বীরভূমি

মাসিক পত্রিকা

নবম খণ্ড

সন ১৩৩৫ সাল

সম্পাদক

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

প্রকাশক

শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্

সিউড়ী, বীরভূম।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
অখিল-ভারত-ব্রাহ্মণ-সম্মেলন	সম্পাদক	৩১৯
অর্জ্জুনের শ্রীরাধাদর্শন	ঐ	৩৩৭
অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী	শ্রীশিবরতন মিত্র	৩৩৬, ৫৪
অভিভাষণ	শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী	৮০
ঐ	শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী	২৭৩
অস্তি, নাস্তি ও ভক্তি	শ্রীপ্রসাদকুমার রায় বি-এ,	৩৬৯
আমার দেবতা	শ্রীসুধীরকুমার সিংহ বি-এ,	৪১
আমার বার্ষিকী	সম্পাদক	৪৬৮, ৫১৮
উৎসব	শ্রীসুধীরকুমার সিংহ বি-এ,	২৬৭
কবিতা-দশক	নন্দনন্দন	৪১৫
চৈতন্য সাধনাশ্রমের গান	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল,	৩৭১
জগন্নাথদাস কীর্ত্তনীয়া	শ্রীশিবরতন মিত্র	৫২৪
জন্মলীলা রহস্য	সম্পাদক	৯৭
তিনটি কবিতা	নন্দনন্দন	১৭১
ধর্ম্ম-গুণাশ্রিত ও নির্গুণ	সম্পাদক	৪৩৩
ধর্ম্মের ঘরে সিঁদ	উদ্ধৃত	১৭৫
নারদের কথা	সম্পাদক	১৯৩
নারদের শ্রীরাধাদর্শন	ঐ	২৮৯
নিত্যলীলা	ঐ	১৪৫
পথ ও প্রশ্ন	শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মহাপাত্র	৩৭৭
পুরঞ্জন বা আত্মতত্ত্ব	সম্পাদক	৩৮৫
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি	শ্রীশশিভূষণ সেনগুপ্ত	৩১৫
প্রাণহীন প্রথা	অনুবাদ	২২১
প্রাণান্বেষণ	শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ	২৭০

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
প্রেম	শ্রীশশিভূষণ সেনগুপ্ত	২৫৬
প্রেমময়ী রাধা	শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ	৪২১
বর্ষা-বিরহ	শ্রীসুধীরকুমার সিংহ	৩৭৪
বৃত্রাসুর ও চিত্রকেতু	সম্পাদক	৪৮১
বেদ ও পুরাণ	ঐ	৫২৯
মন্তব্য ও সংবাদ	সম্পাদক	
অনধিকার চর্চ্চা	”	২৩৮
একখানি পত্র	”	১৩৮
একজন সুলেখক	”	৪৩০
কবি জয়দেবের পরিচয়	”	৯৬
গ্রন্থ-পরিচয়	”	১৮৩
চণ্ডীদাস ও শ্রীগৌরাঙ্গ	”	১৮২
জাতীয় মহাসমিতি	”	৫৭৫
তারকেশ্বর	”	৯২
দেশকর্ম্মী শরৎকুমার	”	১৭৮
দরিদ্রের দারুণ ক্ষতি	”	২২৫
নূতন মাসিক পত্র	”	১৪২
বিজ্ঞানের দাবী	”	৪৫
বিশ্বজনীন বাস্তবধর্ম্ম	”	৪৩
বিশ্ব-ব্রাহ্মণ শিক্ষা-সমিতি	”	৪২
বীরভূম বিবরণ	”	২৮৬
ব্রাহ্মণের নিন্দা	”	১৩৯
ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী	”	২৩২
ব্যবসায়ী সংবাদ-পত্র	”	২৩০
ভ্রম সংশোধন	”	২৮৫, ৪৩২
মহাসমিতির নির্দ্ধারণ	”	৩৪
লণ্ডনে হিন্দুমন্দির	”	৯৬

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
শরৎকুমার আলোচনা	সম্পাদক	৩৮৩
শরৎ-সম্বর্দ্ধনা	„	৩৩০
শ্রীবিষ্ণুদাস কবীন্দ্র	„	১৮৯
শ্রীবুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্য	„	১৮১
শ্রীমৎ মাধ্বাচার্য্য	„	২৩৯, ৪৩১
সমাজ বিপ্লব	„	৪৮
সাহায্য প্রার্থনা	„	২৮৭
সুবর্ণ বণিক সমাজ	„	২২৭
শান্তি (কবিতা)	„	৩৬৬
শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা	সম্পাদক	১
শ্রীকৃষ্ণ কথার সূচনা	„	৪৯
সন্ন্যাসের শিক্ষা	নন্দনন্দন	৫৬৪
সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার	„	৪৮৯
হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর অভিভাষণ		২৯
হিন্দু সভ্যতা	ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১২৪
হিন্দু মুসলমান	উদ্ধৃত	৪২৪

শান্তিনিকেতন প্রেস।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগার কলিকাতা

শ্রীকৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা

১। শ্রীগুরু বন্দনা

বাহিরের চক্ষু দুইটি স্থূল চক্ষু; ইহাদের সাহায্যে মানুষ যাহা দেখিতেছে, ও জানিতেছে, তাহার নাম জগৎ বা সংসার। এই জগৎ বা সংসার সীমাবদ্ধ বা ক্ষয়শীল। মানুষ তাহার স্থূল চক্ষুর দ্বারা এই জগৎ দেখিতেছে, দেখিয়া বুঝিতে ও বুঝিয়া আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু কিছুতেই পারিতেছে না, পদে পদে পরাজিত হইতেছে।

ভিতরের চক্ষু বা অন্তর্দৃষ্টি বলিয়া একটা জিনিস আছে। সেই চক্ষু, দিব্যচক্ষু বা জ্ঞানচক্ষু—প্রজ্ঞাচক্ষু বা প্রেমচক্ষু। সেই চক্ষু আছে, প্রত্যেক মানুষেরই আছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইবার সময় এই চক্ষু দিয়াছিলেন। সেই চক্ষু আছে, কিন্তু, থাকিয়াও যেন নাই। আছে, কিন্তু, অজ্ঞানে অন্ধ হইয়া যেন মরিয়া পড়িয়া আছে। আমাদের সকলের ক্রমে ক্রমে সেই চক্ষু বিকশিত হউক। যাঁহার কৃপায় সেই চক্ষু বিকশিত ও ক্রিয়াম্বিত হয়, তিনিই 'গুরু'। 'গু'-শব্দের অর্থ অন্ধকার, আর 'রু' শব্দের অর্থ নিরোধক। শ্রীভগবান্‌ই গুরু, তিনি এক ও অদ্বিতীয়—অন্তর্যামীরূপে প্রত্যেক জীবেরই অন্তরে তিনি আছেন। মানুষ তাঁহাকে ধরিতে পারে; নিজের ভিতরেই তাঁহাকে ধরিতে পারে, দেখিতে পায়, তাঁহার কথা শুনিতে পায়, তাঁহার কথা শুনিয়া অভয় ও অমৃত লাভ করে। বাহিরের গুরু উদ্দীপকমাত্র। এই বাহিরের গুরু এক হইতেও পারেন, বহু হইতেও পারেন; সমগ্র জীবনব্যাপীও হইতে পারেন, কিছুদিনের জন্যও হইতে পারেন। এই গুরু, বাহিরের গুরু, যে-কেহ এই গুরু হইতে পারেন, সকলেই হইতে পারেন, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত। বাহিরের এই গুরু যিনিই হউন, তিনি গৌণ, তিনি সহায়ক; তিনি উপায়, উপেয় নহেন,—কখনই নহেন,

কিছুতেই নহেন ; শ্রীকৃষ্ণই শ্রীভগবান্ স্বয়ং ভগবান্ ! গুরুরূপী সেই, শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম।

সংসার দাবানললীঢ় লোকত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বং ।
প্রাপ্তস্ত কল্যাণগুণার্ণবস্ত বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥

সমুদ্র. তাঁহার বিশাল জলরাশি লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া নাই। সমুদ্র যদি নিশ্চেষ্ট হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে সংসার থাকিত না, জীব থাকিত না, সব জ্বলিয়া পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইত। সমুদ্রের জল বাষ্প হইয়া আকাশে উঠিতেছে, মেঘ হইয়া বাতাসে ভর করিয়া দেশে দেশে আকাশে ঘুরিতেছে, আর শীতল ও স্নিগ্ধ বৃষ্টিরূপে আপনাকে দান করিয়া জীবের জীবন রক্ষা করিয়া কল্যাণ সাধন করিতেছে। সমুদ্র জল তীব্র ও লবণাক্ত, সুতরাং অপেয় ; কিন্তু, বৃষ্টির জল মিস্ট, স্নিগ্ধ ও সুপেয়। নিখিল কল্যাণগুণের মহাসমুদ্র শ্রীভগবান্ নিশ্চেষ্ট নহেন। একদিকে আমাদের এই সংসার ; আমরা এই সংসারের জীব, আমাদের কর্ম্মদোষে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি, দাবানলে ক্লিস্ট হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছি, একেবারে নিরুপায় ও অসহায়। আর অন্যদিকে, শ্রীভগবান্ই বর্ষণশীল মেঘের ন্যায় করুণার অমৃত বর্ষণের জন্য গুরুরূপে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, মরুভূমিতে, প্রান্তরে, পর্ব্বতে, বনে, মেঘেরই মত নির্ব্বিচারে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া আত্মবিতরণ করিয়া অভয় ও অমৃত দান করিতেছেন। সেই গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

জয় জয় শ্রীগুরু, প্রেমকল্পতরু, অদভুত যাক প্রকাশ।
হিয়-অগেয়ান-তিমিরবর জ্ঞান-সুচন্দ্র কিরণে করু নাশ ॥
ইহ লোচন-আনন্দ-ধাম।
অযাচিত এ হেন, পতিত হেরি যো পঁহু যাচি দেয়ল হরিনাম ॥
দুরগতি অগতি অমতমতি যো জন নাহি সুকৃতি লবলেশ।
শ্রীবৃন্দাবন-যুগল-ভজন ধন তাহে করত উপদেশ ॥
নিরমল গৌর প্রেম-রস সিঞ্চনে পূরল সব মন আশ।
যো চরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল, রোয়ত বৈষ্ণব দাস ॥

প্রেমকল্পতরু শ্রীগুরুর জয় হউক, আমার সমগ্র জীবনে তাঁহার প্রভাব সর্ব্বতোভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক। শ্রীগুরুর প্রকাশ অদ্ভুত ; হৃদয়ের অজ্ঞানরূপ অতি ভয়ঙ্কর (বর)

অন্ধকার, জ্ঞানরূপ সুচন্দ্র-কিরণে তিনি নাশ করিয়া থাকেন। (জ্ঞান = সুচন্দ্র ; আমাদের পৃথিবীর আকাশের চন্দ্রের ন্যায় তাহা কলঙ্কযুক্ত নহে, রাহুভীত নহে, মেঘাবৃত নহে, আকার মাসান্তে কেবল একদিন পূর্ণকলের নহে। তাহা অকলঙ্ক, পূর্ণকল, নির্ভীক ও চির-অনাবৃত।) শ্রীগুরু এই সংসারে চক্ষুর চিদানন্দ-নিকেতন। সেই প্রভু অযাচিত-ভাবে আসিয়া, পতিত দেখিয়া সাধিয়া হরিনাম দিয়াছেন। যে ব্যক্তি দুর্গতি, অগতি ও অসৎমতি, যাহার সুকৃতির কণামাত্রও নাই, তাহাকেও শ্রীবৃন্দাবনের যুগল-ভজন-রূপ ধন উপদেশ করেন। তিনি নির্ম্মল গৌর-প্রেম-রস-সিঞ্চনে সকলের মনের আশা পূর্ণ করিলেন। সেই পাদপদ্মে রতি হইল না বলিয়া আমি বৈষ্ণবদাস রোদন করিতেছি।

২। অন্তর্দৃষ্টি—অমৃত-নয়ন

অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। মানুষের অমৃত-নয়ন আছে, অনন্ত জগতের অমৃতরূপ সেই অমৃত-নয়নে দেখিতে হইবে। অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন হও, ভাবুক হও, ভাবের জগতে প্রবেশ কর, এই ভাবজগৎই অনন্ত ও নিত্য। মানুষের কল্পনাবৃত্তি সেই অনন্তের মধ্যে প্রসারিত হউক। তোমরা সকলে সেই অনন্তের মধ্যে নবজন্মলাভ কর, ভারতের নর-নারী সকলে সমস্বরে সজোরে বল, আমরা দ্বিজ—আমরা ত্রিজ—শূদ্রত্ব পরিহার কর, তাহার পর এই ভাগবতশাস্ত্র শ্রবণ কর।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা আরম্ভ করিবার সময় শ্রীমদ্ভাগবতের ঋষি এই কথাই বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীমদ্ভাগবতের কথা শুনিতে শুনিতে যখন শ্রীশুকদেবকে অনুরোধ করিলেন,—এইবার শ্রীকৃষ্ণকথা বিস্তারিতরূপে বলুন, তখন শ্রীশুকদেব মহারাজার মুখের প্রতি চাহিলেন। তাঁহার এই দৃষ্টি অর্থপূর্ণ। শ্রীশুকদেব যেন বলিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণ-কথা বলিব, বিস্তারিতরূপেই বলিব, কিন্তু, ঠিকমত বুঝিতে পারিবে তো? উল্টা করিয়া বুঝিবে না তো? শ্রীকৃষ্ণ-কথা উল্টা করিয়া বুঝিবার বা ভুল করিয়া বুঝিবার একটা সম্ভাবনা আছে। মহারাজ পরীক্ষিত তখন শ্রীশুকদেবকে বুঝাইলেন,—আপনার কৃপায় ভুল বুঝিব না বলিয়াই আশা করিতেছি। আপনি বলুন।

বীর্য্যাণি তস্যাখিলদেহভাজামন্তর্বহিঃ পুরুষ কালরূপৈঃ।
প্রযচ্ছতো মৃত্যুমুতামৃতঞ্চ মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্॥ ভা, ১০।১।১৩

সকল প্রাণীর অন্তরে ও বাহিরে, পুরুষ ও কালরূপে থাকিয়া যিনি অমৃত ও মৃত্যু দান করিতেছেন, হে বিদ্বন্, তাঁহার বিক্রমময় কার্য্যসকল বলুন। শ্রীধরস্বামী মহোদয় এই শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—অতএব অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া এই শ্রীকৃষ্ণ-কথা শুনিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলার মূলতত্ত্বও শুনিবার অধিকার এই শ্লোকটিতে রহিয়াছে। যমুনার দুই পার! একপারে নন্দগোকুল, ব্রজ ও বৃন্দাবন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ অমৃত। মানুষের তো কথাই নাই; পশুপাখী, কীটপতঙ্গ, তৃণগুল্ম, পাথর জল পর্য্যন্ত অমৃত লাভ করিয়াছে। সেই কৃষ্ণই মথুরা আসিলেন, কিন্তু কংসের নিকট শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যু। শিশুপালের নিকটও মৃত্যু দন্তবক্র, জরাসন্ধ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতির নিকটও তিনি মৃত্যু। ইহাকেই বলে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। শ্রীভগবান্‌কে এড়াইবার উপায় নাই। আমাদের হৃদয়পুরে শ্রীভগবান চতুর্ভুজ বা দ্বিভুজ পুরুষরূপে রহিয়াছেন, আমরা যদি সংযম ও তপস্যার পথে, প্রেম ও ভক্তির পথে অন্তর্মুখী হইয়া তাঁহার অভিমুখী হই, তাহা হইলে আমরা অমৃতত্ব লাভ করিব। আর যদি তাহা না করি, এই সুদুর্লভ মানবজন্ম পাইয়াও, বেদাদি শাস্ত্রের উপদেশ শুনিয়াও, যদি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করি, যদি দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রেরণায় প্রবৃত্তিমার্গে ভোগ ও স্বার্থপরতার পথে ধাবিত হই, তাহা হইলে কি হইবে? শ্রীভগবান্ কালরূপে বাহিরে রহিয়াছেন, তাঁহার প্রভাবে আমরা মরিব, জন্মাইব, আবার মরিব, আবার জন্মাইব; সত্য ও অমৃত হইতে বঞ্চিত হইয়া কেবলই দুঃখভোগ করিব। "গতাগতিং কামকামা লভন্তে"

৩। মানুষ ও যজ্ঞ

শ্রীভগবান্ এই প্রকারে কার্য্য করিতেছেন। চিরদিন, চিরকাল তাঁহার এই কার্য্য চলিতেছে। প্রত্যেক প্রাণীরই ভিতরে পুরুষরূপে থাকিয়া অমৃত দান করিতেছেন, আর বাহিরে কালরূপে থাকিয়া মৃত্যু দান করিতেছেন। যত প্রাণী আছে তাহার মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ। কারণ, মানুষই সর্ব্বপ্রথম এই মহাসত্য বা সারসত্য বুঝিতে পারে। মানুষের জীবনই কর্ম্মজীবন, সত্য বুঝিয়া হিসাব করিয়া মানুষই মিথ্যার সহিত সংগ্রাম করিয়া সত্যের পতাকা বহন করিতে পারে। এই পৃথিবীই কর্ম্মভূমি। পৃথিবীর অধিকার

লইয়াই দেবতায় ও অসুরে সংগ্রাম। অসুরেরা পৃথিবীকে নিজেদের অধিকারে রাখিবার জন্য রসাতলে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ব্রহ্মা স্বায়ম্ভুব মনুকে যখন সৃষ্টিপ্রবাহ পরিচালনার জন্য আদেশ করিলেন, সে সময়ে মনু নিরুপায়। সেই সময়ে ব্রহ্মার নাসিকারন্ধ্র হইতে বরাহ দেবের আবির্ভাব হয়। এই যজ্ঞমূর্ত্তি বরাহদেবই রসাতল হইতে পৃথিবীকে উত্তোলন করিয়া নিজের আধার শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। বরাহদেবের সহিত আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষের সংগ্রাম হয়। এই যজ্ঞের দ্বারাই পৃথিবী ও পৃথিবীর মানুষ অসুরের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া দেবতার সহিত আদানপ্রদানময় নিত্যসম্বন্ধে আসিয়াছে। মানুষ ক্রতুময়, যজ্ঞময়। এই যজ্ঞ একরূপ নহে,—বহুরূপ; এক এক যুগে এক এক রূপ। গীতায় শ্রীভগবান্ তাহা বলিয়াছেন—

দ্রব্যযজ্ঞা স্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ শংসিতব্রতাঃ ॥৪।২৮

শ্রীল মধুসূদন সরস্বতীর মতে গীতায় সর্ব্বসমেত ছয় প্রকার যজ্ঞের কথাই বলা হইয়াছে। ইহার সবই ভাল; কিন্তু ভাগবত-ধর্ম্ম, যাহা বর্ত্তমান কলিযুগে প্রচারিত হইয়াছেন, তিনি বলেন—

কলিযুগে নামযজ্ঞ সর্ব্বযজ্ঞসার।
কলৌ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

পৃথিবীর অধিকার লইয়া যখন দেবাসুরের সংগ্রাম, তখন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই, চেতনে অচেতনে, উদ্ভিদে পশুতে সর্ব্বত্রই দুইটি বিরোধীশক্তির ক্রিয়া চলিতেছে। মানুষে আসিয়া এই সংগ্রাম সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট হইয়াছে। মানুষকে এই সংগ্রাম বুঝিতে হইবে; এবং বুঝিয়া দেবশক্তির অভিমুখী হইতে হইবে। দেবশক্তির অভিমুখী হইলেই মানুষ অমৃত লাভ করিবে, ইহাই ত্যাগের পথ বা নিবৃত্তিমার্গ; যজ্ঞে ইহার আরম্ভ, আর প্রেমে ইহার সমাপ্তি; এই পথই ব্রজের পথ। আর এক পথ—উদ্দাম ভোগের পথ; যাহারা এই পথের পথিক তাহারাও যোগবিদ্যার ও তপস্যার আশ্রয় গ্রহণ করে; যেমন হিরণ্যকশিপু ও রাবণ। ইঁহারাও সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই তপস্যা আত্মসুখের জন্য,—সেবার জন্য নহে।

এই দুইটি পথ; মানুষ এই দুইটি পথের সঙ্গমস্থলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একদিকে

ভব, আর একদিকে ভাব। ভবের পথে মৃত্যু, আর ভাবের পথে অমৃত। ভগবান্‌ই, অসুর ও দেবতা দুইই সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি তাঁহার খেলা, তাঁহার লীলা। দেবাসুরের যুদ্ধ, সমুদ্র মন্থন, এ সকলও তাঁহার খেলা। মানবসৃষ্টিই তাঁহার সৃষ্টিলীলার শেষ সীমা। কারণ, তাঁহার এই সৃষ্টির যাবতীয় উপকরণ একাধারে সুস্পষ্টরূপে এই মানুষের মধ্যেই আছে। ভগবান্ মানুষ সৃষ্টি করিলেন, তিনিও মানুষ হইলেন। ইহারই নাম নরলীলা। তিনি যে মানুষ ছিলেন না, আজ হইলেন, তাহা নহে। যাহা ছিল না, তাহা হয় না। যাহা অব্যক্ত ছিল, তাহাই ব্যক্ত হয়; অব্যক্তের ব্যক্তের নামই সৃষ্টিলীলা, অপ্রকটের প্রাকট্যের নামই সৃষ্টিলীলা।

৪। নিত্যের প্রাকট্য

তাহা হইলে, একটি কথা বুঝিতে পারা গেল। শ্রীকৃষ্ণের লীলা এই ভারতবর্ষে প্রকট হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-লীলা ঐতিহাসিক। কিন্তু, কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনা-রূপে এই ঘটনাগুলিকে দেখিলে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য পাওয়া যাইবে না। ঘটনাগুলি বাহিরে ঘটিতেছে, কিন্তু আমরা এই ঘটনাগুলিকে কেবল ঘটনারূপে বুঝিব না, প্রত্যেক ঘটনাতেই বিশ্বলীলার কতকগুলি চরম ও নিত্যতত্ত্ব যেন মূর্ত্তি লইয়া প্রকট হইয়াছে, এইভাবে আমরা অন্তর্মুখী হইয়া ঘটনাগুলির তত্ত্ব আলোচনা করিব।

এই যে মানুষ, এই যে 'আমি', এই 'আমি'টার ভিতর, এই মানুষ 'আমিটার' ভিতর সবই আছে। ইহার ভিতর নাই, এমন কিছুই নাই। কার্য্যরূপী ব্রহ্মাণ্ড তো আছেই, ব্রহ্মাণ্ডের কারণ যাহা তাহাও আছে, এই 'আমি'টাতেই আছে, এই মানুষের ভিতর আছে। এই মানুষের আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, কল্পনায়, চিন্তায় ও চেষ্টায়, দেবতা আছে, অসুর আছে, দেবাসুরের যুদ্ধ আছে, সমুদ্র-মন্থন আছে। দেবতার পরাজয় আছে, অসুরের বিজয় আছে, আবার শ্রীভগবানের আবির্ভাব আছে, ছোটবড় অবতার আছে, সর্ব্বশেষে বা সবার উপরে বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীভগবান্ আছেন, প্রেমের পূর্ণ বিজয় আছে। আর কি থাকিবে? ইহাই শেষ, প্রেমলীলা—শ্রীবৃন্দাবন। ইহারই নাম 'তত্ত্ব'। ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু অন্তর্মুখী বা 'অন্তঃপ্রাজ্ঞ' হইলে তবে বুঝা যায়।

বাহিরের জগৎ আছে, প্রপঞ্চের সংগ্রাম আছে আলোতে, আঁধারে, জীবনে

মরণে, পাপে পুণ্যে, জড়ে চেতনে, সৃষ্টিতে প্রলয়ে সংগ্রাম আছে, সন্ধি আছে, জয় পরাজয় আছে। এখানেও সব আছে,—দেবতা আছে অসুর আছে, দেবাসুরের যুদ্ধ আছে, সমুদ্র-মন্থন আছে, সুধা আছে, বিষ আছে। দেবতার পরাজয় আছে, অসুরের বিজয় আছে, শ্রীভগবানের আবির্ভাব আছে, ছোটবড় অবতার আছে। সর্ব্বশেষে প্রেমের বিজয় বা শ্রীবৃন্দাবন আছে, কিন্তু মাত্র একবার—প্রকট-লীলা। ব্রহ্মার একদিনে বা চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে মাত্র একবার। ইহার নাম ইতিহাস। ইহাও বেশ বুঝা যায়। ইহার নাম বাহির। 'বহিঃপ্রাজ্ঞ' হইয়া ইহা বুঝা যায়।

এই দুই আছে। ভিতর ও বাহির। মানব-জাতির ইতিহাসে কেহ ভিতরের দ্বারা বাহির বুঝে, কেহ বাহিরের দ্বারা ভিতর বুঝে। কিন্তু, ভিতর বাহিরের দ্বন্দ্ব আর মিটিতে চাহে না। ভিতর ও বাহিরের এই দ্বন্দ্ব যখন মিটিয়া যায়, ভিতরেও যাহা বাহিরেও তাহাই, ইহাই যখন বুঝা যায়, "উভয়তঃপ্রাজ্ঞ"-অবস্থা যখন আসে, তখনই লীলা সম্যক্-রূপে বা সত্যরূপে বুঝিতে পারা যায়।

৫। বুদ্ধি ও লীলা

গীতায় এই অবস্থাকে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির অবস্থা বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও ঠিক্ তাহাই বলিয়াছেন। মহারাজ পরীক্ষিতের কথা শুনিয়া এই জন্যই শ্রীশুকদেব বলিলেন—

সম্যগ্ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম।
বাসুদেব কথায়াস্তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতিঃ॥
বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথা॥১০।১।১৩

শুকদেব কহিলেন, হে রাজর্ষিসত্তম, তোমার বুদ্ধি সম্যক্‌রূপে 'ব্যবসিত' বা কৃতনিশ্চয়া হইয়াছে। কারণ বাসুদেবের কথায় তোমার নৈষ্ঠিকী রতি জন্মিয়াছে। বাসুদেবকথার প্রশ্ন প্রশ্নকর্ত্তা, বক্তা ও শ্রোতা, এই তিন জনকেই পবিত্র করে; ইহা হরিপদবিনিঃসৃত গঙ্গাজলেরই তুল্য।

এই শ্লোকের "ব্যবসিতা বুদ্ধি" কথাটাই বিশেষরূপে আলোচ্য। মানুষের বুদ্ধিকে

কোন্ অবস্থায় "সম্যক্‌রূপে ব্যবসিতা" বলা যায়, তাহাই চিন্তা করিতে হইবে। এই শ্লোকে আর একটি কথাও ধীরচিত্তে চিন্তা করিতে হইবে। শ্লোকে বলা হইল, প্রশ্নকর্ত্তাও ধন্য, তিনিও পবিত্র। ইহার অর্থ কি? সকলেই তো প্রশ্ন করিতে পারে। অন্যের কাছে শুনিয়া বা কোন গ্রন্থ পড়িয়া প্রশ্ন করা, কঠিন কথা নহে, সকলেই তাহা করিতে পারে। এই প্রকারের প্রশ্ন আমরা সর্ব্বদাই করিতেছি। না হয় শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেব সম্বন্ধেই শুনিয়া, শিখিয়া বা গ্রন্থ পড়িয়া কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহা হইলেই আমি পবিত্র হইয়া যাইব? তাহা হইলে পবিত্র হওয়া তো খুব সহজ ব্যাপার হইয়া পড়িল; ধর্ম্মজীবন খুব সুলভ হইয়া পড়িল।

৬। নিজের অনুভব

ইহার উত্তর শ্রীমদ্ভাগবতেই আছে, আর এই কথা বলার ঠিক্ পূর্ব্বেই সে-কথা আছে। মহারাজা পরীক্ষিত যখন প্রশ্ন করিয়াছেন, তখন কেবল শ্রুতি-স্মৃতি আশ্রয় করিয়া প্রশ্ন করেন নাই; কেবল শোনা কথা স্মরণ করিয়া বলেন নাই। এই শ্রুতি-স্মৃতির মূল্য খুব বেশী নহে। যাহাদের অন্তর্দৃষ্টি বিকশিত হয় নাই, তাহারা এই শ্রুতিস্মৃতি লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু আর একটা জিনিস আছে, তাহার নাম "স্বানুভব"—নিজের অনুভব। এই অনুভব না থাকিলে, শ্রুতি ও স্মৃতি প্রাণহীন। কেহ বলিতে পারেন, নিজের অনুভব কি একেবারেই বিকশিত হয়?' তাহা হয় না। শ্রুতি ও স্মৃতি, এই অনুভব বিকশিত করিতে সাহায্য করে। কিন্তু যতক্ষণ এই অনুভব বা আত্মপ্রত্যয় বা 'বিদ্বদনুভূতি' বিকশিত বা ক্রিয়ান্বিত না হয়, ততক্ষণ মানুষ যে নাবালক মানুষ, সে যে মানুষই নহে, শ্রুতি যে তাহাকে দেবতাদের পশু বলিয়াছেন!

মহারাজ পরীক্ষিত যে এই "অনুভব" বা নিজের ব্যক্তিগত-আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা হইতে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টভাবেই রহিয়াছে। মহারাজ পরীক্ষিতের এই অভিজ্ঞতা মূলে তিন প্রকার। এক, পারিবারিক বা বংশগত; দুই, ব্যক্তিগত বা বা নিজস্ব; তাহার পর, সার্ব্বজনীন।

প্রথমেই বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যে আমার কুলদেবতা!

পিতামহা মে সমরেঽমরঞ্জয়ৈর্দেবব্রতাদ্যাতিরথৈস্তিমিঙ্গিলৈঃ ।
দুরত্যয়ং কৌরবসৈন্যসাগরং কৃত্বাতরন্ বৎসপদং স্ম যৎপ্লবাঃ ॥১০।১৫

আমার পিতামহগণ (পাণ্ডবেরা), কি বিপদেই না পড়িয়াছিলেন ! কৌরবদের বিপুল সৈন্য সমুদ্রের তুল্য অতিশয় বিস্তীর্ণ ছিল । দেবব্রত ভীষ্মের ন্যায় অমরজয়ী, ইচ্ছামৃত্যু প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন অতিরথগণ তিমিঙ্গিলের তুল্য, সেই সৈন্যসাগরকে অতিশয় দুস্তর করিয়াছিলেন ! আমার পিতামহগণ শ্রীকৃষ্ণকে তরণির মত পাইয়া সেই সমুদ্রকে বৎসপদের তুল্য তুচ্ছ করিয়া তাহা অনায়াসে পার হইয়াছিলেন ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে আমার কুলরক্ষক, কুলদেবতা ।

তাহার পর, এই শ্রীকৃষ্ণ আমার জীবনদাতা—

দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টমিদং মদঙ্গং সন্তানবীজং কুরুপাণ্ডবানাং ।
জুগোপ কুক্ষিং গত আত্তচক্রো মাতুশ্চ মে যঃ শরণং গতায়াঃ ॥১০।১৬

কুরুপাণ্ডবগণের সন্তানবীজ, এই যে আমার শরীর, এই শরীর যখন মাতৃগর্ভে ছিল, তখন ইহাকে নষ্ট করার জন্য দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল । আর আমার মাতা নিরুপায় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়াছিলেন । তখন শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র গ্রহণ করিয়া মাতার কুক্ষিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গদার দ্বারা আমার ও আমার মাতার অঙ্গ রক্ষা করিয়াছিলেন ।

এই দুইটি 'অভিজ্ঞতা'র কথা বলার পর, যে শ্লোকটি বলিলেন, আমরা পূর্ব্বেই সেই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিয়াছি । সেই শ্লোকটি তত্ত্বকথা । তাহার তাৎপর্য্য, আমি জানি, আমার পিতামহগণ জানিতেন, ইহাই আমাদের কুলগত অভিজ্ঞতা, আর ইহাই আমার নিজেরও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, যে শ্রীকৃষ্ণ মানবরূপে আবির্ভূত হইলেও তিনি সাধারণ মানব বা সাধারণ পুরুষ নহেন, তিনি সেই বিশেষ পুরুষ বা "পুরুষ বিশেষঃ" ; তিনি সেই পরম-পুরুষ, আদ্যপুরুষ বা পুরুষোত্তম, যিনি প্রত্যেক দেহধারীর অন্তরে ও বাহিরে, পুরুষও কালরূপে থাকিয়া অমৃত ও মৃত্যু দান করিতেছেন ।

৭ । প্রশ্ন

এতদূর অগ্রসর হইয়া অর্থাৎ বংশগত অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও তত্ত্ববোধ

এই তিনটি স্তর অতিক্রম করিয়া, মহারাজ পরীক্ষিৎ যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সেইগুলি বিশেষ কথা। বৈষ্ণবতোষণী টীকা, ও শ্রীল বিশ্বনাথ বলিতেছেন "বিশেষং পৃচ্ছতি"।

চারিটি শ্লোকে পরীক্ষিৎ-কর্ত্তৃক এই বিশেষ প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করার হেতু, কিছু ভাগবতে আছে, আর কিছু জনশ্রুতি। সেই কথাগুলি এই।

১। যিনি সঙ্কর্ষণ, তিনিই রাম বা বলরাম। তিনি রোহিণীর পুত্র। আবার বলিলেন, তিনি দেবকীর পুত্র। দেহান্তর বা পুনর্জন্ম ব্যতীত, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে?

শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের শেষ অধ্যায়ে বলদেবকে রোহিণীর গর্ভসম্ভূত বলা হইয়াছে।

২। শ্রীকৃষ্ণ পিতৃগৃহ হইতে কিজন্য ব্রজে গমন করেন?

৩। শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞাতিগণের সহিত কোথায় বাস করিয়াছিলেন?

ব্রজে ও মধুপুরে বাস করার সময় শ্রীকৃষ্ণ কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন?

৪। শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার মাতুল কংসকে কেন বধ করেন?

৫। তিনি কত বৎসর লীলা করিয়াছিলেন?

৬। তাঁহার পত্নী কতগুলি?

এইগুলি মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন। এই সমুদয় প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্য মহারাজার কিরূপ আগ্রহ হইয়াছে, এবং শ্রীকৃষ্ণকথা তাঁহার নিকট কিরূপ উপাদেয় ও মনোরম, পরের শ্লোকে তাহাই বলিয়াছেন।

নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতং॥১০।১।১১

মহারাজ পরীক্ষিত, শ্রীশুকদেবকে বলিতেছেন—প্রভো, আপনি দয়া করিয়া বিলম্ব করিবেন না, আমাকে বলিবেন না, যে তোমার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পাইয়াছে, তুমি ব্যাকুল হইয়াছ, ক্ষণকাল বিশ্রাম কর। আপনার মুখপদ্মবিনির্গত হরিকথামৃত পান করায় দুঃসহ ক্ষুধা আমাকে কোনরূপ কষ্ট দেয় নাই। জলপান ত্যাগ করিয়াছি, আপনার শ্রীমুখের হরিকথামৃত পানের জন্যই বাঁচিয়া আছি। অতএব বলুন।

৮। প্রশ্নের উদয়

শ্রীকৃষ্ণ-কথা জিজ্ঞাসার অধিকারের ক্রমগুলি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে এগারটি শ্লোকে বেশ ভাল করিয়াই বলা হইয়াছে। আমাদিগকে চিন্তাপূর্ব্বক বুঝিয়া লইতে হইবে। এই সঙ্গে, নবম স্কন্ধের শেষের কয়েকটী শ্লোকও স্মরণ করা উচিত। নবম স্কন্ধের চব্বিশ অধ্যায়ে বৈবস্বত মনুর বংশ বলা হইয়াছে। তের অধ্যায়ে সূর্য্যবংশ, আর এগার অধ্যায়ে চন্দ্রবংশ। শ্রীকৃষ্ণকথায় আসিয়া নবম স্কন্ধ শেষ হইয়াছে। তাহার শেষের শ্লোকগুলি এই।

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য ক্ষয়োবৃদ্ধিশ্চ পাপ্মনঃ।
তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ॥
ন হ্যস্য জন্মনো হেতুঃ কর্ম্মণো বা মহীপতে।
আত্মমায়াং বিনেশস্য পরস্য দ্রষ্টুরাত্মনঃ॥
যন্মায়াচেষ্টিতং পুংসঃ স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ায় হি।
অনুগ্রহস্তন্নিবৃত্তেরাত্মলাভায় চেষ্যতে॥
অক্ষৌহিণীনাং পতিভিরসুরৈর্নৃপলাঞ্ছনৈঃ।
ভুব আক্রম্যমাণায়া অভারায় কৃতোদ্যমঃ॥
কর্ম্মাণ্য পরিমেয়ানি মনসাপি সুরেশ্বরৈঃ।
সহ সঙ্কর্ষণশ্চক্রে ভগবান্ মধুসূদনঃ॥
কলৌ জনিষ্যমাণানাং দুঃখশোকতমোনুদং।
অনুগ্রহায় ভক্তানাং সুপুণ্যং ব্যতনোদ্যশঃ॥
যস্মিন্ সৎকর্ণপীযূষে যশস্তীর্থবরে সকৃৎ।
শ্রোত্রাঞ্জলিরুপস্পৃশ্য ধুনুতে কর্ম্মবাসনাং॥
ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকমধুশূরসেনদশার্হকৈঃ।
শ্লাঘনীয়েহিতঃ শশ্বৎ কুরুসৃঞ্জয় পাণ্ডুভিঃ॥
স্নিগ্ধস্মিতেক্ষিতোদারৈর্বাক্যৈ বিক্রমলীলয়া।
নৃলোকং রময়ামাস মূর্ত্ত্যা সর্ব্বাঙ্গরম্যয়া॥

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণভ্রাজৎ কপোলসুভগং সবিলাসহাসং
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো নার্য্যোনরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ॥

জাতোগতঃ পিতৃগৃহাদ্ ব্রজমেধিতার্থো হত্বারিপূন্ সুতশতানি কৃতোরুদারঃ।
উৎপাদ্য তেষু পুরুষঃ ক্রতুভিঃ সমীজে আত্মানমাত্মনিগমং প্রথয়ন্ জনেষু॥
পৃথ্ব্যাঃ স বৈ গুরুভরং ক্ষপয়ন্ কুরূণামন্তঃ সমুত্থকলিনা যুধি ভূপচম্বঃ।
দৃষ্ট্যা বিধূয় বিজয়ে জয়মুদ্বিঘোষ্য প্রোচ্যোদ্ধবায় চ পরং সমগাৎ স্বধাম॥

যে যে সময়ে ধর্ম্মের ক্ষয় ও পাপের বৃদ্ধি হয়, সেই সময়ে ভগবান্, ঈশ্বর হরি আপনাকে সৃজন করিয়া থাকেন। (ভগবানের প্রত্যেক অবতারের আবির্ভাবের ইহাই সাধারণ হেতু; গীতায় ইহা বলা হইয়াছে। "তত্র ভগবদবতারমাত্রস্য সামান্যতঃ কারণমাহ"।)২৬

অন্যের অর্থাৎ জীবের জন্ম ও কর্ম্মের হেতু প্রাচীন কর্ম্ম। তাহা হইলে শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্ম্মের হেতু কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, শ্রীভগবান্ ঈশ অর্থাৎ মায়ার নিয়ন্তা, তিনি পর অর্থাৎ অসঙ্গ, তিনি দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষী, তিনি আত্মা অর্থাৎ সর্ব্বগত, অতএব মায়াবিনোদ ব্যতীত তাঁহার জন্মকর্ম্মের আর কারণ কি? মায়া বিনোদ বলিতে কৃপা প্রকাশ বুঝায়। জীবকুল সংসারের দুঃখসাগরে পতিত, তাহাদিগকে দেখিয়া তাঁহার কৃপা হয়। ২৭

ভগবানের এই কৃপা কৈমুত্য ন্যায়ের দ্বারা দেখাইতেছেন। পুরুষ, প্রকৃতির ঈক্ষণ-কর্ত্তা। মায়ায় সেই পুরুষের যাহা চেষ্টিত অর্থাৎ ঈক্ষণাদি কর্ম্ম তাহাতে জীবের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপাই প্রকাশিত হয়, কারণ এই কর্ম্মের দ্বারা জীবের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়াদি হইয়া থাকে। এই কার্য্য মায়াগন্ধযুক্ত। যদি ইহা দ্বারাই অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে মায়াগন্ধহীন গোবর্দ্ধনধারণাদি কর্ম্ম যে কতদূর অনুগ্রহ-প্রকাশক, তাহা বলাই বাহুল্য। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি লাভ করিয়া জীব যে বিষয়ভোগাদি করে, তাহাও ভগবানের কৃপা; কিন্তু, তাহা মায়াচেষ্টিত। বিষয়ভোগের পরিণাম ভাল নহে, ইহাতে সংসার-দুঃখ ঘটিয়া থাকে। শ্রীভগবান্ তাঁহার জন্ম ও কর্ম্মের দ্বারা জীবের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়কে সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা ভগবদ্প্রাপ্তির উপযুক্ত করেন। ২৮

বহু বহু অক্ষৌহিণীর পতি রাজচিহ্নধারী অসুরগণ, পৃথিবী আক্রমণ করাতে ধরা মহাভারাক্রান্ত হইয়াছিলেন। পৃথিবীর সেই ভার দূর করার জন্য, শ্রীভগবানের এই উদ্যম। যে-সকল কর্ম্ম দেবেশ্বরগণের অতর্ক্য, ভগবান্ মধুসূদন সঙ্কর্ষণের সহিত তাহা করিলেন।

পৃথিবীর ভারহরণ ও অসুরবধ এই দুই কার্য্যের দ্বারা শ্রীভগবানের সংসারহরণরূপ কৃপা প্রকাশিত হয়। ২৯-৩০

শ্রীভগবানের আবির্ভাব-কালে যাঁহারা সংসারে ছিলেন, শ্রীভগবান্ যে কেবল তাঁহাদেরই কৃপা করিলেন, তাহা নহে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সঙ্কল্পমাত্রেই ভূভারহরণে সমর্থ, তথাপি আবির্ভূত হইয়া লীলা করিলেন। কারণ, কলিকালে যাহারা জন্মিবে, তাহাদের দুঃখ, শোক ও তমোগুণ, শ্রীভগবানের এই লীলাকথা শ্রবণের দ্বারা দূরীভূত হইবে। অতএব, ভবিষ্যতের জীবের জন্যও তিনি কৃপা করিয়াছেন। ৩১

শ্রীভগবানের ঐ যশঃ বা লীলাকথা সাধুগণের কর্ণের অমৃত ও শ্রেষ্ঠতীর্থ। কর্ণরূপ অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া ইহা একবার পান করিলে পুরুষ কর্ম্মবাসনা পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয়। ৩২

ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, শূরসেন, দশার্হ, কুরু, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডুবংশীয় মানববর্গ ভগবানের চরিত্রের শ্লাঘা করিয়া থাকেন। ৩৩

স্নিগ্ধ মৃদুহাস্যযুক্ত দৃষ্টি, উদার বাক্য, বিক্রমলীলা ও রমণীয় সর্ব্বাঙ্গযুক্ত মূর্ত্তির দ্বারা শ্রীভগবান্ সমগ্র মানবজাতিকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। ৩৪

এই সকলের মধ্যে ব্রজবাসিগণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধন্য করিয়াছিলেন। মকর কুণ্ডল, সুচারু শ্রবণ যুগল, শোভনীয় কপোল, ও বিলাসপূর্ণ হাস্যের দ্বারা শোভিত তাঁহার বদন সর্ব্বদাই উৎসবময়। সেই বদন নয়নের দ্বারা পান করিয়া নরনারীগণের সাধ মিটিত না, তাঁহারা নিমেষকর্ত্তা নিমির প্রতি পুনঃ পুনঃ ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। ৩৫

শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রজে গমন করেন। কিজন্য ব্রজে গমন করেন? "এধিতঃ প্রকটীকৃত্য বর্দ্ধিতঃ বৃদ্ধিসীমাং প্রাপিতোঽর্থঃ সর্ব্বপুরুষার্থশিরোমণিঃ প্রেমা যেন সঃ"—সর্ব্বপুরুষার্থ শিরোমণি যে প্রেম, সেই প্রেমের পূর্ণতা প্রকটিত করার জন্য। প্রেম প্রখ্যাপনই তাঁহার অবতারের মুখ্য প্রয়োজন। তিনি শত্রুগণকে বিনাশ করেন, তাহাদিগকে মোক্ষদান করা—ইহাও এক প্রয়োজন। তিনি বহুতর দার পরিগ্রহ করেন, শত শত পুত্র উৎপাদন করেন, ইহার দ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করেন এবং স্বকীয় বেদবর্ত্ম বিস্তার করতঃ বহু বহু যজ্ঞের দ্বারা আপনারই পূজা করেন। ৩৬

তাহার পর, ভিতর হইতে সমুত্থিত (জীবের দুষ্কর্ম্মফলজাত) কলিকর্ত্তৃক

সমুৎপাদিত পৃথিবীর গুরুভার মোচন করিয়া দৃষ্টিমাত্রে যুদ্ধস্থলবর্ত্তী নৃপতিগণের সেনাদিগকে কম্পিত করেন। অর্জ্জুনের জয় হইল এইরূপ ঘোষণা করিয়া উদ্ধবকে পরম তত্ত্ব উপদেশ করেন, এবং নারায়ণ-স্বরূপে স্বধামে শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করেন। ৩৭

নবম স্কন্ধের শেষে শ্রীশুকদেব সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলিয়াছেন। এই কথাগুলিও বিশ্লেষণ করিয়া আলোচনা করা আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণের লীলার রহস্য ইহার ভিতর পাওয়া যাইবে। একটি কথা বিশেষরূপে স্মরণীয়। বৈষ্ণবতোষণী টীকায় ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের টীকায়, এই কথাটি ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের লীলার মুখ্য-প্রয়োজন, প্রেম-প্রখ্যাপন। শ্রীবৃন্দাবনে বা ব্রজে এই কার্য্য হইয়াছে। বিরোধী অসুরগণকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মোক্ষদান করেন। ইহাই দ্বিতীয় প্রয়োজন। তৃতীয় প্রয়োজন, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সংস্থাপন। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অনেক পুত্র উৎপাদন করেন, বহু বহু যজ্ঞও করেন। তৃতীয় কার্য্যটি যে হয় নাই, তাহার প্রমাণ প্রভাস ও যদুবংশধ্বংস। এই কার্য্য তখন হইবার নহে বলিয়াই হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ কি জানিতেন না, যে হইবে না? শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন না, বলিলে অপরাধ হইবে, অতএব তাহা বলিবেন না! শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন, কিন্তু অন্যে জানিতেন না, এখনও যে অনেকে জানে না। তাই, শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়া জানাইলেন, উপদেশের দ্বারাও জানাইলেন, তাহা হইবে না। দূর ভবিষ্যতে কখন তাহা হইতে পারে, কিন্তু আপাততঃ তাহা হইবে না।

শ্রীশুকদেবের এই সকল কথার পরেই শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধ শেষ হইল, তাহার পরেই দশমস্কন্ধ ও শ্রীকৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা।

৯। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা

যাঁহারা বেদান্ত-দর্শন বা উত্তর-মীমাংসাদর্শন পড়িয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, এই প্রবন্ধের নাম "শ্রীকৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা" কেন হইল? বেদান্ত-দর্শনের প্রথমেই "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা"। আচার্য্যগণ বিচার করিয়াছেন, কখন কোন্ অবস্থায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি হয়। এ বিষয়ে আচার্য্যগণের মধ্যে বাদানুবাদ হইয়াছে এবং মতভেদও আছে। কিন্তু

এই মতভেদ মারাত্মক নহে। এই মতগুলি মোটামুটি জানিলে "শ্রীকৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা"র রহস্য বুঝিতে পারা যাইবে, বেদান্তের সহিত ভাগবতের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যাইবে, আর বুঝিতে পারা যাইবে, শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের ভাষ্য।

ক। শঙ্করাচার্য্য

শঙ্করাচার্য্যের মতে বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব, এই সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অধিকারী। বিবেক বলিতে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক বুঝায় ইহা নিত্য, ইহা অনিত্য; ইহা থাকিবে, ইহা থাকিবে না, মানুষের মনে এই প্রকারের একটা বিচার জাগে। এই বিচারের ফলে মানুষ নিত্যের সন্ধান পায় এবং অনিত্যকে ধরিতে পারে ও বুঝিতে পারে। তখন তাহার বৈরাগ্য হয়। বৈরাগ্য বলিতে ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগ বুঝায়। ইহলোকে এবং পরলোকে যাহা কিছু আছে, সকলই অনিত্য ও নশ্বর, অতএব এই সকল বিষয়ভোগের যে সুখ তাহা কিছুই নহে, অতএব সে-সকলের জন্য আর কোন কামনা থাকে না। ইহারই নাম বৈরাগ্য। বিবেক হইলেই বৈরাগ্য হইবে, ইহা স্বাভাবিক। ষট্‌সম্পত্তি বলিলে ছয়টি গুণ বুঝায়। শম = বহিরিন্দ্রিয়-সংযম, দম = অন্তরিন্দ্রিয়-সংযম, তিতিক্ষা = শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি দ্বন্দ্ব অবিচলিতভাবে সহ্য করিবার ক্ষমতা, উপরতি = বিষয়ভোগ হইতে ইন্দ্রিয়গণের বিরতি, শ্রদ্ধা = গুরু ও বেদান্তবাক্যে সম্পূর্ণ আস্থা, সমাধান = আত্মতত্ত্বের ধ্যান; আর মুমুক্ষুত্ব = মোক্ষলাভের জন্য প্রবল ইচ্ছা। এই গুণগুলি বা গুণগুলির দ্বারা হৃদয় মন ইন্দ্রিয় ও দেহের যে অবস্থা বুঝায়, সেই অবস্থা যিনি লাভ করিয়াছেন, আচার্য্য শঙ্করের মতে তিনিই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অধিকারী।

শঙ্করাচার্য্যের সহিত পরবর্ত্তীকালের আচার্য্যগণের মতভেদ কোথায় তাহা জানা আবশ্যক। বেদান্তদর্শনের নাম উত্তর-মীমাংসা-দর্শন; ইহা ছাড়া, আমাদের আর একখানি দর্শন আছে, তাহার নাম 'পূর্ব্বমীমাংসা'। উত্তরমীমাংসায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, আর পূর্ব্বমীমাংসায় ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় এই ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই। শঙ্করাচার্য্য বলেন বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেই বুঝিতে পারা যায়, কর্ম্মসমূহের ফল যে স্বর্গাদি, তাহা ক্ষয়শীল। সুতরাং ধর্ম্মজিজ্ঞাসার আর প্রয়োজন কি? উপনিষৎ অধ্যয়ন করিয়া একেবারে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা করিবে। তবে সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন হওয়া চায়।

খ। রামানুজাচার্য্য

বলেন, তাহা নহে। ধর্ম্ম-মীমাংসা ও ব্রহ্ম মীমাংসা, এই দুইখানি দর্শন প্রকৃত প্রস্তাবে একখানি দর্শনেরই দুই অংশ। মানুষ প্রথমে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা করিবে, কর্ম্ম করিবে, এবং বুঝিবে কর্ম্মের ফল অল্প ও অনিত্য। তখন সে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা করিবে। শঙ্করাচার্য্য বলেন—কর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও বেদান্তবাক্যার্থ বিচার করিতে পারেন। রামানুজের মতে—"বৃত্তাৎ কর্ম্মাধিগমাদনন্তরং ব্রহ্মবিবদিষা"—বেদ পাঠ করিতে হইবে, কর্ম্মসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে, সাধারণভাবে উপনিষৎ পড়িতে হইবে, তাহার পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

গ। নিম্বার্কাচার্য্য

রামানুজেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন—ষড়ঙ্গের (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ) সহিত বেদ পাঠ করিলে, কর্ম্মফলসম্বন্ধে নানারূপ চিন্তার উদয় হয় এবং ধর্ম্মের স্বরূপ জানিবার জন্য ইচ্ছা হয়। তখন পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন পড়িলে ধর্ম্মের স্বরূপ, প্রকারভেদ, ও তাহার ফলের জ্ঞান হইয়া থাকে। মানুষ ক্রমশঃ কর্ম্মফলের অনিত্যতা বুঝিতে পারে এবং শ্রীভগবানের গুণ শুনিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। এই অবস্থায় শ্রীভগবানের দর্শনলাভের জন্য প্রেমার্দ্রচিত্তে সদ্গুরুর শরণাগত হইয়া—"অনন্তাচিন্ত্যস্বাভাবিকস্বরূপগুণশক্ত্যাদিভির্বৃহত্তমো যো রমাকান্তঃ পুরুষোত্তমো ব্রহ্মশব্দাভিধেয়স্তদ্বিষয়িকা জিজ্ঞাসা সততং সম্পাদনীয়েত্যুপক্রমবাক্যার্থঃ।"—অনন্ত ও অচিন্ত্য স্বাভাবিক স্বরূপগুণ শক্তি প্রভৃতির দ্বারা বৃহত্তম যে রমাকান্ত পুরুষোত্তম, যিনি ব্রহ্ম-শব্দের দ্বারা অভিহিত, তৎ-সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসা সতত সম্পাদনীয়, ইহাই উপক্রম-বাক্যের অর্থ।

ঘ। বলদেব বিদ্যাভূষণ

মহাশয়, তাঁহার গোবিন্দভাষ্যে বলেন—শিক্ষাদি বেদাঙ্গের সহিত বেদ ও উপনিষৎ অধ্যয়ন আবশ্যক। তাহার পর প্রয়োজন, তত্ত্ববিৎ-প্রসঙ্গ, অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব বা ভগবৎ-তত্ত্ব জানেন, এমন সাধুব্যক্তির সহিত অনুরাগযুক্ত সঙ্গ হওয়া চায়।

তাহা হইলেই নিত্যানিত্য বিবেক হইবে, অনিত্যে বিতৃষ্ণা হইবে, নিত্যবস্তুকে বিশেষরূপে জানিবার জন্য বেদান্তশাস্ত্রে মন প্রবেশ করিবে। বলদেব বলেন—ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা ও কর্ম্ম অনেকেই করে, কিন্তু সৎসঙ্গের অভাবে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ঘটে না। আবার কর্ম্ম-সম্পত্তি নাই এমন লোকও সৎসঙ্গে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হয়। আসল কথা, চিত্তশুদ্ধি প্রয়োজন। কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় না, অতএব কর্ম্মের পর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা, ইহা বলা যায় না। ভক্তির দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি হয়। সাধন চতুষ্টয়ের পর যে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা তাহাও ঠিক নহে।

চারিজন আচার্য্যের মত উদ্ধৃত হইল। ব্যাপার খুব কঠিন নহে। বেদ, বেদাঙ্গ ও উপনিষৎ, মোটামুটি পড়িতে হইবে, সাধারণভাবে তাহাদের অর্থ বুঝিতে হইবে, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। শঙ্করাচার্য্য নৈতিক সদ্‌গুণের (Moral qualifications) প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছেন, রামানুজ ও নিম্বার্ক তাহা অস্বীকার না করিলেও কর্ম্মকাণ্ড (Ritualism) রক্ষা করিয়াছেন। বলদেব, সৎসঙ্গ বা সাধুসঙ্গ বলিয়া একটি নূতন জিনিস আনিয়াছেন, ভক্তিই যে মূল কথা (primacy of emotion)। মনস্তত্ত্বের এই গূঢ় কথাটি বলিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্যের নৈতিক সদ্‌গুণ স্বীকার করিয়াছেন এবং কর্ম্ম-কাণ্ডের উপর জোর না দিয়া ও রামানুজ বা নিম্বার্কের অনুসরণ না করিয়া শঙ্করেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। অবশ্য, ব্রহ্ম বলিতে বৃহত্তম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্, এ-বিষয়ে রামানুজ, নিম্বার্ক ও বলদেব এক মত, এবং শঙ্করের সহিত তাঁহাদের বিরোধ। এই সমান্য আলোচনায় বাঙ্গালীর মনে একটা গর্ব্ববোধ না হইয়াই পারে না। বলদেব বাঙ্গালী। তবে, একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। বর্ত্তমানযুগ সম্প্রদায়ের যুগ নহে, অসাম্প্রদায়িক ও সার্ব্বজনীন সত্যপ্রতিষ্ঠার যুগ। কিন্তু, কেহ কেহ যুগলক্ষণ না জানিয়া অথবা মোহান্তগিরির লোভে যুগধর্ম্মের অন্যথা করিতেছেন, সেইজন্য বাঙ্গালাদেশে বলদেবের বেদান্ত না জানিয়া, নিম্বার্ক প্রভৃতিকে লইয়া অন্ধভাবে টানাটানি চলিতেছে, ইহা বাঙ্গালীর অগৌরব ও নিন্দার কথা।

যাহা হউক শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন করিয়া আমরা "শ্রীকৃষ্ণ-জিজ্ঞাসার" যে ক্রমগুলি দেখাইলাম, বলদেবের মতের সহিতই তাহার বেশ মিল হয়। আচার্য্যগণের প্রত্যেকেরই মত সত্য। যিনি যে সময় আসিয়াছিলেন, সেই সময়ের অবস্থা, যিনি যাহা করিতে

চাহিয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্য, এই দুইটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা প্রত্যেক আচার্য্যকেই শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত প্রণাম করিব, কিন্তু অন্ধভাবে কাহারও মতের অনুবর্ত্তন করিব না, আমাদের সময়ের অবস্থা, ও আমাদের প্রয়োজন, বুঝিয়া আমাদের প্রত্যেকের অধিকার ও অনুভব অনুসারে, মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

১০। শৃঙ্গাররস-সর্ব্বস্ব

শ্রীকৃষ্ণ-জিজ্ঞাসার অধিকার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আর একটি প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছি। 'বৈষ্ণবতোষণী' প্রভৃতি আমাদের দেশের টীকা অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে হইলে, সেই কথা উত্থাপিত না হইয়াই পারে না। শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন, ভূভারহরণ করিয়া সমাজ রক্ষা করিতে, অসুরগণকে বধ করিয়া তাহাদিগকে মোক্ষদান করিতে। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের এই যে দুইটি হেতু, তাহা বহিরঙ্গ—ইহাদের আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক হেতু বলে। ইহার প্রথমটিকে একালের ভাষায় 'ঐতিহাসিক', আর দ্বিতীয়টিকে 'পৌরাণিক' বলা যাইতে পারে। এই দুইটি হেতুই বহিরঙ্গ। যেটি আধ্যাত্মিক বা অন্তরঙ্গ হেতু, সেটি না বুঝিলে শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনার যাহা ভিত্তি, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না। নবম স্কন্ধের শেষাংশের যে-শ্লোকগুলি উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাতে এই গূঢ় বা অন্তরঙ্গ হেতু, বলা হইয়াছে। এই হেতু—প্রেম-প্রখ্যাপন। বেদের যিনি আনন্দব্রহ্ম, রসব্রহ্ম, প্রিয়ব্রহ্ম ও মধুব্রহ্ম, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে প্রকট হইলেন, ইহাই শ্রীভগবানের প্রয়োজন। প্রথম দুইটি হেতু, সংসারী মানবের প্রয়োজন ও ত্রিলোক-রক্ষক দেবতার প্রয়োজন। এই দুইটিই কাম-জগতের কথা। ভিতরের প্রয়োজন কিরূপে বুঝিতে পারা যায়, আমরা সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্—স্বয়ং ভগবান্। ভগবান্-সম্বন্ধে সকলের ধারণা একরূপ নহে। আমরা এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিশ্বব্যাপার দেখিয়া ভগবান্কে অনুমান করি। ইহাই আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের অধিকার। ভগবান্ এই বিশ্বের স্রষ্টা, পালক ও সংহারকর্ত্তা; তিনি বিধাতা, যাহার যাহা কিছু হইতেছে, তাঁহারই ইচ্ছায়। তিনি পতিত-পাবন, দীনতারণ, তিনি দানব-দলন, যুগে যুগে অসুর ও অধর্ম্ম নাশ করিয়া ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিয়াছেন। এইগুলি ভগবানের সাধারণ পরিচয়, বিশ্বমধ্যে তাঁহার কার্য্যাবলী দেখিয়া

আমাদের মনে তাঁহার সম্বন্ধে এই ধারণা জাগিয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন, এগুলি তটস্থ লক্ষণ, এখানে ভগবান্ অনুমান। ভগবান্ সম্বন্ধে এইগুলি শেষ কথা নহে,—প্রথম কথা; ভিতরের কথা নহে,—বাহিরের কথা; ইহা বাহ্য।

তিনি "আত্মার অন্তর্যামী"। এই কথা বলিলে বুঝিতে পারা যায়, বাহির ছাড়িয়া এইবার ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে খুঁজিতেছি। তিনি ভূমা, তিনি সর্ব্ব। আর বাহির নাই, প্রপঞ্চ নাই, ভিতর বাহির এক হইয়া গিয়াছে। এখন সকলি চিন্ময়। দ্বৈত নাই, কিন্তু সকলই আছে, সকলেই তিনি, তাঁহাতেই সকলই, সকলই তাঁহার, তিনিই সকলের। এইবার লীলা। তিনি সুখ, তিনি রস। তিনি সর্ব্বরস,—আদিরস। ইহাই স্বরূপ—স্বরূপের স্বরূপ—পরমস্বরূপ। এখানে বাধ্যতা নাই, প্রপঞ্চের লেশ নাই। ক্রীড়া, কেবলই ক্রীড়া—প্রেম ও লীলা--মধুরলীলা। শ্রীভগবানের এই যে পরিচয়—চরম ও পরম স্বরূপ—এই পরিচয় বা অনুভূতি (conception) হইতে সাধনা আরম্ভ হইল।

শ্রীভগবান্‌কে শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার "উজ্জ্বল নীলমণি"—গ্রন্থে বন্দনা করিতেছেন—

শৃঙ্গাররসসর্ব্বস্বং শিখিপিঞ্ছবিভূষণং। *
অঙ্গীকৃতনরাকারমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ং॥

এই শ্লোকটি আরও প্রাচীনতর কালের, লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গলের। আজ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর কৃপাশক্তিতে উদ্দীপিত শ্রীরূপগোস্বামী মহোদয় জীবের কল্যাণের জন্য যে গূঢ়তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন, সেই তত্ত্ব বা মত নূতন নহে। শ্রীভগবান্ যেমন পুরাণ-পুরুষ, সেইরূপ এই মতও অনাদিকালের, তাই শ্রীবিল্বমঙ্গলের শ্লোক উদ্ধার করিয়া নিজের মতের দৃঢ়তা সাধন করিতেছেন। এই শ্লোকে কি বলিতেছেন? শৃঙ্গাররসসর্ব্বস্বঃ। বহুব্রীহি সমাস করিয়া প্রথমে আস্বাদন করা যাউক। শৃঙ্গার রসই তাঁহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বস্ব। তাহার অভাবে, অর্থাৎ শৃঙ্গাররস ব্যতীত তিনি কৃষ্ণই নহেন। ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাস করিয়া আস্বাদন করুন। শ্রীকৃষ্ণই শৃঙ্গাররসের সর্ব্বস্ব। শ্রীকৃষ্ণ না থাকিলে শৃঙ্গাররস বিফল হইত। সেই শ্রীকৃষ্ণ—শিখিপিঞ্ছবিভূষণ, তাঁহার বেশ ও লীলাদি গোপালাকারোচিত গোপিকাবিহার তাঁহার অসাধারণ ধর্ম্ম। তিনি নরাকার আশ্রয় করিয়াছেন, দেবাকার নহে; তিনি নিখিলভুবনের আশ্রয়, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করি।

রস বলিলেই বুঝিতে হইবে, আস্বাদন বলিয়া একটা ব্যাপার আছে ; আর আস্বাদন বলিলেই তাহার বিষয় ও আশ্রয় আছে, ইহাও বুঝিতে হইবে। কাজেই, শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ধারণা লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলেই, হরিপ্রিয়া বা হরিবল্লভা সম্বন্ধে আলোচনা আসিয়া পড়ে। এই কারণেই উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থে হরিবল্লভাগণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একটা বিষয়ে আমাদের চিত্তকে সংশয়শূন্য করিতে হইবে। প্রথমেই ভাবিতে হইবে—আমরা কোন্ অবস্থায় আরোহণ করিয়াছি, অথবা কোন্ অবস্থায় আরোহণ করিলে, কি প্রকারের দৃষ্টি বিকশিত ও ক্রিয়ান্বিত হইলে, কি প্রকারের অনুভূতি ও আস্বাদনে উপস্থিত হইলে, সেই পরমপুরুষ বা একমাত্র পুরুষ শ্রীভগবান্‌কে "শৃঙ্গাররস সর্ব্বস্ব" বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। সেখানে, বা সে অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত অন্য কেহ ভোক্তা নাই, দেহেন্দ্রিয় ও অহঙ্কার সর্ব্বস্ব, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাভিমানী স্বতন্ত্র জীব নাই। জীবের কর্ম্ম-ফলের ক্ষেত্রস্বরূপ এই মায়িক প্রপঞ্চ বা বহিরঙ্গা মায়াশক্তির আবরণ ও বিক্ষেপ নাই। এ জগৎ আমার, তোমার বা অন্য কাহারও জগৎ নহে, ইহা শ্রীকৃষ্ণের নিজ জগৎ। এখানে সকলই আছে, নিত্যরূপে ও ভাবরূপে আছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের হইয়াই আছে। হৃদয়কে ঠিক্ এই অবস্থায় আনিলে হরিবল্লভাগণের সম্বন্ধে আমরা সত্যরূপে ও সঠিক্‌রূপে আলোচনা করিতে ও তাঁহাদের কৃপাভাজন হইতে পারিব।

শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে এখন এইটুকুই হৃদয়মধ্যে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখা যাউক, তিনিই একমাত্র নায়ক বা প্রেমিক। তাঁহার প্রেমলীলা বা প্রেমলীলারসাস্বাদনই একমাত্র সত্য। তাঁহার এই প্রেমলীলা যাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে সফল করিতেছেন, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণবল্লভা। আত্মসুখ, যিনি যে পরিমাণে ছাড়িয়া কৃষ্ণসুখ অন্বেষণে অভ্যস্ত হইবেন, তিনিই সেই পরিমাণে এই লীলার জগতে বা প্রেমের জগতে বা শ্রীকৃষ্ণের জগতে প্রবেশাধিকার পাইবেন। লীলার জগতে প্রবেশ করিয়া যাঁহারা ঐ জগতের উচ্চতম অধিকার পাইয়াছেন বা শীর্ষসীমায় আরোহণ করিয়াছেন তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণবল্লভা। এই প্রাথমিক কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আলোচনায় প্রবেশ করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণকে কি প্রকারে চিন্তা করিব, শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় তাহা প্রারম্ভেই বলিয়া দিয়াছেন।

অয়ং সুরম্যো মধুরঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
বলীয়াননবতারুণ্যো বাবদূকঃ প্রিয়ম্বদঃ॥
সুধীঃ সপ্রতিভো ধীরো বিদগ্ধশ্চতুরঃ সুখী।
কৃতজ্ঞো দক্ষিণঃ প্রেমবশ্যো গম্ভীরতাম্বুধিঃ॥
বরীয়ান্ কীর্ত্তিমান্ নারীমোহনো নিত্যনূতনঃ।
অতুল্যকেলিসৌন্দর্য্যপ্রেষ্ঠ বংশীস্বনাঙ্কিতঃ॥
ইত্যাদয়োঽস্য মধুরে গুণাঃ কৃষ্ণস্য কীর্ত্তিতা॥

১১। ইতিহাসের কৃষ্ণ

ইতিহাসের কৃষ্ণ, পুরাণের কৃষ্ণ, ভাবুকের কৃষ্ণ,—শ্রীকৃষ্ণের এই ত্রিবিধ প্রকাশ বুঝিলে তবে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে পারা যাইবে। ভারতবর্ষের ভক্তগণ, বিশেষতঃ প্রেমিক ভক্তগণ যাঁহার উপাসনা করেন, তিনি ভাবুকের কৃষ্ণ বা নিত্যলীলার কৃষ্ণ—তিনি বৃন্দাবন-বনচারী ও নিত্য। আজিও তাঁহার লীলা হইতেছে। দ্বারকার রাজরাজেশ্বর কৃষ্ণ ও পার্থসারথী কৃষ্ণ, তাঁহার বিলাস-মূর্ত্তি। তাঁহাদের উপাসনাও যুগবিশেষে সাধকবিশেষের প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু উপাসনার শেষ কথা তাহা নহে। সংঘর্ষ আছে, ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজনও আছে, কিন্তু শেষ কথা যে প্রেম। ইতিহাসের কৃষ্ণকে বুঝিতে হইলে মহাভারতের উত্তমরূপ আলোচনা করিতে হইবে; পৌরাণিকের কৃষ্ণকে বুঝিতে হইলে সাধারণভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা করিলেই হইবে, ভাবুকের কৃষ্ণকে বুঝিতে হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের অনুবর্ত্তী হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ও তদনুগত গোস্বামীশাস্ত্রের আলোচনা করিতে হইবে।

ইতিহাসের কৃষ্ণ পার্থ-সারথী ও গীতার উপদেষ্টা, তাঁহার তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, দেখিতে হইবে, ভারতীয় আর্য্যজাতির ইতিহাসের কি ভয়ঙ্কর সমস্যার মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব। ভয়ঙ্কর সমস্যার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, তাহা মহাভারতের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, দলে দলে, আর্য্যে অনার্য্যে, কি ধর্ম্ম লইয়া, কি দর্শনশাস্ত্র লইয়া তখন ভীষণ গোলযোগ। নৈতিক দুর্গতি তখন চরমসীমায় উঠিয়াছিল, ভারতীয় আর্য্যজাতির জীবনাদর্শ ও সভ্যতার বৈশিষ্ট্য তখন অতিশয় শোচনীয় শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিল। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের এক নব-সমন্বয় (A

new synthesis) সাধনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। ভারতের উন্নততর আদর্শ জীবন রক্ষা করিবার জন্য, ইহসর্ব্বস্ববাদ ও জড়বাদের গতিরোধ করিবার জন্য, ভারতবাসিগণের জীবন ও চিন্তাকে এক নবীন আদর্শের অভিমুখী করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন। ভক্ত পণ্ডিত ভস্বানি বলেন—

"Srikrishno came at a great crisis in the history of the Indo Aryan Race. The clash of sect with sect, the conflict of class with class, the struggle of the Aryan with the Non Aryan, the rivalries in the realm of religion & philosophy, the corruption in morals, the weakening of the sense of spiritual brotherhood, the oppression of the people,—threatened to wreck the Hindu type of life and the mission of the Hindu race. There was a line of cleavage between civilisation and Religion, and the crisis of the age reached its climax in the 'Great war' between Kurus and Pandavas. India was in a piteous need of a new Teacher, a new 'shakti' to nourish her higher life, to stem with the tide of secularism to open up a vision of a new synthesis of thought and life and to press the very struggles and sufferings and travails of the time spirt in the service of a new civilisation and a new Gospel. Sri Krishna came to resist the forces of evil, to effect a new synthesis of the social and spiritual. He came to introduce a great moral and religious era—'an era of synthesis and spirituality'.

১২। ভাবুকের কৃষ্ণ

ভাবুকের কৃষ্ণ বা রসরাজ, শ্রীরাধারমণ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগে আলোচনা করা কিছু কঠিন হইলেও, মানবজাতির চিন্তাপ্রবাহের গতি দেখিয়া মনে হয়, ক্রমে ক্রমে এই দিকেই বি·.বাসী আকৃষ্ট হইবে। একালের একজন সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত

বলিয়াছেন—Modern civilisation has a tendency to circumscribe the limits of our imagination and clip the wings of poetry—Hazilitt. বর্ত্তমান সভ্যতা আমাদের কল্পনারাজ্যের সীমা কমাইয়া কবিত্বের পক্ষচ্ছেদ করিতেছে। কথাটা যে খুব সত্য তাহা এই বাঙ্গালাদেশেই বুঝিতে পারা যায়। এই বাঙ্গালার চারিশত বর্ষ পূর্ব্বের প্রেমভক্তির আন্দোলন, আর বর্ত্তমান যুগের আন্দোলন! উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ! কবিত্বরসের বিপুল বন্যার বিশ্বব্যাপী উচ্ছ্বাস যে বাঙ্গালায়, যে ভারতে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে সমুত্থিত হইয়াছিল, সেই বাঙ্গালার কল্পনাক্ষেত্র আজ শুষ্ক ও অনুর্ব্বর, আজ আমাদের দেশ 'হিতবাদ' (Utilitarianism) ও কাঞ্চনকৌলিন্যে (Mammonism) দগ্ধ হইতেছে।

আমরা একালের মানুষ। আমরা সত্য করিয়া মানিই না যে 'ভাব' Ideals একটি সত্য বস্তু। যাহারা কর্ম্মজগতে খাটিতেছে, ছুটাছুটি ও পাল্লাপাল্লি করিতেছে এবং জয়লাভ করিতেছে, তাহারা প্রায় কেহই 'ভাব'-এর ধার ধারে না। তাহারা খুলিয়া বলে না, কিন্তু মনে মনে জানে 'ভাব'—কবির স্বপ্ন; 'ভাব'—কথার ফাঁকি। তাহারা ভাবের কথা তত্ত্বের কথা, ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংযমের কথা, ও অন্যান্য সুমহৎ লক্ষ্যের কথা বলে, কিন্তু লোক ভুলাইবার জন্য বা দল বাঁধিবার জন্য, চাঁদা তুলিবার জন্য, স্বার্থসাধনের জন্য। ইহাই এখন পৃথিবীর অবস্থা।

আমরা যে শিক্ষা পাইয়াছি, প্রথম হইতেই যে লক্ষ্য লইয়া শিক্ষালয়ে প্রবেশ করিয়াছি, বাস্তবজীবনে প্রতিদিন প্রতি ঘটনায় যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি, তাহাতে এইরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক। যাঁহারা বড়লোক, পদস্থ লোক, বড় বড় রাজ্যের যাঁহারা পরিচালক তাঁহারা সকলেই সুবিধাবাদী। বড় বড় কথা, বড় বড় ভাব, জীবনে সত্য করার চেষ্টা দেখা যায় না। বর্ত্তমানে নিজের বা নিজেদের কিসে সুবিধা হইবে তাহাই লক্ষ্য। বড় বড় কথা, যেমন ধর্ম্ম, সাহিত্য, পরোপকার দেশহিত, সবগুলিই যেন উপায়, আবরণ, ছলনা।

আজ পৃথিবীর এই দুর্দ্দশা, ভারতেরও এই দুর্দ্দশা। বসুন্ধরা আর কত সহ্য করিবেন? ভার অসহ্য হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধি প্রমুখ সাধুগণ গোটা পৃথিবীটাই উল্টাইয়া দিতে চাহেন। দেখা যাউক, কি হয়? যুগান্তরের সূচনা ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া

আসিতেছে। দেখা যাউক ভারতের শুভদিন আবার আসে কি না, ভাবের বিজয় প্রতিষ্ঠিত হয় কি না?

এখন চাই, এক নব ভাবুকতা। সত্যকার ভাবুকতা। ভাবুকতার বিজ্ঞাপন নহে, ভাবুকতার যৌথ-কারবার নহে। মানুষ বুঝুক—ভাবই সত্য, ভাবই নিত্য, ভাবই সর্ব্বস্ব। ভাবের জন্যই ভব, ভবের জন্য ভাব নহে।

ভাবুকের চিন্তা ও অনুভব প্রণালী আমাদের শাস্ত্রে ও সাধুগণের অনুভবে যে-প্রকারে প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

১

নিজের অধিকার বুঝিয়া চলার নামই ধর্ম্ম, আর অনধিকার চর্চ্চাই অ-ধর্ম্ম। অতএব, অনধিকার-চর্চ্চা করিও না।

সকলেই বলিতেছে, 'ভগবান্' 'ভগবান্'। কত কাল ধরিয়াই বলিতেছে। কিন্তু কেমন সে 'ভগবান্', কোথায় বা সে 'ভগবান্'? তিনি অনন্ত, তাঁহার কতটুকুই বা আমরা জানিতে পারি? শ্রীভগবানের যতটুকু আমার অধিকারে আছে, ততটুকুই 'আমার ভগবান্'। আমার নিকট ভগবান্ একটি 'ভাব' বা একটি 'অবস্থা' আর, এই ভাব বা অবস্থা আমারই ভাব বা অবস্থা। তিনি যে স্বতন্ত্র বস্তু নহেন, তাহা নয়, তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব। কিন্তু, আমার নিকট তিনি স্বতন্ত্র নহেন পরতন্ত্র, স্বাধীন নহেন পরাধীন, "ভক্তপরাধীন"। আর, এই যে ভক্ত, ইহা চরমে 'আমি'। অতএব শুধু 'ভগবান্' নহে, সর্ব্বদাই বল—'আমার ভগবান্'।

ভগবান্ একটি ভাব, আমারই ভাব। আমার সেই ভাবটিকে জানিতে হইবে, ভাবিতে হইবে, খুঁজিতে হইবে, ধরিতে হইবে। ইহাই প্রয়োজন। কোথায় তাঁহাকে খুঁজিব? সর্ব্বভূতে বা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-লীলায়।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।

আপনার ভগবদ্ভাব, যিনি সর্ব্বভূতে দেখেন—

ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

আর ভূতসমূহকে ভগবানে ও আত্মায় বা ভগবদাত্মায় দেখেন, তিনিই উত্তম ভাগবত।

২৯১/৩১ ২৮/৫/১৩৬৭

সর্ব্বভূতে নিজের ভগবদ্ভাব, আর নিজের ভগবদ্ভাবে সর্ব্বভূত। এই দুইটি পদ্ধতিই একত্রে সাধনীয়। God in all things and all things in God; God, not an outer being, but my God.

২

আমার বাহিরে, আমার চারিদিকে, আমার ইন্দ্রিয়গুলির কাছে, আমার মন ও বুদ্ধির কাছে, যাহা কিছু আছে, ছিল বা থাকিবে, তাহারাই সর্ব্বভূত। ইহারা ব্যক্ত ও অব্যক্ত। কিছু ব্যক্ত, কিছু অব্যক্ত। অব্যক্ত ব্যক্ত হইতেছে, ব্যক্ত অব্যক্ত হইতেছে। ইহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? আমি 'জ্ঞ' বা 'জ্ঞাতা'; ইহারা আমার কে? ইহারা আমার মিত্র, না অমিত্র? উত্তর, ইহারা আমার মিত্র, ইহাদের মধ্যে আমার ভগবদ্ভাব আছে। আমার ভিতর যাহা সত্য ও সার, আমার ভিতর যাহা শিব ও সুন্দর, তাহা ঘুমাইয়া রহিয়াছে, অবিকশিত অবস্থায় লুকাইয়া রহিয়াছে; ইহারা তাহাকে জাগাইয়া দিতেছে, অতএব ইহারা আমার মিত্র, ইহারা আমার গুরু। আমার ভগবদ্ভাব জাগায় বলিয়াই মিত্র ও গুরু। যদি তাহা না জাগায়, যদি লালসা ও দম্ভ জাগায়, অসুর ভাব জাগায়, তাহা হইলে আমার অমিত্র, আমার শত্রু।

বাহিরের বিশ্বকে বা প্রকৃতিকে স্বীকার করিবে, গ্রহণ করিবে, কিন্তু বুঝিয়া। না বুঝিয়া স্বীকার করিলে মরিবে, আর বুঝিয়া স্বীকার করিলে বাঁচিবে, অমর জীবনে চির-গৌরবে বাঁচিবে। এই দুই পথ।

তবে, বুঝিয়াই স্বীকার করা যাউক। ফুল ফুটিয়াছে, ফুলের সৌরভ বাতাসে ভাসিয়া ছড়াইয়া যাইতেছে। এই সৌরভই ফুলের বা লতাতরুর ভগবদ্ভাব। লতাতরু অনেক সহিয়াছে, অনেক ভুগিয়াছে, অনেক দিনের তপস্যার ফলে এই সৌরভকে ব্যক্ত করিয়াছে। এই সৌরভ তাহাতেই ছিল; তাহার প্রাণের মূলে, তাহার সত্তার সারাৎসার-রূপে অব্যক্ত অবস্থায় ছিল। আঁধারে মাটির নীচে বীজ যখন প্রথম প্রোথিত হয়, তখন সেই বীজের ভিতর তাহার প্রাণশক্তিরূপে এই সৌরভ ছিল। বীজ মরিল; মরিয়া অঙ্কুর হইয়া আবার বাঁচিয়া উঠিল। কত ডাল পালা, কত মুকুল, শেষে এই ফুল এই সৌরভ।

৩

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

অহং সর্ব্বেষু ভুতেষু ভুতাত্মাহংবস্থিতঃ সদা।

আমি সর্ব্বভুতে ভুতাত্মা হইয়া সর্ব্বদাই আছি। ফুলের সৌরভই ফুলের ভিতর ভুতাত্মা। সৌরভ, ফুলের হইয়াও বিশ্বের। ফুলের আনন্দাংশই তাহার সৌরভ, তাহাতে বিশ্বের সকলেরই আনন্দ। যিনি বিশ্বের আনন্দ ও অমৃত, তিনি আমাদের সকলেরই ভিতর অব্যক্তরূপে রহিয়াছেন। আমাতেই তিনি রহিয়াছেন। আমার সেই আনন্দ আমার ভিতর প্রকট হউন। ইহাই আমার প্রতিদিনের প্রাণের কামনা হউক, প্রতিক্ষণের আন্তরিক প্রার্থনা হউক।

বিশ্বে আসিলাম, বিশ্বের যাহা কিছু লইলাম, কিন্তু দিলাম কি? কি সত্য দিলাম, কি কল্যাণ দিলাম, কি আনন্দ দিলাম? নিজেকে লইয়াই রহিলাম, ফুটিতে পারিলাম না, জীবন বিফল হইল। আমার আনন্দ কৈ, আমার বৃন্দাবন কৈ, আমার শ্রীরাধাগোবিন্দ কৈ? শূন্য,—অন্তর বাহির শূন্য।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন, কৃষ্ণের ভিতরেই বিশ্বের লীলা দেখিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণই অর্জ্জুনকে তাহা দেখাইয়াছিলেন। আমরাও তাহাই চাই, কৃষ্ণ চাই, কৃষ্ণের ভিতর বিশ্ব চাই।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মাং ন প্রণশ্যতি॥

ইহারই নাম অমরত্ব লাভ! শ্রীকৃষ্ণকে দেখ সর্ব্বত্র, আর সকলকে দেখ শ্রীকৃষ্ণে। এই প্রকারে তুমি শ্রীকৃষ্ণের হও। শ্রীকৃষ্ণও তোমার কিছু নষ্ট করিবেন না, তুমিও শ্রীকৃষ্ণের কিছু নষ্ট করিবে না।

ফুলে যেমন সৌরভ থাকে, ঠিক্ সেইরূপ সমগ্র বিশ্বই শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে বিদ্যমান। আনন্দরূপে বিশ্ব সেখানে আছে। তোমরা সকলে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ কর, কৃষ্ণই মুক্তি, কৃষ্ণই সুখ।

পৃথিবীর সুগভীর গর্ভের ভিতর রত্ন লুকাইয়া আছে তেমনি তোমারও অন্তরের অন্তরতম স্থলে আত্মার অন্তর্যামী পুরুষ লুকাইয়া আছেন। তুমি তাঁহাকে জান না,

তাঁহার কোনই খবর রাখ না, কিন্তু তিনি তোমাকে জানেন, অতি উত্তমরূপেই জানেন। তুমি তাঁহাকে মোটেই ভাব না, যদিও না ভাবিয়া জন্ম জন্ম অশেষ প্রকারে ক্লেশ পাও। কিন্তু, তুমি তাঁহার সারা জগৎ-জোড়া, তুমি ছাড়া তাঁহার জীবনে আর কিছু নাই! তুমি তাঁহাকে ভালবাস না। কিন্তু, তাঁহার চির-প্রেমাস্পদ তুমি। তিনি তোমার প্রেমের ভিখারী।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

পাতা, ফুল, ফল, জল, যাহা হয় কিছু দাও; ভক্তিসহকারে দাও; একাগ্র অন্তরে দাও, ভক্তির সেই দানই আমার আহার, এই বলিয়া সে চির-ভিখারী তোমাদের দ্বারে দ্বারে নিত্যকাল ঘুরিতেছেন।

তুমি কি তাঁহার পূজা কর? সন্দেহ। মন্দিরের পূজা! ভয়ে ভয়ে সসঙ্কোচে। দূরে দাঁড়াইয়া, কেবল শেখা কথার পুনরাবৃত্তি; সে কি পূজা, সে কি সেবা? তাহাকে যে পর করিয়া দূরে রাখিয়াছ, বাহিরে রাখিয়াছ? উহা পূজা নহে।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত॥

তুমি তাঁহাকে খোঁজ না; কিন্তু, তাঁহার চির-সাথী তুমি। তুমি ছাড়া তাঁহার খেলাই হয় না। ব্রজের রাখাল তুমি, চিরকিশোরের চির-সাথী তুমি, তুমি যে নিজেকে ভুলিয়াছ, নিজেকে ভুলিয়া ঘুমাইয়া দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে! কোথায় ব্রজ, কোথায় বৃন্দাবন! তুমি যে কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গণে আত্মঘাতী হইতেছ! কিন্তু, তবুও তিনি ছাড়েন না। ব্রজের আনন্দ ব্রহ্ম, রসব্রহ্ম, আজ তোমাদের কুরুক্ষেত্রে রণক্ষেত্রে সারথী হইয়াছেন। তোমরা, তোমাদেরই প্রয়োজনে তাঁহাকে সারথী করিয়াছ। কি হইয়াছে, ব্যাপার কিছু বুঝিতেছ কি? একবার কাঁদিবে না! কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিবে না,—

ইঁহ রাজবেশ হাতিঘোড়া মনুষ্য গহন।
কাঁহা গোপবেশ কাঁহা নির্জ্জন বৃন্দাবন॥
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত-পূরণ॥

অথবা—

হা হা কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা ব্রজেন্দ্র নন্দন,
কাঁহা সেই বংশীবদন!
কাঁহা সে বঙ্কিম ঠাম, কাঁহা সেই বেণুগান,
কাঁহা সেই যমুনা-পুলিন।
কাঁহা নৃত্যগীত হাস, কাঁহা রাস-বিলাস,
কাঁহা প্রভু মদন-মোহন॥

শান্তিপূর্ণ ছায়াময় উপত্যকা যেমন, সমুন্নত পর্ব্বত-শৃঙ্গের আশ্রিত, আমাদের এই জীবন ও সংসার, ঠিক্ সেইরূপ প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত। জীবনের যাবতীয় শান্তি ও আনন্দ শ্রীকৃষ্ণের।

মেঘে যেমন বৃষ্টি হয়, অথবা মেঘ যেমন বৃষ্টিরূপে আপনাকে দান করিয়া বিশ্বের তৃষ্ণা নাশ করে, নীরস বিশ্বকে সরস করে, উর্ব্বর করে, শ্যামল ও শস্যময়, ফুলময়, ফলময়, উৎসবময় ও আনন্দময় করে, ঠিক্ তেমনি করিয়া কৃষ্ণ বিশ্বে আসিতেছেন।

মুক্তাহার বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু-পিঞ্ছ তথি,
পীতাম্বর বিজুরি-সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব-জলধর, জগৎ শস্য উপর,
বরিষয়ে লীলামৃতধার॥

চির-জাগ্রত ভগবান্; কিন্তু, তুমি যে ঘুমাইতেছ! তিনি তোমার সঙ্গে আছেন, তিনি তোমার ভিতরে আছেন—চির-জাগ্রত ভগবান্।

হৃদয় নির্ম্মল কর, সরল কর। তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা কর। তিনিই তোমার প্রেমাস্পদ, তোমার হৃদয়ের চির-আকাঙ্ক্ষার ধন, তিনি। মন স্থির কর, পরিস্কার কর। তাহা হইলেই তাঁহাকে বুঝিবে। তিনিই তোমার বুদ্ধি, বুদ্ধির চালক ও সারথী। তিনি তোমার সমগ্র অভিজ্ঞতার সমষ্টি। তিনি মন্দিরে বসিয়া আছেন, পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি মানুষ খুঁজিতেছেন, কিন্তু মিলিতেছে না। মানুষ নাই, মানুষ নাই, ছায়া, শুধু ছায়া। কোথায় মানুষ, কোথায় মানুষ, শ্রীভগবান্ মানুষ খুঁজিতেছেন। কিন্তু, মানুষ কৈ, মানুষ তাঁহাকে খোঁজে কৈ?

মানুষ তাহাকে খুঁজুক, আর ভারতের জীবনে, কেবল কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রের নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের জীবনে শ্রীকৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা প্রতিষ্ঠিত হউক, শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কংস দানব ঘাতন।
জয় পদ্মলোচন, নন্দনন্দন, কুঞ্জকাননরঞ্জন॥
জয় কেশিমর্দ্দন, কৈটভার্দ্দন, গোপিকাগণমোহন।
জয় গোপবালক, বৎসপালক, পূতনাবকনাশন॥
জয় গোপবল্লভ, ভক্তসল্লভ, দেবদুর্ল্লভবন্দন।
জয় বেণুবাদক, কুঞ্জনাটক, পদ্মনন্দকখণ্ডন॥
জয় শান্ত-কালিয়, রাধিকাপ্রিয়, নিত্য নিষ্ক্রয়মোচন।
জয় সত্য চিন্ময়, গোকুলালয়, দ্রৌপদীভয়ভঞ্জন॥
জয় দেবকীসুত, মাধবাচ্যুত, শঙ্করস্তুত বামন।
জয় সর্ব্বতোজয়, সজ্জনোদয়, ভারতাশ্রয় জীবন॥

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ

(বগুড়া জেলার হিলি বন্দরে নিখিল বঙ্গের হিন্দু মহাসভার সভাপতি মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের অভিভাষণ)

আজ উচ্চ নীচ জাতিবর্ণ সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে আমরা বাঙ্গালী হিন্দু এখানে সমবেত হইয়াছি। আজিকার বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্ম্ম এবং সমাজ বিবর্ত্তনের ক্রমগুলি আপনাদের সুবিদিত হইলেও অতি সংক্ষেপে তাহার ইতিহাস বিবৃত করিয়া, বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রাচীন সমাজ হইতে সমাজের কোথায় অনৈক্য ঘটিয়াছে, তাহার সমাধান কিরূপে হইতে পারে তাহার যথাসাধ্য মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। বাঙ্গালীর জাতিতত্ত্বের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও

নিঃসংশয়ে বলা যায় যে (বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ আর্য্যে-অনার্য্যে মিলিয়া গঠিত।) অনার্য্যের উল্লেখে লজ্জা বোধ করিবার কোন কারণ নাই। উভয়ে মিলিয়া বাঙ্গালার সভ্যতা গড়িয়াছে এবং তাহাকে অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা প্রদান করিয়াছে। বঙ্গদেশে আর্য্যেরা আসিবার পূর্ব্বে আদিম জাতিরা বাস করিতেন। বঙ্গে কবে আর্য্যগণ প্রবেশ করেন ঠিক বলা যায় না। বাঙ্গালার সুসন্তান (সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বহু আলোচনাপূর্ব্বক খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী আর্য্য কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের সমাপ্তি কাল) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে আর্য্যভূমি মগধ মিথিলার পার্শ্বে অবস্থিত। কাজেই তাঁহারা বঙ্গদেশে সহজেই প্রবল হইয়া উঠেন এবং ক্রমে ক্রমে আপনাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতা বিস্তার করিতে সমর্থ হন। সেই সঙ্গে অনার্য্যগণের রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান, সামাজিকতাও আর্য্য জাতির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এমন কি আমাদের কোন কোন পূজা পার্ব্বণেও ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ফলতঃ (আর্য্য অনার্য্য সংস্পর্শে এবং সংমিশ্রণে বাঙ্গলায় আর্য্য সভ্যতা বিশিষ্টরূপ ধারণ করিয়াছে।)

বাঙ্গালায় আর্য্য প্রভাব

বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আর্য্য-প্রভাব কতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের আখ্যান হইতে বঙ্গদেশে আর্য্য-প্রভাবের সূচনা দেখা যায়। মনুসংহিতায় তীর্থযাত্রা ব্যতীত অন্য কারণে বঙ্গদেশে আগমন নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই নিষেধাজ্ঞা একদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যের সাক্ষ্য দিতেছে, অপরদিকে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইবার পূর্ব্বে এই স্থানে আর্য্য-প্রভাব প্রদর্শন করিতেছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মানুগত তীর্থের উদ্ভব তাহার পরিচয়।

(চাতুর্ব্বর্ণ্যবাদী অদৃশ্য দেবোপসাক ব্রাহ্মণেরা সাম্যবাদী প্রতিমাপূজক বৌদ্ধগণের ন্যায় সমাদৃত হন নাই। বৌদ্ধ প্রচারকগণের দ্বারাই আর্য্য জাতির সভ্যতা বাঙ্গালাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ভিত্তির উপরই ব্রাহ্মণের দ্বারা বাঙ্গালা দেশে হিন্দুয়ানী গঠিত হইয়াছে।)

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্লাবনে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভাসিয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ অনেক পরিমাণে আত্মরক্ষা করিলেন। শাক্যসিংহ বলিলেন "ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান, বর্ণবৈষম্য মিথ্যা।" বৈষম্য-পীড়িত ভারতবাসী এই মহাবাক্য শুনিয়া বিচলিত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সাম্যবাদী হইলে বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গালায় সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং আদিম জাতিগণকে আপন অঙ্কে স্থান দেয়।

সনাতনধর্ম্মের কথা

অতঃপর বাঙ্গালার পাল রাজবংশ ধ্বংশ হইলে বঙ্গদেশে সেনরাজ্য এবং আরও নানা রাজ্য স্থাপিত হয়। এই সকল রাজ্যের মধ্যে অনেকগুলির অধিপতি সনাতনধর্ম্মী ছিলেন। তাঁহাদের সহায়তায় সনাতন ধর্ম্ম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সময়ে বঙ্গদেশে অনেক ব্রাহ্মণ আগমন করেন।

তাঁহারা অসাধারণ সাধনা ও অপূর্ব্ব মনস্বিতায় বাঙ্গালায় পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গড়িয়া তুলিলেন। সেই ধর্ম্মের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত বর্ণভেদ কঠোর হইতে কঠোরতর করিলেন। তখনকার বর্ণগৌরব-রহিত ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সমাজ ব্যবসাভেদে নানা উপভাগে বিভক্ত এবং বিচ্ছিন্ন। কায়স্থ, বৈদ্য, বণিক, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি এক এক পৃথক জাতি বলিয়া পরিগণিত হইল। মনুর সময়ে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা অবলম্বন করিলেও ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এই সময়েই অন্ত্যজের সৃষ্টি হইল। স্ব স্ব গণ্ডীর বাহিরে বিবাহ আহারাদি নিষিদ্ধ হইল। সমুদ্রযাত্রাও বন্ধ হইল।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা

(ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বাঙ্গালায় সুপ্রতিষ্ঠিত না হইতেই ইসলাম তরঙ্গ আসিয়া তাহার উপর আঘাত করিল। বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ মুসলমান কর্ত্তৃক পরাজিত হইল। ইসলামের রাজশক্তি, রাজ-ঐশ্বর্য্য এবং সাম্যবাদ অসংখ্য বৌদ্ধ ও হিন্দুকে আকৃষ্ট করিল। বিশেষতঃ বৈষম্য প্রপীড়িত বৌদ্ধ এবং হিন্দু অন্ত্যজগণ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিপীড়নের হাত হইতে মুক্তি পাইল। ব্রাহ্মণগণ পুনরায় চতুর্দ্দিকে প্রাচীর উত্তোলন করিয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা কঠিনতর হইতে চলিল। অকিঞ্চিৎকর ত্রুটী-বিচ্যুতিও কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইল। অন্যদিকে জ্ঞানের বিস্তারও সঙ্কুচিত হইয়া আসিতে লাগিল। নীচ জাতি শৃগাল কুকুরের ন্যায় ঘৃণিত পরিত্যজ্য হইয়া উঠিল, প্রেম ভক্তি স্নেহ মমতা প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি বিলুপ্ত হইবার উপক্রম, এমন সময়ে মহাপ্রাণ শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাব হইল। স্বীয় জীবনে জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দেখাইলেন। তাঁহার প্রেম-সঙ্কীর্ত্তনে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, শূদ্র বিভেদ ভুলিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহার সঞ্জীবনীমন্ত্রে মরণাহত জাতির দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইল। কিছুদিনের জন্য জাতি প্রাণ ফিরিয়া পাইল।)

অবনতি আরম্ভ

যদিও এই মহাদেশের নানাস্থানে বিভিন্ন সময়ে রামানুজ, নানক, চৈতন্য, রামদাস, তুকারাম প্রভৃতি ধর্ম্মবীরগণ আবির্ভূত হইয়া বৈদিক উৎস হইতে অমৃতবারি সিঞ্চনে জাতির প্রাণ রক্ষা করিতে-ছিলেন তথাপি চতুর্দ্দিকে তমঃ, অন্ধকার ক্রমশঃ ভারত আবৃত করিয়া আসিতেছিল। জ্ঞানতৃষ্ণা এবং জ্ঞানের উন্নতি বন্ধ হইতে চলিল। তাহার স্থানে পাণ্ডিত্যের মান ও গৌরব বর্দ্ধিত হইল। আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও আভ্যন্তরিক উপলব্ধির স্থানে তামসিক পূজা ও রাজসিক ব্রতের বাহুল্য হইতে লাগিল, লোকে বাহ্যিক আচার ও ক্রিয়া অধিক মূল্যবান্ মনে করিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষ ইংরেজের শক্তির নিকট পরাভূত ও

শৃঙ্খলিত হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। তারপর এক ঘোর অন্ধকারের যুগ। অজ্ঞান, অকর্ম্মণ্যতা, আত্মদ্রোহ, আত্মবিশ্বাসের অভাব, পরধর্ম্মসেবা, পরানুকরণ, পরাশ্রয়-প্রবণতা, দাসত্ব-প্রিয়তা, ক্ষুদ্রাশয়তা প্রভৃতি কোনটিরই অভাব দেখা গেল না।

মহাত্মা রামমোহন

এই অন্ধতমসাচ্ছন্ন প্রাণশক্তিহীন জাতিকে প্রথম জাগাইলেন মহাত্মা রামমোহন। উপনিষদের সঞ্জীবনী সুধা ঢালিয়া মৃতপ্রায় জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। নূতন ধর্ম্মমত এবং বৈষম্যহীন নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। জাতি, ধর্ম্ম এবং সমাজ জীবনে স্বাধীনতার আস্বাদন পাইয়া রাষ্ট্রীয় জগতে মুক্তিলাভে উন্মুখ হইয়া উঠিল। পুনরায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ জাতিকে ত্যাগ ও সেবাধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিয়া বহুল উন্নত করিয়া দিলেন। ইহাই বাঙ্গালার ধর্ম্ম এবং সমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত সংস্পর্শ এবং সংঘর্ষের ফলে আমাদের সমাজে এক নব জীবনের আবির্ভাব এবং নবচেতনার উদ্ভব হইয়াছে। এই চৈতন্যশক্তির ক্রিয়ায় চতুর্দ্দিকে ভাঙ্গন গড়ন চলিতেছে। তথাপি এই শক্তি এখনও দৃশ্য, অদৃশ্য, স্থূল, সূক্ষ্ম সহস্র বন্ধনে শৃঙ্খলিত; পুঞ্জীভূত প্রাচীন সংস্কারের বন্ধন, পরধর্ম্মসেবা, পরানুকরণজনিত নূতন বিজাতীয় মনোভাব প্রভৃতি কারণে এই শক্তি স্ফূর্ত্তিলাভে বিমুখ। এইক্ষণে আমাদের সমাজের উন্নতির গতিরোধ করিয়া যে সকল বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে তাহাদের কি প্রতিকার ইহাই আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

সমাজের ক্ষত

সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই সমাজের ক্ষতস্থানগুলি সহজে দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ নানাজাতি, উপজাতি দ্বারা শতধাবিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন। তদুপরি উচ্চ নীচ, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য ভেদবিষে জর্জ্জরিত। বাঙ্গালায় হিন্দু সংখ্যা মোট দুই কোটী আট লক্ষ, তন্মধ্যে তথাকথিত উচ্চশ্রেণী—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ মোট সাতাইশ লক্ষ, বাঁকী এক কোটী একাশী লক্ষ নিম্ন শ্রেণী। এই নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আভিজাত্য বিদ্যমান আছে। তথাপি সামাজিক স্বার্থ ও অধিকারের দিক হইতে এই যে সকল জাতি লইয়া নিম্ন শ্রেণী গঠিত তাহাদের একই সমস্যা এবং একই মীমাংসা। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সকল জাতি ঘৃণা, অবজ্ঞা, অপমান, লাঞ্ছনা, অবিচার, অত্যাচারে জর্জ্জরিত। এই সকল পতিত জাতির উদ্ধারই বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের সম্মুখে বৃহত্তম সমস্যা।

হিন্দু-সমাজের পরিচয়

ভেদসঙ্কুল বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্মমতের অনুসন্ধান করিলেও বহুমতের অস্তিত্বই দৃষ্ট হইবে। এখন এই সকল মত, সকল পথ, সকল সম্প্রদায় ভাজিয়া

চুরিয়া একমত, একপথ ও এক সম্প্রদায় গঠন করার চেষ্টা বাতুলতা। যখন বহু মত, বহু পথ, বহু সম্প্রদায় বিদ্যমান, তখন হিন্দু সংগঠন কোন্ ভিত্তির উপর দাঁড়াইবে? শৈবও হিন্দু, শাক্তও হিন্দু, বৈষ্ণবও হিন্দু; বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম—ইহাদিগকেও ফেলিয়া দেওয়া যায় না। হিন্দু মহাসভা ইহাদের সকলকে হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করিয়া ভালই করিয়াছেন। আমার মনে হয়, হিন্দুর হিন্দুত্ব কোন বিশিষ্ট মতের অপেক্ষা করে না বা পানাহারের উপরও নির্ভর করে না। একনিষ্ঠতাই হিন্দুত্বের ভিত্তি, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মূলেও এই একনিষ্ঠ চিন্তা রহিয়াছে। আধ্যাত্মিক একত্ব এবং প্রকৃতিগত ভেদের উপলব্ধি বর্ণধর্ম্মের ভিত্তি। ভিন্নকে অভিন্ন করিয়া, সকলকে একীভূত করিয়া জীবনের নিম্নতম স্তর হইতে আধ্যাত্ম জীবনের উচ্চতম প্রদেশে অধিরোহণ করিতে সাহায্য করাই বর্ণবিভাগের উদ্দেশ্য। যে দিন হইতে এই একনিষ্ঠ চিন্তাশীলতার হ্রাস হইতে লাগিল সেই দিন হইতে প্রকৃত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটিল এবং ভারতেরও অধঃপতন আরম্ভ হইল। আজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম জন্মগত, সহস্র জাতি, উপজাতি-ভেদে বিকৃত, আত্মবিকাশের অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত সেই প্রাচীন অভেদ দৃষ্টি এবং বর্ণধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হয় ততদিন পর্য্যন্ত হিন্দুর উত্থান অসম্ভব। পরানুকরণে কিছুদূর অগ্রসর হওয়া যায় কিন্তু অস্থিমজ্জাগত উন্নতি হয় না।

দলিত উদ্ধার কার্য্য

এই অবসরে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। যাঁহারা দলিত-উদ্ধার কার্য্যে লিপ্ত আছেন তাঁহারা অবশ্যই সমাজের শ্রদ্ধার এবং ভক্তির পাত্র। তাঁহাদের একটি কথা সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। তাহা এই যে—সমাজ এক অখণ্ড অবিভাজ্য সত্তা। ইহাকে আংশিকভাবে কোন শ্রেণী বা দল বিশেষের দিক হইতে লক্ষ্য করিলে, তাঁহাদের কল্যাণকর কার্য্যগুলি পূর্ণতালাভ করিবে না। উচ্চবর্ণকে অবনত করিয়া এ সমস্যার মীমাংসা হইবে না। এই কার্য্যে বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদিগকে নেতৃত্বে আহ্বান করিতেছি।

ব্রাহ্মণ হইতেছেন সমাজ পুরুষ। ব্রাহ্মণের সংস্পর্শে এবং সাহচর্য্যে সমাজের স্থিতি, গতি, উন্নতি। কারণ তাঁহারা দ্রষ্টা, সমাজের মস্তক ও চক্ষু স্বরূপ। অবশ্য এই ব্রাহ্মণ বলিতে পৈতাধারী জাতিগত ব্রাহ্মণ মাত্রই বুঝায় না। যিনি ত্যাগে, সংযমে, নৈতিক বলে বলীয়ান্, যিনি বিদ্যায় বুদ্ধিতে, জ্ঞানে, প্রেমে সম্পূর্ণ, তিনিই ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী। আমি এই ব্রাহ্মণের কথাই বলিতেছি। ইঁহারাই সমাজের নিয়ন্তা। ইঁহারা সংখ্যায় এবং শক্তিতে যতই বৃদ্ধিলাভ করিবেন, শূদ্রের শূদ্রত্বও তত শীঘ্রই অপনোদিত হইবে, চণ্ডাল ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হইবে। সমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত, সুশিক্ষিত

এবং সংগঠিত করিতে হইলে নবযুগের উপযুক্ত একদল নূতন ব্রাহ্মণ চাই, যে ব্রাহ্মণ পাশ্চাত্যের জড় ও জীব-বিজ্ঞানে পারদর্শিতার সহিত হিন্দুর আধ্যাত্ম সম্পদে বিভূষিত হইবেন, যিনি ত্যাগে, সংযমে নির্ভীক, সত্যনিষ্ঠায় শ্রেষ্ঠ হইবেন, যিনি শূদ্রত্বের অপনোদনের ভার স্বেচ্ছায় আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইবেন। যে জাতির ব্রাহ্মণ্যশক্তি নিদ্রাভিভূত সেই জাতি যে জড়বৎ নিশ্চল হইবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? আর জাতির পক্ষে নিশ্চেষ্টতা মৃত্যুরই নামান্তর। তাই বলিতেছিলাম জাতির ব্রাহ্মণ্যশক্তি জাগাইতে হইবে। আমি এই হিন্দু সম্মিলনের সভাপতিরূপে মোহাবিষ্ট বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ সমাজকে আহ্বান করিতেছি। আপনারা ক্ষুদ্র হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য এবং অবসাদ ত্যাগ করিয়া পতিতের শিক্ষা, পতিতের দীক্ষার গৌরবময় অধিকার গ্রহণ করুন। ইহাতে আপনাদেরই জন্মগত অধিকার। আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়া অমর হইয়াছেন। আপনাদের শিরায় শিরায় তাঁহাদেরই রক্ত প্রবাহিত। তাঁহাদের শিক্ষা, তাঁহাদের সাধনা, তাঁহাদের সিদ্ধির আপনারাই অধিকারী। আপনাদের ভিতরে সেই ব্রাহ্মণ্যশক্তি লুক্কায়িত আছে। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখুন জগতের সকল জাতিই নিজ নিজ অধিকার বুঝিয়া লইতে উদ্যত, আপনারা কি, এখনও ঘুমাইয়া থাকিবেন? আজ হিন্দু সমাজ যে আপনাদের দিকেই চাহিয়া আছে। আপনাদের নিকট হইতে যে তাহারা আশার বাণী শুনিতে চায়।

"হে ব্রাহ্মণ! জগতের বিখ্যাত শিক্ষক
হে ব্রাহ্মণ! আত্মত্যাগে চিরপরিচিত
হে ব্রাহ্মণ! পরহিতে নিয়ত ব্যাপৃত
হে ব্রাহ্মণ! মহাগুরু ত্রিলোক পূজিত
তব জন্মভূমি কাঁদে ঘোর হাহাকারে
কাঁদে রাজা কাঁদে প্রজা কাঁদে সর্ব্বলোকে
তোমার মহত্বহীন ঘৃণিত আচারে।
এস হে ব্রাহ্মণ! এসে দাঁড়াও আবার
জ্ঞান বৈরাগ্যের দীপ্ত পাবকের শিখা
দাঁড়াও সম্মুখে আজ আদর্শ ব্রাহ্মণ
এই শেষ ভিক্ষা এই শেষ আহ্বান"।

অস্পৃশ্যতা দোষ

হিন্দু সমাজের দ্বিতীয় সমস্যা অস্পৃশ্যতা দোষ। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের স্পর্শে পাপ-

ভাগী হইতে হয় এই প্রকার বিশ্বাস অস্পৃশ্যতার মূল। আজ সমাজে কে আছেন এমন নির্ম্মল, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কলুষ, যিনি মানুষের স্পর্শ এড়াইয়া শুচিতা ও ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চান? তবে কেন, কিসের স্পর্দ্ধায় মানুষকে ঘৃণায় অবজ্ঞায় দূরে রাখিতে চান? ভারতবর্ষে কি হিন্দু কি মুসলমান, আজ যে সকলেই অস্পৃশ্য। জগতের নিকট ভারতবাসী অস্পৃশ্য বৈ কি? জগৎ সভায় ভারতের স্থান কোথায়?

অস্পৃশ্যতা কখনই শাস্ত্র-সঙ্গত নয়। (সংস্কৃত ভাষায় অনুষ্টুপ ছন্দে যাহা কিছু লিখিত তাহাই শাস্ত্র নয়)। অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্ম্মের মূল শ্রুতিসম্মত নয়। আর ধর্ম্মশাস্ত্রের উপরেও মানব-শাস্ত্র আছে। বাঙ্গালারই কবি গাহিয়াছেন—

শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

কোন শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এই মানবতার দাবী অস্বীকার করিবেন?

প্রতিবাদ

চৈতন্য হইতে বিবেকানন্দ, গান্ধি পর্য্যন্ত সকলেই অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। আর ঘরে বাহিরে আঘাত খাইয়াও কি আমাদের চৈতন্য হইবে না? জ্ঞানীর নিকট, প্রেমিকের নিকট, কর্ম্মীর নিকট অস্পৃশ্যতা নাই। যিনি সর্ব্বভূতে একাত্মা দর্শন করেন তাহার নিকট আবার অস্পৃশ্য কে? জ্ঞান যাহাদের অহঙ্কারে আবৃত, প্রেম যাহাদের গর্ব্বে কলুষিত, কর্ম্ম যাহাদের স্বার্থপরতায় দুষ্ট কেবল তাহাদের কাছে অস্পৃশ্যতার অভিনয়। হিন্দুসমাজকে সুসংস্কৃত ও গঠিত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত চাই। যাহাদিগকে দূরে ঠেলিয়াছ তাহাদিগকে কাছে টানিতে হইবে—যাহাদিগকে ঘৃণা করিয়াছ তাহাদিগকে মাথায় তুলিতে হইবে।

আমাদের সমাজের তৃতীয় সমস্যা জনশক্তির হ্রাস। ১৮৭২ সালে হিন্দুর সংখ্যা এক শত একাত্তর লক্ষ, মুসলমানের সংখ্যা এক শত সাতষট্টি লক্ষ, হিন্দু ছিল চারি লক্ষ বেশী। আর আজ বাঙ্গালায় হিন্দু ২০৮ লক্ষ, মুসলমান ২৫৪ লক্ষ। বিগত ১০ বৎসরে (১৯১১—১৯২১) মুসলমান বাড়িয়াছে শতকরা ৫ জন, সেই স্থলে হিন্দু কমিয়াছে। উপরি-উক্ত জন-সংখ্যা হইতে হিন্দুর ভয়াবহ পরিণাম চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। হিন্দুর জনসংখ্যার ক্রমশঃ হ্রাসের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। কিরূপে উহার প্রতিকার হইতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

লোকসংখ্যা হ্রাসের কারণ

মোটামোটি নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ—বৈধব্য প্রথা

দ্বিতীয়তঃ—বাল্য বিবাহ

তৃতীয়তঃ—পাত্রীর অভাব

চতুর্থতঃ—অসবর্ণ বিবাহে অপ্রবৃত্তি

পঞ্চমতঃ—ধর্ম্মান্তর গ্রহণ

বিধবা-বিবাহ—জাতির প্রবৃত্তি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। এক বৎসরে কলিকাতা বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভার আনুকুল্যে ৫০৩টি বিবাহ সংঘটিত হইয়াছে। এরূপ আরও হওয়ার প্রয়োজন। বাল্যবিবাহ—উচ্চ তিন শ্রেণী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থের মধ্য হইতে উঠিয়া যাইতেছে। ইহা বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির অবশ্যম্ভাবী ফল। যে-শ্রেণীর মধ্যে এখনও শিক্ষার আলোক প্রবেশ করে নাই, তাহাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রবলভাবে বর্ত্তমান, শিক্ষার দ্বারাই ইহা দূরীভূত হইবে। অনেক জাতির মধ্যে স্ত্রীর সংখ্যা অল্প, পুরুষের সংখ্যা বেশী এবং অসবর্ণ বিবাহ অপ্রচলিত থাকার জন্য অনেক সময় পুরুষকে আজীবন অবিবাহিত থাকিতে হয়। অনেক সময় অর্থের দ্বারা পাত্রী সংগ্রহ করিতে হয়। কাজে কাজেই অর্থাভাবগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে বিবাহের আশা দুরাশা বলিয়াই বিবেচিত হয়। ইহাদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপনে প্রবৃত্তি ও উৎসাহ দিতে হইবে। শেষতঃ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ প্রতিরোধ করিবার জন্য হিন্দু জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। যে সকল অনাথ এবং অবোধ বালকবালিকা অপহৃত ও প্রলোভিত হইয়া অন্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে তাহাদের উদ্ধার সাধন করিয়া হিন্দুসমাজে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। যে সকল যুবতী স্ত্রী বিধবাই হউক আর সধবাই হউক বলপূর্ব্বক হৃত এবং ধর্ষিত হইতেছেন, তাহাদেরও হিন্দু সমাজের অঙ্কে স্থান দিতে হইবে। যে সমাজের তাহার স্ত্রীলোক বালিকাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবারও অধিকার নাই। সুখের বিষয় হিন্দু সমাজের মত ক্রমশঃ এ বিষয়ে উদার হইতেছে।

হিন্দুধর্ম্মান্তর গ্রহণ

হিন্দুর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। এখন তো দেখা যায় বাঙ্গালার অধিকাংশই মুসলমান। ইহারা যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদের সন্তান নয় তাহা সহজেই বুঝা যায়। ১৯০১ সালের আদম সুমারীর কর্ত্তা রিজলি সাহেবের মতও সকলের সুবিদিত। ভ্রান্তি, মোহ, ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খলতা, সামাজিক অবিচার অত্যাচার বা যে কোন কারণেই হউক যিনি

অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন এবং এখন ভুল বুঝিয়া প্রত্যাগমনে ইচ্ছুক তাঁহাকে হিন্দু সমাজে স্থান দিতে হইবে। বাঙ্গালী হিন্দুর দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। তাহার পরিচয় হিন্দুমিশনের প্রতিষ্ঠা। অন্যূন এক বৎসরের মধ্যে এই শিশু সঙ্ঘটি যাহা সম্পাদন করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই পরমাশ্চর্য্য। এই অল্প সময়ের মধ্যে সত্তর হাজার অহিন্দুকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া এবং তাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস দৃঢ় করিতে সচেষ্ট থাকিয়া হিন্দু সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু-ধর্ম্মের সত্য, সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণে অভিলাষী তাঁহাকেও সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে। হিন্দু ঋষিগণের এমন কোন নির্দ্দেশ নাই যে, এই সনাতন বিশ্বজনীন ধর্ম্ম কেবলমাত্র জন্মগত হিন্দুর মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতে হইবে। বরং হিন্দুর এই আধ্যাত্ম সম্পদের, হিন্দু অহিন্দু ব্যক্তি মাত্রেই অধিকারী। যদি কোন ব্যক্তিই হিন্দু-ধর্ম্মের আদর্শানুযায়ী নিজ জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিতে চান তাহাতে হিন্দুর পক্ষ হইতে কোন বাধা দেওয়া নিতান্ত অহিন্দুচিত এবং হিন্দুধর্ম্ম বহির্ভূত। উপরন্তু জগতের কল্যাণ কামনায় হিন্দু ধর্ম্মের আদর্শের বহুল প্রচার হওয়া কর্ত্তব্য। তন্নিমিত্ত সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র উপযুক্ত প্রচারক ভারতের বহিভূত দেশে বিদেশে প্রেরণ করা প্রয়োজন। এই সকল কার্য্যের জন্য হিন্দুর সর্ব্ব প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া চাই, হিন্দুর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শক্তি সংহত করিয়া সমাজের উন্নতি, ধর্ম্মের বিস্তারকল্পে যোজনা করা চাই।

এই মহৎকার্য্যে আমাদের অভিপ্রায় এক হউক, হৃদয় এক হউক, আমাদের মন এক হউক, আমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে ঐক্যলাভ করি। ঐক্য ভিন্ন আমাদের উন্নতির উপায়ান্তর নাই। বিধাতার আশীর্ব্বাদে হিন্দু আবার উঠিবে, আবার জাগিবে, আবার তাহার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া পাইবে।

মিস্ মেও ও থিওজফি

মিস্ মেও তাঁহার কদর্থিত গ্রন্থে থিওজফি সম্বন্ধে সুকৌশলে একটি গভীর অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করিয়াছেন। থিওজফির ইতিহাস যাঁহারা না জানেন তাঁহারা এই কটাক্ষের অর্থ বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যার জন্য এইটুকু লিখিয়া পাঠাইলাম।

মিস্ মেও'র গ্রন্থে প্রথম অধ্যায়ের শেষাংশে এই কটাক্ষ বা ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যাইবে। লেখিকা কালিঘাট গিয়াছিলেন। কালিঘাটের বর্ণনায় বেশ ভাল করিয়া দেখাইলেন হিন্দুদের ধর্ম্ম একেবারে বর্ব্বরজনোচিত কুসংস্কারে, অজ্ঞানতায় এবং পৈশাচিক নিষ্ঠুরতায় পরিপূর্ণ। কালিঘাটের দৃশ্যটিকে লেখিকা খুব দরকারী মনে করেন এবং মনে করেন এই ব্যাপার হইতে বুঝিতে পারা যায় ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা কি। খৃষ্টীয় প্রচারকেরা ও অহঙ্কারী ইংরাজ আমলারা এই কথা চিরকালই বলিয়াছে। খৃষ্টীয় প্রচারক বলিয়াছে, এই অসভ্যদিগকে সভ্য না করিলে কিছুতেই হইবে না। শ্বেতকায় আমলারা বলিয়াছে এই অসভ্যদিগকে এখনও বহু শতাব্দী নাবালক অবস্থায় শিক্ষাধীন রাখিতে হইবে। বিশ্বহিতৈষী ধর্ম্মপ্রচারক এবং শ্বেতজাতীয় দায়িত্ববোধপীড়িত আমলাগণের এই ধারণা ও মন্তব্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও তীব্র প্রতিবাদ এই থিওজফি।

থিওজফিক্যাল সোসাইটি যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাহার ষষ্ঠ উদ্দেশ্যের মধ্যে এই কথাটি ছিল—

To Counteract as far as possible, the efforts of missionaries to delude the so called "Heathen" and "Pagans" as to the real origin and dogmas of Christianity and the practical effects of the letter in so-called civilised countries, to disseminate a knowledge of the sublime teachings of that pure esoteric system of archaic period, which are mirrorred in the oldest vedas, etc.

আরও ঐ উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল—

To oppose the materialisim of science and every form of dogmatic theology, especially the Christian, which the chiefs of the society regard as particularly pernicious ; to make known among western natives the long suppressed facts about oriental religious philosophies, their ethics chronology esoterism and symbolism.

মিস্ মেও তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন কালিঘাটের বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া তিনি একজন ইংরাজ থিওজফিষ্টকে এই সব কথা বলেন। তাঁহার উত্তরে ইংরাজ থিওজফিষ্ট এই ব্যাপারকে কোন দরকারী ব্যাপার নয় বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। প্রকৃত কথা থিওজফিষ্টরা নিরপেক্ষভাবে পৃথিবীর যাবতীয় সমাজের সভ্যতা ও ধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা করেন। তাহার ফলে হৃদয়ের একটা উদারভাব জন্মায়। তিনি দেখেন, ভাল ও মন্দ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে। আমার হৃদয় এবং চক্ষু

এখন যে অবস্থায় আছে তাহার সাহায্যে দেখিলে যাহা অতিশয় মন্দ বলিয়া মনে হয়, চক্ষু এবং হৃদয়ের কিঞ্চিৎ ভাবান্তর হইলে তাহাকে আর তত মন্দ বলিয়া মনে হয় না। থিওজফিক্যাল সোসাইটির সভ্যেরা বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এই প্রকারের সাধনা করিতেছেন। তাহা ছাড়া থিওজফিক্যাল সোসাইটি ইয়োরো মার্কিনের দাম্ভিক ও জড়বাদী বৈজ্ঞানিকতা, অনুদার ধর্ম্মমত ও ভ্রান্তপথে চালিত; প্রবঞ্চনাময় প্রেতবাদ এবং রাজনীতিক সাম্রাজ্যবাদ; এই চারিটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া পূর্ব্ব দেশের ও ভারতের প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যার আলোকে ইহাদিগকে সংশোধিত ও সৎপথে পরিচালিত করিতে চাহেন। থিওজফি মার্কিন মুলুকে জন্মগ্রহণ করিয়াই ঘোষণা করিলেন, হে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ! তোমাদের ও তোমাদের প্রাচ্যদেশীয় গুরুমারা চেলাদের ভারতের হিমালয় পর্ব্বতবাসী সিদ্ধগুরুগণের শরণাগত হইতে হইবে; নতুবা তোমাদের উদ্ধার নাই, জগতেরও মঙ্গল নাই।

মিস্ মেও যে গূঢ় রাজনীতিক অভিসন্ধি লইয়া এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন, তাহা সফল করিতে হইলে থিওজফির উপর প্রারম্ভেই কষাঘাত করা আবশ্যক; কারণ থিওজফিষ্টরা ভারতের বন্ধু; থিওজফির প্রভাবেই লঙ্কাদ্বীপে ও ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরুত্থান সাধিত হইয়াছে। এবং ভারতের সুপ্রাচীন হিন্দু সমাজে এক নব জীবনের তরঙ্গ জাগিয়া উঠিয়াছে। ভারতের জাতীয় মহাসমিতিও এই থিওজফির প্রভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মিস্ মিও ইহা জানেন—কাজেই মূল শত্রুকেই প্রথমেই কষাঘাত করিয়াছেন। কিন্তু সুনিপুণ সাহিত্য শিল্পী মিস্ মেওর লেখার ধরণের প্রশংসা করিতে হইবে। ইংরাজ থিওজফিষ্টের মত ভুলিয়াই তাঁহার মতের অসারতা প্রতিপাদনের জন্য একজন শিক্ষিত ও সুপরিচিত বাঙালী ব্রাহ্মণের মত উদ্ধার করিয়াছেন। মিস্ মেও বলেন, তিনি—

One of the most learned and distinguished of Bengali Brahmans. এই ব্রাহ্মণকে অবশ্য আমরা জানি না, তবে অনুমান হয় তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের সময় যাহারা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ী যাতায়াত করিতেন, মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতা নিবারণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে যাঁহারা দল বাঁধিয়াছেন, হিন্দু সংগঠন যাঁহাদের চক্ষুঃশূল, কাউন্সিলে যাইবার ভোটের জন্য যাঁহারা টিকিতে ফুল বাঁধিয়া ও ইস্ত্রি করা পৈতা হাতে ব্রাহ্মণত্বের দাবীর সাহায্যে মধুর বচন আওড়াইয়া ভোট ভিক্ষা করিয়াছিলেন মণ্টেগু সাহেব আসিলে যাঁহারা ব্রাহ্মণের জন্য লাটদরবারে

বিশেষ সদস্য নিয়োগের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, সেই সব ব্রাহ্মণের দোহাই দিয়া মিস্ মেও থিওসফির অকিঞ্চিৎকরতা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জানা উচিত পূর্ব্বে এই প্রকারের চেষ্টা অনেকবার হইয়াছে 'কুলেমের' সাহায্য লইয়া "ইজসন্"কে মুরুব্বি করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারক ও আমলা তন্ত্রের শ্বেতকায় আমলারা ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির চরিত্র ও কার্য্যের নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া নিজের বল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীমতী অ্যানিবেসাণ্টের জগদ্গুরু প্রচারের প্রসঙ্গেও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু এই সব চেষ্টার ফলে থিওজফি দুর্ব্বল হয় নাই, সফল ও জয়যুক্ত হইতেছে এবং ভারতের জাতীয় জীবন গৌরবের অভিমুখে বিজয়যাত্রা করিয়াছে।

ইংরাজ থিওজফিষ্টের কথা বলিয়া মিস্ মেও যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার একটু ব্যাখ্যা, আবশ্যক। মার্কিন মহিলার চোখে কালিঘাটের দৃশ্য ভাল লাগে নাই। তিনি তাহার দোহাই দিয়া হিন্দু সমাজকে বর্ব্বর ও সর্ব্ববিধ রাজনীতিক সুবিধা পাইবার অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। থিওজফিষ্ট বলিতেছেন, মানুষ যে সমাজে প্রতিপালিত সেই সমাজ হইতে বিভিন্ন প্রকার সমাজের আলোচনা করিতে হইলে এই প্রকারের ক্ষত অন্বেষণ করা ঠিক নহে এবং দ্রুত সিদ্ধান্তও সঙ্গত নহে। ভারতের মহত্ব ও গৌরব পাশ্চাত্যদেশের লোকও দেখিতে এবং বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহা করিতে হইলে অন্যরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাই Theosophical outlook ; সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য এই দৃষ্টির অনুশীলন আবশ্যক।

যাহা হউক, নিজেদের প্রতি চাহিয়া একটা সত্য কথা না বলিলে থিওজফির অমর্য্যাদা হইবে। দু'একজন বাঙালী লেখক উড়িষ্যা সম্বন্ধে বই লিখিয়াছেন। বাঙ্গালাতে ও ইংরাজিতে সেই পুস্তকের দ্বারা উৎকলবাসী আঘাত পাইয়াছেন। এই পুস্তকের যাঁহারা লেখক তাঁহারা মিস্‌মেওর মত ক্ষমতাশালী লোক নহেন, তবে একই দলের লোক। এ বিষয়ে আমাদের আত্মসংশোধন করিতে হইবে। *

('ব্রহ্মবিদ্যা'—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪)

---

* এই প্রবন্ধটি গত অগ্রহায়ণের ব্রহ্মবিদ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শুনিলাম কেহ কেহ অকারণ উষ্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের শীতল করা দরকার। সেই জন্য পুনর্মুদ্রিত হইল। আপত্তিজনক অংশ মোটা অক্ষরে ছাপাইলাম।

আমার দেবতা

অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস বুকের মাঝে চেপে রেখে সংসারের যাবতীয়, সুন্দর অসুন্দর সবেরই পরিচয় নিলাম, চিন্তা-রথে বিশ্ব ভ্রমণ ক'রে এসেও তো দেখি, সে অতৃপ্তির আগুন বুকের মাঝে জ্বলছেই,—আগেও যেমন, এখনও তেমন। দিনের পর দিন গেছে, উষার পর প্রভাত, অপরাহ্ণের পর সন্ধ্যা, নিয়মিতভাবে এসে উপস্থিত হয়েছে, আঁধারে আলোয়, সুখে দুঃখে, শোকে শান্তিতে জীবন বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে, কিন্তু যার জন্য ঐসব,--সেই মোর দেবতা, আমার মনের মানুষ, আমার দরদী,—তার খোঁজ তো এখনও পেলাম না!

চারিদিকে যাকে দেখি, তাকেই বলি, ওগো তোমরা কি দেখেছ, আমার প্রাণের দেবতাকে, আমার দয়িত, যে আমার প্রেমের জন্য এখনও অপেক্ষা করে আছে? উত্তর তো, মনের মত কারও কাছে পাই না!

কেহ বলে—ঐ যে আমার মাতৃ-স্বরূপিনী শত্রুদলনী সিংহবাহিনী, কেউ বা বিরাট কালশক্তি প্রলয়ঙ্করী শবাসনা কালিকার মূর্ত্তি, আমার মনশ্চক্ষে এঁকে দিলেন, কিন্তু, মন তো মানে না। এ তো মাতৃত্ব, কিন্তু আমার আনন্দ প্রেমের উৎস, সে-দেবতাকে তো এর মধ্যে খুঁজে পেলাম না। কেউ বলে—তিনি বৈকুণ্ঠবিহারী, লক্ষ্মীকান্ত; কেউ বলেন—তিনি মন্মথমথন, মহাভৈরব, কেউ বলে যে তিনি জ্যোতিঃ, কেউ বলে—তিনি শান্ত; কিন্তু আমার দেবতা তো, আমার মনের মতনই হবে!

আমার প্রাণের সাথে, আমার চিন্তার ধারার সাথে, তার শক্তির লীলার বৈষম্যই যদি হোল, তবে তাঁকে আমার দেবতা বলে স্বীকার করি কি ক'রে? পিতামাতাই প্রথম দেবতা, সংসারে তাঁদের সঙ্গেই জীবের প্রাণের মনের ঐক্য বেশী। কিন্তু কোথায় সে আমার আসল প্রাণের নিকুঞ্জ-বিহারী, যে যা বল্‌বে, যা করবে, যা ভাব্‌বে, যা পছন্দ করবে, যা ভালবাসবে, তাকেই আমি সব চেয়ে, শ্রেষ্ঠ ও প্রেষ্ঠ বলে মেনে নেবো। কিন্তু সেই শ্রেয়কে, সেই প্রিয়কে, এখনও তো খুঁজে পেলাম না। মনে অশান্তির আগুন যা' আগে জ্বল্‌ছিল, নীরবে ধিকি ধিকি, এখন তাই জ্বলে উঠল, দাবানলের মত! সমস্ত অতৃপ্ত ইন্দ্রিয় আমার, সেই আগুনের জ্বালায় পাগল হয়ে উঠ্‌লো। বিশ্ব আমার লালসার সম্মুখে হীন তুচ্ছ হয়ে প'ড়ল। এমন সময়ে দূরে শুনলাম্—মোহন প্রাণমাতান শান্ত ধীর উদাত্তস্বরে, গম্ভীররবে বাঁশীর সুমহান্ তান, আমায় আকুল করে তুল্‌লো। সুদূর বৃন্দাবনে কেলিকদম্বমূলে আমার দেবতা, আমার প্রেমিক, আমার চির ঈপ্সিতের স্বর, বাঁশীর মধ্যে কাতর-আহ্বানের সুরে আমায় নিভৃত হৃদয়কুঞ্জে ঝঙ্কার তুললে নূতন রাগিণীর। আনন্দে মনে হোল, সব পাওয়ার দলে

বুঝি এবার নাম পড়লো। কিন্তু কই ? সে আনন্দ রাগিণীর মাঝে বিরহ ব্যথার সুরের অনুভূতি যে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌লো। প্রথমে আমার শ্রুতি, সেই সুরের তরে ব্যাকুল হোল, তার পর আমার আঁখি, তার রূপের খবর না-জানি, কার কাছে পেয়ে তার তরে আকুল হোল। ক্রমেই আমার অধর তারই চুম্বনের তরে, আমার সমস্ত দেহ তারই মধুর আলিঙ্গনের তরে, আকুল হোয়ে উঠলো। আবার পাগল হয়ে ছুটলাম। কোথায় আমার চির-সুন্দর, যে, তার বাঁশীর সুরেই আমার মন প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। তাঁরই খোঁজে আজ চলেছি। পথে দাঁড়াবার সময় নাই। পা আমার বিরাম চায় না। মুখ কেবল তারই জয়-গীতি গান করছে, সেও বিরাম চায় না। মন আমার তার মূর্ত্তি এরই মধ্যে এঁকে নিয়েছে,—শ্যামল মনোহর, ত্রিভঙ্গমুরারী, বাঁকাচূড়া, পীতধড়া, মদনমোহন, দয়িত আমার, প্রাণে কেবল তারই ধ্যান, সেও বিরাম চায় না। যারা আগে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ছুটী চেয়েছিল, সেই অনঙ্গের অনুচরগণকে, আজ বিজয় করলে—সেই বাঁশী! তাই ছুটে চলেছি। কিন্তু বৃন্দাবনের পথে যে আজ আমি দিশাহারা, তাই পথের পথিককে ডেকে বলছি, ওগো, কেউ যদি দরদী থাকো, তবে এই দীনকে বল যে, সে বৃন্দাবনের পথেই এগিয়ে চলেছে কি না ?

বৈষ্ণব চরণাশ্রিত—
শ্রীসুধীরকুমার সিংহ
সন ১৩৩৪ সাল, ১২ই মাঘ

মন্তব্য ও সংবাদ

বিপ্র-ব্রাহ্মণ-শিক্ষা-সমিতি—বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন স্থানে, কোন কোন কার্য্যের দ্বারা "ব্রাহ্মণ" এই সুপবিত্র কথাটির অতিশয় অপব্যবহার হইয়াছে। বহু বহু হিন্দুসন্তান সেজন্য দুঃখিত ও লজ্জিত। তাঁহারা ইহার প্রতিকারের জন্য কিছু করিতে অনুরোধ করিতে-ছেন। নূতন কিছু করিবার প্রয়োজন নাই; আমরা যাহা করিতেছি, তাহাই একটু প্রকাশ্যভাবে করিলেই বর্ত্তমান অবস্থায়, যথেষ্ট। এই কারণে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল।

"ব্রাহ্মণ" বলিতে কেবল যে একটি জন্মগত জাতি বা বর্ণ বুঝায়, তাহা নহে। ব্রাহ্মণ বলিতে

একটি ত্যাগবিত্তা ও তপস্যাপূত জীবনাদর্শ বুঝায়। ব্রাহ্মণের শিক্ষা বা উন্নতি বলিলে, সমগ্র হিন্দু সমাজেরই শিক্ষা ও উন্নতি বুঝায়। চাতুর্ব্বর্ণ্য-সম্পদ্ বেদপুরুষের বা ব্রহ্মণ্যদেবের দেহ, সুতরাং হিন্দু-সমাজের অন্যান্য বর্ণকে বাদ দিয়া পৃথক্‌রূপে ব্রাহ্মণের কথা বলিলে একটি মৃত মনুষ্যের ছিন্ন মস্তক বুঝায়। সেরূপ চিন্তা বাতুলতা মাত্র।

এই সমিতির উদ্দেশ্য—১। যুগোচিত ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত কর্ম্মী, প্রচারক ও লেখক প্রস্তুত করিতে হইবে। ২। হিন্দুসমাজ বা আর্য্যসমাজ মূলে ত্রৈবর্ণিক। প্রত্যেক হিন্দুই দ্বিজ। মানুষ যতদিন আত্মনিয়ন্ত্রণে ও অন্তর্মুখী হইয়া আত্মচিন্তায় অক্ষম, ততদিনই সে শূদ্র। প্রত্যেক হিন্দুকেই শিক্ষার দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রণের সক্ষম করিয়া তাহাকে 'দ্বিজ' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ৩। বর্ত্তমান জগতের অগ্রগতির সহিত বিশিষ্টরূপ সংযোগ রাখিয়া হিন্দুসমাজে যাবতীয় প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে।

আপাততঃ, এই উদ্দেশ্যগুলি লইয়া এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। যাঁহাদের সহানুভূতি আছে, তাঁহারা সভ্য হউন। সকলেই সভ্য হইবার অধিকারী। বার্ষিক চাঁদা, ন্যূনকল্পে চারি আনা মাত্র। অর্থের প্রয়োজন,—বন্ধুগণ অর্থ সাহায্য করুন। আমার নিকটেই আপাততঃ সাহায্য পাঠাইবেন। মাসে মাসে কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইবে। সভাপতি শ্রীকুলদা প্রসাদ মল্লিক—সিউড়ি পোঃ, বীরভূম। আমার উপর যাহাদের আস্থা আছে, আপাততঃ তাঁহারাই অর্থ-সাহায্য করিবেন। প্রত্যেক জেলায় ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হইবে। তিনজন কর্ম্মী পাইলেই শাখাগঠন করা হইবে ;—একজন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয় ও একজন বৈশ্য। এই সমিতির আবশ্যকতা, উদ্দেশ্য, কর্ম্ম-প্রণালী প্রভৃতি নিয়মিতভাবে 'বীরভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। সুতরাং যাঁহাদের সহানুভূতি আছে, এই পত্রিকা খানি তাঁহারা পড়িবেন।

বিশ্বজনীন বাস্তব ধর্ম্ম—The Universal Practical Religion—ভগবৎ-প্রীতি ও মানবপ্রীতি, এই দুইটি একই পদার্থ—ইহাদের মধ্যে কোনই ভেদ নাই। মানুষকে ভালবাসে না, মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করে না, মানুষের মধ্যে দিব্যভাব জাগরিত করিবার জন্য কোনরূপ চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, এই প্রকারের ভগবৎ-প্রীতি একটা শূন্যগর্ভ ভাবোচ্ছ্বাস ও আত্মপ্রীতি মাত্র। বাস্তব বা কার্য্যকরী ধর্ম্মের ইহাই প্রথম কথা। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর অনেক ধর্ম্মই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম হইবার আশা রাখে। বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্ম, যাহা ব্রহ্মণ্যধর্ম্মকল্পতরুর সুবিকশিত অমৃতময় ফল, সেই ধর্ম্মেরও এই আশা আছে। বিশ্বজনীন ধর্ম্ম হইতে হইলে তাহাকে বাস্তব বা কার্য্যকরী ধর্ম্ম হইতে হইবে। এখন বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে, এই ধর্ম্মে নিম্নরূপ লক্ষণ কয়েকটি থাকা চাই। ১। স্বাধীনতা (Freedom),

২। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার সামর্থ্য (Adaptableness), ৩। আত্মবিকাশের ও পূর্ণতা লাভের শক্তি (Power of Self Development and Perfectability) ৪। অজেয় আশাশীলতা (Invincible Optimism) ৫। ভাবের সর্ব্বজনীনতা ও সর্ব্বভূতহিতব্রত (Democracy of Sentiment and Altruistic Purpose) ৬। আধ্যাত্মিকতা—অর্থাৎ এই ধর্ম্ম, ভাবের ধর্ম্ম বা আধ্যাত্ম-ধর্ম্ম হইবে, কেবল আচার অনুষ্ঠানের ধর্ম্ম বা বাহ্য বেশভূষার ধর্ম্ম হইলে চলিবে না।

১। যে-ধর্ম্মের শিক্ষা, উপদেশ ও সাধন, প্রত্যেক মানুষকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকারের অভিমুখী হইতে সাহায্য না করে, মানুষকে সুবিধাভোগী যাজকতন্ত্রের পদানত করিয়া রাখে, সেই মিথ্যা-ধর্ম্মের অবিলম্বে উচ্ছেদ আবশ্যক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মে রাগমার্গ প্রচারিত হওয়ায় এই কথা স্বীকৃত হইয়াছে।

২। বিশ্বনাথ বিশ্বের প্রাণরূপে বিশ্বের ভিতর রহিয়াছেন, তিনি লীলাময়। বিশ্বপতি লক্ষ্য করিয়া মানবজাতির নব নব প্রয়োজন ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের মধ্যে শ্রীভগবানের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহার অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। "নিত্যলীলা" প্রচারের দ্বারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই শিক্ষাই দিয়াছেন। কেবল পুরাতন পুঁথির কথা নহে, স্বানুভব প্রয়োজন।

৩। বিজ্ঞান, শিল্পকলা, মানবসমাজের শাসন-বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রেরণা ও সহায়করূপে ধর্ম্ম মানুষের অজ্ঞানতা, পশুত্ব ও তজ্জাত ক্লেশ দূর করিতে চেষ্টা করিবে।

৪। সেবা, নব নব পদ্ধতিতে মানবের সেবা! "নরলীলা"ই শ্রীভগবানের সর্ব্বোত্তম লীলা; আমাদিগকে মানুষ হইতে হইবে, অন্যকে মানুষ করিতে হইবে। সংসারের অজ্ঞতা, অন্যায়, অত্যাচার, পাপ ও দুঃখ কত! সংগ্রাম কর, ইহারা যে অসুর, তোমরা দেবতা হইয়া এই অসুরের সহিত সংগ্রাম কর, শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ সাঙ্গোপাঙ্গে পতিত উদ্ধারের ব্রত লইয়া জীবের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিতেছেন, তোমরা তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হও।

৫। স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, গোলোক বা বৃন্দাবন যাহাই বল, এইখানেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা এই জগৎ ছাড়িয়া এক অজ্ঞাত ও সুদূরবর্ত্তী কল্যাণের দেশে পলায়ন করিতে চাহি না, সেই কল্যাণের দেশকে এইখানেই আনিতে চাই। আমরা ভগবানের নিকট যাইব না, শ্রীভগবানই আমাদের নিকট আসিবেন। ইহাই শ্রীরাধার আরাধনার স্থায়িভাব—ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম।

১

আমরা গৌরাঙ্গের দেশের মানুষ, তাঁর বলা ভাষায় কথা কই।
আমরা জগতে সকলের বড়, ছোট নই, আমরা ছোট নই॥

নিজে ভগবান্, জগতের প্রাণ, হলেন মোদের ঘরের সন্তান,
আমাদের সাথে খেলিলেন খেলা, সে কথা কেমনে ভুলিয়া রই।
গোলকের হরি নদীয়ার পথে, ধূলা-মাখা গায়ে খেলিছে ওই॥

২

আমরা গৌর নিতাই চরণ ভজিয়া নরকে ডুবিতে চাই রে।
আমরা গোলকের সুখ চাই না।
স্বর্গভবন, তুচ্ছ অতীব, আমরা গোলকের সুখ চাই না॥
এই বাঙ্গালার মাটি, বাঙ্গালার জল,
গৌরপ্রেমে পূর্ণ সকল
বাঙ্গালীর বল, গৌর কেবল, তোরা গৌর গৌর বল রে॥

বিজ্ঞানের দাবী—যাহা আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক, তাহা না জানিয়া ও না বুঝিয়া, তাহাকে পাশ্চাত্য ও বৈদেশিক বলিয়া উপেক্ষা করিও না—সত্যনারায়ণের নিকট অপরাধী হইবে। অজ্ঞ অশিক্ষিত ও সংস্কারবদ্ধ মানুষের মনের মতো কথা বলিলে অনেক সময়ে ব্যবসায় চলে ভালো, কিন্তু সত্যকে উপেক্ষা করিয়া তাহা করিলে পাপ হয়।

হিন্দুমহাসভা-সম্বন্ধে "বঙ্গবাসী" কাগজে যাহা লেখা হইতেছে, তাহা সেই পাপাচরণের দৃষ্টান্ত-মাত্র। Anthropology বা নৃ-বিজ্ঞান, আধুনিক যুগের একটি খুব বড় বিজ্ঞান-শাস্ত্র। ইহা ইউরোপেরও নহে, এসিয়ারও নহে, ইহা মার্কিনেরও নহে, ভারতেরও নহে। ইহা সমগ্র মানবজাতির একটি আধুনিক আবিষ্কার বা আবিষ্করণ-প্রচেষ্টা। নানা দেশের বড় বড় মনীষি সারাজীবন ধরিয়া তপস্যা করিয়া এই বিজ্ঞানশাস্ত্রের তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন। ইহার কত বিভাগ! ইহার এক অংশের নাম ভৌতিক নৃ-বিজ্ঞান (Physical), আর এক অংশের নাম মানসিক নৃ-বিজ্ঞান (Cultural)। প্রথমাংশে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিজ্ঞানগুলির আলোচনা আবশ্যক—

(ক) Ontogeny—বীজতত্ত্ব
(খ) Anatomy—দেহতত্ত্ব
(গ) Physiology—দৈহিক ক্রিয়াতত্ত্ব
(ঘ) Anthropometry—আকার, বর্ণ, ভাব প্রভৃতির পরিমাপতত্ত্ব।
(ঙ) Psychology—মনস্তত্ত্ব,—স্নায়ুগুলের সহিত চিন্তা ও অনুভবের সম্বন্ধ বিচার
(চ) Ethnology—মানবজাতির স্বাভাবিক বিভাগতত্ত্ব। মানসিক নৃতত্ত্ব ও অনেকগুলি বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—

(ক) Glossology—ভাবপ্রকাশের বৈচিত্র্য-তত্ত্ব

(খ) Technology—অভাবপূরণের ব্যবস্থাতত্ত্ব

(গ) Esthetology—আনন্দদানের ব্যবস্থাতত্ত্ব

(ঘ) Sociology—সামাজিক মিলনতত্ত্ব

(ঙ) Sophiology—কাহিনী, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির বৈচিত্র্যতত্ত্ব

(চ) Hierology—অপ্রাকৃতের সহিত সম্বন্ধতত্ত্ব। নৃ-বিজ্ঞান বুঝিতে হইলে এই সব বিজ্ঞান ছাড়া মানবজাতির অতীতের মানসিক ইতিহাস (Culture History) বুঝিতে হয়। যেমন Archeology—প্রাচীন ভাস্কর্য্য, Paleography প্রাচীনলিপির পাঠোদ্ধার, Folk-Lore উপকথা, ও ইতিহাস। আরও দরকার আছে Minerology, ধাতু ও ধাতব বস্তুর ব্যবহারের ক্রম, Geology ভূস্তরের কাল নিরূপণ, ভূগোল (Geography), প্রাণিতত্ত্ব (Zoology)।

এই সব বিদ্যার বীজ প্রাচীন জগতে কিছু কিছু ছিল, আমাদের এই ভারতবর্ষেও ছিল। কিন্তু, সে কথা বলিয়া কোনই লাভ নাই। এই সব বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত হইয়া আমাদিগকে আধুনিক হইতে হইবে, তাহা না পারিলে মরিতে হইবে।

কিন্তু যাহারা স্বধর্ম্মনিষ্ঠার ব্যবসায়ী, তাহারা অজ্ঞানের কুয়াসা সৃষ্টি করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে। দেশের যাঁহারা প্রকৃত কল্যাণকামী, তাঁহারা সংঘবদ্ধ হইয়া প্রতিকারের চেষ্টা করুন।

দু-একটি উদাহরণ—পণ্ডিত প্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বঙ্গের প্রাদেশিক হিন্দু-মহাসভার সভাপতিরূপে কতকগুলি অবিসম্বাদিত ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়াছেন। যথা—

১। শক, যবন, পারদ, পহ্লব, খশ, হুন প্রভৃতি কত বৈদেশিক জাতি দিগ্বিজয় বা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এই ভারতভূমিতে প্রবেশ করিয়া, হিন্দুজাতীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। প্রাচীনতর হিন্দুগণ উল্লাস ও উৎসাহের সহিত তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন। 'বেশনগর' শিলালিপি হইতে জানা যায়, যবন হেলিওডোরা ভাগবত হইয়াছেন, বাসুদেব মন্দির করিয়াছেন, গরুড়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। কিরাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছজাতি ভাগবতধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বেদবিহিত কর্ম্ম করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে।

২। একবার স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলে আর যে স্বধর্ম্মে ফিরিতে পারে না, একথা শাস্ত্রানুমোদিত নহে। আধুনিক যুগেও শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয় ষট্‌সন্দর্ভে বলিয়াছেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রস বিধানতঃ।
তথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥

৩। মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে হিন্দুরা সমুদ্রপথে পৃথিবীর সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দে অবলীলাক্রমে যাতায়াত করিতেন। তাহার অসংখ্য প্রমাণ দেদীপ্যমান।

৪। সমাজ একটি জীবিত পদার্থ, 'সুতরাং কালের পরিবর্ত্তনবশতঃ সকল সমাজকেই অতীত আকার পরিত্যাগ করিতে হইবে।' * * 'কালপ্রভাবানুসারে ধর্ম্ম ও সমাজের রূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী এবং এইরূপ পরিবর্ত্তনের যুগে ধর্ম্মের বিধান অতিক্রম করিলে যে পাপ হয় না এবং কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা একেবারেই নাই, ইহা পরাশর সংহিতার ভাষ্য-রচয়িতা স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।' * * 'যুগানুসারে ধর্ম্মের বাহ্য আকার বদলাইতে হয়, আচারের পরিবর্ত্তন করিতে হয়, ইহা হিন্দুর পক্ষে নূতন কথা নহে। যুগ যুগান্তর হইতেই এইরূপ পরিবর্ত্তন হিন্দুসমাজে কতবার হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং আমাদিগকে আমাদিগের জাতির ও ধর্ম্মের স্থিতি, ও উন্নতি ও প্রসারের জন্য সময়োপযোগী আচার গ্রহণ ও পূর্ব্বকৃত আচারের পরিত্যাগ করিতেই হইবে, ইহা স্থির।

এই কথাগুলি বলার জন্য ধর্ম্মহীন ধর্ম্মব্যবসায়িগণ তর্কভূষণ মহাশয়কে খুব গালাগালি করিয়াছে। ইহার পশ্চাতে 'তৃতীয় দল' এর অতি গূঢ় প্রেরণা এমন সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়া করিতেছে যে যাহা 'প্রেরিত' তাহারাও অনেকে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না।

আর একটি উদাহরণ—হিলি'র সভায় সভাপতি মহারাজা শশিকান্ত, নৃ-বিজ্ঞানের বা জাতিবিজ্ঞানের কয়েকটি অবিসম্বাদিত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করায় অবিদ্যা-রক্ষক ধর্ম্ম-ব্যবসায়িগণের নিকট বিড়ম্বিত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু এই প্রকারের সত্য প্রচারের যাহারা বিরোধী, তাহাদের প্রতিপত্তি-হানির জন্য সংঘবদ্ধ চেষ্টা নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। দেশের জনসাধারণ যে অজ্ঞান। এই অজ্ঞানতা রক্ষা করায় অনেকের যে স্বার্থ রহিয়াছে, সুতরাং বিশেষভাবে একটা কিছু সমবেতভাবে করা আবশ্যক। মহারাজা শশিকান্তের অভিভাষণ স্থানান্তরে মুদ্রিত হইল। সকল কথা সকলেই মানিয়া লইতে না পারেন, কিন্তু বিশেষভাবে চিন্তা করা আশ্যবক।

ব্রাহ্মণ-সন্তান ও জ্ঞানযোগী শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বহুভাষাবিৎ ও সাধু। তিনি যে-প্রণালীতে সংস্কৃতশাস্ত্র ও সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক, কাজেই একদল লোক তাঁহার নিন্দা না করিলে তাহাদের সম্মান রক্ষা হয় না। আমাদের বিপদ্ কোথায়, তাহা একটু ভাবিয়া দেখা দরকার। শাস্ত্র-সম্বন্ধে যাহারা অজ্ঞান বা ভ্রান্তজ্ঞান-সম্পন্ন, তাহাদিগকে ভদ্রলোক মনে করিয়া সম্মান করাই এই বিপদের মূল। আমাদের দেশের একশ্রেণীর লোক শাস্ত্রের কিছুই জানে না, এবং জানেনা যে তাহারা কিছুই জানেনা। ইহারা অজ্ঞ, কিন্তু শাস্ত্রের গ্রন্থ পড়িয়াছে। কি পড়িয়াছে? একযুগের একখানা পুঁথি পড়িয়াছে বা একটা পদ্ধতি পড়িয়াছে। ঐতিহাসিক

পদ্ধতিতে পড়ে নাই, তুলনামূলক পদ্ধতিতেও পড়ে নাই, ক্রমবিবর্ত্তনের বিধির আলোকেও পড়ে নাই। সুতরাং, ইহাদের বিদ্যা, অবিদ্যার দুঃস্বপ্ন, ইহাদের জাগরণ ও সমবায় ভয়াবহ। এই বিপদের সহিত সংগ্রাম আবশ্যক। আমরা আগামীবারে শ্রীমান্ সুনীতিকুমারের অভিভাষণ বাহির করিব।

সমাজ-বিপ্লব—বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালাদেশের হিন্দুসমাজে যাহা চলিতেছে, অনেক শিষ্ট ব্যক্তি বিবেচনা করেন, তাহাই সমাজ-বিপ্লব। আর কি হইবে? "আর কি ক্ষমতা রাখিস্ এলোকেশি!" কিন্তু, এই 'এলোকেশীর খবর যাঁহারা রাখেন, অল্পদিন পূর্ব্বে রুসদেশে এলোকেশীর যে তাণ্ডবলীলা হইয়া গেল, এখনও অনেক স্থানে যে-লীলার উপক্রম ও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, তাহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বলিবেন, হইয়াছে কি? এখনও অনেক বাকি—এই তো কলির সন্ধ্যা!

কিন্তু, হিন্দু বিপ্লব-পন্থী নহে। পরিবর্ত্তন ও সংস্কার চাই, না চাহিয়া উপায় নাই, কারণ তাহা স্বভাবেরই নিয়ম। কিন্তু বিপ্লব চাহিনা, বিকাশ চাই, ভিতর হইতে সংস্কার চাই। রক্ত-গরম তরুণের দল অসন্তোষের দাহে যাহাই বলুক আর যাহাই করুক, শান্তিপ্রিয় জন্মান্তরবাদী ও কর্ম্মের বিধানে বিশ্বাসী হিন্দু বিপ্লব চাহে না। ইহা যে তাহার দুর্ব্বলতা, তাহাও নহে, ইহা তাহার ধর্ম্মজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু, বিপ্লব যে আসিয়া উপস্থিত। স্বভাব যে সংস্কার চায়, প্রাণশক্তির বিকাশ যে-পরিবর্ত্তন অন্বেষণ করে, সুবিধাভোগীও প্রবল নায়কেরা যদি তাহার বিপক্ষতা করে, প্রাণশক্তির জাগরণের সময় সংস্কারের পথ যদি কৃত্রিম উপায়ে রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে মৃত্যু অথবা বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। কেহই মরিতে চাহে না,—সমাজও না, ব্যক্তিও না। কাজেই মৃত্যু অথবা বিপ্লব এই দুইয়ের মধ্যে একতরফে গ্রহণ করিতে সমাজ যখন বাধ্য হয়, তখন মরণের পরিবর্ত্তে সমাজ বিপ্লবেরই আশ্রয় গ্রহণ করে। বিপ্লব একটি সর্ব্বব্যাপী ব্যাপার; যখন হয়, সর্ব্বত্রই হয়; গৃহ, সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য—সর্ব্বত্রই একসঙ্গে হয়।

বর্ত্তমান যুগকে পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবের যুগ বলা যাইতে পারে। যাঁহারা বর্ত্তমান যুগের লক্ষণগুলি দেখিতেছেন ও বুঝিতেছেন, আমাদের দেশে ও সমাজের অতীত ও বর্ত্তমান যাঁহারা বোঝেন, এই সঙ্কটকালে তাঁহাদের অগ্রবর্ত্তী হওয়া উচিত এবং যদি কোনস্থানে কেহ জানিয়া বা না জানিয়া এমন কিছু করেন, যাহা বিপ্লবের সহায়ক, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। যাহাদের স্বার্থ আছে, তাহারা বুঝিবে না ইহা সত্য, কিন্তু হিন্দুস্থানে সকলেই স্বার্থপরায়ণ নহে। অনেকে ভ্রান্ত-সংস্কারের বশেও অপকর্ম্ম করে, তাহারাও যদি সাবধান হয়, তাহা হইলে ষোল-আনা না হউক, অনেক রক্ষা হইবে।

বাঙ্গলাদেশে হিন্দু-সমাজে বিভীষিকাময় সমাজবিপ্লবের উপকরণ সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছিল, কেবলমাত্র একজন উপযুক্ত নায়কের প্রাণসঞ্চারক মন্ত্রফুৎকারের অপেক্ষা করিতেছিল। হিন্দু-মহাসভার আন্দোলন আরম্ভ হওয়ায়, এই আসন্ন-বিপ্লবের সম্ভাবনা বহুল পরিমাণে কমিয়াছে।

বীরভূমি ৯—২, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫

শ্রীকৃষ্ণ-কথার সূচনা

১। পুরাণ ও নব্য ইতিহাস

পৌরাণিকের অনুভব ও প্রত্যয়, বর্ত্তমান কালের অনুভব ও প্রত্যয়ের অনুরূপ নহে। ব্যস্ত হইলে চলিবে না; বর্ত্তমানের মানুষ আমরা, আমাদিগকে ধীরভাবে, চিন্তা করিয়া করিয়া পৌরাণিকের জগতে প্রবেশ করিতে হইবে। বর্ত্তমান জগৎ, যদি পৌরাণিকের অনুভব-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে মানবজাতির উপকার হইবে, বিশ্বসভ্যতার কল্যাণকর সংশোধন হইবে।

প্রাচীন জগতের সভ্য বা অসভ্য, প্রবল বা দুর্ব্বল, সকল জাতিরই পুরাণ ছিল। সেই সব প্রাচীন জাতি এখন আর বাঁচিয়া নাই। তাহাদের পুরাণের কিছু কিছু আছে, আর এই সব পৌরাণিক কথা লইয়া নানারূপ আলোচনাও চলিতেছে। আমাদের জানিয়া রাখা দরকার, এই আলোচনা এখনও শেষ হয় নাই এবং এই আলোচনার জন্য যেমন নূতন নূতন পদ্ধতি প্রযুক্ত হইতেছে, তেমনি নব নব সিদ্ধান্তও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

প্রাচীন জগতের অধিকাংশ জাতিই একরূপ ধ্বংশপ্রাপ্ত, ভারতের আর্য্যজাতি কোনপ্রকারে এখনও বাঁচিয়া আছেন এবং তাঁহাদের একটি সুবিশাল পৌরাণিক সাহিত্য আছে। এই পুরাণগুলি কিছু কিছু বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু ধ্বংশ হয় নাই। বহু অত্যাচার ও বহু আক্রমণ সহ্য করিয়া তাহারা এখনও কোনরূপে বাঁচিয়া আছে। বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন আছে বলিয়াই বাঁচিয়া আছে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। আমাদিগকে ধীরভাবে ভাবিতে হইবে, বর্ত্তমান যুগের নব নব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সাহায্যে আলোচনা করিতে হইবে, এই সব পুরাণের কোনরূপ গভীরতর অর্থ আছে কিনা।

সেকালের পুরাণ, আর এ-কালের ইতিহাস, ইহাদের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ

কোথায়, তাহা জানিয়া রাখিলে অনেক গোলযোগের হাতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সেইজন্য দু-এক কথার আলোচনা আবশ্যক।

পৃথিবীর ব্যাপার বুঝিবার জন্য পৃথিবীর ব্যাপারেরই সাহায্য লইবে; পৃথিবীর ব্যাপার বুঝিবার জন্য অপার্থিব, অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক ব্যাপার লইয়া টানাটানি—অতীত জগতের কুসংস্কার বা ভ্রান্তিমাত্র। এই একপ্রকার মত বা সিদ্ধান্ত। ইহাকে প্রত্যক্ষ-বাদ বলা যাইতে পারে। এই সিদ্ধান্তকে একমাত্র সত্য সিদ্ধান্ত বলিয়া যাঁহারা জানিয়া বা না জানিয়া মানিয়া লইয়াছেন, পুরাণের প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা বা ভক্তির ভাব পোষণ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু, সকলেই এই মতাবলম্বী নহে। প্রাচীনকালেও প্রত্যক্ষবাদী লোক ছিলেন, তবে এই মত তখন সুবিকশিত বা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। একালেও প্রত্যক্ষবাদের বিরোধী অনেক লোক আছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-কথা প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক কথা। শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন ও লীলা করিয়াছিলেন,—সেই লীলা অদ্ভুত, অসাধারণ ও চমৎকার। শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতায় সন্দেহ করার কোন কারণ নাই। শ্রীকৃষ্ণ-কথার যে একটা ঐতিহাসিক মেরুদণ্ড আছে, এবং তাহার সহিত অন্যান্য কথা মিশিয়া গিয়াছে, ইহাই নিরপেক্ষ সুধীগণের সিদ্ধান্ত!

এই যে 'অন্যান্য-কথা', ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িকগণের ভিতরেও মতভেদ ছিল। মতভেদের জন্যই সেকালে বহু বহু মহাযুদ্ধ হইয়াছে। তাহার ফলে ভারতের উদ্ধত ক্ষাত্রশক্তির ধ্বংশই হইয়াছিল। একালে তাহা লইয়া কিছু কিছু বাক্‌যুদ্ধ হওয়ায় আপত্তি কি?

সে-কালের প্রত্যক্ষবাদীরা শ্রীকৃষ্ণকে একজন চতুর ঐন্দ্রজালিক মনে করিতেন, আর, এ-কালের প্রত্যক্ষবাদীরা সমগ্র কৃষ্ণ-কথা রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। কিন্তু, চেষ্টা করিয়াও কেহ কৃষ্ণ-কথা উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানের ফলে শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা অপ্রমাণ না হইয়া সপ্রমাণ হইতেছে। ঐতিহাসিকতা, শ্রীকৃষ্ণ-কথার একটামাত্র দিক্। এ-কালের অনেকের কাছে এই দিক্‌টাই সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন বলিয়া মনে হইতে পারে. কিন্তু একমাত্র প্রয়োজন নহে। মনীষি বঙ্কিমচন্দ্র, যুগের প্রয়োজন বুঝিয়াই তাঁহার 'কৃষ্ণ-চরিত্র'-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা ও পূর্ণ-মানবতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানের প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ করিতে হইলে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা করিয়াছেন, তাহাকে কাজের আরম্ভ-মাত্র বলিতে হইবে। পৌরাণিকগণ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ভিতর কোন উচ্চতর, বৃহত্তর বা মহত্তর সত্য আছে কিনা, তাহাই এখন দেখিতে হইবে।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় লিখিত একটি বিশাল সাহিত্য কেবল শ্রীকৃষ্ণ-কথায় পূর্ণ। কত ভক্ত, কত কবি, কত ঋষি, কত দার্শনিক, সমগ্র জীবন-ব্যাপী সাধনার দ্বারা এই কথার অনুশীলন করিয়াছেন। এই অনুভবাত্মক সাহিত্যের ভিতর প্রবেশ করিতে হইলে তিনপ্রকারের অনুভব-প্রণালীর সহিত পরিচিত হইতে হইবে। ইতিহাসের কৃষ্ণ, পুরাণের কৃষ্ণ আর ভাবুকের কৃষ্ণ। ইতিহাস, লীলা ও নিত্যলীলা, এই তিনটি ব্যাপার বুঝিতে হইবে। এই তিনটির ভিতর প্রকৃত প্রস্তাবে বিরোধ নাই।

বর্ত্তমান সময়ে যাহাকে ইতিহাস বলে, তাহার সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। তাহা বর্ত্তমানের, প্রতীচ্যের নহে। বর্ত্তমানের ইতিহাসও যেমন বুঝিতে হইবে, প্রাচীন কালের পুরাণও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতকে পুরাণ-চক্রবর্ত্তী বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ বলা হইয়া থাকে। এই শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক বা একটি কথা বুঝিতে হইলে অনেকগুলি প্রাথমিক কথা জানা আবশ্যক। সে-কালের লোকে সেই সব প্রাথমিক কথা জানিতেন ও মানিতেন। এ-কালের লোকে মানেন না বলিলে ভুল হইবে, জানেন না, ইহাই ঠিক্ কথা। জানিলে বা শুনিলে অনেকে মানিতেও পারেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে একটিমাত্র শ্লোক এইভাবে ব্যাখ্যাত হইবে।

শ্লোকটি বলিবার পূর্ব্বে, উহা কোন্ স্থানের শ্লোক তাহাই জানিতে হইবে। শ্রুতিসার শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে এবং এই মহাপুরাণের পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চম বেদ মহাভারতে মানবের শ্রোতব্য যাবতীয় তত্ত্বকথাই আছে। সকল কথার সার কথা শ্রীকৃষ্ণ-কথা। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-কথাই মুখ্য কথা, অন্যান্য কথা গৌণ ও আনুষঙ্গিক। শ্রীকৃষ্ণ-কথার পুষ্টি-সাধনের জন্য বা শ্রীকৃষ্ণ-কথার ভূমিকা-স্বরূপেই অন্যান্য কথা বলা হইয়াছে।

শ্রীভগবানের বিশেষ ইচ্ছায় অভিশপ্ত ও সৌভাগ্যবশে বৈরাগ্য-প্রাপ্ত মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীশুকদেবের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা শুনিতে শুনিতে স্বভাবতঃই তাঁহাকে বলিলেন—“প্রভো, এইবার শ্রীকৃষ্ণ-কথা বলুন।

শ্রীশুকদেব কথা আরম্ভ করিলেন।

শ্লোক

ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজদৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১।১৪

দৃপ্ত নৃপতির ছদ্মবেশে দৈত্য আবির্ভূত। তাহাদের শত অযুত সৈন্য। তাহার গুরুভারে পীড়িতা পৃথিবী ব্রহ্মার আশ্রয়ে গমন করিলেন।

এই শ্লোকটি বুঝিতে হইলে কতগুলি কথা মানিয়া লইতে হইবে, প্রথমেই তাহার একটা তালিকা করিয়া লওয়া যাউক। পৃথিবী চৈতন্যময়ী, ক্রিয়াময়ী, তিনি ব্রহ্মার নিকট গেলেন। আমাদিগকে লোকতত্ত্ব, মহাপুরুষ-সংস্থান জানিতে হইবে। দৈত্য হইয়াছে রাজা, সুতরাং দেবাসুরের সম্বন্ধ জানিতে হইবে, কর্ম্মানুযায়ী জন্মান্তরের বিধান জানিতে হইবে। পৃথিবীর ভারহরণের জন্যই অবতার, সুতরাং অবতার-তত্ত্বও জানিতে হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই কথাগুলিই আলোচিত হইয়াছে।

২। বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ হেতু

কিন্তু, প্রারম্ভে আর একটি কথা বলিতে চাই। প্রাচীন টীকাকারেরা এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় সেই কথাটি ধরিয়াছেন। টীকাকার বলিতেছেন, এই শ্লোকের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের যাহা প্রসিদ্ধ কারণ তাহাই বলা হইতেছে। প্রসিদ্ধ কারণের আর একটি নাম বহিরঙ্গ কারণ বা বাহ্য কারণ। সুতরাং বুঝিতে হইবে এই কারণ ছাড়া আর একটি কারণ আছে, তাহা অপ্রসিদ্ধ, অন্তরঙ্গ বা ভিতরের কারণ।

শ্রীকৃষ্ণ কেন আসিয়াছিলেন এবং তিনি কে, এ-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তাঁহার আবির্ভাবের দ্বারা জগতের বা দেবতার উপকার হইয়াছে, এই উপকার সকলেই জানে, ইহাই প্রসিদ্ধ কারণ। জগতের বা দেবতার উপকার করিতে অবতার-পুরুষের আবির্ভাব হয়। কিন্তু, শ্রীমদ্ভাগবত বলেন শ্রীকৃষ্ণ অবতার-মাত্র নহেন, তিনি স্বয়ং ভগবান্। অবতারের আবির্ভাবের যাহা হেতু তাহা বহিরঙ্গ কারণ। কিন্তু, ইহা স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাবের সমগ্র হেতু হইতে পারে না। জগতের প্রয়োজনের দ্বারা ভগবান্‌কে

দেখিলে হইবে না, ভগবানের প্রয়োজনের দ্বারা জগৎকে দেখিতে হইবে ভগবানের যাহা নিজের প্রয়োজন তাহারই নাম অন্তরঙ্গ হেতু।

অন্তরঙ্গ হেতু-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে নানাস্থানে নানা কথা আছে। আমরা প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিলাম।

পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে। কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল। ভারহরণ কাল তাতে হইল মিশাল॥
পূর্ণ ভগবান অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার। যুগ মন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥
সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে। বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে॥
আনুসঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ। যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন। রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ। এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। তার প্রেমবশ আমি না হই অধীন॥
আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ গীতা ৪।১১

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি। এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সম, হীন। সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ভা ১০।৮২-৩১ *

মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন। অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহন। তুমি কোন বড়লোক তুমি আমি সম॥

---

*শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের বলিলেন, সখিগণ, আমার প্রতি ভক্তি ভূতমাত্রেরই পক্ষে অমৃত। আমি ভগবান্, কিন্তু তোমাদের স্নেহের অধীন। তোমাদের প্রেম অতি ভদ্র। উহা আমাকে 'আপয়ন্তি' জোর করিয়া তোমাদের সমীপে আনিয়া বাঁধিয়া রাখে।

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন। বেদস্তুতি হৈতে তাহে হরে মোর মন॥
এই শুদ্ধ ভক্তি লঞা করিমু অবতার। করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার। সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥
মোবিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ। দুঁহার রূপ গুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন। কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
এই সব রস নির্য্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ ভা, ১০।৩৩।৩৬

'ভবেৎ' ক্রিয়া বিধিলিঙ, সেই ইহা কয়। কর্ত্তব্য অবশ্য এই, অন্যথা প্রত্যবায়॥
এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণ-প্রাকট্য কারণ। অসুর সংহার আনুসঙ্গ প্রয়োজন॥

অর্থ এইরূপ। শাস্ত্রে আছে পৃথিবীর ভারহরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। ভূভারহরণ তাঁহার কার্য্য নহে। এই কার্য্য যিনি করেন, তিনি স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু। শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের অবতীর্ণ হইবার সময় উপস্থিত। ঠিক্ সেই সময়েই ভূভারহরণও প্রয়োজন। পূর্ণ-ভগবান যখন আসেন তখন অন্যান্য অবতারেরাও আসেন, কিন্তু পৃথক্ হইয়া আসেন না, স্বয়ং ভগবানের সহিত মিশ্রিত হইয়াই আসেন। নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, মৎস্য প্রভৃতি অবতার, যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র হইয়া আসিয়া থাকেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান। বিষ্ণুর কার্য্য অসুর-সংহার। শ্রীকৃষ্ণের সহিত একীভূত হইয়াই বিষ্ণু আসিয়াছিলেন। অতএব ভূভারহরণ বা অসুরসংহার আনুসঙ্গিক কার্য্য-মাত্র; শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের মুখ্য কারণ নহে। তাহা হইলে মুখ্য কারণ কি? উত্তর—শ্রীকৃষ্ণ রসিক-শেখর, এবং পরম করুণ। তিনি নিজে সর্ব্বোত্তম প্রেমরস আস্বাদন করিতে চাহেন, আর রাগমার্গ ভক্তি প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন। রাগমার্গভক্তিই মানবের সর্ব্বোত্তম ধন। কিন্তু, মানুষ এতকাল তাহা পায় নাই। মানুষ ভগবান্‌কে প্রকৃতভাবে ভালবাসে না, ভালবাসিতে পারে না। কারণ মানুষ ভগবান্‌কে খুব বড় এবং নিজেকে নিতান্ত হীন বলিয়া মনে করে। শ্রীভগবানের সহিত যদি মানুষের এই প্রকারের সম্বন্ধ হয় তাহা

হইলে মানুষ ভগবান্‌কে ভালবাসিতে পারে না। ভগবানের এরূপ ব্যবস্থা নহে। ভগবান্ বলিয়াছেন, মানুষ, তুমি যেমন করিয়া পিতা বা মাতা হইয়া পুত্রকে ভালবাসো, বন্ধু হইয়া বন্ধুকে ভালবাসো, প্রেয়সী হইয়া প্রিয়কে ভালবাসো, সেইভাবে আমাকে ভালবাসো, আমি তাহাই চাই। নিজেকে বড় বলিয়া মনে করিয়া আমাকে হীন বলিয়া মনে কর, বা আমাকে সর্ব্বাংশে তোমার সমান বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেই তোমার সহিত আমার প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, তাহাতে আমি আনন্দিত হইব, আমি তোমার অধীন হইব। বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি ধামে নাই, এমন সব লীলা করিবার জন্য, গোপীগণের সহিত তাঁহার যে ঔপপত্য-সম্বন্ধ তাহাই প্রকটিত করিয়া, প্রচলিত ধর্ম্মের উপরে অনুরাগের যে স্বাধীন সাধন-পথ আছে, তাহাই দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব যে প্রত্যেক চতুর্যুগে বা প্রত্যেক মন্বন্তরে হয়, তাহা নহে। ব্রহ্মার একদিনে অর্থাৎ চতুর্দ্দশ মন্বন্তর পরিমিত সময়ের মধ্যে একবার হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থেই কথিত হইয়াছে।

পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-কুমার। গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥
ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার। অবতীর্ণ হঞা করে প্রকট বিহার॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারিযুগ জানি। সেই চারিযুগে দিব্য একযুগ মানি॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥
বৈবস্বত নাম এই সপ্ত মন্বন্তর। সাতাইশ চতুর্যুগ তাহার অন্তর॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস। চারি ভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥
দাস সখা পিতা মাতা কান্তাগণ লঞা। ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা॥

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের এই সব গূঢ় কথা শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার সময়েই শৃঙ্খলাবদ্ধ-ভাবে প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ও অন্যান্য কোন কোন পুরাণে ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। এই কথাগুলি জানিয়া রাখা দরকার। এই কথাগুলির দ্বারা যে কেবল শ্রীকৃষ্ণলীলারই রহস্য বুঝিতে পারা যাইবে, তাহা নহে; শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা কি, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন-লীলার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার সম্বন্ধ কি, এবং যুগধর্ম্ম কি, তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে।

রাগমার্গ ও গোপীগণের ঔপপত্য, যুগধর্ম্মের চরম কথা। শ্রীজীব গোস্বামী

মহোদয়কেই এই কথা কিয়ৎপরিমাণে চাপিয়া বলিতে হইয়াছিল। শ্রীজীব-গোস্বামীপাদ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—"স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া"। পরের অনুরোধে বা প্রচলিত মতের সহিত পাছে একান্ত-বিরোধ হয়, এই আশঙ্কায় অনেক কথা চাপা দিয়া বলিতে হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা এইবার আলোচ্য বিষয়ের অনুসরণ করি।

৩। লোকতত্ত্ব ও বিরাট্ পুরুষ

পৌরাণিক যুগের লোকেরা জানিতেন বা মানিতেন, এই পৃথিবী বা ভূলোকের অপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং ক্রমেই সূক্ষ্মতর আরও ছয়টি লোক বা জগৎ আছে। তাহাদের নাম ভুবর্লোক, স্বর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক। এই সব লোক সূক্ষ্ম এবং ক্রমেই সূক্ষ্মতর। আবার, আমাদের এই পৃথিবী হইতে স্থূল এবং ক্রমেই স্থূলতর সাতটি লোক আছে। তাহাদের নাম, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল। সূক্ষ্ম আর স্থূল, এই চতুর্দ্দশ ভুবন। পুরাণের ভিতরের কথা বুঝিতে হইলে এই চতুর্দ্দশ ভুবন মনে রাখিতে হইবে। যাঁহারা দ্বিজ, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী। তাঁহাদিগকে প্রতিদিন তিনবার প্রাণায়াম করিতে হয়, আর সূক্ষ্ম সপ্তলোক চিন্তা করিতে হয়। এই সপ্তলোকের সহিত আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। নীচের যে সপ্তলোক বা সপ্তপাতাল, তাহাদের কথাও মনে রাখিতে হয়; কিন্তু, পৃথিবী অপেক্ষা স্থূলতর লোক চিন্তায় আনা বড়ই কঠিন। সপ্তলোক চিন্তা, আর ষট্চক্রচিন্তা, একই কথা, ইহা তন্ত্রোক্ত কুণ্ডলী যোগের অন্তর্গত।

শ্রীমদ্ভাগবতের কথা আরম্ভ করার সময়েই শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, এই চতুর্দ্দশ ভুবন যাঁহার দেহ, সেই বিরাট পুরুষকে হৃদয়ে ধারণা কর। সেই পুরুষ কেমন?

পাতালমেতস্য হি পাদমূলং পঠন্তি পার্ষ্ণি প্রপদে রসাতলং।
মহাতলং বিশ্বসৃজোঽর্থ গুল্ফে তলাতলং বৈ পুরুষস্য জঙ্ঘে॥
দ্বে জানুনী সুতলং বিশ্বমূর্ত্তেরূরুদ্বয়ং বিতলঞ্চাতলঞ্চ।
মহীতলং তজ্জঘনং মহীপতে নভস্তলং নাভিসরো গৃনন্তি॥
উরস্তলং জ্যোতিরনীকমস্য গ্রীবামহর্বদনং বৈ জনোঽস্য।
তপো বরাটীং বিদুরাদিপুংসঃ সত্যন্তু শীর্ষাণি সহস্রশীর্ষ্ণঃ।

অসংখ্য মস্তকযুক্ত এই পুরুষের পদমূলে পাতাল, চরণের অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ রসাতল, গুলফ্‌দেশ মহাতল, জঙ্ঘা তলাতল, জানুদুইটি সুতল, উরুদ্বয়ের নিম্নদেশ বিতল, উপরাংশ অতল। জঘন মহীতল, নাভিসরোবর নভস্তল, বক্ষ স্বর্লোক, গ্রীবা মহর্লোক, বদন জনলোক, ললাট তপোলোক, মস্তকসমূহ সত্যলোক। এই পুরুষের দেহই এই চতুর্দ্দশ ভুবন।

৪। মানুষের মহিমা ও ধর্ম্ম

চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে এই পৃথিবী ঠিক্ মধ্যস্থলে অবস্থিত। একদিকে সপ্তপাতাল আর একদিকে ছয় স্বর্গ, মধ্যস্থলে পৃথিবী। মানুষ, এই পৃথিবীর অধিবাসী। ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর মানুষই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল জীব, স্বাধীনভাবে আত্মশক্তির সাহায্যে নিজের উন্নতি সাধনের অধিকার শ্রীভগবান্ একমাত্র মানবজাতিকেই দিয়াছেন। মানুষের নিম্নে যে-সব জীব আছে, প্রকৃতির তমোগুণের দ্বারা তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা তির্য্যক্, পশুপাখী প্রভৃতি। তাহারা যেমন আছে, তেমনই আছে, নিজেদের উন্নতির জন্য তাহাদিগকে তপস্যা করিতে হয় না, চেষ্টা করিতে হয় না। দেবতারা প্রকৃতির সত্বগুণের সৃষ্টি, তাঁহারাও উন্নতিশীল নহেন, তাঁহাদের দেহ ভোগদেহ, মানুষের দেহের ন্যায় তাঁহাদের দেহ কর্ম্মদেহ নহে। তাঁহারা এখন যে-অধিকার পাইয়াছেন, এক মন্বন্তর পরিমিত সময় কোনরূপে সেই অধিকার রক্ষা করিতেই তাঁহারা চেষ্টিত। অসুরগণ অসন্তুষ্ট, কিন্তু দেবতার অধিকার কোনরূপে কাড়িয়া লওয়া ছাড়া তাহাদেরও অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর একমাত্র মানুষই উন্নতিশীল জাতি।

মানুষের উন্নতির সীমা নাই। "মানুষ! তুমি এই পর্য্যন্ত আসিবে, আর আসিবে না"—এই কথা বলিয়া শ্রীভগবান্ মানুষের উন্নতির সীমারেখা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন নাই। এইজন্যই অনন্ত শ্রীভগবানের যত লীলা তাহার মধ্যে নরলীলাই সর্ব্বোত্তম। এমন কোন উচ্চাবস্থা নাই, ইচ্ছা করিলে ও চেষ্টা করিলে মানুষ যাহা লাভ করিতে পারে না। ভুবর্লোকবাসী গন্ধর্ব্ব হওয়া, স্বর্লোকবাসী দেবতা হওয়া, তপো-লোকবাসী সিদ্ধব্রহ্মর্ষি হওয়া সামান্য কথা। মানুষ ইচ্ছা করিলে ও চেষ্টা করিলে সত্যলোকও ছাড়াইয়া যাইতে পারে। অনন্ত-উন্নতিশীলতাই মানুষের বিশেষ অধিকার।

মানুষের এই উন্নতির নাম "অভ্যুদয়"। এই উন্নতির চরম অবস্থার নাম "নিঃশ্রেয়স"। যে-শক্তিতে ও যে-ব্যবস্থাতে মানুষের এই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সাধিত হয়, তাহারই নাম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মই মানুষের একমাত্র সুহৃদ্।

মানুষ যেমন উন্নতিশীল জাতি, তেমনি তাহার পতনেরও সম্ভাবনা আছে। মানুষ কর্ম্মদোষে অসুর হইতে পারে, রাক্ষস হইতে পারে, পশুও হইতে পারে। এই পৃথিবী আর মানুষ লইয়া দেবতায় ও অসুরে চিরকাল টানাটানি। অসুর, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, একই জিনিস, একই তত্ত্ব, কেবল প্রকাশের ভেদ। স্বর্গে বা স্বর্লোকে দেবতা, আর পাতালে অসুর। দুইয়ের মধ্যে পৃথিবী আর পৃথিবীর মানুষ। এই মানুষ লইয়াই দেবাসুরে সংগ্রাম ও সমুদ্রমন্থন। ধর্ম্মই মানুষের একমাত্র সুহৃদ্। এই ধর্ম্ম রক্ষিত হইলে মানুষ সুরক্ষিত হয়, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড শান্তিতে থাকে। ধর্ম্মই ধারণ করিয়া আছেন; ধর্ম্ম রক্ষিত হইলে মানুষের আর পতনের আশঙ্কা থাকে না।

৫। নৃপ ও দৈত্য

নৃপ বা রাজা, মানুষকে পালন করেন, রক্ষা করেন। এমনভাবে পালন করেন, যাহাতে মানুষের অভ্যুদয় হয়, নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। ধর্ম্মরক্ষাই প্রকৃত পালন।

নৃপ বা রাজার কার্য্য, ন্যায়তঃ দণ্ডধারণ করিয়া শাসনাধীন মানবসমূহকে প্রকৃত উন্নতির পথে পরিচালন। এই কার্য্য ব্রহ্মবিৎ ব্যতীত অন্য কেহ করিতে পারে না। যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়কে জয় করিয়াছেন,—কাম, ক্রোধ, লালসা প্রভৃতি যাঁহার প্রকৃতিতে নাই, তিনিই দণ্ডধারণের অধিকারী। অষ্ট দিক্পালের অংশে তাঁহার জন্ম, তিনিই নৃপ বা প্রকৃত রাজা।

রাজা হওয়া যে কত কঠিন, পৃথুরাজা তাহা প্রজাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন।

য উদ্ধরেৎ করং রাজা প্রজা ধর্ম্মেষ্বশিক্ষয়ন্।
প্রজানাং স মলং ভুঙ্‌ক্তে ভগঞ্চ স্বং জহাতি সঃ॥ ভা ৪-২১-২৪

যে রাজা প্রজাগণকে তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম্ম শিক্ষা না দিয়া কর গ্রহণ করেন, সেই রাজা প্রজাপুঞ্জের পাপভাগী হইয়া অপার ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন।

প্রজারা সকলে ভগবানে মতি রাখিয়া যদি নিশ্চিন্তভাবে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে

পারে, তাহা হইলেই রাজার প্রকৃত মঙ্গল হয়। তাহার অন্যথা হইলে রাজার সর্ব্বনাশ সুনিশ্চিত। এইজন্য মহারাজা পৃথু তাঁহার প্রজাদিগকে বলিলেন—

তৎ প্রজা ভর্তৃপিণ্ডার্থং স্বার্থমেবানুসূয়তঃ।
কুরুতাধোক্ষজধিয়স্তর্হি মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ॥

আমি তোমাদের প্রভু। আমাকে যেন পিণ্ডদান করিতেছ, এই বুদ্ধিতে তোমরা ভগবান্ শ্রীহরির চরণে মতি রাখিয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে আমার প্রতি অনুগ্রহ করা হইবে।*

রাজা হইতে হইলে দেবতাদের কার্য্যাবলী বুঝিতে হইবে, দেবতাদের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে হইবে, নিয়মিতভাবে যজ্ঞাদির দ্বারা দেবতাদের সেবা করিতে হইবে। দেবতাদের সেবা করিলে তাঁহারা তুষ্ট হইবেন, দেবতারা তুষ্ট হইলে মানবের সর্ব্ববিধ কল্যাণ হইবে। পৃথু এবং শ্রীরামচন্দ্র রাজা হইয়া ভারতবর্ষকে এই রাজধর্ম্ম শিখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

ভগবানাত্মনাত্মানং রাম উত্তমকল্পকৈঃ।
সর্ব্বদেবময়ং দেবমীজেঽথাচার্য্যবান্ মখৈঃ॥৯।১১।১

ভগবান্ রামচন্দ্র আচার্য্যকে লইয়া অতি উত্তম যজ্ঞ সমূহের দ্বারা সর্ব্বদেবময় পরমদেব আপনারই অর্চ্চনায় নিযুক্ত হইলেন।

রাজা হওয়া যে কত কঠিন, তাহা শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস ও সীতা-নির্ব্বাসন-ব্যাপারের দ্বারাই ভারতবর্ষ বুঝিয়াছে।

দৈত্যেরা শক্তিমান ও প্রবল, কিন্তু তাহারা কর্ম্মভূমি পৃথিবীর বা মানবজাতির রাজা হইতে পারে না। দৈত্যেরা রাজা হইলে মানবসমাজের কিরূপ অবস্থা হয়, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার বর্ণনা আছে। হিরণ্যকশিপু যখন ত্রিলোকের রাজা তখন মানুষকে পরিশ্রম করিয়া চাষ আবাদ করিতে হইত না। বিনা কর্ষণে কামদুঘা গাভীর ন্যায় সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী

---

* উড়িষ্যায় একটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছে, তাহার দুইটি নাম; মহিমা-সম্প্রদায়, কুম্ভীপট সম্প্রদায়। ইহারা রাজা, ব্রাহ্মণ আর রজক, এই তিনজনের অন্নগ্রহণ করে না। অন্য সকলের অন্ন গ্রহণ করে। ইহারা বলে রাজাতে প্রজার পাপ আছে, ব্রাহ্মণে যজমান ও শিষ্যের পাপ আছে, আর রজকে কাপড়ের ময়লা আছে।

বিবিধ প্রকারের শস্য ও ফল দিতে লাগিলেন। সপ্তসমুদ্র ও নদী রত্নরাশি আনিতে আরম্ভ করিল। কাহাকেও আর রত্ন খুঁজিতে হইল না। বৃক্ষেরা সকল ঋতুতেই সমভাবে ফলপুষ্পযুক্ত হইতে লাগিল। (শ্রীমদ্ভাগবত, সপ্তম স্কন্ধ, চতুর্থ অধ্যায়)। মানুষের ভোগসুখের আর সীমা ছিল না। বিনা পরিশ্রমে মানুষ ভোগবিলাসে মত্ত হইয়া উঠিল।

তাহা হইলে দৈত্যরাজ্যে আপত্তি কি? শ্রীমদ্ভাগবত অতি সংক্ষেপে এক কথায় তাহার উত্তর দিয়াছেন। কথাটা বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে বুঝানো খুব কঠিন। অনেকেই বুঝিতে পারিবে না, আর যে বুঝিবে না তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করা নিরর্থক, কারণ সে কিছুতেই বুঝিবে না। হিরণ্যকশিপু—"লোকপালগণের তেজ ও স্থান হরণ করিয়া লইল।" হিরণ্যকশিপু সূর্য্যকে ডাকিয়া বলিলেন—তোমার কাজ আমি করিব, তুমি আমার ঘরের আলো জ্বালিও। বায়ুকে বলিলেন—তোমার কাজ আমি করিব, তুমি আমার পাখা টানিও। ইন্দ্রকে বলিলেন—তোমার কাজ আমি করিব, তুমি আমার সেবা করিও। ভগবানের শাসন, যাহা দেবতারা চালাইতেছিলেন, তাহা অন্যরূপ। ভগবান্‌ই সব করেন, কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া মনে করে, আমিই করিতেছি, আমি আমার বুদ্ধি খাটাইয়া পরিশ্রম করিয়া করিতেছি। এই যে স্বাধীনতা-বোধ, ইহাই শ্রীভগবানের সৃষ্টির চরম ও পরম মহত্ত্ব। শ্রীভগবান্ সর্ব্বকর্ম্মা ও অকর্ম্মা, ইহাই তাঁহার ভগবত্তা। দৈত্য হিরণ্যকশিপু এই বোধ (আত্মবোধ) অপহরণ করিল, ইহাই তাহার দোষ।

দ্বাপরযুগে বা বিগত দ্বাপরযুগের শেষাংশে দৈত্যেরা ক্ষত্রিয় রাজাদের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজা হইয়া বসিল। দৈত্য কখন 'নৃপ' হইতে পারে না। দৈত্য জড়বাদী, প্রত্যক্ষবাদী, ইহ-সর্ব্বস্ববাদী, নাস্তিক্যবাদী, ভোগবাদী। তাহারা রাজা হইলে মানুষের ভোগসুখ খুব বাড়িয়া যায়, কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মহানি হয়, সুতরাং ঐ ভোগসুখের পরিণাম ভয়াবহ। কিন্তু, কালপ্রভাবে, মানবজাতির কর্ম্মদোষে দৈত্যেরা আসিয়া রাজবংশে জন্মাইয়া অনেক স্থলে রাজা হইয়া বসিল।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার ইহাই প্রথম কথা। টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ বলিলেন, দৈত্য একটি স্বভাব। সেই স্বভাবসম্পন্ন লোকের রাজবংশে জন্ম হইল এবং তাহারা পৈতৃক-

রাজ্যে রাজা হইল। "দিতিবংশত্বাভাবেঽপি কর্ম্মণৈব যে দৈত্যাঃ" ইহারা দিতির বংশে জন্মায় নাই, ইহারা কর্ম্মের দ্বারা দৈত্য হইল। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রত্যেক কথাই গভীরার্থপূর্ণ কাজেই সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা মানুষের সাধ্যাতীত। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মাইলেই ব্রাহ্মণ হইব, ক্ষত্রিয়ের ঘরে জন্মাইলেই ক্ষত্রিয় বা রাজা হইব, ধনীর ঘরে জন্মাইলেই ধনী হইব, এই যে ব্যবস্থা, ইহা মোটেই নিরাপদ ব্যবস্থা নহে। ব্রাহ্মণ-সন্তানের ব্রাহ্মণত্বের জন্য একটা দাবী থাকিতে পারে, ক্ষত্রিয়-সন্তানেরও ক্ষত্রিয়ত্বের জন্য একটা দাবী থাকিতে পারে। কিন্তু, ব্রাহ্মণের সদ্‌গুণাবলী একেবারে নাই, ঈদৃশ ব্রাহ্মণ-সন্তান যদি ব্রাহ্মণের প্রাপ্য আদর ও পূজা পায়, তাহা হইলেও যেমন ধর্ম্মহানি হয়; ধনীর দুশ্চরিত্র সন্তান ধনের অধিকারী হইয়া অনায়াস-প্রাপ্ত ধনের দ্বারা জগতের অমঙ্গল করিলে, অথবা ক্ষত্রিয়ের দুরাচার পুত্র রাজপদ পাইয়া পীড়নাদি করিলে সমাজের অমঙ্গলই হইয়া থাকে। বিগত দ্বাপরযুগের শেষে ক্ষত্রিয় রাজাদের বংশে দৈত্যস্বভাব সন্তান জন্মাইলে, সমাজ তাহাদের অক্ষত্রিয় বা দৈত্য বলিয়া দমন করিতে পারিল না, তাহারা গায়ের জোরে বা বুদ্ধির জোরে রাজা বা মালিক হইয়া বসিল, তাহার ফলে সমাজবিপ্লব ও ধর্ম্মের গ্লানি আরম্ভ হইল।

৬। বর্ণাশ্রম ও ধর্ম্মের গ্লানি

এই সব নৃপপুত্রেরা নৃপ নহে। রাজাগিরি তাহাদের একটা মুখোস্, বা ছদ্মবেশ। ভাগবত বলিলেন তাহারা "নৃপব্যাজদৈত্য"—তাহারা স্বভাবে বা স্বরূপে দৈত্য, রাজার সাজে সাজিয়া রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহারা যে নৃপ নহে দৈত্য, একটি কথার দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারা যায়। তাহারা দৃপ্ত। আমাদের এই বর্ণাশ্রমাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে দর্পের বা অহঙ্কারের স্থান নাই। ইহা আমাদের ধর্ম্মের বিশিষ্টতা। আমরা প্রত্যেকে অপর সকলের জন্য। আমরা প্রত্যেকে সমগ্র সমাজের দাস বা সেবক। ব্রাহ্মণ মস্তক, কারণ তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বড় সেবক। পায়ের তলায় মশা বসিয়াছে, পায়ের সেদিকে মনোযোগ নাই, কিন্তু মাথার ঘুম নাই, সে জাগিয়া পাহারা দিতেছে, পায়ে মশা বসিতেই মাথার নিকট খবর আসিয়াছে, আর মাথা অমনি তাহার প্রধান সহকারী হাতকে মশা তাড়াইবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছে। এই মাথা ও হাত, ইহারা সমগ্র দেহের সেবক। পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছে, যন্ত্রণা হইতেছে, মাথারও ঘুম

নাই, মাথা কেবল ভাবিতেছে, কি করিয়া পায়ের যন্ত্রণা নিবারণ করিব। এই মাথাই ব্রাহ্মণ। এই ব্যবস্থার নাম বর্ণাশ্রম। আমি টাকা জমাইতেছি, সুখে আছি, দেশের চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, অনাচার ও অত্যাচার, আমি কিন্তু বেশ আছি, আর বলিতেছি আমি ব্রাহ্মণ, ইহা একটি বিড়ম্বনা। এই প্রকারের ব্রাহ্মণের দাবী সহ্য করা কোন ভদ্রসন্তানেরই উচিত নহে, তাহাদের সহিত তর্ক করিতে নাই, তাহাদের অবজ্ঞা করিয়া ডালকুত্তার হাতে ছাড়িয়া দেওয়াই একমাত্র ব্যবস্থা।

বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থায় দর্পের স্থান নাই। যে বলিবে বা ভাবিবে আমি আমার জন্য, সনাতনধর্ম্মে সেই পতিত হইবে। বৈষ্ণব-তোষণী টীকা এই 'দৃপ্ত' কথাটির অর্থ করিয়াছেন,—"দর্পস্বভাব নির্দ্দেশাৎ স্থানাস্থানবিবেকাভাবেন সদবমানাদি জ্ঞাপকত্বং দৈত্যত্ব-লক্ষণং"—দৈত্যের স্বভাব এই, তাহারা স্থান অস্থান বুঝে না, সজ্জনের বা মহতের অপমান করিয়া থাকে। ইহার অর্থ দৈত্যের নিকট গুণের আদর নাই। যেমন, আমাদের শাস্ত্রে বলে, একজন চণ্ডালবংশজ ব্যক্তি যদি হরিভক্তপরায়ণ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চ, আবার একজন ব্রাহ্মণবংশে উৎপন্ন বলিয়া পরিচিত ব্যক্তি যদি হরিভক্তিহীন হয় তাহা হইলে সে অতিশয় নিন্দিত। এই কথা শাস্ত্রেও আছে, আর সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যে যে কোন ভদ্রসন্তান ইহা বুঝিতে পারে। কিন্তু, আমরা যদি একজন অনাচারী, কুক্রিয়াসক্ত, পরপীড়ক, দস্যুকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মাথায় করিয়া নাচি, আর কোন ব্যক্তি বা কোন সমাজ সদাচারপরায়ণ ও ধর্ম্মশীল হইলেও যদি তাহাকে বা তাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করি, বা তাহাকে ও তাহাদিগকে গায়ের জোরে উচ্চতর অধিকার-সম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে আমরা পতিত হইয়াছি, আমরা দৈত্য হইয়াছি। অথবা যদি একজন প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ জ্ঞানীব্যক্তিকে অবজ্ঞা করিয়া একজন চাটুকার মিথ্যা ব্যবসায়ীকে বিদ্বান বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে আমরা পতিত হইয়াছি, আমরা দৈত্য হইয়াছি।

যাহারা দৈত্য, তাহারা 'নৃপ' হইতে পারে না, সমাজের নেতা বা চালক হইতে পারে না। কিন্তু, কালের প্রভাবে, বিগত দ্বাপর যুগের শেষে ভারতবর্ষে তাহাই হইয়াছিল। ইহারই নাম ধর্ম্মের গ্লানি।

দৈত্য বা অসুরের দ্বারা ধর্ম্মের গ্লানি হইয়া থাকে। এই গ্লানি বিশ্বব্যবস্থার একটি

স্বাভাবিক নিয়ম। বিশ্বব্যবস্থায় অসুর ও দৈত্যদিগের একটি স্থান আছে। অসুরেরা যখন নিজের জায়গায় থাকে তখন বিশ্বব্যাপার সুশৃঙ্খলায় চলিয়া যায়। নিজের স্থান পরিত্যাগ করিয়া অসুরেরা যে সময় অন্যের অধিকার কাড়িয়া লয়, সেই সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি হইয়া থাকে। সকল যুগেই ধর্ম্মের গ্লানি হয়। কিন্তু এক এক যুগের গ্লানি এক এক প্রকার। দৈত্যেরা বা অসুরেরা বিনষ্ট হইয়াও বিনষ্ট হয় না। তাহারা রূপান্তর গ্রহণ করে। সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণের সংঘাত অর্থাৎ আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও অসংখ্য বৈচিত্র্যময় সংমিশ্রণের ফলে বিশ্বব্যাপার চলিতেছে। সত্বগুণের শাসন বহির্ভূত উচ্ছৃঙ্খল রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা অসুর ও দৈত্যের জন্ম। পাতাল ইহাদের স্বস্থান। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেখিতে পাই, দেবী অসুরদিগকে বলিলেন,—তোমরা যদি বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা কর, পাতালে চলিয়া যাও।

কোনও যুগে পৃথিবীর সমুদয় লোক যে ধার্ম্মিক ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ছিল, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। দেহসর্ব্বস্ব ও ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব লোক সকল যুগেই আছে। এই সব লোক যখন অনাদৃত অবস্থায় সমাজের নিম্নস্তরে পড়িয়া থাকে; আর, যাঁহারা ত্যাগী, সাধু ও ব্রহ্মবিৎ, তাঁহারা সমাজে পূজা পাইয়া সমাজকে পরিচালনা করেন, সেই সময়ে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হয়; সেই কল্যাণের যুগকে সত্যযুগ বলে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন মানুষ কর্ম্মের দ্বারা দৈত্য হয়। এই মানুষের ভিতরেই দৈত্যও জন্মাইতেছে, অসুরও জন্মাইতেছে। ধর্ম্মরক্ষা করিয়া চলিলে, ধর্ম্মানুসারে সন্তানোৎপাদন, গর্ভরক্ষা ও সন্তান পালন করিলে মানুষের ঘরে দৈত্য জন্মাইতে পারে না। কিন্তু মানুষ ধর্ম্মানুসারে চলে না; কামের দ্বারা চালিত হয়; অবিদ্যার দ্বারা চালিত হয়। তাই মানুষের ঘরে অসুর জন্মায়, বড় বড় মানুষের ঘরে অসুর জন্মায়। প্রথমাবস্থায় ব্রাহ্মণের ঘরেই দৈত্যদানব ও অসুরের আবির্ভাব। হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, ইহার উদাহরণ। তাহার পর ক্ষত্রিয়ের ঘরে অসুরের জন্ম। এখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় নাই বলিলেই হয়। এখন বৈশ্যের ঘরে অসুরের জন্ম হইতেছে, আর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বৈশ্যের নিকট বিক্রীত। এইবার সংগ্রাম বৈশ্যে ও শূদ্রে।

মানুষ কর্ম্মের দ্বারা দৈত্য হয়। ক্ষত্রিয়েরা শক্তিশালী, অনেকদিন রাজ্যশাসন

করিয়াছেন। শক্তি বড় কঠিন জিনিস। ইহা লাভ করিতে যে-তপস্যার প্রয়োজন, ইহা রক্ষা করিতে তদপেক্ষা অধিক তপস্যার প্রয়োজন। যাহার শক্তি নাই, সে বুঝিতে পারে শক্তিশালী লোকেরা শক্তির অপব্যবহার করিতেছে। ইহা বুঝিয়া শক্তিহীন শক্তির জন্য তপস্যা করে। তপস্যার ফলে শক্তিলাভ করিয়া কিছুদিন শক্তির সদ্ব্যবহার করে। তাহার পর আবার অপব্যবহার আরম্ভ হয়। সামাজিক সমস্যার একটা চরম নিষ্পত্তি নাই। যুগে যুগে নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়া থাকে, যুগে যুগে নূতন নূতন মীমাংসারও আবশ্যক হয়।

বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে—পৃথিবী তাঁহার দুঃখের কথা নিবেদন করিবার জন্য সুমেরুপর্ব্বতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা তখন দেবগণকে লইয়া সভা করিয়া বসিয়াছিলেন। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণকে প্রণাম করিয়া পৃথিবী করুণ ভাষায় বলিলেন,—অগ্নি সুবর্ণের গুরু, সূর্য্য গো-সমূহের পরম গুরু, নারায়ণ আমার (পৃথিবীর) ও লোক-সমূহের গুরু। নারায়ণ প্রজাপতিগণেরও পতি, আপনারা সকলেই তাঁহার অংশ হইতে সমুদ্ভূত। আদিত্য, মরুৎ, সাধ্য, রুদ্র, বসু, অশ্বী, বহ্নি, পিতৃগণ এবং অত্রি প্রভৃতি সৃষ্টিকর্ত্তৃগণ সেই অপ্রমেয় বিষ্ণুর ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, সর্প, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্‌সরাগণ—সকলেই বিষ্ণুর রূপ। সমগ্র জগৎ বিষ্ণুময়।

তথাপ্যনেকরূপস্য তস্য রূপাণ্যহর্নিশম্।
বাধ্যবাধকতাং যান্তি কল্লোলা ইব সাগরে ॥

বিষ্ণু বহুরূপ। এই বহুরূপের মধ্যে কাহারও যথেচ্ছাচারের পথে যাইবার অধিকার নাই। সমুদ্রবক্ষে নিত্য সমুত্থিত তরঙ্গসমূহ যেমন বাধ্য-বাধকতা-সূত্রে বদ্ধ অথবা নিজ নিজ মর্য্যাদা পালনে বাধ্য, বিষ্ণুর বা স্থিতিশক্তির শাসনে এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই সেইরূপ নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া কার্য্য করিতে বাধ্য।

"দৃপ্ত" কথাটির ব্যাখ্যায় যাহা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকের দ্বারা তাহাই দৃঢ়ীকৃত ও সমর্থিত হইতেছে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, এই বাধ্যবাধকতার বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। The Law of Eternal Interdependence.

বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার মৌলিক কথা,—এই সমাজ পরম-পুরুষের দেহ। দেহের একটি অঙ্গ যেমন অপর কোন অঙ্গকে উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ বর্ণাশ্রম

ব্যবস্থায় কেহ স্ব-তন্ত্র নহে। ব্রাহ্মণ, সমাজের মস্তক। ব্রাহ্মণ যদি বলেন, আমি শূদ্রকে চাহি না, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের অবস্থা কবন্ধের মস্তকের ন্যায় হইবে। ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উদর, শূদ্র চরণ। প্রত্যেককেই নিজের নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের দ্বারা সমগ্র দেহের সেবা করিতে হইবে। বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থায় কোন বর্ণ বা কোন আশ্রম মনে করিবে না যে সে সেব্য অর্থাৎ তাহার সুবিধার জন্য অন্যান্য বর্ণ ও আশ্রম রহিয়াছে। প্রত্যেকেই ভাবিবে, আমি সেবক। ব্রাহ্মণ, তাঁহার তপস্যা ও জ্ঞানের দ্বারা, ক্ষত্রিয় তাঁহার বাহুবল ও সমরকুশলতার দ্বারা, বৈশ্য তাঁহার ধনের দ্বারা, শূদ্র তাঁহার দৈহিক সামর্থ্যের দ্বারা সেই পুরুষের,—নারায়ণের বা সমাজ-দেহের সেবা করিবে। ইহাই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া প্রত্যেকেই নিজের কর্ত্তব্য পালন করিবে, বাহিরের দিকে চাহিয়া কেহই অধিকারের দাবী করিবে না। অধিকারের দাবী করিলেই বর্ণাশ্রমের বিপর্য্যয় বা ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইবে। বাধ্যবাধকতার যে-সনাতন বিধানের উপর আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা সামাজিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই বিধানে দর্পের স্থান নাই। দৈত্য-ভাবাপন্ন ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ যে-সময়ে দৃপ্ত হইলেন, সেই সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি আরম্ভ হইল। "দৃপ্ত" কথাটির ইহাই অর্থ।

৭। পৃথিবী চৈতন্যময়ী

'দৈত্যেরা রাজবংশে আবির্ভূত হইয়া রাজা হইয়াছে। ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত। পৃথিবী ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত।' ইহার অর্থ কি? আমি একজন সুখদুঃখ বোধ-সম্পন্ন জ্ঞানময় পুরুষ, আমার যদি দুঃখ হয় আমি তাহার প্রতিকারের জন্য চিন্তা করি, চেষ্টা করি, যাহা হউক একটা কিছু উপায় উদ্ভাবন করি। পৃথিবীরও কি সেইরূপ বোধ আছে? আর পৃথিবীর কি এমন কোন শক্তি আছে, যে পৃথিবীর ব্যাপার এখন যেমন চলিতেছে সেইরূপ চলিতে লাগিল আর পৃথিবী অন্যরূপ একটা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার দুঃখের প্রতিকারের জন্য স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন? ইহা কি হইতে পারে? না, ইহা প্রাচীন জগতের মানুষের একটা ভ্রান্ত ধারণা বা কুসংস্কার মাত্র?

একথা সত্য যে প্রাচীনকালের মানুষ পৃথিবীর সকল দেশেই বিবেচনা করিত যে

সকলেরই চৈতন্য আছে, সকলেরই ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি আছে। প্রাচীন কালের উপকথা মাত্রেই মানবজাতির এই আদিম বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। গাছ নদী পাহাড় পশু পক্ষী সকলেই চিন্তা করে, কথা কহিতে পারে। প্রাচীন কালের এই মতের নাম Animism। একালে আমরা যাহাকে অচেতন পদার্থ বলি, তাহাদেরও প্রত্যেকের নিজের জীবন বা আত্মা আছে, এমন কি প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনারও নিজের জীবন বা আত্মা আছে, এই যে মত ইহার নাম Animism. The attribution of a personal life or soul to inanimate objects and to the phenomena of nature.

প্লেতো ও পাইথাগোরাসের সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিকেরা পৃথিবীকে চৈতন্যময়ী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। পৃথিবীতে যাহা কিছু হইতেছে, পৃথিবীতে যত রকমের শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, সমুদয়ই পৃথিবীর সেই চৈতন্যময় আত্মার দ্বারা হইতেছে। পৃথিবীর এই আত্মাকে বা চৈতন্যরূপকে তাঁহারা Anima mundi বলিতেন। Hylozoism প্রাচীন জগতের আর একটি দার্শনিক মত। তাঁহারা বলিতেন জড় ও চেতন পৃথক্ নহে। সর্ব্বত্রই চৈতন্যের ক্রিয়া হইতেছে। Life and matter are inseparable. All matter is endowed with life. এই মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা বলিতেন যাহাকে জড়বস্তু বলা হয় তাহারও প্রীতি, অপ্রীতি, পসন্দ অপসন্দ প্রভৃতি আছে। প্রাচীন জগতের বহুদেববাদীগণ প্রায়ই এই মতাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং পীড়িতা পৃথিবী ব্রহ্মার নিকট যাইতে পারেন, এই মত যে ভারতবর্ষের একটি নিজস্ব মত, তাহা মনে করিবেন না, প্রাচীন জগতের অনেকেই এই মতাবলম্বী ছিলেন। অন্যান্য দেশের অধিকাংশ লোক বর্ত্তমান সময়ে এই মতে বিশ্বাস করে না, এই মতকে প্রাচীন জগতের একটি কুসংস্কার বলিয়া ইহা পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশে লোকসংখ্যা গণনা করিলে দেখা যাইবে, অধিকাংশ লোকই এই মতে বিশ্বাস করে।

আমরা কি করিব? প্রাচীন জগতের এই সব ধারণা একেবারে ভ্রান্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। নব্যবিজ্ঞান এই সিদ্ধান্ত অপ্রমাণ করিতে পারেন না। নব্যবিজ্ঞানে এমন অনেক সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইতেছে, যাহার দ্বারা স্বভাবতঃই সত্যনিষ্ঠ ও চিন্তাশীল লোকের মনে হইতে পারে এই মতই সত্য। সুতরাং পৃথিবীর পক্ষে ব্রহ্মার

সভায় যাওয়া এবং নিজের দুঃখের কথা নিবেদন করা যে ঠাকুরমার উপকথার কথা, ইহা বলিতে পারা যায় না। এই গেল এক ব্যাখ্যা। আর এক ব্যাখ্যা আছে যাহা বর্ত্তমানের মানুষ আরও সহজে গ্রহণ করিতে পারে। প্রথম কথা, পৃথিবী বুঝিলেন, তিনি দৈত্যভারে পীড়িতা হইয়াছেন। পৃথিবীর এই বোধ, ইহাই আমাদের আলোচনার বিষয়। অনেক সময়েই দৈত্যের উদ্ভব হয়, দৈত্যেরা এবং দৈত্যদিগের আশ্রিত ও অনুগত লোকেরা, চারিদিকে দর্প করিয়া লম্ফ ঝম্ফ করে। যদিও তাহারা নিন্দিত ও ঘৃণিত, সর্ব্বদাই জঘন্য পাপকর্ম্ম করিতেছে এবং পাপাচরণের দ্বারা বিলাসব্যসনে দিনযাপন করিতেছে, কিন্তু, সে কথা বোঝেই বা কে, আর বলেই বা কে? তাহারাই যে সমাজে প্রধান! মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি একেবারে মলিন হইয়া গিয়াছে; যাহাদের কিঞ্চিৎ ধর্ম্মবুদ্ধি আছে, তাহারা ভীরু, শক্তিহীন ও অসহায়। যাহাদের ধর্ম্মবুদ্ধি মলিন বা লুপ্ত, তাহারা পাপকে পাপ বলিয়া বুঝিতেই পারে না এবং পার্থিব স্বার্থের অনুরোধে বুঝিতে পারে না। কেহ বুঝাইলে বুঝিতে চাহে না, শুনিয়াও শোনে না। যাহারা কিছু কিছু বোঝে, তাহারা সাহস-হীন ও ভীরু। এইরূপ অবস্থায় ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণের কোনই উপায় নাই। পৃথিবী বুঝিলেন, তিনি দৈত্যভারে পীড়িতা। ইহার অর্থ, পৃথিবীবাসী একদল সাধু সুনির্ম্মল জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে দৈত্যদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন, তাহাদের আনুগত্য ত্যাগ করিয়াছেন, সমাজের এই দুরবস্থা ও ধর্ম্মহীনতা দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছেন। এই সাধুগণ দুর্ব্বল ও নিরুপায় হইলেও আশাহীন বা উদ্যমহীন নহেন, ভীরু ও কাপুরুষ নহেন। তাঁহাদের যাহা বোধ, সামাজিক অবস্থা-সম্বন্ধে তাঁহাদের যাহা ধারণা, তাহা সকলের ভিতর জাগাইবার জন্য তাঁহারা তপস্যা করিতেছেন।

মানুষের মতের পরিবর্ত্তন হয়, আজ যে-মানুষ নৈতিক বোধহীন সে সুনীতি-সম্পন্ন হয়, আজ যে স্বার্থপর সে ত্যাগশীল হয়, আজ যে দুর্ব্বল কাল সে সবল হয়। কি করিয়া হয়, তাহা মানুষ সম্পূর্ণরূপে জানে না। কিন্তু, হয়, ইহা জানে। অদৃষ্ট বা অলৌকিক যাহারা মানেন, সূক্ষ্ম জগৎ ও দেবতা যাঁহারা মানেন, তাঁহারা বলেন, দেবশক্তির ক্রিয়ার দ্বারা এই সব পরিবর্ত্তন হয়। দেবতারা আমাদের ইন্দ্রিয়ে মনে প্রাণে বুদ্ধিতে ক্রিয়া করিতেছেন। দেবশক্তির আনুকূল্য লাভ করা যায়। কিন্তু, সেজন্য তপস্যার প্রয়োজন। এই তপস্যার সোফলাই পৃথিবীর ব্রহ্মলোকে গমন ও দেবসভায় আবেদন।

৮। অতিমানুষ ও অবতার

হিরণ্যকশিপুর রাজ্যকালে পৃথিবীর ব্রহ্মলোকগমনের কথা দেখা যায় না। সেখানে সাধু ও লোকপালগণের তপস্যার কথাই আছে। তাঁহারা সমাহিতমতি, সংযতাত্মা ও বিনিদ্র হইয়া বায়ুমাত্র ভোজন করিয়া হৃষীকেশের উপাসনা করিতে লাগিলেন।

ইতি তে সংযতাত্মানঃ সমাহিতধিয়োঽমলাঃ।
উপতস্থুর্হৃষীকেশং বিনিদ্রা বায়ুভোজনাঃ॥

এই তপস্যার ফলে শ্রীভগবানের আসন টলিল, মেঘগম্ভীরনাদে দৈববাণী হইল।

মাভৈষ্ট বিবুধশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাং ভদ্রমস্তু বঃ।

দেবশ্রেষ্ঠগণ ভয় করিও না, তোমাদের সকলের মঙ্গল হইবে।

রাবণের প্রাদুর্ভাবের সময়েও এই প্রকারের তপস্যার কথা রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের প্রারম্ভে ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতার ক্ষীরোদসাগরে পুরুষসূক্তের দ্বারা তপস্যা বা প্রার্থনার কথা পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে পৃথিবীর গাভীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রহ্মার নিকট যাওয়ার কথা পাওয়া যায় না। ইহার কারণ আছে। মানবজাতির ইতিহাসের প্রথমাবস্থায়, সাধারণতঃ কল্পের প্রথমাবস্থায় এবং কখন কখন মন্বন্তরেরও প্রথমাবস্থায়, মানুষের সমুদয় ব্যাপার দেবতারা যতটা কাছে থাকিয়া ভাল করিয়া সর্ব্বদা দেখাশুনা করেন, পরবর্ত্তী সময়ে আর ততটা করেন না। কল্পের প্রারম্ভ এবং মন্বন্তরের প্রারম্ভ, উভয়ই মানবজাতির শৈশবাবস্থা—দুই প্রকারের শৈশবাবস্থা। সে-সময়ে পিতা বা পিতৃস্থানীয় অভিভাবকেরা, শিক্ষকেরা, দেবতা ও ঋষিরা হাতে ধরিয়া মানুষকে পরিচালনা করেন। মানুষকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহাদের কাজ। মানুষ স্বপ্রতিষ্ঠ হইলে তাঁহারা থাকেন, কিন্তু ততটা কাছে কাছে থাকেন না; কিছু দূরে দূরে থাকেন।

কল্পের মধ্যস্থলে এবং মন্বন্তরেরও প্রায় মধ্যস্থলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। সুতরাং এ-সময়ে পৃথিবীকে কেবল লোকপালগণের অভিভাবকতার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। নিজের ভাল মন্দ নিজেকে বুঝিতে হইবে। এই তত্ত্বটুকুও জানা দরকার, যুগধর্ম্ম নির্দ্ধারণে এই তত্ত্বটুকুর জ্ঞান আবশ্যক।

অতিমানুষ ও অতিমানুষের আবির্ভাব সত্য। এই অতিমানুষ যুগের প্রভাবে গড়িয়া উঠেন বা পৃথিবীর আকর্ষণে লোকান্তর হইতে আসেন, ইহাও একটি সমস্যা। এই অতিমানুষ শ্রীভগবানে বা পরমপুরুষে চির-প্রতিষ্ঠিত, কিম্বা এই মানুষই সাধনবলে ক্রমে ক্রমে ঐ স্থানে আরোহণ করেন, এবং তাহার পর পৃথিবীর আকর্ষণে আসিয়া থাকেন, ইহাও এক সমস্যা। এই শেষ মতটিকে 'উত্তারবাদ' বলা যাইতে পারে। ইহা বৌদ্ধ ও জৈনদিগের মত। আমাদের তান্ত্রিকেরা অনেকে এই মতাবলম্বী। শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা নারায়ণ ঋষি বলেন, তাঁহারাও এই মতের লোক। প্রাচীন ভারতের এই সব মতের আলোচনা-দ্বারা বর্ত্তমান যুগের জড়বাদ ও নাস্তিক্যবাদ বিধ্বস্ত হইবে, জীবনের উল্লাস ও আশা বাড়িয়া যাইবে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রারম্ভেই উদ্ধৃত শ্লোকটির তাৎপর্য্য আমরা অন্যপ্রকারেও বুঝিতে পারি। অনেকেই জানেন জৈন পণ্ডিতগণও রামায়ণ মহাভারতের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। জৈন পণ্ডিতের লেখায় যুক্তিবাদ কিছু বেশী। (It is more rationalistic) তাঁহারা বলেন যখনই অবতারের আবির্ভাব হয়, তখনই দুইটি বিরোধী শক্তি বা ভাব একসঙ্গে মূর্ত্তি লইয়া আসিয়া থাকে। নারায়ণ আসিলেই প্রতি-নারায়ণ বা নারায়ণ শক্তির যাহা বিপরীত, সেই শক্তিরও আবির্ভাব হয়। পুরাণের অবতার-কথা বড়ই উচ্চ ও গভীর কথা। বর্ত্তমান কালের উন্নততর চিন্তার আলোকে এই তত্ত্বের আলোচনা করা বড়ই প্রয়োজন।

প্রাচীন ভারতে এ-সম্বন্ধে কত প্রকারের যে আলোচনা হইয়া গিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মহাপুরুষের বা অবতার-পুরুষের আবির্ভাব যে একটি অতিশয় সত্য কথা, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। একটা যুগ শেষ হয়, আর একটা নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হয়, সেই যুগসন্ধির সময়ে একজন অসাধারণ পুরুষ আসিয়া থাকেন, এই ব্যাপার কেবল প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বা পুরাণে নহে, পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, তিনি কি প্রকারে আসেন, কোথা হইতে আসেন, ইহার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। মানুষ ও যুগ, এই দুইটি জিনিস। মানুষ বা অতিমানুষ আসিয়া যুগ সৃষ্টি করেন, কিম্বা যুগের প্রভাবে অতি-মানুষ গড়িয়া উঠে, এ-সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের মধ্যে আলোচনা ও বাদানুবাদ

হয়, প্রাচীন ভারতে কেবল যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা নহে, এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসাও হইয়াছিল। মহাভারতে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন--

কালো বা কারণং রাজ্ঞো রাজা বা কালকারণম্।
ইতি তে সংশয়ো মাভূদ্ রাজা কালস্য কারণম্ ॥

কাল রাজার কারণ, না রাজা কালের কারণ, এ বিষয়ে সন্দেহ করিও না, রাজাই কালের কারণ।

যে-প্রসঙ্গে এই শ্লোকটি বলা হইয়াছে, তাহাতে ইহাই সত্য ; কিন্তু এই প্রশ্নের আর একটা দিক্ও আছে। পৌরাণিকগণ সেই সব কঠিন কথার মীমাংসা করিয়াছেন। সে-কথা পরে আলোচ্য।

"সমগ্র বিশ্ব বিরাট পুরুষের দেহ"। পৌরাণিকের এই মূল সিদ্ধান্ত মনে রাখিলেই অবতারবাদ বা মহাপুরুষবাদের রহস্য বেশ বুঝিতে পারা যায়। আমার একহাতে যদি একটি মশক আসিয়া কামড়ায় তাহা হইলে সেই স্থানে আমার অনুভব শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়। দংশন-জাত যন্ত্রণার ফলে দেহের একটা জায়গায় অনুভবশক্তি যেমন কেন্দ্রীভূত হয়, ঠিক্ তেমনি আর এক জায়গায় প্রাণশক্তিও কেন্দ্রীভূত হয়, আর সেই কেন্দ্রীভূত প্রাণশক্তির প্রেরণায় আমার হাতখানি সেই যন্ত্রণার স্থানে উপস্থিত হইয়া যন্ত্রণা-নিবারণের জন্য চেষ্টা করে। বিশ্বব্যবস্থায় অসুরশক্তি ও দেবশক্তি ঠিক্ এই প্রকারে কার্য্য করিতেছে। অসুরশক্তি কেন্দ্রীভূত হইলেই দেবশক্তিও স্বভাবতঃ কেন্দ্রীভূত হয়। দেবশক্তি কেন্দ্রীভূত হইলেই অবতারের আবির্ভাব হয়। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে ইহাই বলা হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে উদ্ধব বিদুরকে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিয়াছেন। সেই স্থানটি বড়ই মূল্যবান্। সেই স্থানের কয়েকটি শ্লোক স্মরণ রাখা আবশ্যক। উদ্ধব বলিতেছেন—

স্বশান্তরূপেষ্বিতরৈঃ স্বরূপৈ-
রভ্যর্দ্দ্যমানেষ্বনুকম্পিতাত্মা।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো
হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ ॥৩।২।১৫

নিজের অশান্ত রূপ-সমূহের দ্বারা নিজের শান্ত রূপগুলিকে নিপীড়িত হইতে দেখিয়া

দয়ার্দ্রচিত্তে পর ও অবর সকলের ঈশ্বর জন্মরহিত শ্রীভগবান্ মহত্তের অংশযুক্ত হইয়া অগ্নির ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন।

এই শ্লোকে বলা হইল, শ্রীভগবানের অসংখ্য রূপ। এই রূপসমূহ দুই প্রকার, কতকগুলি শান্ত, আর কতকগুলি অশান্ত, এই শান্ত রূপগুলিই দেব মুনি প্রভৃতি, আর অশান্ত রূপগুলি দৈত্য, দানব, অসুর, রাক্ষস। অশান্ত রূপগুলি শান্ত রূপগুলির উপর কখন কখন অত্যাচার করে। এই অত্যাচার হইলে ভগবানের দয়া হয়। সেই সময়ে শ্রীভগবান্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম কিরূপ? কাষ্ঠে অগ্নির প্রকাশের ন্যায়। অগ্নি অপ্রকট অবস্থায় (Latent) সকল সময়েই কাষ্ঠে গূঢ়রূপে আছেন, বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ কারণে অর্থাৎ ঘর্ষণাদির দ্বারা সেই গূঢ় ও অব্যক্ত অগ্নি যেমন ব্যক্ত হইয়া থাকেন, শ্রীভগবানও ঠিক্ সেইরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকেন, ইহাই শ্রীভগবানের জন্মগ্রহণ। মহত্তের বা মহত্তত্ত্বের অংশযুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের এই প্রকাশ হইয়া থাকে। বিশ্বব্যবস্থায় অসুরেরও প্রয়োজন, দেবতারও প্রয়োজন। এই অসুর ও দেবতা শ্রীভগবানেরই রূপ, অশান্ত রূপ আর শান্ত রূপ। ইহারা উভয়ে শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবানের ইচ্ছায় শ্রীভগবানের দেহেই আছে। ইহাদের মধ্যে সমতা থাকিলে কোন গোল নাই। বৈষম্য হইলেই শ্রীভগবানের আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়। তিনি আবির্ভূত হইয়া সমতা (Due balance and proportion) রক্ষা করেন।

ভগবানের শান্ত ও অশান্ত, এই দুই প্রকারের রূপের কথা বলা হইল। আমরা শান্তরূপের পক্ষপাতী, অশান্ত রূপের বিরোধী। ইহাই সাধারণ মানুষের স্বভাব বা স্বধর্ম্ম। এই স্বভাব বা স্বধর্ম্ম আমরা যতক্ষণ অতিক্রম করিতে না পারিব, তত্ত্বের ভাষায় আমাদের চেতনা ও অনুভব যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে এবং এই দেবাসুরের দ্বন্দ্বের ভিতর অবরুদ্ধ, আমরা ততক্ষণ কিছুতেই শ্রীভগবানের স্বরূপও বুঝিব না এবং শ্রীভগবানের আবির্ভাবের অন্তরঙ্গ কারণও বুঝিতে পারিব না। মহাত্মা উদ্ধব যাহা বলিয়াছেন, তাহার সাহায্যে আমরা বহিরঙ্গ হইতে অন্তরঙ্গে প্রবেশ করিতে পারি।

পূর্ব্বেই বলিলাম, আমরা দেবতার পক্ষপাতী, অসুরের বিরোধী। অনেক সময়ে

অসুরের পূজক হইয়াও অসুরের নিন্দা করি। দেবতা আমার ভিতরে নাই, অথচ দেবতার পূজা করি। কিন্তু, উদ্ধব বলিতেছেন—

মন্যে হসুরান্ ভাগবতাংস্ত্র্যধীশে সংরম্ভমার্গাভিনিবিষ্টচিত্তান্।
যে সংযুগেঽচক্ষত তার্ক্ষ্যপুত্রমংসে সুনাভায়ুধমাপতন্তং॥ ৩।২।২৪

আমি অসুরদিগকে পরম ভাগবত বলিয়া মান্য করি। কারণ তাহাদের চিত্ত ক্রোধাবেশে ভগবানে অভিনিবিষ্ট ছিল। তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে গরুড়ারূঢ় চক্রধারী শ্রীভগবান্‌কে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়াছিল।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই শ্লোকের টিকায় বলিয়াছেন—এই শ্লোকটি "বিলাপ এব নতু সিদ্ধান্তঃ"। বিশ্বনাথকে ভুল বুঝিবেন না। ব্রজবাসীর প্রেমের ভূমি হইতে দেখিলে, তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই সত্য। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর হইতে দেখিলে সত্যই অসুরেরাই অধিক ভাগ্যবান্, দেবতা অপেক্ষা অনেক অধিক ভাগ্যবান্।

এই ভাবের কথা উদ্ধব আরও বলিয়াছেন—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়া পায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥

পূতনা রাক্ষসী শিশু শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ নাশ করিবার জন্য নিজের স্তনদুইটিতে কালকূট বিষ মাখাইয়া তাহাই পান করাইয়াছিল! কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, মাতৃভাবের কৃত্রিম অভিনয় করিয়াও সে ধাত্রীর উপযুক্ত গতিলাভ করিল। এমন শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া আর কোন্ দয়ালুর শরণাগত হইব?

দৃষ্টা ভবদ্ভির্নন্থ রাজসূয়ে চৈদ্যস্য কৃষ্ণং দ্বিষতোঽপি সিদ্ধিঃ।
যাং যোগিনো সংস্পৃহয়ন্তি সম্যগ্‌যোগেন কস্তদ্বিরহং সহেত॥ ১৯

উদ্ধব বিদুরকে বলিতেছেন, আপনারা সাক্ষাৎ দেখিয়াছেন রাজসূয়-যজ্ঞে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের দ্বেষ করিয়াছিল। কিন্তু, সেই শিশুপাল এমন সিদ্ধি লাভ করিল, যে যোগিরা সম্যক্‌রূপ যোগ সাধনা দ্বারা সেইরূপ সিদ্ধি সর্ব্বদাই কামনা করিয়া থাকেন। সেই শ্রীকৃষ্ণের বিরহ কি সহ্য করা যায়?

তথৈব চান্যে নরলোকবীরা য আহবে কৃষ্ণমুখারবিন্দং।
নেত্রৈঃ পিবন্তো নয়নাভিরামং পার্থাস্ত্রপূতা পদমাপুরস্য॥ ৩২।২০

কেবল শিশুপাল নহে যে সকল নরলোকবীর অর্জ্জুনের অস্ত্রাঘাতে পবিত্রীকৃত হইয়া যুদ্ধ স্থলে চক্ষুর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নয়নাভিরাম মুখপদ্ম দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

অসুর ও অসুরভাবাপন্ন ক্ষত্রিয়বীরগণের সৌভাগ্যের কথা এই সব শ্লোকে কথিত হইল। অসুরের কথা আলোচনা করিতে হইলে দেবতাদের কথাও আলোচনা করা উচিত। পুরাণে দেবাসুরের সংগ্রামের কথাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা। দেবতা অসুর একই পিতার পুত্র, তাহাদের মাতারাও সহোদরা ভগ্নি। দেবাসুরের কথা ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠান ভূমি হইতে আলোচনা করিতে হইবে। ঐতিহাসিক ভাবে বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষবাদের আলোকে আলোচনা করিলে বলিতে হইবে মানবজাতির সুবিশাল ইতিহাসে অনেক প্রকারের মহাজাতি ও শাখাজাতি সমূহের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেক সংগ্রাম ও সন্ধি হইয়াছে, অনেক সময়ে সংমিশ্রণও হইয়াছে, পুরাণের দেবাসুরকথায় সেই সব ব্যাপারের স্মৃতি রহিয়াছে। মনস্তত্ত্বের দিক্ হইতে বা ভাবের দিক্ হইতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় একই শ্রেণীর জীব ভাবভেদে শত্রু হইয়া যুদ্ধ করিতেছে: হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, শিশুপাল ও দন্তবক্র, মূলে বিষ্ণুরই দুইজন পার্ষদ, জয় ও বিজয়, ঋষিদের অভিশাপে অসুর হইয়া তিনজন্ম মর্ত্ত্যলোকে লীলা করিয়াছে। আরও উপর হইতে দেখিলে, মূলে নারায়ণের যুদ্ধ করিবার ইচ্ছাই সমুদয় ব্যাপারের মৌলিক হেতু।

দেবাসুরের তত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠান-ভূমি হইতে না বুঝিলে অবতার-তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান যুগে ঐতিহাসিকগণের ভিতর যে শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে, তাহারও সংবাদ রাখা আবশ্যক। The Heroic School, the Sociological School, the Anthropological School, the Democratic School, the Naturalistic School, the Environmental School, the Ideatistic School প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের মৌলিক ধারণাগুলি পুরাণের মধ্যে সুস্পষ্ট আকারেই রহিয়াছে। কেবল যে রহিয়াছে, তাহা নহে তাহাদের মধ্যে একটা সমন্বয় করার চেষ্টাও রহিয়াছে। কোন স্থানে কর্ম্মের কথা, কোন স্থানে অভিশাপের কথা, কোন স্থানে শ্রীভগবানের লীলা করিবার কথা বলা হইয়াছে। এইগুলির আলোচনা দরকার।

সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর-সমূহ, ও বংশানুচরিত সাধারণতঃ পুরাণের এই পাঁচটি লক্ষণ।

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্‌॥

১। সর্গ—তত্ত্বসৃষ্টি, উপাদান্‌সৃষ্টি—Inorganic Evolution

২। প্রতিসর্গ—চরাচর সৃষ্টি—Organic Evolution প্রাণশক্তি ও জ্ঞানশক্তির ক্রমবিকাশ।

৩। বংশ—মানবের উৎপত্তি

৪। মন্বন্তর—মানবজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখার আবির্ভাব

৫। বংশানুচরিত—বংশের চরিত্র বর্ণনা এবং অবসান।

পুরাণের লক্ষণ অন্যস্থানে অন্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত দশলক্ষণ এবং ইহা মহাপুরাণ। এই লক্ষণগুলির আলোচনাতেই বুঝিতে পারা যাইবে—যত রকমের ইতিহাস হইতে পারে, সব রকমের কথাই পুরাণে আছে। আবার পৌরাণিকের আলোচনার শেষ সীমায় আশ্রয়-তত্ত্বের আলোচনা। এই আশ্রয় তত্ত্বই সূত্রাত্মা—Over-soul। এই আশ্রয়তত্ত্বের সহিত মানবকে পরিচিত করাই পৌরাণিকের উদ্দেশ্য। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণলীলা—এই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমদ্ভাগবতের মতে সেই আশ্রয়-তত্ত্ব, সুতরাং এই শ্রীকৃষ্ণ-কথা বুঝিতে হইলে পুরাণের সমুদয় তত্ত্বের আলোচনা করিতে হইবে।

৯। দেবলোকে গৃহবিবাদ

দেবাসুরের যুদ্ধের কথা বলা হইতেছে। মানুষ যে বুঝিয়া ও না বুঝিয়া দেবতাদের পক্ষপাতী সে-কথা বলা হইয়াছে। অপক্ষপাতে পৌরাণিকের, বিশেষতঃ পৌরাণিক লীলাবাদের সমুদয় কথা বুঝিতে হইলে দেবতাদের কথাও আলোচনা করা দরকার।

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে এই সব কথা বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মা দেবতাদের প্রথম, কিন্তু, তিনি পৃথক্‌ভাবেই থাকেন, তপস্যা ও জ্ঞান চর্চ্চা তাঁহার কাজ। ইন্দ্র দেবরাজ, স্বর্গলোকের সুখৈশ্বর্য্য তিনিই রাজাসনে বসিয়া ভোগ করেন। দেবসভায়

সুরগুরু বৃহস্পতি আসিলেন, ইন্দ্র প্রত্যুত্থান বা আসনদানের দ্বারা তাঁহাকে সম্মান করিলেন না। বৃহস্পতি সবই বুঝিলেন, সভা হইতে চলিয়া গেলেন। তখন ইন্দ্রের জ্ঞান হইল, তিনি বুঝিলেন, আমি আসুরভাব প্রাপ্ত হইলাম। অন্বেষণ করিয়াও বৃহস্পতিকে পাওয়া গেল না। অসুরেরা দেবলোক আক্রমণ করিলেন। বিপন্ন ও চিন্তাকুল দেবগণ দেবরাজকে লইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত। ব্রহ্মা উপদেশ দিলেন, বিশ্বরূপকে পুরোহিত কর। বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা, তিনি একজন প্রজাপতি বিশ্বরূপের মাতার নাম রচনা, তিনি অসুরকন্যা। বিশ্বরূপ পৌরহিত্য করিতে প্রথমে অসম্মত, কারণ, পৌরহিত্য ভাল কাজ নহে। শেষে দেবতাদের একান্ত অনুরোধে সম্মত হইলেন। এই বিশ্বরূপই ইন্দ্রকে সুপ্রসিদ্ধ নারায়ণ কবচ দিলেন আর এই নারায়ণ-কবচের প্রভাবে ইন্দ্র অসুরহস্তে আপাততঃ রক্ষা পাইলেন।

বিশ্বরূপ লোক ছিলেন ভাল, তিনি সত্যই বিশ্বরূপ। তাঁহার তিনিটি মুখ, এক মুখে পান করিতেন সোম, যাহা দেবতাদের খাদ্য; আর এক মুখে পান করিতেন সুরা, যাহা অসুরদিগের নিজস্ব; আর এক মুখে ভোজন করিতেন অন্ন, যাহা মানুষের ভক্ষ্য। বিশ্বরূপ, একাধারে দেবতা অসুর ও মানুষ; একে তিন, তিনে এক। বিশ্বরূপ দেবতাদেরই মঙ্গল করিতেন, তবে অসুরদের প্রতি তাঁহার টান ছিল, তিনি গোপনে যজ্ঞের ঘৃত অসুরদেরও কিছু কিছু দিতেন। দেবতাদের তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হইত না। কিন্তু, ইন্দ্র, তাহা বুঝিলেন না, ক্রুদ্ধ হইয়া বিশ্বরূপের মুণ্ডচ্ছেদ করিলেন। বিশ্বরূপের সোমপায়ী মস্তকটি হইল চাতক, সুরাপায়ী মুণ্ড হইল চটক, অন্নভোজী মুণ্ড হইল তিত্তীর পক্ষী। ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ হইল। সেই পাপকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ভূমি, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রীজাতিকে সেই পাপ দিলেন। ত্বষ্টা, পুত্রশোকে কাতর হইয়া ইন্দ্রকে বধ করার জন্য এক অসুর সৃষ্টি করিলেন, তাহার নাম বৃত্র। এই বৃত্রের হস্তে দেবতাদের যথেষ্ট লাঞ্ছনা হইল। শেষে পরমতপস্বী বিশ্বপূজ্য ব্রাহ্মণ দধ্যঞ্চ নিজের অস্থি দান করিয়া বৃত্রবধের সাহায্য করিলেন, দেবতারা রক্ষা পাইলেন।

এই উপাখ্যানে ইন্দ্রই নিন্দিত হইয়াছেন। অসুরদিগের বংশে প্রহ্লাদের জন্ম। প্রহ্লাদের পৌত্র বলি, দাতার শিরোমণি, যাঁহার দ্বারে ভক্তিডোরে ভগবান্ বন্দী। বলির

পুত্র বাণ, পরম শিবভক্ত ; যাঁহার কন্যা ঊষা। এই সব অসুর মহামহিম, ইঁহাদের তুলনা নাই। অসুরেরাই ভবিষ্যতের দেবতা, অতীতেও তাঁহারা দেবতা ছিলেন, সুতরাং, অসুরও খুব উচ্চ, দেবতা অপেক্ষাও অনেক বিষয়ে উচ্চ।

দেবাসুরের এই তত্ত্ব বুঝিয়া দেবাসুরের মিলন বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে গিয়া সকল ব্যাপারে একমাত্র লীলাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছা বুঝিতে হইবে, তাহা হইলেই আমরা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের অন্তরঙ্গ কারণ বুঝিতে পারিব।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোক পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। ঐ স্থানে মহামতি উদ্ধবের মুখে বিদুর এই হেতু কিছু কিছু শুনিয়াছেন।

পরিশিষ্ট

(ক) প্লেতো ও পুরাণ

আমরা অনেকে অনেক কথা বিদেশী ভাষায় অনুবাদ করিয়া বুঝিয়া থাকি। আমরা যে-শিক্ষা পাইয়াছি, তাহাতে অনেক স্থলেই এইরূপ করা স্বাভাবিক। অনুবাদ করিয়া চিন্তা করার প্রণালী এইরূপ। পুরাণ = Mythology ; Myth = lie মিথ্যা। অতএব পুরাণ মিথ্যা, কাল্পনিক, রূপক প্রভৃতি। আমরা যে পশ্চিমদেশের পাণ্ডিত্যের সাহায্যে পুরাণকে মিথ্যা বলিতেছি, সেই পশ্চিমদেশের সকলেই বা সমুদয় পণ্ডিতেই যে পুরাণকে মিথ্যা বা, রূপক বলেন তাহা নহে। পশ্চিমদেশেও সেকালে এবং একালে পুরাণ লইয়া মতভেদ আছে। এই মতভেদের সংবাদ জানিলে আমাদের উপকার হইতে পারে। বিলাতী রোগ, বিলাতী ঔষধেই শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটোর গ্রন্থগুলি আমাদের ভাল করিয়া পড়া দরকার। আমরা অর্থাৎ পুরাণাদি শাস্ত্রের সহিত পরিচিত হিন্দুরা, তাঁহার গ্রন্থ পড়িলে এমন অনেক গূঢ় কথা পাইব, যাহা পাশ্চাত্য দেশের অনেক মনীষি ঠিকমত বুঝিতে পারেন নাই। প্লেটো বলেন পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি অতিশয় গভীর ও উচ্চ সত্যের প্রকাশক। ঐ সত্যগুলি এমন যে অন্যপ্রকারে অর্থাৎ পৌরাণিকের আখ্যায়িকা ব্যতীত অন্য উপায়ে

ব্যক্ত করা যায় না। The doctrinal ends, and the mythical begins—তত্ত্বরাজ্যে অগ্রসর হইতে হইতে এমন একটা স্তরে গিয়া মানুষ উপস্থিত হয় যে যুক্তির ভাষা আর পাওয়া যায় না, তখন পুরাণের ভাষা আরম্ভ হয়। ভগবানের মন—The Supreme Mind কিরূপ? কে বলিবে তাহা কিরূপ? মানুষের বিশুদ্ধ আত্মা Nous—spirit—rational soul of man, পরমপিতা পরমেশ্বরেরই অংশ, তাহার প্রকৃতি পরমেশ্বরের প্রকৃতিরই অনুরূপ, কাজেই সেই শুদ্ধ আত্মা নিত্যসত্যসমূহ—the eternal realities দেখিতে পায়। প্রত্যক্ষভাবে পরমার্থ সত্যের দর্শন একমাত্র পরমেশ্বরেরই সম্ভব। এই দর্শনলাভ করার যে চেষ্টা তাহারই ফল দর্শনশাস্ত্র। "This faculty of contemplating reality in a direct and immediate manner belongs to God alone; the aspiration for this knowledge constitutes what is meant by philosophy—the love of wisdom."

সত্যের প্রতি অনুরাগই শিব বা কল্যাণের প্রতি অনুরাগ। এই অনুরাগ যখন প্রবল হয় তখন আর অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা বা কামনা থাকে না, মানুষ তখন পবিত্র হইয়া পরমেশ্বরেরই সারূপ্য লাভ করে। মানুষ পূর্ব্বে এই সারূপ্যেই ছিল, মধ্যে সেই সারূপ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, আবার সেই সারূপ্যে প্রত্যাবৃত্ত হয়। ঈশ্বরের সারূপ্যে থাকার সময়ের অনেক স্মৃতি এই সব পৌরাণিক আখ্যায়িকায় আছে। মহামতি প্লেতো তাঁহার বহুগ্রন্থে পৌরাণিক সত্য-সম্বন্ধে এই সব কথা বলিয়াছেন। এই সব কথা আমাদেরই শাস্ত্রের কথা। ভারতের ঋষিদের এই বিদ্যাই প্লেতো পাইয়াছিলেন ও তাঁহার শিষ্যগণকে শিখাইয়াছিলেন। পৌরাণিকের বর্ণনার প্রতি শ্রদ্ধা জাগরিত করার জন্য, লোকের মনে শ্রদ্ধা জাগরিত করার জন্য আমরা এই ভূমিকাটুকু করিলাম; শ্রদ্ধাপূর্ব্বক না শুনিলে এবং শুনিয়া ধীরভাবে কিছুদিন চিন্তা না করিলে পুরাণের মর্ম্ম বুঝা যায় না। যাহা তত্ত্বকথা বা Doctrinal, তাহা অপেক্ষা পুরাণ উচ্চতর—এইটুকু বুঝিলেই আপাততঃ যথেষ্ট। আমাদের ভাষায় যদি বলা যায় মনের উপর বুদ্ধি, তাহা হইলেও ঠিক এই কথাই বলা যায়।

(ক) প্রত্যক্ষবাদ বা Positivism.

পৃথিবীতে সকল দেশে ও সকল সমাজে সুপ্রাচীন কাল হইতে অনেক প্রকারের

মতবাদ চলিয়া আসিতেছে। এই মতগুলি মানিয়া লইয়া অবরোহ প্রণালীতে আলোচনা করা হইয়া থাকে। অবরোহ প্রণালীতে আলোচনা বলিতে এই বুঝায় যে সেই মতগুলি মানিয়া লইয়া তাহার সাহায্যে বিচার চলিতে থাকে। সেই মতগুলি সত্য কিনা তাহা কোনরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান বা পরীক্ষার দ্বারা দেখা হয় না। এইপ্রকারের আলোচনা পদ্ধতিকে পাশ্চাত্য দর্শনে Speculation বলে। এই পদ্ধতি বর্ত্তমান যুগে অতিশয় নিন্দিত পদ্ধতি বলিয়া পরিচিত। এই পদ্ধতির বিপরীত দুই প্রকারের পদ্ধতি আছে। পরীক্ষা-প্রসূত আরোহ পদ্ধতি Experimental Induction আর Reflective বা অন্তর্দৃষ্টির পদ্ধতি।

কতকগুলি মত সত্য কি না, সে সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার না করিয়া, সেগুলিকে মানিয়া লইয়া যে আলোচনা-করা তাহার নাম Speculative পদ্ধতি। Positivism বা প্রত্যক্ষবাদ বলিতে ইহার বিপরীত পদ্ধতি বুঝায়। যাহা Positive অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা বা পরীক্ষার দ্বারা যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা ছাড়া আর কিছু মানিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যে আলোচনা করা হয়, সেই আলোচনা পদ্ধতির নাম Positivism.

Positivism is Characteristically, not so much a definite Philosophy as a method of Philosophising, a way of thinking about science, life and religion.

প্রত্যক্ষবাদের লক্ষণ এই। ইহা একটি সুসম্পূর্ণ দার্শনিক মতবাদ নহে, অর্থাৎ সকল বিষয়েই যে ইহা কোনরূপ সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করিয়া তাহাই প্রচার করিতেছে, তাহা নহে। ইহা তত্ত্বনির্দ্ধারণের এক প্রকার পদ্ধতি। বিজ্ঞান, জীবন, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তা করিবার ইহা একটি পদ্ধতিমাত্র।

ফরাসীদেশের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক অগাস্ত কোঁৎ (১৭৯৮—১৮৫৭) এই দার্শনিক মতবাদ প্রচারিত করেন। তাঁহার সিদ্ধান্তের প্রাথমিক কথা এই যে মানুষের জ্ঞান মাত্র ব্যবহারিক (phenomena) লইয়া। আবার এই জ্ঞানও সাপেক্ষ (relative) কখনই নিরপেক্ষ (absolute) নহে। কাজেই পরমার্থবিষয় বা বস্তুর স্বরূপ জানিবার জন্য যে সব চেষ্টা, তাহা একেবারেই নিরর্থক। চরম সত্য কখনই কেহ জানিতে

পারিবে না। Metaphysics বা speculative philosophy অর্থাৎ পরমার্থদর্শনের সমস্ত চেষ্টাই অকারণ। আদিকারণ, দ্রব্যগুণ বা বস্তুর স্বরূপ, ঈশ্বর প্রভৃতি জানিবার চেষ্টা নিষ্ফল। কোঁৎ বলেন যাবতীয় জ্ঞান তিনটি সুনির্দ্দিষ্ট স্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। প্রথম Theological—এই যুগে মানুষ যাহা কিছু দেখে, বিবেচনা করে তাহার পশ্চাতে জ্ঞানশক্তি ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট কোন প্রাণী আছে। দ্বিতীয় স্তরের নাম Metaphysical—এই স্তরে তাহারা কল্পনা করে কতকগুলি "কারণ" বা তত্ত্ব আছে তাহার দ্বারাই সমুদয় হইতেছে। তৃতীয় স্তরের নাম Positive—এই স্তরে মানুষ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অনুভব করে যে একটি ব্যাপারের সহিত আর একটি ব্যাপারের সম্বন্ধ রহিয়াছে; এই সম্বন্ধ জ্ঞানের দ্বারাই ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। এই মতবাদের দ্বারা যাবতীয় বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ করার চেষ্টা হইয়াছে। এই শ্রেণী-বিভাগে বিশুদ্ধ পরীক্ষাকরণ পদ্ধতি ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি প্রযুক্ত হইয়াছে। এই মতবাদের দ্বারা একটি সমাজ বিজ্ঞান বা Sociology গঠনের চেষ্টা হইয়াছে। হিতবাদ (utilitarian altruism) সেই সমাজবিজ্ঞানের নৈতিক ভিত্তি। উত্তরকালে অগাস্ত কোঁৎ একটি সম্প্রদায় (cult) প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সম্প্রদায়ের উপাসনা অনেকটা রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়েরই মত, তবে তাহাতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের শিক্ষা স্বীকৃত হয় নাই। এই ব্যাপারের জন্য অনেকে বলেন উত্তরকালে অগাস্ত কোঁৎ, জ্ঞানের প্রথমস্তরে অর্থাৎ Theological স্তরেই ফিরিয়া আসিলেন।

'অগস্ত কোঁৎ'এর পূর্ব্বে 'ভিকো' (১৭২৫) বলিয়া একজন পণ্ডিত পৃথিবীর আলোচনা করিয়া এক সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে মানবের ইতিহাসে তিনটি স্তর দেখা যায়। Divine (ঐশ্বরিক), Heroic (বীরের যুগ) Human (মানবীয়) ধনের বৃদ্ধিতে একটি যুগ অধঃপতিত হয়। তখন পরবর্ত্তী যুগের (Cycle) আরম্ভ হয়। এই প্রকারে যুগচক্র চলিতেছে। এই মতকে Theory of ricorsi বলে।

অভিভাষণ

সভাপতি—শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী

যুবক-সম্মিলনী, কিশোরগঞ্জ, ফাল্গুন ১৩৩৪।

ওঁ নমো ব্রহ্মণে, নমো বাচস্পতয়ে, নমো বিষ্ণবে নমো নমঃ। তুমিই ছন্দোময়ী ঋষিবাণীর অনাহত অধিপতি, তুমিই তরুণদিগের চির নবীনতার অনন্ত উৎস, তুমিই যুবকদিগের অক্ষয় অমৃত-রসভাণ্ডারে, চির বসন্তের বৈজী শক্তি,—উৎসাহ উদ্দীপনার অনির্ব্বাণ অগ্নি,—তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি।

এই সম্মিলনের সভাপতি হইবার আহ্বান শুনিয়া আমি যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হই। বিস্ময়ের কারণ,—দেহ, মন, বুদ্ধিতে আমি এমনি অক্ষম, যে এই সভার নেতৃত্ব করিতে আমি আপনাকে একান্তই অনুপযুক্ত মনে করি। কিশোরগঞ্জের যুবক বন্ধুগণ, আমার অযোগ্যতার কথা না ভাবিয়া, এই সম্মিলনের সভাপতি মনোনীত করিয়া আমাকে তাঁহাদের আনন্দোৎসবের অংশী করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তাহাই আমার আনন্দের কারণ। যুবকদের এই আহ্বানের মধ্যে আমি আজ আবার আত্মীয়দের প্রীতি অনুভব করিতেছি। এই আহ্বানের সঙ্গে আমার অতীত যৌবনের রসাস্বাদ যেন আবার নূতন করে সম্ভোগের সুযোগ পেয়েছি, তাই গৌরব ও আনন্দ বোধ হচ্ছে। বার্দ্ধক্যে আপনাদের দত্ত এই সুযোগের জন্য আপনাদিগকে আমার কৃতজ্ঞতা পূর্ণ অভিবাদন জানাইতেছি।

কিন্তু এই যুবক-সম্মিলনে আমি কি বলিব? আমন্ত্রণ পাইয়া অবধি, শুধু মনে হইতেছে, "সেথা আমি কি গাহিব গান"। যুবকদিগের হৃদয়-যন্ত্রের সহিত সুর মিলাইয়া, আমার এই পুরাতন জরবীণার ছিন্নতন্ত্রী শ্রুতিযোগ্য কোন সুর কি বাজাইতে পারিবে? অল্প কয়েক মাস পূর্ব্বে ময়মনসিংহের যুবক-সম্মিলনে সুযোগ্য সভাপতি চিন্তাশীল মনীষি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে সকল সারগর্ভ বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন, সেই যুবকদিগের সভায়, আমার মত সর্ব্বপ্রকার বিভব-বিহীন ব্যক্তি কি নূতন কথা শুনাইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর মনস্তুষ্টি সাধন করিবে? তবে যিনি মূককেও বাচাল করিতে পারেন ও করেন, পঙ্গুদ্বারাও গিরি লঙ্ঘাইতে পারেন ও করেন,—তাঁহার কৃপাই আমার একমাত্র ভরসা।

নব্য-বঙ্গের যুবজনেরা যে ভাবের অবদান-পরম্পরায় বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বল করিতে প্রয়াসী

হইয়াছেন, সেই যুবকদিগের সভায়, আমার ন্যায় ভাবসম্পদবিহীন ব্যক্তির উপদেশ দানের চেষ্টা, প্রগল্‌ভতা বলিয়াই মনে করি। যে সকল বঙ্গরত্ন যুবক সম্প্রদায়ের গলদেশে, নানা দুর্লভ রত্নাভরণ দিয়া পরিসজ্জিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই ময়মনসিংহের যুবকদিগের কৃতিত্ব বড় কম নহে। এমন কি, এই ক্ষুদ্রায়তন কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের নানা পল্লীর নিভৃত লোকালয়ে, কত কুসুমকমনীয় নীরব কর্ম্মী লোকচক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত রহিয়া, স্বর্গীয় সুরভি দানে, বাঙ্গালার আকাশ বাতাস, স্নিগ্ধ, মধুর, শান্ত সরস সুখ গৌরবময় করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, কে তাঁহাদের তত্ত্ব জানে? কেই বা তাঁহাদের অনুসন্ধান করে?

আজ এই নবযুগে, বাঙ্গলার যুবকদিগের কর্ম্মের গণ্ডী আর ক্ষুদ্র অথবা সীমাবদ্ধ নয়। কর্ম্মও যেমন অসংখ্য, তাহাদিগের প্রকারও তেমনি বহু। কিন্তু সেই সহস্রমুখী কর্ম্মের লক্ষ্য এক। জাতিকে সঞ্জীবিত করা, দেশকে সর্ব্বপ্রকারে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত করা, পৃথিবীর অপর যে কোন সভ্য সমুন্নত সুস্থ স্বাধীন দেশের সহিত স্বদেশকে সমতুল্য করা। জানি, আমরা আজ পতিত, নানা দুঃখ-দুর্দ্দশাগ্রস্ত, বিপন্ন, বিপন্থ, পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী। আমাদিগের উন্নতিকর বহু সদনুষ্ঠানের মূলোচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত, নানা বিরুদ্ধ প্রবল শক্তি, নানাদিকে নানাভাবে প্রতিক্রিয়া করিতেছে। তাহা সত্ত্বেও, আমাদিগের আত্মরক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদা আমাদিগকে সচেষ্ট ও সক্রিয় হইতে হইবে। সংগ্রামই জীবন, কঠোর ত্যাগ ও তপস্যাই সংসার-সংগ্রামে জয়ী হইবার একমাত্র অমোঘ উপায়। স্বর্গরাজ্য-বিচ্যুত দেবগণের দুর্দ্দশা বিমোচনার্থ, দেবমাতা অদিতি, মহাতেজা কশ্যপের শরণাগত হইলে, কশ্যপ বলিয়াছিলেন,—

তেষাং জয়োহি তপসা উগ্রেণাস্থেন ভামিনি।
কুরু শীঘ্রতরেনৈব সুরাণাং কার্যাসিদ্ধয়ে॥

হে ভামিনি! অসুরগণের তপোবল অপেক্ষা অধিকতর তপোবল সঞ্চয় করিতে পারিলেই দেবগণের এ সংগ্রামে জয় লাভ হইতে পারে। কালবৈশাখের রুদ্র গর্জ্জন, বাত্যা ও বজ্রপাত-বিভীষিকায় যদি কোন দেশের লোক সন্ত্রস্ত হন, তবে তাঁহারা কদাচ শ্রাবণের অজস্র বারিধারা-সম্পাতে সুখী ও শস্য-সম্পদশালী হইবার আশা করিতে পারেন না। স্রোতস্বিনীর গতি প্রতিহত হইলেই, স্রোতের বেগ প্রবর্দ্ধিত হয়। ইহাই প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম। বাধা বিপত্তিকে বিধাতার আশীর্ব্বাদ ভাবিয়াই, প্রকৃত কর্ম্মী, একাগ্রচিত্তে লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হন।

প্রধানতঃ এদেশের যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়াই, কতিপয় বৎসর হইল আমাদের চারুমিহিরে লিখিয়াছিলাম, বাহুবল, বিদ্যাবল, বুদ্ধিবল, ধনবল ও চরিত্রবল, এই পঞ্চ বলসম্পদে যে জাতি যতই বলীয়ান্, এ বিশ্ব-সংসারে সেই জাতিই তদনুপাতে সুখ সৌভাগ্য,— সম্পদ ও সম্মান লাভের অধিকারী।

এই পঞ্চ বলের কোনটিতেই আমাদের বলীয়ান্ না হইতে পারিবার কোন বাধা, বিধাতা সৃষ্টি করিয়া রাখেন নাই। ভাগ্যবশতঃ আমরা যে-দেশে জন্মলাভ করিয়াছি, সত্য সত্যই জগতে তাহার তুলনা নাই। তবে বর্ত্তমান সময়ে, অবস্থা-দোষে, ব্যবস্থাবশে এবং প্রধানতঃ আত্মদোষে, আমরা আজ এরূপ দুঃস্থ, দুর্ব্বল, দরিদ্র, নগণ্য এবং লাঞ্ছিত। সংখ্যায় আমরা সামান্য নহি, বহু কোটী। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, বঙ্গদেশ আমাদের জন্মভূমি। জাতি হিসাবে আমরা একান্ত অলস বা শ্রমবিমুখও নহি। কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে আমরাই দরিদ্রতম জাতি। অত্যাবশ্যক অন্নবস্ত্রের অভাবে অকালমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া, মড়ক, মহামারী আমাদের নিত্য সহচর। বুদ্ধিবৃত্তিতে বাঙ্গালী পৃথিবীর অপর যে-কোন সুসভ্য দেশবাসীদিগের অপেক্ষা ন্যূন নহেন। নানা প্রতিযোগী পরীক্ষায় এবং অন্য বহুক্ষেত্রেও তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অনেক সত্যনিষ্ঠ নিরপেক্ষ বৈদেশিক সুধীও তাহা স্বীকার করেন। অন্যান্য জাতির তুলনায়, বাঙ্গালীর মৃত্যুভয়ও অধিক নহে। কলেরা, প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক মহামারীর আক্রমণ-কালে, আত্মীয় বন্ধুকে ফেলাইয়া আত্মপ্রাণ রক্ষার জন্য বাঙ্গালী পলায়ন করেন না। যুদ্ধে যাইবার সুযোগ না থাকিলেও, গত মহাযুদ্ধে অনেক বাঙ্গালী যুবক যে কিঞ্চিৎ সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহার সদ্ব্যবহারে তাঁহারা ভীত হন নাই। এই সহমরণের দেশে, সে দিনও আমাদের কিশোরগঞ্জের কন্যা, শ্রীমতী সুনীতি, পতির লোকান্তর গমনের পর, মরণকে হাসিমুখে বরণ করিয়া, জাতির অন্তর্নিহিত তপঃশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং আমরা কাপুরুষও নহি। তথাপি কেহ কেহ স্বার্থবুদ্ধিতে, বিদ্বেষ-বশে বাঙ্গালীকে ভীরু, কাপুরুষ, অলস, অদূরদর্শী, পল্লবগ্রাহী বকাণ্ড-প্রত্যাশী প্রভৃতি অপবাদ দিতে ভালবাসেন। আমাদের কোথাও কোন দোষ ত্রুটি নাই, আমরা জগতের শ্রেষ্ঠ বা আদর্শ জাতি, এরূপ বৃথাভিমান বা অসঙ্গত অহমিকা অতিশয় নিন্দনীয় ও ক্ষতিকর। ভগবান এজাতিকে এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইতে রক্ষা করুন। কিন্তু তাই বলিয়া, সংসারে আমরা অতীব অক্ষম অপদার্থ জাতি, এরূপ মনে ধারণা করাও সাংঘাতিক অনিষ্টকর বলিয়া মনে করি।

কি উপায়ে আমরা সর্ব্ববিধ বলসম্পদে বলীয়ান হইয়া জগতের জাতি-সভায় সম্মানের আসন অধিকার করিতে পারিব, যুবকদিগের নিকট এখন সংক্ষেপে তাহারাই কিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন করিব। জনসংখ্যায় আমরা অল্প না হইলেও শারীরিক শক্তি-সম্পদে আজকাল অতিশয় দুর্ব্বল। অন্নাভাব অর্থাভাব তাহার মূলীভূত কারণ হইলেও, ম্যালেরিয়াদি মড়ক মহামারীর প্রকোপ, ব্যায়াম চর্চ্চাদি শারীরিক পরিশ্রমের অভাব ও অনভ্যাস, অত্যধিক পঠন পাঠন, সর্ব্ববিধ অসংযম, প্রধানতঃ ব্রহ্মচর্য্যের অভাব, আমাদের শারীরিক শক্তিহীনতার কারণ। দৈহিক বলের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, সর্ব্বত্র সুপ্রচুর সুপানীয়ের সংস্থান, দেশের অর্থোন্নতির দ্বারা অন্ন-সমস্যার সমাধান, স্বাস্থ্যনীতির বহুল প্রচার ও অনুসরণ, ব্যায়াম ও অপর সর্ব্ববিধ শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যতঃ গৌরব প্রতিষ্ঠা, নিয়মিত

মস্তিষ্ক-পরিচালন, এবং দৈহিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ অসংযম হইতে বিরতি, যুবকদিগের নিত্যানুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হওয়া আবশ্যক। প্রাণায়ামের পুনঃ প্রচলনও যুবকদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির ও সংযম-সাধন-পক্ষে বিশেষ হিতকারী। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, অটুট ব্রহ্মচর্য্যের। "মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দু-ধারণাৎ" এ তত্ত্বের তথ্য যুবকদিগের বিশেষভাবে উপলব্ধি ও জীবনে অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। বাহুবল, বুদ্ধিবলের পরেই, বিদ্যাবল। বুদ্ধিবলে বাঙ্গালী হীন না হইলেও পৃথিবীর অপরাপর জাতির তুলনায় বাঙ্গালী বিদ্যাবলে আজও অতিশয় দুর্ব্বল। দেশ অজ্ঞানতার ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন। এদেশের শতকরা মাত্র তিন জন লোক নাম স্বাক্ষর করিতে পারেন। বাকী ৯৭ জনই নিরক্ষর। স্বরাজ বা দায়ীত্বপূর্ণ স্বায়ত্বশাসন লাভের প্রধান অন্তরায়, এদেশবাসীর নিরক্ষরতা বলিয়া, ইংরেজেরা মনে করেন এবং সর্ব্বত্র সে কথা প্রচারও করেন। প্রায় পৌনে দুইশত বৎসর ইংরেজ শাসনের ছায়াতলে থাকিয়াও, এদেশের শিক্ষান্ধতা দূর হইল না, এবং যেরূপ ধীর মন্থর গতিতে শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটিতেছে তাহাতে জাপান, ইউরোপ, আমেরিকার ন্যায় শিক্ষা বিস্তার ঘটিতে কয়টি পূর্ণ শতাব্দি গত হইবে তাহা অনুমান করাও অসম্ভব। ইংরেজ, যে কারণেই হউক, এদেশে নিরক্ষরতা দূর করিতে পারিলেন না। কিন্তু আমাদের যুবকেরা ইচ্ছা করিলে, আগামী দশ বৎসর কাল মধ্যেই, দেশের এই অজ্ঞান অন্ধকার নিশ্চয় দূর করিতে পারেন। গ্রামে ও নগরে, সর্ব্বত্র অবৈতনিক নৈশবিদ্যালয় স্থাপনে যুবকেরা কৃতসঙ্কল্প হইলে, অচিরে যুগান্তর ঘটিবে। যাঁহারা বিদেশে স্কুল কলেজে পড়েন তাঁহারাও গ্রীষ্ম ও শারদীয়াবকাশ কালে একটু সময়ক্ষেপ করিলে অনেক সুফল ফলিতে পারে।

বিদ্যাশিক্ষা এখন অনেকেই অর্থোপার্জ্জনের উপায় বলিয়াই করিয়া থাকেন। বিষয়-জগতে থাকিয়া তাহা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু, এখন আমরা যে ভাবে যে যে বিষয়ে সাধারণতঃ শিক্ষা পাইয়া থাকি, তাহাতে অর্থোপার্জ্জনের আশা অধিকাংশ বিদ্যার্থীর পক্ষেই নিষ্ফল। আমাদের যুবকদের জীবনের চরম পরিণতি কেবল মাছি মারা কেরাণী বা দোভাষী আইন-ব্যবসায়ীতেই পর্য্যবসিত হইবার নহে। তাহা বুঝিবার ও বুঝিয়া চলিবার কঠোর প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইয়াছে। শিল্প বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদির বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙ্গালী যুবকদিগের শক্তি ও সময় নিবেশ করিবার এখন অতিশয় আবশ্যক। এটি এখন বিশেষভাবে ইলেক্ট্রিসিটি, মটর মিকানিজম্ কলকারখানার যুগ। এ যুগের বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করিলে সংসারের দারুণ প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে আমরা চিরদিনই পরাজিত রহিব। অন্যান্য অগ্রগামী দেশসমূহের তুলনায় আমাদিগকেও নূতন নূতন পথে কালের গতি অনুসরণ করিয়া তালে তালে ত্বরিত পদে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের কৃষক ও শিল্পীকুল বিদেশীয়গণের সহিত প্রতিযোগিতায় সমকক্ষতা করিয়া কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারেন, কিরূপে অধিকতর লাভবান

হইতে পারেন, কিরূপে বিদেশী দোহনকারীদিগের শোষণ নিবারণ করিয়া দেশকে ধনসমৃদ্ধ করিতে পারেন, তাহার পথ প্রদর্শন ও উপায় নির্দ্ধারণ আমাদের যুবকদিগকেই করিতে হইবে। আইন-ব্যবসায়ী, কুষিদজীবি মহাজন, জমিদার তালুকদার, ইহাদের কেহই দেশের প্রকৃত ধনোৎপাদক বা ধনবর্দ্ধক নহেন। সমাজে তাঁহাদের কাহারও কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু দেশের কৃষক এবং শিল্পীগণই যে প্রকৃত ধনবর্দ্ধক, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। সেই কৃষক ও শিল্পীর ব্যবসা, সমাজে যথেষ্ট সম্মানের চক্ষে পরিদৃষ্ট হয় না। যুবকদিগকেই তাহার অবস্থান্তর ঘটাইতে হইবে। পাটের প্রসূতি পূর্ব্ববঙ্গে এ পর্য্যন্ত একটীও পাটের কল বা চটের কল হইল না, ইহা আমাদের যেমন ক্ষতি, তেমনই কলঙ্কের কথা।

নৌবিভাগে বাঙ্গালী আজও প্রবেশ লাভ করেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় নিরক্ষর, মুসলমান শুধু, খালাসী সারেঙ্গের কার্য্যেই বাঙ্গালীর শক্তি পর্য্যবসিত করিয়া পরিতৃপ্ত আছেন। উচ্চতর কোন কার্য্য করিবার এতদিন সুযোগ ঘটে নাই। এতদিনে বাণিজ্যপোত পরিচালন বিষয়ক বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিবার এদেশীয়েরা কিছু সুবিধা পাইবেন। শিক্ষার্থী যুবকদিগকে তিন বৎসরকাল জাহাজে থাকিয়া শিক্ষানবিশী করিতে হইবে। এবৎসর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যাঁহারা ঐ বিভাগে প্রবেশপ্রার্থী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল মাত্র এগার জন। তন্মধ্যে আবার মনোনীতের সংখ্যা ছয় জন। এদিকে আরও অধিক সংখ্যক বাঙ্গালী যুবকের প্রবেশ-চেষ্টা আবশ্যক। এইরূপ নানা নূতন নূতন বিভাগে আমাদের যুবকেরা প্রবেশ করিলে, বাঙ্গালীর প্রতিভার যেরূপ পরিচয় দিতে পারিবেন, দেশের ধনাগমেরও তেমনি নূতন পথ আবিষ্কৃত হইবে।

শ্বেতাঙ্গেরা আজ বিশ্বজাতি সভায় সকলের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত। তাঁহাদের অধ্যবসায় বিদ্যানুরাগ এবং অকুতোভয় আচরণ, অনুকরণ ও অনুসরণ করিতে না পারিলে আমরা কখনই তাঁহাদের সমকক্ষ বা সম্মানভাজন হইতে পারিব না। শুধু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানেই তাঁহারা আমাদের আদর্শ নহেন। উত্তর মেরু আবিষ্কার, হিমালয়ের তুঙ্গদেশের তত্ত্বনির্দ্ধারণ প্রভৃতি বহুবিধ দুঃসাহসিক কর্ম্মেও তাঁহারা বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন। তাঁহারা এরোপ্লেন, যেপেলিন, টরপেডো, মাইন প্রভৃতিতে প্রাণ ডালি দিতে বিন্দুমাত্র শঙ্কা করিতেছেন না। সহিত্য চর্চ্চা, ভাষা চর্চ্চা, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনাতেও তাঁহারা পৃথিবীর আদর্শ। শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যে সংস্কৃত, পার্শি, আরবী, পালী প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যের এমন এক একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত আছেন যে, তাঁহাদিগের সারস্বত সাধনা কঠোর তপস্যা বলিয়াই স্বীকার ও সম্মান করিতে হয়। আমাদের যুবকদের মধ্যেও সেইরূপ জ্ঞান ধ্যানরত তপস্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে, জাতি হিসাবে আমরা উচ্চ বলিয়া পরিগণিত বা সমাদৃত হইতে পারিব না। ইতিহাস পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয়ে আমাদের যুবকদের বিশাল কার্য্যক্ষেত্র রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বলিয়াছেন, যে

তিনি আবাদের কার্য্যে কেবল জঙ্গল কাটা কুলির কাজই করিয়া গিয়াছেন। হরপ্রসাদ, রমাপ্রসাদ, অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাখালচন্দ্রের প্রারব্ধ কার্য্যের পরিসমাপ্তি-জন্য বহু কৃতি ত্যাগী যুবকের আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মস্তিষ্কবলে বাঙ্গালী দুর্ব্বল নহেন। এই প্রফুল্ল, জগদীশচন্দ্রের দেশে বৈজ্ঞানিক (Scientific) যান্ত্রিক (Mechanical), কৌশলী (Diplomatic) মস্তিষ্কের বিস্ময়কর বিকাশ দেখিয়া সমগ্র সভ্য জগত অনতিবিলম্বে বিস্মিত হইবে, " এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সে দিন আসিবে।" কিন্তু এ দেশের যুবকদিগের উপরই সে গুরুভার। এখানে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য মনে হইতেছে। আমাদের যুবকেরা কেবল ঐ সকল বিভাগে মস্তিস্কের উৎকর্ষ দেখাইলেই কর্ত্তব্যের শেষ হইবে না। আমাদের দেশ 'পরা' এবং 'অপরা' অভিধায়, বিদ্যার দুইটি বিশিষ্ট শ্রেণী স্বীকার করেন। ঐ উভয় বিদ্যাতেই পারদর্শিতার পরিচয় দিয়া দেশ ও জাতিকে সর্ব্বপ্রকারে গৌরবমণ্ডিত করিতে হইবে, বিশ্বের বাজারে রামমোহন, কেশবচন্দ্র এবং বিবেকানন্দ যে অক্ষয় অমৃত-ভাণ্ড উপস্থিত করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ যে পসরা নিয়ে দেশ দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছেন তাহার পূর্ণ পরিণতি-সাধন বাঙ্গালী যুবকদিগকেই করিতে হইবে। হৃদয় ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনই মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিভব।

হিন্দু ও মুসলমান,—এই দুই সম্প্রদায়ের লোক নিয়াই এই যুবক-সম্মেলন। এখানে মুসলমান বন্ধুদিগকে লক্ষ্য করিয়া বিশেষভাবে কিছু বলিতে চাই। হিতৈষী বন্ধুর কথা—প্রতিবেশী ভ্রাতার কথা, শ্রুতিকটু হইলেও তাঁহারা কৃপা করিয়া প্রণিধান করিবেন, এই আমার আশা ও অনুরোধ। বাংলার মুসলমানসমাজে নিরক্ষরতা, হিন্দুর অপেক্ষা অনেক বেশী। স্বনামখ্যাত মাননীয় আগা খাঁ সাহেব অল্প দিন হইল বলিয়াছেন, ইংরেজ-শাসনের সূচনার সময়ে হিন্দুগণ ইংরেজি শিক্ষার অনুরাগী হন, কিন্তু সে-সময়,—এমনকি তাহার বহু পর পর্য্যন্তও মুসলমানেরা তৎপ্রতি বীতরাগ ছিলেন। ইহা তাঁহাদিগের প্রথম সাংঘাতিক ভুল। তৎপর প্রধানতঃ হিন্দুরা উদ্যোগী হইয়া যে-সময় কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসভার প্রতিষ্ঠা করেন, তখনও এ দেশের মুসলমানেরা ঐ কংগ্রেসে যোগ দিতে বিরত থাকেন। আগা খাঁ সাহেব বলেন, ইহা মুসলমানদিগের দ্বিতীয় সাংঘাতিক ভুল। তাঁহারা এযুগেও কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ মারাত্মক ভ্রম মধ্যে মধ্যে করিতে নিরস্ত হইতেছেন না, কালে সেই সব কারণেও যে তাঁহারা যথেষ্ট ক্ষতি বোধ ও পরিতাপ করিবেন, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু নব্য মোস্লেম যুবকদিগের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তাঁহারা এখনও দেশের সকল কথা,—সকল সমস্যা নিজেরা স্ব স্ব জ্ঞান বুদ্ধি মতে স্বাধীন-ভাবে বিচার করিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন। অন্ততঃ মুসলমান সমাজে নিরক্ষরতা এবং নৈতিক দুর্গতি দূর করিবার প্রত্যেকেই যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। বঙ্গের নানা স্থানে নিত্য যে কত নারী-নির্য্যাতনের সংবাদ শোনা

যায়, শিক্ষিত মুসলমান যুবকেরা তাহার প্রতিকার জন্য অনেক কাজ করিতে পারেন। যে সকল নরপিশাচ, মুসলমান বলিয়া সমাজে পরিচয় দেয়,—অথচ স্বীয় পাশবাচারে ইস্‌লামের পবিত্র নামে দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমা লেপন করে, তাহারা বস্তুতই দেশের কলঙ্ক, বিশেষতঃ মুসলমান সমাজের কলঙ্ক। দেশে শিক্ষার বহুল বিস্তর যেমন আবশ্যক, ইস্‌লাম ধর্ম্মের মহত্ব, পবিত্রতা ও গৌরব বর্দ্ধন জন্য সেইরূপ সন্নীতি প্রচার এবং স্থলবিশেষে নরপিশাচদিগের প্রতি কঠোর সামাজিক শাসনও আবশ্যক। মোস্লেম যুবকেরা সেজন্য অবহিত হউন।

এঞ্জিনিয়ারিং চিকিৎসা প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষায় ও ব্যবসায়ে মুসলমান যুবকেরা আজও অত্যন্ত বীতরাগ। এদেশের চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে শতকরা বোধ হয় পাঁচ জনও মুসলমান নহেন। ইউনানী হেকিমি, একটি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা পথ। এদেশের চিকিৎসক-মণ্ডলী মধ্যে বোধ হয় শতকরা একজনও হেকিম নহেন। এ সম্পর্কে মুসলমান যুবকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। বাণিজ্যপোত-পরিচালন ব্যাপারে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান যুবকদিগের অধিক সংখ্যায় প্রবেশ করার কথা। কিন্তু পূর্ব্বে যে ছয়জন বাঙ্গালী যুবকের বাণিজ্যপোতে শিক্ষানবিশরূপে এবৎসর প্রবেশের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে মাত্র একজন মুসলমান,—ফরিদপুরের মোহাম্মদ হবিবুল হক্। খানসামা, খালাসী, সারেঙ্গের কাজেই কি আমাদের চরম উন্নতি? দেশে মুন্সেফ, সবজজ, ডেপুটি, উকীল, ব্যারিষ্টার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, প্রফেসর প্রভৃতি শ্রেণীতে হিন্দুর সংখ্যাধিক্য দেখিয়া বৃথা বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করিয়া তাঁহারা ঐ সকল পদ প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বাগ্রে যোগ্যতা অর্জ্জন করুন। প্রতিবেশী হিন্দুর সহিত কিরূপ ব্যবহার সুনীতি-সঙ্গত,—কিরূপ ব্যবহারই বা ইস্‌লামের শাস্ত্রানুমোদিত, তাহা উদার ও গভীর-ভাবে অনুসন্ধান ও আলোচনা করুন। মহামহিমান্বিত মুসলমান নরপতি আফগান আমির দূরদর্শী আমানউল্লা খাঁ সাহেব, সেদিন ভারতে আসিয়া মুসলমান-সমাজকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল অমূল্য কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও তাঁহারা বিশেষভাবে প্রণিধান করুন।

দেশের নিরক্ষরতা দুরীকরণ যেমন যুবকদিগের একটী প্রধান কর্ত্তব্য, সুনীতি-প্রচার, দুর্নীতের দমন, বিশেষতঃ নারীসম্ভ্রম রক্ষার জন্য বঙ্গীয় যুবকদিগের কৃতসঙ্কল্প হওয়া তেমনি বা ততোধিক প্রয়োজন। নারী-নিগ্রহ এখন আমাদের হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেরই একটী জাতীয় মহাকলঙ্ক বলিয়া বিবেচিত হওয়া আবশ্যক। ইহার প্রতিকার-জন্য প্রয়োজন হইলে যুবকগণ আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতেও সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকুন। সুখের বিষয়, ইতোমধ্যে বাঙ্গালী যুবকেরাও যে গুর্খাবীর খড়্গাবাহাদুর সিংহের পন্থানুসরণ করিতে পশ্চাতপদ বা ভীত নহেন, দুই এক স্থলে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে পারিয়াছেন।

আজ যাঁহারা তরুণ, বালক, দুদিন পরেই তাঁহারা হইবেন যুবক,—আবার কালে তাঁহারাই

হইবেন প্রৌঢ়, দেশের অন্যতম নেতা। সেদিনের ছাত্র সুভাসচন্দ্র আজই বাংলায়,—শুধু বাংলায় কেন, ভারতের অন্যতম নেতা। বাল্যের চিত্তরঞ্জন শেষজীবনে সমগ্র ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা। দেশবন্ধু দাশ, নবযুগে দ্বিতীয় দধীচির লীলা বিকাশ করিয়া বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করিবেন, একথা কেহ কি কোন দিন স্বপ্নেও মনে ভাবিয়াছিল? আজ যে সকল বঙ্গীয় যুবককে লক্ষ্য করিয়া আমি আমার এই আশা ও আকাঙ্ক্ষার কাহিনী নিবেদন করিতেছি, কালে তাহাদের মধ্যে কে কিরূপ ত্যাগ তপস্যা, সাধনা ও সিদ্ধির দ্বারা বঙ্গমাতার মুখারবিন্দ অপূর্ব্ব জয়শ্রীতে সমুজ্জ্বল করিবেন, তাহা কে বলিতে পারে? বাংলার প্রত্যেক যুবকেরই সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত ঃ—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥

একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে ত্যাগ ও সমাজসেবার যে উচ্চ আদর্শ দেশবন্ধু দেখাইয়া গেলেন পৃথিবীর সকল দেশে সকল যুগেই, তাহা অনন্যসাধারণ, দুর্ল্লভদৃশ্য। তিনি তাঁহার জীবন দিয়া, আমাদের এই বাঙ্গালী জাতির সম্ভাবনীয়তা কত উচ্চ ও মহান্, তাহা দেখাইয়া আমাদের শত্রু মিত্র সকলেরই চক্ষুদান করিয়া গিয়াছেন। ময়মনসিংহ প্রাদেশিক সমিতির গত অধিবেশনে তাঁহার সত্যাগ্রহের প্রস্তাব আমাদের গ্রহণ ও প্রতিপালন করা অসাধ্য মনে ভাবিয়া আমি তাঁহার প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করি। আমার ভাষা কিছু তিক্ত তীব্র ছিল। দেশবন্ধু তদুত্তরে যেরূপ ওজস্বিনী ভাষায়, সমগ্র হৃদয় মন দিয়া তাঁহার সেই প্রস্তাবের পোষণার্থ বক্তৃতা করেন, তাহা আজও যেন আমার কাণে বাজিতেছে। তাঁহার সেই প্রস্তাবের সমর্থন ও গ্রহণ সে সভায় একমাত্র তাঁহার সহধর্ম্মিণীই করিয়াছিলেন। কিন্তু তদবধি আমরণ তিনি যে ভাবে একনিষ্ঠার সহিত সেই দুরূহ ব্রত পালনার্থ, পরিশেষে জীবন পর্য্যন্ত আহুতি দান করেন, সমগ্র জগতের ইতিহাসেও বোধ হয় তাহার তুলনা নাই। আজ তাহার ত্যক্ত সিংহাসন অলঙ্কৃত করিবার উপযুক্ত অধিকারী আমাদের চক্ষে পড়িতেছে না সত্য। কিন্তু সেরূপ মহাপুরুষের বহুল দর্শন প্রত্যাশা করাও একান্ত অসঙ্গত ও অসম্ভব। রাজর্ষি রামমোহনের সময় হইতে এই ক্ষুদ্র একটী শতাব্দী কাল মধ্যে এই ক্ষুদ্রায়তন বাংলা দেশের নানা ক্ষেত্রে, ক্রমে একের পর আর, বহুসংখ্যক মনস্বী ও যশস্বী মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্য এবং ভাবী উন্নতির অবশ্যম্ভাবিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন ও দিতেছেন। বিধাতার কৃপায়, কালে যতীন্দ্রমোহন, সুভাষচন্দ্র বা অপর কেহ ত্যাগে ও তপস্যায়, বুদ্ধি ও চরিত্রবলে দেশবন্ধুকেও অতিক্রম করিয়া বিশ্ববাসীকে অধিকতর বিমোহিত এবং আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে শান্ত পরিতৃপ্ত করিতে পারিবেন না, কে বলিতে পারে? বিধাতা এই পতিত দুঃস্থ জাতির প্রতি বিশেষ কৃপা প্রকাশ করিতেছেন। এ কথায় সকলেরই বিশ্বাস রাখিয়া সর্ব্বদা আশা ও উৎসাহের সহিত স্ব স্ব কর্ত্তব্য-সম্পাদনে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

বৃহত্তর ও বহুতরের স্বার্থের নিমিত্ত, ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থকে অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়া, আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার জন্য দধীচির বংশধরদিগকে সর্ব্বদা প্রস্তুত ও প্রবুদ্ধ থাকিতে হইবে।

স্বীকার করি, এখন আমাদের আপৎকাল, কিন্তু কোন কোন লোকবিৎ, ইতিহাসবিৎ, রাজনীতি-বিৎ, ধর্ম্মনীতিবিৎ, ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিত বলিয়াছেন,—ভারতের গৌরবময় পূর্ব্ব ইতিহাসের পুনরভিনয়ের দিন আবার ফিরিয়া আসিতেছে—কেহ কেহ বলেন, ইতোমধ্যেই তাহার সূচনা হইয়াছে। যাঁহারা দূরদর্শী এবং সূক্ষ্মদর্শী তাঁহারা এই আশার বাণীকে অবিশ্বাস করিতে পারেন না। শত শত কোকিলের যুগপৎ পিকধ্বনি শুনিয়াও যদি কেহ বসন্ত-সমাগমের সুনিশ্চয়তায় সন্দেহ করেন, তবে তাহাকে বিকৃত-বুদ্ধি বলিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে। বিভিন্ন শ্রেণীর শত শত বিহঙ্গমের কাকলি ধ্বনি শ্রবণ করিয়াও যদি কেহ উষাসমাগমে অবিশ্বাসী হন, তবে তাঁহার সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ করাই সমীচিন। ত্যাগ এবং তপস্যাই আমাদের জাতীয় স্বভাব, স্বধর্ম্ম। ত্যাগিশিরোমণি সদাশিব, শঙ্কর শ্মশানবাসী, তাই তিনি মৃত্যুঞ্জয়। তাই সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনী আদ্যাশক্তি ভগবতী তাঁহার জীবনসঙ্গিনী—সেবিকা।

শাস্ত্র বলেন, "যুবৈব ধর্ম্মশীল স্যাৎ"। ধর্ম্ম-সাধন-সম্পদে মনুষ্যজীব জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মও সকলের এক প্রকারের নহে। আধারভেদে, শক্তি এবং সাধন সকলের সমান নয়। এ সংসারে মনুষ্য মাত্রকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। দেব-মানব, সাধারণ মানব এবং পশুমানব। শাসন, সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, নীতি শিক্ষা দানাদি দ্বারা পশু মানবকে সাধারণ মানব-শ্রেণীতে উন্নয়ন করাই বিদ্যালয়, শাস্ত্রবিধি, রাজবিধি ও সামাজিক শাসনবিধির প্রয়োজন। মানুষমাত্রেই আবার প্রকৃতি-প্রভাবে চাতুর্ব্বর্ণ্যে বিভক্ত,—কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, কেহ বা শূদ্র। দুর্ভাগ্যবশতঃ পরাধীন দেশে যাহাদিগের জন্ম, তাহারা প্রায়শই শূদ্রস্বভাব। কেহ হাইকোর্টের জজ হইলেও মনোবৃত্তিতে তিনি অল্পাধিক পরিমাণে শূদ্রস্বভাবান্বিত,—এ দেশে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যুবকদিগের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কে কোন্ বর্ণের লোক, তাহা তাঁহারা আত্মালোচনা দ্বারাই নিরূপণ করিতে পারেন। এজন্য কিছুদিন রাত্রে শয়নকালে ভগবানের সান্নিধ্য স্মরণ করিয়া, গভীর ভাবে আত্মপ্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেই যুবকেরা কে কোন্ বর্ণের লোক তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। বর্ণ নির্ণীত হইলে স্বীয় আধার ও অধিকার উপযোগী আচরণ অনুষ্ঠান করিলেই, যুবকেরা যেমন সহজে আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারিবেন সেইরূপ তৎসঙ্গে স্বীয় পরিবার, প্রতিবেশীমণ্ডলী, সমাজ ও স্বদেশেরও সাধ্যানুসারে হিতসাধন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিবেন। স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ,—পরধর্ম্ম ভয়াবহ। যিনি স্বভাবতঃ সাহিত্যিক, তাঁহার স্বীয় প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হইলে ইঞ্জিনিয়ার বা ব্যবসায়ীর কর্ম্মে লিপ্ত না হওয়াই সঙ্গত। কামার মানুষের কুমারের কাজ,—পরধর্ম্ম, সুতরাং নিষ্ফল ও কষ্টপ্রদ। এবিষয়ে অভিভাবকদিগের দায়িত্বও কম নহে। বর্ণ নির্ণীত হইলে পর, অভিজ্ঞ আচার্য্য,—সদ্গুরুর

সাহায্যে সুগম পন্থা নির্দ্দেশ আবশ্যক। সদ্‌গ্রন্থপাঠেও শিক্ষার্থী সাধক অনেক সাহায্য পাইতে পারেন। জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত, কর্ম্মী,—যিনি যেরূপ আধার, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা প্রভৃতি নানা সদ্‌গ্রন্থে তিনি আপনার উপযোগী অনেক কর্ম্ম-সাধন-সঙ্কেত পাইতে পারেন। দেব-মানবের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অনুসন্ধিৎসু যুবকেরা ৺উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের সঙ্কলিত "শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম" নামক উপাদেয় গ্রন্থখানি অগ্রে পাঠ করিলে শ্রীকৃষ্ণের জীবনী উপলব্ধি-সম্পর্কে প্রবেশ পথ পাইতে পারেন। সকল ক্ষেত্রেই কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। তপস্যার সুযোগ এবং সুপন্থাও সর্ব্বত্র আছে। কিন্তু সুযোগ, সময়মত একান্তচিত্তে গ্রহণ না করিলে, কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হইতে পারে না। আশা, বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার।

"যিনি মহারাজা, বিশ্ব যাঁর প্রজা,
জাননারে মন আমি পুত্র তাঁর।
আমি সামান্যত নই, রাজপুত্র হই,
পিতার ধনে আমার পূর্ণ অধিকার॥"

নিজেকে ছোট মনে ভাবা, আত্মোন্নতির মহা অন্তরায়। আমি সমৃদ্ধ পরিবারে জন্মি নাই, কলিকাতা বা কোন বড় সহরে জন্মি নাই, ইয়োরোপ বা আমেরিকায় জন্মি নাই, নচেৎ আমি এটা করিতে পারিতাম, ওটা করিতে পারিতাম ইত্যাদি ধারণা অসার অপদার্থেরাই করিতে পারে। বিধি-দত্ত শক্তি ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করাই মানুষের কাজ।

সম্মিলনের প্রতি যুবকেরা সমাদর প্রদর্শন করিতেছেন, ইহা সময়ের একটী বিশেষ শুভ চিহ্ন। সম্মিলনে মহাশক্তির আবির্ভাব ও সঞ্চার হয়। ইহা দ্বারা পরস্পর সহানুভূতি বাড়ে, সাহায্য লাভ হয়, সংযম বৃদ্ধি হয়, নীতি ও নেতার প্রতি বশ্যতা-বুদ্ধির বিকাশ হয়, বিদ্বেষ এবং অহমিকার হ্রাস হয়। দশজন মিলিত হইয়া কোন শুভ কাজ বা বৃহদনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার প্রধান উপায় এই সম্মিলন। মানুষে মানুষে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু যখন কোন শুভকার্য্য সাধনের নিমিত্ত তুমি স্বয়ং ইচ্ছা করিতেছ, যদি অপর কাহাকেও সেইরূপ কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত ইচ্ছুক দেখ, তবে অন্যান্য বিষয়ে শত পার্থক্য থাকিলেও, অন্ততঃ সেই একটী শুভকার্য্য সাধন জন্য তাঁহার সহিত সম্মিলিত হওয়া আবশ্যক। সম্মিলনের গুণেই নেতৃত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং নেতার বশবর্ত্তী হইতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মে। যুবকদিগের মধ্যে Nil admirariর ভাব বড় সাঙ্ঘাতিক। মনিষী ভূদেব বলেন, প্রকৃতিস্থ থাকিলে আমরা ছোটকেও বড় করিয়া লইতে পারি, যেমন আপনারা আজ আমাকে বড় করিয়া লইয়াছেন। আমাদের মধ্যে কাহাকেও বড় দেখিবার এবং বড় করিবার চেষ্টা করিতে করিতে আমাদের মধ্যেই প্রকৃত বড়লোক আরও জন্মিবেন। যেদেশে অসূয়ার আধিক্য, সেদেশে প্রকৃত

বড়লোক জন্মিতে পারে না। আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ, দেশবাসীর বিদ্বেষ বিষে জর্জ্জরিত না হইলে নিশ্চয়ই আরও অনেক বেশী কাজ করিতে পারিতেন। এদেশের জল বায়ুর গুণে প্রকৃত বড়লোকের অঙ্কুর নিয়তই উদ্গত হইয়া থাকে। আপনাদের যুবকদের হৃদয়ে এমন একটী আশা সুদৃঢ় হওয়া আবশ্যক, যে আমাদের অধঃপাত-নিবারণ, অবস্থার উৎকর্ষসাধন, হৃদয়ের ক্ষোভ-শান্তন করিবার জন্য স্বজাতিমধ্যে একজন সর্ব্বগুণান্বিত নেতৃ-মহাপুরুষের আবির্ভাব অচিরে অবশ্যই হইবে। সেই আশা, বিশ্বাসে পরিণত হওয়া প্রয়োজন। এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হইলে আমাদের কার্য্যকলাপ, পরস্পর ব্যবহার এবং মানসিক ভাবও তদনুকূল বিশিষ্টতা লাভ করিবে। নেতৃ-পুরুষের আবির্ভাব কোথায় হইবে, তাহা একমাত্র ভগবান্‌ই জানেন। সেই ঘটনা আমার মধ্যেও হইতে পারে, এ দেশের প্রত্যেক যুবকেরই মনে মনে এরূপ আশা ও দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে হইবে এবং তজ্জন্য নিজ বাসগৃহ, দেহ, মন, বুদ্ধি, সেই আকাঙ্ক্ষিত আবির্ভাবোন্মুখ মহাপুরুষের সম্যক্ উপযোগী করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিতে হইবে। বহুসংখ্যক ব্যক্তির দেহ, হৃদয়, মন তাদৃশ উন্নত, পবিত্র এবং একাগ্র হইলেই নেতৃ-মহাপুরুষের আবির্ভাব সহজ, সুনিশ্চিত ও সত্বর হইবে। একই উদ্যমে কোন দেশের বহুসংখ্যক ব্যক্তির চিত্ত উন্নত ও প্রবল আকাঙ্ক্ষা-পূর্ণ না হইলে সেদেশে প্রকৃত মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিতে পারে না। আশা, অধ্যবসায়, একাগ্রতা, বহুজনহিতায় উদার উচ্চচিন্তার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার বৃদ্ধির জন্য সকলেই যুগপৎ সাধনা করাই এখনকার যুবকদের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য।

আমাদের সকলের এই মন্ত্র হউক—

প্রাতরারভ্য সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্॥

যৌবন বড়ই দরদী। তাহাদিগকে আঘাতে যেমন বাজে, এমন অপরকে নয়—তাই সকল দেশে, সকল কাজে যুবকেরাই বেশী অগ্রসর হয়। এদেশে একবার তরুণদের বুকে বড়ই বিষম বেজেছিল, যখন তারা দেশের settledকে unsettled ক'রেছিল। তারা তখন এমন জোর ক'রে সে কথা বলেছিল যে, শেষে তাই হ'য়েও ছিল। যৌবনের বুকে বাজে যেমন বেশী, তার জোরও ঠিক তেমনি। আর তেমনি বাজে বলেই তার জোরও সাজে, কারণ সর্ব্বত্র কাজও যে করে যৌবনই। প্রবীণ করেন পরামর্শের কাজ, কিন্তু বেদনার পতাকা বহন ক'রে পরামর্শকে সিদ্ধ সফল করে যৌবন। দেশের যৌবন আজ আবার বড় ধাক্কা খেয়েছে, তাই চারিদিকে একটা ভীষণ চাঞ্চল্য, একটা বিক্ষোভ এবং একটা আক্রোশের গর্জ্জন শুনা যাইতেছে। সে ধাক্কা কোথায়, কেন এবং কি প্রকারের, সে আলোচনার এটা স্থানও নয়,—হয়ত আবশ্যকও নয়। ব্যথা যদি তোমাদের বেজে থাকে, তবে তা

অপনোদনের ব্যবস্থা তোমাদিগকেই করিতে হইবে। গুরু পথ বলে দিতে পারেন, কিন্তু পথে চল্‌তে হবে যাত্রীকেই। এ সংসারে ফাঁকি-বাজীতে কোন মহৎ কাজই সিদ্ধ হয় না। আর বেশী কি বলিব। তোমরা খাঁটি হও, তরুণ বাঙ্গালা! কি নিয়া তুমি এ যুগের বিশ্বমানবজাতির সভায় উপস্থিত হইবে, তাহা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখ। বিশ্বের অপরাপর দেশের বলদৃপ্ত মদগর্ব্বিত জাতিসমূহ আজ লুণ্ঠকের বেশে দস্যুরূপেই তোমার দ্বারস্থ। কারণ তাহারা ভাবে ও জানে, যে তুমি দুর্ব্বল। ভীত, দুর্ব্বল, দরিদ্র, ভিখারী, কাপুরুষকে জগতে কে না ঘৃণা করে? লাঞ্ছনা করে? যে করে না, সে অতি মহৎ,—সে ত দেবতা! কিন্তু সাধারণ মানুষ অপরকে দুর্ব্বল, অজ্ঞান, ভীত দেখিলে বিদ্রূপ নিন্দা লাঞ্ছনাই ক'রে থাকে।

কিন্তু তুমি ত সত্য সত্য তেমন দুর্ব্বল নও, তুমি যে অমৃতের পুত্র। তবে আত্মবিস্মৃত, তাই এত দুঃখ দুর্দ্দশা। হে আত্মবিস্মৃত জাতি! তোমার আত্মাকে একবার জান। তোমার অতীতের গৌরবকে বর্ত্তমানে আবার তুলিয়া ধর, তপস্যায় প্রবৃত্ত হও। আত্মার সন্ধান কর;—ভারতের আত্মার সন্ধান কর, আত্ম-নির্দ্দেশ কর। ভুলে যাও দুঃখ, ভুলে যাও মৃত্যু, ভুলে যাও ভয়, তোমরা অভীঃ হও, অশোক হও, অমৃত হও, আনন্দিত হও, বড় হও,—ধর্ম্মে, জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে বড় হও, বিশ্বের সকলের সমান হও। ভারত! তুমি পুনরায় ভারত হও,—যে ভারতে ঋষিগণ সাম, ঋক্, অথর্ব্ব বেদ প্রচার করিয়াছিলেন, যে ভারতে অতুলন দর্শন, কাব্য, শিল্পের সৃষ্টি হয়েছিল, যে ভারত একদিন বল, বীর্য্য, তপস্যা, ক্ষমা, শান্তি ঔদার্য্যগুণে পৃথিবীর শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিল, তুমি পুনরায় সেই ভারত হও। পর-পদলেহন, পরদাসোচিত ব্যবহার এবং পরবাস পরিত্যাগ করে, আত্মস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। আত্মানং বিদ্ধি। তোমার স্বাভাবিক জ্ঞান, বল, ক্রিয়ায় তুমি সমৃদ্ধ হও। ঋষিদিগের বাক্যে বিশ্বাস সংস্থাপন কর—ঋষিদিগের প্রদর্শিত পথের অনুবর্ত্তন কর। তাঁহাদের সমীপস্থ হও। তাঁহাদের শিষ্যত্ব স্বীকার কর। এখনও তাঁহাদের বিদেহী আত্মা, ভারতের অরণ্যে, পর্ব্বতে, তটিনিতটে শত সহস্র আসন আস্তীর্ণ করিয়া শিষ্য-প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের সত্যবাণী এখনও এই ভারতভূমিতে কোথাও কোথাও উচ্চারিত হইয়া থাকে। প্রতি শুভকর্ম্মে এখনও তাঁহাদের আশিস্‌ বর্ষিত হয়। প্রতি প্রাতে,—অরুণোদয়কালে, এখনও সেই ঋষিপরিদৃষ্ট জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষের প্রকাশ ক্ষণতরে ঝলবিত হইয়া উঠে। সেই অমৃতময় পরম কল্যাণের উৎসধারায় স্নাত, পবিত্র, শুদ্ধ হইয়া ঋষি-চরণে বারম্বার প্রণত হও। তাঁহাদের বাণী এখনও ভারতের আকাশে বাতাসে সমীরিত হইতেছে। সেই বাণী শুদ্ধ, শান্ত, সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর। শ্রবণ করিয়া সেই বাণী মন্ত্ররূপে মনন কর, এবং তাহাই ধ্যান-সহকারে জীবনে কার্য্যে পরিণত কর। তোমাদেরই তরে সযত্ন রক্ষিত যেই তপস্যার পুণ্যপ্রভাব হৃদয়ে অনুভব কর—সে তপস্যার পুনরুদ্যাপন কর। সিদ্ধি অনিবার্য্য। কায়মনোবাক্যে

তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া এখন বিদায় গ্রহণ করিতেছি। পৃথিবীর দিন আমার ফুরাইয়া আসিতেছে। যাইবার পূর্ব্বে,—তোমাদের মধ্যে ভারতের সেই মহাগৌরবের মহোজ্জ্বল দিনের পুনরাগমন দেখিয়া যেন যাইতে পারি,—এই প্রার্থনা করি। শ্রীভগবান্ তোমাদিগকে শুভ বুদ্ধি দেন।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি

সকলে সমস্বরে বলুন—**বন্দেমাতরম্।**

মন্তব্য ও সংবাদ

তারকেশ্বর

দেশের কাজ করিতে গিয়া আমাদের ভিতর যত প্রকারের দলাদলি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাদের কি মীমাংসা হইবে না? চেষ্টা করিলেই হইবে, সত্যের প্রতি চাহিয়া নিঃস্বার্থভাবে চেষ্টা করিলেই হইবে। তারকেশ্বরের ব্যাপার সকলেরই মনে আছে. এই ব্যাপারের ফল খুব মন্দই হইয়াছে। ১৩৩৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে হুগলীর কয়েকজন দেশকর্ম্মী, যাঁহারা তারকেশ্বরের জন্য খাটিয়াছিলেন, তাঁহাদের বলিয়াছিলাম, তারকেশ্বরের ব্যাপার-সম্বন্ধে আপনাদের যাহা বলিবার আছে, যদি আমাকে লিখিয়া পাঠান, আমার বড় উপকার হয়, ব্যাপারটা বুঝিবার জন্য আমার নিজেরই একটা আগ্রহ আছে। যে-কারণেই হউক, তাঁহারা পাঠাইবেন বলিয়াও পাঠান নাই। (১৩৩৪ সালের পৌষমাসের বীরভূমিতে এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলাম।) দেশকর্ম্মীদের খবর পাইলাম না, কিন্তু ১৩৩৩ সালের মাঘ মাসের 'হিতবাদী' পত্রে ব্রাহ্মণ সভার যাহা বক্তব্য তাহা পাইলাম, বীরভূমি'তে তাহা পুনর্ম্মুদ্রিত হয়। (৮ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা)। বীরভূমি'তে সেই বিবরণী পড়িয়া কোন কোন বন্ধু পত্র লিখিলেন, তুমি এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ-সভার পক্ষাবলম্বন করিয়া অন্যায় করিয়াছ। পক্ষাবলম্বনের কথা নহে; সেই বিবরণী-প্রকাশের হেতুরূপে লিখিয়াছিলাম—"সত্য কথা প্রচারিত হউক, মিথ্যা ও চাতুরী বিধ্বস্ত হউক, দেশের জন-সাধারণের মত সত্যের আলোকে গড়িয়া উঠুক।"

দেশ-হিতকর প্রত্যেক কার্য্যেই প্রধান অসুবিধা উদাসীনতা, উদাসীনতা-প্রসূত অজ্ঞানতা। তারকেশ্বরে যে কি হইল, তাহা কয়জন লোক জানে? যখন দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তখন সমগ্র দেশের লোক উৎসাহিত হইয়া সাহায্য করিয়াছিল, তাহার পর তালপাতার আগুন নিভিল তো একেবারেই ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

আমাদের বিশ্বাস—(এই বিশ্বাস কখনও যদি অপনোদিত হয়, তাহা হইলে সুখী হইব)—'বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা' নামক একটি সভার নামে যাঁহারা শেষে আসিয়া স্বর্গীয় দেশবন্ধুর বিরোধিতা করেন, তাঁহারা কাজটা মোটেই ভাল করেন নাই। হয়ত তাঁহারা না বুঝিয়াই ইহা করিয়াছিলেন, কিন্তু কাজটা মোটেই ভাল হয় নাই। তাঁহারা যে সরকারী কর্ম্মচারী কয়েকজনের প্রেরণায় এই কার্য্যে নামিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। "বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা" বাঙ্গালাদেশের ব্রাহ্মণগণের, এমন কি বাছাই করা আচারবান্ ব্রাহ্মণগণেরও প্রতিনিধি সভা নহে; ইহা একটি কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান; আমলাতন্ত্রের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে চলিতে প্রস্তুত, এই ব্যাপারের দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে 'ব্রাহ্মণ' নামের অগৌরব হইয়াছে, হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষের মাত্রাও বাড়িয়া গিয়াছে। তারকেশ্বর-সত্যাগ্রহে যাঁহারা নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, নেতৃবর্গের ব্যবস্থানুসারে যাঁহারা কারাবরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ-সন্তান এবং জাত-ব্রাহ্মণের দাবী পরিত্যাগ করিতে অনেকেই অসম্মত। কোনও প্রতিষ্ঠান "বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা" এই নাম লইয়া, 'বাঙ্গলা দেশের ব্রাহ্মণগণের আমরা প্রতিনিধি' এই দাবীর জোরে যদি সত্যাগ্রহীদের বিরোধিতা করিয়া থাকে, তাহা হইলে সত্যাগ্রহীদের ভিতর যাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের আর 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিবার কোনই অধিকার থাকিল না। এই একটি বেশ ভাবিবার কথা। যাহা হউক এ-সব কথার আলোচনা পরে হইবে।

হুগলীর দেশকর্ম্মী বা সত্যাগ্রহীদের বলিয়াছিলাম, তোমাদের যাহা বলিবার আছে, আমাকে জানাইলে বড়ই সুখী হইব। আমার এই অনুরোধ একজন রাখিয়াছেন। তাঁহার নাম **শ্রীদুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়**। তাঁহার পত্রখানি রাখিয়া দিলাম। পত্রের শেষাংশটুকু নিম্নে মুদ্রিত হইল।

"বিশ্বানন্দ স্বামী ও সচ্চিদানন্দ স্বামী নামক দুইজন, কয়লাঘাটের কুলীদল ও কয়েকজন সাহসী যুবক লইয়া মোহান্তের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের আয়োজন করেন। ঐ সকল যুবকের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, **সত্য, স্বর্ণ** প্রভৃতি। অনতিকাল মধ্যেই হুগলি কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষগণ সত্যাগ্রহ-সম্বন্ধে আয়োজন করিতে লাগিলেন। ওদিকে ধর্ম্ম-স্বরাজ্যকামী ৺দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ধর্ম্মের গ্লানি দূরীকরণ-মানসে সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া অগ্রসর হইলেন। পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী, প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় প্রভৃতি বিখ্যাত বক্তাগণ মোহান্তের নৃশংস অত্যাচার-কাহিনী সাধারণে প্রচার করিতে লাগিলেন।

সহস্র যুবক দেশবন্ধুর একমাত্র পুত্র ৺চিররঞ্জনের সহিত কারাবরণ করিলেন। অবিলম্বে চিত্তরঞ্জনের আদেশে রাষ্ট্রীয় বাহিনী B. P. V. C. ও H. D. V. C. (হুগলী ডিষ্ট্রীক্ট ভলান্টিয়ার কোর) ও তারকেশ্বরের শান্তি-রক্ষার্থ সজ্জিত হইল। বাজারের একধারে মেডিক্যাল ক্যাম্প খুলা হইল। হরিপালের ডাক্তার কল্যাণ-সঙ্ঘের সম্পাদক, শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস এই Campএর officer-in-charge নিযুক্ত হইলেন।

সত্যাগ্রহীগণ ঘোষণা করেন, মোহান্ত যে প্রাসাদে থাকিত, ঐ প্রাসাদ ও তারকেশ্বরের সম্পত্তি সাধারণের অধিকারে। ঐ অধিকার প্রমাণীকৃত করিবার জন্য উহারা প্রাসাদে দলে দলে প্রবেশ করিতে গিয়া পুলিশ-কর্ত্তৃক ধৃত হইতে লাগিল। যাত্রীগণ পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গেলে নিস্তার নাই। "দুধ পুকুরে" একবার কয়েকজন যাত্রীকে ও স্বেচ্ছাসেবককে মোহান্তের লোকেরা আঘাত করে। সমগ্র বঙ্গবিহার ঐ আন্দোলনে ঝুঁকিয়াছে দেখিয়া মোহান্ত সতীশ গিরি পুলিশ ফৌজ ব্যতীত অসভ্য উলঙ্গ নাগা ভাড়া করিয়া আনাইল। নাগারা গুণ্ডা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকগণ জীবন পণ ব্রত লইয়া গিয়া হঠিল না এক পাও।

বাবা তারকনাথের প্রসাদী ভোগ, সকল যাত্রীদের অদৃষ্টে মিলিত না বলিয়া অভিযোগ করায় বিশ্বানন্দ, সত্য, সেই ভোগ জোর করিয়া আদায় করে। সেইজন্য মোহান্ত তাহাদের বিরুদ্ধে শ্রীরামপুরের হাকিমের বিচারালয়ে অভিযোগ আনয়ন করে। সত্যের মাথা ফাটিল, স্বর্ণের বুকে ছুরি লাগিল—আরও অনেক সত্যাগ্রহীর জেল হইল। মোহান্তের কিছুই হইল না। দেবতার প্রসাদ সকলের অধিকারে, সেই নরনারায়ণের দ্রব্য সে অপহরণ করিতে লাগিল। তাহার কিছুই হইল না। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর উপর এইবার আক্রমণ আরম্ভ হইল। উপরে প্রাচীর হইতে মোহান্তের গুণ্ডারা ঢিল পাথর ছুড়িতে লাগিল। স্বেচ্ছাসেবকগণ আহত হইতে লাগিলেন—কিন্তু উৎসাহ ভঙ্গ হইল না। জন্মাষ্টমীতে পৈশাচিক-লীলা চরম সীমায় উঠে। ঐদিন বুরোক্রাটিক গভর্মেণ্টের আদেশে তীর্থস্থানে গুলি চলিল। কিন্তু এইখানেই পশুরাজের পরাজয় ও সত্যাগ্রহের জয়। মোহান্ত সন্ধি প্রার্থনা করিতে লাগিল। সর্ত্ত হইল—সতীশগিরি গদীত্যাগ করিবে; দেশের কার্য্য করিবে ও তার শিষ্য প্রভাতগিরি মোহান্ত হইবে। সমস্ত সম্পত্তি সাধারণের হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণসভা ইহাতে রাজী হইলেন না। গভর্মেণ্ট Receiver নিযুক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণসভা ইংরাজের বিচারালয়ে প্রভাতগিরির বিপক্ষে দাঁড়াইলেন। ফলে দাঁড়াইল এই, ব্রাহ্মণসভার জয় হইল বটে কিন্তু সতীশগিরি ফিরিয়া আসিল। ব্রাহ্মণসভা কংগ্রেসকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের অজুহাত ছিল এই যে কংগ্রেস-পরিচালকগণ ইংরাজী-সভ্যতা-সম্পন্ন, কিন্তু খাঁটী বিদেশীয় বিধর্ম্মীর সঙ্গে স্বদেশীয়গণের বিপক্ষে যোগ দেওয়ায় গরল উঠিল।"

এই প্রকারের আরও পত্র প্রয়োজন। যাহারা দেশের কাজে খাটিয়াছে ও দুঃখ সহিয়াছে, তাহাদের মর্ম্মকথা শুনিতে আমরা ন্যায়তঃ বাধ্য। তাহাদের ভুল হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের সাহসের ও ত্যাগের একটা মূল্য আছে, ইহা যেন আমরা সর্ব্বদাই স্বীকার করি।

যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই। সংস্কার যে প্রয়োজন, সে বিষয়ে সকলেই একমত। বাঙ্গালা দেশে অনেক তীর্থ আছে, অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি ও দেবস্থান আছে। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাও সংস্কার চাহেন, সত্যাগ্রহী যুবকেরাও সংস্কার চাহেন, আবার মঠাধীশগণও অনেকে সংস্কার চাহেন, গৃহবিবাদ যে আত্মহত্যা তাহাও সকলে বুঝেন। এখন প্রয়োজন, তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ করিয়া যাঁহারা কষ্ট সহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা নিষ্ঠাবান্, সত্যই যাঁহারা দেবস্থান-সংস্কারের প্রয়াসী, এবং ব্রতধারী হইয়া যাঁহারা এই কার্য্য করিতে চাহেন, তাঁহারা সংঘবদ্ধ হউন। সংঘের নাম হউক **"তীর্থ-সংস্কার-সমিতি"**। সংস্কার ইহার উদ্দেশ্য, বিবেচনাহীন সংহার নহে। এই সংঘ সম্ভব হইলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের আনুগত্য করিতে পারেন, মঠাধীশ-সম্মিলনের সহিত মিত্রভাবে মিশিতে পারেন। **"বিশ্ব-ব্রাহ্মণ-শিক্ষা-সমিতি"** হইতে এই একটি কর্ম্মপন্থা প্রদর্শিত হইল। দেশবন্ধু দাস মহাশয় বাঙ্গালার গ্রামগুলিকে সংস্কৃত ও উন্নত করিতে চাহিয়াছিলেন, দেবস্থানগুলির প্রকৃত সংস্কার হইলে এই কার্য্য অনায়াসেই হইতে পারে। প্রত্যেক দেবস্থান বা মঠকে কেন্দ্র করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির হিতসাধনের সর্ব্বপ্রকার আয়োজন করা কঠিন কার্য্য নহে। এই প্রকারের একটি সমিতি গঠন করিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন কর্ম্মী-নির্ব্বাচন। যাহারা ব্রতধারী নহে, চিন্তা-পূর্ব্বক ধীরভাবে কর্ম্ম করিতে যাহারা অক্ষম, হুজুগ্ ও দলাদলিসৃষ্টি যাহাদের পেশা বা জীবিকার্জ্জনের একমাত্র উপায়, এই প্রকারের কর্ম্মী জুটিলেই কাজ নষ্ট হইবে, হিতে বিপরীত হইবে। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার আশ্রমের জন্য যে-ভাবে কর্ম্মী নির্ব্বাচন করেন, ঠিক্ সেই ভাবে কাজ আরম্ভ করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন, লোকশিক্ষা। জনসাধারণ অতিশয় অজ্ঞ, বিশেষতঃ ধর্ম্মসম্বন্ধে তাহারা কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত। জনসাধারণের এই অজ্ঞতা ও তজ্জাত উদাসীনতাই সর্ব্ববিধ সংস্কারের অন্তরায়। এই প্রকারে সমগ্র বঙ্গদেশের জন্য একটি **"তীর্থ-সংস্কার-সমিতি"** স্থাপনায় যাঁহাদের সহানুভূতি আছে, তাঁহারা এই পত্রিকার সম্পাদকের সহিত পত্র-ব্যবহার করিতে পারেন। আপাততঃ সিউড়ি পোঃ, বীরভূম ঠিকানায় পত্রাদি লিখিবেন।

কবি জয়দেবের পরিচয়

১৩৩৪ সালের ২৩শে আশ্বিন হইতে ৪ঠা কার্ত্তিক পর্য্যন্ত যশোহর ও ফরিদপুর জেলার সঙ্গম-স্থলে তিনখানি গ্রামে ছিলাম। কাশিয়ানি বড় গ্রাম, সেখানে ছিলাম ৮ দিন, আর একদিন ছিলাম পার্শ্ববর্ত্তী পিঙ্গলা গ্রামে। এই দুই খানি গ্রাম ফরিদপুর জেলায়। 'মহিষার ঘোপ' গ্রামে ছিলাম তিন দিন, উহা যশোহর জেলায়। এই স্থানটি রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানীর নিকটবর্ত্তী। পিঙ্গলা গ্রামে রাঢ়ীয় শ্রেণী, বাৎস্যগোত্রীয়, কাঞ্জিলাল উপাধি, অনেক সম্ভ্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণের বাস। ইঁহাদের পারিবারিক কিম্বদন্তী, কবি জয়দেব এই বংশেরই লোক। পূর্ব্বে রাঢ় দেশে বীরভূমে কেন্দুবিল্ব গ্রামেই ইঁহাদের বাস ছিল, নবদ্বীপ মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে ইঁহারা এই অঞ্চলে উঠিয়া আসিয়াছেন। নবদ্বীপের বিখ্যাত কবি গঙ্গাদাসও এই বংশের লোক। রঘুদেব, গঙ্গাধর, লক্ষণ, ঘনশ্যাম, গোপীনাথ, প্রতাপ নারায়ণ প্রভৃতি বহু বহু পণ্ডিত, কবি ও সাধক এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গালার ইতিহাসের জন্য এই বংশের বংশতালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক।

লণ্ডনে হিন্দুমন্দির

'ওয়েষ্ট হ্যামষ্টেড' এ শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরের জন্য স্থান সংগ্রহ করা হইয়াছে। ঐ মন্দিরে একটি বড় পূজাগৃহে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সীতা ও হনুমানের মর্ম্মরনির্ম্মিত মূর্ত্তি রক্ষিত হইবে। ভিতরে থাকিবে একটি উপাসনাগার। একটি হোটেলও থাকিবে, তাহাতে যতদূর সম্ভব হিন্দু মতে আহারের ব্যবস্থা হইবে। হিন্দুর উৎসবগুলি নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। লণ্ডনে বর্ত্তমান সময়ে প্রায় তিন হাজার হিন্দু আছেন। ভারতের পার্শিগণও লণ্ডনে একটি অগ্নিদেবের মন্দির করিতেছেন। ইংলণ্ডে পার্শির সংখ্যা প্রায় পাঁচশত।

বীরভূমি ৯—৩, আষাঢ়, ১৩৩৫

জন্মলীলা-রহস্য

১। লীলা

যদি বলা যায় ভগবান্ আসিয়াছিলেন, তাহা হইলে অনেকে অনেকরূপ আপত্তি করিবে, অনেকে অনেকরূপ কথা বলিবে। এই সব আপত্তির কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কাজেই আমরা বলি, মানুষ দেখিয়াছিল ভগবান্‌কে। মানুষ, তাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম দেখিয়াছিল। মানুষের এই যে দর্শন, ইহারই নাম 'বিদ্বদনুভূতি'। বিজ্ঞজনের এই অনুভবই সত্য। এই অনুভব স্বীকার করিয়া আজিকার মানুষ আমরা, আমরাও বলিতেছি ভগবান্ আসিয়াছিলেন। মানুষের দেশে মানুষের বেশে আসিয়া মানুষের সাথে মিশিয়া মানুষেরই মতো কত শত কর্ম্ম তিনি করিয়াছিলেন। ভগবানের এই জন্মের ও কর্ম্মের কথা হাজার হাজার বছর ধরিয়া মানুষ বিস্মিত ও উল্লসিত হৃদয়ে শুনিতেছে। পৌরাণিক ঋষি এই জন্ম ও কর্ম্মের কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, কত ভক্ত সাধু ও কবি এই কথা নিজ নিজ হৃদয়ের অনুভবের দ্বারা নব নব আকারে প্রচার করিয়াছেন। এই কথা নিত্যই নূতন, পুরাতন হইতেছে না। এই কথা শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্ম্মের কথা, যেন ভগবানেরই মতো 'বিশ্বতোমুখ'—ইহার অর্থের শেষ নাই, আজ একজন একভাবে ব্যাখ্যা করিতেছে, সহৃদয় শ্রোতারা শুনিয়া ধন্য ধন্য করিতেছে, আবার কিছুদিন পরে আর একজন আসিয়া সেই কথাই আর এক নূতনভাবে ব্যাখ্যা করিতেছে, লোকে বলিতেছে, পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্য, আজ যাহা বলা হইল তাহাও সত্য। কিন্তু কথার শেষ নাই, ভবিষ্যতে আরও কত নূতন নূতন ব্যাখ্যা হইবে। ভগবান্ অনন্ত, তাঁহার কথাও অনন্ত। ভগবান চিরনবীন, তাঁহার কথাও চিরনবীন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন, ভগবানের কথা কেবল কথা নহে, সংসার-সন্তপ্ত জনের পক্ষে ইহা

অমৃত-স্বরূপ ; এই কথা পাপনাশক ; যাঁহারা কবি, তাঁহারাই এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। এই কথা শ্রবণমঙ্গল, শ্রীমৎ, মানবজগতে এই কথা যাঁহারা প্রচার করেন তাঁহারাই প্রকৃত দাতা।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং।
কবিভিরীরিতং কল্মষাপহং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥ ভা ১০।৩১।৯

এত দীর্ঘকাল ধরিয়া যে-কথার এতই সমাদর, লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রাণ ভরিয়া যে-কথা শুনিয়াছে এবং শুনিতেছে, অগণ্য ও অসংখ্য ভাবুকের ও কবির হৃদয় যে-কথায় উল্লাসে নাচিয়া উঠিয়াছে, সেই কথার চরণে প্রণাম করা সকলেরই উচিত। আস্তিক হও আর নাস্তিক হও, লীলাবাদী হও আর শূন্যবাদী হও, অতি-আধুনিক হও আর প্রাচীন-পন্থী হও, মানুষ যখন তুমি, তখন মানুষের অতিপ্রিয় এই কথা, যাহাকে 'কথামৃত' বলা হইয়াছে এবং এখনও অনেকে অমৃতেরই মতো যে-কথা শুনিতেছে, শুনিয়া আশা পাইতেছে, বল পাইতেছে, আনন্দ পাইতেছে, সেই কথা শ্রদ্ধার সহিত শোনা আবশ্যক।

তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষ-শেষ সরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্নস্পৃশন্ত্যশনতৃড্ ভয়শোকমোহাঃ॥ ভা ৪।২৯।৪০

মহারাজ, সাধুর মুখ হইতে মধুসূদনের চরিত্রকথার অমৃতসার নদী সর্ব্বদা প্রবাহিত হয়। যাঁহারা অন্য বাসনা ত্যাগ করিয়া গাঢ়কর্ণে তাহা শ্রবণ করেন, ক্ষুধা, পিপাসা, ভয়, শোক, মোহ প্রভৃতি তাঁহাদের স্পর্শ করে না।

ভগবান্ আসিয়াছিলেন। মানুষের দেশে মানুষের বেশে জন্ম লইয়া মানুষেরই মতো কর্ম্ম করিয়াছিলেন। পৌরাণিক ঋষি শ্রীভগবানের এই জন্ম ও কর্ম্ম লিখিয়া রাখিয়াছেন, ভক্তসাধকেরা তাহা শুনিতেছেন ও ভাবিতেছেন।

ভগবানের এই জন্ম ও কর্ম্ম, সাধারণ মানুষের জন্ম ও কর্ম্মের ন্যায় প্রাপঞ্চিক

ঘটনামাত্র নহে, এই জন্মের ও কর্ম্মের একটা নিত্যতা আছে, ইহাই মহর্ষিগণের উপদেশ। ঘটনার আবার নিত্যতা কিরূপ? ভাবিবার কথা। ভাবুন, বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্ম্মের নাম লীলা। লীলা কাহাকে বলে? প্রাচীন কালের আচার্য্য বলিলেন—নিত্যের প্রাকট্যের নাম লীলা। যিনি অসীম, তিনি সীমার মধ্যে খেলা করিতেছেন। যিনি দেশ ও কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ বা পরিচ্ছিন্ন নহেন, সকল দেশে সকল কালে যিনি সমান ভাবেই বিদ্যমান, তিনি একটা নির্দ্দিষ্ট দেশে ও নির্দ্দিষ্টকালে আবির্ভূত হইয়া নানারূপ কাজ কর্ম্ম করিয়া আবার লুকাইলেন। চলিয়া গেলেন না, কারণ তিনি যখন সর্ব্বদাই সর্ব্বব্যাপী, তখন চলিয়া যাইবেন কোথায়? তিনি লুকাইলেন, বা অপ্রকট হইলেন। ইহারই নাম লীলা।

অনেকেই তাঁহাকে দেখিলেন, তাঁহার সহিত সম্বন্ধেও আসিলেন, কিন্তু সকলেই যে বুঝিতে পারিলেন, তাহা নহে। কেহ কেহ একেবারেই বুঝিলেন না, সুতরাং উল্টা বুঝিলেন। কেহ কেহ কিছু কিছু কম বেশী নিজের নিজের শক্তি অনুসারে বুঝিলেন।

গীতায় আছে—মানুষের প্রকৃতিতে একটা অজ্ঞানজ তমঃ বা অজ্ঞানতার অন্ধকার আছে। আর ভগবান্, মানুষের ভিতরে থাকিয়া জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া মানুষের সেই প্রকৃতিগত অজ্ঞানতা দূর করেন। মানুষের ভিতরের ভগবান যে-পরিমাণে জাগিবেন, মানুষ সেই জাগ্রত ভিতরের ভগবানের সাহায্যে বাহিরের ভগবান্‌কে চিনিতে ও ধরিতে পারিবে। এই সব কথা গীতায় খুব ভাল করিয়া বার বার বলা হইয়াছে। কাজেই, এই অনিত্যের দেশে, নিত্য যখন আসিলেন, জন্ম লইলেন ও কর্ম্ম করিলেন, অনেকে কিছুই বুঝিল না, বা উল্টা বুঝিল; অপরে, যাঁহার যেমন শক্তি, ততটুকু বুঝিলেন। সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছিলেন, কেবলমাত্র একজন। কিন্তু, শ্রীশুকদেবই শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট করিয়া তাঁহার নাম করিলেন না। যিনি, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিলেন, তিনি সেই নিত্যের সহিত ভিন্ন হইয়াও স্বরূপে অভিন্ন। অর্জ্জুন গীতায় শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছেন, তুমিই কেবল নিজেকে জান, আর কেহই তোমাকে সম্পূর্ণরূপে জানে না।

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পরমেশ্বর।

ইহা অর্জ্জুনের কথা। কিন্তু, পরবর্ত্তী কালের ভক্তেরা আরও ভিতরের কথা বলিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ঠাকুর, তোমাকে অন্যে জানিবে কি? তুমি নিজেই নিজেকে জান না,

নিজেই নিজেকে জানিবার জন্য চিরকাল চেষ্টা করিতেছ কিন্তু জানিয়া শেষ করিতে পারিতেছ না, ইহাই তোমার নিত্যলীলা।

"নিত্যের প্রাকট্যের নাম লীলা"। ইহাই মূল সূত্র। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা এখনও হইতেছে। তখন যেখানে প্রকট ছিল, এখন সেখানে অপ্রকট; আবার তখন যেখানে অপ্রকট ছিল এখন সেখানে প্রকট। প্রকট = Manifest, অপ্রকট = Unmanifest। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা যখন এখনও হইতেছে, তখন চেষ্টা করিলে এখনও তাহা দেখা যায়। ইহাই লীলার সাধন।

অতএব, লীলার সহিত সংশ্লিষ্ট যত স্থান ও ব্যক্তি, সবই নিত্য। কিছুদিনের জন্য আমাদের এই মানবের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন, এখন তাঁহারা প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞানের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখনও আছেন। অপরোক্ষ বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান যাঁহাদের আছে, তাঁহারা এখনও ইচ্ছামত সেই সব স্থান পাত্র ও ঘটনা দেখিতেছেন। আর আমরা,—এই সাধারণ ইন্দ্রিয়-সর্ব্বস্ব মানুষেরা, সেই সব স্থান, পাত্র ও ঘটনা লইয়া যদি দৃঢ়রূপে চিন্তা করি, তাহা হইলে আমাদেরও সেই অপরোক্ষ জ্ঞান বিকশিত হইবে এবং আমরাও তাহা দেখিতে পাইব। ইহাই লীলার সাধন।

মথুরা বলিয়া যেমন একটি স্থান আছে, তেমনি মানবচৈতন্যের একটি অবস্থাও আছে। বৃন্দাবনও তাই, কুরুক্ষেত্রও তাই, দ্বারকা এবং প্রভাসও তাই। চৈতন্যের বা অপরোক্ষ অনুভবের ঐ অবস্থা এবং এই স্থান, এই দুইয়ের মধ্যে যখন কোন ব্যবধান থাকে না, উভয়ে মিশিয়া যখন এক হইয়া যায়—The place and the State of Conciousness are combined in one—সেই সময়েই লীলার প্রকটাবস্থা। ইহারই নাম ভিতর ও বাহিরের মিলন। সিদ্ধ কবি চণ্ডীদাসের ভাষায়—"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর"। উপনিষদে সাধকের এই অবস্থাকে উভয়তঃ-প্রাজ্ঞ অবস্থা বলে।

কংস, শিশুপাল, দন্তবক্র, জরাসন্ধ বা যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন বা ভীষ্ম কুন্তী বা নন্দ যশোদা, ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সত্যই তাঁহারা মানুষ হইয়া একদিন সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। আজ তাঁহারা নাই। কিন্তু একেবারেই যে নাই তাহা নহে। সেদিন তাঁহারা প্রকট হইয়াছিলেন, আজ অপ্রকট হইয়া তত্ত্বরূপে (as principles) তাঁহারা রহিয়াছেন। তত্ত্বরূপে তাঁহারা নিত্য,

(Eternal as principles), ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা পাত্ররূপে অনিত্য। সেই সব নিত্য-তত্ত্ব যখন প্রকট হয়, তখনই লীলা হয়।

এইজন্যই শ্রীভগবান্ গীতায় বলিলেন, আমার জন্ম ও কর্ম্ম 'তত্ত্বতঃ বুঝিবে। শ্রীধর স্বামী বলিলেন অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া বুঝিবে। বৈষ্ণব কবি বলিলেন 'বাহিরের দুয়ার বন্ধ করিয়া ভিতরের দুয়ার খুলিয়া দিবে'। সবই এক কথা।

২। কংস-তত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বুঝিতে হইলে প্রথমেই কংসকে বুঝিতে হইবে। কংস অন্ধকার, শ্রীকৃষ্ণ আলো। আমরা অন্ধকারে আছি, আলোতে যাইতে চাই। অন্ধকার জ্ঞাত বা অনুবাদ, আর আলো অজ্ঞাত বা বিধেয়। অনুবাদের সাহায্যেই বিধেয়কে জানিতে হইবে, অতএব কংস কি বুঝিলে, আমরা বুঝিব,—কৃষ্ণ কি নহেন। কৃষ্ণ কি নহেন, তাহা না বুঝিলে, কৃষ্ণ কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারিব না। কাজেই শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে কংস কি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। ঐতিহাসিক কংস-সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন নাই—কংসতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। কংস একটি নিত্য সত্য, বিশ্ব-ব্যবস্থায় তাহার একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, তাহার একটা ক্রিয়া আছে। কংস কি, তাহার স্থান কোথায়, তাহার ক্রিয়া কি, ইহাই আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপাখ্যানটি আলোচনা করুন। বিবাহের পরদিন নব-বিবাহিতা দেবকী, স্বামী বসুদেবের সহিত রথে চড়িয়া শশুরবাড়ী যাইতেছেন, তাহারই শোভাযাত্রার সমারোহ। কংস,—রথের সারথী। দৈববাণী হইল, ওরে মূর্খ কংস, ভগিনীকে রথে চড়াইয়া লইয়া যাইতেছিস্, তোর এই ভগিনীর অষ্টম গর্ভই তোর 'হন্তা'। দৈববাণী শুনিবামাত্র কংস দেবকীকে হত্যা করিতে উদ্যত, আর বসুদেব তাহাকে উপদেশ দিয়া নিবারণ করিতে চেষ্টিত। প্রপঞ্চে বা সংসারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার ইহাই প্রথম ঘটনা বা প্রথম দৃশ্য।

এইবার অন্তর্মুখী হইয়া তত্ত্ব-চিন্তা করুন। আপনার জীবনে যদি ঠিক্ এইরূপ ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে আপনি কি করিবেন? ইহাই চিন্তা করুন। আপনি কি করিবেন, তাহা আপনিই জানেন। সংসারের মানুষ, সকলেই কিছু সমান নহে। আপনি

কি করিবেন, তাহা জানি না, তবে ভদ্রলোকে কি করিবেন, তাহা বলিয়া দিতে পারি এবং তাহাই বলিতেছি।

কংস যদি চিন্তাশীল ও সাধু ভদ্রলোক হইত, তাহা হইলে কিছুই করিত না। তাহার প্রথম কারণ, দৈববাণীতে বিশ্বাস করাই মানুষের একটা দুর্ব্বলতা। দৈববাণী কি, তাহা কি প্রকারে বুঝিব? বাহিরে উচ্চারিত একটা কথা শোনা গেল। কোথা হইতে এই শব্দ আসিল, কে ইহা বলিল, কেনই বা ইহা বলিল, ইহার অর্থই বা কি, আমরা কেহই তাহা জানি না। এই প্রকারে পরের কথা আর বাহিরের কথা শুনিয়া যাহারা জীবনের পথে চলিতেছে, তাহারা মানুষ হিসাবে অতিশয় নিম্নস্তরের লোক।

ক। জীবনের তিনটি স্তর

মানুষের জীবনে তিনটি স্তর আছে। বাহ্যশাস্ত্রবাদ, যুক্তিবাদ আর প্রজ্ঞাবাদ। এই তিনটি বিরোধী নহে। বাহিরের কথাকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করিব না। কিন্তু যুক্তি বা বিচারশক্তির দ্বারা ধীরভাবে চিন্তা করিয়া তাহা গ্রহণ করিব। ধীরভাবে চিন্তা করিতে করিতে যাহারা ভাল লোক তাঁহাদের ভিতরে প্রজ্ঞার আলোক জ্বলিয়া উঠে। প্রজ্ঞার আলোই আত্মার অন্তর্যামী গুরুরূপী পরব্রহ্মের বা চৈত্যগুরুর বাণী। শাস্ত্র ও যুক্তি এই প্রজ্ঞায় আসিয়া তাহাদের পরিণতি ও পরম-সার্থকতা লাভ করে। সুতরাং, বাহিরের একটা বাণী শুনিলাম, আর চিন্তা নাই, বিবেচনা নাই, পরামর্শ নাই, তাড়াতাড়ি উত্তেজনার মাথায় যাহা হয় একটা কিছু করিয়া বসিলাম, ইহা সর্ব্বনাশের পথ ছাড়া আর কি? দৈববাণী শুনিবামাত্র কংস যখন দেবকীকে হত্যা করিতে অগ্রসর হইল, তখন বোঝা গেল কংস এই সর্ব্বনাশের পথই ধরিয়াছে।

খ। আনন্দ ও অহম্

কংসের চিন্তা এইরূপ। আমার কাছে দুইটা জিনিস আছে। একটার নাম 'আমি', আর একটার নাম 'আনন্দ'। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এই দুইটিকে বলা হইয়াছে—'আনন্দ আর মদন"। আমি এখন 'আমি'-টিরও স্বরূপ বা প্রকৃত তত্ত্ব জানি না, আনন্দেরও স্বরূপ বা প্রকৃত তত্ত্ব জানি না। এই না-জানা তত্ত্ব দুইটি লইয়া আমার এই

সাংসারিক জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম্ম চলিতেছে। প্রত্যেক মানুষের কাছে একদিন একটা প্রশ্ন বা সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয়—'আমাতে আনন্দ' না 'আনন্দে আমি'। 'আনন্দ' আর 'আমি', বুঝি বা না বুঝি, এই দুইটি যখন রহিয়াছে, তখন কে কাহার? গৌণই বা কে, মুখ্যই বা কে? আধারই বা কে, আর আধেয়ই বা কে? যদি বলি 'আমাতে আনন্দ', তাহা হইল আমি কংস হইয়া যাইব বা কংসের হইয়া যাইব। আর যদি বলি 'আনন্দে আমি', 'আমিই আনন্দের' তাহা হইলে ব্রজে যাইব, লীলায় যাইব। কংসের হইলে মৃত্যু পাইব, আর ব্রজের বা বৃন্দাবনের হইলে অমৃত পাইব।

গ। অমৃতের ভ্রান্ত পথ

কংস ভাবিল, আমি মরিব! এই দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান আমায় মারিয়া ফেলিবে! আমি মরিব! না, আমি, মরিব না, আমি মরিতে চাই না, আমি বাঁচিতে চাই। মরণের সন্ধান পাইয়াছি, মরণের পথ বন্ধ করিয়া আমি অমর হইতে চাই। দেবকীই আমার সেই মরণের পথ, দেবকীর গর্ভজাত শিশুই আমার মরণ। সন্ধান যখন পাইয়াছি, তখন দেবকীকে বধ করিব, মরণের পথ বন্ধ করিব। ইহাই হইল কংসের চিন্তা।

এখানে চিন্তার কথা এই। কংস বাঁচিতে চায়; অমর হইতে চায়। এই যে অমৃত-পিপাসা, ইহা স্বাভাবিক; কেহই মরিতে চাহে না, সকলেই অমর হইতে চায়। কিন্তু, অমর হওয়ার উপায় কি, অমৃতের বাড়ী কোথায়? কংস তাহা জানে না। এই দেহ ও ইন্দ্রিয় লইয়াই কংস অমর হইতে চায়। ইহাই কংসের ভুল, মারাত্মক ভুল। মরণের পথ বন্ধ করিয়া কংস অমর হইতে চায়, না মরিয়াই অমর হইতে চায়, ইহাও তাহার মারাত্মক ভুল। কাজেই, কংস বলিলে কাহাকে বুঝিব? যে, অমরতার ভুল রাস্তা ধরিয়া দ্রুতবেগে মরণ হইতে মরণে ছুটিতেছে; বাঁচিবার জন্য চেষ্টা করিয়া কেবলি মরিতেছে; তাহারই নাম কংস। আমরা পরে বুঝিব, আর একটি পথ আছে তাহার নাম মরণের ঠিক্ পথ, সেই পথ অমৃতে লইয়া যায়। জীবনের ভুল পথ মরণের অভিমুখী, আর মরণের ঠিক্ পথ অমৃতের অভিমুখী। এই দুই পথের সংযোগের স্থলে মানুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মানুষ, কোন্ দিকে যাইবে? নিজের পথ ঠিক্ করিয়া লও;

বিধাতার ইহাই আহ্বান। প্রত্যেক মানুষের কাছে প্রতিদিন, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রতি ঘটনার মধ্য দিয়া এই আহ্বান আসিতেছে, নিজের পথ বাছিয়া লও। জীবনের ভুল পথে গেলে, শুধু বাঁচিব কেমন করিয়া আমি সুখে বাচিব কেমন করিয়া, এই চিন্তা আর এই চেষ্টার অনুবর্ত্তন করিলে কংসের দলভুক্ত হইবে, অমৃতই মরণের বেশে তোমার সভায় আসিয়া দাঁড়াইবেন। আর, ঠিক্‌মত মরিব কেমন করিয়া, দেহের মরণে মরিবরে আমি, ইন্দ্রিয়ের মরণে মরিব, মনের মরণে মরিবরে আমি, এই অহঙ্কারের মরণে মরিব, কামের মরণে মরিবরে আমি, লোভের মরণে মরিব, এইভাবে মরণের সত্য পথ (The path of right dying) ধরিতে পারিলেই অমৃত লাভ হইবে। জীবনের পূর্ণতার মাঝে অমৃতরূপে আনন্দরূপে প্রাণের গোবিন্দ হরি মদনমোহন আসিবেন, আমাকে তাঁহার আপনার করিয়া তিনি আমার আপন হইবেন। আমার কুঞ্জ, আমার গোষ্ঠ, আমারই নদীর তীর, আমারই প্রভাত আমারই সন্ধ্যা, আমারই শরৎ বসন্ত, সবই চিদানন্দ-রসময় হইবে।

৩। কংসের ভুল

কংসের ভুল কোথায়, তাহা বসুদেবের কথাগুলি বুঝিলেই বেশ ভাল করিয়া ধরিতে পারা যায়। কংস যখন খড়্গপাণি, দেবকীর কেশের মুষ্টি ধরিয়া অসহায়া সদ্য-বিবাহিতা সেই ভগ্নিকে হত্যা করিতে সমুদ্যত, বসুদেব তখন মধ্যে দাঁড়াইয়া শান্ত-ভাবে সদুপদেশে দ্বারা কংসকে এই অত্যুৎকট পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন। বসুদেবও বীর,—ক্ষত্রিয় বীর, তিনিও অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিয়া কংসকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতে পারিতেন, কিন্তু, সে পথে তিনি গেলেন না, শাস্ত্রে যাহাকে 'সাম-পথ' বলে, সাধুজনের অনুবর্ত্তনীয় সেই সর্ব্বোত্তম প্রথম পথেই তিনি গেলেন। বসুদেবের উপদেশ, শ্রীমদ্ভাগবতের নয়টি শ্লোক—দশম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের ২৫—৩৩শ শ্লোক। এই শ্লোকগুলিতে তিনটি তত্ত্বের আলোচনা ও এই তিনটি তত্ত্বের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি নৈতিক সিদ্ধান্ত আছে। শ্রীধর স্বামী তাঁহার টীকায় এই তত্ত্বত্রয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

মরণস্যাপরিহরণীয়ত্বাৎ দেহান্তরস্য চ অবশ্যংভাবিত্বাৎ তত্রাপি চ ভোগপ্রেমাস্পদত্বাদীনাম-বিশেষাৎ তত্ত্বয়েন পাপাচরণমযুক্তম্।

মরণ অপরিহরণীয়। জন্মাইলেই মরিতে হইবে। মানুষ যখন জন্মায় তখন কেহই বলিতে পারে না, তাহার ভবিষ্যত কি! সে সুখী হইবে কি দুঃখী হইবে, ধনী হইবে কি দরিদ্র হইবে, পাপী হইবে কি পুণ্যাত্মা হইবে, সুস্থদেহ হইবে কি রুগ্ন হইবে, পণ্ডিত হইবে কি মূর্খ হইবে, কেহই বলিতে পারে না। কেবলমাত্র একটি কথা সুনিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায়। যখন জন্মাইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই মরিবে। এইজন্য বসুদেব কংসকে বলিলেন—যে জন্মায়, তাহার দেহের সহিতই মৃত্যুর জন্ম হয়, অদ্যই হউক আর শত বৎসর পরেই হউক প্রাণিমাত্রেরই মৃত্যু অবধারিত।

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবং॥

এই সত্যটি মানবমাত্রেরই সম্মুখে প্রাথমিক সত্যরূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মৃত্যু অপরিহরণীয়, যখন জন্মাইয়াছ, তখন মরিতেই হইবে। কিন্তু, মরিব বলিয়া কি মানুষ ভয়ে অবসন্ন হইবে? বসুদেব এই কথাটি বলিবার সময় কংসকে 'বীর' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ইহার অর্থ, যদিও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা ভয় পাইব না, আমরা সাহসের সহিত, বীরের মতো মৃত্যুর সম্মুখীন হইব। "বীর"—এই কথাটি 'প্রোৎসাহন সম্বোধন'।

মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন দেবকীকে বধ করিয়া কি হইবে? বসুদেব বলিতেছেন, হে কংস! না হয় মানিয়াই লইলাম তুমি দেবকীকে বধ করিলে! কিন্তু, দেবকীকে বধ করিলেই কি তুমি মরণের হাতে পরিত্রাণ পাইবে। তাহা যখন পাইবে না, তখন বিবাহের আনন্দোৎসবে ভগ্নি-হত্যারূপ মহাপাতক তুমি কি জন্য করিতে যাইতেছ?

মৃত্যু যেমন অবশ্যম্ভাবী, দেহান্তর-প্রাপ্তিও সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী। আর এই দেহান্তর কর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে, অতএব এড়াইবার উপায় নাই। কংস এখন রাজার দেহ পাইয়াছে, রাজদেহের সাহায্যে সাধ মিটাইয়া সুখভোগ করিতে চাহে। ইহাই তাহার আকাঙ্ক্ষা, এই জন্যই সে মরিতে চাহে না। বসুদেব তাহাকে বুঝাইলেন ভোগের বস্তু যে মানুষের কাছে আসে, ইহা কর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে। মানুষ ইচ্ছা করিলেই ভোগের বস্তু অধিকার করিতে পারে না। তাহার পর ভোগের বস্তু আসিলেই

যে ভোগের সুখ হয়, তাহাও হয় না, এই ভোগ আত্মার ধর্ম্ম। তাহার পর বসুদেব একটি খুব বড় কথা বলিলেন। তিনি কংসকে বলিলেন, দেখ, আকাশে যেন পূর্ণচন্দ্র রহিয়াছে, আর নীচে জল,—বাতাসে কাঁপিতেছে। সেই তরঙ্গায়িত জলে পূর্ণচন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, কিন্তু জলের চঞ্চলতার জন্য সেই প্রতিবিম্ব ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। একজন লোক চন্দ্রের ঐ ভাঙ্গা ভাঙ্গা প্রতিবিম্বগুলি দেখিতেছে, আর প্রতিবিম্বকে বলিতেছে, তুমি অমন করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া আমাকে দেখা দিতেছ কেন? আমি পূর্ণচন্দ্র দেখিতে চাই, তুমি একবার স্থির হইয়া তোমার অখণ্ড মূর্ত্তি দেখাও। ভাঙ্গা ভাঙ্গা প্রতিবিম্ব কিন্তু অখণ্ডও হয় না, অচঞ্চলও হয় না। এখন সেই প্রতিবিম্ব-দর্শনকারীকে কি বলিবে? তাহাকে বলিবে, ভাই তুমি অখণ্ড পূর্ণচন্দ্র দেখিতে চাও, খুবই ভাল কথা। দেখ, তুমি এই অখণ্ড পূর্ণচন্দ্র দেখিতে চাহিবার আগে হইতেই চন্দ্র অখণ্ড ও পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। চন্দ্র অখণ্ড ও পূর্ণ হইয়া আছে বলিয়াই তোমার মনে অখণ্ড পূর্ণচন্দ্র দেখিবার ইচ্ছা জাগিয়াছে, নতুবা তোমার মনে ঐ ইচ্ছাই জাগিত না। কিন্তু, তুমি পূর্ণচন্দ্রকে খুঁজিতেছ কোথায়? তুমি যে চঞ্চল জলের উপর পতিত প্রতিবিম্বের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছ? ওখানে পূর্ণচন্দ্র কখনই দেখিতে পাইবে না। জলের স্বভাব উহা কাঁপিবে, কখনই স্থির হইবে না, সুতরাং চঞ্চল জলে পতিত প্রতিবিম্বকে অচঞ্চল করার চেষ্টা একেবারে বাতুলতা! তুমি যদি অখণ্ড ও অচঞ্চল পূর্ণচন্দ্র দেখিতে চাও, তাহা হইলে জল হইতে দৃষ্টি তুলিয়া আকাশের দিকে চাও; দেখিতে পাইবে চন্দ্র অখণ্ড ও পূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। জীবনেও ঠিক্ তাহাই হয়, আমরা মরিতে চাহি না, আমরা অমর হইতে চাই। মানুষের আত্মা অমর, আমি স্বরূপে অমর, সেইজন্য আমার ভিতরে অমর হইবার ইচ্ছা বা অমৃত-পিপাসা। কিন্তু, আমার দৃষ্টি কোথায়? আমি আত্মার সন্ধান জানি না, আমার ভিতর আত্মজিজ্ঞাসাই নাই, আমি এই দেহ, ইন্দ্রিয় ও অহঙ্কারের মধ্যেই অমরতা খুঁজিতেছি। ইহাই আমার ভুল, এই কারণেই আমার চেষ্টা বিফল হইতেছে। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনকে ছাড়াইবার চেষ্টা কর, তাহা হইলেই অমৃতের সন্ধান পাইবে। ইহাই হইল বসুদেবের যুক্তি বা উপদেশ।

কংস যে বসুদেবের কথা বুঝিল বা স্বীকার করিল, তাহা নহে। তবে শুনিল এবং কিছু শান্ত হইল। তাহার পর বসুদেব তাহাকে বলিলেন, দেখ, ভাই কংস আমি

তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি দেশ ছাড়িয়া পলাইব না, এই মথুরাতেই আমি থাকিব ; আর আমার স্ত্রীর গর্ভে পুত্র বা কন্যা যাহাই হউক, তোমাকে তাহা দিব, সেই সন্তান লইয়া তোমার যাহা ইচ্ছা করিও। বসুদেবের এই প্রতিজ্ঞায় কংস সন্তুষ্ট হইল।

কংসের এই প্রথম পরিচয় শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যাইতেছে। কংস বাঁচিতে চায়, এই দেহ লইয়া বাঁচিতে চায়। কিন্তু কংস জীবনমরণের তত্ত্ব জানে না, বলিলেও বোঝে না, ভাবে না, মানে না। সে যাহা কিছু তাহার বাঁচিয়া থাকার অন্তরায় বলিয়া মনে করে, যেমন করিয়াই হউক সে তাহা দূর করিতে চায়।

৪। কংসের বিকাশ

এইবার কংসের বিকাশ বা বৃদ্ধি, শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করিতেছেন। মাতা গর্ভধারণ করিয়া যথাকালে সন্তান প্রসব করিয়াছেন। নবীনা মুগ্ধা জননী, সদ্যঃজাত শিশুকে দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। অর্দ্ধমুদিত নয়নে সন্তানের মুখের পানে জননী চাহিয়া আছেন, নন্দনের সদ্যস্ফুট ফুল, বিধাতার আশীর্ব্বাদ, অতীতের শত জনমের তপস্যার ফল এই সুকুমার সুনির্ম্মল শিশু, জননী দেখিতেছেন আর হৃদয়ে স্নেহের রস উথলিয়া উঠিতেছে। এমন সময়ে পাপ কংস আসিয়া মায়ের কোল হইতে সুন্দর শিশুটিকে কাড়িয়া লইয়া সেই মায়েরই সম্মুখে তরবারি আঘাতে তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিল। ছিন্নমুণ্ড, ছিন্নদেহ মাটিতে পড়িয়া গেল, রক্তে মাটি রাঙ্গা হইল, আর 'হা পুত্র, হা বিধি' বলিয়া জননী মূর্চ্ছিতা, ভূপতিতা হইলেন। কংস! এই সুকুমার নিষ্কলঙ্ক সুপবিত্র শিশু, আর এই স্নেহমুগ্ধা নবীনা জননী তোমার কি অপরাধ করিয়াছিল? কি দোষে তুমি তাহাদের এমন অবস্থা করিলে? কংস কি বলিবে? কংস বলিবে—উহারা তো কেহই কোন অপরাধ করে নাই, তাহাতো আমি জানি, খুব ভাল করিয়াই জানি, কিন্তু আমাকে তো বাঁচিতে হইবে বাপু? তবে বাঁচো, প্রাণ ভরিয়া পেট ভরিয়া পার যদি চিরকাল তুমি বাঁচো। এই কংস! কংস বাঁচিতে চায়, এই দেহ লইয়া এইখানে এই সংসারে বাঁচিতে চায়। ইহারই নাম কংস। অমৃত-পিপাসা আছে, বেশ জাগ্রত ও ক্রিয়ান্বিত অবস্থায় আছে, বেশ তীব্র মূর্ত্তিতেই এই পিপাসা আছে, কিন্তু কি করিলে এই পিপাসার নিবৃত্তি হইবে,

কোন্ পথে গেলে সেই অমৃতের দেখা পাওয়া যাইবে, ইহা সে জানে না, ভুল পথে অমৃত-লাভের জন্য চেষ্টা করে ;—ইহারই নাম কংস।

একে একে দেবকীর ছয়টি সন্তানকে কংস বধ করিল। তত্ত্ববিৎ টীকাকার বলিলেন, ইঁহারা 'ষড়্‌বিষয়'—পঞ্চইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা আমরা যাহা কিছু ভোগ করি, তত্ত্ব-হিসাবে এই ছয় পুত্র সেই ষড়্‌বিষয়। খুব ভাল কথা। সপ্তম গর্ভে যিনি আবির্ভূত হইলেন, তিনি অনন্ত। অনন্তের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যাহা কিছু সান্ত বা অন্তবিশিষ্ট, তাহার প্রতি জীবের যে কামনা তাহা ধ্বংশ হওয়া চাই। অনন্ত অস্পষ্ট, অনন্ত রহস্য, তিনি আসেন কিন্তু তাঁহাকে কেহ ধরিতে পারে না। 'অনন্ত' কথাটাই অভাবাত্মক বা নিষেধাত্মক, ভাবাত্মক নহে। Negative, positive নহে। এই কারণে দেবকীর সপ্তম গর্ভের যে কি হইল, তাহা কংসের দলের লোক কেহই জানে না। তাহারা অনুমান করিল, গর্ভ নষ্ট হইয়া গেল। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ। তত্ত্ব বড়ই সুন্দর। লীলাকে কেবল ঐতিহাসিক ঘটনারূপে দেখিলেই হইবে না। লীলা,—স্বরূপে নিত্য। প্রত্যেক মানবের জীবনে, অনুভবে ও জ্ঞানে সর্ব্বদাই লীলা হইতেছে। বাহিরে ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, এই ভাণ্ডের ভিতরে, আমার এই 'আমিটা'র ভিতরে তাহার সবই আছে। লীলা রূপক নহে ঐতিহাসিক। কিন্তু, কেবল ঐতিহাসিক নহে, সাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনা অপেক্ষা কিছু বেশী। যেটুকু বেশী, সেটুকু না বুঝিলে লীলার অর্থ বুঝিবে না। এই জন্যই গীতা বলিলেন শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্ম্ম 'তত্ত্বতঃ' বুঝিবে, শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন 'রসিক ও ভাবুক' হইয়া পান করিবে, শ্রীধরস্বামী বলিলেন 'অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন' হইয়া বুঝিবে।

কংসের ক্রমবিকাশ দেখা যাউক। দেবকী ও বসুদেবের তুল্য সাধু পৃথিবীতে দুর্ল্লভ। তাঁহাদের পদস্পর্শে, ধরণী ধন্যা, মানবজাতি কৃতার্থ। তাঁহারা এমন সাধু যে কখন স্বপ্নেও অত্যাচারী শত্রুর অকল্যাণ কামনা করেন না, শত্রুকেও আশীর্ব্বাদ করেন। এমন সাধু-দম্পতিকে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া অন্ধকারময় কারাকক্ষে কংস বন্দী করিয়া রাখিবে। লোকে বলিতেছে, কংস কি করিতেছে সাধুর উপর অত্যাচার করিতেছে? ইহারা তো তোমার নিকট কোনরূপেই অপরাধী নহে। কংস কি বলিবে? কংস বলিবে—ওগো, তাহা কি আমি জানি না? দেবকী বসুদেব যে সাধু ও নিরপরাধ,

তাহা কি আর আমি জানি না? কিন্তু, আমায় তো বাঁচিতে হইবে? বাঁচো, খুব বাঁচো, প্রাণ ভরিয়া, পেট ভরিয়া বাঁচো, যত পার, বাঁচো। ইহারই নাম কংস।

পুরাণের লীলা যদি বুঝিতে হয়, লীলার অনুশীলন করিয়া যদি নিত্যলীলায় প্রবেশ করিতে হয়, তাহা হইলে কংসকে প্রথমে তত্ত্বরূপে দেখিতে হইবে। এই তত্ত্ব-কংসই নিত্য-কংস। এই কংস থাকে কোথায়? তোমার আমার জীবনে, একটা ভাবরূপে, একটা মনোবৃত্তিরূপে। এই তত্ত্বই মূর্ত্তি লইয়া বাহিরে, ভারতের ইতিহাসের একটা বিশেষ যুগে, একটা বিশেষ স্থানে আবির্ভূত হইয়াছে। তাহার কাজ দেখিয়া পৌরাণিক ঋষি তাহাকে চিনিয়াছেন ও ধরিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার কথা বলিয়া গিয়াছেন, আমরা পৌরাণিকের কথা যদি শ্রদ্ধার সহিত শুনি, ধ্যানযুক্ত হইয়া যদি অনুভব করি, তাহা হইলে আমরাও কংসকে চিনিতে পারিব, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে যে-কংস রহিয়াছে, যে-কংস আমাদের জীবনে থাকিয়া আমাদিগকে লীলায় প্রবেশ করিতে দেয় না, আমাদিগকে কেবল ভবচক্রে ঘুরায়, আমরা সেই কংসকে চিনিতে পারিব, ধরিতে পারিব। তাহাকে চিনিতে ও ধরিতে পারিলে তাহার প্রভাব হইতে পরিত্রাণ পাইব।

জীবনে কংস ও ইতিহাসে কংস, (Kansa in life and Kansa in History) একসঙ্গে এই উভয়স্থানেই কংসকে দেখিতে হইবে। জীবনের কংসকে চিনিয়া তাহার সাহায্যে বাহিরের বা ইতিহাসের কংসকে বুঝিতে হইবে—জীবনের কংস একটি তত্ত্ব (—a principle,—a state of consciousness,—) চৈতন্যের একটি অবস্থা, অতএব ইহা নিত্য (Eternal)। সেই নিত্য প্রকট হইলেন। নিত্যের প্রাকট্যের নামই লীলা। ইতিহাসের কংস সেই নিত্য কংসের প্রাকট্য—The historical Kansa in a manifestation of that Eternal principle. লীলাবাদীগণের ইহাই সিদ্ধান্ত।

৫। লীলার সাক্ষী—

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার বা আবির্ভাবের ঘটনাটিকেও বেশ চিন্তা করিয়া বুঝিতে হইবে। ভাদ্র মাস, কৃষ্ণ পক্ষ, অষ্টমী তিথি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, দেবকী ও বসুদেবের পুত্ররূপে কংস কারাগারে আবির্ভূত হইলেন বা জন্মগ্রহণ করিলেন। এই ঘটনাটি

বুঝিবার সময় এই প্রকারের ঐতিহাসিক ঘটনা আমরা যে-প্রণালীতে বুঝি, যদি চিন্তা না করিয়া ঠিক্ সেই প্রণালীতেই বুঝি, তাহা হইলে লীলাবাদী পৌরাণিকের প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হইবে। লীলা বুঝিবার জন্য কয়েকটি প্রণালী বা পদ্ধতি আছে। তাহার প্রথমটি—'তত্ত্বতঃ বুঝিবে'। আমরা এই চাবিটি প্রয়োগ করিয়াছি। এইবার আর একটি চাবি বাহির করিতে হইবে। "লীলার সাক্ষী কে?" —Whose consciousness is the testimony thereof ?

যে-রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাইয়াছিলেন বা আবিভূত হইয়াছিলেন, সেই রাত্রিতে আমরা যদি মথুরানগরে থাকিতাম, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের এই জন্ম বা আবির্ভাব জানিতে পারিতাম কিনা, ইহাই প্রশ্ন। ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যতা এই প্রকারে পরীক্ষিত হয়। আক্‌বর বাদশাহ জন্মাইয়াছিলেন বা মহারাজা অশোক জন্মাইয়াছিলেন ; যে-তারিখে যে-সময়ে যে-স্থানে তাঁহারা জন্মাইয়াছিলেন, আমরা যদি সেই তারিখে সেই সময়ে সেই স্থানে থাকিতাম তাহা হইলে তাঁহাদের জন্ম জানিতে পারিতাম, দেখিবার অধিকার থাকিলে দেখিতেও পাইতাম। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-সম্বন্ধে কিন্তু এই কথা সত্য নহে।

পুরাণে বলা হইয়াছে, দেবকীদেবী অষ্টমবার গর্ভবতী হওয়ার সময় হইতেই বাহিরের পৃথিবীতে এবং কংসের চিত্তে নানারূপ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। বাহিরের জগৎ মঙ্গলময়, আর কংসের চিত্ত ভীতি ও উদ্বেগময়। যেদিন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়, সেদিনের অবস্থা শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করিয়াছেন।

নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ। দ্বিজালিকুলসন্নাদস্তবকাবনরাজয়ঃ॥
ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃশুচিঃ। অগ্নয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত॥
মনাংস্যাসন্ প্রসন্নানি সাধুনামসুরদ্রুহাং। জায়মানেঽজনে তস্মিন্ নেদুর্দুন্দুভয়ঃ সমং॥
জগুঃ কিন্নর গন্ধর্বাস্তুষ্টুবুঃ সিদ্ধচারণাঃ। বিদ্যাধর্য্যশ্চ ননৃতুরপ্সরোভিঃ সমং মুদা।
মুমুচুর্মুনয়ো দেবাঃ সুমনাংসি মুদান্বিতাঃ॥

নদীগুলির জল প্রসন্ন, হ্রদগুলি ফুল্লকমলশোভিত, ফুলে ভরা বনরাজি ভ্রমরের ও পাখীর গানে মুখরিত। সুখস্পর্শ বায়ু পুণ্যগন্ধবাহী, নিস্তেজ যজ্ঞানল উদ্দীপ্ত। কংসাদি বিদ্রোহী অসুর-ব্যতীত অন্য সকলের চিত্ত সুপ্রসন্ন। শ্রীভগবানের আবির্ভাবের আয়োজন,—দুন্দুভি বাজিতেছে, গন্ধর্ব্বগণ গান করিতেছে, সিদ্ধচারণগণ স্তবপাঠ

করিতেছে, অপ্সরা ও বিদ্যাধর নৃত্য করিতেছে, দেবগণ ঋষিগণ হৃষ্টচিত্তে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে।

কংসের মন আজ সকাল হইতেই উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাকাতর। তাহার মনে হইতেছে আকাশে বাতাসে যেন এক ষড়যন্ত্র চলিতেছে, মেঘে বাতাসে কাহারা যেন যাওয়া আসা করিতেছে, তরুলতায় যেন একটা গুপ্ত পরামর্শ চলিতেছে। বিশ্ব যেন দলবদ্ধ হইয়া কংসের বিরুদ্ধে একটা কিছু করিবার আয়োজন করিতেছে। কংস জানে দেবকীর গর্ভ পূর্ণ। যদিও দেবকী বসুদেব কারাগারের আঁধারকক্ষে বন্দী, যদিও অতিশয় সতর্ক সব প্রহরী সযত্নে কারাগারের প্রতি দ্বার রক্ষা করিতেছে, তথাপি অন্তরে দুশ্চিন্তাই জাগিতেছে; অহেতুক দুশ্চিন্তা, কি জানি কি হয়। আজিকার এই দিনটা কেমন কেমন, আজই দেবকী সন্তান প্রসব করিবে, আর ঠিক্ সেই সময়ে ভয়ানক একটা কিছু হইবে। অতএব সাবধান! কংসের আজ রাত্রিতে নিদ্রা নাই। রাজা কংস নিজে ঘুমাইবেন না, সতর্কভাবে জাগিয়া থাকিবেন। সুতরাং মন্ত্রী, পারিষদ্, সেনাপতি, সৈন্যসামন্ত, এমন কি মথুরাসহরের কেহই আজ আর ঘুমাইবেন না, সতর্কভাবে সকলেই এই রাত্রি জাগিয়া কাটাইবে। কি জানি কি বিপদ ঘটে। আজ রাত্রিতে মথুরায় সতর্ক জাগরণ।

রাত্রিতে খুব মেঘ, খুব ঝড়, খুব বৃষ্টি, খুব মেঘগর্জ্জন। আমরা পৌরাণিকের নিকট শুনিয়াছি শ্রীভগবানের আবির্ভাবের সময় অনেকক্ষণ ধরিয়া মথুরার সকলেই গভীর, নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল,—যোগমায়া তাহাদিগকে ঘুম পাড়াইয়াছিলেন। এই নিদ্রা সত্য, কিন্তু এই নিদ্রাই রহস্য। সকলেই ঘুমাইয়াছিল; মহারাজা কংস স্বয়ং, মন্ত্রী, সেনাপতি, সৈন্য প্রহরী দ্বারী, সকলেই ঘুমাইয়াছিল—হাতী ঘোড়াও ঘুমাইয়াছিল; গভীর, অতি গভীর সে ঘুম, কিন্তু রহস্য এই যে ঘুমের পর জাগিয়া উঠিয়া কেহ বলে নাই বা মনে করে নাই যে সে বা তাহারা ঘুমাইয়াছিল। ইহা কি খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে? আশ্চর্য্যই তো, অতিশয় আশ্চর্য্য! আমরা ঘুমাই, সকলেই ঘুমাই, গভীর ঘুমের পরও স্মৃতি থাকে ঘুমাইয়াছিলাম; কতক্ষণ ঘুমাইলাম বলিতে পারি না, কিন্তু ঘুমাইলাম, ইহা বেশ জানি। আজ, কিন্তু মথুরায় সকলেই ঘুমাইল, কিন্তু তাহারা কেহই জানে না যে ঘুমাইল। They slept but they knew not that they slept. ইহাই রহস্য।

তাহা হইলে ভাবুন, ঘটনাটি কি-প্রকারের ঘটনা! কংসের মতো একজন রাজা,

একজন সুনিপুণ যোদ্ধা, সারারাত্রি জাগিয়া বসিয়াছিল, তাহার সুচতুর সুনিপুণ কর্ম্মচারী-গণও জাগিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু কিছুই জানিতে পারে নাই। তাহারই কারাকক্ষে শিশুর আবির্ভাব হইল. দুয়ারে দুয়ারে সশস্ত্র প্রহরী সতর্কভাবে রাত্রি জাগিয়া বসিয়াছিল, একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকারও প্রবেশের পথ ছিল না, কিন্তু, তথাপি তাহারা কিছুই জানিতে পারিল না।

আর এক দিক্ দিয়া ঘটনাটি চিন্তা করা যাউক। আমরা জানি, পৌরাণিক আমাদের বলিয়াছেন চতুর্ভুজে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম লইয়া নীলোৎপলদলশ্যাম শ্রীভগবান্ কারাকক্ষে দেবকী ও বসুদেবের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন, দেবকী ও বসুদেব তাঁহার নিকট তাঁহাদের নিজেদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ইতিহাস শুনিয়াছিলেন এবং উভয়েই স্তোত্র-পাঠ করিয়া শ্রীভগবানের বন্দনা করিয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহাদের বলিয়াছিলেন, এখানে আমার স্থান হইবে না, আমাকে এখান হইতে লইয়া যাও, যমুনার পরপারে নন্দগোকুলে যশোদার সূতিকাগারে আমাকে রাখিয়া যশোদার সদ্যোজাতা কন্যাটিকে এখানে লইয়া আইস। এইরূপ আদেশ করিয়া শ্রীভগবান্ প্রাকৃত শিশু হইলেন আর বসুদেব গ্রহাবিষ্টের ন্যায় শিশুকে লইয়া চলিয়া গেলেন। লোহার অর্গল খুলিয়া গেল, লোহার কপাট খুলিয়া গেল। প্রহরীরা নিদ্রাগত, একেবারে অচেতন। মুষলধারায় বৃষ্টি, কিন্তু বসুদেবের গায়ে বৃষ্টি পড়ে না, অনন্তদেব অদৃশ্যভাবে ফণা তুলিয়া ছাতা ধরিয়াছেন। ভীষণ অন্ধকার, শিশুর গায়ের ছটায় সম্মুখের পথ আলোকিত। যমুনায় প্রবল বন্যা, কিন্তু, যমুনাও পথ ছাড়িয়া দিলেন। নন্দব্রজে সকলেই নিদ্রিত। যশোদার সূতিকাগৃহে বালককে রাখিলেন, যশোদার বালিকাটিকে লইলেন; বসুদেব ফিরিয়া আসিলেন। এত সব কাণ্ড হইয়া গেল, কিন্তু বসুদেব আর দেবকী ব্যতীত আর কেহ কিছু জানিল না।

বসুদেব কারাকক্ষে ফিরিয়া আসিলে কারাগারের লৌহকপাট আপনাআপনি পূর্ব্বের ন্যায় রুদ্ধ হইল। বালিকা কাঁদিল, প্রহরী জাগিল, কংস সংবাদ পাইল, সূতিকাঘরে আসিল। দেবকী, তাঁহার দাদা কংসের পায়ে ধরিয়া কাঁদিলেন, বলিলেন, এটি বালিকা, তোমার ছেলের সঙ্গে ইহার বিবাহ হইবে, ইহাকে মারিও না। কে শোনে সে কথা! বালিকাকে লইয়া কংস নদীর তীরে গেল, তাহাকে মারিয়া ফেলার জন্য কংস পাথরে আছাড় মারিল।

এইটুকু বেশ ঐতিহাসিক ঘটনা, সকলেরই জ্ঞানের বিষয়ীভূত। দেবকীর কন্যা হইয়াছে, কংস তাহাকে নদীরধারে এক পাথরের উপর আছাড় মারিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। ইহার আগের কথা রহস্যের আঁধারে ঢাকা, পরের কথাও ঠিক্ তাই। কি হইল? পৌরাণিক বলেন, কংস বালিকাকে পাথরে আছাড় মারিবার জন্য যেমন তুলিয়াছে, অমনি কংসের মনে হইল বালিকাটি হাত পিছ্লাইয়া আকাশে উড়িয়া গেল। কংস আকাশের দিকে চাহিয়া দেখে কি,—এক অষ্টভুজাদেবী, কাঁচা সোনার মতো তাঁর গায়ের রং ঝল্ ঝল্ করিতেছে, রং এর ছটায় আকাশ রাঙ্গা হইয়াছে। কেমন সে দেবী?—

অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্ট মহাভুজা।
দিব্যস্রগম্বরালেপ রত্নাভরণভূষিতা। ধনুঃশূলেষুচর্ম্মাসিশঙ্খচক্রগদাধরা।
সিদ্ধচারণ গন্ধর্ব্বৈরপ্সরঃ কিন্নরোরগৈঃ। উপাহৃতোরু বলিভিঃ স্তূয়মানেদমব্রবীৎ॥
কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ। যত্র ক্বচিৎ পূর্ব্বশত্রুর্মাহিংসীঃ কৃপণান্ বৃথা॥

দেখা গেল, বিষ্ণুর অনুজা সেই দেবী সশস্ত্র-অষ্টভুজা, দিব্য মালা, বস্ত্র, গন্ধ, ও রত্নাভরণে ভূষিতা। তাঁহার অষ্ট বাহুতে শূল, ধনুক, বাণ খড়গ, চর্ম্ম, শঙ্খ, চক্র ও গদা। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, কিন্নর, এবং সর্পগণ বিবিধ উপহারের দ্বারা পূজা করিতেছেন ও স্তব পাঠ করিতেছেন। সেই দেবী কংসকে বলিলেন—মূর্খ, আমাকে মারিলে কি হইবে, তোর পূর্ব্বশত্রু এবারেও তোকে বধ করিবার জন্য, কোন স্থানে জন্মিয়াছেন, অসহায় শিশুগণকে আর বৃথা হত্যা করিস্ নি।

আকাশে প্রকাশিত এই দেবীমূর্ত্তি কে দেখিল? শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন "অদৃশ্যত"—দৃষ্ট হইলেন। শ্রীধর স্বামী কিছুই বলেন নাই। বৈষ্ণবতোষণী টীকায় আছে— কংস প্রভৃতি যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা সকলেই দেখিল। কংস ও কংসের অনুচর বা সহচরগণ দেখিল সত্য, কিন্তু, ব্যাপারটা যে বুঝিল, তাহা মনে হয় না। একটা দেবলীলা চলিতেছে, ইহা যদি কংস ঠিক্মত বুঝিত তাহা হইলে সে তাহার আসুরিক পাপাচরণের পথ হইতে একেবারে প্রতিনিবৃত্ত হইত। তাহা সে হয় নাই। কিন্তু, কিছুক্ষণের জন্য তাহার যে একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে বেশ ভাল করিয়াই বলা হইয়াছে।

দেবীর বা যোগমায়ার কথা শুনিয়া কংসের মনে হইল, দৈববাণী—কি মিথ্যা

৩

হইল? দৈববাণী ছিল যে দেবকীর অষ্টম গর্ভেই কংসের মৃত্যুর জন্ম হইবে। কংস জানে এই বালিকাই দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্মাইয়াছে, কিন্তু অষ্টভুজা দেবী যোগমায়া বলিলেন, তোমার অন্তক অন্য স্থানে জন্মাইয়াছে।

কংস আসিয়া দেবকী ও বসুদেবের বন্ধন মোচন করিয়া তাঁহাদের নিকট কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিল। কংসের অনুতাপের প্রধান কথা--

দৈবমপ্যনৃতং বক্তি ন মর্ত্যা এব কেবলং।

মানুষই যে কেবল মিথ্যা বলে, তাহা নহে, দৈবও মিথ্যা বলে! দৈববাণীতে বিশ্বাস করিয়াই আমি ভগিনীর এতগুলি শিশু বধ করিলাম। কংস অজ্ঞান নহে, জ্ঞানী। দেবকী ও বসুদেবকে কংস অনেক তত্ত্বকথা শুনাইল। আশ্চর্য্য এই, কংস দেবকী ও বসুদেবকে যে সব কথা বলিল, নিজে সে সব কথা মানিয়া ইহার পরেও চলিতে পারিল না। এজন্য কংসকে কপট মনে করার প্রয়োজন নাই। কংসের ভিতর ভাল জিনিস ছিল, কংস উন্নত আত্মা, যোগমায়া দেবকীকে দেখিয়া তাঁহার কথা শুনিয়া কিছুক্ষণের জন্য তাহার ভিতরে সদ্ভাবের জাগরণ হইল। কিন্তু এই জাগরণ স্থায়ী হইল না। কংস যেমন তাহার মন্ত্রীগণুলে পরামর্শ আরম্ভ করিল, অমনি তাহার পূর্ব্বভাব বা স্থায়ীভাব ফিরিয়া আসিল।

মন্ত্রীরা সমুদয় কথা শুনিয়া কংসকে পরামর্শ দিলেন, পুরে গ্রামে ব্রজে যত শিশু জন্মাইয়াছে সব বিনাশ করা হউক। দেবতাদের মূল বিষ্ণু, বিষ্ণুর মূল ধর্ম্ম, ধর্ম্মের মূল ব্রাহ্মণ, তপস্যা ও যজ্ঞ, অতএব এই তিনটি জিনিস নষ্ট করিতে হইবে। যজ্ঞ নষ্ট করিতে হইলে দুগ্ধবতী গাভীও বধ করা প্রয়োজন। মন্ত্রীগণের পরামর্শানুসারে কংস এই নীতি অবলম্বন করিলেন। ইহাই হইল কংসের পরিণতি।

এখন স্বভাবতঃই মনে হইবে, যোগমায়ার কথা শুনিয়াই কংস, দেবকী ও বসুদেবের নিকট যেসব জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বকথা বলিলেন, সেই সব কথা কোথায়? কংসের আর ঐ কথা মনেই থাকিল না। এইবার আলোচনা করা যাউক, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে কংসের কি মত? কংসের version কি? কংসকে জিজ্ঞাসা করুন, মহারাজ, গত অষ্টমীর রাত্রিতে কি হইয়াছিল? কংস বলিবে, সে দিন রাত্রিতে বড়ই দুর্যোগ। দেবকীর অষ্টম গর্ভ, গর্ভও পূর্ণ। আমার মনে হইল আজ রাত্রিতে বুঝি বা কিছু হয়।

দেবকী বসুদেবকে পূর্ব্ব হইতেই কারাগারে রাখিয়াছিলাম, প্রহরীরও খুব কঠোর ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তবু ভয় হইল, কি জানি কি হয় ? সারারাত্রি আমরা সকলে জাগিয়াছিলাম। কিছু হয় নাই। রাত্রি যখন প্রায় শেষ, তখন দেবকীর একটি কন্যা হইল। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাইয়া সেই কন্যাটিকে লইয়া গিয়া পাথরে আছ্‌ড়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছি। কংসের ইহাই ধারণা। যোগমায়ার কথা মনে আছে, কিন্তু সেকথায় তাহার তেমন আস্থা নাই। সে কথার ভিতর 'তাহার অন্তক জন্মাইয়াছিল', এইটুকুই কেবল সে মনে রাখিয়াছে, বাকিটুকু ভুলিয়া গিয়াছে।

৬। লীলার সাধন

এইবার লীলার তত্ত্ব বা রহস্য চিন্তা করা যাউক। কংস একটি তত্ত্ব বা মানবচৈতন্যের একটি অবস্থা, আর একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কংস বলিতে এক সঙ্গেই এই দুইটি বুঝিতে হইবে। 'ভগবান্' বলিলেই মানুষ বাহিরের দিকে চায়, এই জন্যই ভগবান্‌কে পায় না, বাহিরের ছোটখাটো একটা-যাহা-হউক-কিছু লইয়া বঞ্চিত হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যখন ঈশ্বরের কথা বলিলেন, তখন বলিলেন—অর্জ্জুন বাহিরে নহে ভিতরে, 'হৃদ্দেশে'। ইহাই সার্ব্বজনীন প্রথম কথা। ইতিহাসে ভগবান্‌কে দেখা যায়, দেখা গিয়াছে ; কিন্তু তিনি সেই আত্মার অন্তর্যামী পুরুষ।

সেদিন যেমন বর্ষারাত্রিতে অন্ধকারে কারাকক্ষে শ্রীভগবান্ আসিয়াছিলেন, আজও তিনি সেইভাবে আসিবেন। আসুন! সুধু আজ কেন, শতবার সহস্রবার তিনি আসুন। তাঁহার আসায় আমার কিছু হইবে না, আবার জানা ও পাওয়া লইয়াই কথা। তিনি আসিবেন, আমি কি জানিতে পারিব ? ইহাই প্রশ্ন। কংস জানিতে পারে নাই, যাহারা কংসের লোক তাহারাও জানিতে পারে নাই। তাহারা জানে তাহারা ধরিবার জন্য জাগিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা জাগিয়া ছিলনা, ঘুমাইয়াছিল। হতভাগ্য তাহারা,—জানিতেও পারে নাই যে তাহারা ঘুমাইয়াছিল ! প্রশ্ন, আমার কি হইবে ! তিনি আসিবেন, আমি কি তাঁহাকে পাইব ? উত্তর, আমি যদি কংসের হই, কংস বলিলে মানব-চৈতন্যের যে-অবস্থা, যে-মনোবৃত্তি বা হৃদয়ভাব বুঝায়, আমি যদি সেই অবস্থায় সেই মনোবৃত্তি ও হৃদয়ভাব লইয়া থাকি, তাহা হইলে আমি জানিতে পারিব না।

তিনি আসিবেন, আঁধারে চুপি চুপি আসিবেন। বর্ষার রাত্রির দুর্যোগে তিনি আসিবেন, আমরা তখন সকলেই ঘুমঘোরে অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকিব। চিরদিনের আকাঙ্খিত ধন তিনি, নিখিল বেদমন্ত্র মানবের জ্ঞান-বিকাশের প্রথম উষা হইতে যাঁহার আবাহন-গীতি গাহিয়াছে, যাজ্ঞিকের যজ্ঞধূম নীলাকাশে ব্যাপ্ত হইয়া যাঁহার রাঙা শ্রীচরণ-দুইটি অন্বেষণ করিয়াছে, যোগী যোগধ্যানে অন্তরের অন্তরে যাঁহাকে খুঁজিয়াছে, সেই তিনি আসিবেন। কোথায় আসিবেন, রাজসিংহাসনে নহে, যজ্ঞবেদিতে নহে, মন্দিরে নহে, তিনি আসিবেন কারাকক্ষে। মানুষের প্রচলিত ধর্ম্মাচরণের অসারতা প্রতিপাদনের জন্যই তিনি আসিলেন কারাগারের অন্ধকারময় কক্ষে! মানুষ অত্যাচারী, অকারণ অত্যাচারী, স্বার্থের জন্য অত্যাচারী। প্রবল, অত্যাচার করে দুর্ব্বলের উপর, অসাধু অত্যাচার করে সাধুর উপর। কোথায় আসিবেন ভগবান্। অত্যাচারিতের লাঞ্ছনার মধ্যেই সত্য ও ভগবান্। অত্যাচারীর মন্দির মিথ্যা, প্রাসাদ মিথ্যা, বেদী মিথ্যা, সিংহাসন মিথ্যা। তাই কারাকক্ষে আসিলেন ভগবান্।

আমি যদি কংসের হই, তাহা হইলে ঘুমাইয়া থাকিব, জানিতে পারিব না। তিনি আসিবেন, চলিয়া যাইবেন। তাহার পর, অনেকদিনের পর, আবার যখন আসিবেন, তখন মৃত্যুরূপে আসিবেন। তিনি অমৃতরূপ, কিন্তু, সেই অমৃতকে চিনিয়া লইতে না পারিলে মৃত্যুরূপেই তিনি আসিবেন।

দেবকী ও বসুদেব বলিতে যে তত্ত্ব, যে অবস্থা, যে-মনোবৃত্তি বা হৃদয়ভাব বুঝায়, আমি যদি তাহাই হইতে পারি, তাহা হইলে আমার বন্ধনে আমার আঁধারে আমার লাঞ্ছনায় তিনি আসিবেন। দেবকী বসুদেব যাহা দেখিয়াছিলেন আমিও তাহাই দেখিব, তাঁহারা যাহা হইয়াছিলেন, আমিও তাহাই হইব, তাঁহারা যাহা পাইয়াছিলেন, আমিও তাহাই পাইব।

৭। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ

ইহাই শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার রহস্য ও সাধন। আমাদের দেশে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাকে শ্রীকৃষ্ণলীলার পরিপূরক বলা হইয়া থাকে। আমরা চৌর্য্যলীলায় তাহা দেখাইয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মলীলার তুলনা করিলেও এই সত্যটি আমরা পাইব।

"প্রথমতঃ আবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন। মানুষ তাঁহাকে কত ডাকিয়াছে, তাঁহার জন্য কত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে! কিন্তু তিনি আসিলেন বর্ষার অন্ধকারময়ী রাত্রিতে, সকলে যখন নিদ্রাগত। কেহই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে নাই, চোখের জল দিয়াও কেহ সেই চিরদয়িতের চরণ ধোয়াইয়া দিবার আয়োজন করে নাই। তিনি কারাকক্ষে আসিলেন, কক্ষের দ্বার খোলাইলেন, তাঁহার উপদেশে বসুদেব তাঁহাকে কোলে করিয়া যমুনার পরপারে নন্দগোকুলের অভিমুখে চলিলেন। আমাদের নিপুণ প্রহরীগণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দ্বার রক্ষা করিতেছিল, কিন্তু তাহারা কেহই জাগিল না! তাঁহার চরণ-নখরের কিরণচ্ছটা প্রহরীগণের মস্তকে নিপতিত হইল, কিন্তু তাহারা বিশ্ব-মনচোরকে ধরিতে পারিল না; জ্ঞানে ও সভ্যতায় উন্নতির শিখরারূঢ় মথুরানগরে তিনি আসিলেন, কিন্তু সেখানে তাঁহার স্থান হইল না।

তিনি যে আসিলেন, তাহা দেবকী ও বসুদেব ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারে নাই। যোগমায়া সকলকে ঘুম পাড়াইয়াছিলেন। সে ঘুম আবার এমন, জাগিয়া উঠিয়া কেহ বলিতে পারে নাই ঘুমাইয়াছিলাম। মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গেলেন, ব্রজ হইতে বৃন্দাবন। লীলা হইল, বাহিরের কেহ জানিল না। ক্রমে ক্রমে সে-কথা প্রচারিত হইল, কেহ বুঝিল, কেহ বুঝিল না।

তাহার পর, প্রতিবৎসর জন্মাষ্টমীতে ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী উপবাস করে, ব্যাসের রচনা শুকের বর্ণনা মুমূর্ষু পরীক্ষিতের আস্বাদিত অমৃতময়ী ভাগবতী কথা, শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা ভক্তেরা শুনিতেছেন। এ বড় আনন্দের সংবাদ। কিন্তু, শ্রীভগবানের করুণার দিকে চাহিলেই আনন্দ, আমাদের নিজেদের দিকে চাহিলে আনন্দ নাই, কেবল দুঃখ! তিনি আসিলেন, আমরা করিলাম কি? আমরা তো জাগিয়া উঠিয়া অভ্যর্থনা করিতে পারি নাই।

এই দুঃখে পাঁচ হাজার বৎসর কাটিয়া গেল। গঙ্গার দুঃখের সীমা নাই। তিনি বলেন, আমি বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা, কলি-কলুষ-নাশিনী পতিত-পাবনী। কিন্তু, নিত্যলীলা যখন প্রপঞ্চে প্রকট হইল, তখন সে-রূপের ছবি আমার বুকে পতিত হইল না। যমুনার কালো জলে ব্রজগোপী-ঘেরা কিশোরী-কিশোর-রূপের মোহন ছবি পতিত হইল। বুকের ভিতর গোষ্ঠ-বিহারী, রাখালসঙ্গী, "ব্রজেন্দ্রকুল-দুগ্ধ-সিন্ধুর পূর্ণ ইন্দু"কে পাইয়া যমুনা

গর্ব্বে ফুলিয়া নাচিতে নাচিতে আমার কাছে আসিয়া প্রয়াগে সে-কথা বলিয়া চলিয়া গেল। গঙ্গার বিষম দুঃখ।

এমনি করিয়া দীর্ঘ পঞ্চসহস্র বৎসর কাটিয়া গেল। আবার তিনি আসিয়াছেন। প্রেমলীলা সর্ব্বসাধারণকে আস্বাদন করাইবার জন্য বৃন্দা-বিপিন-বিহারী, নবজলধরশ্যাম আজ শ্রীরাধার ভাবকান্তির পিঞ্জরের মধ্যে বদ্ধ হইয়া আসিতেছেন।

এবারে স্থান—মথুরায় কংস-কারাগারের অন্ধকারময় কক্ষ নহে। এবারে নবদ্বীপ! বঙ্গের মস্তিষ্ক ও হৃদয় আজ সেখানে, সমগ্র ভারতের প্রতিভা ও সাধনা আজ সেখানে পুঞ্জীভূত হইয়াছে। সেখানে গঙ্গার ঘাটে লক্ষ ছাত্র স্নান করে, এবার সেই নবদ্বীপে আবির্ভাব। এবারে বর্ষাকালের আঁধার রাত্রি নহে। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার সন্ধ্যা। বঙ্গদেশে নববসন্ত সমাগমে যত তরু, যত লতা, নূতন পাতায় নূতন ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। গাহিয়া গাহিয়া কোকিলের গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জয়দেব ও চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সাধনার মধ্য দিয়া বৃন্দাবনের বসন্ত ঋতু ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালা দেশেই আসিয়াছে। তাই আজ মলয়সমীরণ সুকুমার লবঙ্গলতাসংসর্গে পরমসুরভি, কুঞ্জকুটির মধুকরনিকরের ঝঙ্কার-মিশ্রিত কোকিল-কাকলীতে মুখরিত। ভ্রমরকুল-সমাচ্ছন্ন বকুল-কলাপ নিরাকুল। এই বসন্তের পূর্ণিমার সন্ধ্যায় বৃন্দাবনের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যসম্ভার নদীয়ায় উপস্থিত। কেন্দুবিল্বের কবি অজয়ের বীচিমালার নৃত্যের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস ঢালিয়াছিলেন এতদিন অজয় যেন রাঢ়দেশের নিভৃত পল্লীর মধ্যে তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, আজ পবিত্র কণ্টকনগরীর মূল হইতে নদীয়া-পর্য্যন্ত ভাগীরথীর বুকে সেই উচ্ছ্বাস বাজিয়া উঠিল।

ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিত কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ কুটিরে॥
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে॥

বসন্তের পূর্ণিমার সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণ! আমাদের পৃথিবীর কলঙ্কযুক্ত চাঁদ আকাশে উঠিয়াছিলেন। রাহু আসিয়া বলিল, ভাই আজ আর উঠিও না, আজ চাঁদের হাট—"সেই মন্ত্রময় সার্দ্ধ-চব্বিশ চাঁদ" আজ আসিতেছেন। সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণ। বালবৃদ্ধ যুবানারী, কেহই ঘরে নাই, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে গঙ্গাস্নানে

চলিয়াছেন। আজ বধির শ্রুতিশক্তি পাইয়াছে, পঙ্গু চরণ পাইয়াছে। গঙ্গার বুকে মৃদুল মলয়ে তরঙ্গসমূহ জাগিয়া, কলকল ছলছলে যেন হরি হরি বলিয়া তারার ছবি বুকে লইয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া চলিয়াছে, তটের চরণে আসিয়া মাথা লুটাইয়া লুটাইয়া আনন্দভরা করুণ সুরে যেন বলিতেছে, তট, তুমি কঠোর মৌন কেন? ভাঙ্গিয়া পড়, গলিয়া যাও মিশিয়া যাও, চল আমাদের সঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে নাচিতে নাচিতে, গ্রামে গ্রামে এই আনন্দ-বার্ত্তা কীর্ত্তন করিবে। এই সত্য জাগরণ।

আমরা যাহাকে জাগরণ বলি, তাহা অবিদ্যায় দুঃস্বপ্ন দর্শন। হরিনামে হৃদয় যখন গলিয়া নাচিয়া উঠে, হরিনামে সকলের সঙ্গে যখন এক হইয়া যাই, তখনই সত্য জাগরণ। আজ বসন্তের পূর্ণিমার সন্ধ্যায় সত্য জাগরণের মধ্যে ভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জন্মাষ্টমী ও ফাল্গুনী পূর্ণিমা—মথুরা ও নবদ্বীপ। যাহা কারাকক্ষে নিভৃতে কেবলমাত্র দুইজনের জ্ঞাতসারে হইয়াছিল,—আজ তাহা জগতের হইল। আজ বন ভাঙ্গিয়া দ্বীপ রচনা করা হইল। সাগরের মধ্যে—সংসার-সাগরের মধ্যে এই নবদ্বীপ। উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রের বুকে যত জাহাজ সব ডুবিয়া গিয়াছে—এমন দুর্দ্দিনে এই নবদ্বীপ রচিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য এই উভয়তত্ত্বের মধ্যে যে গূঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহা এই প্রকারে অবধারণ করিতে হইবে।" *

কংসের অধিষ্ঠান-ভূমি হইতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কিরূপ তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। প্রাচীন আচার্য্যেরা ইঙ্গিতে এই সব কথা বলিয়াছেন। শ্রীধর স্বামী শ্রীকৃষ্ণ-লীলার প্রারম্ভে বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ "প্রতীতি" ছিল। 'বৈষ্ণব তোষণী' বলিয়াছেন—অজ্ঞজনের প্রতীতি অন্যরূপ। শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাবের প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ কারণ আছে। এই সব ইঙ্গিত অবলম্বন করিয়া লীলার তত্ত্ব অবধারণ করিতে হইবে।

ইতিহাসের কৃষ্ণ, আর উপাসকের কৃষ্ণ, ঠিক্ এক জিনিস নহে। উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আছে, কিন্তু তাহাও যে খুব বেশী উপাসকেরা তাহা মনে করেন না। কৃষ্ণ-

---

* নবদ্বীপ-নিদাঘ-বিদ্যালয়ে কথিত ও পনর বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত "শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য"-নামক অধুনা-নিঃশেষিত গ্রন্থ হইতে চিহ্নিত অংশ উদ্ধৃত।

উপাসনার ভিত্তি শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা নহে, ভক্তহৃদয়ের অনুভব ও জ্ঞানীর তত্ত্ববোধ, এই দুইটির উপর নিত্য-কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা এবং ইনিই ভক্তের বা উপাসকের কৃষ্ণ। Historicity is not the basis of Krishna-worship. The basis is the spiritual experiences of the devotees.

ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।

আর এক কথা—"অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ"—আজও সেই লীলা চলিতেছে।

কংস কিরূপ বুঝিয়াছিল তাহা আর একটু বিস্তারিত-রূপে চিন্তা করা যাউক।

৮। কংসের মন্তব্য

মনে করুন, সে সময়ে মথুরায় কংসরাজার নিজের দৈনিক খবরের কাগজ ছিল, সেই খবরের কাগজের পুরাতন সংখ্যা খুঁজিয়া বাহির করিয়া ঠিক জন্মাষ্টমীর পরের দিনের কাগজখানির সংবাদস্তম্ভ পড়িয়া দেখুন। দেখিবেন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি লীলা-গ্রন্থে যাহা লেখা আছে, কংসের খবরের কাগজে তাহার কিছুই লেখা নাই। সে কাগজে এইটুকু মাত্র লেখা আছে যে 'কাল রাত্রিতে খুব দুর্যোগ গিয়াছে, আকাশ মেঘাবৃত ছিল, সমস্ত রাত্রিই বৃষ্টিপাত হইয়াছিল, যাহা হউক কারারুদ্ধা দেবকীর সন্তান প্রসূত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকায় মহারাজা বাহাদুর স্বয়ং এবং পাত্রামাত্রপারিষদ্ আদি সকলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়াছিলেন। প্রহরীগণও সকলে খুব সতর্কভাবে জাগিয়া বসিয়াছিল। কয়েক-দিন হইতে মহারাজা বাহাদুর দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাহার পর সারাদিন নানারূপ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, এজন্য লোকে মনে করিয়াছিল রাত্রিতে দেবকীর সন্তান প্রসবের সময় কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবে। কিন্তু রাত্রিতে কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটে নাই। রাত্রি যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন দেবকী একটি কন্যা প্রসব করিলেন। নিমেষের মধ্যে সংবাদ পাইয়া মহারাজা বাহাদুর স্বয়ং কারাকক্ষে প্রবেশ করিলেন ও স্বয়ং স্বহস্তে বালিকাকে লইয়া আসিয়া নদীতীরে পাথরের উপর আছাড় মারিয়া মারিতে চেষ্টা করিলেন। এই সময়ে এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। মহারাজা বাহাদুর যেমন সদ্যঃ প্রসূত বালিকাকে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিবার জন্য হাত উপরে তুলিয়াছেন অমনি সেই বালিকা হাত হইতে পিছলাইয়া অদৃশ্য হইল। সহরে সাধারণ অশিক্ষিত লোকসকল

এইরূপ জনরব তুলিযাছে যে সেই বালিকা শূন্যে উড়িয়া গেল ও অস্ত্রেশস্ত্রে ভূষিতা উজ্জ্বল গৌরবর্ণা অষ্টভূজা মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া মহারাজা বাহাদুরকে সতর্ক হইবার জন্য আদেশ করিয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। অশিক্ষিত লোকের এই জনরব বিজ্ঞানসম্মত নহে এবং সর্ব্বৈব মিথ্যা।”

জন্মাষ্টমীর পরদিন মথুরায় যে দৈনিক পত্র বাহির হইয়াছিল, তাহাতে এইরূপ কথাই লিখিত ছিল। তাহার পরদিনের কাগজে সম্পাদক মহাশয় (এই সম্পাদক মহাশয় বোধ হয় কংসরাজার একজন পুরোহিত। এই পুরোহিতদিগের অমোঘ দৃষ্টির (?) কথা শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় দৃষ্ট হইবে) লিখিলেন “কতকগুলি ধূর্ত্ত ও কুসংস্কার-রোগগ্রস্ত পাগল লোক সহরে রাষ্ট্র করিতেছে যে কাল রাত্রিকালে স্বয়ং মহারাজা বাহাদুর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রহরীগণ পর্য্যন্ত সকলে দীর্ঘকাল নিদ্রায় অচেতন হইয়াছিল। এত অচেতন হইয়াছিল যে কতক্ষণ সময় যে ঘুমাইয়াছিল তাহা তাহারা জানে না। এই পাগলদিগের দলের সেই সর্দ্দার বলিতেছে, শুধু তাহাই নহে, ঘড়ির কাঁটা তো দূরের কথা, আকাশের তারকা পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল গতিহীন হইয়াছিল। এই সভ্য যুগে, এই উন্নত মথুরা রাজ্যে যে এই প্রকারের বিজ্ঞান ও দর্শন-বিরুদ্ধ কথা প্রচারিত হয়, ইহাই আশ্চর্য্য! তারকারা গতিশূন্য ছিল, কালস্রোত প্রবাহিত হয় নাই, সমস্ত লোক ঘুমাইয়া ছিল, ইহা হইতেই পারে না। কারণ, বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের সমস্ত সিদ্ধান্ত ইহার বিরোধী। পরম্পরায় রাষ্ট্র যে পাগলেরা সহরবাসীকে উত্তেজিত করিতেছে ও বলিতেছে “ভাই সকল প্রস্তুত হও, সুসময় আসিতেছে—বিরজার পরপারে পরব্যোমমধ্য হইতে বৈকুণ্ঠ রাজ্য আসিতেছে—এই মথুরায় বৈকুণ্ঠ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তোমরা সকলে প্রস্তুত হও। হিংসা দ্বেষ পরিত্যাগ কর। অহঙ্কারের নঙ্গর তুলিয়া মহীয়সী ও মঙ্গলময়ী ইচ্ছার স্রোতে নিজ নিজ জীবন-তরণী ছাড়িয়া দাও, সুসময় আসিতেছে, বৈকুণ্ঠ সমাগত প্রায়—প্রস্তুত হও। আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করি মহারাজা বাহাদুর কঠোর আইন করিয়া এই সমস্ত দুষ্ট লোক এইরূপ পাগলের প্রলাপ যাহাতে সহরে রাষ্ট্র করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন।”

মথুরার সংবাদপত্রে এইরূপ সংবাদ লিখিত হইয়াছিল। আমরা যদি মথুরায় থাকিতাম, তাহা হইলে এই পর্য্যন্তই জানিতে পারিতাম। ইহার বেশী আর আমাদের জানিবার শক্তি হইত না।

কিন্তু যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত বা অন্য লীলাগ্রন্থ পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে পূর্ব্ব রাত্রিতে কত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু কংস ও তাঁহার স্বপক্ষীয়গণ এই সমস্ত ঘটনার কিছুই জানিতেন না। কংসকে, তাঁহার গুরু দেবর্ষি নারদ আসিয়া আভাষে কিছু কিছু বলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি সামান্য আভাষ পাইয়াছিলেন, কিন্তু সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারেন নাই।

যিনি যোগমায়া, তিনি সেদিন যাহাদের ঘুম পাড়াইয়াছিলেন, তাহারা কেহই এই আবির্ভাব বুঝিতে পারে নাই।

৯। দেবকী ও বসুদেব

কংসের অধিষ্ঠান-ভূমি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া খুবই কঠিন। শ্রীভগবানের কৃপায় যদি আমরা পরিত্রাণ পাই, যদি আমরা 'বসুদেব-দেবকী'র অধিষ্ঠান-ভূমি অথবা তাঁহাদের পদরেণু লাভ করি, তাহা হইলে আমাদের সংসারের এই আঁধার কারায় এমন স্নিগ্ধ মধুর আলোক আসিবে, যে-আলোক পৃথিবীর চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারায় নাই, সেই আলোকে এমন গন্ধ ভাসিবে, নন্দনের সদ্যস্ফুট মন্দারেও সে সৌরভ নাই, দিব্যবীণা বেণুর ধ্বনি জাগিবে। হাতের বাঁধন, পায়ের বাঁধন টুটিবে, বুকের পাথর সরিবে। ভিতর বাহির প্রেমালোকে ভরা, দেবরূপী আমরা দেখিব, দেবকী ও বসুদেব যাহা দেখিয়াছিলেন। এইখানেই তাহা দেখিব। আমাদের সকলের সংসারের এই জীবনে সত্য সুধু দেবকী ও বসুদেবের কারাবাস ও তপস্যা। অবশিষ্ট যাহা কিছু, সবই ছায়া ও মায়ার ছলনা। দেবকী-বসুদেবের নিকট শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশই সেই নিত্য পরম ঘটনা, যাহার জন্য পীড়িত বিশ্ব চির-প্রত্যাশী। দেবকী ও বসুদেব দেখিয়াছিলেন—

দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ। আবিরাসীদ্যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ॥

তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধং।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভি কৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্র-পয়োদসৌভগং॥
মহার্হবৈদূর্য্য-কিরীটকুণ্ডলত্বিষা পরিষ্বক্ত সহস্রকুন্তলং।
উদ্দাম কাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভির্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত॥
স বিস্ময়োৎফুল্লবিলোচনো হরিং সুতং বিলোক্যানকদুন্দুভিস্তদা।
কৃষ্ণাবতারোৎসব সংভ্রমোঽস্পৃশন্মুদা দ্বিজেভ্যোঽযুতমাপ্লুতো গবাং॥

অর্থৈনমস্তৌদবধার্য্য পুরুষং পরং নতাঙ্গঃ কৃতধীঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
স্বরোচিষা ভারত সূতিকাগৃহং বিরোচয়ন্তং গতভীঃ প্রভাববিৎ॥

পূর্ব্বদিকে পূর্ণচন্দ্রের উদয় যেমন হয়, দেবরূপিনী দেবকীতে সর্ব্বগুহাশয় বিষ্ণু সেইরূপে আবির্ভূত হইলেন। বসুদেব দেখিলেন অদ্ভুত সেই বালক, পদ্মলোচন, চতুর্ভুজে শঙ্খ গদা প্রভৃতি আয়ুধ, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসনামক রোমাবর্ত্ত, গলদেশে কৌস্তুভমণি, পীত বসন, স্নিগ্ধ নীল নীরদের ন্যায় সুন্দর তাঁহার বর্ণ। মহামূল্য বৈদূর্য্যমণিময় কিরীট ও কুণ্ডলের প্রভায় তাঁহার অপরিমিত কেশদাম দীপ্ত; তাঁহার সমগ্র দেহ মেখলা অঙ্গদ ও কঙ্কণ প্রভৃতির দ্বারা শোভিত। বিস্ময়োৎফুল্লনয়ন আনকদুন্দুভি (বসুদেব) শ্রীহরিকে পুত্ররূপে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের অবতারের উৎসবের জন্য সম্ভ্রমযুক্ত (ত্বরান্বিত), ও আনন্দরসে আপ্লুত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মনে মনে ব্রাহ্মণকে অযুত গাভিদানের সংকল্প করিলেন। হে ভারত, তাহার পর কৃতধী বসুদেব বুঝিলেন, এই পুত্রই পরম পুরুষ—চরণে প্রণত হইয়া যুক্তকরে নির্ভয়ে স্তব করিতেছেন। সে-সময়ে বালকের অঙ্গকান্তিতে সূতিকাগৃহ উদ্ভাসিত। –

বসুদেবের এই দর্শন ও বোধই মূল সত্য—জগজ্জীবের হৃদয়ে হৃদয়ে এই বোধ জয়যুক্ত হউক।

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গঃ
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥
জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥

হিন্দু-সভ্যতা

(অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)

আমি হিন্দু। আমি হিন্দু, আমি হিন্দু, আমি হিন্দু—এই কথা মনে মনে যখন আমি ব'লতে থাকি, আমার হিন্দুত্বের কথা যখন সমস্ত মন দিয়ে এইরূপে আমি নিজে নিজে অনুভব করবার চেষ্টা করি, তখন অনেক সময়ে একটা অপূর্ব্ব ভাবের দ্বারায় আত্মহারার মতন হ'য়ে যাই, আর যে অদৃষ্ট আর অদৃশ্য শক্তি, যাকে কর্ম্মসূত্রই বলো আর ঈশ্বরই বলো, যার প্রসাদে ভারতবর্ষে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে হিন্দু হবার জন্ম-সৌভাগ্য আমার ঘ'টেছে, সেই শক্তির প্রতি বিশেষ এক কৃতজ্ঞতা-রসে আমার মন তখন ভ'রে যায়। ভারতবর্ষের বাইরে আর ভারতবর্ষের ভিতরে নানান্ জা'তের লোকের সঙ্গে আমার মেশবার সুযোগ হ'য়েছে, নানা দেশের রীতি-নীতি কায়দা-করণ ভাব-ভঙ্গী চিন্তাপ্রণালী আমি দেখে এসেছি। নানা সভ্য আর স্বাধীন জাতের লোকের সঙ্গে মিশেছি। আমাদের ভারতবর্ষ এখন পরাধীন, আমাদের ভারত এখন দারিদ্র্যের, অজ্ঞতার আর ভয়ের ভারে নিপীড়িত, ভারতের নরনারী দেহে দুর্ব্বল মনে নিস্তেজ, বহু শতাব্দীর দাসত্বের কলঙ্কের বোঝা মাথায় ক'রে ব'য়ে ব'য়ে ভারতবাসী তার সরল নির্ভীক স্বাধীন চিন্তার শক্তি, তার স্ফূর্ত্তিপূর্ণ মানসিক বিকাশকে যেন হারিয়ে ফেলেছে—ভারতবাসীর পূর্ব্বগৌরব অস্তমিত। তার আভিজাত্য ভুলে গিয়ে অনেক বিষয়ে সে এখন বর্ব্বরের মতন মনোভাবের আশ্রয় গ্রহণ ক'রেচে। কিন্তু এই সমস্তর মধ্যেও এক চিরন্তন মানসিক স্বাধীনতার উৎস আমি দেখি আমার ভারতীয়, হিন্দু পূর্ব্বপুরুষদের চিন্তার মধ্যে, আমার হিন্দু মনোভাবের মধ্যে, আমার হিন্দু সভ্যতার মধ্যে। লাটিন কবি ভর্জিল ব'লে গেছেন totamque infusa par artus mens agitat molem, et magno se corpore miscet (and mind, pervading its members, sways the whole mass and mingles with its mighty frame); পালি ধর্ম্মপদের গোড়ার শ্লোকেই বলা হ'য়েছে—"মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা, মনোসেট্‌ঠা মনোময়া"—মানুষের ধর্ম্ম অর্থাৎ স্বাভাবিক বৃত্তি মনকে অনুসরণ করে, মনই ধর্ম্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্ম মনোময় অর্থাৎ ধর্ম্ম মন থেকেই উৎপন্ন হয়;—অর্থাৎ মানুষের স্বভাব বা চিন্তা মনের দ্বারাই অনুপ্রাণিত আর পরিচালিত হয়, জীবের সমস্ত ভাব আর চেষ্টা বা কার্য্য মন থেকেই উৎপন্ন হয় আর মনের স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এই মনকে উন্মুক্ত রাখবার চেষ্টা ক'রেছে, পারমার্থিক আর আধ্যাত্মিক বিষয়ে একে পূর্ণ স্বাধীনতা

দিয়েছে একমাত্র আমার হিন্দু সংস্কৃতিতে ; আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা গায়ত্রী মন্ত্র খালি এই চাইছে, যেন পরমেশ্বর ধীশক্তিকে, আমাদের বুদ্ধিকে পরিচালিত করেন,—"ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ," অন্য কিছু প্রার্থনা নয়। প্রাচীন যুগে আমাদের অন্যতম আধ্যাত্মিক কাম্য ছিল "অপ্রমাদ", যাতে আমাদের মনন-শক্তি তার শুভ্র জ্যোতির আলোক ত্যাগ ক'রে প্রমত্ত ভাবের ধোঁয়ায় ম্লান না হয়। এই মনের স্বাধীনতা আমাদের হিন্দু ধর্ম্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা ব'লে এখনও এই পতনের যুগে এই আপৎকালে যে সময়ে আমাদের মধ্যে বহু নিন্দার বিষয়, বহু কুপ্রথা এসে প'ড়েছে সে সময়েও আমরা একেবারে বর্ব্বর হ'য়ে যাই নি।—আমাদের সভ্যতার মূল কথার মধ্যে একটী হ'চ্ছে এই মানসিক স্বাধীনতা, আর একটী পরের সঙ্গে সহানুভূতি আর পরমত-সহিষ্ণুতা ; আমাদের আধুনিক হিন্দুসমাজের বুদ্ধিভ্রংশ অবস্থা, এ সমীক্ষার অভাব আর এর অন্ধ আত্মহনন চেষ্টা আমাদের সভ্যতার মূল কথা নয়। এই জন্য, অন্য স্বাধীন আর সভ্য জগতের উন্নত গৌরবময় অবস্থার সঙ্গে যখন আমাদের ভাঙ্গনের দশার তুলনা করি, তখন আমাদের দুর্দ্দশার কথা ভেবে মনে দুঃখ পাই বটে, কিন্তু আমাদের হিন্দু সংস্কৃতির, হিন্দু চিন্তাধারার আর বাস্তব জগতে হিন্দুর কৃত কার্য্যের ভিতর এমন কিছু দেখি না যার জন্য হিন্দু হ'য়ে জন্মেছি বলে' আমার মনে কোনও লজ্জা বা দুঃখ হ'তে পারে। বরঞ্চ, বাস্তব আর মানসিক জগতে আর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির লোকে আমার জা'ত এমনিই কৃতিত্ব দেখিয়ে এসেছে, সমগ্র মানব জাতির মধ্যে মানুষে মানুষে জা'তে জা'তে ধর্ম্মে ধর্ম্মে সত্যকার সম্বন্ধ কি হওয়া উচিত, সে বিষয়ে এমন কতকগুলি সহজ পথ নির্ণয় ক'রে দিয়েছে, সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের বিপরীত আর বৈরীভাবাপন্ন সম্বন্ধকে কি ক'রে এক পরস্পরের সঙ্গে শান্তি আর সহযোগিতার সূত্রে গাঁথ্‌তে হয়, সে সম্বন্ধে নিজের ইতিহাসে এমনই দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে, যে যার জন্যে অন্য সমস্ত জা'তের তুলনায় আমার হিন্দু জা'তের একটা বৈশিষ্ট্য আমি দেখি ; আর যখন নানা জা'তের মধ্যে প্রতিযোগিতা, পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠুরতা, আর নানা ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা আর অবিমৃষ্য অসহিষ্ণুতার কথা মনে পড়ে, তখন আমি আমার জা'তের সম্বন্ধে একটা অভিমান অনুভব করি, আমার জা'তের অন্য একটা গর্ব্বসুখ আমার চিত্তকে প্রসন্ন ক'রে তোলে।

আমাদের হিন্দু সভ্যতার মূল কথা কি, কোথায় এর বিশেষত্ব, আর এর শ্রেষ্ঠতা, আমাদের, অর্থাৎ ভারতীয় হিন্দুর জাতীয় জীবনে এর স্থান কতটা, আর বিশ্বের তাবৎ মানবের ব্যক্তিগত আর জাতিগত জীবনেও এই হিন্দু চিন্তা আর হিন্দু মনোভাবের উপযোগীতা কতটা,—এই সমস্ত কথা প্রত্যেক হিন্দুর বুঝ্‌তে চেষ্টা করা উচিত ; হিন্দু চিন্তা আর হিন্দু মনোভাব যে একটা বড়ো জিনিস, এই চিন্তা আর মনোভাবের দ্বারায় মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য আর পরমার্থ সম্বন্ধে অতি মহান্ অতি উদার অতি ব্যাপক এক দেশনা আর অনুপ্রাণনা সহজ ভাবেই যে পেতে পারে, যার মহত্ত্ব উদারতা আর ব্যাপকত্ব অন্য ধর্ম্মচিন্তায় দুর্লভ ; পৃথিবীতে নিজের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশকে অবলম্বন ক'রে মানুষকে

শান্তি আর স্বতন্ত্রতার সঙ্গে বাস ক'রতে গেলে আমাদের ভারতের আদর্শের, হিন্দু আদর্শেরই যে আবশ্যকতা আছে,—এই কথাটী যখন আমরা সত্য সত্য উপলব্ধি ক'রবো, তখন ভারতের চিন্তা-জগতের, হিন্দু মনোভাবের, বংশপরম্পরাগত উত্তরাধিকারী ব'লে আমরা এর রক্ষার জন্যে বদ্ধপরিকর হবো, যাতে এই মনোভাবের প্রসূতি আমাদের হিন্দু সভ্যতার, হিন্দু সমাজের হানি না হয়, যাতে আরও এর উৎকর্ষ হয়, সে বিষয়ে অনন্যচিত্ত হ'য়ে আমরা চেষ্টমান থাকবো। আর জ্ঞান-প্রসূত হ'লে পর আমাদের চেষ্টা সার্থক হবে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা আমাদের জীবনের পরম বস্তু পিতৃপিতামহের কাছ থেকে লব্ধ শ্রেষ্ঠ রিকৃথ, ভারতের, এশিয়া মহাদেশের, তথা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনার ধন এই আমাদের ভারতীয় হিন্দু ভাবশুদ্ধিকে বিশ্বমানবের সমক্ষে ভারতবর্ষের মানবের সনাতন দান স্বরূপ আবার উপস্থাপিত ক'রতে পারবো, আর বিশ্বমানব এই দান গ্রহণ ক'রবে, আমরাও পিতৃপুরুষের অনুবর্ত্তন ক'রে কৃতার্থ হবো।

হিন্দু চিন্তার বহিরঙ্গ স্বরূপ যে বাস্তব আর মানসিক জগৎ বহু শতাব্দী ধ'রে গ'ড়ে উঠেছে, যাকে Hindu Culture, Hindu Mental Outlook, Hindu View of Life বলা যায়, তা কেবল আমাদের বুদ্ধি আর বিচার আর কল্পনা শক্তি দিয়ে, আমাদের পঠন আর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দিয়েই চর্চ্চা করা যায়। এখানেই আমরা ধীশক্তির দাবী ক'রতে পারি, কারণ এ জিনিস প্রমাণ-সাপেক্ষ, আধ্যাত্মিক জিনিসের মত এ স্বতঃসিদ্ধ নয়। এক কথায়, ধর্ম্ম আর ইতিহাস এক জিনিস নয়। ধর্ম্মের সঙ্গে ইতিহাসকে জড়িয়ে ফেল্‌লে, ধর্ম্মকে ইতিহাসের ঘটনাবিশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রবার চেষ্টা ক'রলে, ধর্ম্মেরও গৌরব হানি, আর ইতিহাসেরও বিনাশ।

এই ভাব নিয়ে, প্রমাণ আর যুক্তির পথ ধ'রে, আমাদের অতীত আলোচনা ক'রে দেখার সাহস আমাদের থাকা উচিত। পৃথিবীর হাটে আমাদের কৃতিত্বের স্থান কোথা তা যাচাই ক'রে দেখা দরকার। এ সম্বন্ধে আমরা আমাদের হিন্দু মনোভাবের কাছে অসাধারণ স্বাধীনতা পেয়েছি। আমাদের হিন্দুধর্ম্মের মূল মন্ত্র বা ধর্ম্মবীজ যা, তা ইতিহাস-নিরপেক্ষ, কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে বাদ দিলে আমাদের ধর্ম্মের সূত্র ছিন্ন হয় না। এত সহজে ধর্ম্মের "সত্যনাশ"-এর ভয় যখন আমাদের নেই আমাদের পক্ষে আমাদের অতীতের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাটা সহজ। সত্যদিদৃক্ষা নিয়ে, অপক্ষপাত দৃষ্টিতে আমাদের প্রাচীন কথা অনুশীলন ক'রলে পরে, বুদ্ধি আর বিচারের শুভ্র রশ্মিধারা অতীতের অন্ধকার উদ্ভাসিত হবে, অতীতকে সত্যরূপে জান্‌তে পারবো। অতীতের উপর বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠিত, বর্ত্তমানের অনেক সমস্যার অনেক শক্তি আর দৌর্ব্বল্যের মূল অতীতেই, শ্রদ্ধামিশ্র কল্পনার মাল্য-চন্দনে অতীতকে ঢেকে রেখে দিলে বর্ত্তমানকেও আমরা জান্‌তে পারবো না। কিন্তু আমাদের চেষ্টা যাতে সার্থক

তুল্‌তে হবে। এমন দুর্দ্দিন এসেছে যে, যখন আমরা জগতে টি'কে যেতে পারবো কি না সে সম্বন্ধে লোকে নৈরাশ্যের সঙ্গে প্রশ্ন ক'রছে। আমাদের কোন পথে চলা উচিত, কোন্‌ দৌর্ব্বল্য আমাদের দূর করা উচিত, কোথায় আমাদের শক্তিকে আরও জাগ্রত ক'রতে পারি, ইতিহাসের অর্থাৎ জাতীয় জীবনের ঘটনাপরম্পরার প্রতি লক্ষ্য রেখে এ সমস্ত বিষয় না জান্‌তে পারলে আমাদের সংহত হওয়া সম্ভব হবে না।

আমার মনে হয়, হিন্দু অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতার তিনটী বড়ো দান হ'চ্ছে সমন্বয়, সত্যানুসন্ধিৎসা, আর অহিংসা। ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবন মানুষের নিজের অন্তরের ব্যাপার। ধর্ম্মের দুটো দিক আছে—ব্যক্তিগত, আর জাতি বা সমাজ। ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধনার জন্য হিন্দু চিন্তায় "রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাম্‌"—রুচির বিচিত্রতা হেতু সরল কিংবা কুটিল নানা পথ ধ'রে যারা চলে এমন মানুষের জন্য নানা পথের সার্থকতা মেনে নেওয়া হ'য়েছে। মানব জীবনের মতনই হিন্দুধর্ম্ম বিভিন্ন মতের এক বিচিত্র সমাবেশ। এতে একটি মাত্র অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য মতের প্রাধান্য নেই, এতে কোনও এক প্রকার প্রস্থানের বা পারমার্থিক বিচারের গোঁড়ামি নেই। বিশেষ এক রকম ধর্ম্মানুভূতি ছাড়া আর সব রকম অনুভূতি হয় মিথ্যে নয় ভুল—এটা হ'চ্ছে শেমীয় জাতির মধ্যে উৎপন্ন তিনটী বড়ো ধর্ম্ম যা জগতের অনেকখানি জুড়ে আজকাল র'য়েছে তাদের কথা। ভগবান্‌ খালি আমার সম্প্রদায়েরই দখলে, এই রকম স্পর্দ্ধা, যাকে blasphemy বা ঈশ্বরনিন্দা বলা যায়, তা হিন্দুর নেই ব'লে, হিন্দু ভগবান্‌কে ছোটো ক'রে নিয়ে, নিজের দলভুক্ত ক'রে নিয়ে তাঁকে অপমান করার পাপে পাপী হয়নি। "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ" পরমেশ্বর মানুষের মনের ভাবটাই দেখেন, তার উদ্দেশ্য নিয়েই বিচার করেন—এইরূপ ধারণা অবশ্য সব ধর্ম্মের মধ্যেই স্বীকৃত হয়। কিন্তু এই বিশ্বাস হিন্দু একটা অসাধারণ মৈত্রীর সঙ্গে পোষণ করে ব'লে সমস্ত রকমের সাধনার সব পর্য্যায়ের ধর্ম্মানুষ্ঠান আর ধর্ম্মমতের সঙ্গে সহানুভূতি ক'রতে তার পক্ষে বাধে না। যার পাত্র যতটুকু সে কেবল ততটুকুই নিতে পারবে, তার বেশী নিতে পারছে না ব'লে তাকে যেন-তেন-প্রকারেণ নিয়েছি বলাবার চেষ্টা ক'রতে হবে, আর সে যদি নিয়েছি না বলে তা হ'লে তাকে জাহান্নমে পাঠাতে হবে, এরূপ চিন্তা হিন্দুর পক্ষে মনে আনাও অসম্ভব। অধিকারভেদ জিনিসটাকে মানার ফলে, সমস্ত ধার্ম্মিক অনুভূতিকে এক অখণ্ড ধর্ম্ম-সাধনার বিবিধ দিক্‌ বা পর্য্যায় ব'লে হিন্দু মেনে নিয়েছে। হিন্দু খালি একথা বলে না, যে সব ধর্ম্মেই আংশিক ভাবে সত্য আছে। শেমীয় জাতির মধ্যে উদ্ভূত ধর্ম্মের লোকেরা যখন এইরূপ একটা কথা বলেন তখন তাঁরা মনে করেন যে তাঁরা একটা চরম ঔদার্য্য আর খোলা মনের পরিচয় দিলেন। কিন্তু হিন্দু খালি সেই টুকুই ব'লে তার উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখায় না; হিন্দু সহজেই স্বীকার ক'রবে, যত মত তত পথ—

ধর্ম্ম-মতকে সত্য সত্য ধর্ম্ম-মত ব'লে গণনা ক'রতে হ'লে, গোড়ার একটী বিষয় দেখতে হবে—সেটীর সঙ্গে মানুষের নিত্যধর্ম্মের কোনও সংঘাত আছে কি না—মানুষের নিত্য ধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মদমন, সত্যকথন, আস্তেয়, সারল্য প্রভৃতি; আর তার দ্বারা মানবাদি অন্য জীবের কোনও হানি বা ক্লেশ হয় কি না, তাদের কোনও অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় কি না। যদি তা হয়, আর যদি মানুষের নিত্যধর্ম্মের সঙ্গে কোনও সংঘাত থাকে, তা হ'লে হিন্দুর মতে সেই ধর্ম্ম-মত উচ্চ আদর্শ থেকে স্খলিত। সাধারণভাবে যেখানেই আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে একটা চেষ্টা আছে, হিন্দু তাকে গ্রহণ ক'রেছে। এই ভাবে দেখায় দরুণ জগতের সমস্ত ধর্ম্ম-প্রচেষ্টা হিন্দুর চোখে শ্রদ্ধার জিনিস। তবে বিচারের বা অনুভবশক্তির তারতম্য ধ'রে হিন্দু সকলের মর্য্যাদা সমান দিতে পারে নি, এদের নানা স্তরে ফেলেছে। "অগ্নৌ ক্রিয়াবতাং দেবো হৃদি দেবো মনীষিণাম্। প্রতিমাস্বল্পবুদ্ধিনাং, জ্ঞানিনাং সর্ব্বতঃ শিবঃ॥" ব্যক্তিগত জীবনে নিজের নিজের শিক্ষা রুচি আর বোধশক্তি অনুসারে নিজের সাধনমার্গ তৈরী ক'রে নিতে হবে, বা বেছে নিতে হবে,—আধ্যাত্মিক আর মানসিক জগতে মানুষ পূর্ণরূপে স্বাধীন, এখানে আর পাঁচজনে যে মতটীকে শ্রেষ্ঠ ব'লে জোর গলায় চেঁচাচ্ছে তাকে তাঁর আত্মার কল্যাণের জন্যে সেইটেই নিতে হবে তার বিচার-বুদ্ধি, ঈশ্বর-দত্ত তার ধীশক্তিকে খর্ব্ব ক'রে, এরকম অত্যাচার থেকে সে মুক্ত। এই যে মানসিক মুক্তির হাওয়া, যাতে একজন হিন্দু স্বচ্ছন্দে মনে বিচার করে থাকে, যা অন্যত্র সভ্য মানবের একটা নূতন মহাকষ্টে লব্ধ অধিকার মাত্র, সেইটী যখন ব্যক্তিগত জীবন থেকে জাতিগত বা সমাজগত জীবনে এলো, তখনই দাঁড়াল একটা সমন্বয়ের সজ্ঞান চেষ্টা। আর তা ছাড়া ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবনে নিজের রুচি অনুসারে পথ নিজেই খুঁজে নেবো বা কেটে বার ক'রবো, এই থেকে এলো হিন্দুর সত্যানুসন্ধিৎসা।

সমন্বয়ের কথাটা আগে ধরা যাক্। আমার নিজের ধর্ম্মমত আমার কাছে প্রিয়, আমার কাছে সত্য, এই মত নিয়ে যখন আমি চ'লতে চাইবো তখন কারও অধিকার নেই যে আমায় আটকায়। তারা নাই বা আমার মত নিলে,—সকলে কিন্তু আমার মতকে সম্মান ক'রে চলুক, এটী আমি চাইবো। আমি পাঁচজনের কাছে যা প্রত্যাশা করি, আর পাঁচজনেও আমার কাছে তাই প্রত্যাশা করে; কাজেই অপরের মতকে আমার অন্ততঃ বাহ্য সম্মান দেখাতে হয়। ধর্ম্মবিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে একটা নৈতিক বিধি ব'লে স্বীকার ক'রলে, live and let live নীতি তার সহজ সিদ্ধান্ত হ'য়ে দাঁড়ায়। যেখানে অনেক রকমের ধর্ম্ম-মতকে অবলম্বন করে আছে এমন ভিন্ন ভিন্ন জনসমাজকে একত্র বাস ক'রতে হয় আর ধর্ম্ম মতের স্বাধীনতা সবাই স্বীকার ক'রে বলে যেখানে নানা নোতুন মত গ'ড়ে ওঠে আর এই সব নোতুন মতকে নিয়ে লোকে দল পাকায়, সেখানে এই সব মতের একটু ঊর্দ্ধে যাঁরা উঠেছেন তাঁদের মধ্যে নিত্য বা প্রধান স্বরূপগুলিকে বিচার ক'রে আর লৌকিক বা অপ্রধান কথাগুলিকে গৌণ স্থান

দিয়ে, তাদের অন্তর্নিহিত ভাবসাম্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এই সব ধর্ম্মমত নিয়ে একটী সমন্বয় একটী সামঞ্জস্য করবার চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের হিন্দু সভ্যতায় নানা মতের সমন্বয় এই ভাবেই হ'য়েছিল।

যতদিন থেকে "হিন্দু-সভ্যতা" ব'ললে যা বুঝি, যে মনোভাব যে চিন্তাপ্রণালী বুঝি তা স্পষ্ট হ'য়ে রূপ ধ'রে মূর্ত্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, ভারতের আর্য্য আর অনার্য্যের সভ্যতা রীতি-নীতি ধর্ম্ম আর মনোভাবের অপূর্ব্ব মিশ্রণের ফলে, আর আর্য্য ভাষা সংস্কৃত আর পালি প্রভৃতি তথা দ্রাবিড় ভাষা তামিল ইত্যাদিকে অবলম্বন ক'রে ক্রমে তার ভাবগুলি আর তার শাস্ত্র জমাট বেঁধে উঠেছে, ততদিন থেকে ভারতের মনীষীদের মধ্যে চিন্তা-নেতাদের মধ্যে ভারতের আদিম আর পরবর্ত্তী কালে আগত নানা জাতির সভ্যতা আর চিন্তাকে নিয়ে একটী বিরাট সমন্বয় করবার চেষ্টা চ'লেছে। প্রথমটায়, ভারতের অন্ধতমিস্রাচ্ছন্ন প্রাগৈতিহাসিক যুগে হয়তো আপনা আপনি কালধর্ম্মের ফলে নানা জাতির মানুষের প্রতিবেশ প্রভাবে মানুষের কোনও সচেতন বা প্রবুদ্ধ উদ্দেশ্য না নিয়েই এই সমন্বয়ের বীজ উপ্ত হ'য়েছিল। কিন্তু বেদের সময় থেকেই যখন ঋষি তাঁর এক ঋক্‌মন্ত্র রচনা ক'রেছিলেন—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি (যা আছে তা এক; ধীমান্ লোকেরা তাকে বহু ব'লে বলে),—তখন থেকেই এই সমন্বয়ের একটা সচেতন প্রয়াস আমরা দেখতে পাই। এই সমন্বয় চেষ্টা হয়তো কোনও কোনও যুগে ভারতের কোথাও কোথাও এক বিশেষ মতবাদের লোকপ্রিয়তার ফলে স্ফূর্ত্তি পায় নি, কিন্তু কখনও এই চেষ্টা ক্ষুণ্ণ হয় নি, আর বৈদিক যুগের কতকগুলি ঋষি থেকে আরম্ভ ক'রে এখনকার রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সমস্ত শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এই সমন্বয়েরই কথা ব'লে এসেছেন।

ভারতের এই সমন্বয় না হ'য়ে যায় না, কারণ সমগ্র ভারতীয় জাতিটা আর তার সঙ্গে ভারতের সভ্যতা নিজেই যে সমন্বয়ের ফল। গত শতাব্দীর মধ্য ভাগে যখন আধুনিক রীতিতে ভারতের ইতিহাসের আলোচনার সূত্রপাত হ'ল, তখনকার দিনের অল্প খবরের ভিতের উপর অনেকখানি মনগড়া যে ইতিহাসের ইমারত তৈরী হ'য়েছিল, তার বক্তব্য ছিল এই যে, ভারতের সভ্যতার মূলে সমন্বয় নয়, বাইরে থেকে এলো এমন কতকগুলি উচ্চ ধরণের ধর্ম্ম বিশ্বাস দর্শন রীতি-নীতি দ্বারা দেশের অভ্যন্তরের বর্ব্বরতার বিনাশ বা দূরীকরণ; এর মূলে synthesis নয়, suppression বা destruction. এই ইতিহাসের পুনরুদ্ধারের চেষ্টার ফলে যে মত গড়ে উঠেছে, তার কথা এই। অতি প্রাচীনকালে ভারতে কৃষ্ণকায় অসভ্য বর্ব্বর অনার্য্য জাতি বাস ক'রত, শ্বেতকায় সুসভ্য আর্য্যেরা এসে তাদের উপর রাজত্ব ক'রতে লাগলেন যেমন ক'রে আধুনিক ইউরোপের শ্বেতকায় জাতির লোকে গিয়ে নানা দেশে অপেক্ষাকৃত কম সভ্য বা একেবারে অসভ্য কৃষ্ণকায় লোকেদের উপর সহজ আধিপত্য ক'রে থাকে। ভারতের সভ্যতায় যা কিছু শ্রেষ্ঠ, সুন্দর, সত্য, অভিজাত, জ্ঞান আর

সচ্চিন্তার পোষক, সমস্তই এই আর্যাদের দান; আর ভারতের জীবনে যা কিছু ঘৃণ্য, অজ্ঞতার ভয়ের আর নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক, কদর্য্য এবং মিথ্যা, সমস্তই আর্য্য কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে উৎখাত হয়নি এমন অনার্য্যের আহৃত উপাদান। কিন্তু এই ধারণা এখন ভুল ব'লে প্রমাণিত হ'চ্ছে। নানা নূতন তথ্যের উদ্‌ঘাটনের ফলে এখন যে মত দাঁড়িয়ে যাচ্ছে সেটী হ'চ্ছে এই, যে, ভারতের সভ্যতায়, আমাদের হিন্দু সভ্যতায়, অনার্য্য কর্ত্তৃক আহৃত উপাদান খুবই উঁচু দরের, আর বোধ হয় পরিমাণে আর্য্যদের আহৃত উপাদানের চেয়ে কম তো নয়ই, বরং বেশী হবে। একটা তুলনা দিয়ে বলা যেতে পারে, যে, ভারতীয় সভ্যতা যেন একখানা ধূপছায়া কাপড়; তার টানার সুতো হ'চ্ছে আর্য্যদের সভ্যতা আর মনোভাব, আর প'ড়েনের সুতো অনার্য্যদের সভ্যতা আর মনোভাব, দুইয়ে জড়িয়ে হিন্দু সভ্যতার এই চমৎকার বস্ত্র খণ্ড,—টানা পড়েন দুইয়ের আলাদা অস্তিত্ব বা'র ক'রতে গেলে, বিশ্লেষণের চেষ্টায় হিন্দু সভ্যতার সম্পূর্ণাঙ্গ যুগের পূর্ব্বাবস্থায় গিয়ে পৌঁছিতে হয়, তখন কাপড় পাই না, পাই দুই বা তার বেশী প্রস্থ সুতো, অসংপৃক্ত অবস্থায় রয়েছে।

কথাটা একটু খুলে' বলবার জন্য আমাদের হিন্দু জাতির আর সভ্যতার গঠনের বিষয়টা একটু আলোচনা করা যাক্। প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে নানা জাতি এসে বসবাস ক'রেছে। এদের ভাষা ছিল আলাদা আলাদা, এখনও আছে; তেম্‌নি আলাদা আলাদা ছিল (আর অনেক স্থলে আছেও) এদের জীবনযাত্রার প্রণালী, এদের ধর্ম্ম, এদের সামাজিক রীতি-নীতি,—এক কথায়, এই সব জা'তের জগৎ ছিল আলাদা আলাদা। ভারতে যত রকমের জা'ত এসেছে, এসে এখানকার অধিবাসী হ'য়ে গিয়েছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে এখানে যে প্রবর্দ্ধমান জীবনস্রোত ব'য়ে চ'লেছে তার সঙ্গে মিশে একাঙ্গীভূত হ'য়ে গিয়েছে; এমনটী খুব কম দেশেই হ'য়েছে। ভারতের আদিমতম অধিবাসীরা নামহীন, পরিচয়হীন; তার পরে কোল, দ্রাবিড়, আর অন্য জা'ত; হিন্দু আর্য্য; ভোট-চীনজাতি; ইরাণী আর্য্য; যবন বা গ্রীক; শক; হূণ; তুর্ক; আরব; থাই বা আহম; মুসলমান পারসীক; পাঠান; য়িহুদী; সিরীজ; পোর্ত্তুগীজ; আর আধুনিক ইউরোপের ইংরেজ;—সবাই ভারতে স্থান পেয়েছে, ভারতের দিনের পর দিন বৃদ্ধিশীল জীবনে সকলেই অংশ নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "ভারত-তীর্থ" নামে বিখ্যাত কবিতার উদাত্ত ছন্দে ভারতে মহামানবের মিলনের কথা ব'লেছেন, তাঁর এই কবিতা ভারতের হিন্দুর সমন্বয়-প্রয়াসী চিত্তের, যে চিত্ত সকলকেই গ্রহণ ক'রতে চায় কারুকে বর্জ্জন ক'রতে চায় না তার এক আবাহন গীত—

* * * *

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা,

সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থ নীরে।
আজি ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।

"সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থ নীর" দিয়েই ভারতবাসী তার ভারত সংস্কৃতির অভিষেক ক'রে এসেছে, খালি আর্য্যের, ব্রাহ্মণের সৃষ্ট নয় আমাদের হিন্দু সভ্যতা। আর্য্যেরা বাইরে থেকে ভারতে এলো কবে তা কেউ ঠিক ক'রে ব'লতে পারে না। নোতুন কতকগুলি বস্তু বা প্রমাণের বলে একটা মতবাদ আধুনিক কালে অনেকগুলি পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মধ্যে গৃহীত হ'চ্ছে, সেই মত অনুসারে আর্য্যেরা এদেশে আসে খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় সহস্রকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে—খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৫০০র পরে। এই মতবাদটী আমার মনে সব চেয়ে বেশী যুক্তিযুক্ত ব'লেই লাগে। ভারতের ইতিহাস ভারতের বাইরে নানা দেশের সঙ্গে জড়িত। প্রাচীন প্রাচ্য জগতের ইতিহাসের একটা অংশ মাত্র; ভারত যে জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ছিল না, এই বোধটী আমাদের মনে সর্ব্বদা থাকা উচিত। এই বোধ নিয়ে বিচার করি ব'লে, ভারতে আর্য্যদের আগমনের কাল খুব বেশী প্রাচীন যুগের কথা নয় এরূপ মতে আসতে আমার মনে দ্বিধা হয় না। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে যাঁরা আর্য্যবংশধর ব'লে নিজেরা গর্ব্ব অনুভব করেন, আর ভারতের সভ্যতা আর হিন্দু চিন্তা গ'ড়ে তুলেছে এক আর্য্যেরাই এই রকম ভাবতে যাঁরা অভ্যস্ত, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে আর্য্যেরাই জগতের প্রাচীনতম সভ্য জাতি, তাঁরা এই রকম কথা অশ্রদ্ধার সঙ্গে উড়িয়ে দেবেন। তাঁদের সঙ্গে আমি এখন বিবাদ ক'রবো না, কারণ এ ঠিক তার সময় নয়। তবে আমি খালি এইটুকু আবার ব'লবো, যে ধর্ম্ম আর ইতিহাস এক জিনিষ নয়; historyর সঙ্গে theology মিশিয়ে ফেলার সম্ভাবনাটা আমাদের খুবই বেশী আছে। 'আমরাই জগতে ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত দেশে, দেবতাধ্যুষিত দেশে বাস করি, প্রাচীনতম সভ্যতার একমাত্র ওয়ারীসান আমরাই,' এইরূপ বিচার আমাদের দেশে দুর্লভ নয়—যদিও এই বিশ্বাস আমাদের ভারতের সমন্বয়কামী মনোভাবের বিরোধী; আর এইরূপ বিশ্বাস থেকে মনকে মুক্ত না ক'রলে ইতিহাস-আলোচনার অধিকারী হওয়া যায় না।

হিন্দু সভ্যতার উৎপত্তি আর বিকাশ সম্বন্ধে আমার বক্তব্যটা সংক্ষেপে শেষ করি। আর্য্য তো বাইরে থেকে এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন তাঁর ধর্ম্ম, তাঁর আচার অনুষ্ঠান, তাঁর সামাজিক রীতি নীতি, তাঁর সংস্কৃতি। আর নিয়ে এলেন তাঁর অতুলনীয় ভাষা। ঋগ্বেদে আর্য্যদের জগতের পরিচয় পাই, আর এই জগতের জের চ'লেছে অন্য বেদে, ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে, আর গৃহ্য আর অন্য সূত্রগুলিতে। অনেক বিষয়ে ঋগ্বেদের যুগের ধর্ম্মের আর ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মের আর অনুষ্ঠানের একটা মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। আজকাল হিন্দুর দেবসেবার জন্য যে অনুষ্ঠানটী সব-চেয়ে বেশী প্রচলিত, সেটা হ'চ্ছে পূজার অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান সাধারণতঃ গণেশ, শিব, গৌরী, বিষ্ণু, লক্ষ্মী

প্রভৃতি দেবতার আরাধনায়-ই দেখি ; আর এঁরা হ'চ্ছেন মুখ্যতঃ পৌরাণিক অর্থাৎ বেদের পরের কালের দেবতা। এঁদের দু একজনের নাম আর দু একজনের সম্বন্ধে সূক্ত বা স্তোত্র বেদে পাওয়া গেলেও, বৈদিক আর পৌরাণিক বিষ্ণুতে, বৈদিক রুদ্রে আর পৌরাণিক শিবে বিশেষ পার্থক্য আছে। বৈদিক আর পৌরাণিক, দুটী বিভিন্ন জগত, তার দেবতা, আর তাঁদের ক্রিয়া-কলাপ আলাদা। পূজার অনুষ্ঠান পৌরাণিক, পরবর্ত্তী কালের অনুষ্ঠান। বেদে পূজার অনুষ্ঠানের খবর আমরা পাই না ; চার বেদে, আর ব্রাহ্মণগ্রন্থে, আর সূত্রগুলিতে যে দেবসেবার বিধি আমরা দেখতে পাই, তা হ'চ্ছে হোম। হোম আর্য্যদের নিজস্ব দেবপূজাবিধি ; ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ বর্ণ, যাঁরা আর্য্যবংশধর ব'লে স্বীকৃত হন, একমাত্র তাঁরাই হোমের অধিকারী, দ্বিজেতর অন্যজাতি কেবল পূজার অধিকারী। পূজা আর হোম, দুইয়ের অন্তর্নিহিত ভাব পরস্পরের থেকে পৃথক্। বৈদিক দেবতারা স্বর্গে, অর্থাৎ আকাশে থাকেন, তাঁরা সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট, ৩৩ জন ; তাঁরা কতকটা মানবধর্ম্মী ; তাঁদের কাছে মানুষ প্রার্থনা করে দীর্ঘ আয়ু, বহু বীর পুত্র, গো'-অশ্ব ধান্য সম্পৎ, সুখ। দেবতাদের প্রসন্ন ক'রবার জন্য মানুষে তাঁদের অর্ঘ্য দেয়, তাঁদের জন্য পশু হত্যা ক'রে তার মেদ আর মাংস বেদির উপর কাঠের আগুন ক'রে তাতে পোড়ায়, পুরোডাশ বা যবের রুটি আগুনে দেয়, দুধ দেয়, ঘী দেয়, সোমরস দেয় ; এক কথায়, তার শ্রেষ্ঠ খাদ্য সে আগুনের মধ্যে দিয়ে দেবতাদের নিবেদন ক'রে দেয়। আগুন হ'চ্ছে দেবতাদের দূত, আগুনেই দেবতাদের বহন ক'রে আনে, আগুন মানুষকে পিতার ন্যায় রক্ষা করে, আগুনে হোম ক'রলে এই সব ভোজ্যবস্তু দেবতাদের ভোগে উপস্থিত হয়। বেদের জগতের এই হোমের অনুষ্ঠান, এর অনুরূপ অগ্নিতে মাংস বা মদ্য আহুতি দিয়ে দেবসেবা আর্য্যদের যে সমস্ত জাতি ভারতের বাইরে বাস ক'রত তাদের মধ্যেও পাওয়া যায়—যেমন প্রাচীন পারসীকদের মধ্যে, গ্রীক, ইটালিক, কেল্টিক, জরমানিক, স্লাভদের মধ্যে। কিন্তু পূজা অনুষ্ঠানের মধ্যেকার ভাবটী হোমের থেকে একেবারে অন্য রকমের। সমস্ত বিশ্ব ব্যেপে এক পরম আত্মা র'য়েছেন। এই পরম আত্মার কাছ থেকে মানুষ সাহায্য চায়, এঁকে দুঃখ নিবেদন ক'রতে চায়, এঁর সামনে আত্মনিবেদন ক'রতে চায়। এঁর যথাশক্তি যথারুচি সেবা ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রতে চায়। কিন্তু অশরীরী আত্মার তো দর্শন মেলে না। পূজার রীতিতে সেই আত্মার প্রতীক খাড়া ক'রে সেই প্রতীকের সাহায্যে তাঁর সঙ্গে যোগের চেষ্টা হ'ল। একটী মূর্ত্তি বা চিহ্ন, একটী প্রস্তরখণ্ড, শিবলিঙ্গ বা শালগ্রাম শিলা, বা ঘট নিয়ে, পরমাত্মার বা তদঙ্গীভূত কোনও বিশেষ ঐশী শক্তির প্রতীক হিসাবে বসানো হ'ল ; তারপর বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে সেই ঐশী শক্তিকে আকৃষ্ট ক'রে মূর্ত্তি বা শিলা বা ঘটের মধ্যে স্থাপনা করা হ'ল, দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হ'ল। এই প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পরই প্রতীক আর তুচ্ছ ধাতু বা কাষ্ঠখণ্ড নয়, একেবারে সাক্ষাৎ ভগবানের বিগ্রহ। মানুষে যে সব বাস্তব জিনিসকে শ্রেষ্ঠ ভোগ ব'লে মনে ক'রে থাকে, প্রতিষ্ঠিত এই

বিগ্রহের সাম্‌নে সেই সব ভোগ দেওয়া হ'তে লাগ্‌ল। ফুল, পাতা, ফল, শস্য—এগুলি পৃথিবী থেকে উৎপন্ন, এই দেওয়া হ'তে লাগ্‌ল; গন্ধ, ধূপ, দীপ, সুপকার উৎকৃষ্ট সুখাদ্য, নৃত্য গীত, সমস্তই দেব-বিগ্রহের সেবায় অর্পিত হ'য়ে থাকে, বিগ্রহ যেন মূর্ত্তিমান্ ভগবান, পূজকের আত্মীয় কোন জীবন্ত মানুষের মতন তাঁর প্রীতির জন্য এই সব দেওয়া হয়। দেবতাকে কেউ চিরতরের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেন, কেউবা অল্পকালের জন্য; অল্পকালের জন্য হ'লে আবার বিসর্জ্জন-মন্ত্র দ্বারা ঐশী শক্তি বা পরম আত্মাকে প্রতীক থেকে পৃথক ক'রে দেওয়া হয়, প্রতীক তখন বিশেষত্বহীন পবিত্রতা-বর্জ্জিত মৃৎখণ্ড বা প্রস্তর বা কাষ্ঠ বা ধাতুখণ্ড। হোম আর পূজা, এই দুইটী হ'চ্ছে পৃথক্ পৃথক্ জগতের পৃথক্ পৃথক্ সভ্যতার অনুষ্ঠান। হোম আর্য্যের, আর পূজা আর্য্যাদের পূর্ব্বেকার কালের ভারতের অনার্য্যদের, দ্রাবিড়দের দেবার্চ্চনা পদ্ধতি—এই রকম একটা মত প্রচারিত হ'য়েছে। আর্য্যের আদি ধর্ম্মগ্রন্থে, প্রাচীন যুগের ব্রাহ্মণের উপাসনায় পূজার স্থান নাই। হোমই একমাত্র অনুষ্ঠান; "তন্মদগ্নৌ জুহোতি স দেবযজ্ঞঃ।" 'পূজা' শব্দটী মূলে আর্য্য ভাষার, সংস্কৃতের নয়, এই মত একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত দিয়াছেন। সংস্কৃতের সহোদরা স্থানীয় অন্য যে সব ইন্দো ইউরোপীয় বা আর্য্য ভাষা ভারতের বাইরে বলা হ'ত, যেমন প্রাচীন পারসীক, প্রাচীন আরমানী, প্রাচীন গ্রীক, লাটিন, প্রাচীন আইরীশ, গথিক, প্রাচীন স্লাভ, প্রাচীন কুচীভাষা, সেগুলিতে সংস্কৃত ধাতু আর শব্দের প্রতিরূপ শতকরা আশীটা কি তারও বেশী মেলে। যেখানে একটা সংস্কৃত শব্দের বা ধাতুর প্রতিরূপ ভারতের বাইরের আর্য্য ভাষায় পাওয়া যায় না, সমস্ত আর্য্যভাষার মধ্যে খালি সংস্কৃতেই এই শব্দ বা ধাতুর অস্তিত্ব যেখানে, সেখানে এই কথা ব'লতে হয়, যে হয় শব্দ বা ধাতুটী অন্য সব ভাষায় অপ্রযুক্ত বা লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে; কিংবা শব্দটী মূলে আর্য্য নয়, সংস্কৃতে অনার্য্য ভাষা থেকে গৃহীত হ'য়েছে, তাই এটীকে আদি মূল আর্য্যভাষা থেকে অন্য আর্য্যভাষা পেতে পারে নি। তারপর যদি এইরূপ সংস্কৃতের শব্দের বা ধাতুর অনুরূপ শব্দ বা ধাতু ভারতের অনার্য্য ভাষাতে পাওয়া যায়, তাহ'লে এই শব্দের অনার্য্য ভাষায় উৎপত্তি সম্বন্ধে আস্থা করবার কারণ বেড়ে যায়। ভাষাতাত্ত্বিকেরা এই বিষয়ে প্রশংসনীয় বিদ্যাবত্তার সঙ্গে নানা খুঁটিনাটী আলোচনা ক'রে বা'র ক'রেছেন যে ভারতের আদি যুগের আর্য্য ভাষায় বৈদিক সংস্কৃতে আর পরবর্ত্তী সংস্কৃতে, আর প্রাকৃত গুলিতে বিস্তর অনার্য্য শব্দ গৃহীত হ'য়েছে—দ্রাবিড়ভাষা থেকে আর কোল ভাষা থেকে। ভারতের যা বিশিষ্টতা এমন অনেক বস্তুর নাম, এমন অনেক রীতি বা অনুষ্ঠানের নাম, অনার্য্যভাষা থেকেই সংস্কৃতে গৃহীত হ'য়েছে। 'হোম' শব্দের প্রতিরূপ অন্য আর্য্য-ভাষায় মেলে; কিন্তু 'পূজা' শব্দ কেবল ভারতের সংস্কৃতেই পাওয়া যায়, অন্য আর্য্যভাষায় এ কথা নেই। ভারতের দ্রাবিড় ভাষা থেকে 'পূজা' শব্দের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। ফুল পূজায় প্রধান অঙ্গ। হোমকে বৈদিক সাহিত্যে 'পশুকর্ম্ম' বলা হ'য়েছে, কারণ হোমে পশু-আলম্ভন বা পশু-বধ প্রধান কার্য্য।

সে হিসেবে পুজাকে 'পুষ্প-কর্ম্ম' বলা যায়। এখন দ্রাবিড়ভাষাগুলিতে 'পুষ্পবাচক সাধারণ শব্দ হ'চ্ছে 'পু'; আর 'কৃ' ধাতুর দ্রাবিড় প্রতিশব্দ হ'চ্চে 'শের, চের্.' বা 'গের্'। 'পু-চের্' এইরূপ কোনও প্রাচীন দ্রাবিড় সমস্ত-পদ থেকে 'পূজা' শব্দের উৎপত্তি খুবই সম্ভব। পরে 'পূজ' ধাতুর সৃষ্টি। অবশ্য এটা স্বীকার্য্য যে এই কথা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত সত্য নয়। তবে এই রকম নানা বিষয় আছে যা থেকে এই সন্দেহটা জাগে, বুঝি আমাদের সভ্যতার বহু অংশ আর্য্যদের কাছ থেকে পাওয়া নয়।

এতটা কথার অবতারণা করা গেল খালি এই জিনিষটি দেখাবার চেষ্টায়, যে ভারতবাসীর সভ্যতার মূল খুঁজ্‌তে গেলে খালি সংস্কৃত ভাষার আর আর্য্যের সৃষ্ট ভাবরাজ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখলেই চ'লবে না। অনার্য্য ভাষা, আর তাদের ধর্ম্ম রীতি-নীতির প্রতিও দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে। কোল আর দ্রাবিড়, আর্য্যদের আস্‌বার অনেক আগে থেকেই এই দেশটা দখল ক'রে ব'সেছিল, প্রায় সারা দেশটা জুড়েই ব'সেছিল। এই কোল আর দ্রাবিড় জাতের লোকেরা কর্পূরের মতন উড়ে যায় নি। তারাই আর্য্যদের ভাষা নিয়ে আর আর্য্যদের সঙ্গে অনেকটা মিশে গিয়ে আধুনিক ভারতের জাতির সৃষ্টিতে সহায়তা ক'রেছে। যে সব জা'ত হিন্দু জা'তের গঠনে সাহায্য ক'রেছে, খালি রক্ত-দানেই যে তাদের কার্য্য শেষ হ'য়েছে তা নয়, তাদের আধ্যাত্মিক আর বাস্তব বিশ্বাস রীতি-নীতিও তারা দিয়েছে। ভারতের সভ্যতার বৈদিক যুগ একদিকে, আর পরবর্ত্তী হিন্দু আর বৌদ্ধ যুগ আর একদিকে। বৈদিক যুগের আর্য্যদের রীতি-নীতি ধর্ম্ম মনোভাবের বেশী মিল পাই, ভারতের বাইরের প্রাচীন আর্য্যজাতি-গণের সঙ্গে—প্রাচীন পারসীক, গ্রীক, ইটালিক, কেল্টিক জরমাণিক, শ্লাভ জাতের সঙ্গে। কিন্তু ভারতবর্ষে বৈদিক যুগের পরে অনার্য্যদের সাহায্যে যে সভ্যতা আর্য্যেরা গড়ে তুললেন যে সভ্যতার জগৎ অন্য ধরণের, সেই হ'চ্ছে আমাদের হিন্দু সভ্যতা, যার উত্তরাধিকারী আমরা, অন্তর্ম্মুখীতায়, গভীর অনুশীলনে, বিশ্বের তাবৎ জীবের সঙ্গে সহানুভূতিতে সেবাধর্ম্মে, যে জিনিস জগতে অতুলনীয়। আর্য্য জগতের চিন্তানেতাদের গৌরব এই যে এদেশে বসবাস করবার পর থেকেই ভারতবর্ষে আর্য্য আর অনার্য্যকে মিলিয়ে তাঁরা এক নোতুন ধর্ম্ম আর নোতুন সভ্যতা গঠন ক'রে তুলেছেন। হিন্দু সভ্যতার উৎপত্তি আর বিকাশ নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা এখানে এখন সম্ভব হবে না। তবে তোমাদের এই কথা বলি; এই যে আমাদের চ'খের সামনে সাঁওতাল মুণ্ডা ওরাওঁ প্রভৃতি তথাকথিত অহিন্দু জা'ত উচ্ছ্বসিত উৎসাহের সঙ্গে হিন্দুর গভীর-তর ধর্ম্মজীবনে হিন্দুর বৃহত্তর সভ্যতায় যোগ দিচ্ছে, সংস্কৃত ভাষা যার বাহন সেই হিন্দু সভ্যতাকে নিজেদের ক'রে নিচ্ছে, এই ব্যাপারটা নোতুন নয়। এই সব কোল-জাতীয় মুণ্ডা আর সাঁওতালদের আর দ্রাবিড় জাতীয় ওরাওঁদের জ্ঞাতি যারা তিন হাজার আড়াই হাজার বছর আগে শস্য সমৃদ্ধ গঙ্গার

দেশে বাস ক'রত, আর যারা এখনকার পাহাড়ের আর জঙ্গলের কোল আর ওরাওঁ প্রভৃতিদের মতন সভ্যতায় এতটা হীন ছিল না, বরঞ্চ যাদের একটী উচ্চ ধরণের সভ্যতার খবর আমরা আজ কাল পাচ্ছি, তারাই নবাগত আর্য্যের সঙ্গে যোগ দিয়ে আর্য্যের ভাষা গ্রহণ ক'রে, আর্য্যের ধর্ম্মের আর অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিজেদের ধর্ম্মের আর অনুষ্ঠানের একটী সমন্বয় ক'রে নিয়ে হিন্দু জন-সাধারণে পরিণত হ'য়ে গিয়েছিল। এখনকার সাঁওতাল প্রভৃতিরা যে বিরাট হিন্দু সমাজদেহের অঙ্গীভূত হ'তে চাইছে, এটী কেবল যুগধর্ম্মের কথা নয়, এটী ভারতের ইতিহাসের পত্তন থেকে যে সমন্বয়ের আর একীকরণের স্রোত ব'য়ে এসেছে তারই ধারা মাত্র।

খৃষ্টীয় প্রথম সহস্রকের মধ্যেই, ভগবান বুদ্ধের পূর্ব্বেই, মুটোমুটী ভাবে আমাদের হিন্দু সভ্যতার আধুনিক প্রকাশ এক রকম দাঁড়িয়ে যায়, হিন্দু জীবনকে তার বিশ্ব-সমন্বয়ের চেষ্টার পথে চালিত করা হয়। হিন্দুর শ্রেষ্ঠ চিন্তা যা, তার উপনিষদ, এই সময়ের মধ্যেই রচিত হ'য়ে যায়, হিন্দুর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের, যথা উপনিষদের ঋষিদের, জৈন তীর্থঙ্করদের, আর বুদ্ধদেবের উদ্ভবও এই যুগে। হিন্দুর বিশিষ্ট কতক-গুলি দার্শনিক মতবাদও এই সময়ের মধ্যেই উদ্ভূত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যায়—যথা ব্রহ্ম এবং আত্মা, ও কর্ম্ম এবং পুনর্জন্মবাদ, আর আর্য্যের পশুবধবহুল যজ্ঞের পরিবর্ত্তে এই যুগেই জৈন আর বৌদ্ধের অহিংসা আর জীবদয়া, সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে সহানুভূতি, যা আমাদের ভারতের আমাদের হিন্দুদের এক শ্রেষ্ঠ আদর্শ, ত'-ও সাধারণতঃ গৃহীত হ'তে থাকে, "পশুমারণ কর্ম্মদান" ব্রাহ্মণও এই আদর্শ আন্তরিক-তার সঙ্গে স্বীকার ক'রে নেন। আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের দেবতাগণ এই যুগে সম্পূর্ণরূপে প্রকট না হ'লেও আস্তে আস্তে বৈদিক আর্য্যের দেবতা ইন্দ্র অগ্নি মরুদ্গণ বরুণ সূর্য্য উষা অশ্বি পর্জন্য পূষা প্রভৃতিদের পাশে স্থান ক'রে নিচ্ছেন,—পৌরাণিক বিষ্ণু, শ্রী, রুদ্র-শিব, উমা, এঁরা নোতুন মূর্ত্তিতে দেখা দিচ্ছেন; আর্য্য ব্রাহ্মণের গ্রন্থগুলিতে এঁদের পূজার কথা বিশেষ কিছু আমরা পাই না, কিন্তু হিন্দু সভ্যতার পত্তনের যুগে এঁরা যে নানা অবৈদিক দেবতা ও যক্ষ প্রভৃতি দেবযোনিদের সঙ্গে জন-সাধারণের কাছ থেকে পূজা পেয়ে আস্ছিলেন সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ থাকে না। সমন্বয়ের মূল বাণীটী মেনে নেওয়ার পরবর্ত্তী শতক-পঞ্চের মধ্যে গজমুণ্ড বিঘ্নরাজ গণেশ প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের আজকাল-কার হিন্দুর উপাস্য শিব উমা বিষ্ণু লক্ষ্মী ও হিন্দুর ধর্ম্ম-জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রলেন।

এইরূপে একটা বিরাট সমন্বয়ের ফলে আমাদের ভারতীয় সভ্যতা আর ভারতীয় জীবন পূর্ণতা লাভ ক'রলে। তারপর থেকে আমাদের জাতীয় ইতিহাস হ'চ্ছে এক অতি গৌরবের ইতিহাস। ভারতের বাইরে থেকে যে সব জাতি ভারতে এলো,—পারসীক, গ্রীক, শক, হূণ, ভোট-ব্রহ্ম, শান—এরা ভারতীয় জীবনের অঙ্গীভূত হ'য়ে গেল। আমরা ছেলেবেলায় ইস্কুলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাঠ করি, যে, ভারত বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে একান্তে অবস্থান ক'রছিল, ভারতের সঙ্গে বাইরের

কোনও জা'তের বা দেশের যোগ ছিল না ; India grew in splendid isolation ; বাইরে থেকে বিদেশীরা বার বার ভারতে এসেছে, ভারতবাসীদের জয় ক'রেছে, আর এদেশে রাজা হ'য়ে ব'সেছে, আর ভারতবাসীরা তাদের মেনে নিয়েছে। কিন্তু এই ইতিহাস সত্য নয়, কাল্পনিক মন-গড়া অনুমান-সমষ্টি-মাত্র। নানা নূতন তথ্য এখন আমাদের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হ'চ্ছে,—ভারতের বাইরে এশিয়ার নানাদেশে, আফ্রিকায়। মধ্য এশিয়ার মরুদেশের বালুকার স্তূপে, আফগানিস্থানের বন্ধুর পর্ব্বত গাত্রে, ইন্দোচীনের শ্যাম কম্বোজ চম্পায় অরণ্যানীগ্রস্ত মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষে, ইন্দোনেসিয়া বা দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি আর সেখানকার লোকেদের দৈনিক জীবনে, চীনের আর জাপানের ধর্ম্ম-জীবনে আর শিল্পকলায়, এই ইতিহাস নিলীন আছে। গত পঁচিশ বৎসর ধ'রে লুপ্ত এই কথার উদ্ধার চ'লছে, ভারতবাসীর পুলক আর বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন জগৎ উদ্‌ঘাটিত হ'চ্ছে। আমরা এখন জানতে পারছি যে বাইরে থেকে মাঝে মাঝে দুর্দ্ধর্ষ বিদেশী আক্রমণকারী ভারতের প্রত্যন্ত দেশ অধিকার ক'রেছিল বটে, কিন্তু ভারতের সভ্যতা তাদের বশ ক'রে মানুষ ক'রে নিয়েছিল, তাদের ভারতীয় সমাজে স্থান দিয়েছিল। আর ভারতবর্ষ প্রায় সারা এসিয়া-ময় সহস্রবর্ষব্যাপী এক দিগ্বিজয় ক'রেছিল—এই দিগ্বিজয় পাশব শক্তি নিয়ে হনন আর লুণ্ঠনের অভিযান ছিল না, এই দিগ্বিজয় ছিল ধর্ম্ম-দিগ্বিজয়। "ভারতধর্ম্ম—অর্থাৎ ভারতের শ্রেষ্ঠ দর্শন চিন্তা, কি ব্রাহ্মণ্য কি বৌদ্ধ দর্শন আর চিন্তা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সভ্যতা কলা শিল্প শাসন প্রভৃতি ভারতবর্ষ উদার হৃদয়ে উন্মুক্ত হস্তে জগৎকে বিতরণ ক'রেছে। আর্য্য আর অনার্য্য তাদের মৌলিক পার্থক্য আর ভেদবুদ্ধিকে ভুলে গিয়ে যখন একাঙ্গীভূত হ'য়ে গিয়ে ব্রাহ্মণ্য-জৈন-বৌদ্ধ মতের দ্বারা বৈচিত্র্যযুক্ত এক অভিনব সুসভ্য ভাব-রাজ্য আনয়ন ক'রলে, তখন এই কৃতিত্বের উল্লাস প্রকট বা অপ্রকট ভাবে ভারতের চিত্তকে উৎসাহে কর্ম্মানন্দে ভ'রে দেয়, এই উল্লাসের ফলে ভারত তার ভৌগোলিক গণ্ডীর বা'র হ'ল, তার বাণী জগৎকে শোনাবার জন্য ব্যগ্র হ'ল, আর এইরূপে ভারত চিরন্তনের জন্য পৃথিবীতে তার স্থান ক'রে নিলে। খ্রীষ্ট-জন্মের পরের প্রথম বর্ষ সহস্রক এক হিসাবে ভারত-সভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ, কারণ এই যুগের এশিয়ার ইতিহাস হ'চ্ছে মুখ্যতঃ ভারত সভ্যতার প্রচারের ইতিহাস। L' Inde civilisatrice (India the civiliser), সংস্কৃতি-কারক ভারত—এই আখ্যা দ্বারা একজন ফরাসী লেখক এই যুগের ভারতকে অভিহিত ক'রেছেন। ভারতের এই সভ্যতা প্রচারের ফলে আমরা এক বৃহত্তর ভারতের সৃষ্টি আর বহু শতাব্দী ধ'রে তার গৌরবময় ইতিহাস দেখতে পাচ্ছি ; যবদ্বীপের চম্পা কম্বোজ শ্যামের সভ্যতা, প্রাচীন মধ্য এসিয়ার সভ্যতা, চীনের ও জাপানের আধ্যাত্মিকতা ও শিল্প—এ সমস্তই ভারতে নানা ধর্ম্ম আর চিন্তার সমন্বয়ের ফল, এই সব দেশে ভারতের কার্য্যকারিতা ভারতের মনোভাবেরই ফল।

অত্যধিক সভ্যতার ফলে সব জাতির মধ্যেই একটা মানসিক আর দৈহিক অবসাদ আসে। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে ভারতেরও একটা অবসাদ এসেছিল। আর তার জন্য অন্য জাতির সম্বন্ধে ভারতের একটা সহানুভূতির অভাবও এসেছিল। প্রায় সমগ্র এশিয়ার ধর্ম্ম আর চিন্তা-গুরু হওয়ার ফলে ভারতে মুসলমান জয়ের অল্প পূর্ব্বে বাইরের জাতির সম্বন্ধে একটা অবজ্ঞাও ভারতের চিত্তকে কলুষিত ক'রেছিল। অন্য জাতিকে অবজ্ঞার পাপ থেকে অবশ্য কোন জা'তই মুক্ত নয়। কিন্তু ভারতকে তার জাতীয় মানসিক অবসাদের যুগে এইরূপ মনোভাব, নোতুন কিছু শেখবার অনুপযুক্ত ক'রে তুলেছিল। কাজেই যখন আরবের মরুতে উদ্ভূত নবীন ইস্লাম ধর্ম্ম জরাজীর্ণ গ্রীক আর পারসীক জগৎকে আক্রমণ ক'রে জয় করে, বিজিত গ্রীক আর পারসীকের সভ্যতাকে স্বাঙ্গীভূত ক'রে নিয়ে নবীন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে মধ্য এশিয়ায় অগ্রসর হ'ল, তখন মধ্য এশিয়ার অর্দ্ধ বর্ব্বর তুর্কেরা আরব ধর্ম্ম আর গ্রীক ঈরাণী সভ্যতার এই নূতন সংমিশ্রণকে গ্রহণ ক'রে মুসলমান হ'ল। ঈরাণীদের সাহচর্য্যে, নব ধর্ম্ম আর সভ্যতার গর্ব্বে দৃপ্ত তুর্কেরা যখন অত্যধিক-সভ্যতা-ব্যাধিতে অবসন্ন ভারতকে আক্রমণ করে, তখন ভারতের পতন সহজেই ঘ'টেছিল। তুর্কীদের আক্রমণ আর বিজয় ২ ৩ শতাব্দী উত্তর ভারতে হিন্দুর জীবনে এক প্রবল আঘাত দিয়েছিল। কিন্তু ভারতের আত্মা এই আঘাতে মূর্চ্ছিত হ'লেও মৃত হয় নি। তার অপূর্ব্ব সমন্বয়শক্তি আবার দেখা দিলে, সজ্ঞান-ভাবে নব ভাব-রাজ্য গঠন আবার সুরু হ'ল। মুসলমান সভ্যতা অর্থাৎ—পারস্যের সুসভ্য মনের সংস্পর্শে সংস্কৃত ও আমূল নূতন শক্তি আর সৌন্দর্য্য মণ্ডিত আরবের মনোভাব—ভারতের মনোভাবের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রতে বাধ্য হ'ল, আর এই সহযোগিতার ফলে উদ্ভব হ'ল ভারতীয় সভ্যতার এক অভিনব বিকাশ—ভারতীয় মুসলমান সভ্যতা, যার জগৎকে দান হ'চ্ছে কবীর, আকবর, দারা শেকোহ; দিল্লী আগ্রার বাস্তু-শিল্প, তাজমহল, মোতী মস্জিদ্; মোগল চিত্র রীতি, খেয়াল প্রভৃতিতে ভারতীয় সঙ্গীতের নূতন বিকাশ; নানা নূতন ভারতীয় শিল্প; ভারতের ঐক্যবিধায়ক হিন্দুস্থানী ভাষা; ভারতের ধর্ম্মচিন্তার সঙ্গে তাই জাতি ইস্লামে সূফী চিন্তার অন্তরঙ্গ যোগ; গীত-কাব্যের ভিতর দিয়ে বাঙলার ধর্ম্মজীবনের যে প্রকাশ হ'য়েছিল, যা থেকে আমরা বৈষ্ণব পদ, বাউল, আর রামপ্রসাদী প্রভৃতি গানের উত্তরাধিকারী হ'য়েছি, সেই গীত-কাব্যের প্রকাশকে মুসলমান ভাবে অনুপ্রাণিত ক'রে মারফতী গানের সৃষ্টি। মুসলমান ধর্ম্মের সঙ্গে সংঘাত আর তার সঙ্গে সমন্বয়ের চেষ্টা করেন গুরু নানক, তাঁর শিখ ধর্ম্মের উন্মুক্ত কৃপাণের মতন সর্ব্বজটিলতাচ্ছেদী একেশ্বরবাদ নিয়ে, যা ভারতের জনসাধারণের কাছে নোতুন ক'রে অন্য ভাবে আবার উপনিষদের বাণী শোনাতে পেরেছে। এই সব জিনিসের ভিতর দিয়েই ভারতের নবীন যুগেও তার অপূর্ব্ব সমন্বয় বৃত্তির গতি আমরা দেখতে পাই। মুসলমান যুগের এই সব জিনিস আমাদের কাছে, প্রত্যেক হিন্দুর কাছে, আমাদের ভারতীয়

সভ্যতার অংশ হিসাবে আদরের আর গৌরবের বস্তু। হিন্দুযুগের শ্রেষ্ঠ রিক্থের চেয়ে আমাদের নাড়ীর সঙ্গে এদের যোগ কোনও অংশে কম নয়, সময় ধ'রলে আর আমাদের জীবনে এদের স্থান ধ'রলে বরং অধিকতর নিকটবর্ত্তী।

মন্তব্য, সংবাদ ও বিবিধ

একখানি পত্র

লেখক কে, জানি না; লেখাটির অর্থ এবং অভিপ্রায়ও সম্যক্‌রূপে বুঝিলাম না; চিঠিখানি ডাকে আসিল। ভালই লাগিল, কাজেই নিয়ে ছাপাইয়া দিলাম। লেখকের দেখা, কালে পাওয়া যাইবে।

তিষ্ঠ তিষ্ঠ অগ্রদূত,
মুক্তাকাশে জলন্ত তারকা,
হা হা মোর অন্তরের সখা!
হে মোহন! এ কি কোলাহল—
কুজ্ঝটিকারুদ্ধ দশদিক,
বন্ধুর পিচ্ছিল পথতল!
পথিপাশে ফুঁসিছে নাগিনী,
কোথা তব বাঁশির রাগিণী!
যে বাঁশীতে করিলে উদাসী,
খুলি সপ্তপুরীদ্বার
একাকিনী বাহিরিয়া আসি।
পবন জানিল সমাচার
গৃহশিরে তারকার দল

নীরবে করিল হাহাকার!
প্রভাতের আলোকের মাঝ,
কিরূপ দেখালে ছবিরাজ!
কোথা তব সে উজ্জ্বল আঁখি,
লুকাইলে ফেলিয়া একাকী!
কুলের তো কপাটে আগল
কুলটারে করেছ পাগল
ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই আর
কোথা তব সোণার স্বদেশ,
দীর্ঘ যাত্রা কবে হবে শেষ?
বহিতে পারিনা পদভার
তবু ছুটি পশ্চাতে তোমার
ফিরে চাহ, চাহ একবার!

"যাহার প্রতি সমগ্রের হিতের ভার তাহার নির্লিপ্ত থাকিবার বিধি আমাদের দেশে চলিয়া আসিয়াছে......ব্রাহ্মণও সেইরূপ শূদ্রেহ সেইরূপ নির্লিপ্ত......আমি ভারতবর্ষের সেই ব্রাহ্মণ"—
"জনজনের সঙ্গে জড়িত হইয়া ব্যবসায়ের পঙ্কে লুণ্ঠিত হইয়া অর্থের প্রলোভনে লুব্ধ হইয়া যে ব্রাহ্মণ

শূদ্রত্বের ফাঁস গলায় বাঁধিয়া উদ্বন্ধনে মরিতেছে, গোরা তাহাদিগকে তাহার স্বদেশের সজীব পদার্থের মধ্যে গণ্য করিল না। তাহাদিগকে শূদ্রের অধম করিয়া দেখিল; কারণ শূদ্র আপন শূদ্রত্বের দ্বারাই বাঁচিয়া আছে কিন্তু ইহারা ব্রাহ্মণত্বের অভাবে মৃত সুতরাং ইহারা অপবিত্র, ভারতবর্ষ ইহাদের জন্য আজ দীনভাবে অশৌচ যাপন করিতেছে!" —গোরা, রবীন্দ্রনাথ।

...... "পুরাতনের প্রলয় যজ্ঞের আগুনের শিখার উপরে নূতনের অপরূপ মূর্ত্তি দেখ্‌বার জন্যই পুরুষের সাধনা। রক্তবর্ণ আকাশক্ষেত্রে একটা জ্যোতির্ম্ময় ভবিষ্যৎ দেখ্‌তে পাচ্ছি। দেখ আমার বুকের ভিতরে কে ডমরু বাজাচ্ছে।" —গোরা।

ব্রাহ্মণের নিন্দা

সরলপ্রাণ, নিষ্ঠাবান্‌, ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত অতিশয় ভাল লোক, কিন্তু বর্ত্তমান জগতের জটিল ও কুটিল রীতি কিছুই জানেন না। তাঁহাদের প্রতিনিধি সাজিয়া একদল চতুর লোক তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। কিন্তু, সরলপ্রাণ, ব্রাহ্মণপণ্ডিত তাহা না বুঝিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, আজকাল সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণের নিন্দা,—কলি, ঘোর কলি, ব্রাহ্মণের নিন্দা করা কালের রীতি বা 'ফ্যাশান্‌' হইয়া পড়িল। নিন্দা হইতেছে, কিন্তু, আজকাল নহে, সুদীর্ঘকাল। আর নিন্দা হয় কাহার? প্রকৃত ব্রাহ্মণের নিন্দা হয় নাই, হইবে না এবং হইতে পারে না; প্রকৃত ব্রাহ্মণের সম্মান দেশে বাড়িতেছে। তবে, নিন্দা হয় কাহার? জন্মগত বা জাতিগত ব্রহ্মণ্যের প্রতিপত্তিকামী অযোগ্য ব্যক্তিদেরই নিন্দা হইতেছে। এই নিন্দা আধুনিক নহে। পুরাণেও এই নিন্দা আছে, প্রাচীন সাহিত্যেও এই নিন্দা আছে। ইহা কলির দুর্লক্ষণ নহে। ঘোর কলিকালেও সত্যযুগের দৃষ্টিও অনুভূর কিছু কিছু আছে বা থাকে, ইহা তাহারই সুলক্ষণ। ব্রাহ্মণের বা ব্রহ্মণ্যের নিন্দা নহে, ব্রাহ্মণ-মাত্রেরই নিন্দা নহে, ব্রাহ্মণ-নামধারী একদল লোকেরই নিন্দা হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রের পতনেও এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের নিন্দা, বঙ্গে যবনবিজয়েও এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের নিন্দা। ইতিহাস-প্রভৃতি আধুনিক শাস্ত্রের অনুশীলন প্রয়োজন। ইতিহাসও শাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞানও শাস্ত্র, আধুনিক বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে। 'ব্রাহ্মণ' এই সমুন্নত ও সুপবিত্র কথাটি মূলে 'পারমার্থিক'। ব্যবহারিক বা ঐহিক সুবিধাভোগের জন্য যেদিন হইতে এই কথাটির ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতে নিন্দা আরম্ভ হইয়াছে।

ধর্ম্মস্থানে অধর্ম্মের উলঙ্গ তাণ্ডব-নর্ত্তন অনেকদিনই চলিতেছে, ব্রাহ্মণ শক্তিহীন, জানিয়াও এতদিন কিছু করিতে পারেন নাই। দেশের একদল সাহসী লোক তাহা নিবারণ করিতে চাহে,

ধর্ম্মস্থানের ও তাহার মালিকের সংশোধন চাহে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই নিবারণ ও সংশোধন খুবই কঠিন। দেশের সকল রকম কাজে কয়েকটি দল কেবলই সংগ্রাম করিতেছে, কাজেই দেশের কোন কাজ করা খুবই কঠিন। সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল যে দল, তাহা সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তনের বিরোধী। কারণ পরিবর্ত্তন হইলেই প্রবলতম দল মনে করে তাহার শত্রুদলের শক্তি বাড়িল, আর মনে করে এইবার তাহারও পতন অবশ্যম্ভাবী, কাজেই সুবিধাভোগী একদল লোক পরিবর্ত্তন চাহে না। যদিই বা পরিবর্ত্তন হয়, সে চাহে তাহার দ্বারা হউক, তাহার মতে হউক, অন্যে কেন হস্তক্ষেপ করিবে? ধর্ম্মস্থান যে কলুষিত হইয়াছে, এ-কথা তো অনেককালই লোকে জানে, এতদিন ব্রাহ্মণেরা কিছু করেন নাই, করিতে পারেন নাই, আজও কিছু করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। সুতরাং যাঁহারা ব্রাহ্মণ, তাঁহারা নিশ্চেষ্ট ছিলেন এবং এখনও আছেন। পরিবর্ত্তন-বিরোধী প্রবল দল ব্রাহ্মণের নামটা পাইলে নিজেদের কিছু সুবিধা করিতে পারে। কয়েকজন ব্রাহ্মণ যদি এই নাম দিয়া প্রবলদলের সাহায্য করে, তাহা হইলে কি হয়? এই কতিপয় ব্রাহ্মণের উপস্থিত কিছু পার্থিব সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ বৃহত্তর হিন্দুসমাজে বা আরও বৃহৎ স্বদেশ-সমাজে নিন্দিত এবং ঘৃণিত না হইয়া পারে না।

নিরীহ, দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তোমার লাটবেলাটে দরকার কি? রাজনীতি একটা শাস্ত্র, এই শাস্ত্র যাহারা জানে, এই শাস্ত্রের বিধিব্যবস্থানুযায়ী আন্দোলন করার যাহাদের শক্তি আছে, সাহস আছে, তাহাদের সঙ্গে তোমাদের বিরোধ করা কেন? লর্ড চেমস্‌ফোর্ড যখন লাট ছিলেন, তখন ভারতের জাতীয় মহাসভা বা কংগ্রেস্‌, তাঁহার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিলেন। এই অনাস্থা-জ্ঞাপন বৈধ-আন্দোলনেরই অঙ্গ, জনসাধারণের ইহা করিবার অধিকার আছে। একজন প্রবল ও ধনী ব্যক্তির আহ্বানে নিরীহ ও দরিদ্র ব্রাহ্মণেরা সভা করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়া আসিল। কি বিড়ম্বনা! বেচারারা কি করিল, শতকরা ৯৯.৯ জন তাহা জানে না। নিরীহ ভালমানুষদের দাবাখেলার ছকে বসাইয়া এই প্রকারের রাজনীতির খেলা যাহারা খেলিতেছে, তাহারা প্রবল ও চতুর; তাহারা যাহা করিতেছে তাহা হিসাব করিয়া জানিয়া বুঝিয়াই করিতেছে, সুতরাং তাহাদিগের নিকট আমাদের কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু, যাহারা না জানিয়া এই সব লোকের দ্বারা চালিত হইতেছে, তাহাদিগকে এই সব কথা বুঝাইয়া দেওয়া দরকার।

ব্রাহ্মণের নামে রাজনীতিক্ষেত্রে কোন কাজ করিতে হইলে টোলে আধুনিক ও প্রাচীন রাজনীতি-শাস্ত্রের অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত করা উচিত। ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকারের দাবী ব্রাহ্মণের দিক্‌ হইতে করা অতিশয় অন্যায় কার্য্য। এই সব কাজের ফল এই হইবে যে হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের নামও থাকিবে না। হয়ত তাহাই হইবে, লক্ষণ সেইরূপ; তবে লোককে সাবধান করা উচিত।

বিদেশী রাজার ব্যবস্থাপক সভা, বড়ই কঠিন, সেখানে আমাদের সম্মান নাই, প্রতিপত্তি নাই। তাহাদের রাজনীতি বড়ই কঠিন বিদ্যা, তাহাদের পক্ষের লোক, বাগা বাগা তার্কিক। দেশের পক্ষে সেখানে তাহারাই যাউক, যাহারা তাহাদের রাজনীতিশাস্ত্র বোঝে, তাহাদের পক্ষের তার্কিকদের নিরস্ত করিতে পারে। এ-প্রকারের বিদ্যা এবং সাহস যাহাদের আছে, সেখানে যাইবার উপযুক্ত পাত্র তাহারাই। কিন্তু, আমলাতন্ত্র চায় বেশ পোষ-মানা বোকা-সোকা, ধামা-ধরা জনকতক লোক। "ধর্ম্ম গেল, সমাজ গেল" বলিয়া একটা অকারণ হৈচৈ তুলিয়া কয়েকজন ব্রাহ্মণ পাঁতি দিয়া এই দ্বিতীয় প্রকারের প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য যদি চেষ্টা করে, তাহাতেও কি নিন্দা হইবে না? কাহার মুখ বন্ধ করিবেন? লোকে বলিবে,—সত্য হউক, মিথ্যা হউক লোকে বলিতে ছাড়িবে না, তোমরা তৈলবটের প্রত্যাশায় এই সব অপকর্ম্ম করিতেছ। কাজেই নিন্দা হইবে।

আরও কথা আছে; তাহা এখন থাকুক। 'ব্রাহ্মণ' হইয়া এ-সব কাজ করিতে হইত না, এ-সব কাজ ব্রাহ্মণের নহে। ব্রাহ্মণের কাজ তপস্যা, জ্ঞানচর্চ্চা, জ্ঞানবিতরণ প্রভৃতি। এ-সব কাজ না করিয়া নবযুগের নবহুজুগে মাতিয়া দলাদলির মধ্যে ঢুকিয়া, আধুনিক দলাদলির ময়লা নর্দ্দমার আবর্জ্জনা ঘাঁটিলে নিন্দাই তো হইবে।

এখন উপায় কি! নিন্দা শুনিলেই অন্তর্মুখী হইয়া ভাবিতে হইবে এই নিন্দা সঙ্গত, কি অসঙ্গত? যদি অণুমাত্রও সঙ্গতি থাকে, তাহা হইলে নিন্দকের কথা মাথা পাতিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং সংশোধনের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য। সাংসারিক প্রতিযোগিতায় এই নীতির অনুবর্ত্তন অনেকেরই পক্ষে কেবল কঠিন নহে, অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। আজকাল, নিজের প্রশংসায় ঢক্কানিনাদ অনেকস্থলেই যেন প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। নিজের দোষ গোপন করা, দোষ ধরা পড়িলে কুতর্কের দ্বারা বা মিথ্যাসাক্ষ্যের দ্বারা তাহা অপ্রমাণ করা যেন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, ইহাকে তো ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য বলা যায় না। নিজের দোষ স্বীকার করা ও সংশোধনের চেষ্টা করাই আত্মলাভের পথ, ইহাই ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য। এই পদ্ধতির অনুসরণে যদি সংসারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, যদি নগণ্য, দরিদ্র ও অবজ্ঞাত হইয়া পড়িয়া থাকিতে হয়, ক্ষতি কি? ব্রাহ্মণের তাহাই কি শ্রেয়ঃ নহে?

বৌদ্ধগ্রন্থে আছে, এক উপবনে কতকগুলি যুবক প্রমত্তভাবে আমোদ করিতেছে, আর চোর আসিয়া তাহাদের যাহা কিছু ছিল সব চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহারা চোর ধরার জন্য ব্যস্ত, এমন সময়ে মহাত্মা বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত। তিনি তাহাদের বলিলেন, চোরের সন্ধান করা ভাল, না আত্মার সন্ধান করা ভাল? যদি আত্মার সন্ধান চাও, পথ বলিয়া দিতে পারি। ইহাই ব্রাহ্মণের পথ। কোন কোন ব্রাহ্মণ তাঁহাদের পার্থিব অধিকার-রক্ষার জন্য পূর্ব্বকালে কখন কখন রাজশক্তির সাহায্য

লইয়া সাময়িক সুবিধালাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেই ব্রাহ্মণের ও হিন্দুস্থানের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

ভারতের বা ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য অন্তর্ম্মুখীনতা—Subjective standpoint to life। আশ্চর্য্য কথা, ইহা ইংলণ্ডের ভাবের একেবারে বিপরীত। কিন্তু, কর্ম্মদেবগণ,—বৈবস্বত মনু এবং তাঁহার সহকারীগণ, এই দুইটি দেশকে একসূত্রে গাঁথিয়াছেন। যতদিন সমগ্র মানবজাতির জন্য এই অন্তর্মুখীনতার প্রয়োজন, এই অন্তর্মুখী-চিন্তা, যতদিন সমগ্র পৃথিবীব্যাপী না হইবে, আর ভারতবর্ষ যতদিন এই অন্তর্মুখী-চিন্তার সাধনা করিবেন, ততদিনই ভারতের পরমায়ু;—আধ্যাত্মবিদ্যার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে—তাঁহারা পৃথিবীর ইতিহাস পড়িয়া এই সব কথা বুঝিতে পারিতেছেন, আমাদেরও বুঝিবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

— ——

নূতন মাসিকপত্র

১। **সুদর্শন**—১৩৩৪ সালের আশ্বিন মাস হইতে এই মাসিকপত্রখানি প্রকাশিত হইতেছে। 'বঙ্গ-প্রান্তীয় মঠাধীশ-সম্মিলন' নামে একটি সমিতি হইয়াছে, পত্রখানি সেই সমিতির। তারকেশ্বরের মোহান্তের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সুপ্রবল আন্দোলন হওয়ার পর মঠাধীশ মোহান্তগণ যে আত্মরক্ষার জন্য সমবেত হইবেন, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। আমরা এই পত্রের নবম সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। এই সম্মিলনের কার্য্যের ভিতর সংস্কার বা সংশোধনেরও চেষ্টা আছে। সুতরাং উদ্দেশ্য সাধু। ব্রাহ্মণ হউন আর মোহান্ত হউন, আর আমলাতন্ত্র হউন, নিজেদের দোষ বুঝিয়া যাঁহারা আত্মশোধন করিবেন, তাঁহারাই রক্ষা পাইবেন। মোহান্তগণের আত্মশোধন-চেষ্টা প্রশংসনীয়।

প্রথম কয়েকমাস শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র সরকার মহাশয় সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার লিখিত কয়েকটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ উচ্চাঙ্গের ভাল ভাল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। এখন শ্রীগোবিন্দ রামানুজ দাস মোহন্ত, ইহার সম্পাদক। পোঃ সাতবাঁকুড়া, জেলা মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুমুদবান্ধব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের "বেদস্তুতি" অন্বয়, স্বামী-টীকা, টীকা-ব্যাখ্যা, স্বামী-শ্লোকার্থ ও মূলশ্লোকার্থ সহ বাহির করিতেছেন। টীকার ব্যাখ্যা খুব সুন্দর হইতেছে। এই পত্রখানির বিশেষত্ব ইহাতে বাজে প্রবন্ধ নাই, প্রত্যেক প্রবন্ধই সারগর্ভ। অখিল বাবুর প্রবন্ধের কথাই নাই। বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ বসু মহাশয়ের "ভুবর্লোক-রহস্য", চৈত্র সংখ্যায় শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের "বিশ্বাসের বল", শ্রীললিতমোহন রায় মহাশয়ের ধারাবাহিক প্রবন্ধ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আত্মজীবনকথা" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এই পত্রের লেখকগণ

সকলেই তন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী,—অসার প্রবন্ধ আদৌ নাই, মফঃস্বল হইতে বাহির হয়, এইগুলিই ইহার বিশেষত্ব। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক তিন টাকা মাত্র। আমরা এই পত্রের ও এই সম্মিলনের উন্নতি কামনা করি।

বাঙ্গলা দেশে যে-সব মঠ আছে, তাহাদের ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে এই পত্রে কিছু কিছু আলোচনা থাকিলে ইহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে বলিয়া মনে করি।

২। **শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মাধুরী**—১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাস হইতে এই সুমুদ্রিত ও পরিচ্ছন্ন পত্রিকাখানি আমরা নিয়মিতরূপে পাইতেছি। বর্দ্ধমান জেলার শ্রীপাট শ্রীখণ্ড হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২॥০ টাকা। বাঙ্গলার বৈষ্ণব সাধনায় শ্রীখণ্ডের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। 'খণ্ডবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ, ইঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে প্রাণের প্রাণ করিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের মাধুরীতে বিহ্বল হইয়া সেই আস্বাদন মানব-জগৎকে দিয়া গিয়াছেন। শ্রীখণ্ডের চরণে প্রণাম। পত্রিকাখানির নাম খুব ভাল হইয়াছে। বেদের মধুবিদ্যা শ্রীবৃন্দাবনে মধুমতী সখী, আর তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর। তাঁহার বংশে এখনও অনেক পণ্ডিত আছেন, সাধু, ভক্ত ও ভাবুক আছেন। আজ বাঙ্গলা দেশে সাহিত্যের নামে 'মধু' বলিয়া বিষের ব্যবসায় চলিতেছে, কাজেই খণ্ডবাসীগণ 'গৌরপ্রেমমধু' বিতরণ করিয়া আমাদিগকে বাঁচাইবার জন্য এই যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহাতে আমরা উল্লসিত ও আনন্দিত হইলাম। সম্পাদক মহাশয় "প্রীতি-সন্দর্ভ"এর মূল ও বঙ্গানুবাদ বাহির করিতেছেন। পত্রিকাখানি খুব ভাল হইতেছে, ভাল জায়গার কাগজ, ভাল লোকের হাতে, ক্রমে আরও ভাল হইবে। "শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রিয়-গোষ্ঠী" ইহার সহায় হউন।

৩। **সেবা**—চতুর্থ বর্ষ—কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাস হইতে পুনরায় নিয়মিতভাবে বাহির হইতেছে। আমরা প্রথম চারি সংখ্যা পাইয়াছি। অকিঞ্চনভাবে আজীবন দেশে দেশে ঘুরিয়া ধর্ম্মের জন্য সমাজের জন্য অল্পলোকই খাটিয়াছেন, খাটিতেছেন ও খাটিতে পারেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ ভক্তিবিনোদ, তত্ত্বভূষণ মহাশয় এই শ্রেণীর একজন একনিষ্ঠ সাধক। "গোবিন্দ দাসের করচা" আর বাঙ্গলার বৈষ্ণব-সাধনার প্রতি কোন কোন গ্রন্থকারের অত্যাচার-সম্বন্ধে যে আন্দোলন, এই যোগেন্দ্রমোহনই তাহার নেতা। এই কার্য্যের সমগ্র কৃতিত্ব এই যোগেন্দ্রমোহনের প্রাপ্য। এই কার্য্য করিতে তাহাকে যেরূপ কষ্টস্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এই পত্রিকাখানির তিনিই সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী। পোঃ স্বর্ণগ্রাম, ঢাকা হইতে প্রকাশিত; অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ মাত্র। শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর ধর্ম্মকে উদার-ভাবে প্রচার করা, ধর্ম্মকে কেবল মন্দিরের ভিতর অবরুদ্ধ না রাখিয়া মানবজাতির যাবতীয় কল্যাণমুখী

প্রচেষ্টায় আলোকপাত করিয়া তাহাদিগকে সঞ্জীবিত ও সুপথগামী করাই ধর্ম্মপ্রচারকের কর্ত্তব্য, এইরূপ যাঁহারা বিবেচনা করেন তাঁহারা এই পত্রিকাখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন।

"চৈতন্যভাগবতে শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত" "শিক্ষা-সংস্কার" প্রভৃতি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি সুলেখকগণ নিয়মিত লেখক। এই পত্রিকাখানির বহুল প্রচার প্রয়োজন।

৪। **পূর্ণিমা**—এই নামের দুইখানি পত্রিকা পাইতেছি। একখানির সম্পাদক প্রসিদ্ধ নাট্যকার রায় বাহাদুর নির্ম্মলশিব বন্দোপাধ্যায়, বীরভূম জেলার লাভপুর হইতে প্রকাশিত। এখানি সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকা। বার্ষিক মূল্য তিন টাকা ছয় আনা। ইহাতে গল্প, কবিতা, ছবি, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সবই আছে। মফঃস্বল হইতে প্রচারিত এই কাগজখানির পশ্চাতে অনেকগুলি লেখক ও সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তি আছেন। সুতরাং ইহার উন্নতি ও স্থায়িত্ব একরূপ নিশ্চিন্ত বলিলেও চলে। আমরা পত্রিকাখানির উন্নতি কামনা করি। গত চৈত্রমাসে এই পত্রিকার ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা বাহির হইয়াছে।

"এই নামের দ্বিতীয় পত্রিকাখানি অতিশয় ক্ষুদ্র, ময়মনসিং জেলার আষ্টঘরিয়া নামক গ্রামের (পোঃ আচমিতা) শ্রীশশিভূষণ হোম চৌধুরী ইহার সম্পাদক। এখানি ধর্ম্মপ্রচারিণী। মালিহাটী নিবাসী শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ ঠাকুর (শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশধর) বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত; তাঁহারই শিষ্যেরা এই পত্রিকাখানি বাহির করিতেছেন। সাধু চেষ্টা, সফল হউক। কাগজখানির ছাপা ও কাগজ আরও ভাল হওয়া আবশ্যক।

অন্যান্য পত্র ও পত্রিকা

এই মাসিক পত্রিকাগুলি নূতন। ইহা ছাড়া, হাবড়া, আন্দুল হইতে প্রকাশিত "ভক্তি", হুগলি, এলাটি হইতে 'ভক্তিপ্রভা'; কুমিল্লা—'সাধনা'; নবদ্বীপ "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ" হাবড়া—'সাহিত্য সংবাদ'; আসাম, কোকিলামুখ "আর্য্যদর্পণ" কলিকাতা—'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা, 'মাতৃমন্দির' "সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা" নিয়মিতরূপে পাইতেছি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাক্ষিক বাঙ্গালা কাগজ "তত্ত্বকৌমুদী" পাইয়া থাকি।

সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' 'বঙ্গবাসী' 'মেদিনীপুর হিতৈষী' পঞ্চায়েৎ (ঢাকা), স্বরাজ (পাবনা), 'রাজবাড়ি-পত্রিকা', হিন্দুরঞ্জিকা (রাজসাহি), 'মালদহ-সমাচার' শক্তি (বর্দ্ধমান), খুলনাবাসী ও ইংরাজী সাপ্তাহিক The Indian Messenger আসিয়া থাকে। হিন্দুমিশন (পাক্ষিক), হিন্দু (সাপ্তাহিক), প্রজার কথা (পাক্ষিক), আর্থিক উন্নতি (মাসিক) কৃষিসম্পদ (মাসিক) আসিতেছে।

বীরভূমি ৯—৪, শ্রাবণ, ১৩৩৫

নিত্যলীলা

১। ভক্ত, ভগবান্, ভক্তি

কথাটা এমন, যে আমাদের কাহারও তাহা বলিবার অধিকার নাই। কিন্তু, শ্রীভগবান্ তাহা নিজেই বলিয়াছেন ;—বহু স্থানে বহু প্রকারে বলিয়াছেন, প্রথম প্রথম ইঙ্গিতে ও আভাসে, শেষে সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বলিয়াই আমরা বলি এবং বলিয়া আশা পাই ও বল পাই। কথাটা এই—**"ভক্ত বড়, শ্রীভগবানের অপেক্ষাও বড়।"** কথাটি বহিরঙ্গ-তত্ত্বের বিচার বা পরিমাপের কথা নহে,--অন্তরঙ্গ ও অন্তরতম অনুভবের কথা।

ভক্তের পূজা যখন শ্রীভগবানের পূজা অপেক্ষা বড়, আর তুমি আমি যখন কেবলমাত্র পূজারই অধিকারী, তখন তোমার কাছে, আমার কাছে ভক্তই বড়, ভক্তই প্রথম সত্য ; প্রথমে ভক্ত, তাহার পর ভগবান্। 'ভক্ত' বড়,—ইহার অর্থ 'ভক্তি' বড়। ভক্তি ভক্তের নহে, ভক্তই ভক্তির। অতএব, ভক্তিই বড়, ভগবানের অপেক্ষাও বড়, ভক্তের অপেক্ষাও বড়। এই ভক্তিই খেলা করিতেছেন ; এক হাতে তাঁর ভক্ত, আর এক হাতে ভগবান্,—এই উভয়কে লইয়া ভক্তিদেবী খেলা করিতেছেন। ভক্তির এই খেলার নামই লীলা। যাঁহারা ভাগ্যবান্, তাঁহারা এই লীলা বা ভক্ত-ভগবানে খেলা দেখিতেছেন ; কিন্তু যিনি খেলাইতেছেন, উভয়কেই নাচাইতেছেন, তিনি গোপনে লুকাইয়া আছেন।

এই ভক্তি কি, তাহা জানি না, তবে জানিতে চাই। কখন তাঁহাকে জানিতে বা জানিয়া শেষ করিতে পারিব না। কিন্তু, খুঁজিব ; আর বুঝিব—জানিতে পারিলাম না, বুঝিলাম না, পাইলাম না। 'পাইলাম না' ইহা বুঝিয়া কাঁদিব ও পাগল হইব ; আর

খুঁজিব, কেবলই খুঁজিব। অন্য অভিলাষ যত, সকলই ছাড়িয়া, ধর্ম্মাধর্ম্ম, বেদবিধি, ইহকাল পরকাল, তুমি আমি সব ভুলিয়া, খুঁজিব কেবলই খুঁজিব, অনন্তকাল কেবলই খুঁজিব ;—ইহাই পথ, সাধন-পথ, ভাগবত-ধর্ম্মের সাধন-পথ, শ্রীরাধাগোবিন্দ-আরাধনার পথ। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর এই পথের পথিক হইয়া এই পথে তাঁহার শ্রীপদাঙ্ক চিরকালের জন্য অঙ্কিত করিয়া আমাদিগকে—এই কলির জীবদিগকে, এই পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা বুঝিয়াছি, আর পথ নাই—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। ইহা ছাড়া পথ নাই, আর অন্য পথ নাই। পথিকের পুরস্কার—'পাওয়া' নয়, 'চাওয়া'; 'পাওয়া' নয় 'হওয়া'—কাঙ্গাল হওয়া, ভিখারী হওয়া, পাগল হওয়া। ভক্তি কি? 'অস্য ভজনম্'—শ্রীভগবানের ভজনা, কেবলই ভজনা—এই ভজনাই শেষ, ইহার আর অন্য কিছু পুরস্কার নাই। ভজনা,—নিত্যকালব্যাপী ভজনা, শেষহীন ভজনা।

ভক্তিই বড়, ভক্তিই মূল। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে একটি সম্বন্ধ, এই ভক্তির দ্বারাই স্থাপিত হয়। এই সম্বন্ধ অবশ্য নূতন নহে, নিত্য ও চিরপুরাতন ; কিন্তু, বিস্মৃত। সম্বন্ধ স্থাপিত হয় বলিলে বুঝিতে হইবে, চির-বিরাজিত, অথচ বিস্মৃত,—এই নিত্য-সম্বন্ধ প্রকটিত হয়, ক্রিয়ান্বিত হয়। ইহাও নিত্যের প্রাকট্য। এই ভক্তি যে কেবল ভক্তকে মত্ত ও বিহ্বল করেন, তাহা নহে শ্রীভগবান্‌কেও বিহ্বল করেন, অনুরঞ্জিত করেন, মত্ত করেন।

কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা, ভক্তেরে নাচায়।

ভক্তির কার্য্য অনুরঞ্জন, ধ্বংশও নহে, নব-নির্ম্মাণও নহে। ভক্তি রং ধরান্। ভক্তে যে রং ধরান্, তাহা সকলেই বোঝে, সকলেই জানে, সকলেই দেখে। কিন্তু, অসীম ঐশ্বর্য্যশালী, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি, বাক্যমনের অগোচর অথচ সর্ব্বাশ্রয়, বিরাট মহান্ ও স্বপ্রকাশ বলিয়া যিনি নিখিলবেদে পরিচিত, তাঁহাতেও রং ধরান্, তাঁহাকেও পাগল করেন, বিহ্বল করেন, নাচান্, কাঁদান্, মাতান্! ভদ্রলোকেরা বলিবেন—অসম্ভব, অতি অসম্ভব, অশাস্ত্রীয়, অবৈদিক, অযৌক্তিক—এই কথা ; ভগবান্‌কে আবার মাতাইবে কে? সর্ব্বেশ্বরের আবার ঈশ্বর, সর্ব্বনিয়ামকের আবার নিয়ামক! বাতুলের কথা, অশ্রদ্ধেয়, অশ্রোতব্য।

কিন্তু, ইহাই সত্য। তোমার আমার কথা নহে। যাঁহারা দেখিয়াছেন, জানিয়াছেন,

বুঝিয়াছেন, দেখিয়া জানিয়া বুঝিয়া জগতের গুরু হইয়াছেন, মানবজাতির চিরকালের পথপ্রদর্শক হইয়াছেন তাঁহাদের কথা, হঠাৎ উড়াইয়া দিবেন না। দোহাই ভাই, পায়ে ধরি, কথাগুলি হঠাৎ হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন না। এই কথা বুকের ভিতর লইয়া আমাদের সোণার গৌরের এই সোণার গৌড়দেশ চারিশত বর্ষ ধরিয়া দিনরজনী গুম্‌রাইতেছে, অনির্ব্বচনীয় মর্ম্মব্যাথায় নীরবে কাঁদিতেছে। এই কথা অবৈদিক নহে, বেদগোপ্য। বাংলার কাণে, বাংলার প্রাণে এই বেদগোপ্য কথা গৌর-নিতাই বলিয়া গিয়াছেন। বিস্মিত চকিত বাংলা এই বাণী শুনিয়াছে। চারিশত বর্ষকাল, বড় দুঃখে, বড় দুর্দ্দশায়, বড় যাতনায় ও মর্ম্মপীড়ায় সোণার বাংলাদেশ, এই বাণী,—এই মর্ম্মবাণী বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। এখনও পারে নাই, বুঝিতে ও বুঝাইতে, কিন্তু, পারিবে। ইহাই বঙ্গের মর্ম্মকথা, ভারতের সনাতনী বাণীর ইহাই সারাৎসার। ইহারই নাম প্রেম। প্রাণ দিয়া, সর্ব্বস্ব দিয়া, দীন হইয়া, রিক্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বাঙ্গালী একথা বুঝিবে ও জগৎকে বুঝাইবে। ইহাই বাংলার ব্রত, ইহাই বাংলার পণ, ইহাই বাংলার বৈশিষ্ট্য।

২। প্রেম

কথাটা কি? **ভক্তি—কেবল ভক্তকে নহে শ্রীভগবান্‌কেও অনুরঞ্জিত করে**—বিহ্বল করে, নাচায়, মাতায়, কাঁদায়। ভক্তিদেবী যখন এই কার্য্য করেন, তখন তাঁহার নাম হয় প্রেম বা প্রেমভক্তি। নাম নূতন হউক, কিন্তু বস্তু সেই একই। 'ভক্তিরস্তভজনম্‌' 'পরানুরক্তিরীশ্বরে' 'কস্মৈচিৎ পরমপ্রেমরূপা'। নারদ, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি প্রাচীনদের এই সব কথা, বড় গূঢ়, বড়ই নূতন, আজও নূতন, কালও নূতন, নিতুই নূতন। **প্রেম, প্রেম, প্রেম!**

প্রেম কি? পরানুরক্তি বা ঐকান্তিক অনুরাগের পরাকাষ্ঠাই প্রেম। 'মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ' অতিশয় মমতাযুক্ত হৃদয়-ভাবের নাম প্রেম। আমি তাহারই, সে আমারই; আমি তাহারই, শুধু তাহারই, আর কাহারো নই গো আমি আর কাহারও নই, এই প্রকারের পাগল-করা ভাবের নাম প্রেম। এই ভাব বা প্রেম অক্ষয় ও অমর, কিছুতেই তাহার ধ্বংশ নাই। ধ্বংশের শত শত কারণ রহিয়াছে, অথচ ধ্বংশ নাই। প্রেম

পুরাতন হয় না, কমে না, কেবল নূতন হয়, আর বাড়িয়া যায়। এই প্রকারের ভাব-বিশেষের নাম প্রেম। দাসে প্রভুতে, সখায় সখায়, পুত্রে ও পিতামাতায়, কান্তায় ও কান্তে এই প্রেমের বন্ধন হয়। কাজেই দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর,—এই চারি-প্রকারের প্রেম। কান্ত ও কান্তার বা প্রিয় ও প্রেয়সীর প্রেমই সর্ব্বাপেক্ষা নিবিড়। আবার এই কান্তা-প্রেম যেখানে একেবারে স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত, বাহিরের কোন' কিছুর কোনরূপ বাধ্যতা-বন্ধন নাই, সেইখানেই এই প্রেম সর্ব্বোচ্চ, সেইখানে বা সেই অবস্থায় এই প্রেম তাহার পূর্ণতার চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রেম শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধ বা বন্ধন, অথবা এই প্রেমই শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলায় এই প্রেম চির-বিলসিত। এই প্রেম নিত্য, এই প্রেম সত্য, এই প্রেমই পরমার্থ।

কিন্তু, সাধু, সাবধান! এই প্রেম, তোমার আমার দেহ ইন্দ্রিয়ের সুখভোগের এই মায়িক জগতের নহে। "ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস"। এখানে, এই 'আমার আমার' বলা জড়-চেতনের দ্বন্দ্বময় অনিত্য সংসারে, ইহা একটি ভাবমাত্র, ধ্যানের বস্তু মাত্র, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা দেহভোগ্য একটা বিষয় বা বস্তু নহে। ইহা অপ্রাকৃত, শুদ্ধ ও চিন্ময়।

৩। প্রেমঘন—শ্রীগৌরাঙ্গ

আবার এই প্রেম একটি রূপক বা আধ্যাত্মিক ইন্দ্রজালও নহে। এই প্রেম অনুমান নহে, কল্পনা নহে। ভারতবর্ষ এই প্রেম দেখিয়াছিলেন, স্পষ্টরূপে দেখিয়া-ছিলেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জগৎও তত স্পষ্ট হয় না, তত সর্ব্বেন্দ্রিয়াকর্ষক হয় না। অতিশয় স্পষ্টরূপে, সমগ্র সত্ত্বা ও চৈতন্যকে অভিভূত করিয়া এই প্রেম আসিয়া গোপনে শ্রীবৃন্দাবনে দেখা দিয়াছিলেন। ভারতের বেদ, ভারতের ঋষি; নিখিল বেদ নহে, নিখিল ঋষি নহে, অতি ভাগ্যবান্ ঋষি কতকগুলি, আর অতিভাগ্যবতী শ্রুতিবিদ্যা কতকগুলি, এই প্রেমকে দেখিয়াছিলেন, এই প্রেমের সেবা করিয়াছিলেন, এই প্রেমে আত্মনিবেদন করিয়া, এই প্রেমকে নিজস্ব করিয়াছিলেন। গোপনে—অতি গোপনে, শ্রীবৃন্দাবনে। ভারতের সাধনার এই গুপ্তকথা সেদিন শ্রীবৃন্দাবনেরই সকলে জানিতে পারেন নাই। বাহিরের ভারতবর্ষ রাজ্যমদে মত্ত ছিল, কেমন করিয়া জানিবে? কিন্তু,

প্রেম আসিয়াছিলেন, গোপনে—অতি গোপনে। সে প্রেমের কোমলমধুর সরস পরশ যাহারা পাইয়াছিল, তাহারা নীরবে প্রাণের ভিতর যতনে অতিগোপনে তাঁহা লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ব্যক্ত করার জিনিষ নহে, ব্যক্ত হয় না। কিন্তু, একেবারে অব্যক্ত যে ছিলেন তাহা নহে—কিছু কিছু কোন কোন স্থানে আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছিলেন।

বাংলার চরম পরম সৌভাগ্য, সেই প্রেম চারিশতবর্ষ পূর্ব্বে মূর্ত্তি লইয়া আসিয়াছিলেন—নিজেকে জানাইবার জন্য, নিজেকে বিলাইবার জন্য। ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা।

ভারতের সনাতন ধর্ম্মের সকল তত্বই শ্রীগৌরাঙ্গদেব শিখাইয়া ও বিলাইয়া গিয়াছেন। তিনি 'সর্ব্বধর্ম্মময়'। কলির প্রভাবে মানুষ ধর্ম্ম ভুলিয়াছিল, সেই পুরাতন ও সনাতন ধর্ম্মকে তিনি ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু, সেই 'সর্ব্বধর্ম্মময়' পরম প্রভুর চরম ও গূঢ় দান—এই প্রেম—শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম বা নিত্যলীলা ও তাহার সাধন।

বড় কঠিন কথা। 'এ বড় কঠিন ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই'। একথা বলিতেই ভয় হয়। 'পাছে অরসিকে শুনি অনর্থ করয়'। জিনিষটা এমনই যে যাহারা ভাবুক ও রসিক নহে, তাহারা ইহার প্রকৃত তত্ব না বুঝিয়া এমনভাবে বুঝিবে যাহাতে অনর্থেরই উৎপত্তি হইবে। কিন্তু, কি করিবে? তাই বলিয়া কি চরম ও পরম সত্য অব্যক্তভাবে চিরনির্ব্বাসিত হইয়া থাকিবেন? শাসন যখন একান্তভাবে বাহিরের, তখন তাহাকে সম্মান করিয়া আমি যে পদে পদে নিজের কাছে অসম্মানিত হই। এই অসম্মান যে অসহ্য। কাজেই, শাসন থাকুক, প্রয়োজনমত থাকুক, কিন্তু এই শাসন ভয়ের নহে, লোভের নহে,—প্রেমের। কেবল প্রভু নহে, বিভু এবং প্রিয়। বাহিরের শাসনের ক্রীতদাস হইয়া কেহই থাকিবে না। বাহিরের শাসন কেন? ভিতর আঁধার বলিয়া। কিন্তু, চিরকাল কি মানব-হৃদয় অন্ধকারেই ডুবিয়া থাকিবে? ভিতরে কি আলো জ্বলিবে না? বেদ বলিয়াছেন, আছেন এক তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ,—বাহিরেও আছেন, ভিতরেও আছেন। ভিতরে তাঁহার বাণী যতদিন না শুনিতে পাই, ততদিনই ভয়ে ভয়ে বাহিরের শাসন মানিয়া চলি, ততদিনই বাহিরের অপেক্ষা। কত যুগ কত মহাযুগ কত মন্বন্তর গেল চলিয়া। বৈবস্বত মন্বন্তর, অষ্টাবিংশতি দিব্যযুগ, তাহারও চতুর্থপাদ। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের যিনি ব্রহ্মা, তাঁহারও পরমায়ুর অর্দ্ধেক কাটিয়া গেল! বেলা যায়, আজও

মানবজাতি নিজের ভিতরে আলোক দেখিবে না! আজও কি "বাঁশি বাজিবে না"? কেবল বাহিরে নহে, "হৃদয়-কুঞ্জবনে"?

বাঁশি বাজিয়াছে, প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়েই বাজিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের আবির্ভাব, এই কলির প্রথম সন্ধ্যায় কেন হইয়াছিল। তাঁহারা হৃদয়ের অন্ধকার ক্ষালন করিয়াছিলেন, একটি নির্দ্দিষ্ট বা নির্ব্বাচিত বা অনুগৃহীত দলবিশেষের নহে, সকলের। 'দুর্ম্মতি অতি পতিত পাষণ্ডী' সকলের হৃদয়-শোধন করিয়াছেন, বা করিতেছেন। তবে আমরা ভয় পাই কেন?

নিজেরই 'হৃদয়কুঞ্জ' বনে সেই তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষকে যিনি দেখিবেন, তাঁহার বংশীর আহ্বান যিনি শুনিবেন. তিনি রাগমার্গের পথিক। এই রাগমার্গই প্রেমের সাধন, এই রাগমার্গ আশ্রয় করিয়াই নিত্যলীলায় প্রবেশ করিতে হইবে। এই রাগমার্গ বিধিকে ধ্বংশ করে না, সফল করে ও সত্যোপেত করে, মধুর করে ও প্রিয় করে, প্রাণময় ও অর্থযুক্ত করে, উজ্জ্বল সুন্দর সুগম ও লোভনীয় করে!

৪। নিত্যলীলা

এই নিত্যলীলা কেবলমাত্র একটি মতবাদ বা দার্শনিক সিদ্ধান্তমাত্র নহে। যাঁহারা মধুরভাবের সাধক, যাঁহারা রাগমার্গের পথিক, ইহা তাঁহাদের সর্ব্বকালব্যাপী সমগ্রজীবন-ব্যাপী সাধনার বস্তু, ধারণা ও ধ্যানের বস্তু। দেহের ক্রিয়াকে তাহার শেষসীমায় কমাইয়া আনিয়া, ইন্দ্রিয়গুলিকে রক্ষা করিয়া সতেজ করিয়া অথচ বাহিরের বিষয়সমূহ হইতে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহৃত করিয়া, প্রাণকে অচঞ্চল ও শান্ত করিয়া, মনকে উজ্জ্বল অথচ প্রসন্ন করিয়া সাধক এই 'বুদ্ধিগ্রাহ্য, অতীন্দ্রিয়', চিদানন্দ রসধামে প্রবেশ করিয়া নব নব অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেন।

মানবজাতি আঁধারের মধ্যে পড়িয়া সংগ্রাম করিতেছে, আলোকের জন্য,—মুক্তির জন্য। এ সংগ্রামের শেষ নাই, বিরাম নাই। চলিতেছে, চলিতেছে। একদিকে থামিতেছে, আর একদিকে আরম্ভ হইতেছে। একদেশে থামিতেছে, আর একদেশে আরম্ভ হইতেছে। কিন্তু, চলিতেছে, সংগ্রাম চলিতেছে। আলোকের জন্য, মুক্তির জন্য এই সংগ্রাম। প্রত্যেক জীব চাহে, সেই নিত্য আলোক চাহে, মুক্তি

তাহার নাম। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম, সেই নিত্য আলোক, নিত্য মুক্তি! কিন্তু, আমাদের সংসারের বহু যুগযুগান্তের বদ্ধধারণা ও সংস্কার, আমাদের হৃদয় ও মনের উপর চাপিয়া বসিয়া আমাদের ভবসাগরে ডুবাইয়া রাখিয়াছে। ভাসিব মনে করিলেও ভাসিয়া উঠিতে পারি না, মুক্ত আলোকে উদার বাতাসে মাথা তুলিয়া ভাসিয়া উঠিতে পারি না। আবার অনেক সময়ে অতলেই তলাইয়া স্বপ্ন দেখি যেন ভাসিয়া উঠিয়াছি, কিন্তু তাহা স্বপ্ন;—অলীক ও ক্ষণস্থায়ী, ভাসিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু, ভাসিয়া উঠিতে হইবে। যত ভাসিবে, কৃত্রিম সংস্কারের বন্ধনরজ্জু ছিঁড়িবে। অসুর-মানুষের লোভের দ্বারা কামের দ্বারা যে নঙ্গর সুদীর্ঘকালে গড়িয়া উঠিয়াছে, স্বার্থ-সন্ধানের কাদার ভিতর যে নঙ্গর শক্ত হইয়া পুঁতিয়া বসিয়া আছে, তাহা তুলিয়া ভাসিয়া উঠিতে হইবে। ভাসিবে; সমগ্র জগৎ, সমগ্র মানবজাতি আজ ভাসিয়া উঠিবার জন্য, আলোক ও মুক্তির মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার জন্য ক্রমে ক্রমে সমবেত হইতেছে, "আসিবে, সেদিন আসিবে"। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিত্যলীলার মর্ম্মকথা ব্যক্ত হইবে। কারণ, তাহা সত্য, পরমার্থ; তাহা আলোক, তাহা মুক্তি। তোমরা নির্ভীক হও, শ্রীনিত্যানন্দের হুঙ্কার শুনিয়া নির্ভীক হও, শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিত্যলীলার মর্ম্মকথা ব্যক্ত হইবে। নিত্যলীলার পরিমল প্রতি জীবের হৃদয়ে মনে প্রাণে সঞ্চারিত হইবে। ইহা রাগমার্গের কথা, প্রত্যেক মানবাত্মার বন্ধন মোচনের বার্ত্তা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার বার্ত্তা।

বিধির প্রয়োজন কে অস্বীকার করিবে? বাহিরের শাসন, শাস্ত্রের ও সমাজের শাসন, সদাচার পালন, নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান, সুশৃঙ্খলিত জীবন,—ইহাদের প্রয়োজন কে অস্বীকার করিবে? যে অস্বীকার করিবে, সে অসুর, সে রাক্ষস, সে দানব, সে পিশাচ, সে পশু, সে যথেচ্ছাচার, সে উন্মার্গগামী। কিন্তু, এই বিধি, শাস্ত্র, সমাজ, ইহারা কি চিরকাল আমার বাহিরে থাকিয়া আমায় ভয় দেখাইয়া, আমায় লোভ দেখাইয়া, আমায় পঙ্গু করিয়া রাখিবে। প্রভু কি বিভু হইবে না, বাহির কি ভিতর হইবে না?

এই সাধন চলিতেছে, সুতরাং ইহার সংবাদ লওয়া আবশ্যক। কেবল আমাদের দেশের জিনিষ বলিয়া যে কেবল আমাদেরই আবশ্যক তাহা নহে, পৃথিবীর সকল দেশের চিন্তাশীল ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু, বিশেষতঃ ধর্ম্মপ্রিয় সুধীব্যক্তির ইহার সংবাদ রাখা আবশ্যক। 'মনস্তত্ত্ব'-বিদ্যার অত্যদ্ভুত উন্নতি হইতেছে, মনস্তত্ত্বের সুগভীর বিধানের আলোকে

অধ্যাত্মসাধনার মর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইতেছে, কামকলা-তত্ত্বেরও অনুসন্ধান চলিতেছে, সুতরাং এই নিত্যলীলার সাধন-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। আজ, মহামানবের মহা-মিলনের মহামহোৎসবে, সকলে বিশ্বজনীনের অন্বেষণ করুন, যিনি বিভু ও বিশ্বজনীন, যিনি সর্ব্বাত্মান্তর্যামী, তিনিই জয়যুক্ত হউন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মতানুসারে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহার প্রকটলীলার শেষ অষ্টাদশ বৎসর এই নিত্যলীলার সাধনের শেষসীমায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীলস্বরূপ-দামোদর আর শ্রীলরামানন্দ রায়, তাহার সাক্ষী। শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি এই পথের পথিক। পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি এবং তাঁহাদেরও সকলের পূর্ব্বে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতি এই পথের পথিক। কত নাম লইব? শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের ধর্ম্মমণ্ডলীর ইহাই অন্তরঙ্গ সাধন। যদি কেহ বলেন, এই সাধন আধুনিক, মাত্র চারিশত বৎসরের। আমরা তাহা স্বীকার করিতে অক্ষম, কারণ শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা,
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন দুই ভাই উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন। সংসারের সুখ সুবিধা সেযুগে যতটা সম্ভব, তাহা তাঁহাদের ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রভাবে তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব করুণার অমৃতের দ্বারা তাঁহাদের অভিষিক্ত করিলেন, নবজীবন ও নব অনুভব দিলেন। কেন? "শ্রীবৃন্দাবনের কেলিবার্ত্তা শ্রীবৃন্দাবনের গূঢ় নিত্যলীলার কথা কালপ্রভাবে লুপ্ত হইয়াছিল, মানুষ তাহার অর্থ ও সাধন ভুলিয়া গিয়াছিল। সেই কেলিবার্ত্তার পুনঃপ্রচার প্রয়োজন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন সেই লীলা আবার জগৎকে জানাইবার উপযুক্ত পাত্র। সেইজন্য শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর তাঁহাদের ঘরের বাহির করিয়া বৈরাগ্যপথে লইয়া আসিলেন।

এই শ্লোকটি 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লোকটিতে বলা হইল, শ্রীবৃন্দাবনের কেলিবার্ত্তা আধুনিক নহে, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেরণায় শ্রীরূপ শ্রীসনাতন প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহা নহে। শ্রীবৃন্দাবনের এই লীলা ও তাহার সাধন প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল, কালে লোকে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের যুগে আবার পুনঃ-প্রচারিত হইল।

ধর্ম্মজগতে এইরূপই হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় যোগ-সাধনার কথা বলিবার সময় অর্জ্জুনকে বলিলেন, অর্জ্জুন, আমি তোমাকে কোন নূতন কথা বলি নাই, এই কথা আমি আদিতে সূর্য্যদেবকে বলিয়াছিলাম, সূর্য্যদেব মনুকে, মনু ইক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন। গুরুশিষ্যপরম্পরায় রাজর্ষি-সমাজে এই যোগ, এই বিদ্যা ও তাহার সাধন প্রচলিত ছিল। বহুকাল পরে এই যোগ নষ্ট হইয়া গেল, রাজর্ষিগণ তাহা ভুলিয়া গেলেন। হে অর্জ্জুন, তুমি আমার ভক্ত সখা, তুমিই এই বিদ্যা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র, তোমার মধ্য দিয়াই এই রহস্যবিদ্যা বা গুপ্তবিদ্যা ও তাহার সাধন মানব সমাজে পুনর্ব্বার প্রচারিত হইতে পারে, সেই জন্যই সেই সব পুরাতন গুহ্যকথা আমি তোমাকে বলিতেছি।

দ্বাপর যুগের শেষে শ্রীকৃষ্ণ ভারতে অবতীর্ণ হইয়া অর্জ্জুনকে নিমিত্ত করিয়া যেমন লুপ্তবিদ্যার একাংশের পুনঃপ্রচার করিয়াছিলেন, উদ্ধব ও মৈত্রেয়কে নিমিত্ত করিয়া যেমন আর এক অংশ প্রচার করিয়াছিলেন, তেমনি ব্রজগোপীদের মধ্য দিয়া আর এক অংশও প্রকট করিয়াছিলেন। এই শেষাংশই গুহ্যতম। এই গুহ্যতম শেষাংশই প্রয়োজনের অনুরোধে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়া উপযুক্ত পাত্র-সমূহের মধ্যে শক্তি-সঞ্চার করিয়া পুনর্ব্বার তিনিই প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং এই বিদ্যা—শ্রীবৃন্দাবনের কেলিবার্ত্তা, বা নিত্যলীলা ও তাহার সাধন, নূতন নহে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে, ইহা অনাদিকালসিদ্ধ। ব্রহ্মসংহিতার দ্বারাও তাহাই প্রমাণিত হয়। পদ্মপুরাণ, বৃহদ্বামনপুরাণ প্রভৃতিতে দেখা যায়, অতি প্রাচীন কালে, শ্রীরামচন্দ্রের প্রকটলীলার সময়ে অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরের চতুর্ব্বিংশতি ত্রেতায় অতি-প্রাচীন মহর্ষিগণ এই সাধনায় মগ্ন। তাঁহারা সাধনসিদ্ধা ব্রজগোপী হইয়াছিলেন। অতএব এই বিদ্যা ও তাহার সাধন, নূতন নহে; আধুনিক নহে, ইহা অনাদিকাল সিদ্ধ।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা হইতেছে, প্রতিদিন ও প্রতিক্ষণ এই লীলা চলিতেছে;

লীলার বিরাম নাই। বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব ও দানকেলি-কৌমুদী, এই তিনখানি নাটকে শ্রীলরূপগোস্বামী মহোদয় নিত্যলীলারও পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার রচিত একটি স্তোত্র আছে, তাহার নাম—"সংক্ষিপ্ত নিত্যলীলা স্মরণমঙ্গল স্তোত্র"। সেই স্তোত্রে নিত্য-লীলা বর্ণিতা হইয়াছেন। সেই স্তোত্রকে সূত্ররূপে অবলম্বন করিয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় "শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত" নামক তেইশ সর্গে বিভক্ত সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া নিত্য-লীলার আরও অনেক গ্রন্থ আছে। যেমন, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-ঠাকুর মহাশয়ের 'ভাবনামৃত' 'সংকল্পদ্রুম' প্রভৃতি। বাঙ্গালা পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের রচিত, রায়শেখর কৃত, যদুনন্দনদাস-অনূদিত অনেক উপকরণ আছে।

নিত্যলীলা চলিতেছে। নিত্যসিদ্ধা সখীগণ, ললিতা, বিশাখা, রূপমঞ্জরী, রতি-মঞ্জরী, অনঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি, তাঁহাদের গণে প্রবিষ্ট অন্যান্য সখী ও তাঁহাদের অনুগতা সখীগণ, এই নিত্যলীলায় শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিতেছেন। এই সেবার নাম প্রেম-সেবা। শ্রবণ, অর্চ্চন, স্মরণ, কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গের যাঁহারা যাজন করিতেছেন, এমন কি ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত প্রভৃতিও নিত্যলীলার প্রেমসেবার অধিকারী নহেন। যাঁহারা বিশুদ্ধ মাধুর্য্যভাবের উপাসক, যাঁহারা ব্রজের মধুর ভাবকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া জানিয়াছেন এবং একান্তভাবে তাহা আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই এই প্রেমসেবা লাভ করিবার অধিকারী। একমাত্র প্রগাঢ় লোভের দ্বারা ইহা পাওয়া যায়। গুরুদেবের কৃপায় সাধক নিজের দেহকে গোপিকার দেহের ন্যায় মনে করিয়া মনে মনে সুদৃঢ় চিন্তার দ্বারা সেবা করেন। এই সেবার নাম 'মানসী প্রেমসেবা'। যাঁহারা রাগমার্গের উপাসক কেবলমাত্র তাঁহারাই এই মানসী প্রেমসেবার অধিকারী। সেই উপাসকেরা কি ভাবে প্রতিদিন ও প্রতিক্ষণ মনে মনে নিত্যলীলা স্মরণ করিবেন, তাহারই ব্যবস্থা করার জন্য 'শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত' গ্রন্থ রচিত।

ঐ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে সাধনার প্রাথমিক কথাগুলি বলা হইয়াছে। আমরা সেই শ্লোকটির আলোচনা করিতেছি। এই শ্লোকটিই শ্রীরূপ গোস্বামী-কৃত প্রথম শ্লোক

শ্রীরাধাপ্রাণ-বন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশশেষাদ্যগম্যা,
যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিতপরৈর্গাঢ়লৌল্যৈকলভ্যা।
সা স্যাৎ প্রাপ্তা যয়া তাং প্রথয়িতুমধুনা মানসীমস্য সেবাং
ভাব্যাং রাগাধ্বপান্থৈর্ব্রজমনুচরিতং নৈত্যিকং তস্য নৌমি॥

শ্রীরাধার যিনি প্রাণবন্ধু, অথবা শ্রীরাধাই যাঁহার প্রাণবন্ধু, তাঁহার চরণকমলযুগলের সেবা চলিতেছে। ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত প্রভৃতিরও এই সেবা অগম্য, (তাঁহারা সর্ব্বদা ভক্তি-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, অর্চ্চন, স্মরণ, কীর্ত্তন প্রভৃতি করিয়াও এই গূঢ় প্রেমসেবা জানিতে পারেন না। কারণ তাঁহারা শুদ্ধ মাধুর্য্যের উপাসক নহেন। ব্রহ্মা, শিব এবং অনন্তদেবও যখন এই প্রেমসেবার অধিকারী নহেন, তখন অন্যে তাহা জানিবেই বা কি প্রকারে, আর তাহার অধিকারই বা পাইবে কি প্রকারে? কিন্তু, তাহাও লোকে জানিয়াছে, ও জানিতে পারে। কি প্রকারে, তাহাই বলা হইতেছে।) যাঁহারা ব্রজ-বাসীগণের চরিত্র বা সাধনপ্রণালীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত সেই চরিত্রেই আসক্ত বা আবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারাই ইহা জানিতে পারেন, অন্য কেহ কিছুতেই তাহা জানিতে পারেন না। (এই প্রেমসেবা "গাঢ়-লৌল্যৈক-লভ্যা"। সান্নিপাতিক পীড়া হইলে জলের জন্য যেমন অতিরিক্ত আকাঙ্খা ও তৃষ্ণা-চাঞ্চল্য হয়, এই প্রেমসেবার জন্য যাঁহাদের চিত্তে সেইরূপ উৎকণ্ঠা ও ব্যগ্রতা হয়, তাঁহারাই এই প্রেমসেবার অধিকারী।) এই প্রেমসেবা মানসী, নিয়মিতভাবে স্মরণ করাই ইহার সাধন। যাঁহারা রাগমার্গের সাধক তাঁহারাই ইহার অধিকারী। রাগমার্গের পথিকগণের ভাবনার বিষয়ীভূত এই সেবা বর্ণনা করিবার প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন ব্রজচরিত্রকে প্রণাম করি।

এই যে সাধন পথ, ইহার পথিক হইতে হইলে শ্রীভগবান্‌কে শ্রীরাধা-প্রাণবন্ধুরূপে জানিতে হইবে। শ্রীভগবানের এই পরিচয় ভারতবর্ষ পাইয়াছে, কিন্তু একদিনে পায় নাই। ভারতের ভগবদুপাসনার ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন স্তরগুলি জানিতে হইবে, মানুষ ভগবানকে কত ভাবে কত প্রকারে জানিয়াছে, ক্রমে ক্রমে ভাল করিয়া আরও ভাল করিয়া, কাছে আনিয়া আরও কাছে আনিয়া, কাছে আসিয়া আরও কাছে আসিয়া, ভক্ত শ্রীভগবানের এই অন্তরতম পরিচয় পাইয়াছে। "শ্রীরাধা-প্রাণবন্ধু"—এই যে পরিচয়,

ইহা অন্তরতম পরিচয়। সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন এই পরিচয়ের। তাহার পর প্রয়োজন গাঢ় ও ঐকান্তিক লোভ। ইহাই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভের একমাত্র সাধন। "শ্রীরাধা-প্রাণবন্ধু" বলিয়া সেই তেজোময়, অমৃতময় পরমপুরুষকে জানিলে এই লোভ স্বাভাবিক। অন্তরের ঐকান্তিক লোভের দ্বারা যে ভগবানের আরাধনা, তাহাই মুখ্য ধর্ম্ম বা মৌলিক ধর্ম্ম, নিজের অন্তরতম অনুভব বা 'প্রজ্ঞান' এর উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। অন্যরূপ ধর্ম্ম বা ধর্ম্মানুষ্ঠান, যাহা আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, তাহা গৌণ, বাহিরের পুরোহিত বা গুরুঠাকুর প্রধানতঃ তাঁহাদের নিজেদের সুবিধার জন্য ইহা আমাদের উপর চাপাইয়া দেন, পরম্পরাগত কিম্বদন্তীর দ্বারা ইহা প্রাপ্ত এবং অন্ধ অনুকরণের দ্বারা অনুষ্ঠিত এবং অভ্যাসের দ্বারা রক্ষিত। * মুখ্য ধর্ম্ম বা ঐকান্তিক লোভের ধর্ম্ম কিরূপ তাহা শ্রীরাধা বা শ্রীগৌরাঙ্গের কথা যাঁহারা জানেন তাঁহারাই জানেন। শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধু বলিয়া শ্রীভগবানকে জানিতে হইবে এবং শ্রীভগবানের সেবার জন্য গাঢ়রূপে লোভান্বিত হইতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই প্রেমসেবার অধিকার অতি উত্তমরূপেই বলা হইয়াছে। শ্রীল রায় রামানন্দ বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শুনিতেছেন।

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর। দাস্যবাৎসল্যাদিভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহঁ অধিকার। সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী-বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়। সখীলীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী-বিনু এই লীলার নাহি অন্যের গতি। সখীভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়। সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপিভাবঃ
ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ১০।১৭

---

* Socond-hand religion is made by others, communicated by tradition, determined to fixed forms by imitation and retained by habit. Original religion is not a dull habit, but like an acute fever.

[চিদ্বিভূতিরিবেশঃ—চিদ্বিভূতিসমূহ বা চিচ্ছক্তির ক্রিয়া ও প্রকাশ ব্যতীত যেমন সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বরেরও পুষ্টি হয় না, সেইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই ভাব যদিও বিভু (সর্ব্বব্যাপক ও অতিমহান্,) অতি সুখরূপ এবং স্বপ্রকাশ, তথাপি সখী ব্যতীত ক্ষণকালের জন্যও ইহার রসপুষ্টি হয় না। অতএব, এই সব সখীগণের পদ কোন্ রসজ্ঞ ভক্ত না আশ্রয় করিবে ? উত্তর,—রসজ্ঞ হইলেই আশ্রয় করিবে।]

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন। কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়। নিজকেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেমকল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লবপুষ্পপাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। নিজসেক হইতে পল্লবাদ্যের কোটিসুখ হয়॥

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনীনামশক্তেঃ
সারাংশ প্রেমবল্ল্যাঃ কিসলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রম্॥
শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ১০।১৬

[ব্রজকুমুদচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির সারাংশের নাম প্রেম। শ্রীরাধিকা সেই প্রেমবল্লী, সখীগণ তাহার পত্র, পুষ্প ও নবপল্লব। সুতরাং সখীগণ শ্রীরাধার স্বতুল্য। অতএব, লতা লীলামৃতরসসমূহে অভিষিক্ত হইয়া উল্লাসিতা হইলে পত্রপুষ্পাদিতুল্যা সখীগণ নিজের সেচন অপেক্ষা যে শতগুণে অধিক উল্লাসবতী হইয়া থাকে, তাহা আশ্চর্য্য নহে।]

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন। তথাপি রাধিকায় যত্নে করায় সঙ্গম॥
নানা ছলে কৃষ্ণ প্রেরি সঙ্গম করায়। আত্মকৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়॥
অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেমে করায় রস পুষ্ট। তা-সভার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট॥
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়াসাম্যে তার কহি কাম নাম॥

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

[গোপরামাগণের প্রেমকেই কাম বলা হইয়া থাকে। উদ্ধবাদি ভগবৎপ্রিয়গণ ইহা বাঞ্ছা করিয়া থাকেন।]

নিজেন্দ্রিয় সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য। কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার। কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গমবিহার॥

যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১০।৩১ ১৯

[হে প্রিয়, তোমার চরণ কমল, সুজাত কমল, অতএব কোমল, অতি সুকোমল। তুমি প্রিয়, অতএব ঐ চরণকমল হৃদয়ে স্তনের উপরেই ধারণ করার যোগ্য। কিন্তু, আমরা ভয়ে ভয়ে, বড় ধীরে ধীরে ধারণ করি, কর্কশ এ বুক, পাছে কোমল চরণে ব্যথা পায়। হায়, হায়, সেই চরণে এখন তুমি বনে বনে ঘুরিতেছ, সূক্ষ্ম পাষাণাদিতে ব্যথা পাইতেছ। আমাদের চিত্ত বড়ই বিভ্রান্ত হইতেছে ;—তুমি যে আমাদের আয়ু—জীবনের জীবন !]

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়। বেদধর্ম্ম সর্ব্বত্যজি সে কৃষ্ণ ভজয়॥
রাগানুগামার্গে তারে ভজে যেই জন। সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
ব্রজলোকের কোনভাব লঞা যেই ভজে। ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্ শ্রুতিগণ। রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥

নিভৃতমরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্ত ধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০ ৮৭।২৩

[দৃঢ়যোগযুক্ত মুনিগণ, মরুৎ (প্রাণ) মন ও অঙ্গ (ইন্দ্রিয়গণ) নিভৃত (সংযমিত করিয়া হৃদয় মধ্যে আপনার যে তত্ত্বের উপাসনা করেন, শত্রুগণও (বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে) স্মরণ করিয়া তাহাই লাভ করেন। স্ত্রীগণ সর্পাকার আপনার ভুজদণ্ডে আসক্তবুদ্ধি হইয়া আপনাকে পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ বিবেচনা করিয়াও তাহাই প্রাপ্ত হয়। আমরা শ্রুতি, আমরাও

ঐ স্ত্রীগণ বা গোপীগণের তুল্য হইয়া আপনার পাদপদ্ম সুধা পাইয়া থাকি।] এই শ্লোক গভীরার্থপূর্ণ।

'সমদৃশ' শব্দে কহে সেই ভাবে অনুগতি। 'সমা' শব্দে কহে শ্রুতির গোপী দেহপ্রাপ্তি ॥
'অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা' কহে কৃষ্ণ সঙ্গানন্দ। বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ॥

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৯।২১ বা ১৬

[গোপীকাসুত শ্রীভগবান্ দেহাভিমানি তাপসাদির, নিবৃত্তাভিমানী আত্মভুত জ্ঞানীর সুখলব্ধ নহেন। ব্রজে (ইহ) (যশোদার দ্বারা উপলক্ষিত বাৎসল্য সখ্য কান্ত ভাবাশ্রয় দ্বারা লভ্য যে ভক্তি) সেই ভক্তিমান্‌গণের তিনি সুলভ।

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার। রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাঁহাই সেবন। সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
গোপী-অনুগতি-বিনে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে। ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে ॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিলা ভজন। তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতা নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৭।৫৩।

[রাসোৎসবে ভুজদণ্ডের দ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীভগবানের যে-অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, বক্ষঃস্থলস্থিতা একান্তরতা কমলার প্রতিও সেরূপ অনুগ্রহ হয় নাই, যে-সকল স্বর্গাঙ্গনার পদ্মতুল্য সৌরভ ও কান্তি তাঁহাদের প্রতিও হয় নাই। অতএব অন্যের আর কথা কি?]

৫। অষ্টকাল

শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই নিত্যলীলার অপর নাম অষ্টকালীন লীলা। দিনমান অর্থাৎ সমগ্র দিনরাত্রি অষ্টভাগে বিভক্ত। এই আট ভাগের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থভাগ প্রত্যেকে বার দণ্ড, অবশিষ্টগুলি প্রত্যেকে ছয় দণ্ড।

ঋতুদণ্ডা অমী কিন্তু তৃতীয়ৌ মাসদণ্ডকৌ।

এই অষ্টকালের নাম এইরূপ।

নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্নো মধ্যাহ্নশ্চাপরাহ্নিকঃ।
সায়ং প্রদোষো নক্তঞ্চেত্যষ্টৌকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

সকাল ছয়টার সময় যদি সূর্য্যোদয় ধরা যায়, তাহা হইলে এই অষ্টকাল এইরূপ দাঁড়াইবে।

১। নিশান্ত—রাত্রি ৫৪ দণ্ডের পর ৬ দণ্ড। রাত্রি ৩টা ৩৬ মিনিটের পর হইতে ৬টা পর্য্যন্ত।

২। প্রাতঃ—সকাল ৬টা হইতে ৮-২৪ পর্য্যন্ত।

৩। পূর্ব্বাহ্ন—৮-২৪ হইতে ১-১২ পর্য্যন্ত ১২ দণ্ড

৪। মধ্যাহ্ন—১-১২ হইতে ৬টা পর্য্যন্ত ১২ দণ্ড।

৫। অপরাহ্ণ—৬টা হইতে ৮-২৪ পর্য্যন্ত।

৬। সায়ং—৮-২৪ হইতে ১০-৪৮ পর্য্যন্ত।

৭। প্রদোষ—১০-৪৮ হইতে ১-১২ পর্য্যন্ত।

৮। নক্ত—১-১ হইতে ৩-৩৬ পর্য্যন্ত।

এই অষ্টকাল। এই অষ্টকালে শ্রীরাধাকৃষ্ণের কিরূপ লীলা হয় তাহা নিম্নের শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

কুঞ্জাদ্গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যং
প্রাতঃ সায়ঞ্চলীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গমে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্ণে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোঽবতান্নঃ॥

(বিবিধপ্রকারের মধুর বিলাস-শয্যাদিবিশিষ্ট লতাদিদ্বারা আবৃত রম্যস্থানের নাম কুঞ্জ। রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীবর্গসহ সেই স্থানে থাকেন। নন্দমহারাজের নিজের মন্দিরের নাম গোষ্ঠ।) নিশান্তে শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে যান। (প্রথম কাল)। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে গোদোহন ও ভোজনাদি করেন। (দ্বিতীয় ও ষষ্ঠকাল)। পূর্ব্বাহ্নে গোচারণ ও সখাদের সহিত বিহার। (তৃতীয় কাল)। মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে শ্রীরাধার

সহিত সাক্ষাৎ বিলাস। (চতুর্থ ও অষ্টমকাল)। অপরাহ্নে গোষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন। (পঞ্চমকাল)। প্রদোষে সুহৃদগণের সহিত বিহার। (সপ্তমকাল)। শ্লোকের শেষে বলিলেন এইরূপ লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত অষ্টকালীন লীলা।

ক। নিশান্তলীলা

দশদিশ নিরমল ভেল পরকাশ।
সখীগণ মনে ঘন উঠয়ে তরাস॥
আম্রে কোকিল ডাকে কদম্বে ময়ূর।
দাড়িম্বে বসিয়া কীর বলয়ে মধুর॥
দ্রাক্ষাডালে বসি ডাকে কপোত কপোতি।
তারাগণ সনে লুকায়ল তারাপতি॥
কুমুদিনী-বদন তেজল মধুকর।
কমল নিয়ড়ে আসি মিলয়ে সত্বর॥
শারী কহে রাই জাগ চল নিজ ঘর।
জাগল সকল লোক নাহি মান ডর॥
শেখর শেখরে কহে হাসিয়া হাসিয়া।
চোর হৈয়া সাধু পারা রহিলা শুতিয়া॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতগ্রন্থে প্রথমে একটি শ্লোকে (১০ম শ্লোকে) সংক্ষেপে সমগ্র লীলা বর্ণনা করিয়া তাহার পর বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন।

রাত্র্যন্তে ত্রস্তবৃন্দেরিত বহুবিরবৈর্বোধিতৌ কীরসারী-
পদ্যৈর্হৃদ্যৈরপি সুখশয়নাদুত্থিতৌ তৌ সখীভিঃ।
দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ তদাত্বোদিতরতি ললিতৌ কক্খটীগীঃ সশঙ্কৌ।
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবপি নিজ নিজ ধাম্ন্যাপ্ততল্পৌ স্মরামি॥

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে। বৃন্দাদেবী ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। দিন হইয়া গেলে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিগূঢ় নিকুঞ্জবিলাস লীলা অন্যে জানিয়া ফেলিবে। এই কারণে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে জাগাইবার জন্য শুক, সারী প্রভৃতি অসংখ্য পাখীকে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই সব

পাখীর কলরবে, আর প্রিয় ও অপ্রিয় নানারূপ কবিতা পাঠের শব্দে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ জাগরিত হইলেন। তাঁহারা উভয়েই তখন ক্লান্ত, সখীগণ দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতেছেন ও আনন্দানুভব করিতেছেন। কক্‌খটি নামা এক বানরী চীৎকার করিতেছে, তাহার চীৎকারে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভীত। এই অবস্থায় শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ হইতে বাহির হইলেন, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণনয়নে পরস্পর পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিতে চাহিতে নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। নিশান্তলীলার ইহাই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। দুইটি প্রাচীন পদ—

১

নিশি অবশেষে, জাগি সব সখীগণ, বৃন্দাদেবী মুখ চাই।
রতিরস আলসে, শুতি রহু দুঁহু জন, তুরিতহি দেহ জাগাই॥
তুরিতহি করহ পয়ান।
রাই জাগাই, লেহ নিজ মন্দিরে, যব নাহি হোয়ত বিহান॥
শারী শুক পিক, সকল পক্ষীগণ, সুস্বরে দেহ জাগাই।
জটিলা আগমন, সবহুঁ মেলি ভাখই, শুনইতে চমকই রাই॥
বৃন্দার বচনে সকল পক্ষীগণে, মধুর মধুর করু ভাষ।
মন্দির নিকট ঝারি লই ঠারহি, হেরত গোবিন্দদাস॥

২

কানন দেবতি হেরি নিশি অবসান, আদেশিলা দ্বিজকুলে করইতে গান।
শারী শুকে কহে দোঁহে জাগাহ তুরিতে।
অরুণ উদয় হেরি নাহি মান ভীতে॥
বানরীগণে পুনঃ করল আদেশ।
তুরীতে শবদ কর নিশি অবশেষ॥
শুনইতে ইহ বনদেবতি বোল।
কানন ভরিয়া উঠিল মহারোল॥
হেরইতে ঐছন নিশি পরভাত।
মাধবদাস শিরে দেই হাত॥

কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ নিজ নিজ ভবনের দিকে যাইতেছেন—তাহার বর্ণনা :—

পদ আধ চলত, চলত পুনঃ ফিরত, কাতরে নেহারই মুখ।
একই পরাণ, দেহ পুনঃ ভিন ভিন, অতএ সে মানিয়ে দুখ॥
তিল এক বিরহ, কলপ করি মানয়ে, গাবয়ে ও পরসঙ্গ।
ভন রাধামোহন, ঐছন নামগুণ, যাহে নহে ও রস ভঙ্গ॥

কুঞ্জভঙ্গ লীলার বিস্তারিত আস্বাদন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বহু বহু কবিতায় পাওয়া যায়, ভক্তগণ তাহা আস্বাদন করিবেন। এই লীলার তত্ত্ব কি, গোবিন্দলীলামৃতের নিম্নের শ্লোকটিতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

নির্বর্ত্ত্য বিভ্রমভরং সময়ে স্বধাম্নি
সুপ্তেঽচ্যুতে প্রতিলয়ে শ্রুতয়ো যথেশম্।
লীলাবিতাননিপুণাঃ সগুণাঃ সমীয়ুঃ
সখ্যোঽপ্যলক্ষ্যগতয়ঃ সদনং যথাস্বম্॥ ১।১১৬

অচ্যুতে ব্রহ্মাণ্ডভরং নির্বর্ত্ত্য প্রতিলয়ে সময়ে স্বধাম্নি সুপ্তে—ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা আদিপুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের লীলাবিলাস শেষ করিয়া প্রত্যেক প্রলয়কালে নিজধামে নিদ্রিত হইলে পর, লীলাবিতাননিপুণাঃ সগুণাঃ অলক্ষ্যগতয়ঃ শ্রুতয়ঃ যথা ঈশম্ সমীয়ুঃ—লীলাবর্ণনায় বিচক্ষণা সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী অলক্ষ্যগতি শ্রুতিগণ যেমন সেই পরমপুরুষে লীন হন। সেইরূপ রাস ও কুঞ্জাদিলীলা সমাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভবনে গমন করিলে পর শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিস্তার-কার্য্যে নিপুণা গুণময়ী গোপীগণ অলক্ষ্যগতিতে নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্যের কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। নিশান্তলীলার অপর নাম বা প্রচলিত নাম কুঞ্জভঙ্গ। পদাবলীসাহিত্য বা কীর্ত্তনগানের সাহায্যে এই সব লীলা আস্বাদিত হইয়া থাকেন। কীর্ত্তনগানের একটি কথা, তত্ত্ব-ব্যাখ্যা করিতে নাই। কীর্ত্তনগান হৃদয়ের একটি অব্যক্ত ও মধুময় জাগরণ বা উদ্দীপনা-সঞ্চারের জন্য। তত্ত্ব-ব্যাখ্যা করিলেই ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু, এখনকার দিনের লোকে তত্ত্বকথাই পছন্দ করে। দুদিক্ রক্ষা করিবার জন্য তত্ত্ব-কথার ইঙ্গিতমাত্র করা যাইতে পারে। পূর্ব্বের

শ্লোকটিতে ঠিক্ তাহাই করা হইয়াছে। আমরা এই ইঙ্গিতটুকু ঈষৎ স্পষ্ট করার চেষ্টা করিতেছি।

ভগবদ্গীতার দুইটি শ্লোক—

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥

ব্রহ্মার দিন সৃষ্টিবৈচিত্র্যের প্রকাশিত অবস্থা, আর ব্রহ্মার রাত্রি অব্যক্ত অবস্থা। দিনের উদয়ে অব্যক্ত হইতে সমুদয় ব্যক্ত হয়, আর রাত্রি আসিলে সমুদয় অব্যক্তে লীন হয়। এই ব্যাপার চলিতেছে। ক্রমাগত রাত্রি, আর ক্রমাগত দিন। ভূতগ্রাম পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতেছে আর লীন হইতেছে। রাত্রিকালে অবশ হইয়া লীন হয়, আর দিন আসিলে পুনরায় প্রকাশিত হয়।

গীতার টীকাকার এই অব্যক্তের অর্থ লইয়া অনেক বাদানুবাদ করিয়াছেন। কেহ বলেন অব্যাকৃত অবস্থা বা প্রধান, কেহ বলেন ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থা ইত্যাদি। এই সব বিচারের কোনই প্রয়োজন নাই। অব্যক্ত আর ব্যক্ত, আর এই দুইয়ের সম্বন্ধ, এইটুকু বুঝিলেই যথেষ্ট।

ভগবদ্গীতাতে এই শ্লোক দুটির পরে আছে, এই যে অব্যক্তরূপ কারণ, ইহাই শেষ, আদি বা সর্ব্বকারণ কারণ নহে। এই অব্যক্তেরও উপরে একটি ইন্দ্রিয়াতীত ও অনাদি ব্রহ্মভাব আছে। সেই ব্রহ্মভাবের নাশ নাই। সেই অতীন্দ্রিয় ভাবের জন্ম নাই, লয় নাই, তাহাই পরম গতি। তাহা পাইলে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। সেই ভাবই, (শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন) বা ধামই আমার পরম ধাম।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যালভ্যস্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥

তিনি, (অর্থাৎ যিনি অব্যক্তেরও অব্যক্ত,) পরমপুরুষ, ভূতসমূহ তাঁহার মধ্যাবস্থিত, তাঁহা-দ্বারা এই জগৎ ব্যাপ্ত, অনন্যা ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়।

ইহার নাম 'পুরুষবাদ'। ভারতের সাধনায় 'প্রকৃতিবাদ'ও আছে। বৌদ্ধ প্রজ্ঞাপারমিতায় তাহার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। দুই মতই সত্য, পুরুষবাদও সত্য, প্রকৃতিবাদও সত্য। কালরাত্রি, মহারাত্রি, মোহরাত্রি, এই সব রাত্রির ভেদ। যাহাই হউক, পুরুষও আছেন প্রকৃতিও আছেন, শ্রীকৃষ্ণও আছেন, শ্রীরাধাও আছেন, উভয়ে একীভূত হইয়া আছেন। তাঁহারাই জাগিবেন, উঠিবেন, কুঞ্জের বাহিরে যাইবেন, তখন আরও সকলে জাগিয়া উঠিবে, কর্ম্ম কোলাহলের মধ্যে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ পৃথক্ হইবেন। বৈচিত্র্যময় কোলাহলের দুই প্রান্তে দুই জন, মধ্যে বাধা, বিপুল ও ভয়ঙ্কর। এই বাধার ভিতরেই গোপনে প্রাণের টান। শ্রীরাধা চাহেন শ্রীকৃষ্ণকে, শ্রীকৃষ্ণ চাহেন শ্রীরাধাকে। এই প্রণয়,—গোপন প্রণয়।

এইবার সখীদের কথা। শ্রুতিবিদ্যা এই সখীগণ। ইঁহারা এই শ্রীরাধাগোবিন্দের সহিত অভিন্ন ও ভিন্ন। ইঁহারাও নিত্যা, ছিলেন, আছেন, থাকিবেন। ইঁহারা সবই জানেন, ভিতরের কথা। সেই পরম অব্যক্তকে অন্তরে গোপনে রাখিয়া ইঁহারা বাহিরের কোলাহলের মধ্যেও মিশিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ব্যক্তকে আবার অব্যক্তে লইয়া যাওয়া, শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন সাধন করা। এই এক কাজ তাঁহাদের, আর এক কাজ দলপুষ্টি করা, এই অব্যক্তের চির গোপনের আপনার জন যদি কেহ হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে পথ দেখাইয়া দলে লওয়া, ইহাও তাঁহাদের কাজ। লীলা চলিতেছে, দলও বাড়িতেছে, জয় হোক্ চির অব্যক্তের, জয় হোক্ চির গোপনের, জয় হোক্ শ্রীরাধাকৃষ্ণের। ব্যক্তের ভিতরেও সেই চির অব্যক্ত দুজন, পরমপুরুষ, আর পরমাপ্রকৃতি, দুঁহু দোঁহা করে অন্বেষণ। ব্যক্ত বিশ্বব্যবস্থার দুই প্রান্ত দূরে দূরে থাকিয়া এক হইতে চাহিতেছে, ব্যক্ত অব্যক্ত হইতে চাহিতেছে। দুই এক হইতেছে, আবার দুই দুই হইতেছে, এক বহু হইতেছে, বহু এক হইতেছে। রাত্রি দিন হইতেছে,

দিন রাত্রি হইতেছে। ইহাই নিত্যলীলা, ইহাই চরম তত্ত্ব, ইহাই শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-বিলাস।

খ। প্রাতঃকালের লীলা

রাধাং স্নাতবিভূষিতাং ব্রজপয়াহূতাং সখীভিঃ প্রগে-
তদ্গেহে বিহিতান্নপাকরচনাং কৃষ্ণাবশেষাশনাং।
কৃষ্ণং বুদ্ধমবাপ্তধেনুসদনং নির্ব্যূঢ়গোদোহনং
সুস্নাতং কৃতভোজনং সহচরৈস্তঞ্চাথতাঞ্চাশ্রয়ে ॥৪

প্রাতঃকালের লীলা। তাং রাধাং তং কৃষ্ণঞ্চ আশ্রয়ে, সেই রাধাও সেই শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করি। কেমন শ্রীরাধা? প্রগে, প্রাতঃকালে, ব্রজপয়া যশোদয়া, যশোদা কর্ত্তৃক, আহূতাং, যাঁহাকে ডাকিয়া আনা হইয়াছে। আর কেমন? তদ্গেহে, যশোদার গৃহে, সখীভিঃ সহ, সখীগণ সঙ্গে, বিহিতান্ন-পাকরচনাং, যিনি যথাবিধি অন্নাদি পাক রচনা করিয়াছেন। আর কেমন? কৃষ্ণাবশেষাশনাম্—যিনি, যে শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ ভোজন করেন, সেই শ্রীরাধাকে প্রণাম করি। আর শ্রীকৃষ্ণ কেমন? বুদ্ধম্. অবাপ্ত-ধেনুসদনং, জাগরিত হইয়া গোগৃহে গমন করিয়াছেন। নিব্যূঢ়গোদোহনং যথানিয়মে গোদাহন কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছেন, সুস্নাতং, উত্তমরূপে স্নান করিয়াছেন। সহচরৈঃ কৃতভোজনং, সহচরগণের সহিত ভোজন করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি। প্রভাতে স্নান করিয়া নানারূপ অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া যশোদা দেবীর আহ্বানে শ্রীরাধা সখীগণের সহিত যশোদার গৃহে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করেন, শ্রীকৃষ্ণের ভোজন হইলে ভুক্তাবশেষ ভোজন করেন, সেই শ্রীরাধাকে প্রণাম করি। শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যূষে জাগরিত হইয়া গোগৃহে গমন করিয়া যথানিয়মে গোদোহন করিয়া সখাগণসঙ্গে ভোজন করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

বৈষ্ণব কবি শ্রীযদুনন্দন দাস শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহার অনুবাদ এইরূপ।

রাধা স্নাত, বিভূষণ, নানাচিত্র বিলেপন, ব্রজেশ্বরীর আজ্ঞার পালন।
সঙ্গে করি সখীগণ, গেলা তাঁহার ভবন, প্রাতে কৈল কৃষ্ণের রন্ধন ॥

কৃষ্ণচন্দ্র জাগি তথা, গেলা ধেনুশালা যথা, কৈলা তাঁহা গোদোহন কাজে।
সব সখাগণ মেলা, নানাম কৌতুক কলা, পুনঃ আইলা স্নানবেদি মাঝে ॥
তাঁহা কৈল স্নান কাম, সঙ্গে নর্ম্ম সখা যাম, ভোজন করয়ে রসময়।
শয়ন হইল তবে, দাসগণ পদ সেবে, নানান কৌতুক ভাব হয় ॥
রাই নিজ সখী সনে, কৃষ্ণের শেষান্নাশনে, ভোজন করিলা বহু রঙ্গে।
তাহাতে বিশেষ যত, বিস্তারি কহিব কত, শ্রীগোবিন্দলীলামৃতছন্দে ॥

প্রাতর্ভোজনের পর শ্রীকৃষ্ণের যে-শয়ন, তাহার সহিত ক্ষীরোদ-সাগরে অনন্ত-শয্যায় শয়নের উপমা দেওয়া হইয়াছে। ইহাও একটি ইঙ্গিত। এই শয়ন তৃতীয় শয়ন।

মন্থানোচ্ছলিতগব্যবিন্দুনিকরৈর্ব্যাকীর্ণরম্যাঙ্গনং
প্রেমস্নিগ্ধজনান্বিতং বহুবিধৈরত্নৈর্বিচিত্রান্তরম্।
ক্ষীরোর্ম্ম্যুচ্ছলিতং মুদা হি বিলসচ্ছয্যাপ্রসুপ্তাচ্যুতং
শ্বেতদ্বীপমিবালয়ং ব্রজপতেবীক্ষ্যাস সানন্দিতা ॥

যোগমায়া পৌর্ণমাসী, যাঁহার হৃদয়াকাশে প্রেমরূপ পূর্ণশশী নিত্য বিরাজিত, তিনি দেখিতেছেন—প্রেমস্নিগ্ধজনসমূহে অন্বিত বহুপ্রকারের রত্নের দ্বারা বিচিত্রিত, মন্থনোচ্ছলিত দুগ্ধব্যাপ্ত নন্দভবন যেন শ্বেতদ্বীপ, তথায় অচ্যুত অনন্ত শয্যায় সুনিদ্রিত। ইহাও একটি ইঙ্গিত, তত্ত্বের ইঙ্গিত।

গ। পূর্ব্বাহ্ণ

পূর্ব্বাহ্নে ধেনুমিত্রৈর্বিপিনমনুসৃতং গোষ্ঠলোকানুযাতং
কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিসৃতিকৃতে প্রাপ্ততৎকুণ্ডতীরং।
রাধাঞ্চালোক্য কৃষ্ণং কৃতগৃহগমনামার্য্যয়ার্কার্চ্চনায়ৈ
দিষ্টাং কৃষ্ণপ্রবৃত্ত্যৈ প্রহিত নিজসখীবর্ত্মনেত্রাং স্মরামি ॥ ৫

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকে স্মরণ করি। শ্রীকৃষ্ণ কেমন? পূর্ব্বাহ্নে ধেনুমিত্রৈর্বিপিন-মনুসৃতং—পূর্ব্বাহ্নে গরুগুলিকে ও সখাগণকে লইয়া যিনি বিপিনে গমন করেন; গোষ্ঠলোকানুযাতং—নন্দযশোদাদি গোষ্ঠবাসিগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। আর শ্রীকৃষ্ণ কেমন? রাধাপ্তিলোলং, শ্রীরাধাকে পাইবার জন্য সতৃষ্ণ; আর কেমন? প্রাপ্ততৎকুণ্ডতীরম্, শ্রীরাধার অভিসারের জন্য যিনি রাধাকুণ্ডের তীরে উপস্থিত হয়েন।

আর শ্রীরাধা কেমন? কৃষ্ণং আলোক্য কৃত গৃহগমনাং, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া গৃহে গমন করিয়াছেন; আর্য্যয়া অর্কার্চ্চনায়ৈ দিষ্টাং, আর্য্যা জটিলা কর্ত্তৃক সূর্য্যপূজার জন্য প্রেরিতা; আর কেমন? শ্রীকৃষ্ণপ্রবৃত্ত্যৈ প্রহিত নিজসখীবর্ত্মনেত্রাং, শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তার জন্য নিজসখীগণকে পাঠাইয়া তাহাদের পথের প্রতি যিনি চাহিয়া রহিয়াছেন। তাং স্মরামি, সেই শ্রীরাধাকে স্মরণ করি।

ঘ। মধ্যাহ্ন

মধ্যাহ্নেঽন্যোন্যসঙ্গোদিত বিবিধবিকারাদিভূষাপ্রমুগ্ধৌ
বাম্যোৎকণ্ঠাতিলোলৌ স্মরমখললিতাদ্যালিনর্ম্মাপ্তশাতৌ
দোলারণ্যাম্বুবংশীহৃতিরতিমধুপানার্কপূজাদিলীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পরিজনঘটয়া সেব্যমানৌ স্মরামি ॥৬

মধ্যাহ্নে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে স্মরণ করি। তাঁহারা কেমন? অন্যোন্যসঙ্গোদিতবিবিধ-বিকারাদিভূষাপ্রমুগ্ধৌ—পরস্পরের সঙ্গলাভ করিয়া বিবিধ বিকার অর্থাৎ অষ্ট সাত্ত্বিক ও সঞ্চারি আদি ভাবভূষায় তাঁহারা উভয়েই অতিশয় মনোহর হইয়াছেন। আর কেমন? বাম্যোৎকণ্ঠাতিলোলৌ বাম্য ও উৎকণ্ঠায়, তাঁহারা উভয়েই অতিশয় সতৃষ্ণ। আর কেমন? স্মরমখললিতাদ্যালিনর্ম্মাপ্তশাতৌ, কন্দর্পযজ্ঞে ললিতাদি সখীগণের পরিহাস বাক্যের দ্বারা উভয়েই সাতিশয় সুখানুভব করিতেছেন। আর কেমন? দোলারণ্যাম্বু-বংশীহৃতিরতিমধুপানার্কপূজাদিলীলৌ, দোললীলা, বনলীলা, জললীলা, বংশীচুরি, রমণ, মধুপান, সূর্য্যপূজাদি লীলায় যাঁহারা তৎপর। আর কেমন? পরিজনবর্গ কর্ত্তৃক সেবিত ও সতৃষ্ণ, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে স্মরণ করি।

ঙ। অপরাহ্ন

শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজরমণকৃতে ক্লিপ্তনানোপহারাং।
সুস্নাতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখকমলালোকপূর্ণপ্রমোদাং
কৃষ্ণঞ্চৈবাপরাহ্নে ব্রজমনুচলিতং ধেনুবৃন্দৈর্বয়স্যৈঃ
শ্রীরাধালোকতৃপ্তং পিতৃমুখমিলিতং মাতৃমৃষ্টং স্মরামি ॥৭

অপরাহ্নে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করি। শ্রীরাধা কেমন? প্রাপ্তগেহাং শ্রীরাধা

নিজভবনে গমন করিয়াছেন। সুস্নাতাং রম্যবেশাং, উত্তমরূপে স্নান করিয়া রমণীয় বেশ পরিধান করিয়াছেন। নিজরমণকৃতে ক্লিপ্তনানোপহারাং—নিজের রমণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য যশোদার আদেশে কর্পূরকেলি অমৃতকেলি প্রভৃতি নানাবিধ উপহার প্রস্তুত করিলেন। আর কেমন? প্রিয়মুখকমলালোকপূর্ণপ্রমোদাং—বন হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোষ্ঠে আসিতেছেন তখন সেই প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল দর্শন করিয়া পূর্ণপ্রমোদা হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কেমন? ধেনুবৃন্দৈর্বয়স্যৈশ্চ সহ—ব্রজমনুচলিতং—গোগণ ও সখাগণসঙ্গে ব্রজে আগমন করিতেছেন। আর কেমন? শ্রীরাধালোকতৃপ্তং, পথে শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়া অতিশয় তৃপ্ত হইয়াছেন। আর কেমন? পিতৃমুখমিলিতং মাতৃমৃষ্টং—শ্রীনন্দাদি পিতৃগণের সহিত মিলিত, যশোদাদি মাতৃগণ কর্তৃক স্নানাদি দ্বারা মার্জ্জিত।

চ। সায়ং

সায়ং রাধাং স্বসখ্যা নিজরমণকৃতে প্রেষিতানেকভোজ্যাং
সখ্যানীতেশ-শেষাশন মুদিতহৃদাং তাঞ্চ তঞ্চ ব্রজেন্দুং।
সুস্নাতং রম্যবেশং গৃহমনুজননীলালিতং প্রাপ্তগোষ্ঠং
নির্ব্যূঢ়োহস্রালিদোহং স্বগৃহমনুপুনর্ভুক্তবন্তং স্মরামি ॥৮

সায়ংকালে তাং রাধাং তঞ্চব্রজেন্দুং স্মরামি। শ্রীরাধা কেমন? স্বসখ্যা, নিজ সখীর দ্বারা, নিজরমণকৃতে, নিজরমণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য, প্রেষিতানেকভোজ্যাং, অনেক প্রকারের খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতেছেন। সখ্যানীতেশশেষাশনমুদিতহৃদাং—সখীগণ কর্তৃক আনীত শ্রীকৃষ্ণের ভোজন শেষ ভোজন করিয়া তাঁহার হৃদয় প্রফুল্লিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কেমন? সুস্নাত, রম্যবেশ; গৃহমনুজননীলালিতং, গৃহমধ্যে জননী কর্তৃক সংলালিত; প্রাপ্তগোষ্ঠং, গোষ্ঠগত; নির্ব্যূঢ়ঃ সমাপ্তীকৃতঃ, উস্রালের্গোশ্রেণ্যাদোহো দোহনং যেন তং—গোদোহন-ক্রিয়া শেষ করিয়া স্বগৃহমনুপুনর্ভুক্তবন্তং—গৃহে আসিয়া ভোজন করিতেছেন।

ছ। প্রদোষ

রাধাং সালীগণান্তামসিতসিত নিশা যোগ্যবেশাং প্রদোষে
দূত্যা বৃন্দোপদেশাদভিসৃত যমুনাতীর কল্পাগকুঞ্জাং।

কৃষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিহিতগুণিকলালোকনং স্নিগ্ধমাত্রা
যত্নাদানীয় সংশায়িতমথ নিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং স্মরামি ॥৯

প্রদোষে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে স্মরণ করি। শ্রীরাধা কেমন? সালীগণাং—সখীগণমণ্ডিতা; অসিতসিতনিশাযোগ্যবেশাং—কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষের উপযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ ও শুক্লবর্ণ বস্ত্র-রচিত বেশ ধারণ করিয়াছেন; বৃন্দোপদেশাৎ—বৃন্দাদেবীর উপদেশ অনুসারে। দূত্যা, দূতীর সহিত; অভিসৃত যমুনাতীরকল্পাগকুঞ্জাং, যমুনাতীরবর্ত্তী কল্পবৃক্ষশোভিত কুঞ্জে অভিসার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কেমন? সভায়াং গোপৈঃ সহ, গোপসকলের সহিত সভামধ্যে, বিহিতগুণিকলালোকনং, গুণিজনের কৌশল দর্শন করিয়া; স্নিগ্ধমাত্রা যত্নাৎ আনীয় সংশায়িতম্—স্নেহময়ী জননী কর্ত্তৃক সযত্নে আনীত হইয়া শয্যোপরি শায়িত; তাহার পর, নিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং, গোপনে সঙ্কেতকুঞ্জে উপস্থিত।

জ। নক্ত

তাবুৎকৌলব্ধসঙ্গৌ বহুপরিচরণৈর্বৃন্দয়া রাধ্যমানৌ
প্রেষ্ঠালীভির্লসন্তৌ বিপিনবিহরণৈর্গান রাসাদিলাস্যৈঃ।
নানালীলানিতান্তৌ প্রণয়িসহচরীবৃন্দসংসেব্যমানৌ
রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং সুকুসুমশয়নে প্রাপ্তনিদ্রৌ স্মরামি ॥১০

নিশায় অর্থাৎ রাত্রির দ্বাদশ দণ্ডের পর শ্রীরাধাকৃষ্ণকে স্মরণ করি। কেমন তাঁহারা? তৌ উৎকৌ—মিলনের জন্য উভয়েই উৎসুক। তাহার পর, লব্ধসঙ্গৌ—তাহার পর মিলিত। প্রেষ্ঠালীভিঃ সহ বৃন্দয়া বহু পরিচরণৈঃ রাধ্যমানৌ, সখীগণসহ বৃন্দাকর্ত্তৃক বহু প্রকার সেবার দ্বারা আরাধ্যমান। বিপিনবিহরণৈর্গানরাসাদিলাস্যৈঃ নানালীলা নিতান্তৌ, বনবিহার, গান, রাস নৃত্য প্রভৃতি লীলার দ্বারা অতিশয় শ্রান্ত এবং প্রণয়ি-সহচরীবৃন্দ সংসেব্যমানৌ, প্রণয়ি সহচরীবৃন্দ কর্ত্তৃক উত্তমরূপে সেবিত এবং সুকুসুমশয়নে প্রাপ্তনিদ্রৌ—উত্তম পুষ্পশয্যায় উভয়েই নিদ্রামগ্ন।

তিনটি কবিতা

পরিব্রাজক ভিক্ষু শ্রীনন্দনন্দনানন্দ ব্রহ্মচারী রচিত গান ও কবিতা খণ্ড খণ্ড কাগজে মুদ্রিত হইয়া নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বিতরিত হইতেছে। এই গান ও কবিতা আমরাও পাইতেছি। নিম্নে তাহার তিনটি মুদ্রিত হইল।

মিলন-গীতি।

(সুর—রামপ্রসাদী)

আয়রে ছুটে বিশ্ববাসী, গৌর নিতাই তোদের ডাকে,
মোহের কুহক স্বপনজালে জড়াস্ না আর জীবনটাকে!
গোলোক হ'তে প্রেমের আলোক ঝরছে রে এই গৌড়দেশে,
ভক্তি-কমল ফুট্‌ল ভূমে ভক্ত-ভ্রমর জোট্‌না এসে!
যা ছিলনা কোন কালে তীর্থে ক্ষেত্রে কোন খানে,
অসম্ভব সম্ভব হেথা গৌর নিতাইর প্রেমের টানে!
ভূলোক হ'ল গোলোকপুরী, মুক্তি হাসে মায়ার পাশে,
মিথ্যা জগৎ সত্য লাগে কর্ম্ম কাঁদে প্রেমের ফাঁসে!
মুচি হ'ল শুভ্রশুচি যবন পেল ব্রাহ্মণতা,
শূদ্র সে গোস্বামী হ'ল পতিত পেল পাবনতা!
ধনী সে দরিদ্র হ'ল সব বিলিয়ে প্রেমের হাটে,
দরিদ্র সে লক্ষপতি প্রেমধনে এই ন'দের বাটে!
করিস্‌নে ভাই দলাদলি স্বার্থে অর্থে রেষারেষি,
তার নামে সব গলাগলি তার প্রেমে সব মেশামেশি!
বিশ্বে সবাই একের সেবক যতই বলুক অন্য কথা,
দিক্ না গালি ফাটাক্ মাথা কদিন ক'রবে বিরুদ্ধতা!
নিতাই বলে কাঁদে যারা, গৌর যাদের পরাণ রতন,
হোক্ না তারা পরের দলে তারাও মোদের মনের মতন!

বল্‌বে বল হরেকৃষ্ণ নিতাই গৌর শ্যাম কি রাধা,
গৌর বিষ্ণুপ্রিয়াই বল, আমরা তাতে দেই না বাধা!
তিলক কর বটপত্র কিম্বা নূপুর চাঁপার কলি,
পর্‌বে পর ধুতিচাদর ডোর কপীন কি নামাবলী!
গৃহস্থ হও কি বৈরাগী ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী,
খুঁজে নেব বুঝে নেব কে কতটা প্রেমপিপাসী!
চেন ঘড়ি কি চসমা টেরি 'হ্যাট' 'কোট' 'টাই' পরে থাক,
দেখ্‌ব কে কতটা প্রেমে নিতাই গৌর বলে ডাক!
যার দলে রও যাইবা কর নাইক মোদের জানাজানি,
আমরা যে ভাই প্রেমের কাঙ্গাল প্রেমটী খুঁজি যোল আনি!
ভেদ করিনা কোন দলে সব দলেতে আস্‌ব যাব,
সবার দ্বারে আঁচল পেতে প্রেম-ফল কুড়িয়ে খাব!
পরিব্রাজক ভণে শুভক্ষণে বিশ্ব-ভুবন প্রেমে ভাসে,
গৌর নিতাইর চরণতলে ভাইকে ডাকি ভাইয়ের পাশে!

প্রেমভূমি

কর্ম্মী কেহ জ্ঞানী কেহ কেউ বা যোগে নির্নিমেষ
সবার সেরা প্রেমের ভূমি সে শুধু এই বঙ্গদেশ
চিরন্তনী প্রেমের লীলা এই দেশেতে মূর্ত্তিমান্‌
নিশার বাঁশী বধূর হাসি পথিক গাহে প্রেমের গান!
মোরা শঙ্কা করি শঙ্করেরে বৌদ্ধ দেখেও বুদ্ধি লীন
চাই না মোরা কষ্ট যোগীর ভেল্কী বাজী লক্ষ্যহীন
ভোগের ভোগায় নিত্য যারা বুন্‌ছে বসে কর্ম্মফাঁস
প্রভাস কূলে কুরুক্ষেত্রে তারাও দুখের নর্ম্মদাস
দেশটা যাদের রুক্ষ রুঠা জগৎ তাদের মিথ্যা লাগে
তারাই চক্ষু মুদে সর্ব্বনেশে ফন্দী ফাঁকির কামান দাগে

মোদের দেশ যে শোভায় ভরা রসের ঝরা স্বপ্নরেশ
হেথা প্রেমের গুরু গৌর নিতাই প্রেমভূমি এ বঙ্গ দেশ !
ঠাকুর মোদের রসিক প্রেমিক মানববেশী জগন্নাথ
সেব্য তিনি সেবক মোরা সাধন মোদের দিবস রাত।
মা হয়ে তাঁয় বাঁধছি মোরা সখ্যে যে তাঁর স্কন্ধে উঠি
প্রেমের জোরে চরণ পরে মাথায় চূড়া পড়াই লুটি ;
হোন্ না অসীম হোন্ না মহান্ নাইক মোদের ভয়ের লেশ
আমরা যে তার প্রেমের সেবক প্রেমভূমি এ বঙ্গদেশে !
কর্ম্ম মোদের ধর্ম্মে বাঁধা ভক্তি প্রেমের সাধনপথ
প্রেম-যোগেরই যোগী মোরা অন্য যোগে দণ্ডবৎ।
মায়াবাদের ধোঁকার টাটি চাইনা জ্ঞানে অভেদবাদ
ভেদাভেদের ধার ধারি না মিটাই মোরা প্রেমের সাধ।
মুগুর মেরে জগৎটারে চাইনা মোরা কর্‌তে ধূলি
বোধাবোধ হীন নির্ব্বাণেতে প্রেমের লীলা যাইনা ভুলি।
ঠাকুর মোদের প্রেমের কাঙ্গাল আমরা তাঁরি নিত্যজন
রূপে রসে গন্ধে ভরা জগৎ মোদের বৃন্দাবন।
মোদের ব্রহ্ম মানববেশী নয় নিরাকার নির্ব্বিশেষ
প্রেম-পিপাসী সাকার মোরা প্রেমভূমি এ বঙ্গদেশ !

নব বৃন্দাবন

লুপ্ত কোথা দ্বাপরলীলা গুপ্তে করে দিন যাপন
নন্দসুতের রঙ্গভূমি বঙ্গ নবীন বৃন্দাবন !
রসের নদী ভাবের ফেনা প্রেমের পলি গড়ল মাটি
জড়ের বেশে মরের দেশে অতীন্দ্রিয়ের রূপটি খাঁটি।
চিত্রেও তার মূর্ত্তি গড়া সঙ্গীতে তার সম্ভাষণ
কাব্যে খোওয়া প্রাণের হাওয়ায় কাঁপ্‌ছে পারুল চম্পাবন।

হেথা ব্যক্ত হ'ল গুপ্ত গহন স্বপ্ন পেল সঞ্জীবন
নন্দসুতের রঙ্গভূমি বঙ্গ নবীন বৃন্দাবন !
কদমতলার স্নানের ঘাটে বাঁশীর গান আর মলয় হাওয়া
বনের ফাঁকে কলসী কাঁখে নবীন বধূর জল্‌কে যাওয়া ।
জলদমেদুর গগনতলে তমালবনের শ্যামল ছটা
কুসুম ফোটা কুঞ্জবনে শুকশারীকার দ্বন্দ্ব ঘটা ।
রাখালসখার আকুল আরাব নিত্য নিঝুম সন্ধ্যাবেলা
রূপের হাটে পল্লীবাটে মধুর ফেরৎ-গোষ্ঠ মেলা ।
দহের জলে সাপের ফণা বটের তলে শিঙ্গার করা
কুল-মজান প্রেমের দায়ে গুম্‌রে শুধু মর্ম্মে মরা ।
নদীর জলে নৌকোবিলাস গাছের তলে পূর্ব্বরাগ
মাঠের পথে পসারিণীর কোমল পায়ের কল্প্রদাগ—
হেথা কল্পনা সব সত্যি হ'ল সাধক পেলে সাধ্য ধন
নন্দসুতের রঙ্গভূমি বঙ্গ নবীন বৃন্দাবন !
লুপ্ত কোথা দ্বাপরলীলা গুপ্তে করে দিন যাপন
কোথায় হরি কোথায় প্যারী শুষ্ক সাধের বৃন্দাবন ।
মনের দুঃখে হুতাশ বুকে পালিয়ে এল সূর্য্যসুতা
সঙ্গে এল বৃন্দাদেবী অঙ্গে ঋতুর গুচ্ছ-যুতা ।
কোকিল তানে ভ্রমর গানে মূর্চ্ছা গেল পুষ্পবাণ
ব্রজের ধনী ব্রজের বধূ বঙ্গে হ'ল মূর্ত্তিমান্ ।
রঙ্গ দেখে গঙ্গা পড়ে কৈলাশপতির জটটি ছিঁড়ি
সাগর-পাশে পদ্মা হাসে মেঘ ছায়াতে অঙ্গ ঘিরি ।
গুপ্ত খেলা খেল্‌ছে হেথা দ্বাপর যুগের রঙ্গ-ভূমি
ভাব্‌ছে সবে, "চোরের ঠাকুর' ও লুকোচোর কই গো তুমি"
তাই কৃষ্ণ-বরণ গৌর ক'রে কাঁদ্‌লো বৃন্দারণ্য-ধন
নন্দসুতের রঙ্গভূমি বঙ্গ নবীন বৃন্দাবন ।

ধর্ম্মের ঘরে সিঁদ

আজকাল ধর্ম্মের নামে সমগ্র ভারত তোলপাড় হইতেছে, একদিকে হিন্দু—অন্যদিকে মুসলমান, ধর্ম্মের জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিতেছে ও ভাই ভাই লড়াই করিয়া গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত করিয়াছে। কোথাও শান্তি নাই। কিন্তু এই ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম অর্থে কি কেবল আচার ব্যবহার এবং মন্দিরে ও মসজিদে যাইয়া আড্ডা দেওয়া ও পরস্পরের অনিষ্ট চিন্তা করা? মন্দিরে ও মসজিদে না যাইলে কি ধর্ম্মচর্চ্চা হয় না? যাঁহারা বনে ও জঙ্গলে বাস করেন, যাঁহারা সহরগুলিতে আসিতে পান না, তাঁহাদের কি ভগবানের আরাধনা হয় না? ভগবান কি একজনের হাতে চা'ল কলা খাইয়া ও অন্যের হাতে রক্ত খাইয়া, একজনের হাতে ছাগের রক্ত খাইয়া ও অন্যের হাতে গরুর রক্ত খাইয়া সুখী হন? একজনের পূজার সময় বাজনাবাদ্য ভালবাসেন ও অন্যের পূজার সময় বাজনা বাজিলে কানে আঙ্গুল দেন? একজনের নিকট নানামূর্ত্তিতে আবির্ভাব? অন্যের নিকট নিরাকার সাধনে তুষ্ট? একজনের ঘরে ঘরে প্রতিমাপূজার বিধি ও অন্যের শূন্যস্থানে একযোগে উপাসনার বিধি। একজন অনেক সময় অন্যের উপর পূজার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিয়া দেবারাধনা করেন। অন্যজন কেবল ঘরেই তাহার আরাধনা করিয়া তুষ্ট। একজন প্রতিমা গড়িয়া তাহাতে ভগবানের আবাহন, পূজা ও পরে বিসর্জ্জন করেন, অন্যে তাহা না করিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে তাহার অধিষ্ঠান জানিয়া, সকল জীব জন্তুতেই তাঁহার আরাধনা করেন। একজন গাছপালা পূজিয়া তুষ্ট, অন্যজনে ভাবে মগ্ন হইয়া তাঁহার ভাবনা করিয়া তুষ্ট। কেহ বা সূর্য্য, অগ্নি, পৃথিবী, জল বায়ু, আকাশ গো, অতিথি, নিজ আত্মা ও সকলের আত্মাকে পূজা করেন। যদি এই সব ভাবেই ভগবানের পূজা হয়, তবে বৃথা আড়ম্বরের আয়োজন কেন? কেনই বা দ্বেষাদ্বেষী? কেনই বা রক্তারক্তি? ঈশ্বরের নামে ছাগবলি, মহিষবলি, পাঁঠাবলি, মেষবলি, পায়রা-বলি, হাঁসবলি কেন? নিজেদের উহা প্রয়োজন হয়, সেইভাবে কাজ করিলে কি ভাল হয় না? ভগবানের নামে বলি দিয়া ভগবানকে কেন রক্তপিপাসু সাজান? তিনি ত'

জীব-সকলকে পরস্পরের ভক্ষ্য করিয়াছেন—উদ্ভিদ জঙ্গমের ভক্ষ্য, ছোটজীব বড় জীবের ভক্ষ্য, তবে কেন নিজ স্বার্থসাধন জন্য ভগবানের নাম কলুষিত করা? মাংসাসীর পক্ষে মাংসভক্ষণে দোষ নাই, যাহার শরীর যেরূপভাবে গঠিত, তাহার শরীর সেইরূপ উপাদানে রক্ষিত, তবে কেন নিজের জন্য ঈশ্বরের নামে কলঙ্ক? আবার ধর্ম্মের নাম করিয়া উপাস্য দেবতা প্রতিমার ভিতর ধন সঞ্চয় করা? উহাতে কি প্রতিমার মর্য্যাদা থাকে?—না সেবকের উহাতে ভক্তি হয়, না অন্যে উহাকে অপরের দেবতা বলিয়া সম্মান করিতে পারে? সোমনাথের মন্দিরের বার বার আক্রমণ ও লুণ্ঠন কি ঐ প্রতিমার ভিতর ধন-সঞ্চয় জন্যই হয় নাই? দোষ কাহার? আক্রমণকারীর?—না যাহারা পূজার প্রতিমাকে ধনাগার করেন? যেখানে সেখানে প্রতিমা স্থাপন করিয়া উহাকে জাগ্রত রক্তখেকো ঠাকুর বলিয়া লোকের মনে আশঙ্কা জাগাইয়া তাহার শান্তির জন্য পূজা গ্রহণ কি কর্ত্তব্য? শীতলা ও কালীর মূর্ত্তি আবালবৃদ্ধ বনিতার ভয়ের কারণ নয় কি? এই ভণ্ডামির জন্যই কি কালা পাহাড়ের আবির্ভাব হয় নাই? অকালে বোধন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজার যে বিধি, তাহা কি শাস্ত্রসঙ্গত? বাল্মিকী রামায়ণে ত' ঐ পূজার উল্লেখও নাই। উহা রামের কীর্ত্তি নয়, উহা বাঙ্গালীরই কীর্ত্তি। তাহার প্রমাণ, উত্তর পশ্চিমদেশই রামের ভক্ত, উহারা প্রতি আশ্বিনমাসে রামলীলা অভিনয় করে। উহাতে রামের বন গমন হইতে ভরত মিলন অবধি সমস্ত লীলাই অভিনীত হয়। কিন্তু তাহার মধ্যে দুর্গাপূজা নাই, বা সেতুবন্ধে রামেশ্বরের বাণলিঙ্গ বসাইবারও ব্যবস্থা নাই। যদি উহা প্রকৃত না হয়, তবে উহার সৃষ্টি কি ধর্ম্মের ঘরে সিঁদ দেওয়া নয়? সত্য বটে, ঐ পূজায় পূর্ব্বে বাঙ্গালীর হৃদয়ের অনেক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইত, কিন্তু এখন কৈ? সে ভাব ত' দেখা যায় না। এখন উহা ধর্ম্মের নামে ভক্তের অর্থ শোষণ নয় কি? সন্ন্যাসী সাজিয়া কামিনী-কাঞ্চন বর্জ্জন করিলাম বলিয়া, গৈরিক বসন পরিয়া মঠ স্থাপন দ্বারা ধন-সঞ্চয় ও নূতনধরণের সংসার পাতা কি ধর্ম্মের ঘরে সিঁদ নয়? আবার কোথাও বৈরাগী হইয়া সেবাদাসীর দাসানুদাস হওয়া কি ধর্ম্মের ঘরে সিঁদ নয়? আর সকলকে শাস্ত্রপাঠে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের মূর্খ করিয়া কতকগুলি উপকথার দ্বারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন কি ঐরূপ সিঁদ দেওয়া নয়? গুরু সাজিয়া শিষ্যের মূর্খত্বসাধন ও ধনাপহরণ বিধি কি ধর্ম্মের ঘরে সিঁদ দেওয়া নয়? সকলকে শূদ্র করিয়া তাহাদের পূজা ও শ্রাদ্ধাদিতে

পক্কান্নের বিধি বন্ধ করিয়া আমান্নের নৈবেদ্যাদির ব্যবস্থা কি ধর্ম্মের ঘরে সিঁদ দেওয়া নয়? ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ না হইলে পিতৃশ্রাদ্ধ হয় না, তাহার স্থলে কুশের ব্রাহ্মণ করিয়া গাঁট্‌রী বাঁধা কি ধর্ম্মের ঘরে সিঁদ নয়? ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাবে মনুতে যে ব্রাহ্মণের বিকল্প বিধি আছে, তাহা অবলম্বন হয় না কেন?

ধর্ম্মের ঘরে এত রকমে সিঁদ কাটিলে, আর সে ঘরে কি কিছু থাকে? তাই এখন সকলেই ধর্ম্মের নামে পলায়ন করেন ও ধর্ম্ম-ধ্বজীকে দেখিলে সিঁদেল বলিয়া ভীত হন। এ দোষ কার? ভক্তের?—না সিঁদেলের? অবশ্য একটী শাস্ত্রবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া এই সব করা হয়। যথা—ব্রাহ্মণের বৃত্তি যাজন, এখন যাজনের থ'লের ভিতর হাতী সাঁদ করিতে পারিলেই মজা। তাই প্রেতশ্রাদ্ধে অগ্রে ও পশ্চাতে সামান্য দান পতিত অগ্রদানীকে দিয়া মধ্যে ষোড়শদানটীর ব্যবস্থা কি ঐ সিঁদের বিধি নয়? ধর্ম্মের ঘরে সিঁদেলদের দ্বারা কি সমাজ রক্ষা হয়? না, তাঁহাদিগকে কেহ নেতা বলিয়া মানিতে চায়? যাহারা সমাজ-রক্ষক হইতে চান, লোকের শিক্ষক হইতে চান, যাহারা প্রকৃত সম্মান পাইতে চান, তাঁহাদের ত অগ্রে সিদকাঠিটী ছাড়া প্রয়োজন। কাণেফোকা গুরুগিরি ত্যাগ করিয়া বৈদিক আচার্য্যের পদ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কেবল রঘুনন্দনের পুরাণ-তন্ত্রের বচন সঙ্কলিত নব্য স্মৃতিটিকে কালের স্মৃতি না করিয়া মনুর স্মৃতি আনিয়া আলোচনা করা উচিত। তাহা হইলেই পূর্ব্বসম্মান আসিবে, দেশে শান্তি স্থাপিত হইবে। আর পুরুষরা মেয়েদের বারবিলাসিনী না সাজাইয়া, তাহাদের নিজ নিজ সহধর্ম্মিণী করিবেন। আর নারীরা দাসীত্ব হইতে মুক্ত হইয়া দেবীত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, ইহা কি সম্মানের নয়? মাতা ভগিনীকে দাসী সাজাইয়া, শাস্ত্রাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের পঞ্চযজ্ঞ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, কেবল পাকশালার মালিক করিলেই মাতৃমর্য্যাদা রক্ষা হয় না, তাহাদের সহধর্ম্মিণীস্থানে বসানো হয় না, তবে যাহারা নিজে পাচক ব্রাহ্মণ বা ঠাকুরে ব্রাহ্মণ তাহাদের সহধর্ম্মিণীকে কেবল রান্ধুনী বা দাসী সাজাইলে বড় দোষের হয় না। কারণ—তাহাদের ঘরে ত' পঞ্চযজ্ঞ হয় না, তাহাদের স্ত্রীগণ তাহাদের জন্য প্রকৃতভাবেই রন্ধন করিয়া তাহাদের সহধর্ম্মিণী হন। নতুবা ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের পত্নীকে, বীরের পত্নীকে বণিকের পত্নীকে পাচিকা করিলে কি তাহাদিগকে সহধর্ম্মিণীত্ব হইতে পতিত করা হয় না? আমরা এখন পূজুরে ব্রাহ্মণ হইয়াছি। ব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্য হইয়াছি, প্রজাপীড়নে বেশ

পটু হইয়াছি ও ব্যবসায় বাণিজ্যে ভেজাল চালাইয়া বেশ আয়ের ব্যবস্থা করিতে শিখিয়াছি। কাজেই ধর্ম্মপত্নীকে কেবল রান্ধুনী সাজাইলে কিছু ত' সাশ্রয় হয়, তাহা করিব না কেন? যেখানে স্বার্থ প্রবল, সেখানে স্বার্থসাধনই বিধি বলিয়া গণ্য হয়। ইহা কি ধর্ম্মের ঘরে সিঁদ নয়? আর কত বলিব? কাশীর কালভৈরব কি কাশীর সিঁদেলের নিবৃত্তির বিধি করিবেন? যতদিন না আমরা এই সিঁদেলদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব, ততদিন আমাদের নিস্তার নাই। এই সিঁদেলদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই ইউরোপে রোমান ক্যাথলিকদের পরিবর্ত্তে প্রোটেস্‌টেন্টের আবির্ভাব। টার্কিতে খেলাপতের প্রাধান্য নাশ এবং এই জন্যই হিন্দুস্থানে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণে লড়াই বাঁধিয়াছে। এই লড়াইয়ের ফল কি তাহা নিশ্চিত। এই লড়াইয়ে বামনামী ধ্বংস হইয়া সনাতন আর্য্য-বর্ণধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। অতএব সকল বীরপুরুষেরই এই যুদ্ধে যোগদান করা উচিত। সিঁদেলদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতেই হইবে। * (ত্রিশূল)

মন্তব্য, সংবাদ ও বিবিধ

দেশকর্ম্মী শরৎকুমার

দেশের কাজের জন্য সংগৃহীত অর্থের হিসাব না দেওয়ার জন্য, প্রবীণ ও নিরপেক্ষ সাপ্তাহিক পত্র 'সময়' কয়েকজন ভদ্রলোকের সুতীব্র নিন্দা করিয়াছেন। 'সময়' পত্র আমরা পাই না। অন্য কাগজে উহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, দেখিলাম। ঐ তালিকায় বরিশালের দেশকর্ম্মী শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয়ের কথাও ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে—"পাবনায় হিন্দুরক্ষার জন্য চাঁদা তুলিয়া লইয়া যেমন এক ভণ্ড বৃন্দাবনে সন্ন্যাসী হইয়া বসিয়াছে।" শরৎকুমারকে আমরা জানি, কাজেই এই অংশটুকু পড়িয়া ব্যথিত হইলাম এবং এ-সম্বন্ধে দু-একটি কথা প্রকাশ্যভাবে বলা আবশ্যক বলিয়া মনে

* আমরা এখন আর 'ত্রিশূল' পাই না। প্রবন্ধটি "বীরভূম বার্ত্তা"য় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। আমরা সেখান হইতে পাইলাম। আশা করি "ত্রিশূল" আসিবে, আঘাত করিতে নহে, রক্ষা করিতে। প্রকাশক, বীরভূমি।

করিলাম। শরৎকুমার এক সময়ে বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন—অল্প বেতনের দরিদ্র শিক্ষক। সেই কর্ম্ম তিনি পরিত্যাগ করেন। শুনিয়াছি, কোনও ব্যাপারে ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণায় তিনি এই কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। তাহার পর কিছুদিন নির্জ্জন সাধনা। তিনি নিত্যধামগত জ্ঞানানন্দ অবধূত (অন্য নাম বা সাংসারিক নাম নিত্যগোপাল) মহাশয়ের একজন শিষ্য। এই অবধূত মহাশয়কে কেন্দ্র করিয়া নবদ্বীপে কিছুদিন একটা ভাবোন্মাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, ভক্তগণ অবধূত মহাশয়কে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনের বিবরণ সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। শরৎকুমারের সহিত আমাদের যখন পরিচয়, তখন তিনি বরিশাল সহরে একটি কুটিরে বাস করিয়া নিভৃতে পড়াশুনা করিতেছেন। বার্গসোঁর Creative Evolution ও পড়েন, বৈষ্ণব কবিতা বা শ্রীমদ্ভাগবতও পড়েন। "বংশীধ্বনি" বা এই প্রকারের বিষয় লইয়া বক্তৃতাও করেন। ইহার পর তিনি আসিলেন কলিকাতায়। কলিকাতায় নানাস্থানে বক্তৃতা হইত, উত্তরপাড়াতেও বক্তৃতা হইয়াছিল। কলিকাতার বক্তৃতায় বেশ লোকসমাগম হইত, বরিশাল হইতে কতকগুলি বন্ধু বা সহকর্ম্মীও সঙ্গে আসিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গ করিতেন, শ্রীমতী বেশান্তের Ancient wisdom গ্রন্থ পড়িতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল থিয়সফিক্যাল্ সোসাইটির কর্ম্মী হইতে, এবং এজন্য চেষ্টাও করিতেছিলেন। এই সময়ে অসহযোগ আন্দোলনের প্লাবন আসিল। বরিশালের শ্রীযুক্ত সরলকুমার দত্ত প্রভৃতি শরৎকুমারকে বরিশালে লইয়া গেলেন, আর শরৎকুমার অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। শরৎকুমারের বক্তৃতায় বরিশালে খুব উত্তেজনা জাগিয়া উঠিল। অমৃতবাজার পত্রিকায় বরিশালের খবরে শরৎকুমার সম্বন্ধে লেখা হইত The Celebrated Vedantist of Calcutta fame ইহার পর বরিশালে প্রাদেশিক সম্মিলন, যাহাতে বিপিন পালকে দল বাঁধিয়া নিগৃহীত করা হয় এবং যাহার পর নিরুপায় পাল মহাশয় ইংলিশ-ম্যানের সহিত বন্ধুতা করেন। এই সম্মিলনে শরৎকুমার দেশের বাগ্মী রাজনীতিক দেশনায়কগণের মধ্যে একজন হইয়া পড়েন। তাহার পর শরৎকুমারের কারাবাস। বরিশালের কর্ম্মীগণ ফটোগ্রাফ্ লওয়া, শোভাযাত্রা করা প্রভৃতি কোনরূপ অনুষ্ঠানের ত্রুটি করেন নাই। অসহযোগী-শিবিরে দলাদলি হইল, শরৎকুমার দেশবন্ধুর দল ছাড়িয়া অপর দলে বা পরিবর্ত্তন বিরোধীর দলে আসিলেন। তিনি নানাস্থানে বক্তৃতা করিলেন, পতিতা নারীগণের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ-বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর সহিতও তাঁহার মতভেদ হইল। এইবার তিনি 'উজ্জ্বল ভারত' নাম দিয়া সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করিলেন। যশোহরের প্রাদেশিক সম্মিলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যও শরৎকুমার বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

পাবনার হিন্দুরক্ষার যে-ব্যাপারের জন্য শরৎকুমারের নিন্দা হইয়াছে, আমাদের মনে হয়, তাহা

একটি সুবৃহৎ তামাসা বা প্রহসন। যাহাদের লোকসান হওয়ার মতো কোনো কিছু নাই, এই প্রকারের আন্দোলনজীবি লোকের পক্ষেই এইরূপ ব্যাপারের পরিকল্পনা সম্ভব। ব্যাপারখানা এই। কৃষিক্ষেত্র হিন্দুদের হাত ছাড়া হইয়া মুসলমানের অধিকারে গিয়াছে, এই সব কৃষিক্ষেত্রের উদ্ধার সাধন আবশ্যক। টাকা চাই আর পাঁচশত যুবক চাই। এই জন্য একটা আন্দোলন হইল। মনে হয়, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ই ইহার কর্ণধার ছিলেন, শরৎবাবু বক্তৃতা করিতেন, কাঁদিতেন এবং বক্তৃতার শেষে ধূলায় গড়াগড়ি দিতেন। পয়সা কড়ি কত কি উঠিয়াছিল জানি না, কিন্তু ব্যাপারটা একটা বিরাট আকাশ-কুসুম মাত্র। যদি কিছু পয়সা উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা যে খুবই সামান্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। সরকার বাহাদুরের যেমন এমন কতকগুলি লোকহিতকর বিভাগ আছে, যাহার মঞ্জুরি টাকা সরঞ্জামিতেই ফুরাইয়া যায়, কাজ করিবার জন্য কিছু থাকে না, পূর্ব্বে যে-আন্দোলনের কথা বলা হইল, তাহাতেও প্রায় তাহাই হয়। বক্তৃতার হলের ভাড়া, বিজ্ঞাপন-ছাপাই, প্ল্যাকার্ড টাঙ্গানোতেই খরচ, বাকি কিছু নেতাদের গাড়ীভাড়ায় দিলেই, জমা ও খরচ মিলিয়া যায়।

"গৌরাঙ্গ গোষ্ঠী" নাম দিয়া শরৎকুমার একটি মণ্ডলী গঠনের চেষ্টা করেন, নবদ্বীপে কয়েকদিন বক্তৃতা করেন, কিন্তু টাকা কোথায়, মানুষ কোথায়? শরৎকুমার সন্ন্যাসী হইলেন, স্ত্রীপুত্র পড়িয়া থাকিল, শরৎকুমার বৃন্দাবনে তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহোদয় শরৎকুমারের একজন সুহৃৎ। তিনি তাঁহার 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকায় শরৎকুমারের পরিবার রক্ষার জন্য প্রকাশ্যভাবে ভিক্ষা করিয়া থাকেন।

শরৎকুমার একজন ভাবুক, ধর্ম্মরাজ্যের লোক, তাঁহাকে সাংসারিক লোক বলিয়া মনে হয় না। যে-সব মানুষ কেবল ধর্ম্মরাজ্যেরই মানুষ, কর্ম্মরাজ্যের নহে, তাহাদের সহিত সংসারের সক্ষম মানুষদের মিল হয় না। তাহারা অসাধারণ ও খেয়ালি;—exceptional, eccentric এই সব লোকের প্রায়ই ভাবোচ্ছ্বাস খুব বেশী হয়—of exalted emotional sensibility, আবার কখন কখন ব্যাধির মতো একটা বিষণ্ণতা আসিয়া অন্তর্জীবন অধিকার করে। মনস্তত্ত্ববিৎগণ যাহাকে fixed idea বলে, এই সব লোক প্রায়ই তাহা দ্বারা আক্রান্ত হয়, কাজেই সংসারে দশজন লোকের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারে না। দেবদর্শন স্বপ্নাদেশ প্রভৃতি যে-শ্রেণীর লোকের হয়, ডাক্তারেরা যাহাকে neurotic বলেন, শরৎকুমার সেই শ্রেণীর লোক। ক্ষেত্র অনুকূল হইলে ধর্ম্মরাজ্যে এই শ্রেণীর লোকেরাই উচ্চস্থানের অধিকারী। শরৎকুমার এই শ্রেণীর লোক। তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, বিবেচনা সম্বন্ধে যিনি যাহা বলিবেন বলুন, কিন্তু ভণ্ড আর অর্থলিপ্সু, এই দুইটি কথা বলিবেন না। হইতে পারে শরৎকুমারের জীবনের ভুল, রাজনীতির দলে মেশা। বোধ হয়, তাঁহার এই বিভাগের অভিজ্ঞতার অভাব ছিল, সেইজন্য তাঁহার জীবন-দেবতা বা গুরুদেব তাঁহাকে রাজনীতির আবর্ত্তে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। হইতে

পারে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, ঠিক্ স্বার্থমূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নহে, পরার্থমূলক বা দেশসেবামূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহার তাড়নায় অন্ধভাবে রাজনীতিক আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা ভাল কি মন্দ, কাহারও বলিবার অধিকার নাই। তবে তাঁহার দ্বারা যে অনেক কাজ হইয়াছে, রাজনীতিক বক্তৃতামঞ্চে একটা নূতন ভাবুকতার রসোন্মাদ যে শরৎকুমার দিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবশাস্ত্রে যাহাকে 'বিজাতীয়াশয়' লোক বলে, তাহাদের সঙ্গ করায় শরৎ-কুমারের যেমন একদিকে কিছু ক্ষতি হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি তিনি অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। এখন তিনি শ্রীবৃন্দাবনে, অনুমান হয় তপস্যা করিতেছেন। দেশের লোকে যাঁহারা তাঁহাকে জানে, তাঁহারা এখনও তাঁহার আশা রাখে। সুতরাং না জানিয়া তাঁহার নিন্দা করিলে অপরাধ হইবে।

শ্রীবুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্য

আমাদের দেশে যাঁহারা আচার্য্য বা ধর্ম্মোপদেশক তাঁহারা অধ্যাত্মবিজ্ঞান বা ধর্ম্মতত্ত্ব-আলোচনার আধুনিক ও সমুন্নত পদ্ধতির সহিত পরিচিত হইলে দেশের বড়ই উপকার হয়। এই পদ্ধতি ঐতিহাসিক, তুলনামূলক ও ক্রমবিকাশবাদের বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। Historico-Comparative and Evolutionary.

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ধর্ম্মে দুইটি সাধনধারা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে এই দুইটি ধারা বিরোধী। এই দুইটির মধ্যে একটি সত্য, আর একটি কতকগুলি অধিকারী ব্যক্তির অধিকার-রক্ষার প্রচেষ্টা-প্রসূত। বুদ্ধদেব বিষ্ণুর নবম অবতার, বৌদ্ধভাবাপন্ন জনসাধারণই বঙ্গে এবং উড়িষ্যায় শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কাজেই বৌদ্ধধর্ম্মের মৌলিক তত্ত্বগুলির আলোকে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্মের আলোচনা করিলে ভাল হয়।

একদল লোক সমাজে প্রবল ও প্রধান হইয়া অত্যাচার ও অবিচার করিত, ভণ্ডামি করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে একচেটিয়া অধিকারের দাবি করিত, বৌদ্ধধর্ম্ম তাহারই প্রতিবাদ। যাজকতন্ত্রের কবল হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের মুক্তিবিধান করিয়াছিল। অন্ধ-শাস্ত্রবাদ বা বেদবাদের পরিবর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্ম জনসাধারণকে যুক্তিবাদে (Rationalism) অভ্যস্ত করিয়াছিল। দেবতাকে বা দেবতা-রক্ষক মোহান্ত বা পুরোহিতকে উৎকোচের দ্বারা তুষ্ট করিয়া স্বর্গে যাইতে হইবে, এই কুসংস্কারের দ্বারা ভারতবর্ষ যে-সময়ে মৃতপ্রায়, বুদ্ধদেব সেই যুগে আসিয়া ঘোষণা করেন—মানুষের মুক্তি তাহার নিজের হাতে, দেহ ও মনের পবিত্রতার দ্বারা, সংযম ও পরার্থপরতার দ্বারা প্রত্যেক মানুষই মুক্তি-লাভের অধিকারী।

গীতার ধর্ম্মও ঠিক্ ইহাই। শ্রীচৈতন্তভাগবত-গ্রন্থ ভাল করিয়া পড়িলে বুঝিতে পারা যায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ধর্ম্মও ঠিক্ এই ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্ম, বুদ্ধ, সংঘ, বৌদ্ধধর্ম্মের এই ত্রিরত্ন। শ্রীচৈতন্তভাগবতের প্রথমেই এই 'সংঘ'।

আগে শ্রীচৈতন্ত-প্রিয় গোষ্ঠির চরণে।
অশেষ প্রকারে মোর দণ্ড পরণামে॥

ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ, একই কথা, বিশ্বের মূল ধর্ম্ম, ধর্ম্মই প্রেম, প্রেমই কৃষ্ণ। Law = Love, ধর্ম্মকে যিনি জানিয়াছেন, জানিয়া ধর্ম্মের সহিত যিনি এক হইয়াছেন, তিনিই বুদ্ধ। আর শ্রীকৃষ্ণকে যিনি জানিয়াছেন তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত। এই বুদ্ধকে যাঁহারা জগতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত, রক্ষা করার জন্ত একতাবদ্ধ ও সাধনরত তাঁহাদের মণ্ডলীর নাম সংঘ। প্রথম সংঘ, তাহার পর বুদ্ধ, তাহার পর ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তকে রক্ষা করার জন্ত সংঘ স্থাপনা করিলেন শ্রীনিত্যানন্দ, তাঁহার পর শ্রীল নরোত্তম। এই কারণে শ্রীল নরোত্তম বলিলেন—

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোরে গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।

প্রেমই সত্য, প্রেমই জ্ঞান, প্রেমই আনন্দ। সত্যজ্ঞানানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তাবস্থাই 'যুগলকিশোর', শ্রীরাধাকৃষ্ণ, এই যুগল-পিরীতিই প্রয়োজন। বুদ্ধদেবের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের তুলনামূলক আলোচনাই এখন সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্মে যে ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে তাহা দূর করিবার ইহাই প্রথম উপায়।

চণ্ডীদাস ও শ্রীগৌরাঙ্গ

চণ্ডীদাস বীজ, শ্রীগৌরাঙ্গ অঙ্কুর। পীড়িত ও বিচ্ছিন্ন বঙ্গদেশ কাতরে কাঁদিতেছে, সেই প্রেমবৃক্ষ আর কতদূর! যাহার ফল অমৃত! ইহাই বাঙ্গালার মর্ম্মকথা বা সাধনা। চণ্ডীদাস যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা ইন্দ্রিয়াতীত। চণ্ডীদাস মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

শুন, রজকিনী রামি।
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি॥
তুমি বেদবাদিনী, হরের ঘরণী, তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা-যাজনে, তুমি সে গলার হারা॥
রজকিনী-রূপ কিশোরী-স্বরূপ, কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥

চণ্ডীদাস লাঞ্ছিত। আদ্যাশক্তি নিত্যার প্রেরণায় বাশুলির ব্যবস্থায় এই উপযুক্ত আধারের মধ্য দিয়া যে প্রেম জগতে দেখা দিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গই সেই প্রেম।

পিরীতি পিরীতি, সব জন কহে, পিরীতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল, নহেত পিরীতি, নাহি মিলে যথা তথা॥
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি-রতন লভিল যে জন বড় ভাগ্যবান্ সে॥
পিরীতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া, পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে পিরীতি মিলয়ে তারে॥
পিরীতি-সাধন, বড়ই কঠিন, কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া, এক অঙ্গ হও, থাকিলে পিরীতি আশ॥

এই প্রীতিই পঞ্চম পুরুষার্থ। এই প্রীতির সাধনার দ্বারা 'নবসংঘ' গঠন করিতে হইবে। বুদ্ধদেব শ্রীগৌরাঙ্গে পরিণতি লাভ করিবেন।

গ্রন্থ-পরিচয়

১। **ঠাকুর বাণী**—প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্ট জেলার শতক গ্রামে কাশ্যপ-গোত্রীয় রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশে সিদ্ধ মহাপুরুষ ঠাকুর বাণীনাথের আবির্ভাব হয়। তাঁহার দুই স্ত্রীর গর্ভজাত দুই পুত্র অনাথ ও রাজেন্দ্র। শ্রীহট্ট জেলার আথানগিরির গোস্বামী-বংশ, অনাথের বংশধর; আর উক্ত জেলার দিনারপুর, চৌয়ালিশ, চাউতলী ও ভানুগাছের গোস্বামীবংশ রাজেন্দ্রের বংশ। এই গোস্বামীগণের অনেক শিষ্য আছে; ঠাকুর বাণীনাথ শতকগ্রামে যে তেঁতুলগাছের নীচে বসিয়া সাধন করিতেন, সেই সিদ্ধ তেঁতুলগাছ এখনও আছে, মাঘী শুক্লা ষষ্ঠীতে ঠাকুরের জন্মতিথি-উপলক্ষে সেখানে এখনও বিরাট মহোৎসব হইয়া থাকে।

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে রঘুনাথ রায় কানুনগো নামক জনৈক বৈষ্ণব সাধক ঠাকুরবাণীর বংশধর পরমানন্দ গোস্বামীর নিকট ঠাকুরের জীবন-কাহিনী অবগত হইয়া "শ্রীবাণী-চরিত্র-চিন্তারত্ন" নামে একখানি পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই পুঁথি অবলম্বনে শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত।

ঠাকুর বাণীনাথ উদারমতাবলম্বী ছিলেন, আল্লা শ্রীকৃষ্ণ, কোরাণ পুরাণ সমদৃষ্টিতে দেখিতেন। মুসলমানেরা তাঁহাকে নানারূপে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার অলৌকিক শক্তিবলে কেবল যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা নহে মুসলমানগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন। কুলজা সাহিত্য-

মন্দির, পোঃ নর্ত্তন, শ্রীহট্ট হইতে গ্রন্থখানি প্রকাশিত, উত্তমরূপে মুদ্রিত, কয়েকখানি চিত্রও আছে, ভাষা বেশ প্রাঞ্জল, মূল্য ছয় আনা। "শ্রীবাণী-চরিত্র-চিন্তারত্ন" গ্রন্থখানি মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক।

২। **মর্ম্মগাথা**—কবিতা পুস্তক—শ্রীকালাচাঁদ দালাল বিরচিত। শান্তিপুর, নদীয়া; প্রেম-নিকেতন হইতে শ্রীচিদানন্দ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। কবির 'মর্ম্মবাণী' নামক পুস্তক-সম্বন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম—"এই পুস্তকের কবিতাগুলির ভাষা যেমন স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, ভাবও তেমনি পবিত্র। প্রত্যেক কবিতাই ভক্তিরসপূর্ণ ও উদার ভাবের উদ্দীপক।" এই গ্রন্থখানি আরও ভাল লাগিল। ভাবে ও ভাষায় কোনরূপ কৃত্রিমতা বা অস্পষ্টতা নাই। "শান্তিপুর-গ্রাম", "শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত", "কাল-বিপর্য্যয়" প্রভৃতি কবিতা অতীব মধুর ও উপভোগ্য। লেখক যে একজন সুকবি, এই গ্রন্থের দ্বারা তাহা সুপ্রমাণিত হইয়াছে।

৩। **শান্তিপুর ও শ্রীঅদ্বৈত**—পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের তিনটি কবিতা পৃথক্‌ভাবে মুদ্রিত। মূল্য এক আনা মাত্র, সুপাঠ্য ও সুন্দর।

৪। **মহাত্মাজীর চিঠি**—প্রথম খণ্ড—অনুবাদক শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীকালীকুমার মিত্র। মূল্য আট আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান কোন্নগর, হুগলি। মহাত্মাজি এক সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ডার্ব্বাণ বন্দর হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত "ফিনিক্‌স্" নামক পল্লীতে ভারতীয়-গণের একটি পল্লীবাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই পল্লীবাসে প্রত্যেককেই দরিদ্রের ন্যায় জীবন যাপন করিতে হইত। মাসে ৪৫৲ টাকার অধিক কেহ গ্রহণ করিতে পারিত না। ব্যবসায়ে লাভ হইলে সকলে তাহার সমান অংশ পাইত। প্রত্যেককে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য বিনা সুদে টাকা দেওয়া হইত, চাষের জমি দেওয়া হইত। এইখান হইতেই তাঁহার বিখ্যাত সংবাদপত্র "ইণ্ডিয়ান্ ওপিনিয়ন্" বাহির হইত। মহাত্মাজি যখন এই কার্য্যে লিপ্ত, সেই সময়ে তাঁহার পুত্র মণিলালকে যে-সব পত্র লিখিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে সেই পত্রগুলি প্রাঞ্জলভাষায় অনূদিত হইয়াছে। 'আত্মানুসন্ধান', 'ধর্ম্মজীবন গঠন', 'বাল্য-বিবাহ' প্রভৃতি অনেক বিষয়েই মহাত্মার মত এই সব পত্রে পাওয়া যাইবে। মহাত্মাজীর জীবনের তপস্যা যে কিরূপ কঠোর এই গ্রন্থে তাহারও বেশ পরিচয় পাওয়া যাইবে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থের ব্যাখ্যায় মহাত্মাজীর পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রার্থের অনুভব কিরূপ আশ্চর্য্যজনক এই গ্রন্থপাঠে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার প্রার্থনীয়। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড সত্বর বাহির হইবে।

৫। **দরিদ্র নারায়ণ**—শ্রীমধুসূদন আচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ-প্রণীত। বালিয়াটি, ঢাকা, হইতে শ্রীহীরালাল সাহা প্রকাশক। মূল্য দশ আনা মাত্র। বালিয়াটি-গ্রামে একটি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম আছে, আবার তাহার সম্মুখে নবদ্বীপ-মায়াপুরের একটি আশ্রমও আছে। উভয়ের মধ্যে মতভেদ তো আছেই, গ্রাম্য দলাদলিও আছে। এই গ্রন্থের যিনি লেখক তিনি সেবাশ্রমের প্রধান

কর্ম্মী। পুস্তকখানি সুলিখিত। ভারতের ও পশ্চিম দেশের ধর্ম্মে জনসেবার স্থান কোথায়, এবং উভয় দেশের জনসেবাবিষয়ক ধারণার প্রভেদ কি, গ্রন্থকার তাহা দেখাইয়াছেন। একটি অধ্যায়ের নাম "বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও দরিদ্র-সেবা"। এই অধ্যায়ে বর্ত্তমান সময়ের গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণের জনসেবায় ঔদাসীন্য দেখিয়া গ্রন্থকার বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা গ্রন্থকারের মতের অনুমোদন করি।

গ্রন্থকার ভারতীয় শাস্ত্র ও সমাজ-ব্যবস্থা-সম্বন্ধেও যেমন সুপণ্ডিত; বর্ত্তমান প্রতীচ্যের সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, শ্রমিক-আন্দোলন প্রভৃতির সহিতও তিনি সেইরূপ সুপরিচিত। কাজেই গ্রন্থখানি বেশ ভাল হইয়াছে। মফঃস্বলের সেবাশ্রম হইতে এই প্রকারের গ্রন্থপ্রচার পল্লীজীবনের উন্নতির পরিচায়ক। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা ও উপদেশ গ্রাম্যজীবনেও প্রবেশ করিতেছে, ইহা খুব আশার কথা সন্দেহ নাই।

৬। **The Suppressed Classes of India**—শ্রী রাধিকা মোহন অধিকারী। এই ইংরাজী পুস্তকখানিও 'বালিয়াটি' হইতে প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা। দেশের অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়নের আবশ্যকতা এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইংরাজী ১৯১৫ অব্দে গ্রন্থকার ভারতরক্ষা আইনে বন্দী হইয়াছিলেন, সেই বন্দীদশায় তিনি Hinduism and Untouchability (হিন্দুধর্ম্ম ও অস্পৃশ্যতা) এবং এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন। গ্রন্থ দুইখানি তিনি বাঙ্গালাতেও লিখিতে পারেন।

৭। **বর্ত্তমান সমাজের ইতিবৃত্ত**—শ্রীভাগবতচন্দ্র দাশ, বি, এল্‌-প্রণীত। মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত, মূল্য এক টাকা।

কত যুগ যুগান্তের, কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কত শত শত গ্রন্থ শাস্ত্র-নামে পরিচিত হইয়া আমাদের এই হিন্দু-সমাজে চলিতেছে। শাস্ত্ররাশি এক গহন বন। এই দুর্ভেদ্য গহনে বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকী-চিন্তার রশ্মি প্রবেশ করাইতে হইবে। যাঁহারা শাস্ত্র-ব্যবসায়ী তাঁহাদের অক্ষমতা প্রমাণিত হইয়াছে—সুতরাং শক্তিশালী ও শাস্ত্রজ্ঞ নব নব কর্ম্মীর প্রয়োজন। নতুবা, এই শাস্ত্র ও এই শাস্ত্র-শাসিত সমাজ বিপর্য্যস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। এই গ্রন্থের যিনি লেখক, তিনিও ব্রাহ্মণ-সন্তান; শাস্ত্র-ব্যবসায়ী নহেন কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ। বেদ, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের শৃঙ্খলাবদ্ধ সামাজিক ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি চিন্তাশীল হিন্দুমাত্রেরই যত্নপূর্ব্বক পড়া উচিত; যাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাকেন, কিন্তু ঐতিহাসিক তুলনামূলক পদ্ধতিতে শাস্ত্রালোচনা করেন নাই, জড়স্বভাব ও ভীরুতা-প্রযুক্ত প্রচলিত সংস্কারকেই শাস্ত্রের দোহাই দিয়া চলেন, তাঁহাদের এই শ্রেণীর গ্রন্থ পাঠ করিতে বাধ্য করা উচিত। এই গ্রন্থ পড়িলে আমাদের অনেক কুসংস্কার দূরগত হইবে, নিজেদের দোষগুণ বুঝিতে পারিব এবং আমাদের সমাজের ও ধর্ম্মের

উন্নতিপথ কোন্ দিকে তাহাও অবধারণ করিতে পারিব। এই গ্রন্থখানি আমাদের সমাজ-বিজ্ঞানের গ্রন্থ। হিন্দু-সমাজ-বিজ্ঞান নামের বাজে গ্রন্থ আমরা দেখিয়াছি—কিন্তু এ-প্রকারের সমাজতত্ত্বের গ্রন্থ আমরা পূর্ব্বে দেখি নাই। এই গ্রন্থের সিদ্ধান্তগুলির বহুল প্রচারের জন্য সংঘবদ্ধ চেষ্টা প্রয়োজন।

৮। **সেবকের আদর্শ**—শ্রীরাধিকামোহন অধিকারী-প্রণীত। বালিয়াটি পোঃ ঢাকা। মূল্য চারি আনা মাত্র। এই গ্রন্থকারের "দরিদ্র নারায়ণ" নামক গ্রন্থের আমরা সমালোচনা ও প্রশংসা করিয়াছি। এই গ্রন্থখানিও বেশ ভাল হইয়াছে। দোষ, ছাপা ভুল; আর ত্রুটি, মহাত্মা গান্ধীর কথা উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজীর অনুবাদ করা হয় নাই। ইংরাজী অংশগুলির স্বপ্রাঞ্জল ও সুবোধ্য অনুবাদ আবশ্যক।

৯। **প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ**—প্রভুপাদ শ্রীবিভূতিভূষণ গোস্বামী-প্রণীত। শ্রীধাম নবদ্বীপ "জয় জয় মহাপ্রভুর মঠ" হইতে প্রকাশিত, মূল্য চারি আনা মাত্র। গ্রন্থকার একজন সুপরিচিত ধর্ম্মপ্রচারক এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশধর। বাগ্মী ও সুলেখক সমাজ-সংস্কারক শ্রীদিগীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন। তাঁহার কথাই আমাদেরও কথা। তিনি লিখিয়াছেন—"এই পতিত দেশে, পতিত সমাজে পতিত-পাবন শ্রীগৌরাঙ্গের আদর্শে যাহাতে প্রকৃত মানুষ, প্রকৃত ভক্ত গড়িতে পারে তজ্জন্য তাঁহার (গ্রন্থকারের) প্রাণ ব্যাকুল। সারা বাঙ্গালা ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। * * * গৌর-ভক্তগণ ইহা পাঠে বিমল আনন্দ লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই; ভক্তগণের প্রাণেও নূতন চিন্তা, কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনার সঞ্চার করিবে।"

১০। **শ্রীশ্রীরাধারমণ-কথামৃত**—শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীকালীকুমার মিত্র-সঙ্কলিত। কোন্নগর, পোঃ হুগলী। মূল্য আট আনা মাত্র। শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের জীবন-চরিত-গ্রন্থ হইতে এই উপদেশগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে। নাম-মাহাত্ম্য, গুরুতত্ত্ব, কৃপা, সাধন, গৌরাঙ্গ-ভজন প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের জ্ঞাতব্য অনেক প্রসঙ্গ আছে। "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম" এই নামের অর্থও এই গ্রন্থে আছে। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"ব্রজে যেমন—"ব্রজবাসীর কোন এক ভাব লইয়া ভজে। ভাবযোগ্য দেহ পাইয়া কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥" নবদ্বীপেও সেইরূপ—"গৌরগণের আনুগত্যে ভজে যেই জন। অনায়াসে পায় সেই গৌরাঙ্গ-চরণ॥" শ্রীগৌরাঙ্গদেব যেমন ভাবনিধি, শ্রীনিতাইচাঁদও সেইরূপ সকল ভাবের আশ্রয়। আবার, শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন সকল রসের আকর, শ্রীনিতাইচাঁদও সেইরূপ সকল রসের গুরু। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলেছেন—

নিতাই নাগর, রসের সাগর, সকল রসের গুরু।
যে যাহা চায়, সেই তাহা পায়, বাঞ্ছা কল্পতরু॥

কাজেই যে-ভাবের বা যে-রসের উপাসক হউক না কেন, একমাত্র নিতাইকে আশ্রয় ক'র্‌লেই সেই-ভাবে ও সেইরসে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে লাভ কর্‌তে পার্‌বেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয় এবং নিতাই আশ্রয়। "ভজ নিতাই গৌর" অর্থাৎ যদি মানবজন্ম সফল করতে চাও, তবে নিতাইচাঁদকে আশ্রয় করে শ্রীগৌরাঙ্গের ভজনা কর অর্থাৎ সেবা কর। নিতাই প্রেমদাতা। আগে প্রেমধন না পেলে কি দিয়ে গৌরাঙ্গের সেবা কর্‌বে? গৌরাঙ্গচাঁদ প্রেমের কাঙাল—ধন, মান, কুলের কাঙাল ত নন। তাই মহাজনগণ বলেছেন—

গৌরাঙ্গ পাইতে যদি থাকে অভিলাষ।
একান্ত ভাবেতে হও নিত্যানন্দ দাস॥
মুখেও যে জন বলে মুঞি নিত্যানন্দ দাস।
নিশ্চয় দেখিবে গোরার স্বরূপ প্রকাশ॥

এইরূপ নিতাইর কৃপায় যেমন গৌরাঙ্গ পাইলাম, অমনি আদেশ হল—"ভজ রাধেশ্যাম" উপায়—"জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম"। তারপর মহাপ্রভু নিজমুখে বলেছেন—"জনম ধরিয়া হেলায় শ্রদ্ধায় যে লয় নিতাইর নাম। আমি বিকাই তারে দেখাই যুগল রাধাশ্যাম॥" তবেই দেখ, গৌরাঙ্গ লাভ হলে রাধাগোবিন্দ প্রাপ্তির জন্য অন্য কোন সাধন ভজন না কর্‌লেও নিজ নিজ হৃদয়ের ভাবানুসারে সেই গৌরাঙ্গই রাধাশ্যামকে মিলিয়ে দেবেন। আরও দেখ "নিতাই গৌর রাধেশ্যাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" জপ করবার ব্যবস্থাই দেওয়া হয়েছে। জগতে কোনো লোক যদি সামান্য উপকার করে বা কিছু দেয়, লোকে আজীবন তার প্রশংসা করে থাকে। আর যাঁর কৃপায় গোলোকের গোপনীয় চির-অনর্পিত ধন অনায়াসে লাভ কর্‌লে, আগে তাঁকে না ভজে—তাঁর গুণগান না ক'রে, অপরের গুণ গাইলে নেমকহারামি হয় না কি? অতএব সর্ব্বাগ্রে নিতাই-গৌর ভজ, কোন অভাব থাক্‌বে না। পরিশেষে দেখ, এই মন্ত্র স্বপ্রকাশ—বালকেও অতি সহজে উচ্চারণ কর্‌তে পারে। কলির প্রভাবে জীবসকলের জিহ্বায় জড়তা এসেছে; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে শ্রীনিত্যানন্দ-পদাশ্রয় পূর্ব্বক তাঁর কৃপালাভ কর্‌তে না পার্‌লে নাম উচ্চারণের শক্তি মানুষ কোথায় পাবে? তাই দেশকালপাত্র অনুযায়ী এই নামের ব্যবস্থা হয়েছে।" এই গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠায় একটি উপদেশ আছে, তাহা সংশয়িত এবং সহজেই কদর্থিত হইতে পারে।

১১। শীতল ছায়া ১২। কিসে হয়—গদ্য ও পদ্যময় গ্রন্থ। শ্রীশচীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীআশুতোষ মিত্র, ১০১ ক্রেজার ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ। মূল্য ৷৵০ ও

১৮। গ্রন্থকার ইন্‌জিনিয়ারের কাজ করেন। দ্বিতীয় গ্রন্থে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবন কথা আছে। তিনি দুঃখের সহিত অনেক সংগ্রাম করিয়াছেন, অনেক দুঃসাহসিক কর্ম্ম করিয়াছেন, দুর্গম প্রদেশে আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হস্তে অনেকবার রক্ষা পাইয়াছেন। এই প্রকারের অভিজ্ঞতা বর্ত্তমান বাঙ্গালীর বৈচিত্র্যহীন জীবনে খুবই কম ঘটে। আলোচ্য গ্রন্থের অনেক কবিতাই গ্রন্থকারের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা। এই সব অভিজ্ঞতার মূল্য খুব বেশী। গ্রন্থকার পেশাদার সাহিত্যিক নহেন; আড়ম্বরহীন সরল শিশু, নিজের স্বাভাবিক ভাষায় প্রাণের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। মরমী ও দরদী হইয়া বিশ্বাস-সহকারে গ্রন্থ দুইখানি যিনি পড়িবেন, তিনিই গ্রন্থকারকে আপনার জন বলিয়া ভাল বাসিবেন। গ্রন্থকার একজন কৃষ্ণ উপাসক, বৃন্দাবন-চন্দ্র তাঁহার প্রাণের দেবতা। তিনি তাঁহার দেবতাকে খুব কাছে পাইয়াছেন, খুব আপনার করিয়া পাইয়াছে। গ্রন্থকার ভাগ্যবান্।

মধ্বাচার্য্য ও শ্রীগৌরাঙ্গ

শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গে ও উৎকলে যে ধর্ম্মমণ্ডলী গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই মণ্ডলীর এখন শৈশবাবস্থা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চারিশত বৎসর একটি ধর্ম্মমণ্ডলীর জীবনে বেশি দিন নহে। এই মণ্ডলীতে এখনও নানারূপ মতভেদ চলিতেছে, এমন কি মৌলিক ব্যাপার লইয়াও মতভেদ আছে। এই মণ্ডলীর অধিকাংশ আচার্য্যই স্বীকার করেন এই মণ্ডলী মধ্ব-সম্প্রদায়ের শাখা। শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক, বৈষ্ণবদের এই চারিটি মূল সম্প্রদায়। ইহার মধ্যে ব্রহ্ম সম্প্রদায়েরই অন্য নাম মধ্ব-সম্প্রদায়। মধ্বাচার্য্যের নামানুসারে এই নাম হইয়াছে। কটক হইতে একজন ভক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণ বসু মহাশয় কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক ছাপাইয়া বিলি করিতেছেন। আমরা অনেকদিন পূর্ব্বে এই কাগজ পাইয়াছি। তাহাতে তিনি দেখাইতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মণ্ডলীকে মধ্ব-সম্প্রদায়ের শাখা বলা চলে না; শ্রীগৌরাঙ্গ দেবই একজন সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক; তাঁহার মণ্ডলী প্রাচীন চারি সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ একটি নূতন সম্প্রদায়। তিনি যে-সব যুক্তি দিয়াছেন তাহা অসঙ্গত নহে। তাঁহার যুক্তিগুলি এইরূপ।

১। চারি সম্প্রদায়ের যে চারিজন প্রবর্ত্তক, শ্রীগৌরাঙ্গদেব সেই চারিজনেরই 'ভর্ত্তা' সুতরাং তিনি আবার ইঁহাদের অনুগত হইবেন কেন?

২। মধ্ব-সম্প্রদায়ের সাধ্য পঞ্চবিধা মুক্তি, সাধন কর্ম্মার্পণ, শাস্ত্র মহাভারত, ইষ্ট দ্বারকাপতি, ভাষ্য মধ্বভাষ্য, বাদ দ্বৈতবাদ। শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মমণ্ডলীর সাধ্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, সাধন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত, ইষ্ট শ্রীনন্দনন্দন, ভাষ্য গোবিন্দভাষ্য, বাদ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ। সুতরাং ছয়টি তত্ত্বেই প্রভেদ, সুতরাং ইঁহাদের অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধ হইতে পারে না।

৩। শ্রীগৌরাঙ্গদেব যদি মধ্বসম্প্রদায়ের মতই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তত্ত্ববাদী-গণের সহিত বিচার করিয়া তিনি তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন কেন ?

এ-সম্বন্ধে আমাদের আপাততঃ কিছুই বলিবার নাই। আচার্য্যগণ চিন্তা করিবেন। আমরা জানি ভবিষ্যতে মানুষের ধর্ম্মজীবন মণ্ডলীর দ্বারা শাসিত হইবে না, প্রত্যেক মানুষের ধর্ম্ম তাহার নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার হইবে।

পূর্ব্বের কথাগুলি যিনি প্রচার করিতেছেন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম্ এ। কিছুদিন সাব্ ডেপুটি কালেক্টরী কার্য্য করিয়াছিলেন। কোনও কারণে সেই চাকুরী যায়। তিনি শ্রীমৎ রাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের একজন শিষ্য। কটকে রাসবিহারী মঠ বলিয়া যে মঠ আছে, নবদ্বীপের বাবাজীদের অপসারিত করিয়া তিনিই এখন সেই মঠের অধ্যক্ষ। চরণদাস বাবাজী মহোদয়ের অন্য শিষ্য রামদাস বাবাজীর ইনি বিরোধী, উড়িষ্যার শিষ্য লইয়া ইঁহাদের মধ্যে প্রতি-যোগিতা। রাধাকৃষ্ণ বাবুরা উড়িয়া বাঙ্গালী। ইনি পূর্ব্বে আর একখানি কাগজ ছাপাইয়া প্রতিপাদন করিয়াছিলেন যে শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গলীলার পঞ্চতত্ত্বের সমষ্টি। চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের নামে ইনি দীক্ষাদান করেন, উড়িষ্যায় ইঁহার অনেক শিষ্য আছে।

শ্রীবিষ্ণুদাস কবীন্দ্র

'বীরভূমি'তে এই গোস্বামী-পরিবার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বাহির হইয়াছিল। সম্প্রতি 'ভক্তি-প্রভা' কাগজে শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, আমরা তাহা আদরপূর্ব্বক পত্রস্থ করিলাম। এই প্রসঙ্গে একটি আনন্দের কথা প্রকাশ করিতেছি। বৈষ্ণব-পত্রিকা "ভক্তি-প্রভা"র সম্পাদক মহাশয় তাঁহার বৈষ্ণব ইতিহাসে কবীন্দ্র পরিবার সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিবরণ বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহার দোষ নাই, রিজ্‌লি সাহেবেরই ইহা ভুল। সরকারী কাজ যেমনভাবে হয়, রিজ্‌লি সাহেবের কাজ সেইভাবেই হইয়াছিল, কোন বাজে লোকের মুখে একটা কিছু শুনিয়া কোন আমলা তাহা লিখিয়া দিয়াছিল। বৈষ্ণব পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় এই ভুলের কথা জানিতে পারিয়া ভুল স্বীকার করিয়াছেন এবং 'ভক্তি-প্রভা' পত্রিকায় যথার্থ বিবরণ বাহির করিয়া বৈষ্ণবোচিত মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। পত্রিকা-জগতে ও আমাদের সাহিত্য-জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। বৈষ্ণব আদর্শের জয় হউক।

স্বর্ণবর্ণং দ্বিভুজঞ্চ ধ্যানাবিষ্টং দ্বিনেত্রকং।
শ্রীচৈতন্যপ্রিয়ং-বন্দে বিষ্ণুদাস-কবীন্দ্রকং॥

পূত-সলিলা ভাগীরথী তীরে নবলা বিষ্ণুপুর গ্রামে আনুমানিক ১৪১২ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরা তিথিতে শ্রীবৃন্দাবন লীলায় শ্রীচম্পকলতা সখীর যূথের শ্রীমণিকুণ্ডলা সখী শ্রীল বিষ্ণুদাস কবীন্দ্র ঠাকুর

নামে আবির্ভূত হন। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় ৬৪ মহান্তের একজন, সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রণম্য। এই নওলা বিষ্ণুপুর গ্রাম এক্ষণে গঙ্গাগর্ভে নিহিত। ইঁহার পিতার নাম শ্রীসদাশিব গুণাকর, এবং মাতার নাম রসবতী। সদাশিব দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চিত্রপুরের দে বংশ, কাশ্যপ গোত্র, ৭ ঘরের মধ্যে সৎ-মৌলিক।

শ্রীল বিষ্ণুদাস কবীন্দ্র পরম সুন্দর পুরুষ ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে বিনয়ী, সত্যবাদী ও হরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন। সাধারণতঃ বালক বালিকারা প্রথমে 'মা', 'মা', "বা" "বা", 'দা', 'দা' প্রভৃতি কথা বলিতে শিখে, কিন্তু বিষ্ণুদাস প্রথমে "হরি" "হরি বুলি বলিতে শিখিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ফুলিয়া গ্রামের শ্রীমধু পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ, সাংখ্য, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ, বেদান্ত, ভক্তি-শাস্ত্র প্রভৃতি পাঠ শেষ করিয়া সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সেই সময় একদিন—

"নিশিযোগে নিদ্রাবেশে দেখেন স্বপন।
সম্মুখেতে ব্রহ্মচারী আছেন একজন ॥
তিনি যেন সম্বোধিয়া কহে বিষ্ণুদাসে।
সাধ্য সাধন শিখে নিমাঞের পাশে ॥
নবদ্বীপ ধামে বাস শ্রীশচীনন্দন।
তিনি করিবেন তব সন্দেহ ভঞ্জন ॥

নিদ্রাভঙ্গে বিষ্ণুদাস নিজ অধ্যাপক শ্রীমধু পণ্ডিতের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং বৃদ্ধ পিতা ও বৃদ্ধা মাতার নিকট শ্রীধাম নবদ্বীপে যাইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। তখন তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে বিবাহ করিয়া পুত্র মুখ দেখিয়া পরে নবদ্বীপ যাইতে অনুমতি করিলেন। প্রত্যক্ষ দেবতা মাতা পিতার অনুমত্যানুসারে কুলীন গ্রামের বসু রাখালানন্দের একবংশ-সম্ভূত সূর্য্যদাস বসুর রত্নাবতী নাম্নী সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। বিবাহের অল্পদিন পরে বিষ্ণুদাসের মাতাপিতা স্বধামে গমন করিলেন। মাতাপিতার পারলৌকিক কার্য্য শেষ করিয়া পত্নী রত্নাবতীকে পিতৃভবনে পাঠাইয়া দিয়া বিষ্ণুদাস জন্মভূমির নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীধাম নবদ্বীপা-ভিমুখে ছুটিলেন এবং নবদ্বীপে গিয়া রসরাজ মহাভাব শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের সহিত মিলিত হইয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুদাসকে শ্রীরাধা গোবিন্দ নাম প্রদান করিয়া বলিলেন :—

"ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অভিলাষ ছাড়ি।
বলিতে শিখহ মুখে মুকুন্দ মুরারি ॥
শ্রবণ মনন আর স্মরণ কীর্ত্তন।
প্রভৃতি আছয়ে শাস্ত্রে নবধা ভজন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্ ॥" ইত্যাদি।

এই নববিধা ভক্তি নবদ্বীপ ধামে।
দর্শে স্পর্শে ধ্যানে বা লইলে যার নামে॥
সর্ব্বার্থের সাধ্য হয় সাধে প্রেম ধনে।
ভক্তি আর প্রেম শিখ সে সাধ্য সাধনে॥
গতিহীন যত জাতি যে যে লোক আছে।
প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হয়ে বাহু তুলে নাচে॥
শ্রীমুখেতে বিষ্ণুদাস শ্রবণ করিয়া।
"আমার গৌরাঙ্গ" বলি উঠেন কাঁদিয়া॥
গৌরাঙ্গ আমার প্রাণ গৌরাঙ্গ স্মরণ।
গৌরাঙ্গ পদেতে মম জীবন মরণ॥
গৌর-ভক্ত সবে মোরে করহ করুণা।
হৃদয়েশ শ্রীগৌরাঙ্গ মম উপাসনা॥"
এরূপেতে কিছুদিন নবদ্বীপে থাকি।
ভক্তি শাস্ত্র গূঢ় তত্ত্ব লইলেন শিখি॥
নাম গান প্রেমভাব বাড়িতে লাগিল।
দৈন্যতা দাস্যতা অঙ্গভূষণ হইল॥"

ইহার পর কিছুদিন নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, বাসু ঘোষ, শিবানন্দ প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গগণের সঙ্গে নাম-সংকীর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভুর অনুমতি লইয়া নিজ জন্মভূমি বিষ্ণুপুর গমন করিলেন। কিছুদিন বিষ্ণুপুরে পত্নী রম্ভাবতীর সহিত সংসার ধর্ম্ম পালন করিলেন। রম্ভাবতীর গর্ভে বিষ্ণুদাসের এক পুত্র হইল। বিষ্ণুদাস পুত্রের নাম রাখিলেন শ্রীরাধাবল্লভ। নিজ পত্নী ও পুত্রকে দীক্ষা প্রদান করিয়া মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে গমন করিলেন, তাহার কিছুদিন পরেই বিষ্ণুদাসও পত্নী পুত্রের রক্ষার ভার শ্রীহরির উপর প্রদান করিয়া নীলাচল গমন করিলেন এবং তথায় বাস করিতে লাগিলেন; যথা :—

"নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস। এ সভার সঙ্গে প্রভুর নীলাচলে বাস॥"

কোন সময়ে বিষ্ণুদাস নীলাচলে জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে শাস্ত্র-বিচারে পরাজয় করিয়া মহাপ্রভু কর্ত্তৃক "কবীন্দ্র" উপাধি প্রাপ্ত হন। মহাপ্রভুর আদেশে ইনি নীলাচল হইতে পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা জেলার অন্তর্গত সানোরা গ্রামে আসিয়া পত্নী ও পুত্রের সহিত বাস করেন এবং বহু শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, বৃন্দাবনচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপীবল্লভ শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ইহাঁর বংশধরগণ তথায় আরও অনেক সেবা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এক্ষণে তথায় আটটী সেবা বর্ত্তমান আছেন। কথিত আছে কোন সময়ে একজন পাষণ্ড শূদ্র, বিষ্ণুদাস কবীন্দ্রকে নিজের ন্যায় একজন সামান্য শূদ্র জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত অনেক বাদানুবাদ করিতে করিতে তাঁহার সহিত একাসনে উপবেশন করিয়া কবীন্দ্রের শিষ্যগণকে বলেন, তোমাদের গুরুকে আমারই ন্যায় যজ্ঞসূত্র-হীন শূদ্র মনে করি, তাঁহাকে প্রণাম বা ভক্তি করিব কিসের জন্য? এই কথা শুনিবামাত্র বিষ্ণুদাস নখ দ্বারা বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া বক্ষের মধ্যে স্বর্ণের যজ্ঞসূত্র দেখাইলেন। অমনি সেই মুহূর্ত্তে সেই পাষণ্ড শূদ্রের রুধির বমন হইতে আরম্ভ হয়, পরে বিষ্ণুদাসের পদে প্রণত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মুক্তি লাভ করেন। এইরূপে পূর্ব্ববঙ্গের হিংসুক, নিন্দুক, পাষণ্ডী প্রকৃতির যত লোক ছিল সকলকে উদ্ধার করিয়া পত্নী,

পুত্র ও শিষ্যগণের উপর সেবার ভার অর্পণ করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন করেন এবং গোবিন্দবাগে মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীযুগল-সেবা স্থাপন পূর্ব্বক বাস করেন। বৃন্দাবন যাইবার সময় বিষ্ণুদাস প্রিয়পুত্র রাধাবল্লভকে অনুমতি করিয়া যান যে যেন প্রত্যেক বৎসর পঞ্চম দোল উৎসবে একশত বাহান্ন ভোগ প্রদান করিয়া সকলে মিলিয়া সেই প্রসাদ গ্রহণ করা হয়। আজ পর্য্যন্ত উক্ত মহামহোৎসব সানোয়ার বিখ্যাত কবীন্দ্র বংশধরগণ কর্ত্তৃক মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ইঁহারা কায়স্থ কুলোদ্ভূত গোস্বামী হইলেও শ্রীল বিষ্ণুদাস কবীন্দ্র ঠাকুরের সময় হইতে বহু লোককে দীক্ষা দান করিয়া আসিতেছেন। আজকালও এই বংশের প্রায় পঞ্চাশ হাজার শিষ্য আছেন। বিষ্ণুদাস আনুমানিক ১৪৭২ শকের মাঘী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে দেহ রক্ষা করেন। ইহাঁর তিরোভাবের পর ইহাঁর বংশধরগণ তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, উক্ত শ্রীমূর্ত্তির সেবা এখন সানোয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মূর্ত্তিটী সুবর্ণ-নির্ম্মিত। কবীন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত প্রবাদ প্রচলিত আছে—

তাঁহার দেহরক্ষার পর তাঁহার পত্নী রত্নাবতী স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন যে বৃন্দাবনে গোবিন্দবাগে তাঁহার সমাধির মধ্যে তাঁহার সুবর্ণময় মূর্ত্তি আছে, পুত্র রাধাবল্লভকে পাঠাইয়া সেই সমাধি হইতে উক্ত মূর্ত্তি উত্তোলন পূর্ব্বক সানোয়ায় লইয়া গিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তির পার্শ্বে যেন স্থাপন করা হয়। তদনুসারে এই মূর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবন হইতে আনিয়া সানয়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কথিত আছে যে ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে এই বংশের পূর্ণচন্দ্র মহান্ত নামক কবীন্দ্র ঠাকুরের জনৈক ভক্তের বিদেশে মৃত্যু হওয়ায় ঐ মূর্ত্তির অঙ্গ হইতে অনবরত ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে; তৎপরে ঐ মৃত দেহ বিদেশ হইতে নৌকাযোগে বাড়ীতে আনা হইলে মূর্ত্তি-গাত্র হইতে ঘর্ম্ম পড়া বন্ধ হয়।

এই বংশের আউলিয়া আশানন্দ ঠাকুর অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। ইনিও বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া সাধারণকে সোণার পৈতা দেখাইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ইনি কাঁচা মানকচু চিবাইয়া খাইতেন এবং এক সময়ে মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট বিষ ভক্ষণ করিয়া নিজের অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। এই বংশের শীতলচাঁদ, নবীনচাঁদ ও নিমাইচাঁদ মহান্ত সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। ইহাঁরা যাহাকে যাহা বলিতেন তাহাই ফলিত।

"কেহ কেহ বিষ্ণুদাস কবীন্দ্র-পরিবারকে সম্প্রদায়-বর্জ্জিত বলিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে ইহাঁদের কোন দোষ দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-সঙ্গীত, ভক্তিরত্নাকর, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা, ভোগমালা, সিদ্ধান্ত-মঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীল বিষ্ণুদাস কবীন্দ্র ঠাকুরকে ৬৪ মহান্ত মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। কবীন্দ্র পরিবার সম্প্রদায়-বর্জ্জিত নহেন; সম্প্রদায়-বর্জ্জিত "কবীন্দ্র" নামে পরিচিত একটী উপসম্প্রদায় আছে বলিয়া শুনা যায়; তাঁহাদের সহিত এপরিবারের কোন সংস্রব নাই।"

বীরভূমি ৯—৬, আশ্বিন, ১৩৩৫

মহাশক্তির আরাধনা

১। ভাব ও বস্তু

মননশক্তি বা চিন্তাশক্তি আছে বলিয়াই মানুষ মানুষ। মননশক্তি না থাকিলেই মানুষ পশু। মননশক্তির অনুশীলনই মানুষের ধর্ম্ম। "মননেন হি জীবতি"। এই মনন বা চিন্তা যেমন আরম্ভ হওয়া অমনি মানুষের মনের সমক্ষে দুইটি পথ খুলিয়া গিয়াছে। এই যে দুইটি পথ, ইহাদের নাম ভাবের পথ আর বস্তুর পথ। ভাব আর বস্তু, দুইদিকে এই দুইটি জিনিস, আর, মানুষের মন,—এই দুইয়ের মধ্যে ঘড়ির দোলকযন্ত্রের ন্যায় দোলায়িত। প্রাচীনেরা ভাবকে বলিয়াছেন সৎ, আর বস্তুকে বলিয়াছেন অসৎ; ভাবকে বলিয়াছেন চিৎ, বস্তুকে বলিয়াছেন অচিৎ বা জড়; ভাবকে বলিয়াছেন জ্ঞাতা, আর বস্তুকে বলিয়াছেন জ্ঞেয়; আবার কখন ভাবকে বলিয়াছেন চৈতন্য, বস্তুকে বলিয়াছেন মায়া। এই সব মত যাঁহারা প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা 'ভাবসত্যবাদী'।

'বস্তুসত্যবাদ' বলিয়াও একটা মত আছে। এই মতের আচার্য্যগণ ভাবকে বা চৈতন্যকে প্রাধান্য দিতে অনিচ্ছুক, এই জন্য তাঁহাদিগকে জড়বাদীও বলে। তাঁহারা বলেন, ভাব বা চিন্তা একটা গৌণ পদার্থ, একটা 'জন্য' সামগ্রী। বস্তুর ধর্ম্ম,—গতি, মিশ্রণ ও পরিবর্ত্তন; বস্তুর এই গতি, মিশ্রণ ও পরিবর্ত্তন হইতেই ভাবের উদ্ভব ও পুষ্টি। ভাবের নিজের কোনরূপ স্বতন্ত্রতা নাই। যাহারা ভাবকে 'স্ব-তন্ত্র' বা 'নিরপেক্ষ' মনে করে, তাহারা কল্পনাকেই সত্য মনে করে। ইহাই 'বস্তু-সত্য-বাদ'।

চরম পন্থী "বস্তু-সত্য-বাদী" যেমন ভাবের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করেন, চরমপন্থী 'ভাব-সত্য-বাদী" ঠিক্ সেইরূপ বস্তুর স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করেন,—বস্তুর সত্তাই অস্বীকার করেন। চিন্তাজগতে এই দুই চরমপথ। মানুষের মন কিন্তু চরমপন্থায় বিচরণ করিতে

চাহে না। কাজেই এই দুই মতের নানাপ্রকারের সন্ধি, রফা বা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। দর্শনশাস্ত্রের পাঠকগণ তাহা জানেন। সামঞ্জস্য যখন হইল, তখন উভয়পক্ষই স্বীকার করিলেন ভাব ছাড়া বস্তু নাই, বস্তু ছাড়া ভাব নাই; জড় ছাড়া চেতন নাই, চেতন-ছাড়া জড় নাই; ইহারা চির-সাপেক্ষ, চির অবিচ্ছেদ্য; ইহাদের পৃথক্ করিয়া দেখাই একটা ফাঁকা কল্পনা। বিরোধ মিটিয়া গেল সত্য, কিন্তু বিরোধের স্মৃতি থাকিল। উভয়-পক্ষই বলিতেছেন চৈতন্য ছাড়া মায়া নাই, মায়া ছাড়া চৈতন্য নাই; কিন্তু একপক্ষ বলিলেন 'চৈতন্যোপহিতা মায়া' আর একপক্ষ বলিলেন 'মায়োপহিত চৈতন্য'। *

২। পুরুষ ও প্রকৃতি

আমাদের দেশে অতীব প্রাচীনকাল হইতেই পুরুষ আর প্রকৃতি, এই দুইটি কথা বা তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে। ভাব আর বস্তুর কথা, যাহা বলা হইল, তাহার সহিত এই পুরুষ-প্রকৃতির যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, এই ভাব ও বস্তু হইতেই যে পুরুষ-প্রকৃতির চিন্তা বা ধারণা উদ্ভূত, তাহাতে সন্দেহ করার কোনই সঙ্গত কারণ নাই। যাঁহারা 'ভাবসত্যবাদী' তাঁহারা পুরুষের উপাসক, আর যাঁহারা 'বস্তুসত্যবাদী' তাঁহারা প্রকৃতির উপাসক। পুরুষ-উপাসকদিগের আদিম-মন্ত্র ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত, আর প্রকৃতি উপাসকদিগের আদিম মন্ত্র, ঐ বেদেরই দেবীসূক্ত। ঋগ্বেদই পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনশাস্ত্র। পুরুষের উপাসনা ও প্রকৃতি-উপাসনার মধ্যে বিরোধ ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহার নিস্পত্তি হইয়াছে। নিস্পত্তির প্রমাণ,—আমরা প্রায় সকলেই যুগলের উপাসক—হরগৌরী, লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ।

পুরুষ ও প্রকৃতির তত্ত্ব ভাল করিয়া ভাবা দরকার। যাহারা ভাবে না ও বোঝে না, কেবল কথা লইয়া আর বাহিরের স্থূল লইয়া দলের সিপাই হইয়া কলহ করে, তাহারা

* শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান নবদ্বীপ। প্রাচীনতম গ্রন্থে 'মায়াপুর' এর নাম নাই। শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাসী হইলে তাঁহার নাম হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,—সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য। পরবর্ত্তী চরিতাখ্যায়কেরা বলিলেন নবদ্বীপের যে দ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম হয়, সে-দ্বীপের নাম অন্তর্দ্বীপ, আর ঐ দ্বীপের বা ক্ষুদ্রগ্রামের যে পল্লীতে জন্ম হয় তাহার নাম 'মায়াপুর'। মায়া কি চৈতন্যোপহিতা হইলেন, না চৈতন্য মায়োপহিত হইলেন! ভাবিবার কথা !!

বড়ই করুণার পাত্র। তাহাদিগকে যদি অল্প একটু ভাবাইতে পারা যায় তাহা হইলে শান্তি ও মিলনকামী জগতের বড়ই উপকার হয়।

প্রথম দেখা যাউক, ভাব আর বস্তু, এই যে দুইটি জিনিস, ইহারা কি? ইহারা কি প্রকারে মানুষের মনন-ক্রিয়া জাগাইয়া দেয়। আমাদের মনে হয় এবং আমরা দেখিতেছি বলিয়াই মনে হয়, আমাদের বাহিরে অগণ্য অসংখ্য বস্তু রহিয়াছে, আর সেই সব বস্তুর মধ্যে নানাপ্রকারের ব্যাপার অবিরাম গতিতে চলিতেছে। সূর্য্য আছে—প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা ও রাত্রি আছে; শীত গ্রীষ্ম বর্ষা আছে। চন্দ্র আছে—অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অন্যান্য তিথি আছে, চন্দ্রের ক্ষয় বৃদ্ধি আছে। আবার নক্ষত্র আছে, মেঘ আছে, চন্দ্র-সূর্য্যে গ্রহণ আছে, মেঘে বিদ্যুৎ আছে, বজ্র আছে। মাঝে মাঝে ধূমকেতু আছে, গ্রহগণের স্থান-পরিবর্ত্তন আছে। এক আকাশেরই ব্যাপার কত! এই আকাশ পিতা, মাথার উপর আছেন, ইহার কত লীলা, নিতাই নব নব লীলা। তাহার পর পৃথিবী, ভূমি, অদিতি, ইনি মাতা। তরু, লতা, ফুল, ফল, পাহাড়, নদী, মরুভূমি, প্রস্রবণ, জীবজন্তু কত,—সীমা নাই, সংখ্যা নাই। আবার জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্য আছে,—সুখদুঃখ ও রোগশোক আছে। এই যে সুখ দুঃখ, ইহারা কিন্তু ভাব, বস্তুর দ্বারা নিয়মিত হইলেও ইহারা বস্তু নহে ভাব, উহা মনের ধর্ম্ম। এই মনের ভিতর একটা খুব বড় জিনিস আছে, তাহার নাম স্বপ্ন। এই স্বপ্নে আসিয়াই মানুষের মন এক অভিনব জগতে প্রবেশ করিল। স্বপ্ন কি? প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত এই স্বপ্ন-সম্বন্ধে মানুষ কতই না ভাবিয়াছে, কত কথাই না বলিয়াছে! কিন্তু, শেষকথা কেহই জানে না। মরণের চিন্তা, সকলের অপেক্ষা বড় চিন্তা। মানুষের মন এই মরণের চিন্তাকে কিছুতেই এড়াইতে পারে না। স্বপ্নের অনুভব, আর স্মৃতি, এই দুইয়ের সাহায্যে মরণের চিন্তা মানুষের মনকে ভাবরাজ্যে ঠেলিয়া লইয়া চলিল, এক নিত্য ও পরমার্থের আশায় আকুল করিয়া তুলিল। যে মরিয়া যায়, সে একেবারে চলিয়া যায় না, ফুরাইয়াও যায় না, স্বপ্নে তাহার সহিত দেখা হয়। এই সব চিন্তা নিতান্তই স্বাভাবিক। এই সব চিন্তার সোপানশ্রেণী বাহিয়া মানুষ অন্তর্জগতে বা ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিতেছে।

এই প্রকারে দুইটি জগৎ, বাহিরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জগৎ আর ভিতরের অতীন্দ্রিয়

সূক্ষ্মজগৎ,—মানুষের মননক্রিয়ার বিষয়ীভূত হইল। কিন্তু, তাহারা চিরদিন পৃথক্ হইয়া, পরস্পর বিরোধী হইয়া থাকিল না। মানুষ দেখিল তাহাদের মধ্যে একটা মেলামেশা চলিতেছে, বস্তু চলিতেছে ভাবে, আর ভাব আসিতেছে বস্তুতে। এই ভাব ও বস্তুর মধ্যে বিরোধ আছে, বৈষম্য আছে, কিন্তু এই বিরোধ ও বৈষম্য মিলনের জন্যই আছে। এই ভাব আর বস্তুই পুরুষ ও প্রকৃতি। সর্ব্বত্রই এই দুইয়ের খেলা, বিরোধ করিয়া পুনরায় মিলন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। পুরুষ অসঙ্গ, প্রকৃতি প্রধান হইলেও অব্যক্ত। একজন অসঙ্গ, আর একজন অব্যক্ত, সুতরাং কেহই কিছু নহেন। পুরুষের সন্নিধানবশে অব্যক্ত ব্যক্ত হইলেন, প্রকৃতি বা উপাদান-কারণ হইয়া নিত্যই নব নব কার্য্য-সৃষ্টির অধিকারিণী হইলেন; আর পুরুষ, প্রকৃতিতে ও তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে নিজের প্রতিবিম্ব নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইবার পুরুষ হইলেন ভোক্তা, আর প্রকৃতি ক্ষুভিতা হইয়া বহুরূপা হইয়া পুরুষের ভোগবিধান করিতে লাগিলেন। প্রকৃতি পুরুষের এই মিলনের নামই লীলা, ইহাই প্রকট বিশ্ব। বাহিরে দাঁড়াইয়া নির্লিপ্ত হইয়া দেখিবেন, তবেই লীলাদর্শন হইবে, নতুবা বাঁধনে জড়াইয়া হাবুডুবু খাইবেন।

এখন প্রশ্ন উঠিল, কে কাহাকে নাচায়? প্রকৃতি নাচান্ পুরুষকে, না পুরুষ নাচান্ প্রকৃতিকে? শুকসারীর দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল। শুক বলেন পুরুষ বড়, আমার কৃষ্ণ বড়; সারী তাহা মানিবে না, সারী বলে আমার রাধাই বড়। এই দ্বন্দ্বেরও শেষ হইল। লীলাবাদী দেখিলেন পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই অনাদি (Co-eternal and Co-existent) বেশ কথা, আর গোল নাই।

৩। মায়া

'মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্ধি' মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। যাহা কিছু হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, সবই মায়ার খেলা। অতএব মায়ার কথা আর একটু ভাবা যাউক। 'মায়া' এই কথাটি আমাদের শাস্ত্রে নানাস্থানে নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির নাম মায়া। যাহা হইবার নহে তাহাও হয়। কি করিয়া হইল, কেন হইল, তাহা বুঝি না, কিন্তু একটা কিছু হইল। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিলাম, ইহার কারণ মায়া। এ বড় মজার কথা। 'অজ্ঞেয়' বলিয়া একটা জিনিস রহিয়াছে—অনেক 'অজ্ঞেয়'

জ্ঞাত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেজন্য অজ্ঞেয়ের রাজ্য কমে নাই, বরং যেন বাড়িয়াই চলিতেছে, সুতরাং মায়ার দোহাই না দিয়া মানুষের আর অন্য কোন উপায় নাই।

'মায়া' বলিতে "বিষয়-বিসদৃশ-প্রতীতি-সাধনী শক্তি" বুঝায়। একটা বিষয় বা বস্তুকে, আর একটা কিছু বলিয়া,—তাহা যাহা নহে তাহাকে তাহা বলিয়া, আমার মনে হইতেছে। যে-শক্তির দ্বারা এইরূপ মনে হয় তাহার নাম মায়া। এই মায়া পরমেশ্বরের শক্তি। পরমেশ্বর বা মহেশ্বর মায়ী বা মায়ার অধীশ্বর, ইহাও বেদের বা উপনিষদের কথা। একটা রাজ্য রহিয়াছে, এই রাজ্য চির-অজ্ঞেয়ের রাজ্য; মানুষের জ্ঞানের আলোক, মানুষের শক্তির প্রভাব, এই রাজ্য ভেদ করিতে একেবারেই অক্ষম। এই রাজ্যের পুরোদেশে আসিলে মানুষের উন্নত মস্তক ভয়ে বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে আপনিই নত হইয়া লুটাইয়া পড়ে, সেখানে শুধুই পূজা ও স্তুতিগান, বন্দনা ও আত্মনিবেদন। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে মায়াকে "সংদ্রষ্টুঃ শক্তি সদসদাত্মিকা" বলা হইয়াছে। ইহা নারদের কথা। এখানে মায়াকে অসৎ বলা হয় নাই, মায়াতে সৎ ও অসৎ উভয়ই আছে। সুতরাং ইহা বিরোধভঞ্জনের কথা। মায়া সৎ ও অসৎ, উভয়াত্মিকা। মায়াকে জানিলে সৎ ও অসৎ, এতদুভয়ের মিলন ও সম্বন্ধ অর্থাৎ লীলা বুঝা যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে এই মায়া সংদ্রষ্টা পরমেশ্বরের শক্তি—,সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ'। "তন্মায়া ফলরূপেণ দ্বিধা সমভবৎ"

আনন্দচিদ্ঘনস্বামী প্রভুঃ প্রকৃতিরূপধৃক্।

প্রকৃতিকে বা শক্তিকে যেন শক্তিমান্ বা পুরুষ হইতে পৃথক্ মনে না করি। যিনি আনন্দচিদ্ঘনস্বামী প্রভু, তিনিই প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা শৈবাগমের কথা।

নারদীয় পুরাণে আছে—

যথা হরির্জগদ্ব্যাপী তস্যশক্তিস্তথানঘ।
দাহশক্তি যথাঙ্গারে স্বাশ্রয়ং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি॥

অঙ্গারে দাহশক্তি আছে, কখন ব্যক্ত কখন অব্যক্ত। সমগ্র অঙ্গারকে ব্যাপ্ত করিয়াই এই দাহশক্তি আছে। হরি যেমন জগদ্ব্যাপী তাঁহার শক্তিও ঠিক্ তদ্রূপ (co-eternal, co-existent)।

মায়ার আরও অর্থ আছে। আমাদের সাধনশাস্ত্র বুঝিতে হইলে এই সব অর্থ

জানা আবশ্যক। 'মাতি ঈশ্বরমপি বশীকরোতি ইতি মায়া'। ঈশ্বরকেও যিনি বশীভূত করেন, তিনিই মায়া। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, গোপিকার প্রেমের ঋণে গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ চির-ঋণী। "গোপীস্তু প্রকৃতিং বিদ্ধি"—গোপী বলিতে প্রকৃতিকেই বুঝায় বা প্রকৃতির অবস্থাবিশেষ বা প্রকাশবিশেষ বুঝায়। 'মীয়তে জ্ঞায়তে পরমেশ্বরোঽনয়া" যে-শক্তির দ্বারা পরমেশ্বরকে জানা যায়, তাহাই মায়া। গোপীর বা শ্রীরাধার কৃপাতেই শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায়। মায়ার কার্য্য, সৃষ্টি স্থিতি ও লয়। এই গুলি পরমেশ্বরের তটস্থ লক্ষণ। তটস্থ লক্ষণের দ্বারাই শ্রীভগবানের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়, স্বরূপ লক্ষণ অনেক দূরের বা অনেক পরের কথা।

আগমে আছে—

অব্যক্তং ন চ ব্যক্তং স্যাৎ প্রকৃত্যা জ্ঞায়তে ধ্রুবম্।
তস্মাৎ প্রকৃতিযোগেন জ্ঞায়তে নান্যথা কচিৎ॥
বিনা ঘটত্ব-যোগেন প্রত্যক্ষো নান্যথা ঘটঃ॥

প্রকৃতির দ্বারাই অব্যক্ত ব্যক্ত হইয়াছেন। ঘটত্বের যোগ ব্যতীত যেমন ঘটের জ্ঞান হয় না, সেইরূপ।

৪। শাক্ত ও বৈষ্ণব

আমাদের দেশে দুইটি বড় বড় সম্প্রদায় রহিয়াছে, শাক্ত ও বৈষ্ণব। এই দুইটি পথ বা দুইটি মত সত্য সত্য দুইটি পৃথক্ পথ নহে। দুইটি পথ যে এক, তাহা অল্পায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। বৈষ্ণব তাঁহার অভীষ্ট পরমদেবতাকে বলেন, "বিষ্ণু" আর শাক্ত তাঁহার অভীষ্ট পরমদেবতাকে বলেন "ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিঃ" তুমি মা বৈষ্ণবী শক্তি। তত্ত্ববিৎ বলেন, শক্তি ও শক্তিমানে কোনই ভেদ নাই, তাঁহারা 'একাত্মানৌ'; শক্তি ও শক্তিমান্ এক আত্মা অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবেই এক। মহামায়ার পূজা আসিতেছে, আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া সমস্বরে বলি—

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেত-
ত্ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

পালনশক্তি, সম্মোহিনীশক্তি ও মুক্তিদাতৃত্বশক্তি, এই ত্রিবিধশক্তিই তোমাতে আছে। তুমি বিষ্ণু-সম্বন্ধিনী শক্তি, অনন্তবীর্য্যা অর্থাৎ দুরত্যয়া বা অপারা। গীতাতেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া"। তুমিই বিশ্বের বীজ অর্থাৎ সমবায়ি কারণ। "প্রকৃতির্যস্তোপাদানম্"। নারদীয় পুরাণে বলা হইয়াছে, "ভাবাভাবস্বরূপা" অর্থাৎ কার্য্যকারণরূপা। তুমি পরমা—"পরমং ঈশ্বরং মাতি কর্ত্তৃভোক্তৃভাবেন বশয়তি" ঈশ্বরকেও কর্ত্তা ও ভোক্তা করিয়া বশীভূত করিয়াছে। কারণ—"স ঈশো যদ্বশে মায়া স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ"। জীবেও মায়া আছেন, ঈশ্বরেও মায়া আছেন। প্রভেদ, ঈশ্বরের মায়া ঈশ্বরের অধীন আর জীব, মায়ার শাসনাধীন। তুমি মা মায়া, তোমার দ্বারা সমুদয় জগৎ সম্মোহিত হইয়া রহিয়াছে, আবার তুমি প্রসন্না হইলে মুক্তিলাভ হয়, তোমার প্রসন্নতাই মুক্তির হেতু। *

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

তুমি শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ (শৃঙ্গময় মুষ্টিযুক্ত খড়্গ) প্রভৃতি আয়ুধধারিণী, বৈষ্ণবী শক্তিরূপিণী নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম করি।

---

* মূলে 'ভুবি' অর্থাৎ এই 'ভূলোকে' এই কথাটি আছে। প্রাচীন টীকাকার গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই কথাটির ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছেন, উপাসক বা সাধক মাত্রেরই তাহা মনে রাখা প্রয়োজন। "তীর্থাদিদেশবিশেষাগ্রহ পরিহারায়োক্তম্। ত্বয়ি প্রসন্নায়াং যত্র কুত্রাপি স্থিতস্য মুক্তির্ভবতি। তদুক্তং, বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্ত ইতি।" আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের একটা ভয়ানক দুর্ব্বলতা বা অজ্ঞানতা আছে। তাহারা মনে করে, আর ব্যবসায়ী যাজকতন্ত্র নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য তাহাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দেয় যে মুক্তিলাভ করিতে হইলে তীর্থে বা স্থানবিশেষে যাইতে হইবে। প্রকৃত কথা, ইহা সত্য নহে। মা জগদম্বাকে জানিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করাই প্রয়োজন। মহামায়ার ইচ্ছা কি, মানুষ তাহা বুঝিতে পারে। মায়ের ইচ্ছা বুঝিয়া সেই ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া সেই ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করাই মায়ের প্রসন্নতা-লাভ। এই প্রসন্নতা যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনিই 'বিদ্যাময়'। এই প্রসন্নতা যিনি লাভ করিতে পারেন নাই, যিনি মাকে জানেন না, মাকেও ভাবেন না, মাকে খোঁজেন না, যিনি কেবল এই 'আমি'টাকে লইয়াই আছেন, তিনি 'অবিদ্যাময়'। যিনি 'বিদ্যাময়' তিনি মুক্ত, আর যিনি 'অবিদ্যাময়' তিনি বদ্ধ। আর এই মহামায়াই বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয় মূর্ত্তি ধরিয়া লীলা করিতেছেন। তিনি যখন বিদ্যারূপিণী, তখনই তিনি যোগমায়া।

আরও ভাল করিয়া চিন্তা করুন। ভগবান্ বিষ্ণু বা নারায়ণ বা কৃষ্ণ, বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন।

বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ক-কলেব নিমগ্না।
কেশবধৃত-শূকররূপ, জয় জগদীশ হরে। জয়দেব।

হে কেশব, হে বরাহরূপধারিণ্, সর্ব্বলোকধাত্রী এই ধরণী তোমার শুভ্রদন্তের অগ্রভাগে চন্দ্রমণ্ডলের কলঙ্করেখার ন্যায় লগ্ন হইয়া অবস্থিত। হে জগদীশ, হে হরে, তুমি জয়-যুক্ত হও।

আবার চণ্ডী বলিতেছেন—

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥ চণ্ডী।

উগ্র ও ভীষণ চক্র ধারণ করিয়াছ, দন্তের দ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছ, নারায়ণি, কল্যাণি, মা তুমি বরাহরূপিণী, তোমায় প্রণাম করি। *

বিষ্ণু, নারায়ণ বা কৃষ্ণ আসিলেন, নৃসিংহরূপে।

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গম্
দলিত-হিরণ্যকশিপু-তনু-ভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে॥

হে কেশব, হে নরসিংহরূপধারিণ্, তোমার শ্রেষ্ঠ করকমলে (কেশরের ন্যায়) অদ্ভুতশৃঙ্গ বা অগ্রভাগযুক্ত নখর হিরণ্যকশিপুর দেহরূপ ভৃঙ্গকে বিদলিত করিয়াছে; হে জগদীশ, হে হরে তুমি জয়যুক্ত হও।

---

* সিদ্ধ কবি জয়দেবের দশাবতার-স্তোত্র ও শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয়-চণ্ডী হইতে যে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল, এই দুইটি শ্লোকের মর্ম্মাবধারণ করিয়া আপনারা কি মনে করেন? আপনারা অর্থাৎ শাক্ত ও বৈষ্ণবেরা, যাঁহারা এখনও বিরোধ করিতেছেন ও ভাবিতেছেন আমাদের ভগবান্ পৃথক্, শাস্ত্র পৃথক্, পরমার্থ পৃথক্ কাজেই আচারও পৃথক্। আপনারা, যাঁহারা কেবল গণ্ডী বাঁধিতেছেন, আপনারা কি বলেন? আপনারা কি বলিবেন, বৈষ্ণবের ঠাকুর বরাহ হইলেন দেখিয়া শাক্তেরা কাঁদিতে লাগিল, বলিতে লাগিল মা বৈষ্ণবেরা জিতিয়া গেল! তখন মা কি করেন? ভক্ত সন্তানদের খুসি করার জন্য বারাহীরূপে আসিলেন?

চণ্ডী বলিতেছেন,—

নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥

মা, তুমি অতি ভয়ঙ্কর নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৈত্যকুলকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, তুমি ত্রৈলক্যত্রাণকারিণী নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।

এই নারায়ণীর বন্দনা আজ প্রয়োজন। নারায়ণ ও নারায়ণী একই তত্ত্ব, বরাহ ও বারাহী একই তত্ত্ব, একই বস্তু, নৃসিংহ ও নারসিংহীও ঠিক্ তাহাই। একজন পুরুষের ভূমি হইতে দেখিয়াছেন, একজন প্রকৃতির দিক্ হইতে দেখিয়াছেন। কিন্তু, বস্তু এক, তত্ত্ব এক, সাধনও এক। এই ঐক্যজ্ঞান প্রথম প্রয়োজন। ঐক্যের ভূমিতে চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, যাবতীয় প্রভেদ ও পার্থক্যকে ঐ ঐক্যের আলোকে বুঝিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা আমাদের সনাতনধর্ম্মের মহিমা ও বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারিব।

৫। শারদীয়া পূজা

শরৎ ঋতু আসিয়াছে। বর্ষার অবসানে শরৎ আসিয়াছে। শরতের প্রভাতের হরিদ্রাভ রবিকরে, শরতের শিশিরসিক্ত বিকশিত শেফালি কুসুমে কত অতীতের ও সুদূরের সুখস্মৃতি সুপ্ত হৃদয়ে নবীন বেশে জাগিয়া ও ভাসিয়া উঠিতেছে। ভারতবাসী বেদপন্থীসমাজের প্রত্যেক নরনারীর প্রাণ মন নাচিয়া উঠিতেছে। 'মা আসিতেছেন, মা আসিতেছেন'—সকলেই প্রস্তুত হইতেছে, প্রতীক্ষা করিতেছে। 'মা আসিতেছেন'। আগমনীর গানের সুর বাঙ্গালার বাতাসে ভাসিয়া উঠিয়াছে। এ এক মধুর স্বপ্ন। মেনকার মাতৃহৃদয়ে জাগিয়া এই স্বপ্ন হৃদয়ে হৃদয়ে সংক্রামিত ও সঞ্চারিত হইতেছে। নন্দন বা নন্দিনী,—আমাদের এই মর্ত্ত্যবাসী নরনারীর আনন্দাংশ। আমাদের সেই আনন্দ, সেই নন্দিনী,—ছিলেন, আমাদেরই গৃহাঙ্গন আলোকিত করিয়া তাঁহার মধুর মধুর রুনুর ঝুনুর চরণ-নূপুর-ধ্বনিতে আমাদের সুপ্ত হৃদয়ে দিব্যজাগরণ ছড়াইয়া দিয়া, তাঁহার উচ্ছল হাসির জ্যোৎস্নায় আমাদিগকে মত্ত ও বিহ্বল করিয়া,—তিনি ছিলেন, আমাদের আপনার হইয়া ছিলেন। আমাদের নয়নে তখন ছিল কেবল তাঁহারই রূপ, সেই

নন্দিনীর রূপ, অতুল ও অনুপ। নাসিকায় ছিল শুধু গন্ধ, সেই নন্দিনীর চিদানন্দময় অপূর্ব্ব মনোহর গন্ধ। রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে শব্দে, আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় পূর্ণ করিয়া, কৌতুকে নৃত্যে হাস্যে আমাদের প্রাণ মন ও হৃদয় সফল করিয়া,—তিনি ছিলেন। তাঁহাকে লইয়া আমরা পূর্ণ হইয়াছিলাম, ধন্য হইয়াছিলাম; জানি না সে কবেকার কথা, কোন্ সত্যযুগেরও পূর্ব্বের কথা. সে বুঝি কালেরও জন্ম হওয়ার আগের কথা। কবেকার কথা জানি না, সত্য কি স্বপ্ন, তাহাও জানি না; কিন্তু জানি তিনি—ছিলেন, কন্যারূপে ছিলেন, তিনি মাতৃরূপে ছিলেন; একাধারে কন্যা ও মাতৃরূপে ছিলেন, আমার জীবনের সর্ব্ব-স্বরূপেই ছিলেন। সে যেন এক নিদ্রা, সুগভীর নিদ্রা, সে যেন এক সমাধির রসাবেশ। তাহার পর হঠাৎ জাগিলাম, নয়ন খুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সে নাই,—আমার প্রাণের নন্দিনী নাই। কোথা কোন্ সুদূরের কৈলাসের গোপনের দেবতা আসিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া গিয়াছে,—আমার সেই প্রাণের নন্দিনীকে। আমিই তো দিয়াছি, জামাতা বলিয়া পূজা করিয়া আমিই তো আমার প্রাণের নন্দিনীকে দান করিয়াছি। সে চলিয়া গিয়াছে। স্মৃতিটুকু অন্তরে রাখিয়া, সারা বরষ ধরিয়া বসিয়া আছি। হেমন্ত ও শীত গেল, তবু সে আসিল না। বসন্তের ফোটাফুলে মলয় বাতাসে কোকিলের কুহুরোলে ভ্রমরগুঞ্জনে প্রাণে কতই না আশা জাগিল, ভাবিলাম এইবার সে আসিবে—আমার প্রাণের নন্দিনী আসিবে! কুঞ্জে কুঞ্জে ফুল ফুটিল, কত বিচিত্র বর্ণের; কত পাখী সারাদিন তরুশাখায় বসিয়া কত নব নব রাগ রাগিনী আলাপ করিল, ভাবিলাম সে আসিবে। সে যে না আসিলে,—বিফল হইবে ফোটা ফুল; কে তুলিবে, কে গাথিবে মালা, কে পরিবে গলে? কত বুকভরা আশা লইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন গণিলাম। প্রভাতে ভাবিলাম সন্ধ্যায় আসিবে, সন্ধ্যায় ভাবিলাম নিশীথে,-তবু সে আসিল না। বসন্ত আমার বিফল হইয়া গেল। বিফল হইল চন্দ্রালোক, আমার বিফল হইল ফোটা-ফুল, আমার সোহাগের নিধি উমা,—আমার প্রাণের নন্দিনী আসিল না। কোকিল ভ্রমর গেল চলিয়া, কুসুম পড়িল ঝরিয়া, মলয় হইল দাহময়, সূর্য্য হইলেন ক্ষিপ্ত, নিদাঘের তপ্তবায়ু শুষ্ক ধূলি উড়াইয়া হাহারোলে উন্মাদের প্রায় দিগ্‌দিগন্তে ছুটিল, তবু সে আসিল না। তবে আর আসিবে না সে, গিয়াছে চিরদিনের তরে গিয়াছে,—আমিই তো তাহাকে দিয়াছি, দত্ত ধনে স্বত্ব নাই, চিরকালের জন্য সে চলিয়া গিয়াছে। বর্ষায় নিরাশার আঁধারে

প্রাণ ভরিয়া গেল ; বেদনার বজ্রধ্বনি, কি নির্ম্মম, কি কঠোর ! মেঘে মেঘে একেবারে ছেয়ে গেছে নীলাকাশ, নিভে গেছে, রবি শশি তারা—আলো নাই, হাসি নাই, পথ নাই, কেবলই কর্দ্দম। আর দৃষ্টি চলে না। শুধু বারিধারা,—আকাশে ও নয়নে। আর আসিবে না, আমার প্রাণের উমা আর আসিবে না।

বরষার নিরাশার অন্ধকার কারাগার, শরতের কোমল মৃদুল হাসির পরশে অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। শরৎ আসিলেন, নবীন আশা লইয়া আসিলেন। নির্ম্মল আকাশতল, মেঘ নাই, মোটে মেঘ নাই। নির্ম্মল সরসী জল, প্রস্ফুটিত শতদল, কুমুদ কহ্লার। মা আসিবেন, উমা আসিবেন। শরৎ আসিয়াছে। শরতের শিশিরসিক্ত শেফালি-গন্ধ-নন্দিত মৃদুল শীতল অনিলের শ্বাসে শ্বাসে কে যেন জপিতেছে, "বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজাকর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তোঽ ব্রুবন্তু"। প্রাণের ভিতর হইতে কে যেন অতীব কাতরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে—"বলুন বলুন আপনারা, ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণেরা "পুণ্যাহং, পুণ্যাহং পুণ্যাহং"। আপনারা বলুন ঋদ্ধি হউক, সিদ্ধি হউক। শরৎ আসিয়াছে, মৃতদেহে নব প্রাণের উল্লাসতরঙ্গ জাগিয়াছে। প্রাণের নন্দিনী আসিবে আমার, আমার হারানিধি আসিবে, আমার প্রাণের উমা হররমা আসিবে। উষায় স্বপ্ন দেখিয়া কাঁপিয়া কাঁদিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন গিরিজায়া মা মেনকা, শুনিতেছেন যেন উমা আসিতেছে, গৌরী আসিতেছে, সঙ্গে তাহার কত কি আসিতেছে, নিখিল বিশ্ব আসিতেছে,—গিরিরাজ, অচল পাষাণ, উঠ একবার জাগ, একবার অভ্যর্থনা কর সকলের—আমার উমা আসিতেছে, আমার গৌরী আসিতেছে! এই শারদীয় মহাপূজা, কলিযুগের মহামহোৎসব, এই মহাযজ্ঞ।

৬। বোধন

প্রাণকে উদার কর, ঐ শরতের মুক্ত সুনির্ম্মল আকাশের মতো। অতীতের কোন দাগ যেন না লাগিয়া থাকে। নূতন হও, নূতন হও। বর্ষা চলিয়া গিয়াছে, শরতে ধরিত্রীর নবজন্ম হইল, অতীতের ব্যথা, গ্লানি, দ্বন্দ্ব, দুঃখ, ক্লেশ, নিঃশেষে মুছিয়া ফেল, নূতন হও, নূতন হও। শরৎ আসিয়াছে,—চির নবীনের বার্ত্তা লইয়া, শরৎ আসিয়াছে 'তারুণ্যামৃতধারা'র স্নান করাইয়া তোমাদের চির নবীন ও চির কিশোর করিবার

জন্য। তোমরা করুণ হও, করুণ হও। শরৎ আসিয়াছে, তোমাদিগকে কারুণ্যামৃতধারায় স্নান করাইতে। তোমরা সুন্দর হও, সুন্দর হও। নবীন হইয়া করুণ হইয়া সুন্দর হও। তোমাদের লাবণ্য উচ্ছ্বসিত হউক, ছড়াইয়া পড়ুক। শরৎ আসিয়াছে, তোমাদিগকে লাবণ্যামৃতধারায় স্নান করাইতে। আজ আমার রোগ-কাতর প্রাণের ভিতর কৈশোরের খেলাঘরের আশাভরা মোহনমধুর স্বপ্নরাশি জাগিয়া উঠিল। মা আসিতেছে, উমা আসিতেছে, গৌরী আসিতেছে। প্রস্তুত হও, অভ্যর্থনা কর, বোধন কর।

বাহিরে যাঁহাকে খুঁজিতেছ, যাঁহার আগমনের জন্য কাতরে তৃষিত প্রাণে প্রতীক্ষা করিতেছ, সে যে আছে,—ভিতরেই আছে—মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীরূপে ঘুমাইয়া আছে সে, তাহাকে জাগাও, প্রবুদ্ধ কর, উদ্বুদ্ধ কর। কাহাকে জাগাইবে?—সে যে জগদম্বা জগদ্ধাত্রী, সে যে বিশ্বেশ্বরী। আজ শুভ-শরতের পুণ্যদিনে বিল্ববৃক্ষমূলে স্বস্তিবাচন করিয়া সংকল্প করিয়া বিশ্বকে জাগাইতে চাই। বিশ্ব যে আমার, আমি যে বিশ্বের, সে কথাটা ভুলিয়া গিয়াছি, তাই মরিয়াছি, বদ্ধ হইয়াছি। জাগাও নিখিল-বিশ্ব, জাগাও বিশ্বদেবতা, নিজের প্রাণের ভিতরে জাগাও। আত্ম প্রাণের সহিত বিশ্বপ্রাণের একাত্মতা সাধিত না হইলে সেই বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী আসিবেন কোথায়?

সর্ব্বদেবসমন্বিত সর্ব্বতীর্থোদ্ভব বারি, আমার এই ক্ষুদ্র ঘটে বিরাজিত,—আমাকে ক্ষুদ্র ভাবিও না। আমি আজ "মহতো মহীয়ান্"—কারণ আমার মা আসিতেছে। মা, গণসহ তোমার নিখিল বিশ্ব লইয়া আমার এই ঘটে বিরাজ কর। ঘটে আসিলেন,—হৃদয়ে আসিবেন, পীঠন্যাস কর। হৃদয়পীঠ প্রস্তুত করিয়া মহামায়ার আসন প্রস্তুত কর। সকলই আছে; যাহা প্রয়োজন, আমার মায়ের জন্য যাহা প্রয়োজন, ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপিণী হৈমবতী উমার জন্য যাহা প্রয়োজন সবই আছে, এই হৃদয়েই আছে। আধারশক্তি আছে, প্রকৃতি অনন্ত পৃথিবী, ক্ষীরসমুদ্র, শ্বেতদ্বীপ, মণিমণ্ডপ, কল্পবৃক্ষ, মণিবেদিকা, রত্নসিংহাসন সবই আছে; মানুষ তোমার হৃদয়পীঠে সবই আছে। অভাব কিছু তো নাই। কিন্তু হৃদয় যে অন্ধকার হইয়া মরিয়া রহিয়াছে। হৃদয়ের কপাট খুলিয়া ফেল, আসুক শরতের হাসির আলো,—হৃদয় মধ্যে আসুক, অবাধে বিপুলবেগে আসুক, হৃদয়ে সকলই আছে। অনন্ত আছে, পদ্ম আছে, সূর্য্যমণ্ডল, সোমমণ্ডল, বহ্নিমণ্ডল, সত্ত্ব, রজঃ,

তমঃ, আত্মা, অন্তরাত্মা, জ্ঞানাত্মা, পরমাত্মা, সবই হৃদয়ে আছে, জাগাও হৃদয় জাগাও। হৃৎপদ্মের অষ্ট কেশরে প্রভা, মায়া, জয়া, সূক্ষ্মা, বিশুদ্ধা, নন্দিনী, সুপ্রভা, বিজয়া—সকলই আছেন, আর সকলের যিনি প্রাণ, সকল যিনি সফলতা ও পূর্ণতা, সেই সর্ব্বসিদ্ধি-দায়িনী আছেন. বজ্রের ন্যায় যাহার নখ ও দংষ্ট্রা, সেই মহাসিংহের সিংহাসনে সেই সর্ব্ব-সিদ্ধিদায়িনী আছেন। তাঁহাকে জাগাও।*

পূজা কর ভিতরে। পীঠন্যাস করিয়া হৃদয়পদ্মে তাঁহাকে বসাইয়া পূজা করিতেছি। পূজার উপকরণ বাহিরে সজ্জিত, কিন্তু বাহির এখন কিছুই নহে। ভিতরের দ্বারাই বাহির সত্য হয়। ভিতরে ভাবরূপে পূজার উপকরণ সবই আছে, অন্বেষণ করিয়া বাহির কর, জগদম্বার শ্রীচরণে সমর্পণ কর। কুণ্ডলিনী-পাত্রে জল আছে, তাহাই পাদ্য, মায়ের চরণে পাদ্যদান কর, মনোরূপ অর্ঘ্য, সহস্রদল কমল হইতে অমৃত-ক্ষরণ হইতেছে, সেই অমৃতই আচমনীয়, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব গন্ধ, অহিংসা প্রভৃতি গুণ পুষ্প, প্রাণবায়ু ধূপ, তেজস্তত্ত্বদীপ, সুধারসসাগর নৈবেদ্য, আকাশ চামর, সূর্য্য দর্পণ, চন্দ্র ছত্র, অনাহতধ্বনি ঘণ্টা।

---

* পূজা করি কাঁহার ? অনাত্মের পূজা করিলে মানুষের অধঃপতন হয়। আমার ভিতরে, আমার আত্মতত্ত্বের অন্তর্ভূত হইয়া যাহা আমার ভিতরে নাই, যদি ভয় বা লোভের দ্বারা চালিত হইয়া তাহার পূজা করি, তাহা হইলে আমার অধঃপতন ও সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। শ্রীমদ্ভাগবতে ইন্দ্রযজ্ঞ রহিত করার সময় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 'অঞ্জসা যেন বর্ত্তেত তদেবাস্য হি দৈবতম্'। আমি কেমন বেতালা ও বেসুরা হইয়া গিয়াছি। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত প্রভৃতি যাহাদের আমি আমার বলিয়া মনে করি, আমি জানি না ইহারা কে, ইহারা আমার কতখানি আপনার। আমিই বা কোথায়, তাহাও আমি জানি না। এইটুকু কেবল জানি, আর বড় দুঃখে এইটুকুই সর্ব্বদা অনুভব করি, যে আমার ভিতর সামঞ্জস্য নাই, কেবল বিরোধ ও বৈষম্য। এই বৈষম্যের দ্বারা আমি পীড়িত ও অপ্রকৃতিস্থ। আমি প্রকৃতিস্থ হইতে চাই, আমি সামঞ্জস্য চাই। যাহার দ্বারা আমার ভিতরে এই সামঞ্জস্য ও শান্তি আসে, তাহাই আমার দেবতা ; অথবা যাঁহার দ্বারা আমি প্রকৃতিস্থ হইতে পারি, স্ব প্রকৃতিতে রমমাণ হইতে পারি, তিনিই আমার দেবতা। কে আমায় বুঝাইয়া দিবে, আমার জীবন-দেবতা কে ? জন্মে জন্মে অন্বেষণ চলিতেছে, জানিয়া বা না জানিয়া ; কবে আবার দেখা হবে আমার, আমার জীবনদেবতার সঙ্গে ? শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতে এই দেবতার কথাই বলিয়াছেন। এই জীবনদেবতার পূজা না করিয়া যে কোন দেবতার পূজা করিলে পাপ হইবে, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন।

হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যান্মনস্ত্বর্ঘ্যং প্রকল্পয়েৎ॥
আচামমমৃতেনৈব স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতম্।
আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং স্যাদ্‌গন্ধঃ স্যাৎ ক্ষিতিতত্ত্বকঃ॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণং প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধিঃ॥
অনাহতধ্বনির্ঘণ্টা বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্।
সহস্রারং ভবেচ্ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকম্।
নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি পূজামিত্থং প্রকল্পয়েৎ॥

মানস-পূজার এই প্রকারের আরও ব্যবস্থা আছে। প্রথমে প্রয়োজন এই মানসপূজা। মানসপূজা না হইলে বাহ্যপূজা প্রাণহীন আড়ম্বর মাত্র। মা আসিতেছেন, আমাদের প্রাণ-মন প্রস্তুত হউক, এই মানস-পূজার জন্য, তবেই মায়ের আগমন সত্য হইবে, শারদীয় মহাপূজা সফল হইবে।

হৃৎপদ্মমধ্যে তেজোময় দেবতার রূপ চিন্তা করিয়া মানসোপচারে পূজা করার পর, যিনি অন্তরতম,—অন্তরের অন্তরে অন্তর্যামীরূপে যিনি চিরবিরাজিত তাঁহাকে উত্তমরূপে উদ্বুদ্ধ করার পর, তিনি বাহিরে প্রকট হইবেন। বিশেষার্ঘ্যস্থাপনা করুন। অন্তরে যাহা দেখিয়াছেন, অন্তরে যাহার পূজা করিয়াছেন, এইবার ক্রমে ক্রমে বাহিরেও তাহা দেখুন, বাহিরে তাহাকে দেখিয়া তাহার পূজা করুন। এই প্রকারে বাহির অন্তরময় হউক, অন্তরের ও বাহিরের চিরদিনের দ্বন্দ্বের অবসান হউক, ভবের ভিতর ভাবের বিজয় প্রতিষ্ঠিত হউক। বাহিরেও বহ্নিমণ্ডল, গন্ধপুষ্পের দ্বারা তাহার পূজা করুন। বহ্নি-মণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল, সোমমণ্ডল বাহিরেও আছেন। এইবার ভিতরের সেই পরমার্থবস্তুকে দক্ষিণ নাসিকাপথে বাহিরে আনিতে হইবে। ইহারই নাম পূজা, প্রথমে ভিতরে তাহার পর বাহিরে।

রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতা পুরা॥
অহমপ্যাশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং বোধয়ামি সুরেশ্বরীম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষায় বরদা ভব শোভনে॥

পূজাং গৃহাণ সুমুখি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে।
শক্রেণাপি চ সম্বোধ্য প্রাপ্তং রাজ্যং সুরালয়ে॥
তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি বিভূতিরাজ্যপ্রতিপত্তি-হেতোঃ।
যথৈব রামেণ হতো দশাস্যস্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি॥
দুর্গে দেবী সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়।
যজ্ঞভাগান্ গৃহাণ ত্বমষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ॥
দুর্গে দেবী জগন্মাতর্জ্জগদ্বন্দিতবরপ্রদে।
শারদীয়োৎসবার্থং ত্বাং বোধয়ামি সুরেশ্বরি॥
দেবি চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি চণ্ডবিগ্রহকারিণি।
বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ দেবি যথাসুখম্॥

কোন্ সুদূর অতীতের কথা। এখনও তাহার স্মৃতি রহিয়াছে। রাম রাবণের যুদ্ধ। কোথায় রাক্ষসপুরে নর-নারায়ণ, অধর্ম্মের বিনাশের জন্য উপস্থিত। সেদিন বেদপতি ব্রহ্মা অকাল-বোধন করিয়াছিলেন, মহামায়ার শারদীয় পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সেই স্মৃতি এখনও রহিয়াছে। সেই স্মৃতি ততদিনই থাকিবে যতদিন অধর্ম্ম আছে, আর যতদিন আমাদিগকে এই অধর্ম্মের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। যাহারা যুদ্ধ করিবে না, রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করাকেই যাহারা ধার্ম্মিকতা বলিয়া মনে করে, সেই সব ভীরু কাপুরুষেরা মনুষ্যত্ব-বিবর্জ্জিত, তাহারা জড়, তাহারা পশু, শ্রীদুর্গার তত্ত্ব তাহারা বুঝিবে না। কিন্তু, আমাদিগকে বুঝিতে হইবে ও বুঝাইতে হইবে, এই শ্রীদুর্গা কি? তাই ব্রহ্মার অকাল-বোধন। এখনও রাবণ আছে, এখনও আছে সীতাহরণ, সুতরাং আজও প্রয়োজন শ্রীদুর্গাপূজার। তবে সত্য এবং প্রাণময় পূজা চাই, শুধু বাহ্যাড়ম্বরের আত্মবঞ্চনা আর চলিবে না। শাক্ত হও, আর বৈষ্ণব হও, ভাবুক হও আর কর্ম্মী হও, সংসার-সংগ্রামে যখন আসিয়া পড়িয়াছ, তখন "যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ" সর্ব্ববিধ অবসাদ পরিহার করিয়া যুদ্ধ কর, ক্লৈব্য পরিত্যাগ কর, এই ক্লৈব্য পরিত্যাগ করাই শ্রীদুর্গার পূজা। শক্তির প্রয়োজনই প্রথম, আগে শক্তি, তাহার পর ভক্তি। শক্তিহীন ভীরুরা ভক্তির নামে কেবল একটা কল্পনাময় দুঃস্বপ্ন দেখে, আর ক্রমে ক্রমে পশুত্বে ও জড়ত্বে অবনমিত হয়। বিভূতি চাই, রাজ্য চাই, প্রতিপত্তি চাই। কি বলিতেছ? ইহা সকাম কর্ম্ম। নিজের জন্য চাহিলেই সকাম কর্ম্ম, কিন্তু বিভূতি রাজ্য প্রতিপত্তি চাহিলে তাহা যে নিজের জন্যই

চাওয়া হইল, একথা তোমায় কে বলিল? যাহা চাই, তাহা শ্রীভগবানের জন্য চাই, তাঁহার সেবার জন্য চাই, জগতের সকলের কল্যাণ সাধনের জন্য চাই। চাওয়া যে প্রয়োজন, পাওয়াও যে প্রয়োজন। এই চাওয়া ও পাওয়ার মধ্য দিয়াই জীবনের ক্রম-বিকাশ হইতেছে, মানুষ বাড়িয়া উঠিতেছে, প্রাণে বা শক্তিতে বাড়িয়া উঠিতেছে, জ্ঞানে বাড়িয়া উঠিতেছে, প্রেমে বাড়িয়া উঠিতেছে। এই বাড়িয়া উঠাই সচ্চিদানন্দের আরাধনা, অস্ফুট সচ্চিদানন্দ জীবের ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুট হওয়া। অতএব চাও এবং লও, আর বাড়িয়া বাড়িয়া উঠ, ইহাই পথ—নিঃশ্রেয়স ও অভ্যুদয়ের পথ।

৭। শ্রীদুর্গা ও শ্রীরাধা

ধর্ম্মশীল লোক ধর্ম্মাচরণ করে কেন? ধর্ম্মজীবনের উদ্দেশ্য কি? এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে কোনরূপ মতভেদ নাই, মতভেদের কোনরূপ কারণও নাই। এ বিশ্ব-চরাচরে যাহা কিছু আছে সকলই এক মহাশক্তির খেলা। আমরা প্রত্যেকেই সেই মহাশক্তির। সেই মহাশক্তি কেমন, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী তাহা অতি উত্তমরূপেই বুঝাইয়াছেন। এই বিশ্বের সৃষ্টিই হইত না, প্রকাশই হইত না। ব্রহ্মা চেষ্টা করিয়াও পারিতেন না, কিন্তু পারিয়াছেন, চেষ্টা করিয়াই পারিয়াছেন। এই চেষ্টাই সাধনা ও তপস্যা। জ্ঞান-পূর্ব্বক কৃতকর্ম্মই তপস্যা। বিশ্বব্যবস্থার মূলতত্ত্ব জানিতে ও বুঝিতে হইবে। সেই মূল তত্ত্বই মহাশক্তি, আদ্যাশক্তি। সেই তত্ত্ব বুঝিয়া তাঁহার আনুকূল্য লাভ করিতে হইবে, ইহাই সাধনা, ইহাই তপস্যা। ব্রহ্মা তপস্যা করিয়াছিলেন। নিজের জীবনের মূল কোথায়, সেই জীবন-মূলের মূলে আবার কিছু আছে কিনা, ব্রহ্মাকে এতদূর বুঝিতে হইয়াছিল, তাই তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তাই তিনি বেদপতি।

ব্রহ্মার দিনের নাম কল্প। এই কল্পের অন্তে ভগবান্—যিনি

উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিং।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥

ভূতসমূহের আগতি ও গতি, উৎপত্তি ও প্রলয়, বিদ্যা ও অবিদ্যা, যিনি জানেন তিনিই ভগবান্। সেই ভগবান্ অবশ্য প্রভু, তিনি যাহা করেন স্বেচ্ছায় করেন, বাধ্য হইয়া করেন না। শ্রীভগবানের প্রকৃতিতে যে বাধ্যতা দেখা যায়, তাহা তাঁহার নিজেরই ইচ্ছার

বাধ্যতা, অন্য কিছু সেখানে নাই, সুতরাং অন্য কোন কিছুর বাধ্যতাও সেখানে নাই। কল্পান্তে সেই প্রভু ভগবান্ যিনি বিশ্বের পালন কার্য্যে বিষ্ণু, তিনি তামসী শক্তিকে আহ্বান করেন। এই তামসী শক্তিই যোগনিদ্রা। মানুষ যেমন গায়ে কাপড় ঢাকা দিয়া নিদ্রা যায়, ভগবান্ বিষ্ণুও সেইরূপ, সাধারণ মানুষের ন্যায় মোহপরবশ হইয়া নহে, লীলায় যোগনিদ্রাকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত শয্যায় নিদ্রাগত। তখন প্রলয়ের কাল, কেবল প্রলয়সাগরের জলরাশি.' আর কিছুই নাই। ব্রহ্মার জন্ম বা জাগরণ হইয়াছে, বিষ্ণুর নাভিকমলে,—প্রলয়-সাগর-জলে তিনি ভাসিতেছেন। আর দুইজন অসুর, মধু ও কৈটভ, বিষ্ণুর কর্ণমূলে ইহাদের উৎপত্তি, ইহারা বেদবিলোপী, ইহারা দুইজনে ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত। ভগবান্ বিষ্ণুর জাগরণ আবশ্যক, নারায়ণ না জাগিলে ব্রহ্মা নিরুপায়। কেমন করিয়া জাগিবেন নারায়ণ ? তিনি যোগনিদ্রাকে লীলায় বরণ করিয়াছেন, তাঁহাকে ডাকাডাকি করা অকারণ। কাজেই ব্রহ্মা যোগনিদ্রার বন্দনা করিতেছেন। এই বন্দনায় মহাশক্তির তত্ত্ব কি তাহা জানিতে পারা যায় এই মহাশক্তিই বিশ্বেশ্বরী ও জগদ্ধাত্রী, ইনিই স্থিতি ও সংহারকারিণী।

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥

সৃষ্টিকালে সৃষ্টিরূপা, পালনে স্থিতিরূপা, অন্তে সংহাররূপা, তিনি জগন্ময়ী। তিনিই সর্ব্বস্বরূপা, বিদ্যা মেধা স্মৃতিও তিনি, আবার মোহও তিনি।

আমরা এই মহাশক্তির, কিন্তু, সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি। আবার, 'আমি তোমার' বলিয়া সেই মহাশক্তির শরণাগত হওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য, আর যে ধর্ম্মই যাজন করি না কেন, সমুদয় ধর্ম্মযাজনার ইহাই একমাত্র লক্ষ্য।

আমাদের এই ভারতের সাধকেরা এই মহাশক্তিকে দুইটি পথে দুইটি ভাবে পাইয়াছেন। এইজন্য মানবের আরাধনাই দ্বিবিধ। দেবপূজা আর ভক্তপূজা, পূজা দুই প্রকার। ঐশ্বর্য্যকামী বা পুষ্টিকামী দেবগণের উপাসনা করেন। এক এক দেবতার যথারীতি উপাসনা করিলে এক এক প্রকারের শক্তি ও ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করা যায়। মানুষ দেবপূজা করে, ঐশ্বর্য্যলাভ করে। ক্রমে ক্রমে মানুষ যখন আর দেবগণকে পৃথক্‌রূপে দেখে না, যখন দেখে সমুদয় দেব এক পরমৈশ্বর্য্যময়ী মহাদেবীর ভিন্ন ভিন্ন বিভূতিমাত্র,

তখন সেই সাধক দুর্গা বা চণ্ডিকারূপে মহাশক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করেন। শ্রীদুর্গা "নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্তি"।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর দ্বিতীয় চরিত্রে বলা হইয়াছে, দেবগণের দেহ হইতে তেজ বাহির হইল, সেই তেজ একত্র মিলিত হইলে একটি নারীমূর্ত্তি গড়িয়া উঠিল। এই নারীমূর্ত্তিই শ্রীদুর্গা, সিংহবাহিনী, মহিষাসুরনাশিনী। শিবের তেজ তাঁহার মুখ, যমের তেজ কেশ, বিষ্ণুর তেজ বাহু, চন্দ্রের তেজ স্তনযুগল, ইন্দ্রের তেজ মধ্যদেশ, বরুণের তেজ জঙ্ঘা ও উরু, পৃথিবীর তেজ নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজ চরণযুগল, সূর্য্যের তেজ চরণের অঙ্গুলি, অষ্টবসুর তেজ করের অঙ্গুলি, কুবেরের তেজ নাসিকা, প্রজাপতির তেজ দন্তসমূহ, অগ্নির তেজ ত্রিনয়ন, সন্ধ্যার তেজ ভ্রূযুগল, বায়ুর তেজ শ্রবণযুগল। তাহা হইলে এই সিংহবাহিনী শ্রীদুর্গা কে?

সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবা

মানবজাতি যুগ যুগ ধরিয়া যত দেবতার পূজা করিয়াছে, সেই সব দেবতা মিথ্যা কল্পনাও নহে, আর পরস্পরবিরোধীও নহে। এক মহাদেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে এই দেবগণকে বুঝিতে হইবে। এই দেবী সর্ব্বায়ুধধারিণী। যত দেবতার যত অস্ত্র যত দেবতার যত ভূষণ মানবজাতি দেখিয়াছে, সমুদয় অস্ত্রের ও আয়ুধের সার দিয়া দেবগণ এই মহাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন। চণ্ডীর দ্বিতীয় চরিত্রে মহাদেবীর এইরূপ বর্ণনা।

চণ্ডীর তৃতীয় চরিত্রে দেখা যায়, যুদ্ধস্থলে অসংখ্য দেবী অসুরগণকে বধ করিতেছেন।

হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে॥

অক্ষমালা ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া, হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী আসিলেন।

মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী।
মহাহিবলয়াপ্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা॥

মহাসর্পের বলয় এবং চন্দ্ররেখার দ্বারা বিভূষিতা হইয়া, ত্রিশূল হস্তে বৃষে আরোহণ করিয়া মাহেশ্বরী আসিলেন।

কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবরবাহনা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকা গুহরূপিণী॥

হস্তে শক্তি, ময়ূরে আরোহণ, গুহরূপিণী অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় আকৃতি সম্পন্না কৌমারী দেবী দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন।

তথৈব বৈষ্ণবীশক্তি র্গরুড়োপরি সংস্থিতা।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গাহস্তাভ্যুপাযযৌ ॥

শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনু ও খড়্গ হস্তে গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বৈষ্ণবী শক্তি আসিলেন।

যজ্ঞবারাহ: তুলং রূপং যা বিভ্রতো হরেঃ।
শক্তিঃ সাপ্যাযযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতো তনুম্ ॥
নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ।
প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপক্ষিপ্তনক্ষত্রসংহতিঃ ॥
বজ্রহস্তা তথৈবৈন্দ্রী গজরাজোপরিস্থিতা।
প্রাপ্তা সহস্রনয়না যথা শক্রস্তথৈব সা ॥

অতুলনীয় যজ্ঞবরাহরূপ ধারণ করিয়া বারাহী আসিলেন, কেশররাজির আঘাতে নক্ষত্র-মণ্ডল উৎক্ষিপ্ত করিতে করিতে নৃসিংহদেবের ন্যায় মূর্ত্তিধারিণী নারসিংহী আসিলেন। ঐরাবতে আরোহণ করিয়া বজ্রহস্তে ইন্দ্রশক্তি ঐন্দ্রী আসিলেন, তিনি ইন্দ্রের ন্যায় সহস্র নয়না।

অগণ্য ও অসংখ্য দেবীমূর্ত্তি যুদ্ধ করিতেছেন, অসুর বিনাশ করিতেছেন। শুম্ভ অসুর, তিনি এই বহু দেবীমূর্ত্তির ভিতর ঐক্য দেখিতে পাইলেন না, এই বহু বহু দেবশক্তি যে একই মহাশক্তি বা আদ্যাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিমাত্র তাহা বুঝিলেন না, কাজেই শ্রীদুর্গাকে বলিলেন—

বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্ব্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী ॥

দুর্গে, বলগর্ব্বে তুমি বড় উদ্ধত হইয়াছ। গর্ব্ব করিও না, তুমি পরের বল আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতেছ।

শুম্ভাসুরের এই কথার উত্তরে মহাদেবী বলিলেন—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ ॥

হে দুষ্ট, এই জগতে আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কে আছে? আমি একাই। এই সব দেবীমূর্ত্তি, ইহারা আমার বিভূতি, ইহারা আমাতেই প্রবেশ করিবে।

ততঃ সমস্তা স্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীত্তদাম্বিকা ॥

সেই সমস্ত ব্রাহ্মণী প্রভৃতি দেবী বা শক্তি সেই দেবীশরীরে লীন হইলেন, তখন একমাত্র দেবীই বিরাজ করিতে লাগিলেন।

ইহাই শ্রীদুর্গার তত্ত্ব। মহাশক্তির এই এক প্রকারের প্রকাশ। ইহাকে ঐশ্বর্য্য বলিতে পারেন।

ভারতবর্ষের সাধকগণ মহাশক্তির আর এক মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহার নাম শ্রীরাধা। শ্রীদুর্গা যেমন "নিঃশেষদেবগণশক্তি-সমূহমূর্ত্তি", সেইরূপ শ্রীরাধা "নিঃশেষভক্তগণভাব-সমূহমূর্ত্তি"। মহাশক্তির পরিচয়-লাভের দুইটি পথ, একপথ দেবতাদের মধ্য দিয়া, আর একপথ ভক্তগণের মধ্য দিয়া! ভক্তগণের অনুভব ও আস্বাদনের মধ্য দিয়া যাঁহারা চলিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, অনন্ত কালের যত ভক্ত তাঁহাদের যত অনুভব, আস্বাদন ও অভিজ্ঞতা, তৎসমুদয়ের যিনি সমষ্টিরূপা তিনি শ্রীরাধা। ভারতের অধ্যাত্মসাধনায় মহাশক্তি দুই মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন—শ্রীদুর্গা ও শ্রীরাধা।

এখন প্রশ্ন এই, আমরা একেরই উপাসনা করিব, কিম্বা উভয়েরই উপাসনা করিব। এই প্রশ্নের সুমীমাংসা নিতান্তই প্রয়োজন। ধর্ম্মজীবনের প্রথম ও প্রধান কথা আত্মনির্দ্ধারণ। জড়ধর্ম্মী ও পশুধর্ম্মী মানুষ আত্মনির্দ্ধারণ কাহাকে বলে জানে না, তাহার নিজের প্রকৃতি কি তাহা জানে না। তাহাদের ধর্ম্ম অন্য লোকে নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়, আর তাহারা অন্ধভাবে সেই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করে। এই প্রকারের ধর্ম্মানুষ্ঠানে মানুষের কোনই উপকার হয় না, অপকার হয়, মানুষের আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের পথ, হয় রুদ্ধ হইয়া যায়, নতুবা অবাঞ্ছনীয় বিকৃতি প্রাপ্ত হয়।

যিনি নিজের প্রকৃতির সন্ধান পাইয়াছেন তিনি হয় শ্রীরাধাকে নতুবা শ্রীদুর্গাকে আশ্রয় করিবেন। যিনি শ্রীদুর্গাকে আশ্রয় করিবেন তিনি কর্ম্মী, আর যিনি শ্রীরাধাকে আশ্রয় করিবেন তিনি ভাবুক। এই দুই পথ, কর্ম্মের পথ বা ঐশ্বর্য্যের পথ, আর জ্ঞানের পথ, বা মাধুর্য্যের পথ। সাধনতত্ত্বের মূলের খবর যাহার পায় নাই, দলবদ্ধ সম্প্রদায়ের স্বার্থাভিসন্ধি যাহাদিগকে অন্ধ করিয়াছে, তাহারা হয়ত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিবে, জ্ঞানের কথা বলিলেন, ভক্তির কথা কৈ? উত্তর, ভক্তি যে এক [illegible]ন, জ্ঞানের

একটি বিশেষপ্রকারের পরিপক্ক বা পরিণত-প্রাপ্ত অবস্থার নামই ভক্তি। প্রাচীন আচার্য্যেরা ইহা দেখাইয়া দিয়াছেন : এই ভক্তি প্রথমে জ্ঞান-মিশ্রা, তাহার পর জ্ঞান শূন্যা, নির্গুণা, অহৈতুকী ; তাহার পর প্রেম বা প্রেমভক্তি ; তাহার পর স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব। প্রেমের এই সপ্তভূমিকা, মহাভাব ইহার পরাকাষ্ঠা, আর শ্রীরাধাই মহাভাব-স্বরূপিনী।

জ্ঞানের সঙ্গেই যেমন ভক্তিকে গ্রহণ করিতে হইবে, সেইরূপ যোগকে হয় কর্ম্মের সহিত লইতে হইবে, নতুবা গীতার মতে বলিতে হইবে, সবই যোগ। জ্ঞানও যোগ, ভক্তিও যোগ, কর্ম্মও যোগ। যাহাই হউক, দুই পথ—কর্ম্মীর পথ আর ভাবুকের পথ। কিন্তু, কর্ম্মীর পথ বলিতে যে-সাধন পথ বুঝায় তাহা যে ভাবুকতা-বিহীন,—তাহা নহে। কর্ম্মের পথে নিরাপদে চলিতে হইলে ভাবের প্রয়োজন। ভাব না থাকিলে কর্ম্মে রস থাকিবে না, জীবন শুকাইয়া যাইবে। আবার ভাবের পথে চলিতে হইলে কর্ম্মের প্রয়োজন ; নিয়মিত, সুশৃঙ্খলিত ও সুবিবেচিত কর্ম্মের প্রয়োজন ; কর্ম্ম না থাকিলে ভাবুকতা অন্ধতার দুঃস্বপ্নে অধঃপতিত হইবে। তাহা হইলে 'কর্ম্মের পথ' কথার অর্থ কর্ম্মপ্রধান পথ ; 'ভাবুকতার পথ' কথার অর্থ ভাবুকতা-প্রধান পথ, কিন্তু চাই, দুইই চাই—ভাবও চাই কর্ম্মও চাই। একজন বলিবেন আমি কর্ম্ম চাই, কিন্তু কর্ম্মের জন্য নহে, ভাবের বিকাশের জন্য, ভাবের বিলাসের জন্য, ভাবের পুষ্টির জন্য, ভাবের শৃঙ্খলা ও নিশ্চয়তার জন্য, ভাবের গভীরতা ও সঠিকতার জন্য। আর এক জন বলিতেছেন, আমি ভাব চাই, কিন্তু ভাবের জন্য নহে কর্ম্মের জন্য ; কর্ম্মের প্রাণময়তা ও সরসতার জন্য। কর্ম্মই মূল, কর্ম্মই শেষ—"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং"।

প্রাচীনকালের ভাললোকেরা এই প্রকারের কথা বলিয়াছেন। কাহারা বলিয়াছেন? সত্যদর্শী ও সত্যনিষ্ঠ ভাল লোকেরা বলিয়াছেন। আর অন্ধ অথবা মিথ্যাব্যবসায়ী স্বার্থপরেরা বলিয়াছে, কর্ম্ম আর ভাব, কিছুতেই ইহারা মিলিবে না, ইহাদের মধ্যে চিরবিরোধ, সন্ধির সম্ভাবনা মোটেই নাই। এখন আমরা যে নবীন জগতে বাস করিতেছি; নবযুগের মানুষ আমরা, আমরা, নরলীলার উপাসক—ভগবত্তা মানবতায় সফল হইয়াছে; আর মানবতা ভগবত্তায় সফল হইয়াছে। এই নদীর তীরে, গোষ্ঠে ও কুঞ্জে, কিশোর-কিশোরীর খেলা ঘরে তাহাদের নীরব প্রেমের সুখস্বপ্নে মানবে ও ভগবানে

মহামিলন হইয়াছে—সুতরাং তোমরা বল কর্ম্মও চাই ভাবও চাই, ঐ নরলীলা পূর্ণ করার জন্য। আমরা শ্রীরাধাও চাই, শ্রীদুর্গাও চাই। যাবতীয় শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীদুর্গা। শ্রীদুর্গাই যোগমায়া, কাত্যায়নী, পৌর্ণমাসী, বৃন্দা, লীলাশক্তি, সবই ইনি। ঐশ্বর্য্যহীন মাধুর্য্য বড়ই নিন্দনীয়, নারদ ঋষি বলিয়া গিয়াছেন; আর মাধুর্য্যহীন ঐশ্বর্য্য বড় নিষ্ঠুর, বড় কর্কশ,—একেবারে অসহনীয়, তাহাতো সকলেই জানে। অতএব চাই—শ্রীদুর্গাও চাই, শ্রীরাধাও চাই।

আজ শুভ শরতে তোমাদের অন্তরে বাহিরে শ্রীদুর্গা আসিতেছেন। ইহার পর আসিবেন, লক্ষ্মী, তাহার পর কালী, তাহার পর আসিবেন জগদ্ধাত্রী, তাহার পর রাসপূর্ণিমায় আসিবেন শ্রীরাধা—এই প্রকারে তোমাদের মহাশক্তি আরাধনা সফল হউক।

৮। নবপত্রিকা ও মহাস্নান

শারদীয়া মহাপূজা, এই দুর্গোৎসব মহাশক্তির পূজা। আমাদের এই ভারতীয় আর্য্য জাতির চিত্তে এই মহাশক্তির চিন্তা বা ধারণা হঠাৎ একদিনে জাগে নাই। মা মহামায়া আসিয়াছেন, আমাদের ঋষিদের হৃদয়ে আসিয়াছেন, ভক্তগণের পূজায় আসিয়াছেন, জনসাধারণের উৎসবে আসিয়াছেন। কিন্তু, একদিনে অকস্মাৎ তিনি আসেন নাই, তিনি আসিয়াছেন, ক্রমে ক্রমে ক্রমে। আজ কি শুনিতে ও জানিতে ইচ্ছা হয় না, কিপ্রকারে ক্রমে ক্রমে তিনি আসিলেন? তাঁহার এই ক্রমিক প্রকাশ, তাঁহার আবির্ভাবের এই ক্রমগুলি পণ্ডিতের অনুসন্ধানের বিষয়, সাধকের ধ্যানের বিষয়। মায়ের পূজায় দেখা যায় ভারতের জ্ঞানের যাবতীয় বিভাগ, ভারতের যাবতীয় শাস্ত্র, ভারতের যোগী ঋষি ও ভক্তগণের যাবতীয় অভিজ্ঞতা, সবই একত্র হইয়াছে। বেদ পুরাণ তন্ত্র, সাংখ্য যোগ বেদান্ত—মহামায়ার মহাপূজায় সকলকেই দেখিতে পাই। কবে, সুদূর অতীতে স্বারোচিষ মন্বন্তরে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য, মেধস্ মুনির নিকট আদ্যাশক্তি মহামায়ার লীলা আনুপূর্ব্বিক শুনিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই মহামায়ার পূজা করিয়াছিলেন। দেবীসূক্ত জপ করিয়া, নদীতীরে দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পুষ্প, ধূপ ও হোমের দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। তিন বৎসর এই প্রকারে পূজা করার ফলে জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা তাঁহাদের

দর্শনদান করিলেন। সুরথরাজা পাইলেন নিষ্কণ্টক রাজ্য, আর বৈশ্য পাইলেন জ্ঞান। শুনিতে পাওয়া যায় রাক্ষসপতি রাবণ মহামায়ার পূজা করিতেন, চৈত্রমাসে বসন্তকালে রাবণের পূজা হইত, আর এই মহামায়ার কৃপাতেই রাবণ দেবজয়ী হইয়াছিলেন। ভগবান্ রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য অকালে অর্থাৎ শরতে মহাদেবীর পূজা করেন। শ্রীরামচন্দ্রের সেই ব্যবস্থানুসারেই আমাদের এই শারদীয়া মহাপূজা।

এই পূজার প্রথম জিনিস বিল্ববৃক্ষ। এই বিল্ববৃক্ষে মহাদেব ও মহাদেবী বাস করেন।

মেরুমন্দরকৈলাস হিমবচ্ছিখরে গিরৌ।
জাতঃ শ্রীফলবৃক্ষ ত্বমম্বিকায়াঃ সদা প্রিয়ঃ॥
শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফল শ্রীনিকেতন।
নেতব্যোঽসি ময়াগচ্ছ পূজ্যো দুর্গাস্বরূপতঃ॥
শ্রীফলোঽসি মহাভাগ সদা ত্বং শঙ্করপ্রিয়ঃ।
চণ্ডিকারোপণার্থায় ত্বামহং বরয়ে প্রভো॥

কত যুগ যুগান্তের, কত সুখদুঃখময় সংগ্রামের স্মৃতি বহন করিয়া আমরা আজ এই মহামায়ার পুজা করিতেছি। চারিদিকে অগণিত বৃক্ষলতা, ইহাদের কাহার ভিতরে কত কি আছে, তাহা মানবজাতি এখনও সম্পূর্ণরূপে জানে না, কিন্তু জানার প্রয়োজন। কাহার দ্বারা কখন্ কি প্রকারের উপকার হইয়াছে, এখনও কত উপকার হইতেছে তাহাও মানুষ জানে না। মানুষ একদিন দুর্ব্বল ছিল, জীবন-সংগ্রামে পশু রাক্ষস ও পিশাচের দ্বারা, ভূত প্রেত ও বেতালের দ্বারা, বিবিধ প্রকারের প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের দ্বারা মানুষ সর্ব্বদাই বিব্রত ও বিপন্ন হইত। কিন্তু, মানুষ ধ্বংশ হয় নাই, ক্রমে ক্রমে ক্রমে মানুষ বিজয়লাভ করিয়াছে, পশু রাক্ষস পিশাচ বেতাল প্রভৃতিকে পরাস্ত করিয়া দেবতারও উপরে নিজের গৌরবের সিংহাসন লাভ করিয়াছে, এই মানুষই সাধনার দ্বারা মনু হইয়াছে, ইন্দ্র হইয়াছে, ব্রহ্মপদ লাভ করিয়াছে, নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছে। কি করিয়া ইহা হইল? চণ্ডী বলিলেন, "মহামায়ানুভাবেন" মহামায়ার কৃপায় এই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে, এখনও কত কি হইবে। মহামায়ার এই কৃপা লাভ করিতে মানুষ যাহাদের সাহায্য পাইয়াছে, আজ মানুষ তাহাদের পূজা করিবে। তাই বিল্বের পূজা, বিল্ববৃক্ষের

পূজা। কোথায় মেরু, কোথায় মন্দর, কোথায় কৈলাস, কোথায় হিমাচল ? এই সব পর্ব্বতের শিখরে শিখরে মানবজাতি কত যুগযুগান্তর গুহায় গুহায় পরিভ্রমণ করিয়াছে! কোথায় শ্রীশৈলশিখর, কে তাহা জানে ? সেই সব স্থানে জগজ্জননী অম্বিকার প্রিয় এই শ্রীফল বা বিল্ব। মাতার ন্যায় এই শ্রীফলবৃক্ষ আমাদের কল্যাণ করিয়াছেন, ইনি শ্রীনিকেতন—লক্ষ্মীর বসতি স্থান, সৌন্দর্য্যের লীলাস্থল। এই শ্রীফলবৃক্ষ শঙ্করেরও প্রিয়, কাজেই শঙ্করীর পূজায় শ্রীফলের পূজা।

বিল্ববৃক্ষ মহাভাগ সদা ত্বং শঙ্করপ্রিয়ঃ।
গৃহীত্বা তব শাখাঞ্চ দুর্গাপূজাং করোম্যহং ॥
শাখাচ্ছেদোদ্ভবং দুঃখং ন চ কার্য্যং ত্বয়া প্রভো।
দেবৈর্গৃহীত্বা তে শাখাং কৃত্বা পূজেতি বিশ্রুতিঃ ॥
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবী সর্ব্বকল্যাণ হেতবে।
পূজাং গৃহাণ সুমুখি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ॥
দেবি চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি চণ্ডবিগ্রহকারিণি।
বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ দেবী যথাসুখম্ ॥

দেবতারা বিল্বশাখা গ্রহণ করিয়াই মহামায়ার পূজা করিয়াছিলেন, আমরাও আজ চণ্ডিকাকে আহ্বান করিতেছি, তিনি আসিলে, তিনি কৃপা করিলে আমাদের সর্ব্ববিধ কল্যাণ হইবে, তিনি ব্যতীত তাঁহার কৃপা-ব্যতীত আমাদের কোনই আশা নাই, সেইজন্যই বিল্বশাখা, বিল্বফল ও বিল্ব-পত্রের প্রয়োজন।

নবপত্রিকার তত্ত্বও এই প্রকারে বুঝিতে হইবে। সূক্ষ্ম অনুভবশক্তির প্রয়োজন। বৃক্ষলতার ভিতর যে-প্রাণের ক্রিয়া হইতেছে, বিশ্বপ্রাণের যে যে বিভূতি ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষ ও লতার মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিতেছে, নিজের প্রাণকে জাগাইয়া তাহা বুঝিতে হইবে এবং সেই প্রভাব গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রকারেই আমরা নিখিলের প্রাণের সহিত একাত্মতা লাভ করিয়া মহামায়ার আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করিব।

সুরনায়িকা ব্রহ্মাণী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে বাস করেন, কদলীতরুতে তিনি বিরাজিত। কচ্চি দুর্গারূপা, সেখানে কালিকা আছেন। হররূপা হরিদ্রা শঙ্করের প্রিয়া, সেখানে দুর্গার পূজা করিতে হয়; এই হরিদ্রা রুদ্ররূপে আমাদের শান্তি দান করেন। জয়ন্তী-বৃক্ষে কার্ত্তিকী, এই জয়ন্তী জয়রূপা। শ্রীফলবৃক্ষে শিবার পূজা করিতে হয়, ইনি বিজয়-

বর্দ্ধন। দাড়িম্ববৃক্ষে রক্তদন্তিকা শক্তি, ইনি পাপ ও ক্ষুধা নাশ করেন। অশোকে শোকরহিতা শক্তি, এই শক্তি শোকনাশিনী। মানবৃক্ষে চামুণ্ডাশক্তি, তিনি মান দান করেন। ধান্যবৃক্ষে মহালক্ষ্মীশক্তি, ইনি সকলের প্রাণদায়িনী। মহাশক্তির এই নয় প্রকার মূর্ত্তি, নয় প্রকারের বৃক্ষে বিরাজিত, নয়টি দ্রব্যের দ্বারা নয় জনের পূজা। এই নয়টি বৃক্ষকে অপরাজিতা লতার দ্বারা একত্রে বন্ধন করিতে হয়। আমরা চাই বিজয়া। মহামায়ার সন্তানসন্ততিগণ, নিজেদের ভুলিয়া গিয়াছে, আবার তাহারা সংগ্রাম করিয়া বিজয় লাভ করিবে।

ব্রহ্মাণী, কালিকা, দুর্গা, কার্ত্তিকী, শিবা, রক্তদন্তিকা, শোকরহিতা, চামুণ্ডা, মহালক্ষ্মী, এই নবশক্তি বা নবদুর্গা। চন্দনমিশ্রিত উষ্ণজল, পুষ্পজল, বাপীজল, শিশির-জল, সর্ব্বৌষধিজল, পঞ্চকষায়জল, সুগন্ধিজল, কর্পূরজল ও গঙ্গাজলের দ্বারা কদলী কচ্চী, হরিদ্রা, জয়ন্তি, বিল্ব, দাড়িম্ব, অশোক, মান ও ধান এই নয়টি বৃক্ষকে স্নান করাইয়া অপরাজিতা লতায় নবপত্রিকা বন্ধন কর।

ভারতের যত পুণ্যনদ, যত পুণ্যনদী, আজ এশুভ শরতে সকলেরই আহ্বান, আজ সকলে আসুন। কেবল ভারতের নহে, স্বর্গের মন্দাকিনী আসুন, পাতাল হইতে ভোগবতী আসুন, সকলে আসিয়া মহামায়ার স্নানের ব্যবস্থা করুন।

আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী।
সরযূগণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী॥
ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।
সর্ব্বাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাঃ।

দেবতারা আসুন, ধর্ম্মের পত্নীগণ আসুন, আদিত্য চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগণ আসুন, আজ সকলের মহামিলন, সকলেই এই শুভকর্ম্মে যোগদান করুন, ইহাই মহামায়ার পূজা।

সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ॥
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে।
আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈর্ঋতস্তথা।
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথাশিবঃ।
ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাঃ পান্তু তে সদা॥

কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ কান্তিঃ শান্তিস্তুষ্টিশ্চ মাতরঃ॥
এতাস্ত্বামভিসিঞ্চন্তু ধর্ম্মপত্ন্যঃসমাগতাঃ।
আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ।
গ্রহাস্ত্বামভিসিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ।
দেবপত্ন্যো ধ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ।
অস্ত্রাণি সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ।
ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ।
এতে ত্বামভিসিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥
সিন্ধুভৈরব শোণাদ্যা যে নদা ভুবি সংস্থিতা।
সর্ব্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥
কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগশ্চ অক্ষয়ো বটসংজ্ঞকঃ।
গোদাবরী বিয়দ্‌গঙ্গা নর্ম্মদা মণিকর্ণিকা॥
সর্ব্বাণ্যেতানি তীর্থানি ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে।
তক্ষকাদ্যাশ্চ যে নাগাঃ পাতালতলবাসিনঃ।
সর্ব্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে।
দুর্গা চণ্ডেশ্বরী চণ্ডী বারাহী কার্ত্তিকী তথা।
হরসিদ্ধা তথা কালী ইন্দ্রানী বৈষ্ণবী তথা।
ভদ্রকালী বিশালাক্ষী ভৈরবী সর্ব্বরূপিণী।
এতাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাঃ॥

স্নাতা সুভূষিতা জগন্মাতা নবদুর্গা আসিলেন। পূজামণ্ডপ আলো করিয়া মা বসিলেন। দশদিকে দশকর, ত্রিকালে ত্রিনয়ন, জগদম্বা আসিলেন। মা যখন আসিয়াছেন, তখন আর আসিতে কেহই বাকি নাই, সকলেই আসিয়াছেন, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আজ আমার, আমি আজ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের। এস, মা, আমার গৃহে অষ্টশক্তি সহ, আমি যে শক্তিহীন, বড় কষ্টে বড় নিরুপায় হইয়া পড়িয়া আছি। জীবনে কেবলি বিফলতা, সিদ্ধির জন্য কামনা

যে প্রাণে নাই তাহা নহে, কামনার দাহে ভোগের পিপাসায় নীরবে পুড়িয়া মরিতেছি, সাধ মিটাইবার শক্তি নাই। বঞ্চক হইয়া পড়িয়াছে এই জাতি ও এই দেশ। অক্ষমতা স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করে, তাই নিস্কামতার ছদ্মবেশ পড়িয়া জগৎকে ও নিজেকে বঞ্চনা করে। এখন উপায়? সিদ্ধিলাভ আর সিদ্ধিলাভের উপায় শক্তিপূজা। তাই বলিতেছি মা, এস, অষ্টশক্তিসহ আমার গৃহে এস।

আগচ্ছ মদ্‌গৃহে দেবি অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ।
পূজাং গৃহাণ বিধিবৎ সর্ব্বকল্যাণকারিণি॥
এহেহি ভগবত্যম্ব শত্রুক্ষয়জয়প্রদে।
ভক্তিতঃ পূজয়ামি ত্বাং নবদুর্গে সুরার্চ্চিতে॥
দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়।
যজ্ঞভাগান্ গৃহাণ ত্বমষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ॥

উৎসব

ঐ যে দূরে বাঁশি বাজ্‌ছে, ধীরগম্ভীর উদাত্ত স্বরে! বাঁশির আহ্বান, মিলনের সুর ব্যোম ভরপুর করে দিয়েছে। কত কাল পরে, কত যুগ পরে, আজ পূরব আকাশ অরুণ রাগের প্রথম পরশ পেয়ে আকুল হয়ে উঠেছে;—সে আকুলতা ফুটেছে তার বুকের পরে, পরতে পরতে, বিচিত্র রঙের খেলায়। আনন্দের সাড়া পড়ে গেছে, জলে স্থলে বনানীতে;—সে আনন্দের হিল্লোলে, চারিদিক ব্যাকুল করে তুলেছে। এতটুকু সঙ্কেতে, যেন সমস্ত বিশ্ব আজ তাণ্ডব নৃত্যে মেতে উঠ্‌বে। এত যুগ ধরে, আঁধারের মাঝে যে পূজা, সম্বর্দ্ধনা, আরাধনা চল্‌ছিল, আজ সেই ব্রত উদ্‌যাপনের দিন। প্রথম যে দিন বিশ্ব-

নিয়ন্তার কোমল পরশের মাঝে এই বিশ্ব গড়ে উঠেছিল, সেইদিন সে সাধনা সুরু হয়েছিল, হৃদয়ের অতি নিভৃত কোণে, নীরবে শান্তিপূর্ণ আনন্দের সাধনা—সেই সাধনা আজ পূর্ণ হবে। আজ সার্থক এ দিন, সার্থক এ জীবন, সার্থক এ সাধনা!

বিপুল পুলকে যমুনার উছল স্রোতে কল্লোল উঠেছে। বৃন্দাবনে সখীদের মধ্যে অভিসারের আয়োজন। ব্রজে আজ উৎসব। প্রতি কুঞ্জের ভিতরে বাহিরে উৎসবের আয়োজন সুরু হয়েছে। ব্রজাঙ্গনার চিত্ত, ঝড়ের পূর্ব্বের মতই শান্ত—কিন্তু ভিতরে যে ঝড় উঠেছে, তা কঞ্জন বুঝ্ছে। প্রতি পল প্রতি মুহূর্ত্ত সখীদের কাছে যেন যুগ বলে প্রতীতি হচ্ছে। বাঁশির সুরের আহ্বানের কাতরতাও ক্রমেই বেড়ে উঠছে। সংসারের মধ্যে অঙ্গ ডুবিয়ে সখীরা পঞ্চইন্দ্রিয় মন প্রাণ সকলকে দূতী করে খবর আন্‌তে পাঠাচ্ছেন। মনের মধ্যে—আর কোনও চিন্তা নাই। কিন্তু বাহিরে কোন ভাবের আভাস বা প্রকাশ হচ্ছে না। কেবলমাত্র মধ্যে মধ্যে পরস্পরের চোখের সলাজ বক্র চাহনি, সে নিভৃত হৃদয়ের কোণের গোপনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। প্রেমের রীতিই এই!

বাঁশি বাজ্‌ছেই। ক্রমে ঘনীভূত সন্ধ্যার ছায়ায় সংসার মলিন হয়ে উঠল। সেই আধ আলো আধ ছায়ায় পূর্ণচন্দ্রের পূত কিরণজাল, মাঝে বাঁশির মোহন তান, আরও মধুর আরও করুণ হয়ে উঠ্‌ল। প্রতি কুঞ্জে অভিসারের সাড়া জাগল। হঠাৎ কুহকমন্ত্রে সমস্ত প্রকৃতি পরম পুরুষের তরে আকুল হয়ে উঠ্‌ল। তার বুকের ভিতরে প্রাণশ্বাস আনন্দে সমস্তটাকে হিল্লোলিত করে তুল্‌লে। আনন্দ, আনন্দ, বনে আনন্দ, জলে আনন্দ, স্থলে আনন্দ, পাতায় আনন্দ, ফুলে আনন্দ, বায়ুতে আনন্দ, নভস্তলে আনন্দ, একটা যেন আনন্দের ঘূর্ণী উঠল। ঐ যে শ্যামসুন্দর ত্রিভঙ্গমুরারি পীতধড়া বাঁকাচূড়া, ঐ যে প্রাণ-গোবিন্দ, ঐ যে আমার দয়িত। চারিদিকে সখীরা কুঞ্জ হতে, ফুলের সাজে অলকা তিলকা ভালে লয়ে, যমুনার কূলে কেলিকদম্বমূলে চিরসুন্দরকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন। মধু, মধু, মধু। মধু সে রাসবিহার—মধু সে কেলি, সে আনন্দ সে মাধুর্য্য, সে অঙ্গস্পর্শ, সে চুম্বন, সে আলিঙ্গন, সে মিলন; অপূর্ব্ব, অদ্ভুত, অভিনব সে। সে কিন্তু আবার নিত্য সত্য, চিরন্তন সে। সেই রাসস্থলীতে ব্রহ্মাণ্ডের সব রস ঘনীভূত আজ, প্রেমানন্দমূর্ত্তি আজ সেখানে।

ব্রজকুলবালারা লজ্জা মান ভয় কালার পায়ে সমর্পণ করে আত্মবিক্রয় করেছে।

ক্রমে রস প্রবাহে সব ডুবে গেল। সর্ব্বনাশ হোল—প্রেমের বন্যায় তুমি আমি প্রভেদ কোথায়, তলিয়ে গেল। যত গোপী তত কৃষ্ণ। প্রতি সখী রাসমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিহার করছেন। যেন এই বিরাট প্রকৃতি তাঁর অঙ্গে লয় পেয়েছে। ভাবের তরঙ্গ, তরঙ্গের পর তরঙ্গ, পুলকের বান ডাকিল। তার পর নৃত্য। সেই শ্রীরাসমণ্ডলীতে যত গোপী তত কৃষ্ণ, নৃত্য করছেন। অপূর্ব্ব লাস্য, অপূর্ব্ব অঙ্গভঙ্গী, অপূর্ব্ব গতি, অপূর্ব্ব রীতিতে পূর্ণ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সেই নৃত্যে মেতে উঠল। পায়ের নীচে বাসুকী কাঁপল; মহাদেবের রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দুলে উঠলো। মাথার জটার উপর ফণী গর্জ্জে উঠল। ব্রহ্মা চতুরানন, দশানন, শতানন, সহস্রানন, অযুতানন, কত কোটী কল্পের ব্রহ্মারা নৃত্যে মাতলেন, ইন্দ্র নাচ্‌ল বরুণ নাচ্‌ল, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর স্বর্গের দেবতারা সকলেই নিজেকে সেই পুলকের উচ্ছ্বাসে হারিয়ে ফেল্‌ল। স্থাবর জঙ্গম, মর্ত্ত্য পাতাল সব সেই নাচে মেতে গেল। আনন্দের উচ্ছ্বাসে বিরাটকে ছেয়ে ফেলল। একটা প্রেমানন্দের ঘূর্ণী সৃষ্টি হোল সেই রাসমণ্ডল হতে। সেই ঘূর্ণী পরিব্যাপ্ত হয়ে বিশ্বকে উতলা করে তুলল। বসন্তের মৃদু দখিন বাতাসে এমনই ঘূর্ণী বাত্যার উদ্ভব হয় বটে!

ললিতের আলাপে পাখিরা যখন উষার বন্দনা গান সুরু করেছে তখন সখীরা পরস্পর সম্বিত পেয়ে রাগ-অলস নেত্রে চেয়ে বল্‌ছেন—একি ব্যাপার? মনের মাঝে তখনও, গত নিশার আনন্দের সুরের রেশ অনুরনিত হচ্ছে।

তার মাঝে জাগরণক্লিষ্ট নিদ্রা-জড়িত অথচ পুলকে উচ্ছ্বসিত সহাস্য মুখে তাঁরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছেন, সখি গত নিশায় কি স্বপন দেখিলাম। বাঁশির সুর তখনও দূর হতে ভেসে আসছে। তখনও প্রত্যেকের মনের মধ্যে আনন্দের লহর উঠ্‌ছে।

বাঁশি এখনও বাজছে। আমিও সকলকে জিজ্ঞাসা করি, ওগো এটা কি স্বপন-কাহিনী, না আমার চিন্তাক্লিষ্ট মনের কল্পনা? অথবা কাতর প্রাণের আশ্বাসবাণী।

বিশ্ব যেন ডেকে বলছে—রে বিশ্বাসি, এ তোরই প্রাণের রাসমণ্ডপে প্রাণ-গোবিন্দেরই কথা।

বৈষ্ণব চরণাশ্রিত—সুধীরকুমার সিংহ।

প্রাণান্বেষণ

দিনরাত্রি বাঁশী বাজছে—বাঁশি বেজেই চলেছে। বড় বিরামহীন বাঁশি! সকালবেলায় বাজে, সকালবেলার আলো বাতাসের সঙ্গে সুর মিলিয়ে—জাগরণের সুরে।—জাগে কে?—কেও তো জাগে না.—বিফল বাঁশি—বিরাম-বিহীন বেজেই চলে।

দৈনিক কোলাহলের মধ্যে প্রাণ ডুবে যায়—বাঁশির সুর আর কানে পৌঁছোয় না:—ওরে বাঁশ যে গেয়ে গেয়ে সারা হল! তৃষ্ণাতে যে বাঁশির কণ্ঠ করুণ হ'য়ে আসে!

———যা খুঁজে সে বাঁশি বাজায় তা পেল কৈ?—প্রাণ খুঁজে সে সারা হল প্রাণ তো পেল' না!

এমনি করেই প্রাণ খোঁজা, তার কাজ। মাঠের গোধন হারিয়ে গেছে তার—তারই জিনিষ তাই সে খুঁজে মরে। বাঁশি বাজায়—বাঁশির সুরে যদিই ছুটে আসে। রাখালের বাঁশির ধ্বনি সব গোধনেই চেনে। ব্যাকুল প্রাণে তাই তো খুঁজেই চলে—বাঁশির যে তার শ্রান্তি ক্লান্তি নাই—আরাম বিরাম নাই! অবোধ গাভী তাই কি কভু বোঝে?—নইলে সে কি যার ধন তার হাতে না দেয় ধরা! পদে পদে বিপদ,—আপদ বালাই জ্ঞান থাক্‌তে কেও কি কোথাও আপন মাথায় নেয়?……হায়রে অবোধ গাভী!

বড়ই করুণ বাঁশি। দিন যে চলে যায়—তবুও তো সে গায়! পাখী আপন কুলায় পানে ধায়, কনকরবি পাল তুলে তার আপন লোকে যায়,—ঘরছাড়ারা আপন ঘরে ঢোকে—কাজের থেকে সবাই ছাড়া পায়।—ওরে বাঁশির শুধু শান্তি, বিরাম নাই—বিশ্ব ভ'রে ছড়িয়ে পড়ে করুণ তার ঐ গান। নদী স্রোতে কেবল কাতরতা—বাতাসেতে কেবল ভাসে ব্যথা।—ওরে এখনো কি কানের মাঝে পশেনি ঐ সুর?—কাছের বাঁশি এখনো কি ঠেক্‌ছে বহুদূর?

চায় সে শুধুই প্রাণ—বিফল হয়েও গেয়েই চলে গান। তার প্রাণ-চাওয়া ঐ গান আকাশ বাতাস বেড়ায় বুকে নিয়ে। তোর অজানা ঐ সখা তোকে জানে বলেই কর্‌ছে ডাকাডাকি! পরমসখা সেই তো শুধু তোর—তোর্ চোখে, আঁধার ঘোর—নইলে এমন

স্বার্থহারা পাগলপারা বন্ধুরে তুই দিবসনিশি দিস্‌রে ব্যথার খোঁচা !—তবুও গাহে বাঁশি,—তবুও ডাকাডাকি !

······সব সখাতেই আপন সখার হৃদয়খানি চায় ;—এমনি নিদয় তুই তোর পরম সখা এত ডাকেও সাড়াও না তোর পায় !

* * *

কৃষ্ণ আবার কে ?—বাঁশি আবার কি ? বাজায় বা সে কেন ? ······

বিশ্ব জনের প্রাণ খুঁজে যে মরে, কৃষ্ণ রে সেই তোর ! বাঁশির সুরে করছে ডাকাডাকি ! প্রাণ-চাওয়ায় আর প্রাণ-না-পাওয়ায় বাজছে যে তার বাঁশি—কেবল অহর্নিশি।

* * *

অনেকদিনের কথা। বৃন্দাবনের কথা।

প্রাণ খুঁজে সে বাঁশি বাজায়
প্রাণ তো নাহি পায়—

হতাশ হয়ে বাজছিল তার বাঁশি,—বিফলতাই পড়ছিল তার মনে !—

হঠাৎ দেখা রাধার সে প্রাণ
আঁধার যমুনায়।

কতকালের অতৃপ্তি আজ তৃপ্ত বুঝি হল। আনন্দে তার হৃদয় গেল ভ'রে। ক্লান্তি বুঝি শান্তি পেল' আজ !······বাঁশির সুরে উঠল ফুটে পূর্ণিমার ঐ চাঁদ। বিশ্ব ভ'রে ছড়িয়ে গেল অরূপ-রূপের লীলা—অপূর্ব্ব ঐ বাঁশির সুরের ফাঁদ !—চাঁদের হাসি উঠ্‌ল তখন ফুটে—যমুনা তা পরাণ ভ'রে হেসে নেচে আপন মাঝে নিল' সকল লুটে ! দখিন-হাওয়া জ্যোৎস্না হিয়ায় করল অধীর অথির—পাপিয়া আজ গেয়ে গেল—'তৃপ্ত হল আঁখি' !

পুরোনো এই জগৎটা আজ পড়ল মোহন সাজ,
বুকের মাঝে উঠ্‌ল জ'মে শান্তি, প্রেম, আর লাজ !

ব্যাকুলতার সমাপ্তি যে সবার মধুরতম ! বহুদিনের বহু আশা—হৃদয়তলের গোপন ভাষা—নির্ঝরিণীর মতন যে আজ ভাঙল' পাষাণ-কারা—চলল' ছুটে যুগল-প্রেমের ধারা।

কৃষ্ণসখার ক্লান্ত বাঁশি শান্ত হল ঐ—রাধাসখির তরাগাঙ্ আজ নাচল তাথৈ থৈ !

আজকে রাধার হায়—
বুকের বসন গেল খুলে,
আজকে রাধা হায়—
চাইলে সলাজ নয়ন তুলে,
আজকে রাধা—
ঘরের কথা গেল ভুলে,—
ছুট্‌ল চোখে জল
বহুদিনের বুকের আশা—
আজকে তাহার পেল' ভাষা,
আজকে যে তার—
জ্যোৎস্না এল আঁধার-নাশা
ভরল হৃদয়-তল।

কানের ভিতর দিয়া মরমমাঝে পশ্‌ল' বাঁশির সুর।…ঢাক্‌না-খোলা সকল-ভোলা প্রাণটা যে তাই সে—হৃদয়েশের চরণতলে বিলিয়ে দিল' রে!

আজ— পূর্ণিমার এই মধুর ক্ষণে
কদম-তলে বৃন্দাবনে
গাঢ়-প্রেমের আলিঙ্গনে
দুজনে বিহ্বল!

আজকে রাধা—
কৃষ্ণবঁধুর পায়ের তলে সকল মধু তার
এক নিমেষেই বিলিয়ে দিতে চাইল' বারেবার!
কৃষ্ণবঁধুর আনন্দের আজ
নাইরে সীমা নাই—
প্রাণ পেয়েছে সে—
প্রাণ যে এবার প্রাণ পেল তার
আনন্দ উছলায়!

এই দোঁহার আনন্দেতে আজি স্বর্গমরত উঠল নেচে···ঐ পরমানন্দে বরণ করে নে। কৃষ্ণসখার ব্যাকুল ডাকে দেরে সারা দে।—বিশ্ব উঠুক দুলে—ধন্য সফল হোক্—যেমন হয়েছিল—

পুণ্য গোকুল ঝুলন দোলে
রাসের সে লীলায়।

বৈষ্ণবচরণাশ্রিত—শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ

বরিশালে হিন্দুমহাসভার অধিবেশনে

সভাপতি—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের

অভিভাষণ

শ্রীঃ

যে বিরাট পুরুষের অঙ্গ হইতে আমরা সকলে উৎপন্ন হইয়াছি, আমাদের সকলের আদিপুরুষ সেই পরব্রহ্মকে কোটি কোটি প্রণাম। লোকোত্তর-শক্তিসম্পন্ন আমাদের পূর্ব্বজগণকেও আমাদের কোটি কোটি প্রণাম।

"জীর্ণা তরিঃ সরিদিয়ং চ গভীরনীরা
নক্রাকুলা বহতি বায়ুরতিপ্রচণ্ডঃ।
তার্য্যাঃ স্ত্রিয়শ্চ শিশবশ্চ তথৈব বৃদ্ধা-
স্তৎকর্ণধারভুজয়োর্বলমাশ্রয়ামঃ॥"

ভগবান শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, "জগতে কেহই অযোগ্য নহেন, কিন্তু যোজকই সুদুর্ল্লভ।" একটা প্রকাণ্ড এঞ্জিনের একটা ক্ষুদ্র স্ক্রুপের উপযোগিতা তাহার বড় চাকা হইতে কম নহে। উপযুক্ত স্থানে স্ক্রুপ সংযুক্ত হইলে সে অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। কেহ আমরা হীন নহি, কেহ আমরা

ছোট নহি। এই সংযোজনার জন্য কেহ স্তূপকে ধন্যবাদ দেন না, সমস্ত ধন্যবাদের পাত্র কারুকর—সংযোজক। আমার ভালমন্দের দায়ী আপনারা। এই যোজনার জন্য আমি আপনাদের কাছে বিনয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

১

সকল প্রকার রোগের মধ্যে ক্ষয়রোগ দুশ্চিকিৎস্য, মারাত্মক ও ক্লেশপ্রদ। আমাদের হিন্দুসমাজে এই দারুণ রোগ প্রবেশ করিয়াছে। ইহার প্রভাবে দিনে দিনে আমরা ক্ষীণ হইতেছি, দুর্ব্বল হইতেছি, মৃত্যুমুখের দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছি। ক্ষয় নানারূপে দেখা দিয়াছে, ইহা রোধ করিবার জন্য সংস্কারের প্রয়োজন। যথায় সংস্কার নিপুণতার সহিত অনুষ্ঠিত হয়, তথায় জীবনী-শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তথায় জীবনীশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। ক্ষয় স্বভাবধর্ম্ম—ক্ষয়রূপ দারুণ আপৎ দূর করিবার জন্য অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় মিলিত হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, তাই আমাদের সমাজ সুদীর্ঘজীবি। আমাদের সম্মুখে জল-বুদ্‌বুদের ন্যায় কত জাতির উদ্ভব ও পতন হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই।

অতি প্রাচীনকাল হইতে দেশবাসীকে "ব্রাহ্মণ আপদ হইতে উদ্ধার করিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণ উপলক্ষমাত্র। বর্ণচতুষ্টয়ের মিলিত কার্য্যের উপর জাতির সমস্ত গৌরব নির্ভর করে। এ মিলনের ভিত্তি সাম্য। যে স্থানে সাম্য, তথায় সুখ শান্তি, নিরোগিতা। তাই শ্রীভগবান্ পার্থ-সারথি বলিয়াছেন, "যাঁহাদের মন সাম্যে অবস্থিত, তাঁহারা ইহলোকে অবস্থান করিয়া স্বর্গ বিজয় করিয়া থাকেন।" আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা—বৈষম্যের উত্তম উদাহরণ। দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র্য বৈষম্যের ফল। সকল পাপের বড় পাপ পরাধীনতা—এই পরাধীনতা বৈষম্যের নিদারুণ পরিণাম।

২

সাম্য স্বর্গীয়। এই সাম্যে যখন আমরা অবস্থিত ছিলাম তখন আমাদের মাহিষ্য, নমঃশূদ্র আদি পরিচালিত নৌবাহিনী পৃথিবীর সর্ব্বত্র গমন করিয়াছিল। আপনাদের ভুজবলে ভারতের বাহিরে বিশাল রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। যবদ্বীপে মজপহিত অর্থাৎ বিশ্ব-সাম্রাজ্য হিন্দুর ভুজবল ও নৈতিক বলের উত্তম উদাহরণ। কাম্বোজে "নিত্যদান পয়ঃসিক্তকর" ভববর্ম্মা প্রভৃতির "অভ্রংলিহ মন্দির", "আরোগ্যশালা"; সূর্য্যবর্ম্মা প্রভৃতির নির্ম্মিত আঙ্কোরের কথা চিরদিন বিস্ময়ের সহিত কীর্ত্তিত হইবে। ইহার কারুকার্য্য দেখিয়া য়ুরোপীয়রাও সম্মোহিত হন। কাম্বোজ রাজন্যবর্গের সভায় ভারতীয় বুধমণ্ডলী ও কারুকরগণ সৎকৃত হইতেন, নানা ধনরত্ন দ্বারা তাঁহারা প্রপূজিত হইতেন। যাভায় সিংগ্রী-বুরোবুডোর প্রম্বানন প্রভৃতির অদ্ভুত কারুকার্য্য হিন্দুর উত্তম, একতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, তন্ময়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। তাঁহারা যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, জগতের

ইতিহাসে তাহা নিতান্ত সুলভ নহে। আবার যদি আমরা সমদৃষ্টিসম্পন্ন হই, আবার যদি সকলে একতাবদ্ধ হই, আবার যদি সকলে চরিত্রবান্ হই, তাহা হইলে অচিরকালের মধ্যে আমরা আমাদের পূর্ব্ব-সমৃদ্ধি পুনঃ প্রাপ্ত হইব, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা কবি-কল্পনা নহে—বাস্তব কথা। কিছু দিন আগে আমাদের কীর্ত্তিনারায়ণ আদি বীরপুরুষগণ ফেরঙ্গ, মগ ও যবন-বল-গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন। সাম্য সকল শক্তির আধার, ইহার অভাবে আমরা শক্তিহীন, ঘৃণিত, ধিক্কৃত ও ভর্ৎসিত হইয়া থাকি।

সাম্য একতা আনয়ন করে—একতার বলে মানুষ শত্রুর অজেয় হয়। এক জন মহিলা-কবি বলিয়াছেন,—

"ধরমের ডাকে, চরণোদ্ভব, শীঘ্র করি' আসি মিলল সবে।
সগর-সন্তানে উদ্ধারিতে আহা চরণোদ্ভবা যেরূপে যাবে॥"

দেশবাসীর দুর্গতি দূর করিবার জন্য চরণোদ্ভব হউন অথবা আননোদ্ভবই ইষ্ট হউন, সকলকে মিলিত হইয়া জাতির দারুণ ক্ষয়রোগ দূর করিতে হইবে।

৩

যে জাতি প্রাণিজগতের আর্ত্তি দেখিয়া অভিভূত হইয়াছিলেন, জীবসমূহের দুঃখ দূর করিবার জন্য যাঁহারা অনন্য-সাধারণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, মনুষ্য ত দূরের কথা, পশু, পক্ষী, এমন কি, উদ্ভিদেরও আরোগ্যের জন্য যথাসাধ্য প্রযত্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরদিগের মধ্যে এখন অস্পৃশ্য রোগ উপস্থিত হইয়াছে! যাঁহারা কামনা করিতেন, "আমি রাজ্য চাহি না—স্বর্গ চাহি না—মোক্ষেরও কামনা করি না—কিন্তু দুঃখতপ্ত প্রাণীদের আর্ত্তি দূর করাই আমার একমাত্র কামনা।" এরূপ পবিত্র কামনা জগতের আর কেহ করিতে সমর্থ হন নাই। যাঁহাদের পূর্ব্বজদিগের হৃদয় এরূপ উদার ছিল, তাঁহাদের বংশধরদের মধ্যে এরূপ সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা, অনুদার ভাব কেন উপস্থিত হইল? স্পর্শাস্পর্শ রুগ্নের জন্য,—দুঃস্থের জন্য। দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে সময় সময় মানুষ অস্পৃশ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা সকল সময়ের জন্য নহে। অত্যুৎকট অস্পৃশ্যতা আমাদের জাতীয় অভ্যুদয়ের পরিপন্থী। আমাদের অজ্ঞতা, আমাদের দরিদ্রতা, আমাদের সহানুভূতিশূন্যতা এই "অছুঁত" রোগকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। যে দিকে দেখি, সেই দিকেই দেখিতে পাই, আমরা শ্রীভগবানের পবিত্র আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি অবহেলা করিয়াছি, আমরা ভগবান্-দ্রোহী হইয়াছি। যদি সাম্যে আমাদের আস্থা থাকিত, তাহা হইলে আমরা দারুণ দুরবস্থায় আপতিত হইতাম না। আমাদের বিরাট অজ্ঞতার কথা ভাবিয়া দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ি। যে সময় আমাদের অঙ্গস্বরূপ—আমাদের ভিত্তিস্বরূপ—আমাদের প্রাণস্বরূপ "অছুঁতেরা" অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, সে সময় সে আমাদের নিকট হইতে সম্মানপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

গত মোপলা-বিদ্রোহের পর হিন্দুদের দুরবস্থা দেখিবার জন্য আমি মালাবার অঞ্চলে গমন করিয়াছিলাম। তথায় যে সকল অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, আমরা হিন্দুরা অল্পকালের মধ্যে তাহা ভুলিয়া যাই ও ভুলিয়া গিয়াছি। একটি ক্ষুদ্র ঘটনা আমি আপনাদের নিকট উল্লেখ করিব। এক জন থিয়া—সে দেশে অস্পৃশ্য (আমাদের দেশের শিউলী) আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট লড়াই, করিয়াছিল। মোপলা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া সে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। সে মুসলমান হইয়া ঘোরতর বিক্রমে হিন্দু ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। আমরা তাহাকে ঘৃণা করিয়া কালাপাহাড় নামে অভিহিত করিয়া থাকি। ভারতের সর্ব্বত্র এইরূপ কালাপাহাড়ের সংখ্যা যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাতে দেশে কালাপাহাড়ের আবির্ভাব না হয়, তাহার জন্য আমরা কি করিয়াছি? উত্তরে শুনিতে পাইব, কিছুই করি নাই, প্রত্যুত যাহাতে কালাপাহাড়ের দল বৃদ্ধি পায়, তাহাই আমরা করিয়া আসিতেছি।

আর একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বিবৃত করিব, ইহা জীবিত ব্যক্তির কথা। মহাভাগ শিবাজী দুর্গম রায়গড় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া দুর্গের দুর্গমতম প্রদেশে পতাকা উত্তোলনের জন্য বীরবৃন্দকে আদেশ করেন। যিনি ইহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি টাকার পুঁটুলী আর সর্ব্বজনস্পৃহণীয় শিবাজীর আলিঙ্গন লাভে সমর্থ হইবেন। যখন এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে কেহ অগ্রসর হইল না, তখন এক জন মহাড় করযোড়ে দূর হইতে কহিল, "প্রভু যদি আজ্ঞা করেন, তাহা হইলে এ সেবক একবার চেষ্টা করে।" গুণদর্শী শিবাজী সাদরে মহাড়ের বাক্য অনুমোদন করেন। মহাড় সকলের সম্মুখে দুর্গের দুর্গমতম প্রদেশ দিয়া উপরে আরোহণ করিয়া পতাকা উড্ডীন করে। উপর হইতে প্রত্যাগমনের পর শিবাজী অস্পৃশ্য মহাড়কে ধন আর সকল ধনের শ্রেষ্ঠ ধন—সকলের আকাঙ্ক্ষিত ধন আলিঙ্গন প্রদান করিয়া মহাড়কে ধন্য করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি গো-ব্রাহ্মণ আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। শিবাজী জানিতেন, জগতে কেহই অযোগ্য নহেন। তিনি দীর্ঘদৃষ্টিসম্পন্ন যোজক ছিলেন। শিবাজী এই অচ্ছুঁতদের সহায়তায় নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এক বিশালশক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডচ, পর্ত্তুগীজ, ইংরাজ প্রভৃতির ভীতি ও শান্তিপ্রদ হইয়াছিলেন। জলে ও স্থলে সর্ব্বত্র সাম্যের বিজয়বৈজয়ন্তী উড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এরূপ উদার উদাহরণ আমাদের সম্মুখে থাকিতেও যদি জাতির কল্যাণের জন্য আমরা অন্ধের ন্যায় অবস্থান করি, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল কোথায়?

৪

শুদ্ধি বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের জীবন-মরণের প্রশ্ন। এ প্রশ্ন বহুকাল হইতে আমাদের সমাজে আলোচিত হইয়া আসিতেছে। অতি পুরাকালে সুকেশী আদি রাক্ষসগণ ব্রাহ্মণগণের সদাচার

দেখিয়া ব্রাহ্মণভক্ত হইয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ ভারতীয় সভ্যতা-বিস্তারের জন্য দেশদেশান্তরে গমন না করিয়া পৈতৃক গৃহে গৌরবের সহিত সকল শাস্ত্র অধ্যাপনা করিলেও তিনি গ্রাম্যজন বলিয়া উপেক্ষার পাত্র হইতেন। বেদব্যাস বলেন—

"অপি চ জ্ঞানসম্পন্নঃ সর্ব্বান্ বেদান্ পিতুর্গৃহে।
শ্লাঘামাণ ইবাধীয়াৎ গ্রাম্য ইত্যেব তং বিদুঃ॥"

ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র গমন করিয়া ভারতীয় সভ্যতা প্রচার করিয়াছিলেন। রাক্ষসরাজ সুকেশী, ব্রাহ্মণ-অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম প্রজাগণকে গ্রহণ করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করেন। কবে তিনি প্রজাগণকে এই আজ্ঞা প্রদান করেন, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু ত্রয়োদশী তিথিতে যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত আছি।

"ততঃ সুকেশী দেবর্ষে গত্বা পুরমনুত্তমম্।
সমাহূয়াব্রবীৎ সর্ব্বান্ রাক্ষসান্ ধার্ম্মিকং বচঃ॥
অহিংসা সত্যমস্তেয়ঃ শৌচমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
দানং দয়া চ ক্ষান্তিশ্চ ব্রহ্মচর্য্যমমানিতা॥
শুভা সত্যা চ মধুরা বাঙ্ নিত্যং সৎক্রিয়ারতিঃ।
সদাচারনিষেবিত্বং পরলোকপ্রদায়কাঃ॥
ইত্যাচুর্মুনয়ো মহ্যং ধর্ম্মমাদ্যং পুরাতনম্।
সোঽহমাজ্ঞাপয়ে সর্ব্বান্ ক্রিয়তামবিকল্পতঃ॥
ততঃ সুকেশিবচনাৎ সর্ব্ব এব নিশাচরাঃ।
ত্রয়োদশাংশতো ধর্ম্মং চক্রুর্মুদিতমানসাঃ॥"

ইহা হইল পৌরাণিক কথা।

অনেক গ্রীক ভারতীয় সংসর্গের ফলে ভারতীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা শিলালেখ পাঠে অবগত হইয়া থাকি।

ভারতের ধনরত্নের লোভে বহু জাতি আমাদের দেশে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কুষণরা অনেক দিন প্রবল-প্রতাপের সহিত রাজত্ব করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে—

"হুষ্ক-জুষ্ক-কনিষ্কাখ্যাস্ত্রয়স্তত্রৈব পার্থিবাঃ।
স বিহারস্য নির্ম্মাতা জুষ্কো জুষ্কপুরস্য যঃ॥
তে তুরুষ্কান্বয়োদ্ভূতা অপি পুণ্যাশ্রয়া নৃপাঃ।
শুষ্কলেত্রাদিদেশেষু মঠ চৈত্যাদি চক্রিরে॥"

শুদ্ধির প্রভাবে হুষ্ক, জুষ্ক, কনিষ্ক প্রভৃতি রাজারা ভারতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বহু বিহার—মঠ—চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই বংশে বাসুদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার নামই শুদ্ধির মহিমা চিরকাল স্মরণ করাইয়া দিবে।

প্রচীনকালে গান্ধার দেশের দীর্ঘদর্শী ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধি-কার্য্যে খুব নিপুণতা দেখাইয়াছিলেন।

পুরাণপাঠে আমরা অবগত হই, "মিশ্রদেশবাসীরা কাশ্যপ-গোত্রীয়দের অনুশাসনে শাসিত হইতেন।"

বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকেরা দূরতর প্রদেশে গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা আপনাদের সুবিদিত কথা।

জাপানের প্রাচীন রাজধানী নারাতে এক জন বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক ব্রাহ্মণ বহু দিন অবস্থান করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। সে সময়ের জাপানাধিপতি মঠস্থাপনের জন্য জায়গীর প্রদান করেন। জাপান-বাসীরা এখনও ভক্তির সহিত সে কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

এক জন ভরদ্বাজগোত্রীয় মৌনী ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপ্রচারের অপূর্ব্ব কাহিনী আপনাদের কাছে উল্লেখ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে তিনি চীনদেশে গমন করেন, তথায় তিনি একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া সাধন-ভজনে নিরত থাকিতেন। এই অদ্ভুত পুরুষের অদ্ভুত কথা কালক্রমে সম্রাটের কর্ণগোচর হয়। সম্রাট্ ভারদ্বাজকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। বিষয়বিরক্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার আশ্রম পরিত্যাগে অস্বীকৃত হইলে—সম্রাট্ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে দর্শন করিতে গমন করেন। তিনি বহু সৈন্য ও বিদ্বানগণ সহ সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে গমন করেন। সম্রাট্ কুটিরদ্বারে উপস্থিত হইলেও ভারদ্বাজের কোনরূপ নিয়মভঙ্গ হইল না।

কমললোচন ভারদ্বাজ কুটিরদ্বারে যথাসময়ে উপস্থিত হইলে, সম্রাট্ তাঁহার পূজা করিয়া কিছু উপদেশ প্রদান করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। ভিত্তিনিরীক্ষক, ভারতীয় পণ্ডিত কমললোচন—চীন ও জাপানীগ্রন্থে বর্ণিত লাক্ষণিক নামযুক্ত ভারদ্বাজ এরূপ তন্ময়তা, এরূপ একাগ্রতা, এরূপ ভক্তি ও অসাধারণ শক্তির সহিত তাঁহার আরাধ্য গ্রন্থ প্রদক্ষিণ করেন যে, সম্রাট্ সমস্ত জনগণ সহ ভারদ্বাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এরূপ ভাবে ধর্ম্ম-প্রচার পৃথিবীর ধর্ম্ম-প্রচারের ইতিহাসে অতুলনীয়।

আপনারা হুণ মিহিরকুলের নামের সহিত পরিচিত আছেন। এরূপ ভীমকর্ম্মা রাজা পৃথিবীতে অতি অল্পই উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার কথায় ইতিহাস বলেন:—

"দিবারাত্রং হতপ্রাণিসংস্রপরিবারিতঃ।
যোঽভূদ্ভূপালবেতালো বিলাসভবনেষ্বপি॥"

এরূপ ঘোর নৃশংস রাজাও দীর্ঘদর্শী গান্ধার দেশীয় ব্রাহ্মণের প্রভাবে আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,

তখন "হিন্দু নাম আমরা প্রাপ্ত হই নাই। তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয় এই গান্ধার দেশে; পাণিনি প্রভৃতি মনীষিগণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে, মিহিরকুল, মিহিরেশ্বর নামে শিব স্থাপন করিয়াছিলেন।

"হোলাড়ায়াং স মিহিরপুরাখ্যং পৃথুপত্তনম্।
অগ্রহারগ্রগৃহিরে গান্ধারা ব্রাহ্মণাস্ততঃ॥"

মিহিরকুল সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, আর গান্ধারদেশের ব্রাহ্মণগণ তাঁহার প্রদত্ত অগ্রহারসকল গ্রহণ করিয়াছিলেন। উদার-প্রকৃতির ব্রাহ্মণের প্রভাবে হূণ, শক প্রভৃতি আর্য্য আচার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা যদি আগ্রহের সহিত শুদ্ধিকার্য্য চালনা করিতেন, তাহা হইলে আজ পাঞ্জাবের জনসংখ্যা অন্যরূপে দর্শিত হইত।

মহারাষ্ট্রীয়রা যখন হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করেন সে সময়ও তাঁহাদের মধ্যে শুদ্ধি-প্রশ্ন উঠিয়াছিল। দীর্ঘদর্শী অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন রামশাস্ত্রী, পর্ত্তুগীজ-পীড়িত পরধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া স্বজাতির মধ্যে লইবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। যে জাতি পুত্র-কন্যাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া শুদ্ধির পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে, সে ক্লীব জাতির কখনও মঙ্গল হইতে পারে না। সংকীর্ণতা ও ক্লীবত্ব পরিত্যাগ করিয়া জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হউন।

বিপুল জনসংখ্যা জাতির অস্তিত্বরক্ষার সহায়তা করিয়া থাকে। অনেক জাতি নানাসদ্গুণ-সম্পন্ন হইয়াও জনসংখ্যার স্বল্পতার জন্য পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা ইতিহাস-পাঠে অবগত হই। প্রচারককে অনুদ্বেগকর হইতে হইবে—অলি যেরূপ অনুদ্বেগকর হইয়া পুষ্পকে অধীন করিয়া পুষ্পরস সংগ্রহ করিয়া থাকে। প্রচারককে এই প্রাচীন ভারতীয় প্রথা অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে। তাহা হইলে তিনি সফলতা লাভ করিবেন।

৫

শিক্ষার অভাব। এ দেশের অবস্থা এক দিন এরূপ ছিল, যখন এ দেশের রাজা মুক্তকণ্ঠে বলিতেন, 'আমার দেশে অবিদ্বান্ নাই।" সকলেই আপন আপন বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইতেন। আমাদের লৌহকারগণ এরূপ লৌহ প্রস্তুত করিতেন, অতি প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীর বাজারে সম্মানের সহিত তাহা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। এইরূপ বস্ত্রশিল্পে—রঙ্গের কার্য্যে—নৌনির্ম্মাণ ও চালনায়—ভাস্করকার্য্যে—স্থাপত্য ও কৃষিবিজ্ঞানে দেশের কারুকরগণ অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন দেশ, কাল ও অবস্থা অনুসারে দেশবাসীকে শিক্ষা দিতে হইবে। আবার শুভদিন আসিবে। পুরাকালে ব্রাহ্মণরা সকল বিষয়েই তাঁহাদের অসাধারণ প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন। কারুকরগণ তাঁহাদের শিক্ষায় দীক্ষিত হইয়া ভারতের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন।

কৃষিকার্য্যে ভারতের অধিকাংশ ব্যক্তি জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। রাজর্ষি জনক কৃষি-কার্য্য করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে ক্ষেত্র অকর্ষিত অবস্থায় পতিত থাকিলেও আমরা লাঙ্গল চালনা করি না। অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইব, তাহাও স্বীকার, তথাপি কৃষিকার্য্য করিব না; আমাদের এ অজ্ঞতা, কুসংস্কার দূর না করিলে আমাদের গৃহ ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হইবে না। এ কুসংস্কার দূর করিবার জন্য আমাদের সকলকে সচেষ্ট হইতে হইবে। এক সময় কাশ্মীরে অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। মহারাজা রণবীর সিং রাজকুমারগণকে লাঙ্গল-চালনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত রাজ-কুমারগণ যে পর্য্যন্ত না বারিবর্ষণ হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত কর্ষণ-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। প্রচুর বারি-বর্ষণের সহিত রাজকুমাররা শ্রান্তি লাভ করেন। অলস ও বচনসর্ব্বস্ব হইলে নেতৃত্বপদ সুদৃঢ় রাখা সম্ভবপর হয় না।

৬

আমরা রুগ্ন, অলস ও বিলাসী হইয়াছি। আলস্য মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অনলসের কাছে লক্ষ্মীর দ্বার অনর্গল—অনলস ব্যক্তি সর্ব্বদাই উপকরণসম্পন্ন; অনলস কখন নিজেকে অসহায়, একাকী, দুর্ব্বল, অসমর্থ বিবেচনা করেন না। যে কোন কঠিনতম কার্য্য উপস্থিত হউক না কেন, তিনি অবিচলিত হইয়া অভীষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বাধা প্রাপ্ত হইলে তাঁহার শক্তি সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হয়। হে ভগবন্! দেশের যুবকগণকে সদ্‌গুণমণ্ডিত করুন,—যেন তাহাদের বিশাল হৃদয়ে ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, আবিলতা প্রবেশলাভ করিতে না সমর্থ হয়। তাহারাই দেশের আশা-ভরসা, গৌরব। প্রাচীন শিলালেখের সহিত আমি বলিব, "অনুরাগযুক্ত হইয়াও যেন শত্রু তোমার পৃষ্ঠদেশ, আর পর-স্ত্রী তোমার বক্ষঃস্থল দর্শন করিতে সমর্থ না হয়।" নূতন হিন্দু, জগতে নূতন যুগ আনয়নে সহায়ক হউক। হৃদয়ে ও বাহুতে অলৌকিক শক্তি আসুক। ইহার সাধনায় তোমরা নিযুক্ত হও।

৭

মাতৃজাতি। আমাদের ভারতীয় সভ্যতার বিস্তারপক্ষে মাতৃ-জাতির প্রযত্ন কম ছিল না। সময় উপস্থিত হইলে তাঁহারা অকাতরে স্বামি-পুত্র দেশের কল্যাণ-কল্পে উৎসর্গ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাঁহাদের কুসুম-কোমল হৃদয় তখন বজ্র অপেক্ষা কঠোরতা ধারণ করিত। এক সময় অসুর প্রপীড়িত ভারতীয় সভ্যতাবিস্তারের জন্য প্রযত্নশীল মুনিকে রক্ষা করিতে গিয়া এক রাজকুমার নিহত হইয়াছিলেন। রাজা এই নিদারুণ সংবাদ মহারাণীকে প্রদান করেন। তখন তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অধঃপতিত আমাদের হৃদয়ে সুবর্ণ অক্ষরে অঙ্কিত থাকা উচিত। মহারাণী বলেন—"হে রাজন্! মুনি-পরিত্রাণকালে আমার পুত্র নিহত হইয়াছে শুনিয়া আজ আমি যেরূপ সুখী

হইয়াছি, আমি আমার মাতা-ভগিনী দ্বারা সেরূপ সুখ প্রাপ্ত হই নাই। যাহারা শোচনীয় বান্ধবগণের জন্য ব্যাধিক্লিষ্ট হইয়া অতি দুঃখে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদিগের জননী বৃথা পুত্রের জননী। যাহারা গো-দ্বিজ-রক্ষণ-সংগ্রামে নির্ভয়চিত্তে যুদ্ধ করিতে করিতে শস্ত্রক্ষুণ্ণ হইয়া বিপন্ন হয়, তাহারাই পৃথিবীতে মানুষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। প্রার্থী, মিত্র এবং শত্রুগণ যাহার নিকট পরাঙ্মুখ হয় না, তাহার দ্বারাই পিতা পুত্রবান্ আর মাতা বীরপ্রসবিনী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের গর্ভক্লেশ তখনই সফলতা লাভ করে, যখন পুত্র সমরবিজয়ী হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন অথবা যুদ্ধস্থলে বীরগতি প্রাপ্ত হন।"

"ন মে মাত্রা ন মে স্বস্রা প্রাপ্তা প্রীতির্নৃপেদৃশী।
শ্রুত্বা মুনিপরিত্রাণে হতং পুত্রং যথা ময়া॥
শোচতাং বান্ধবানাং যে নিশ্বসন্তোঽতিদুঃখিতাঃ।
ম্রিয়ন্তে ব্যাধিনা ক্লিষ্টাস্তেষাং মাতা বৃথাপ্রজা॥
সংগ্রামে যুধ্যমানা যেঽভীতা গোদ্বিজরক্ষণে।
ক্ষুণ্ণা শস্ত্রৈর্বিপন্নাস্তে ত এব ভুবি মানবাঃ॥
অর্থিনাং মিত্রবর্গস্য বিদ্বিষাঞ্চ পরাঙ্মুখম্।
যো ন যাতি পিতা তেন পুত্রী মাতা চ বীরসূঃ॥
গর্ভক্লেশঃ স্ত্রিয়ো মন্যে সাফলং ভজতে তদা।
যদারিবিজয়ী বা স্যাৎ সংগ্রামে বা হতঃ সুতঃ॥

ভারতের এক মহীয়সী মহিলা প্রার্থনা করিতেন, ভারতের কোন রমণী যেন ক্রোধহীন, উৎসাহ-বিহীন, নির্বীর্য্য, অরিনন্দন পুত্র প্রসব না করেন।

"নিরমর্ষং নিরুৎসাহং নির্বীর্য্যং অরিনন্দনম্।
মাস্ম সীমন্তিনী কাচিৎ জনয়েৎ পুত্রমীদৃশম্॥"

মাতারা এরূপ ভাবে শিক্ষিতা হইতেন বলিয়া তাঁহাদের পুত্রেরাও জাতির গৌরব বর্দ্ধন করিতে সমর্থ হইতেন।

এরূপ ভাবে শিক্ষিত যুবকরাও প্রতিজ্ঞা করিত—

"এষা হি মে রণগতস্য দৃঢ়া প্রতিজ্ঞা
দ্রক্ষ্যন্তি যন্ন রিপবো জঘনং হয়ানাম্।
যুদ্ধেষু ভাগ্যচপলেষু ন মে প্রতিজ্ঞা
দৈবং যদিচ্ছতি জয়ং পরাজয়ং চ॥

হিন্দু নারীর হৃদয় হইতে এ পবিত্র ধারা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, অল্প চেষ্টাতেই এই প্রসুপ্ত অবস্থা তিরোহিত হইবে।

পারস্য, তুরস্ক, আফগানস্থান সকলেই জড়তা পরিত্যাগ করিতেছেন বা করিয়াছেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্র নবযুগের সাড়া পরিলক্ষিত হইতেছে—সে দেশেও এই জাগরণের পরিপন্থী মোল্লাজাতীয় পুরুষেরা, তাহারা শক্তিহীন হইতেছেন—আমাদের সমাজে ও আমাদের অন্নে পরিপুষ্ট এরূপ মোল্লা-জাতীয় পুরুষের অভাব নাই। দেশের লোক বুঝিয়াছেন, এই সকল কূপমণ্ডুকের প্রভাব দেশে আর নাই।

৮

কানু বিনা যেরূপ গান নাই, সেইরূপ সংগঠন ব্যতীত হিন্দুসভাই হইতে পারে না। পতিত জাতির অভ্যুদয় সংগঠন ব্যতীত হইতে পারে না। সমাজকে সুশ্রীসম্পন্ন করিতে হইবে—সমাজের যাহা কিছু বিরূপতা, তাহা দূর করিতে হইবে। সমাজের সকলে যেন একতন্ত্রীতে আবদ্ধ থাকে। কন্যাকুমারীতেই হউক বা কোহাটেই হউক, হিন্দু পীড়িত হইলে যাহাতে সমগ্র দেশের সকল হিন্দু পীড়া বোধ করেন, সেই ভাব আনয়ন করিতে-হইবে। এ ভাব তখনই আসিবে—যখন হিন্দু হিন্দুকে মমত্ব-বুদ্ধিতে দেখিবে। যখন আমরা পশু-পক্ষীর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখিতে পাই, তাহারা পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন। একটা কাক যদি শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় অথবা তাহার পুত্র-কন্যা অপহৃত হয়, সে সময়ের দৃশ্য ত আপনারা অনুদিন প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কাকের শব্দে সকল কাক সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া একত্র হয়। চঞ্চু ও নখ দিয়া আক্রমণকারীকে বিব্রত ও উত্যক্ত করিয়া থাকে। আক্রমণকারী তখন বাধ্য হইয়া সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এ দৃশ্য আমরা সকল সময় প্রত্যক্ষ করিতেছি। এক জন হিন্দু বিপন্ন হইলে যাহাতে সমস্ত হিন্দুসমাজ ব্যথিত হয়, বিক্ষুব্ধ হয়, তাহার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়, সেইরূপ শিক্ষায় দীক্ষিত হইতে হইবে। এরূপ হইলে বুঝিতে হইবে, হিন্দুসমাজে প্রাণ আসিয়াছে—শক্তি আসিয়াছে।

৯

অতি প্রাচীনকাল হইতে শাস্ত্র আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, "কখন মানুষের স্তুতি করিও না।" আত্মপ্রবঞ্চনা না করিয়া বলুন দেখি, আমরা কয় জন সে অনুশাসন পালন করি? শাস্ত্র বলেন, "পরের ভূমিতে পিতৃগণের শ্রাদ্ধক্রিয়া করিও না।" বলুন দেখি, আমরা কয় জন শাস্ত্রের সে আদেশ পালন করিতে সমর্থ হই? শাস্ত্র বলেন, "ম্লেচ্ছ রাজ্যে বাস করিও না।" আমি জিজ্ঞাসা করি, আমাদের মৃত তথাকথিত হিন্দু ইহার কি উত্তর দিবেন? শাস্ত্র বলেন, "পরাধীন ব্যক্তি নিত্য সূতকগ্রস্ত।" অশুচির দ্বারা কি কোন কার্য্য হইতে পারে? যখন হিন্দু জীবিত ছিল, চাটুকারের

জাতিতে পরিণত হয় নাই, তখন ইহার বাক্যের মূল্য ছিল। হিন্দুর দেশ যখন হিন্দুর ছিল, তখন ইহাদের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মকার্য্য ফলপ্রদ হইত। নদীর তটে যাহার বাস, পরের ভূমিতে যাহার অবস্থান, সেই নিত্য উদ্বিগ্ন ব্যক্তির শান্তি কোথায়? ব্রাহ্মণ! তোমার সে তপস্যার বল—আর সে ধনুর্ব্বাণ কোথায়? যাহার দ্বারা তুমি জগতে শান্তিস্থাপন করিতে। ব্রাহ্মণ! তুমি যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে তখন তোমার এক হস্তে দণ্ড ও অপর হস্তে কমণ্ডলু অবস্থান করিত—উভয়ই শান্তির প্রতীক ছিল। আবার আবশ্যক হইলে ঢাল-তরবারি গ্রহণ করিয়া জগতের অশান্তি দূর করিতে। তোমার সে মধুরতাপূর্ণ উগ্র মূর্ত্তি কোথায়? আমার দৃঢ় ধারণা, তোমরা সমদর্শী হইলে, তোমরা নিজেদের শক্তির সহিত পরিচিত হইলে স্বরাজসংস্থাপনে সমর্থ হইবে। তাই বলি, এই মূর্চ্ছিত জাতির চৈতন্যসম্পাদনের পরিপন্থী হইও না। এখন বর্ণও নাই, আশ্রমও নাই। স্বরাজ্যসিদ্ধির পর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থা করিও।

১০

জগতে আমাদের বড় অনুকূল সময় উপস্থিত হইয়াছে। সুবায়ু প্রবাহিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ সুযোগ যদি আমরা গ্রহণ না করি, তাহা হইলে কি আমরা বিপৎসমুদ্র পার হইতে সমর্থ হইব? পারস্য, আফগানিস্থান প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশবাসীও জাগরিত হইয়াছে। ভগবান্ বুদ্ধদেবের চরণাশ্রিত চীন চণ্ডু ছাড়িয়া এখন মুণ্ডু লইয়া খেলা করিতেছে। তাহার হুঙ্কারে গগন-পবন ধরণী কম্পিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য পশ্চিমদেশবাসীরা "সমর পরিহার" করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। ক্ষেত্র কর্ষিত হইতেছে, বিশ্ববাসী "সমর-পরিহার" "সমর পরিহার" মন্ত্রের সহিত পরিচিত হইয়া বাস্তবিকই তাহারা সমর-পরিহারের ভক্ত হইয়া পড়িবে। তখন সমগ্র পৃথিবীর মানব-শক্তি সমর পরিত্যাগ করিয়া সত্য সত্যই জগতে সাম্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবে।

এই শুভদিনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, বহুদিনের নিপীড়িত হিন্দু তুমি, তোমার আধ্যাত্মিক রাজ্যের ত্যক্ত সিংহাসন অধিকারের জন্য প্রস্তুত হও। শুদ্ধির জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ কর—অস্পৃশ্যতা পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের শক্তিকে সুদৃঢ় কর—সংগঠনের দ্বারা অরাতিগণের অপরাজেয় হও। আর যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কারের প্রয়োজন, তাহা দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া করিতে হইবে। উপাসনা দ্বারা মানসিক শক্তিসম্পন্ন হইতে হইবে। নিয়মিত ব্যায়াম দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে শারীরিক শক্তিসম্পন্ন হইতে হইবে। ভোজন-সংযম দ্বারা উভয় শক্তি সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। ভোজনাদি-সংযমের ফলে রোমক ও পারসিকরা পুরাকালে জগতে অজেয় হইয়াছিল। গোপালন করিতে হইবে, ইহার ফলে জাতির নষ্ট স্বাস্থ্য বিদূরিত হইবে।

স্বরাজ বা মুক্তি প্রত্যেক হিন্দুর ঈপ্সিত বিষয়। এ জন্য চরিত্রবান্ হইতে হইবে, নিজের

মহিমায় বিরাজিত হইতে হইবে। তবে আমরা স্বরাজের অধিকারী হইব। ভ্রষ্টচরিত্র ইহা আনয়ন করিতে সমর্থ হয় না। স্বরাজ আমাদের ধ্যান ধারণার বিষয় হউক। স্বরাজ আমাদের জাগরণে চিন্তার বিষয় হউক, স্বরাজই আমাদের সকল অভীষ্টপূরণের সহায়ক হইবে। ইহার প্রাপ্তিতে নানা বিঘ্ন আছে। দৃঢ়ব্রত হইতে হইবে। কবি যথার্থ বলিয়াছেন ;—

রত্নৈর্মহার্হৈস্তুতুষুর্ন দেবা ন ভেজিরে ভীমবিষেণ ভীতিম্।
সুধাং বিনা ন প্রযযৌ বিরামং ন ঈপ্সিতার্থাৎ বিরমন্তি বীরাঃ॥

তবে আমরা স্বরাজলাভে সমর্থ হইব।

১১

শেষ কথা বা সর্ব্বপ্রধান কথা। কোন্ শক্তির প্রভাবে এই দারুণ দুর্দ্দশাতেও আমরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি ? তাহার সহিত আমাদের পরিচিত হইতে হইবে। নানাপ্রকার বিপ্লব, নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থা, নানাপ্রকার লোমহর্ষণ অত্যাচার সহ্য করিয়াও কোন্ শক্তির প্রভাবে মুমূর্ষু সম অবস্থাতেও সন্তুষ্টচিত্তে নিজেদের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকি ? এই সহনশীলতার জন্য—এই উদ্যম-হীনতার জন্য ইহলোকসর্ব্বস্ব ব্যক্তিদের কাছে অনেক সময় আমরা উপহসিত হইয়া থাকি। গত পাবনা-বিপ্লবের সময় আমার জাতির প্রতীকস্বরূপ, সাহা জাতির একজন অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে যখন উত্তম পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া "কলমা" পড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছিল, সে সময় পুলিস অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া তাহার উদ্ধার-সাধন করে। সে সময় তিনি "সবই কেষ্টর ইচ্ছা" বলিয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। যে জাতি বিষম বিপদেও চিত্তের স্থৈর্য্যবিচ্যুত হয় না—ভগবানে সমস্ত অর্পণ করিয়া অবিকৃতবদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, সে জাতির অস্তিত্ব কখন পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইতে পারে না।

আমার জাতির ইহাই হইল প্রাণ—ইহাই আমার আত্মা। এই প্রাণের সহিত পরিচিত হইতে হইবে—এই আত্মার সাক্ষাৎ-কার লাভ করিতে হইবে। ইহাই আমাদের জাতির বিশিষ্টতা। হে ভগবান্! যেন আমরা এই বিশিষ্টতা হইতে বঞ্চিত না হই।

তাই অমর সাধক বলিয়াছেন :—

লব্ধা বিদ্যা রাজমান্যা ততঃ কিং
প্রাপ্তা সম্পৎ প্রাভবাঢ্যা ততঃ কিম্।
যুদ্ধে শত্রুনির্জ্জিতো বা ততঃ কিং
যেন স্বাত্মা নৈব সাক্ষাৎকৃতোঽভূৎ॥

ভূপেন্দ্রত্বং প্রাপ্তমুর্ব্ব্যাং ততঃ কিং
দেবেন্দ্রত্বং সংভৃতং বা ততঃ কিম্।
প্রাপ্তশ্চায় পক্ষিবৎ খে ততঃ কিং
যেন স্বাত্মা নৈব সাক্ষাৎকৃতোঽভূৎ ॥

ভক্তদের জয় হউক—হিন্দুর জয় হউক ! *

---

* সন ১৩৩৫ সাল ১৬ই, ১৭ই ভাদ্র এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

মন্তব্য, সংবাদ ও বিবিধ

২৩। ভ্রম-সংশোধন

'পদকল্পতরু', 'অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থের সুযোগ্য ও সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়, আমাদের 'নিত্যলীলা' নামক গ্রন্থের একটি প্রয়োজনীয় অশুদ্ধি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। শ্রদ্ধেয় সতীশ বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই ঠিক্, তাঁহার পত্রখানি নিম্নে মুদ্রিত হইল, পাঠকগণ সংশোধন করিয়া লইবেন।

"বীরভূমি পত্রিকার শ্রাবণের সংখ্যায় "নিত্যলীলা" শীর্ষক প্রবন্ধের ১৫৯ ও ১৬০ পৃষ্ঠায় অষ্টকালের যে সময় ও পরিমাণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে কিছু ভুল ও অসঙ্গতি আছে। নিম্নে উহা প্রদর্শিত হইল।—

(১) প্রবন্ধ-লেখক "নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্ণ ইত্যাদি অষ্টকালের নাম নির্দ্দেশক শ্লোক ও "ঋতু-দণ্ডা অমী কিন্তু তৃতীয়ৌ মাস-দণ্ডকৌ" এই পরিমাণ নির্দ্দেশক শ্লোকার্দ্ধ উর্দ্ধৃত করিয়া 'তৃতীয়ৌ পদের অর্থে তৃতীয়' ও চতুর্থ অর্থাৎ নিশান্ত হইতে গণনায় ৩য় ও ৪র্থ অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্ণ ও মধ্যাহ্ন কাল বুঝিয়া ঐ কাল দুইটীর পরিমাণ প্রত্যেকে ১২ দণ্ড ও বাকি কালগুলির পরিমাণ প্রত্যেকে ৬ দণ্ড ধরিয়া লওয়ায় অষ্টকালের অন্তর্গতি ৫ম অর্থাৎ অপরাহ্ণ কাল সন্ধ্যা ছাড়িয়া, সন্ধ্যা হইতে ৬ দণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যাপী এবং ৬ষ্ঠ অর্থাৎ সায়ং কাল ৬ দণ্ড রাত্রি হইতে রাত্রি ১২ দণ্ড পর্য্যন্ত ব্যাপী হওয়ায়, 'অপরাহ্ণ' ও 'সায়ং' কাল-দ্বয়ের সময়-নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও শাস্ত্রীয় সংজ্ঞার বিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার একমাত্র সুমীমাংসা (২) দফায় লিখিত হইল।

(২) শাস্ত্রে "নিশান্তঃ প্রাতঃ" ইত্যাদি বীরভূমির উদ্ধৃত শ্লোকের অব্যবহিত পরে এবং "ঋতু দণ্ডা" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকার্দ্ধের পূর্ব্বে এই অতি প্রয়োজনীয় শ্লোকার্দ্ধ দৃষ্ট হয়, যথা—

"চত্বারোঽহ্নি প্রাতরাদ্যা
এবাং শেষা নিশি স্মৃতাঃ ॥"

অর্থাৎ নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সায়ং, প্রদোষ ও নক্ত—এই অষ্টকালের মধ্যে প্রাতঃ প্রভৃতি চারিটি কাল অর্থাৎ ১। প্রাতঃ ২। পূর্ব্বাহ্ণ, ৩। মধ্যাহ্ন ও ৪। অপরাহ্ন—এই চারিটি কাল দিবার এবং সায়ং প্রভৃতি চারিটি কাল অর্থাৎ ১। সায়ং, ২। প্রদোষ, ৩। নক্ত ও ৪। নিশান্ত—এই চারিটি কাল রাত্রির অন্তর্গত। শাস্ত্রকার "তৃতীয়ৌ" পদের দ্বারা 'নিশান্ত হইতে গণণায় আটটী কালের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ কাল অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্ণ ও মধ্যাহ্ন কাল বুঝান নাই,— তিনি "তৃতীয়ৌ" পদের পূর্ব্বোক্ত দিবা ও রাত্রির পৃথক্ পৃথক্ কাল চতুষ্টয়ের মধ্যে দুইটী তৃতীয় অর্থাৎ দিবার তৃতীয় (অর্থাৎ 'মধ্যাহ্ন') এবং রাত্রির তৃতীয় (অর্থাৎ 'নক্ত') কাল দুইটীকে বুঝাইয়াছেন। স্বভাবতঃই দিবা মধ্যাহ্ন ও নক্ত অর্থাৎ মধ্য-রাত্র কালদ্বয় প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্ণ প্রভৃতি হইতে সুদীর্ঘ প্রতীত হয়; সুতরাং ঐ দুইটী কালের পরিমাণ ১২ দণ্ড ও বাকি সমস্ত কালের পরিমাণ ৬ দণ্ড নির্দ্দেশ করা খুব সঙ্গত হইয়াছে এবং এইরূপ কালবিভাগ দ্বারা অপরাহ্ণ-কালটী রাত্রি ভাগে খণ্ডিত না হওয়ায় প্রত্যক্ষ বিরোধ বা অস্বাভাবিকতা ঘটে নাই।

(৩) "নিশান্ত" কালটা রাত্রির শেষ ভাগে পতিত হইলেও—কি জন্য অষ্ট-কালীয় লীলার বর্ণনা, উহা হইতেই আরম্ভ করা হয়—এই অনালোচিত ও দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের আলোচনা এখানে বাহুল্য ভয়ে প্রদর্শিত হইল না। মৎসম্পাদিত পদকল্পতরুর (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ) ৪র্থ খণ্ডের ১৩৭ পৃষ্ঠার পাদ-টীকায় উহার আলোচনা দ্রষ্টব্য।"

২৪। বীরভূম-বিবরণ

দুইজন সুপরিচিত ও প্রতিভাসম্পন্ন বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর। ইঁহাদের পরিচয় এতদিন জানা ছিল না। "বীরভূম-বিবরণ" গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে এ-সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে। ইঁহারা দুই সহোদর, কাঁদড়ার মঙ্গল ঠাকুরের বংশধর। "রাধে জয় রাজপুত্রি, মম জীবন-দয়িতে" এই পদটি কাহার? শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছিলেন বদনের, আর 'বীরভূম-বিবরণ'-সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন ইহা শশিশেখরের। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক সভায় বাদানুবাদ হইয়াছিল, পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধও বাহির হইয়াছিল। "ভক্তিপ্রভা" পত্রিকায় "নায়িকা-রত্নমালা" নামক এক অপ্রকাশিতপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে,

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ঐ গ্রন্থের সম্পাদক, ভূমিকায় তিনি স্বীকার করিয়াছেন, ঐ পদটি শশিশেখরের। অনেকে জিদ করিয়া স্বীকার করেন না। এই স্বীকারোক্তিতে আমরা আনন্দিত হইলাম। 'বীরভূম-বিবরণ' গ্রন্থে সাহিত্যের, সমাজের এবং রাজনীতির ইতিহাসের অনেক নূতন সংবাদ আছে। এই সব সংবাদ একত্র করিয়া একখানি পৃথক্‌গ্রন্থ করা প্রয়োজন এবং সেই গ্রন্থখানির যাহাতে ভালরূপ প্রচার হয় তাহারও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

২৫। সাহায্য-প্রার্থনা

মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানার অধীন নপুখুর গ্রামে ৺ডুম্‌নীতলা নামক একটি দেবতার স্থান আছে। বহু দূর দেশ হইতে বন্ধ্যা মৃতবৎসা হিন্দুমুসলমান রমণীগণ সন্তানের জন্ম ও জীবিত কামনায় ঐ স্থানে ৺ডুম্‌নীমাতার অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন। বঙ্গে ডোমন ডুম্‌নী নামক যত নরনারী আছেন তাঁহারা সকলেই এই ডুম্‌নীমাতার মানস পুত্র পুত্রী। ৺ডুম্‌নীতলা দেশবাসীর এইরূপ প্রয়োজনীয় স্থান হইলেও যাত্রীগণ তথায় আসিয়া অসাধারণ কষ্টভোগ করিয়া থাকেন। দেবতার স্থানে গৃহাদির কোন ব্যবস্থা না থাকায় সহসা ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি উপস্থিত হইলে যাত্রীগণের বিপদের আর সীমা থাকে না, এই সব অসুবিধা নিবারণ-কল্পে স্থানীয় শিক্ষিত যুবকগণ ১৩৩১ সালে ৺ডুম্‌নীতলা 'আশ্রম-সংস্কার-সমিতি' নামক একটী সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং সেই সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে আশ্রমের পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় ৭/০ বিঘা একখণ্ড জমি ক্রয় করা হইয়াছে, ও আশ্রমের সীমানাভুক্ত সমস্ত জমি কাঁটাতারের বেড়ার দ্বারা ঘেরা হইয়াছে। ১৩৩১ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত আশ্রমে মন্দিরাদি কয়েকটী নির্ম্মিত হইয়াছে। সেবকগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই কার্য্যের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। মালদহ জেলার বুলবুলচণ্ডীর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় এই কার্য্যের উপযোগীতা অনুভব করিয়া ১৩৩২ সালে ৫০০৲ শত টাকা ও লালগোলার মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় সি, আই, ই বাহাদুর ১৩৩৩ সালে ৫০০৲ শত টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থান হইতে সেবকগণ আরও প্রায় ৫০০৲ শত টাকা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এখনও প্রায় ৪০০০৲ সহস্র টাকার কমে আরব্ধ কার্য্য শেষ হইবে না।

এই দেবস্থানটি অতীব প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ। বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে হিন্দু নরনারী অপত্য কামনায় অথবা কামনাসিদ্ধির পূজা দিবার জন্য সর্ব্বদাই এই স্থানে আসিয়া থাকেন। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু-মাত্রেরই এই কার্য্যে সাহায্য করা উচিত। যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ লাহিড়ি, নপুখুর, বেলডাঙ্গা পোঃ, মুর্শিদাবাদ।

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী

১৭—চন্দ্রসখী

[এই অজ্ঞাতনামা প্রাচীন বৈষ্ণবপদকর্ত্তার, আমরা মাত্র একটি পদ প্রাপ্ত হইয়াছি।—ইঁহার কোন পরিচয় অবগত হইতে পারি নাই]

শমন ঔর রমণ মোহে ভুললরে প্রিয়সখি
কি করি উপায় বুদ্ধি বলনা।
এহ দিবস যামিনী হাম কৈছে নিরবাহব
এতহু দুখে হতহু জীউ গেলনা॥
শ্যাম গুণধাম হম পরবাসে হাম পামরী
এ মু' দরশাওব কোন লাজে?
এ দুখ হেরি করুণা করি বিদরে যদি বসুমতী
তবহু হাম পৈঠি তছু মাঝে॥
প্রিয়াকি গূঢ় গরবে হাম কবহু ধরণীতলে
তৃণহি করি কাহুকো নাই গণনা।
অবহু মুঝে ঐছে গতি কা হোয়ল রে সখী
সোহি অভিশাপ মুঝে ফলনা॥
পুন কি ব্রজরাজসুত আওব ব্রজমণ্ডলে
কোই নাই কহত ঝুটবাণী।
চন্দ্র সখী চতুরী যদি যাওএ মথুরাপুরী
আওব কিনা আওয়বে হরি জানি॥

শ্রীশিবরতন মিত্র

বীরভূমি ৯—৭, কার্ত্তিক, ১৩৩৫।

নারদের শ্রীরাধা দর্শন

১। প্রারম্ভে একটি অনুরোধ

দেবাদিদেব মহাদেবকে মহামায়া দেবী ভগবতী একদিন বলিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ, হে করুণাময়, 'মহামোহনরূপী' শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন, আপনার নিকট সেই কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে আছে, দেবীর অনুরোধে মহাদেব এই গুহ্য কথা দেবীর নিকট বলিয়াছিলেন। এই কথা, শ্রীবৃন্দাবনেরও রহস্য-কথা, শিবদুর্গার ন্যায় পতিপত্নীর মধ্যে নিভৃতে ইহার আলোচনা হইয়াছিল। পতি মহাদেব বক্তা, আর পত্নী মহাদেবী শ্রোতা। মহাদেব মহাদেবীর ন্যায় পতিপত্নীর ইহা আলোচনার বিষয়, অনুভবের বিষয়, আস্বাদনের বিষয়। কালের প্রভাবে বা শ্রীভগবানের ইচ্ছায় বা কৃপায়, এই গুপ্ত কথা জন সাধারণের নিকট ব্যক্ত হইয়াছে। ব্যক্ত হইয়া ভালও হইয়াছে, মন্দও হইয়াছে। সংসারের যাবতীয় ব্যাপারেই এইরূপ হইয়া থাকে, ভালও হয়, মন্দও হয়, ইহাতে বিস্ময়ের বা দুঃখের কোন কারণ নাই। যাহার দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভাল হয়, তাহার দ্বারাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মন্দও হইয়া থাকে। যেমন সর্পবিষ, অগ্নি, মন্ত্র, তেজস্কর ঔষধ, যোগসাধনা প্রভৃতি। মন্দ হয়, মন্দ হইয়াছে বা মন্দ হইতেও পারে বলিয়াই কোন জিনিসকে বা ব্যাপারকে মন্দ বলা যায় না, না জানিয়া ব্যবহার করিলে ভাল জিনিসেও মন্দ হয়। "শ্রীরাধার কথা" এই প্রকারের একটি জিনিস। ভারতের অধ্যাত্মসাধনার রাজ্যে এ পর্য্যন্ত যত বিদ্যা, মন্ত্র ও রহস্য আবিষ্কৃত বা প্রচারিত হইয়াছে, 'শ্রীরাধা' তাহার মধ্যে সর্ব্বোত্তম, ইহাই একশ্রেণীর শাস্ত্রকার, সাধু, সিদ্ধ ও সাধকের অভিমত। আবার, বর্ত্তমান কালে এমন অনেক ভাল লোকও আছেন যাঁহারা শ্রীরাধার নাম একেবারেই সহিতে পারেন না, শ্রীকৃষ্ণের কথায়

তাঁহাদের তত বেশী আপত্তি হয়ত নাই, বরং কিছু কিছু অনুরাগ আছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে যখন শ্রীরাধারমণ বা শ্রীরাধাকান্ত বলা যায়, তখন তাঁহারা একেবারেই অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন, অথচ, বর্ত্তমান যুগে, বর্ত্তমান যুগের উপযোগী আকারে শ্রীরাধা-সম্বন্ধে তেমন আলোচনাও যে খুব বেশী হইয়াছে তাহা নহে। সুতরাং এসম্বন্ধে তাড়াতাড়ি কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবেন না, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এক স্বামিস্ত্রীর কথোপকথন আছে। স্বামী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি, আর স্ত্রী মৈত্রেয়ী, উভয়েই তখন পরিণতবয়স্ক, তাঁহাদের গার্হস্থ্যজীবন শেষ হইয়াছে, তখন তাঁহাদের বাণপ্রস্থের সময়। সেই সময়ে প্রেমের তত্ত্ব লইয়া, সংসারের মানবের এই ভালবাসাবাসির ভিতরের গুপ্ত কথাটা কি তাহাই লইয়া তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা হইয়াছিল। এই আলোচনায় মানবের জীবনের যে সমস্ত মৌলিক গুপ্তকথা বীজরূপে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে বা ইঙ্গিতমাত্র করা হইয়াছে, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলায় তাহাই ব্যক্তরূপে পরিস্ফুট ও বিস্তারিত। তরুণেরা ভাবিবেন না যে ইহা তাঁহাদের নহে। ইহা তাঁহাদেরই নিজস্ব। তারুণ্যের কারুণ্যের ও লাবণ্যের একটা অমৃতরূপ বা নিত্যরূপ আছে। সেই ত্রিবিধ অমৃতের ধারা শ্রীরাধার স্নানের উপকরণ। শ্রীরাধার কথা তরুণ ও তরুণীদের নিজস্ব কথা। কিন্তু, তারুণ্য যাহাদের অন্ধ করিয়াছে, ইহা তাহাদের বোধ্যও নহে, উপযোগীও নহে। পরিণত বয়সের দৃষ্টি ও অনুভব যদি তারুণ্যের রসাবেশের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে, তারুণ্যের রসাবেশের স্বরূপ, যাহা নিত্য ও শাশ্বত, এই দৃষ্টি ও অনুভব যদি তাহারই অন্বেষণে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে।

২। প্রকৃতি ও পুরুষ

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি—

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে। ইহাই সত্য, পরম সত্য, চরম সত্য ও সার সত্য। ইহার পরেও কিছু হয়ত আছে, হয়ত বা নাই, কিন্তু তাহা অনুমান, নিছক অনুমান। যাহা বর্ত্তমান বা প্রত্যক্ষ, এমন কি

অপরাধ করিয়াছে যে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া ও অনাদর করিয়া অনুমানের * পূজা করিতে হইবে? অতএব, ইহাই সত্য, শেষ সত্য ও সার সত্য, প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়েই তুল্যরূপে অনাদি।

---

* ভগবান্ কি অনুমান? লীলাবাদী ভক্তের নিকট ভগবান্‌কে অনুমানমাত্র বলিবেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যুগে একদল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এই কথা বলায়, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ এতই ব্যথিত হইয়াছিলেন যে তাঁহারা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে বলিয়াছিলেন, প্রভু আপনি অনুমতি করুন, আমরা গঙ্গায় দেহত্যাগ করি। যে-সমাজে বা যে-দেশে বাস করিলে পণ্ডিতের মুখেও শুনিতে হয় ভগবান্ অনুমান, সে-সমাজে বাস করা অপেক্ষা আত্মহত্যাই শ্রেয়স্কর। ভক্তগণের এই দুঃখের কথা শুনিয়াই শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ্যভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—

করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়ন-গোচর

লীলাবাদী ভক্তেরা বা ভাবুক রসিকেরা বলেন ভগবান্ সম্বন্ধে মানুষের একটা ব্যক্তিগত জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপেক্ষাও সুনিশ্চিত। তাঁহারা আরও বলেন এই প্রকারের জ্ঞানের এক কণা বা এক রতির ওজন বা মূল্য রাশি রাশি ধার-করা শাস্ত্র-গ্রন্থ অপেক্ষা বহু গুণে বেশী। An ounce of personal experience is worth a ton of borrowed theology ভগবানের স্পর্শও পাওয়া যায়, তাহাকে দেখা যায়, তাঁহার কথা শোনা যায়। কোন্‌কালে কে দেখিয়াছে বলিয়া বসিয়া থাকিলে হইবে না, আমাকে নিজে দেখিতে হইবে। লীলাবাদী ভাবুক রসিক বলেন দেহের যেমন ইন্দ্রিয় আছে, আত্মারও তেমনি ইন্দ্রিয় আছে। The soul has its senses. ভগবান্ সম্বন্ধে কেবল বিচার বিতর্ক (speculation) করিও না, স্বানুভব, আত্মবোধ (sensation) অন্বেষণ কর, পাইবে, নিশ্চয় পাইবে। তাহা যদি না পাও, যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম্ম পণ্ডশ্রম, গৌণধর্ম্ম মুখ্যধর্ম্ম নহে। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্মকথা, ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ, ইহাই যুগধর্ম্ম, নামজাদা গুরুপুরোহিতের গোলাম হইয়া বকলমিতে চলিবে না, বল আমার ঈশ্বর, প্রাণের ঈশ্বর, আমার নয়নে শ্রবণে নাসিকায়, আমার রসনায় ত্বগিন্দ্রিয়ে, আমার সমগ্র চেতনায়, রসরূপে উল্লাসরূপে তিনি বিরাজিত ক্রীড়ান্বিত।

খৃষ্টীয় বন্দনা-গীতে বলা হইয়াছে O taste and see how gracious the Lord is— আস্বাদন করিয়া বুঝিয়া লও মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং।

স্বানুভবকে প্রাধান্য দেওয়া এবং শাস্ত্রকে গৌণ করার এই যে মত, ইহার আবার একটা চরম বা উৎকট মূর্ত্তি আছে। তাহা অবশ্য দূষণীয়। Objective, Subjective আর universal, বহিঃপ্রাজ্ঞ, অন্তঃপ্রাজ্ঞ আর উভয়তঃ প্রাজ্ঞ, ধর্ম্মজীবনকে যদি এই তিন স্তরে ভাগ করা যায় তাহা

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর তৃতীয় চরিত্রে চণ্ডমুণ্ড নিহত হওয়ার পর শুম্ভ যখন যুদ্ধস্থলে উপস্থিত এবং যে সময়ে ব্রহ্মা, শিব, কার্ত্তিকেয়, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের শক্তি তাঁহাদের অঙ্গ হইতে বাহির হইয়া নারীমূর্ত্তিতে চণ্ডিকার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, সেই সময়ে দেবশক্তিসমূহ-কর্ত্তৃক পরিবৃত ঈশান চণ্ডীকাকে বলিলেন, আপনি এইবার অসুরগণকে শীঘ্র শীঘ্র বিনাশ করুন, তাহা হইলেই আমি প্রীতিলাভ করিব। অপরাজিতা দেবী চণ্ডিকা এই কথা শুনিয়া ধূম্রবর্ণ-জটা-বিভূষিত মহাদেবকে বলিলেন, আপনি আমার একটি কার্য্য করুন, আপনি দূত হইয়া শুম্ভ নিশুম্ভের নিকটে যাইয়া তাহাদের বলুন, তাহারা ত্রৈলোক্য রাজ্য ইন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিয়া পাতালে চলিয়া যাউক। যদি তাহা না করিয়া বলগর্ব্বে যুদ্ধ করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাদের নিস্তার নাই! এই সময়ে চণ্ডিকার আদেশে মহাদেব দূতের কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া জগজ্জননী চণ্ডিকার একটি নাম শিবদূতী। রক্তবীজ বধের ঠিক্ পূর্ব্বে এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। বাবা একটি আদেশ করিলেন মাকে, আর মা একটি আদেশ করিলেন বাবাকে। জগতের যাঁহারা পিতামাতা যুদ্ধস্থলে তাঁহাদের এই লীলাটি বেশ! এই পিতামাতা পুরুষ ও প্রকৃতি। ইঁহারা আজ পিতা ও মাতা, আমরা সকলেই তাঁহাদের পুত্র ও কন্যা। পিতামাতা চিরদিন পিতামাতা নহেন, তাঁহারা একদিন প্রেমিক প্রেমিকা ছিলেন এবং অন্তরের অন্তরে এখনও তাঁহারা প্রেমিক প্রেমিকা। নবীন প্রেমিক ও নবীনা প্রেমিকা, স্বপ্নময় ও সুমধুর প্রেমের লীলায় তাঁহারা মত্ত ও বিহ্বল। এক শ্রেণীর সাধক বিশ্বের আদিতত্ত্ব সেই পরমপুরুষ ও পরমা প্রকৃতিকে এইভাবে দেখেন। ইহাতে আপত্তি কি? "নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।" ইহাতে বিরোধ হয় কেন? "যার যেই ভাব সেই হয় সর্ব্বোত্তম"; আপত্তি কোথায় জিজ্ঞাসা করায় একজন সাধু বলিয়াছিলেন, পরকীয়ভাব আনিলে কেন? ইহাতেই আপত্তি। অলঙ্কারশাস্ত্র যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা জানেন নায়ক-নায়িকার

হইলে বলিতে হইবে অন্তঃপ্রাজ্ঞ অবস্থায় স্বানুভব বা আত্মবোধের প্রাধান্য। এই আত্মবোধ যদি বিশ্বজনীন না হইয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য লইয়াই থাকে অর্থাৎ অন্তঃপ্রাজ্ঞতা যদি উভয়তঃ-প্রাজ্ঞতায় না পৌছায় তাহা হইলেই বিপদ। আসল কথা, স্বানুভব ও সৎশাস্ত্রের অবিরোধের উপরেই সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। বাঙ্গলার বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস, তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিলেই ইহা পরিস্ফুট হইবে।

প্রেমলীলার পূর্ণতাসাধনের জন্য এমন কতকগুলি ভাব ও অবস্থা আছে যাহা পরকীয়-ব্যতীত হইতে পারে না। স্বকীয় নায়ক নায়িকারও রসপুষ্টির জন্য পরকীয়ত্বের ভাবের আরোপ করিতে হয়। যেমন পূর্ব্বরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা! "পরকীয়ভাবে অতি রসের উল্লাস"—সুতরাং পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতির নিত্য ও পূর্ণ প্রেমলীলায় পরকীয়ভাবের আরোপ না করিলে লীলাই যে সিদ্ধ হয় না।

শিবদূতীর লীলায় দেখিলাম পুরুষের আদেশে প্রকৃতি চলিতেছেন, প্রকৃতির আদেশে পুরুষ চলিতেছেন। উভয়েই অনাদি, পুরুষও অনাদি, প্রকৃতিও অনাদি! গীতার এই তত্ত্ব শিবদুর্গার লীলায় যেমন দেখা গেল শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাতেও সেইরূপ দেখা যাইবে। সুতরাং এই কথা কেবলমাত্র সম্প্রদায়-বিশেষের কথা নহে, ইহা সার্ব্বজনীন সনাতন ধর্ম্মেরই কথা। কাহারও নিকট পিতামাতা, কাহারও নিকট নায়ক-নায়িকা, কাহারও নিকট স্বকীয়, কাহারও নিকট পরকীয়, কিন্তু চিন্তা করিলে বুঝিবেন, সকলেই একই মহাসত্যের প্রচারক ও সাধক।

তাহা হইলে অনুভব করিতে অভ্যাস কর, এই পুরুষ ও প্রকৃতি, তোমার নিজের ভিতরে দুজনাই আছেন। প্রকৃতিও আছেন, পুরুষও আছেন, চিরকাল আছেন এবং তুল্যরূপে আছেন। কেহ ছোট নহেন, কেহ বড় নহেন, উভয়ে সমান। আমি, এই জীব, কখন প্রকৃতির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ি, ঢলিয়া পড়ি, আবার কখন পুরুষের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ি বা ঢলিয়া পড়ি। দুইয়ের মধ্যে,—এই অনাদি দুইয়ের মধ্যে ভারকেন্দ্র ঠিক্ করিয়া একটা সাম্যাবস্থা পাওয়ার জন্য এত চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই পারিতেছি না। কখন প্রকৃতির দিকে ঝোঁক, কখন পুরুষের দিকে ঝোঁক। এই দুটানায় জীবন চলিতেছে, ইহাই জীবনের নিত্যলীলা। অনেকে বলেন, একটা সাম্যাবস্থা আছে। থাকুক, আমি তাহা বুঝি না, আপাততঃ বুঝিতে চাহি না, কারণ, বুঝিতে পারি না, পারিব না। আমরা লীলাকেই নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলাম।

মানুষের জীবনে যত প্রকারের অভিজ্ঞতা হইয়াছে, হইতেছে, হইবে বা হইতে পারে, সকলের মধ্যেই এই পুরুষ-প্রকৃতির খেলা, এই দুটানাটানিই জীবন, ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই। দৈহিক জীবন, মানস জীবন, নৈতিক জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন বা

সামাজিক জীবন, যেদিকেই চাহিবে, চোখ থাকিলে দেখিবে প্রকৃতি পুরুষের খেলা, পুরুষ-প্রকৃতির খেলা—যুগল বিলাস, যুগলের প্রেমলীলা, নিত্য ও অনাদি।

জীবনের সর্ব্বত্রই একটা রসের সম্ভোগ আছে, একটা রস-পিপাসা আছে। দৈহিক জীবনে আছে, মানস জীবনে, নৈতিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, পারিবারিক জীবনে আছে, সুতরাং এই সব জীবনের যাহা মূল, এই সব জীবন যে মূল-জীবনের বিভিন্ন প্রকারের প্রকাশমাত্র, এই সব জীবন যে মূল জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই আধ্যাত্মিক জীবনেও রসপিপাসা ও রসসম্ভোগ আছে। পিপাসা ও ক্ষুধা বা অভাববোধ ও আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে সম্ভোগ হয় না, সম্ভোগের পুষ্টি হয় না, অতএব আধ্যাত্মিক জীবনে রস-পিপাসাও আছে, রসসম্ভোগও আছে।

আধ্যাত্মিক জীবনের রসসম্ভোগের মধ্যে ভক্ত হৃদয় রসোল্লাসের আশ্রয় ও বিষয়-রূপে, যাঁহাদের সাক্ষাৎকার লাভ করেন তাঁহারাই সেই যুগল শ্রীরাধাগোবিন্দ, ইঁহাদের নাম চিন্মিথুন—ইহারা মিথুন অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষ বা পুরুষ প্রকৃতি কিন্তু চিৎ অর্থাৎ চৈতন্যরূপী, জ্ঞানানন্দরূপী, জড়ীয় নহেন, জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন। রসের যাহা আদি, তাহারই নাম আদিরস, শৃঙ্গাররস। এই আদিরসের প্রাণের ভিতর এই যুগল-বিলাস হইতেছে। এই যুগলকে জানিলে বা লাভ করিলেই প্রকৃত রস পাওয়া যাইবে, আর এই যুগলকে না জানিয়া রস বলিয়া যাহা গ্রহণ করিব, তাহা রস নহে—রসাভাস, সত্য-রসের আংশিক প্রতিবিম্ব। রসের খেলা চলিতেছে, নিত্য বৃন্দাবনে বিরামবিহীন নিত্য-লীলা চলিতেছে। একদিকে নিখিলকবির হৃদয়মধ্যে কল্পনার সোহাগসিন্ধু উথলিত; আর একদিকে ফুল ফুটাইয়া মলয় ছুটাইয়া, বিহগের কলকণ্ঠে সঙ্গীতের মধুরধ্বনি জাগরিত করিয়া, মেঘের উপর রামধনু চিত্রিত করিয়া ময়ূরময়ূরী নাচাইয়া, নৃত্যগীতে হাস্যকৌতুকে, চিত্রে কাব্যে সঙ্গীতে সেই যুগলবিলাস, নিত্যের সেই রসসম্ভোগ আপনাকে প্রকটিত করিতেছে। শ্রীবৃন্দাবনের যুগললীলার শেষকথা কি? অনেক সময়েই মনে হয় পুরুষেরই পরাজয়—প্রকৃতির জয়। শ্রীবৃন্দাবন শ্রীরাধারই বিজয়-গীতি, নদীয়া-লীলাতেও শ্রীরাধারই আধিপত্য। এই তত্ত্বটুকু হৃদয়ে ধারণ করিয়া পদ্মপুরাণের তত্ত্বপূর্ণ গভীর কথা—"তত্ত্বতঃ" আস্বাদন করুন।

৩। লীলাবাদের প্রাথমিক কথা

তোমরা, যাহারা বল নিত্য সনাতন অনন্ত বা অমৃত বলিয়া সত্য করিয়া কোন কিছু নাই,—উহা অজ্ঞান বা অল্পজ্ঞান মানুষের একটা কল্পনা, অনুমান ও মোহ। ইহাই যাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহাদের সহিত প্রারম্ভেই পথের ছাড়াছাড়ি করিয়া লইলাম। তাঁহাদের সহিত বিরোধ নাই, কিন্তু তাঁহাদের সহিত পথের ছাড়াছাড়ি না করিলে পৌরাণিকের রাধা-কথা বলিতে পারিব না। আমরা বলিব, সত্য করিয়া যাহা আছে, তাহা অমৃত ও অনন্ত। তোমরা তোমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহা আছে বলিয়া মনে কর, তাহাকে আমরা মিথ্যা বলিব না, সে দুঃসাহস আমাদের যেন কখন না হয়। তবে বলিব, তাহা নশ্বর, তাহা সেই নিত্যের বিবিধ প্রকারের ছায়ার খেলা। এই ছায়ার খেলার দেশ আছে অনেকগুলি, আমাদের এই পৃথিবী বা ভূমণ্ডল তাহার মধ্যে একটি। এই ভূমণ্ডল ছায়ার দেশ হইলেও, যিনি কায়া বা নিত্য, তিনি যে ইহাকে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিয়া চিরকাল ইহা হইতে দূরে বা ইহার বাহিরে বসিয়া আছেন, কদাচ তাহা ভাবিবেন না। অসীমের বাঁশি বাজে এই সীমার দেশেই বাজে, কখন মৃদু অস্পষ্টসুরে, কখন গভীরে মধুরে স্পষ্টাক্ষরে। অসীম যিনি, তিনি সর্ব্বদাই উকি ঝুঁকি মারেন, এই সসীমের ভিতর। অসীম যিনি, তিনি এক কৌতুকের খেলা পাতিয়াছেন, সর্ব্বদাই সেই খেলা খেলিতেছেন। আমরা, এই মানুষেরা, অসীম হইয়াও সসীম, মুক্ত হইয়াও বদ্ধ, নিত্য হইয়াও অনিত্য। আমরা সীমার বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছি। সেই চিরমুক্ত অসীম পুরুষ-প্রকৃতি বা প্রকৃতি-পুরুষ, যিনি সর্ব্বদাই দুইএ এক ও একে দুই, তাঁহাকে রসিকেন্দ্র-চূড়ামণিই বলিলাম, তিনি উঁকিঝুঁকি মারেন, আমাদের পাগল করার জন্য, আমাদের ব্যাকুল করার জন্য, আমাদের অধীর করার জন্য। আসিতেছেন, আসিতেছেন, সেই নিত্য পুরুষ, মনের মানুষ, প্রাণের মানুষ, যিনি আমাদের সকলের,—তিনি আসিতেছেন। ক্রমে ক্রমে ক্রমে, ক্রমশঃ স্পষ্ট, আরও স্পষ্ট, আরও স্পষ্ট হইয়া, কাছে আরও কাছে আরও কাছে, এমনি করিয়া আসিতেছেন। ইহাই তাঁহার লীলা। যুগের পর যুগ মন্বন্তরের পর মন্বন্তর, এমনি করিয়া আসিতে আসিতে ব্রহ্মার দিনের ভিতর একবার তাঁহার আসা পূর্ণ হইল, আমাদেরও আশা পূর্ণ হইল, ব্রহ্মার দিনও সফল হইল।

আজ আর আংশিকরূপে অস্পষ্টরূপে ইঙ্গিতে বা আভাসে নহে। আজ তিনি আসিলেন, ষোল আনা পূরাপূরি; আজ তিনি আসিলেন, ধরা পড়িবার জন্য। এতদিন চোরের মত আসিতেন গোপনে, আজ আসিলেন ধরা পড়ার জন্য। এই আসার নামই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণলীলা। ইহাই গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবরের সর্ব্বোত্তম নরলীলা। এই লীলা স্বরূপে নিত্য, ভক্তজনের গূঢ় বা অন্তরতম অনুভবের সামগ্রী, আমাদের ভূমণ্ডলে বা প্রপঞ্চে আজ তাহা প্রকট। বিশ্ব যেন এতদিন জানিয়া বা না জানিয়া ইহারই আশায় বসিয়াছিল। ফোটা ফুল, মলয় হাওয়া, কৈশোরের প্রেমের স্বপন, বিহগের কণ্ঠগীতি, সকলেই যেন ইহারই জন্য, এই নিত্যের প্রাকট্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, প্রতীক্ষাময়ী তপস্যা করিতেছিল। বিশ্বসৃষ্টির প্রথম ঊষা হইতেই যাঁহার অভ্যর্থনার ও অর্চ্চনার আয়োজন হইতেছিল, আজ তিনি আসিলেন, সেই চির-অপেক্ষিত চির-প্রার্থিত, চিরদয়িত আসিলেন। *

---

* উপনিষদের সাহায্যে ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার বৈশিষ্ট্য যাঁহারা বুঝিয়াছেন, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা তাঁহাদের নিকট নিতান্তই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইবে। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য বলে। অকৃত্রিম কথার অর্থ নিরপেক্ষ ও অসম্প্রদায়িক। উপনিষৎ বলেন ব্রহ্ম বা ভগবান্ আত্মন্ বা আত্মা—তিনি নিজেকে প্রকাশিত ও ব্যক্ত করিতেছেন। The self-revealing spirit. ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, তিনি সেতু, যাহাতে লোকসমূহ ছিন্ন ভিন্ন না হয় সেজন্য তিনি সকলকে ধরিয়া রহিয়াছেন। আমরা সকলে একত্বাবদ্ধ হইয়া যে আছি, তাহা তাঁহারই জন্য। তাহা হইলে তিনিই সেই পরম ঐক্য—The supreme unity. কিন্তু এখনও সেই ঐক্য ব্যক্ত হয় নাই বা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ক্রমে ক্রমে সেই ঐক্য ব্যক্ত হইতেছে। উপনিষদের মতে সেই আত্মা বা ব্রহ্মই পরোক্ষ—immediate। যাহা সসীম তাহা পরোক্ষও নহে, স্বপ্রকাশ (self-explanatary) নহে। তাহার পর সেই পরোক্ষ পরব্রহ্ম অন্তর্যামী The Eternal is the in-soul. এই আত্মা বা অন্তর্যামী পরমাত্মা বিশ্বব্যবস্থায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন—The experience of the spirit is gradual and progressive. He reveals Himself as men are able to sense or receive Him। ইহাই লীলা। শ্রীবৃন্দাবন এই প্রকাশের একটা পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তপোবনের সাধনায় একটা পূর্ণতা দেখাইয়াছেন।—কিন্তু সেই পরাকাষ্ঠা বা পূর্ণতাও একটা শেষ নহে, সেখানেও অনন্তমিলনে অসীম বিরহ বা চির-প্রেমবৈচিত্ত্য।

পরমাত্মা শ্রীভগবানের স্বরূপের ক্রমিক আত্মপ্রকাশ বেদান্তদর্শনের দুইটি সূত্রে পাওয়া যায়।

৪। গোকুলে নারদ

নারদের আনন্দের সীমা নাই। নারদের সাধনা ও তপস্যা বহু-যুগ-ব্যাপী ও অতীব কঠোর। সেই সাধনা সংগ্রামময়ী, নারদকে কত দ্বন্দ্বই করিতে হইয়াছে। এক হাতে তাঁহার দেবতা, আর একহাতে অসুর; দৃষ্টি তাঁহার উভয়মুখী—ব্রহ্মে আর মানুষে; কর্ম্ম তাঁহার অসন্তোষ ও কলহের সৃষ্টি। নারদের সেই সাধনা ও তপস্যার ফল শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীরাধাকৃষ্ণ। কাজেই নারদ নন্দগোকুলে আসিলেন।

গোকুলের পথে পথে বীণা বাজাইয়া
দেবর্ষি নারদ যায় নাচিয়া নাচিয়া।
বীণাস্বরে আনন্দিত, ব্রজ-নরনারী যত,
পথে আসি নারদেরে করিছে দর্শন,
ভক্তিভরে করিতেছে চরণ বন্দন।

* * * *

নন্দ গোকুলের মাঝে, ওই বাজে ওই বাজে,
দেবদত্ত বীণা সুমধুর।
হাসিয়া হাসিয়া, নাচিয়া নাচিয়া,
ওই আসে ওই আসে, নারদঠাকুর।

নন্দগোকুলে আসিয়া নারদ দেখিলেন মহাযোগমায়েশ অচ্যুত ও বিভু নন্দগৃহে বাল-নাট্যধর।

গত্বা তত্র মহাযোগমায়েশং বিভুমচ্যুতং।
বালনাট্যধরং দেবং দদৃশে নন্দবেশ্মনি॥

"জন্মাদ্যস্য যতঃ" আর "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"। প্রথম সূত্রে পাওয়া যায় তিনিই সব, নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ, The source and the substance। দ্বিতীয়টিতে পাই তিনি শাস্ত্রযোনি। শাস্ত্রই ধর্ম্ম, শাস্ত্রই সাধন। শাস্ত্রের দ্বারাই মানুষ ক্রমশঃ অন্ধকার হইতে আলোকে, অসৎ হইতে সতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে যাইতেছে। অতএব, তিনি The revealer of the Law or Dharma. এই প্রকাশই তাঁহার আত্মপ্রকাশ। এই ধর্ম্ম বা ঋতই প্রেম। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণই সেই প্রেম, শ্রুতিবিদ্যা গোপী, বৈদিক ঋষিও গোপী।

যিনি বিভু (সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয় ও সর্ব্বেশ্বর), যিনি মহাযোগমায়ার অধীশ্বর, যিনি অচ্যুত (অবিকারী ও নিত্য-একরূপ), সেই দেবতা আজ বালকত্বের অভিনয়ের জন্য নন্দ মহারাজের গৃহে আবির্ভূত। সোনার খাটে কোমল বস্ত্রের শয্যা, পরমদেব শ্রীকৃষ্ণ সেই শয্যায় শুইয়া আছেন, গোপকন্যাগণ চির-তৃষিত নয়নে তাঁহার রূপলাবণ্য দেখিতেছে। নারদও দেখিলেন, বালকৃষ্ণের মুখের হাসি দেখিলেন, হাসিবার সময় সভোজাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুএকটি দন্ত প্রকাশিত হয়, তাহাও দেখিলেন। মুগ্ধ ও বিহ্বল হইয়া নারদ নন্দমহারাজকে এই বালকের মহিমার কথা কিছু কিছু বলিয়া গেলেন।

৫। পরা রতি

নন্দগৃহ হইতে বাহির হইয়া নারদ ভাবিলেন, ভগবান্ আসিয়াছেন, গোপগৃহে গোপশিশুরূপে আসিয়াছেন, তাহা হইলে ভগবতীও আসিয়াছেন, গোপকন্যারূপে কোন স্থানে আসিয়াছেন, নতুবা ক্রীড়া হইবে কিরূপে ? ভগবান্‌কে দেখিলাম, ধন্য হইলাম, এখন ভগবতীর অন্বেষণ প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্রজবাসীর গৃহে যাইতে হইবে, যত বালিকা ও বালক আছে সকলকে দেখিতে হইবে। নারদ তাহাই করিলেন, ব্রজবাসীর ঘরে ঘরে অতিথি হইয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। নারদ লক্ষ্য করিলেন, ব্রজের নরনারী সকলেরই নন্দসুতে পরা রতি। তিনি দেখিয়া বুঝিলেন—

সর্ব্বেষাং বল্লবাদীনাং রতিং নন্দসুতে পরাম্।

ব্রজবাসীরা স্বভাবতঃই প্রেমিক, অতিশয় প্রেমিক। ভালবাসার জন্য যদি কেহ হাসিতে হাসিতে মরিতে পারে, তাহা কেবল ব্রজবাসীরাই পারে। এ-বিষয়ে ব্রহ্মাণ্ডে তাহাদের তুলনা নাই। ইহারা সকলকেই ভালবাসে, কিন্তু সকলের অপেক্ষা নন্দসুতকেই অধিক ভালবাসে, আর নন্দসুতের জন্যই অপর সকলকে ভালবাসে। ইহারা নিজের ছেলেকে নিজের মেয়েকে তত ভালবাসে না, নন্দসুতকে যত বেশী ভালবাসে। ইহারা নিজের নিজের ছেলে মেয়েকে ভালবাসে নন্দসুতের জন্য। নিজেদের ছেলেমেয়েরা নন্দসুতের সাথী হইবে, খেলার সহায় হইবে, নন্দসুতের আনন্দবিধান করিবে, সেবা করিয়া তাহাকে সুখ দিবে, এই জন্যই নিজেদের ছেলেমেয়েকে ভালবাসে। ইহাই ব্রজবাসীর পরা রতি। নিজের দেহকে নিজের আত্মাকে তাহারা তত ভালবাসে না; যত ভালবাসে এই

নন্দসুতকে। আবার, নিজেদের দেহ এবং আত্মাকে যে ভালবাসে, তাহাও ঐ নন্দসুতেরই জন্য। এই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রাণ বা আত্মার দ্বারা নন্দসুতের সেবা হইবে, তাহার আনন্দ বিধান হইবে, এই জন্যই দেহে ও আত্মায় প্রীতি। নারদ ইহা বুঝিলেন, আনন্দিত হইলেন, ভাবিলেন এতদিনে আমার জীবন ও তপস্যা সফল হইল। গোপগণের গৃহে গৃহে অসংখ্য পরমাসুন্দরী বালিকা দেখিলেন। প্রত্যেকেই অনিন্দ্যসুন্দরী, কাহারও সহিত অপর কাহারও তুলনা করা যায় না, প্রত্যেকেই যেন অতুলনীয়, নারীসৌন্দর্য্যের এক এক প্রকারের এক একজন পরাকাষ্ঠা। নারদ ভাবিলেন ইহারা সকলেই ভগবতীর অংশে অবতীর্ণা হইয়াছেন। ইঁহারা পৃথিবীর সাধারণ মানুষ নহেন, গোপবালকবেশী বাল্যনাট্যধর পরমপুরুষ পরব্রহ্মের ক্রীড়ারসপুষ্টির জন্যই মর্ত্তালোকে ইঁহাদের আবির্ভাব।

নন্দমহারাজের একজন সখার নাম ভানু। নারদ আসিয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত। নারদের আজ প্রয়োজন ছেলেমেয়ে দেখা। ভানুকে বলিবামাত্র ভানু তাঁহার অতি তেজস্বী পুত্রকে দেখাইলেন। বেশ ছেলে, বেশ ছেলে, নারদ দেখিলেন—"রূপেণা-প্রতিমং ভুবি"—এমন রূপ পৃথিবীতে আর বুঝি নাই।

পদ্মপত্রবিশালাক্ষং সুগ্রীবং সুন্দরভ্রুবম্।
চারুদন্তং চারুকর্ণং সর্ব্বাবয়বসুন্দরম্॥

নারদের আহ্লাদের সীমা নাই, ভানুরাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—সাধু, সাধু, তোমার এই শিশুপুত্র রামকৃষ্ণের বেশ উপযুক্ত সখা হইবে, রামকৃষ্ণের সহিত দিবারাত্রি বিহার করিবে। বড়ই পরিতুষ্ট হইলাম।

অয়ং শিশুস্তে ভবিতা সুসখা রামকৃষ্ণয়োঃ।
বিহরিষ্যতি তাভ্যাঞ্চ রাত্রিন্দিনমতন্দ্রিতঃ॥

৬। শ্রীরাধা

আজিকার মত নারদের কাজ একরূপ হইয়া গেল, নারদ এখন অন্যত্র যাইবেন। ভানু বলিলেন, প্রভু, দয়া করিয়া আমার ঘরে পদধূলি দিয়াছেন, কৃতার্থ করিয়াছেন, চিরঋণী করিয়াছেন, আমার ছেলেটিকে দেখিয়াছেন, আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। দয়াময় আমার যে একটি কন্যা আছে, কন্যাটি এই পুত্রের কনিষ্ঠা, দেখিতে পরমাসুন্দরী, কিন্তু, সেই কন্যাটি জড়, অন্ধ ও বধির।

একান্তি পুত্রিকা দেব দেবপত্ন্যুপমা মম।
কনীয়সী শিশোরস্ত জড়ান্ধ বধিরাকৃতি॥

আপনার অযাচিত কৃপায় উৎসাহিত হইয়া আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া সেই বালিকাকে একবার দেখুন, আর আপনার প্রসন্নদৃষ্টির দ্বারা তাহাকে সুস্থ করুন। নারদের চিত্তে বড়ই কৌতূহল হইল, ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন কন্যাটি ভূমিতে শুইয়া আছে, কন্যাটিকে দেখিয়াই নারদের হৃদয়ে স্নেহরস উথলিয়া উঠিল, তিনি কন্যাটিকে কোলে তুলিয়া লইলেন। ভানুরাজও আসিয়া নারদের নিকট দাঁড়াইলেন। কন্যাটিকে দেখিয়া ও ক্রোড়ে লইয়া দুই মুহূর্ত্তের জন্য নারদ জ্ঞানশূন্য ও নিশ্চল, তাহার পর ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিলেন, কিন্তু মুখে কথা নাই। নারদ ভাবিতেছেন—আমি স্বচ্ছন্দচারী, সর্ব্বলোকে সর্ব্বদাই পরিভ্রমণ করিতেছি, ব্রহ্মাণ্ডে এমন কিছু নাই, যাহা আমি দেখি নাই। এই বালিকার রূপের তুল্য রূপ আমি কখনও দেখি নাই। ব্রহ্মলোক রুদ্রলোক ইন্দ্রলোক, সর্ব্বত্রই আমার গতি, কিন্তু এই কন্যার সৌন্দর্য্যের কোটিভাগের একভাগও আমি যেন কখনও দেখি নাই। মহামায়া ভগবতী হিমাচলনন্দিনীকে দেখিয়াছি, তাঁহার রূপে চরাচর মুগ্ধ। কিন্তু, তাঁহারও এমন শোভা নাই। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কান্তি ও বিদ্যা প্রভৃতি বরাঙ্গনাগণ যেন ইহার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারেন না। বিষ্ণুর সেই মোহিনী মূর্ত্তি, যাহা দেখিয়া মহাদেবও অধীর হইয়াছিলেন সে রূপও দেখিয়াছি, সে রূপও এ-রূপের সদৃশ নহে। এই বালিকার তত্ত্ব জানিবার শক্তি আমার নাই, ইনিই হরিপ্রিয়া, জগতের কেহই ইঁহার তত্ত্ব অবগত নহে। এই কন্যাকে দেখিবামাত্র শ্রীগোবিন্দের পাদ-পদ্মে আমার যেরূপ উল্লাসময় অনুরাগ জাগিয়া উঠিল, তাহা অভূতপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয়। এই রূপই শ্রীকৃষ্ণের পরমতুষ্টিকর হইবে।

এই প্রকারের চিন্তাপ্রবাহে অভিভূত চিত্ত দেবর্ষি নারদ ভানুরাজকে অন্যস্থানে পাঠাইয়া গৃহটি নির্জ্জন করিয়া ঐ কন্যার চরণবন্দনপূর্ব্বক ভক্তিগদ্‌গদহৃদয়ে স্তব পাঠ করিতেছেন।

দেবি, তুমি মহাযোগময়ী, মাহেশ্বরী ও মহাপ্রভা, তুমি মহামোহনদিব্যাঙ্গী, মহা-মাধুর্য্যবর্ষিণী। তুমি মহাদ্ভুতরসানন্দ-শিথিলীকৃতমানসা, তোমার দৃষ্টি নিত্যমন্তঃসুখা, তুমি রজঃসম্বন্ধি কলিকাশক্তি। দেবি, তুমি নিজেকে গোপন করিয়া রাখিয়াছ। আমার

প্রতি কৃপা করুন। আপনার যে রূপ দেখিয়া নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধ হইবেন সেই রূপ দেখিবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা ; দয়া করিয়া প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

ভানুকন্যার স্তবপাঠ করার পর দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণেরও স্তবপাঠ করিলেন।

জয় কৃষ্ণ মনোহারিন্ জয় বৃন্দাবনপ্রিয়।
জয় ভ্রূভঙ্গ ললিত জয় বেণুরবাকুল॥
জয় বর্হকৃতোত্তংস জয় গোপীবিমোহন।
জয় কুঙ্কুমলিপ্তাঙ্গ জয় রত্নবিভূষণ॥

জয়যুক্ত হও তুমি, হে কৃষ্ণ হে বিশ্বমনোহর, জয়যুক্ত হও তুমি শ্রীবৃন্দাবনের প্রিয়তমধন। জয়যুক্ত হও তুমি হে ললিতকটাক্ষভূষিত, জয়যুক্ত হও তুমি বেণুরবমত্ত। তুমি ময়ূরপুচ্ছ-চূড়াধারী, তুমি গোপীবিমোহন, জয়যুক্ত হও। কুঙ্কুমলিপ্তাঙ্গ তুমি রত্ন-বিভূষণ, তুমি জয়-যুক্ত হও। দয়াময়, কবে আমি এই বালিকার সহিত তোমায় সম্মিলিত দেখিব।

এই প্রকারে স্তবপাঠ ও প্রার্থনা করা হইলে সেই বালিকা দিব্যমূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন। দেবর্ষি দেখিলেন তিনি চতুর্দ্দশ বয়স্কা, রূপের কথাই নাই। বালিকা যেমন তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিলেন, অমনি দেবর্ষি দেখিলেন, এই বালিকা একাকী নহেন, তাঁহার চারিদিকে অসংখ্য গোপকন্যা শোভা পাইতেছেন। ব্রজগোপীগণ সকলেই প্রায় সমবয়স্কা ও পরমসুন্দরী। এই দৃশ্য দেখিয়া দেবর্ষির সংজ্ঞা লোপ হইল। গোপিকারা সেই ভানুকন্যার চরণোদকের দ্বারা দেবর্ষিকে সচেতন করিয়া বলিলেন, মুনিবর, তুমি ভক্তশ্রেষ্ঠ, তুমি আজ যাহা দেখিলে তাহার দর্শন আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবগণ, সিদ্ধ মুনীশ্বরগণ, প্রধান প্রধান ভক্তগণও সাধনা করিয়া এই রূপ দেখিতে পান নাই। এই দেবী হরিপ্রিয়া। তুমি ইঁহাকে দেখিলে তুমি পরম ভাগ্যবান্। দেবীর সহিত তোমার কোনরূপ কথা হইবে না, আর অধিকক্ষণ তুমি দেখিতেও পাইবে না, তুমি উঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ও প্রণাম করিয়া এখন প্রস্থান কর। দেবী ব্যাকুলা হইয়াছেন, তিনি সত্বর প্রস্থান করিবেন।

কিং ন পশ্যসি চার্ব্বঙ্গীমত্যন্তব্যাকুলামিব।
অস্মিন্নেব ক্ষণে নূনমন্তর্ধানং গমিষ্যতি॥

নানয়া সহ সংলাপঃ কথঞ্চিত্তে ভবিষ্যতি।
দর্শনঞ্চ পুনর্নাস্যা প্রাপ্স্যসি ব্রহ্মবিত্তম ॥

তুমি আর কখন ইঁহার সাক্ষাৎকার পাইবে না। কিন্তু, তোমাকে একটি সন্ধান বলিয়া দিতেছি, এই বৃন্দাবনে একটি অশোক লতা আছে উহা সর্ব্বদাই পুষ্পময়ী. পুষ্পের সৌরভও অপূর্ব্ব এবং সর্ব্বদিগ্‌ব্যাপী। গোবর্দ্ধন গিরির নিকটে কুসুম নামে এক সরোবর আছে, তাহার তীরে এই অশোকলতা দেখিতে পাইবে। ঐ অশোকলতার মূলে মধ্যরাত্রিতে আমাদের সকলকেই দেখিতে পাইবে।

৭। কুসুমসরোবরে নারদ

ব্রজগোপীর আদেশমত দেবর্ষি বিদায় হইলেন। যাইবার সময় ভানুরাজকে বলিয়া গেলেন, এই বালিকাকে প্রকৃতিস্থ করা দেবগণেরও অসাধ্য। কিন্তু, এই কন্যা সর্ব্বভূষণের ভূষণ-স্বরূপা, এই কন্যার চরণ যেখানে যেখানে পতিত হয় নারায়ণ ও লক্ষ্মী দেবগণের সহিত সেখানে সর্ব্বদাই বসতি করেন। তুমি যত্নপূর্ব্বক এই বালিকাকে প্রতিপালন কর, তুমি অতিশয় ভাগ্যবান্।

দেবর্ষি নারদের মনে এখন আর অন্য কোন চিন্তা নাই, ঐ বালিকার ও তাঁহার রঙ্গিনী সঙ্গিনীগণের তিনি যে রূপলাবণ্য দেখিলেন তাহাতেই তাঁহার হৃদয়মন পূর্ণ। এই অবস্থায় তিনি কুসুম সরোবরের তীরবর্ত্তী সেই অশোকলতার মূলদেশে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভার পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন। মধ্যরাত্রি উপস্থিত, এক দিব্য আলোকে সেই স্থান উদ্ভাসিত হইল, দিব্য গন্ধে দিগ্‌দিগন্ত ভরিয়া গেল, বেণুবীণার ধ্বনির সহিত নূপুরনিক্কণ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। দেবর্ষি পূর্ব্বে ভানুরাজের গৃহকক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন, আবার তাহা দেখিলেন। অভিভূত ও স্তব্ধ হইয়া অনিমেষ নয়নে কেবলি দেখিলেন মাত্র, কোন কথা বলিতেও পারিলেন না, শুনিতেও পাইলেন না। দেবর্ষি বিস্মিত ও সম্ভ্রমান্বিত হইয়া নতশিরে যুক্তকরে বসিয়া আছেন। অশোক-বনদেবতার নাম অশোকমালিনী। তিনি দেবর্ষির প্রতি কৃপান্বিতা হইলেন। তিনি দেবর্ষিকে বলিলেন—মুনিবর, এই সব অশোককলিকায় আমি বাস করি, আমার পরিধান রক্তবসন, আমি সর্ব্বদাই রক্তমাল্যে অনুলিপ্ত। আমার মাথায় রক্তবর্ণ সিন্দুরকলা চির-সমুজ্জ্বল।

আমার কর্ণভূষণ রক্তোৎপল-রচিত, কেয়ূর মুকুট প্রভৃতি আমার যাবতীয় ভূষণ রক্তবর্ণ-মানিক্যখচিত। একবার বসন্তোৎসবের সময় গোপবেশ শ্রীগোবিন্দ প্রেয়সীর সহিত প্রেমানন্দে ক্রীড়া করিতেছিলেন, গোপাঙ্গনাগণ সকলেই সঙ্গে ছিলেন, আমি সেই সময়ে অশোকমালা-সমূহের দ্বারা ভক্তিসহকারে তাঁহাদের সকলের পূজা করিয়াছিলাম। সেই দিন আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে, বিবিধ প্রকারের ভূষণের দ্বারা গোপীজনবল্লভের সেবা করিবার আমি অধিকার পাইয়াছি। আমি এই স্থানেই থাকি, গো, গোপ ও গোপীগণের কথা আমি সমস্তই জানি। মুনিবর তোমার মনের কথাও আমি জানি। তুমি ভাবিতেছ দেবী হরিপ্রিয়াকে কি করিয়া দেখিতে পাইব, আর কি করিয়াই বা তাঁহার চরণপদ্মের আরাধনা করিব? আমি তোমাকে এ বিষয়ে উপদেশ দিতে পারি। একসপ্ততিসংখ্যক উগ্রতপা ঋষি মানস সরোবরে থাকিয়া এই আরাধনা করিয়াছেন ও সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সাধনার কথা আমি তোমাকে কিছু কিছু বলিতে পারি।

৮। মুনিদের গোপীত্বলাভ

দেবী অশোকমালিকা প্রাচীনকালের অনেকগুলি মুনির কঠোর তপস্যার কথা নারদকে বলিয়াছিলেন। সেই মুনিগণের নাম, মন্ত্র, ধ্যানের প্রণালী নারদ শুনিলেন। অশোকমালিকা নারদকে যাহা বলিয়াছিলেন দেবাদিদেব মহাদেব আবার সেই কথা মহামায়া ভগবতীকে বলিলেন। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে এই গুহ্য কথা জন সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণের এই স্থানের বর্ণনায় একটি বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। যেসব মুনির কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই সাধনার দ্বারা গোপী হইয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের যে মূর্ত্তির ধ্যান করিয়াছেন, তাহা "শৃঙ্গাররসরাজমূর্ত্তি" বা আদিরসের ঘনীভূত মূর্ত্তি, জয়দেব যাহাকে "শৃঙ্গার মূর্ত্তিমান" বলিয়াছেন। এই মূর্ত্তি ঠিক্ একরূপ নহে, ইহারও নানারূপ প্রকাশ আছে। সেইগুলি সাধকগণের চিন্তনীয়।

ক। উগ্রতপা—সুনন্দা

উগ্রতপা মুনি সাগ্নিক ও অগ্নিভক্ষ হইয়া পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিতেন। এই

মন্ত্র কামবীজ (ক্লীঁ) পুটিত, স্বাহা ও কৃষ্ণায়, এই দুইপদও ইহাতে আছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিম্নরূপ মূর্ত্তি ধ্যান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রেরই এইরূপ আকার।

দধ্যৌ চ শ্যামলং কৃষ্ণং রসোন্মত্তং বরোৎসুকং।
পীতপট্টধরং বেণুং করেণাধরমর্পিতম্॥
নবযৌবনসম্পন্নং কর্ষন্তং পাণিনা প্রিয়াম্।

শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, রসোন্মত্ত, বরদানে উৎসুক, পীতবর্ণ, পট্টবাস তাঁহার পরিধান, করধৃত বেণু তাঁহার অধরে, তিনি নবযৌবনসম্পন্ন, হস্তের দ্বারা প্রেয়সীকে আকর্ষণ করিতেছেন।

এই মুনির দেহ কল্পশতান্তে বিসর্জ্জিত হইল। সুনন্দগোপের কন্যা সুনন্দা হইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুনন্দার হস্তে বীণা।

খ। সত্যতপা—ভদ্রা।

সত্যতপা মুনি কেবলমাত্র শুষ্কপত্র ভোজন করিতেন জলে বাস করিতেন, কাম বীজপুটিত রত্যন্ত দশাক্ষর মন্ত্র তিনি জপ করিতেন। তিনি নিম্নরূপ মূর্ত্তি ধ্যান করিতেন।

স প্রদধ্যৌ মুনিবরশ্চিত্রবেশধরং হরিং।
ধৃত্বা রমায়া দোর্ব্বল্লীদ্বিতয়ং কঙ্কনোজ্জ্বলম্।
নৃত্যন্তং তন্মুদং তাঞ্চ সংশ্লিষ্যন্তং মুহুর্মুহুঃ
হসন্তমুচ্চৈরানন্দতরঙ্গং জঠরাম্বরে।
দধতং বেণুমাজানু বৈজয়ন্ত্যা বিরাজিতম্॥
স্বেদাম্ভঃকণ সংসিক্তললাট বনিতাননম্॥

এই শ্লোকে "রমা" এই কথাটি আছে। "রমা" বলিতে সাধারণতঃ লক্ষ্মীকেই বুঝায়। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় গোস্বামীপাদগণ 'রমা' বলিতে শ্রীরাধাকেই বুঝিয়াছেন। এই মুনিগণ শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসক, অতএব এখানেও শ্রীরাধাকেই বুঝিতে হইবে। "শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্রবেশে সজ্জিত, শ্রীরাধার কঙ্কণোজ্জ্বল হস্ত দুইটি ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর সেই আনন্দে মত্ত হইয়া শ্রীরাধাকে মুহুর্মুহু আলিঙ্গন করিতেছেন। তিনি উচ্চহাস্য করিতেছেন, যেন আনন্দের তরঙ্গ, জঠরের বস্ত্রে বেণু শোভা পাইতেছে,

তাঁহার জানু পর্য্যন্ত লম্বিত বৈজয়ন্তী হার। শ্রীকৃষ্ণের ললাটে ও শ্রীরাধার মুখে স্বেদকণা।" দশকল্পকাল ধরিয়া মুনিবর এইরূপ ধ্যানে মগ্ন হইয়া তপস্যা করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। এই মুনি সুভদ্র নামক গোপের কন্যা, তাঁহার নাম ভদ্রা। তাঁহার পৃষ্ঠে দিব্য ব্যঞ্জন আছে।

গ। হরিধামা—রঙ্গবেণী

মুনির নাম হরিধামা, ভোজনত্যাগী ও কৃচ্ছ্রতপস্যাপরায়ণ। তাঁহার প্রথম মন্ত্র বিংশতি বর্ণাত্মক, তাহার পর কামবীজ জপ করিয়া ব্যোম ও হংসশোভিত বর্ণ চন্দ্রদৈবত-মন্ত্রে তিনি আরোহন করেন। ঐ মন্ত্রের প্রথমে মায়াবীজ, পরে নমোযুক্ত স্মরাদি দশাক্ষর মন্ত্র। তিনি এই প্রকারের মন্ত্রজপ করিতেন, আর নিম্নরূপ ধ্যান করিতেন।

দধৌ বৃন্দাবনে রম্যে মাধবীমণ্ডপে প্রভুম্।
উত্তানশায়িনং চারু-পল্লবাস্তরণোপরি॥
কদাচিদতিকামার্ত্তবল্লব্যা রক্তনেত্রয়া।
বক্ষোজযুগমাচ্ছাদ্য বিপুলোরঃস্থলং মুহুঃ॥
সচুম্বমানং গণ্ডান্তস্তপ্যমানরদচ্ছদম্।
কলয়ন্তং প্রিয়াং দোর্ভ্যাং সহাসং সমুদাদ্ভুতম্॥

রমণীয় শ্রীবৃন্দাবন, মাধবীমণ্ডপে চারুপল্লবের আস্তরণ, শ্রীকৃষ্ণ তাহার উপর উত্তানভাবে শায়িত। অকস্মাৎ এক রক্তনেত্রা অতিকামার্ত্তা বল্লবীস্বকীয় বক্ষঃদেশ আচ্ছাদন করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃদেশ বিপুল। শ্রীকৃষ্ণ ঐ গোপিকার গণ্ডদেশে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেছেন, দংশনবশতঃ গণ্ডান্ত সন্তপ্ত। শ্রীকৃষ্ণ হাস্যমুখে হস্তদ্বয়ের দ্বারা গোপীকে আকর্ষণ করিতেছেন।

এই প্রকারে ধ্যানরত অবস্থায় মুনিবর বহুবার দেহত্যাগ করিলেন। তিন কল্পের পর তিনি সারঙ্গ গোপের কন্যা রঙ্গবেণী হইয়া আবির্ভূত হইলেন। এই গোপী শুভ লক্ষণা, চিত্রকর্ম্মে নিপুণা, তাঁহার দন্তগুলিতে চিত্রিত শোণবিন্দুসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়।

ঘ। জাবালি—চিত্রগন্ধা

মুনিবরের নাম জাবালি, তিনি ব্রহ্মবাদী। তিনি তপস্যা করেন, যোগাভ্যাস করেন, আর নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। এক মহারণ্যের ভিতর একটি তড়াগ, তটগুলি স্ফটিক-নির্ম্মিত, জল অতিস্বাদু, পদ্মপুষ্প প্রস্ফুটিত, পদ্মগন্ধ বহন করিয়া সুশীতল মৃদুপবন বহমান। তড়াগের পশ্চিমতটে একটি বটবৃক্ষ। তাহার তলে এক তপস্বিনী তপস্যা করিতেছেন। কঠোর সে তপস্যা। কিন্তু, তপস্বিনীর মূর্ত্তি কি সুন্দর! তিনি যুবতী, চন্দ্রকিরণের স্থায় অঙ্গের দীপ্তি। কটিতটে বামহস্ত, দক্ষিণহস্তে জ্ঞানমুদ্রা অনিমেষ নয়ন, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, দেহ সুনিশ্চল, আহারাদি দৈহিক ক্রিয়া একেবারেই নাই। কে এ তাপসী কার ধ্যানে এ বিজনে যৌবনে যোগিনী? একশত বৎসরকাল ব্রহ্মবাদী জাবালি অপেক্ষা করিলেন, এই তপস্বিনীর সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার মর্ম্মকথা জানিবার জন্য। শতবর্ষ পরে তাপসীর ধ্যানযোগ ভাঙ্গিল, জাবালি তাঁহাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে, কেনই বা এই তপস্যা? তাপসী ধীরে ধীরে বলিলেন, আমি ব্রহ্মবিদ্যা। জ্ঞানীগণ সকলেই আমার সাধনা করেন, আর আমি হরিপাদপদ্ম পাইবার জন্য এই তপস্যা করিতেছি। আমি ব্রহ্মানন্দপূর্ণ, কিন্তু তাহাতেও তৃপ্তি নাই। আরও কিছু চাই, আমার হৃদয় মন শূন্য, আমার আকাশ বাতাস শূন্য, কে যেন আমায় পাগল করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্য আমি পাগল হইয়াছি, আমি অভিলাষ করিয়াছি এই জলাশয়ে দেহ বিসর্জ্জন করিব।

ব্রহ্মবাদী জাবালি বিস্মিত হইয়া জগজ্জননী ব্রহ্মবিদ্যার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, মা, আপনি যে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার জন্য আমারও প্রাণ সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। আপনি যদি কৃপা করেন, মন্ত্র ও সাধন উপদেশ করেন, তবেই আমার মনোরথ পূর্ণ হয়। চরণে শরণাগত আমি আপনার, কৃপা করুন, দীন প্রপন্ন আমি, আমাকে উপেক্ষা করিবেন না। আমি চিরদিন আপনারই অন্বেষণ করিয়াছি। জাবালি ব্রহ্মবিদ্যার নিকট মন্ত্র ও সাধন পাইলেন। মানস-সরোবরে কঠোর তপস্যা। একপদে দণ্ডায়মান, অনিমেষ নয়নে ব্রহ্মবাদী জাবালি সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া আছেন। তাঁহার মন্ত্র পঞ্চবিংশতি বর্ণাত্মক। তাঁহার ধ্যান নিম্নরূপ, তিনি-আনন্দব্রহ্ম বা আনন্দ-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতেন।

দধৌ পরমভাবেন কৃষ্ণমানন্দরূপিণম্ ।
চরন্তং ব্রজবীথীষু বিচিত্রগতিলীলয়া ।
ললিতৈঃ পাদবিন্যাসৈ ক্বণয়ন্তঞ্চ নূপুরম্ ।
চিত্রকন্দর্পচেষ্টাভিঃ সস্মিতাপাঙ্গবীক্ষিতৈঃ
সমোহিন্যাখ্যয়া বংশ্যা পঞ্চম্যারুণচিত্রয়া ॥
বিম্বোষ্ঠপুটচুম্বিন্যা কলালাপৈর্ম্মনোজ্ঞয়া ।
হরন্তং ব্রজরামাণাং মনাংসি চ বপুংষি চ
শ্লথন্নীবীভিরাগত্য সহসালিঙ্গিতাঙ্গকাম্ ।
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্
শ্যামলাঙ্গ প্রভাপূর্ণং মোহয়ন্তং জগত্রয়ম্ ॥

জাবালি মুনি পরম-ভক্তিসহকারে আনন্দরূপী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দগতি, তিনি ব্রজের পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহার চরণবিন্যাস অতীব মনোহর, চরণে নূপুরের ধ্বনি হইতেছে, তিনি বিবিধ প্রকারের কন্দর্পচেষ্টা-সমন্বিত হাস্যযুক্ত কটাক্ষদৃষ্টিসমূহের দ্বারা বিম্বোষ্ঠপুটচুম্বিনী, অরুণবর্ণ, পঞ্চমস্বরে নিনাদিত সম্মোহিনী নামক বংশীর দ্বারা, মনোজ্ঞ ও মধুরাস্ফুট আলাপের দ্বারা ব্রজনারীগণের দেহ ও মন আকর্ষণ করিতেছেন। ব্রজগোপীগণের নীবিবন্ধন শিথিল হইতেছে, তাঁহারা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে দিব্যমালা শোভা পাইতেছে, তাঁহার অঙ্গ দিব্য গন্ধদ্রব্যের দ্বারা অনুলিপ্ত। তিনি শ্যামতনু, প্রভাপূর্ণ, ত্রিজগতের মোহনকারী।

কত কাল ধরিয়া ব্রহ্মবাদী জাবালি মুনি সুকঠোর তপস্যা করিলেন। নব কল্প শেষ হইয়া গেল, তিনি প্রচণ্ড নামক গোপের চিত্রগন্ধা-নাম্নী কন্যা-রূপে আবির্ভূত হইলেন। এই গোপী সুকুমারী ও শুভাননা, তাঁহার অঙ্গগন্ধে দশদিক্ আমোদিত।

৬। শুচিশ্রবা ও সুবর্ণ

কুশধ্বজ নামক ব্রহ্মর্ষির দুইটি পুত্র ছিলেন, শুচিশ্রবা ও সুবর্ণ। উভয়েই বেদজ্ঞ ছিলেন। তাঁহাদের মন্ত্র "হ্রীঁ হংসঃ"। তাঁহারা ঊর্দ্ধপদ হইয়া অত্যুৎকট তপস্যা করিতেন। তাঁহারা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতেন।

ধ্যায়ন্তৌ গোকুলে কৃষ্ণং বালকং দশবার্ষিকম্।
কন্দর্পসমরূপেণ তারুণ্য ললিতেন চ।
পশ্যন্তীব্রজবিম্বোষ্ঠী মোহয়ন্তমনারতম্॥

তাঁহারা গোকুলবাসী দশবর্ষবয়স্ক বালক শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ বালক, কিন্তু তাঁহার রূপ ও সুন্দর-তারুণ্য কন্দর্পের তুল্য, বিম্বোষ্ঠী ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহাকে দেখিতেছেন আর শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীগণকে সর্ব্বদা মুগ্ধ করিতেছেন।

কল্পান্তে দেহত্যাগ করিয়া ইঁহারা উভয়ে সুধীর নামক গোপের পরমাসুন্দরী কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই হস্তে একটি করিয়া সারিকা আছে, এই সারিকা মধুরস্বরে গান করিয়া থাকে।

চ। শুক

মুনির নাম দীর্ঘতপা, পূর্ব্বকল্পে তিনি ব্যাস হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম মুনিবর শুক, পরম বিদ্বান্। এই মহাপ্রাজ্ঞ বালকের সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণচরণ চিন্তা, পিতামাতা ছাড়িয়া বনবাসী হইলেন। তিনি জপ করেন, রমাবীজপুটিত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র। তাঁহার ধ্যানের প্রণালী এইরূপ।

দধ্যৌ পরমভাবেন হরিং হৈমতরোরধঃ।
হেমমণ্ডপিকায়াঞ্চ হৈমসিংহাসনোপরি।
আসীনং হেমহস্তাগ্রে দধানং হৈমবংশিকাম্।
দক্ষিণেন ভ্রাময়ন্তং পাণিনা হেমপঙ্কজম্।
হেমদ্রবেন প্রেয়স্যা পরিক্লিপ্তাঙ্গচিত্রকম্।
হসন্তমতিহর্ষেণ পশ্যন্তঞ্চ নিজাশ্রমম্।

হেমতরুর অধোদেশে হেমমণ্ডপ, তাহার উপর হেমসিংহাসন, হেমহস্তে হেমবংশী ধারণ করিয়া হরি সেই সিংহাসনে আসীন। তাঁহার দক্ষিণহস্তে হেমপদ্ম, তিনি সেই পদ্ম ঘুরাইতেছেন। প্রেয়সী তাঁহার অঙ্গে হেমদ্রব লেপন করিতেছেন, আর তিনি অতি হর্ষে হাস্য করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

মুনিবর শুক ঐ মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া অতিশয় আনন্দ পাইতেন, তাঁহার চক্ষু দুইটিতে

হর্ষাশ্রু প্রবাহিত হইত, সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইত। 'হে নাথ, প্রসন্ন হও" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি কম্পিত কলেবরে ভূমিতে লুন্ঠিত হইতেন। এই প্রকারে একদিন তিনি ভূমিতে লুন্ঠিত হইয়াছেন আর শ্রীভগবান্ আসিয়া তাঁহার হাতে ধরিয়া আদর করিয়া উঠাইয়া বলিলেন, আমি মায়াসুত, তুমি আমার প্রিয়তমা, অদ্য হইতে তুমি সর্ব্বদাই আমার নিকটে থাকিবে।

ছ। চিত্রধ্বজ—বিত্রেকলা

চন্দ্রপ্রভা নামে এক রাজর্ষি ছিলেন তাঁহার পুত্রের নাম চিত্রধ্বজ। চিত্রধ্বজ বাল্যকাল হইতেই স্বভাবতঃ বিষ্ণুভক্ত। দ্বাদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে এক ব্রাহ্মণ ঐ বালককে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। এক বিষ্ণু-মন্দিরে থাকিয়া সুবেশ পরিধান-পূর্ব্বক ঐ বালক মন্ত্র জপ করিতেন আর চিন্তা করিতেন।

কথং ভজামি তং কৃষ্ণং মোহনং গোপযোষিতাম্।
বিক্রীড়ন্তং সদা তাভিঃ কালিন্দীপুলিনে বনে॥

গোপবালাগণের মোহনকারী শ্রীকৃষ্ণ যিনি কালিন্দী পুলিনে বনে গোপাঙ্গনগণ সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন, কি প্রকারে আমি তাঁহার ভজনা করিব।

রাজর্ষিপুত্র বালক চিত্রধ্বজ এই চিন্তায় একেবারে আত্মহারা হইলেন। এই সময়ে তিনি স্বপ্নযোগে এক পরমা বিদ্যা লাভ করিলেন। যে মন্দিরে থাকিয়া চিত্রধ্বজ তপস্যা করিতেন, সেই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের এক সুন্দর শ্রীবিগ্রহ ছিলেন। ঐ বিগ্রহ ইন্দিবর-শ্যাম, স্নিগ্ধ, লাবণ্যশালী, ত্রিভঙ্গললিত ও ময়ূরপুচ্ছশোভিত, অধরে সুবর্ণবেণু—যেন বাদিত হইতেছে। পার্শ্বে দুইটি সুন্দরী দেবী মূর্ত্তি, যেন নিত্য চুম্বিত ও আনন্দিত। এক দিন চিত্রধ্বজ প্রণামান্তে এই বিগ্রহ দর্শন করিয়া কেমন লজ্জান্বিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের পার্শ্বস্থিত দেবীমূর্ত্তি দুইটিও যেন লজ্জিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বস্থিত দেবীমূর্ত্তিকে বলিলেন—মৃগলোচনে, দেখিতেছ কি, এই পরমভক্ত বালক তোমারই শরীরের অংশগত হইয়াছে, এখন তুমি ইহাকে আত্মসম করিয়া লও। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া পদ্মনয়না ঐ দেবী চিত্রধ্বজের নিকটবর্ত্তী হইলেন। দেবী ভাবিতে লাগিলেন তাঁহার নিজের অঙ্গ আর ঐ ভক্তবালক চিত্রধ্বজের অঙ্গ যেন অভিন্ন। দেবীর

অঙ্গ হইতে জ্যোতি বাহির হইয়া চিত্রধ্বজের অঙ্গে প্রবেশ করিতে লাগিল। দেবীর স্তনযুগলের প্রভায় চিত্রধ্বজের দুইটি স্তন হইল, দেবীর নিতম্ব-প্রভায় চিত্রধ্বজের অনুরূপ নিতম্ব হইল, কেশরাশির কিরণে কেশরাশি হইল। একটি দীপ হইতে যেমন আর একটি দীপ জ্বলিয়া উঠে, ঠিক সেইরূপ। চিত্রধ্বজের দেহ মন হাব ভাব সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া ঠিক্ ঐ দেবীর ন্যায় হইয়া উঠিল; চিত্রধ্বজ আর বালক নহে, সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হইয়া পরমা সুন্দরী যুবতী হইয়াছেন, তিনি এখন লজ্জিতা ও মৃদুহাস্যযুতা। ঐ দেবী তাঁহাকে গোবিন্দের বামপার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, আপনার এই দাসী, ইঁহার নামকরণ করুন, ইঁহাকে কিরূপ সেবা করিতে হইবে আদেশ করুন। গোবিন্দকে আর কিছু বলিতে হইল না, দেবী নিজেই বলিলেন, ইহার নাম হইল চিত্রকলা। চিত্রকলে, তুমি এই বীণা গ্রহণ কর, তুমি সর্ব্বদা বীণাবাদন করিয়া প্রভুর গুণগান করিবে, ইহাই তোমার সেবা। চিত্রকলা গোবিন্দ ও তাঁহার প্রেয়সীদ্বয়কে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিলেন—যুগল-রূপের বন্দনা করিয়া বীণা বাজাইয়া সুমধুর স্বরে গান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

সমুদয় ব্যাপারটি একটি স্বপ্ন। আলিঙ্গনের অনির্ব্বচনীয় আনন্দে চিত্রধ্বজের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। প্রেমাবেশে বিহ্বল ও আত্মহারা চিত্রধ্বজ কাতরস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। সেই হইতে চিত্রধ্বজের আর আহার নাই নিদ্রা নাই, বাহ্যজ্ঞানও নাই। তাঁহার পিতা কত কথাই জিজ্ঞাসা করেন, উত্তর নাই। অল্পদিন পরেই চিত্রধ্বজ লোকালয় ছাড়িয়া বনপ্রদেশে পলায়ন করিলেন। তাঁহার সেই কঠোর তপস্যা চলিতে লাগিল। প্রলয়কাল উপস্থিত বুঝিয়া চিত্রধ্বজ তপোবলে দেহত্যাগ করিলেন। তিনি এখন বীরগুপ্ত নামক গোপের কন্যা, তাঁহার নাম চিত্রকলা। তাঁহার স্কন্ধদেশে সপ্তস্বর-শোভিতা মনোহর বীণা সর্ব্বদাই বিরাজিত।

জ। পুণ্যশ্রবা—লবঙ্গা

কশ্যপবংশসম্ভূত এক তপস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার পুত্রের নাম পুণ্যশ্রবা। ঐ ব্রাহ্মণ অতিশয় শিবভক্ত ছিলেন। চতুর্দ্দশীর অর্দ্ধরাত্রে হরগৌরী আবির্ভূত হইয়া ঐ ব্রাহ্মণকে বর দিলেন, তোমার পুত্রটি পরম কৃষ্ণভক্ত হইবে। আমি তোমাকে একটি

এক বিংশতি-অক্ষর সিদ্ধ মন্ত্র দিতেছি, তোমার পুত্রের যখন আট বৎসর বয়স হইবে, তখন এই মন্ত্রে উহাকে দীক্ষিত করিবে। বালককে দীক্ষিত করিয়া নিম্নরূপ ধ্যান-প্রণালী শিখাইও।

পূর্ণামৃতনিধের্ম্মধ্যে দ্বীপং জ্যোতির্ম্ময়ং স্মরেৎ।
কালিন্দ্যা বেষ্টিতং তত্র ধ্যায়েদ্ বৃন্দাবনং বনম্॥
সর্ব্বর্ত্তু কুসুমস্রাবি-দ্রুমবল্লীভিরাবৃতম্।
নৃত্যন্মত্তশিখিস্বানং গায়ৎকোকিল ষট্‌পদম্॥
তস্য মধ্যে বসত্যেকঃ পারিজাত তরুর্ম্মহান্।
শাখোপশাখা বিস্তারৈঃ শতযোজনমুচ্ছ্রিতঃ॥
তলে তস্যাথ বিমলে পরিতো ধেনুমণ্ডলম্।
তদন্তর্ম্মণ্ডলং গোপ-বালানাং বেণুশৃঙ্গিনাম্॥
তদন্তরে তু রুচিরং মণ্ডলং ব্রজ সুভ্রুবাম্।
নানোপায়নপাণীনাং মদবিহ্বলচেতসাম্॥
কৃতাঞ্জলিপুটানাঞ্চ মণ্ডলং শুক্লবাসসাং
শুক্লাভরণভূষাণাং প্রেমবিহ্বলিতাত্মনাম্॥
তত্রবেদ্যাং ততো ধ্যায়েদ্দুকূলাবরণং হরিম্।
উরৌ শয়ানং রাধায়াঃ কদলীকাণ্ডকোপরি॥
তদ্বক্ত্রং চন্দ্রসুস্মেরং বীক্ষমানং মনোহরম্।
কিঞ্চিৎকুঞ্চিতবামাঙ্ঘ্রি-বেণুযুক্তেন পাণিনা॥
বামেনালিঙ্গ্য দয়িতাং দক্ষিণং চিবুকং স্পৃশন্।
মহামারকতাভাসং মৌক্তিকচ্ছায়মেব চ।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষং পীতনির্ম্মলবাসসম্॥
বর্হভারলসচ্ছীর্ষং মুক্তাহার মনোহরম্।
গণ্ড প্রান্তলসচ্চারুমকরাকৃতি কুণ্ডলম্॥
আপাদতুলসীমালং কঙ্কণাঙ্গদভূষণম্।
নূপুরৈর্ম্মুদ্রিকাভিশ্চ কাঞ্চ্যা চ পরিমণ্ডিতম্॥
সুকুমারতনুং ধ্যায়েৎ কিশোরবয়সান্বিতম্॥

পূর্ণামৃত সিন্ধুমধ্যে জ্যোতির্ম্ময় দ্বীপ। সেই দ্বীপে, কালিন্দী-নদী-বেষ্টিত বৃন্দাবন বন।

সকল ঋতুর পুষ্প তথায় নিত্য-প্রস্ফুটিত ও নিত্য-পতিত। পুষ্পময় তরুলতা শোভে অগণন। মত্ত ময়ূরের দল নিত্য-নৃত্যরত। কোকিল ভ্রমরকুল গীতে মাতোয়ারা। বনের ভিতরে এক সুবৃহৎ পারিজাত তরু। সেই তরুর শাখা উপশাখা শত যোজন উচ্চ ও সর্ব্বদিকে বিস্তারিত। সেই তরুর সুনির্ম্মল তলদেশে অগণিত ধেনু চতুর্দ্দিকে বিচরণ-শীল। সেইস্থানে বেণু ও শৃঙ্গধারী গোপবালকগণ মণ্ডলাকারে বিরাজিত, সেই মণ্ডলের মধ্যে আর একটি সুন্দর মণ্ডল, তাহা সুভ্রুবা ব্রজবালাগণের দ্বারা গঠিত। ব্রজবালাগণের হস্তে নানাপ্রকারের সেবার সামগ্রী, তাহারা মদবিহ্বলচিত্তা, শুক্লবস্ত্র পরিধানা-ও কৃতাঞ্জলি-পুটা। ব্রজবালাগণের ভূষণ ও আভরণ শ্বেতবর্ণ, তাহাদের আত্মা প্রেমবিহ্বল। এই গোপীগণ শ্রুতিকন্যাদিগের প্রিয় বাক্য সর্ব্বদা শুনিতেছেন ও পালন করিতেছেন। এই মণ্ডলীর ভিতর রত্নদেবী, রত্নবেদীর উপর বস্ত্রাবৃত শ্রীহরি শ্রীরাধার কদলীকাণ্ডসদৃশ উরুদেশে শায়িত অবস্থায় শ্রীরাধার চন্দ্রবদন পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বামচরণ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিয়া দয়িতা শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিতেছেন ও তাঁহার দক্ষিণ চিবুক স্পর্শ করিতেছেন। মহামরকতমণিতুল্য শ্রীকৃষ্ণের কান্তি, গলে মুক্তাহার পুণ্ডরীক-নয়ন, পীত-নির্ম্মল বসন তাঁহার পরিধান, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ, গণ্ডস্থলের প্রান্ত-দেশে অতি সুন্দর মকরাকৃতি কুণ্ডল, তাঁহার চরণ-পর্য্যন্ত তুলসীর মালা, কঙ্কণ ও অঙ্গদ তাঁহার ভূষণ, নূপুর মুদ্রিকা ও কাঞ্চীর দ্বারা তিনি পরিমণ্ডিত। কিশোরবয়সান্বিত সুকুমার তনু শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে ধ্যান করিবে।

শঙ্কর ও পার্ব্বতী কাশ্যপগোত্রীয় শিবভক্ত ব্রাহ্মণকে এই ধ্যান প্রণালী বলিয়া বলিলেন, দশাক্ষর মন্ত্রে পূজা হইবে আর চতুর্লক্ষ জপে পুরশ্চরণ হইবে। ব্রাহ্মণ যথা-কালে তাঁহার পুত্রকে যথারীতি দীক্ষিত করিয়া, এই সব উপদেশ তাহাকে দিলেন। এই মন্ত্রের জপ ও এই প্রকারের ধ্যানের প্রভাবে পুত্র পুণ্যশ্রবার রূপ লাবণ্য ও প্রতিভা এমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে সেই মুনিসমাজে তাঁহার আর কেহ সমকক্ষ রহিল না। পুণ্য-শ্রবা সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণ ও লীলা বর্ণনা করেন, তাঁহার মুখের বর্ণনা শুনিয়া সকলেই আনন্দিত ও মুগ্ধ। কিছুদিন পরে সেই ভক্তবালক গৃহত্যাগী হইলেন, অন্য কোন কিছু আর তিনি আহার করেন না, একমাত্র বায়ু ভোজন করিয়া তিনি তপস্যা করিতে লাগিলেন। কত যুগ চলিয়া গেল, অযুতত্রয় কল্পকাল এই তপস্যা চলিল।

এখন তিনি গোকুলে নন্দগোপের ভ্রাতার ভবনে লবঙ্গানাম্নী কন্যারূপে আবির্ভূত। ইনি সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের গতিবিধি ও ইঙ্গিত পর্য্যবেক্ষণ করেন, মুখমার্জ্জনের দ্রব্য ও যন্ত্রাদি তাঁহার হস্তে।

* * * *

কয়েকজন প্রধান প্রধান মুনির মন্ত্র, ধ্যানপ্রণালী, তপস্যা ও পরিণাম কথিত হইল। পদ্মপুরাণে ইহা ছাড়া আরও অনেকগুলি মুনির পরিচয় আছে। জটিল, জজ্বপূত, ঘৃতাশী, ও কর্ব্বু, এই চারিজন মুনি জলমগ্ন হইয়া তপস্যা করিতেন, রমাবীজত্রয়ে পুটিত দশাক্ষরাত্মক স্মরাদি-মন্ত্র জপ করিতেন। তাঁহারা নিম্নরূপ ধ্যান করিতেন।

দধ্যুশ্চ গাঢ়ভাবেন বল্লবীভির্ব্বনে বনে
ভ্রমন্তং নৃত্যগীতাদ্যৈস্তর্পমানম্বস্তং মনোহরম্॥
চন্দনালিপ্তসর্ব্বাঙ্গং জবাপুষ্পাবতংসকম্।
কহ্লারমালয়াবীতং নীলপীতপটাবৃতম্॥

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণের সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণশীল, গোপীগণ নৃত্য ও গীতাদি দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ চন্দনলিপ্ত ও মনোহর, জবাফুল তাঁহার কর্ণভূষণ, গলদেশে কহ্লার পুষ্পের মালা, নীলবর্ণ ও পীতবর্ণ বস্ত্রে তাঁহার দেহ আচ্ছাদিত।

এই মুনি-চতুষ্টয়ও তিন কল্প পরে গোপীত্বলাভ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া উপনন্দের এক নীলপদ্মকান্তিশালিনী কন্যার প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু নাম নাই। ইনিও পূর্ব্বে একজন মুনি ছিলেন। এই গোপীর হস্তে শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বনীয় বস্তু বিদ্যমান। ইনি সঙ্গীতনিপুণা। ইঁহার সঙ্গীত শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ইঁহার গলদেশে গুঞ্জাবলী দিয়াছিলেন, সেই গুঞ্জাবলী এখনও তাঁহার গলদেশে শোভা পাইতেছে। কৃষ্ণবধূ এই গোপিকার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীকৃষ্ণের বিরহের সময় তিনি কাতরচিত্তে সুমধুর স্বরে যখন কৃষ্ণগুণ গান করেন, তখন অন্যান্য গোপীরা বাদ্য বাদন করেন! আবার কখন কখন তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের বেশ পরাইয়া দেন। শ্রীকৃষ্ণের বেশ পরিয়া তিনি যখন নৃত্য করেন, সেই সময়ে অন্যান্য গোপীরা গোবিন্দজ্ঞানে তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন।

শ্বেতকেতু নামক এক ব্যক্তির বেদবেদাঙ্গপারগ পুত্র গোবিন্দের পরমাশক্তির

আরাধনা করিয়াছিলেন তিনি একাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিতেন। তিনি এখন অবনির কন্যা ব্রজগোপী।

৯। শেষ কথা

পদ্মপুরাণ হইতে এই উপাখ্যানটি লিখিত হইল। শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে আরও অনেক কথা আছে। তাহা প্রবন্ধান্তরে আলোচিত হইবে। আমরা এ-পর্য্যন্ত শ্রীরাধা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিয়াছি। ১। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধা-প্রসঙ্গ ২। শ্রীরাধাতত্ত্ব ৩। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীরাধা ৪। বৃন্দাবনে শ্রীরাধা (ইহা তৃতীয় পুস্তকের শেষাংশ) ৫। বিদগ্ধমাধবে শ্রীরাধা ৬। ললিত-মাধবে শ্রীরাধা ৭। দানকেলিকৌমুদী ও শ্রীরাধা। ৮। গীতগোবিন্দে শ্রীরাধা ৯। জগন্নাথবল্লভে শ্রীরাধা ১০। শ্রীদুর্গা ও শ্রীরাধা। বর্ত্তমান প্রবন্ধে পদ্মপুরাণে শ্রীরাধার একাংশ আলোচিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই কলিযুগে আবির্ভূত হইয়া যে-প্রেমধর্ম্ম দিয়া গিয়াছেন, তাহার সারকথা শ্রীরাধা। শ্রীমন্মহাপ্রভুই স্বরূপে ও অন্তরের অন্তরে শ্রীরাধা। সুতরাং আমাদের দেশের ধর্ম্মজীবনের ভিতরের কথা বুঝিয়া যদি আমরা ধন্য হইতে চাই, আমাদের দেশের ভাবুক ও ভক্তগণের হৃদয়ের সহিত যদি আমরা পরিচিত হইতে চাই, তাহা হইলে শ্রদ্ধাসহকারে সকল দিক্ হইতে এই শ্রীরাধার কথা আলোচনা করিতে হইবে।

কতকগুলি কথা স্পষ্ট। বর্ত্তমান কালের সমালোচকগণ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা বা শ্রীবৃন্দাবনের ঐতিহাসিকতা নির্দ্ধারণের জন্যই ব্যস্ত। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা যাহাকে ঐতিহাসিকতা বলেন তাহা ছাড়া মানুষের আর কিছুই যেন ভাবিবার বুঝিবার ও অন্বেষণ করিবার নাই। ইহা একটি দূষণীয় কুসংস্কার। ভাবুকের পদ্ধতি বলিয়া একটা খুব বড় জিনিস রহিয়াছে। কতকগুলি জিনিষ বাহ্যেন্দ্রিয়ের কাছে সত্য, আর কতকগুলি জিনিস বাহ্যেন্দ্রিয়ের অগোচর কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয় বা চিন্তার নিকট সত্য। True to the sense আর True to the thought. বাহ্যেন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেই তাহাকে যদি মিথ্যা বলেন, তাহা হইলে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি ভক্তহৃদয়ের প্রিয়তম ও গূঢ় বস্তু-সম্বন্ধে আলোচনা না করাই উচিত। আমরা বলিব, অন্তরিন্দ্রিয়ের নিকট

বা চিন্তার নিকট যাহা সত্য, that which is true to the thought, তাহা সকল স্থলে বা সকলের নিকট না হইলেও অনেকস্থলে বা অনেকের নিকট বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সত্য অপেক্ষা বেশী সত্য is more true than what is true to the sense. মানব সমাজে যাঁহারা মহত্ব লাভ করিয়াছেন, পূজনীয় হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনবৃত্ত শ্রদ্ধাসহকারে আলোচনা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। এই জন্যই সর্ব্বপ্রথম ভক্তের পূজা। ভক্তের যাহা ভাব, অনুভব ও অভিজ্ঞতা (sensation, idea, experience) তাহার উপর শ্রদ্ধা না থাকিলে, ভক্তের পূজা বা প্রকৃত সাধু-সঙ্গ হয় না। আদৌ শ্রদ্ধা, তাহার পর সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ না হইলে ভজনা হয় না, ভক্তি হয় না।

দ্বিতীয় কথা, ভক্তি বলিয়া যে বৃত্তি বা শক্তি (principle বা faculty) আছে, তাহা একটা অসার কল্পনা বা স্নায়বিক ব্যাধি নহে। এই ভক্তি এক নব দৃষ্টি (a new sight.), একটি নব অনুভব ও নবচৈতন্য (a new sense, a new consciousness), ইহাই চরমে শ্রীরাধা, আবার ইহাই, এই চৈতন্যই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (Consciousness of the Lord of Supreme Love.) বাঙ্গলা ধন্য, ভারত ধন্য, মানবজাতি ধন্য, এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঘন হইয়া, মূর্ত্তি লইয়া নিত্যানন্দ-সহ আবির্ভূত হইয়াছেন। ভারতের চিরপরিচিত ও চিরপূজ্য অদ্বৈত বা ব্রহ্মজ্ঞান সফল হইয়াছে।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ধর্ম্মপ্রচারকগণ এবং সমাজ-সংস্কারকগণ প্রবৃত্তিমার্গ অপেক্ষা নিবৃত্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। ইহার ফলে হিন্দুদিগের অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে জাতি-হিসাবে তাহারা জগতের সম্মুখে স্পর্দ্ধার সহিত দাঁড়াইতে অক্ষম হইয়াছে। এই নিবৃত্তিমার্গের ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহারা, যাঁহারা নির্ব্বাণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জগৎকে মায়া বলিয়াছেন—জগৎকে মিথ্যা

বলিয়াছেন—জগৎকে কেবল—দুঃখময় বলিয়াছেন। এই মায়াবাদ বুদ্ধদেবের সময় হইতে প্রচারিত হওয়ার কথা আমরা জানি—তাহার পূর্ব্বে এইরূপ মায়াবাদ ছিল কি না ইতিহাস সেকথা বলিতে পারে না। যাহাই হউক নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তিমার্গ সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ এখনও অনেক হিন্দু আছেন যাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গের নামে শিহরিয়া উঠেন। তাঁহাদের ধারণা প্রবৃত্তিমার্গ বিপদ-সঙ্কুল, অমঙ্গলময় এবং পতনের পথ। সেইজন্য ভোগে তাঁহাদের সুখ বা আনন্দ হয় না, অথচ ভোগ না করিয়াও থাকিতে পারেন না। এই মিথ্যাচারে এবং কপটাচারে কোন জাতির উন্নতি হইতে পারে না।

নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তিমার্গের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সৃষ্টিতত্ত্বের এবং মানুষের বিষয় বিচার করিয়া দেখা বিশেষ আবশ্যক।

সৃষ্টি ভগবানের ইচ্ছাশক্তি হইতে হইয়াছে। এই ইচ্ছাশক্তি ভগবানে বিদ্যমান আছে। এই শক্তির অপ্রকট অবস্থাই প্রলয় বা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের অবস্থা, আর এই শক্তির প্রকট অবস্থাই সৃষ্টি বা লীলা বা সগুণ ব্রহ্মের অবস্থা। শক্তি থাকিলেই ক্রিয়া থাকিবে, সেইজন্য ভগবান মূলে সগুণ এবং ক্রিয়াশীল। নির্গুণ বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা ভগবানের বিশ্রাম অবস্থা।

মানুষেরও এইরূপ দুই অবস্থা। যখন চিত্তবৃত্তি স্থির থাকে কোন কাজ করে না তখন নির্গুণ বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা, আর যখন চিত্তবৃত্তি কাজ করে তখন সগুণ বা ক্রিয়াশীল অবস্থা। ক্রিয়া এবং বিশ্রাম উভয়ই মানুষের প্রয়োজনীয়। বিশ্রামহীন কর্ম্ম যেমন ক্লান্তি ও অবসাদ আনয়ন করে, সেইরূপ কেবলমাত্র বিশ্রামেও মানুষকে অথর্ব্ব করিয়া ফেলে।

দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকলের পুষ্টি সাধন হয় তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচালনায়। এই পরিচালনা করার ইচ্ছা আমাদের স্বাভাবিক। একটী শিশুর দিকে লক্ষ্য রাখিলে ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। শিশু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করে, দেখিবার জন্য চক্ষু ফিরায়। কথা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ থাকে, হাসে কাঁদে সকল বিষয় জানিতে চায়—এই সকল স্বাভাবিক। এই সকল স্বাভাবিক কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ করিলে অর্থাৎ শিশুকে নড়িতে চড়িতে না দিলে, চাহিতে না দিলে, শুনিতে না দিলে, খাইতে না দিলে, যাহা জানিতে চায় বুঝাইয়া না দিলে শিশুর পুষ্টির কথা ত দূরের কথা—শিশু বিকলাঙ্গ ও জড়ভরত হইয়া মরিয়া যাইতে পারে।—অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় উভয়ের পরিচালনা করিলেই উভয়ের বিকাশ হইতে পারে এবং মানুষ প্রকৃত মানুষ হইতে পারে। সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহ সম্পূর্ণ বিকশিত হইলে অতীন্দ্রিয় বস্তুর উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা হইতে পারে, তাহার পূর্ব্বে কখনই হইতে পারে না।

ভগবান সত্য এবং তাঁহার লীলাও সত্য। এই লীলাও ভগবানের ন্যায় নিত্য, অনাদি ও অনন্ত।

যাঁহাদের এই মত তাঁহাদের নিকট জগৎ মিথ্যা নয়। যাঁহাদের মতে ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা—যাঁহারা ভগবানের লীলা স্বীকার করেন না তাঁহাদের নিকট জগৎ রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায়। এ মতভেদ বহুকাল হইতে আছে। ইহার সত্য মিথ্যা বিচার করিয়া কোন সুফল পাওয়া যাইবে না—কেবলমাত্র পণ্ডশ্রম হইবে। তবে প্রথম মতাবলম্বীগণের পক্ষে প্রবৃত্তিমার্গ এবং দ্বিতীয় মতাবলম্বীগণের পক্ষে নিবৃত্তিমার্গ যে উপযোগী ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

সৃষ্টির মধ্যে ভগবানের একটী খেলা আছে—সেইটী সুরাসুরের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ না থাকিলে লীলা সম্পূর্ণ হয় না। অন্ধকার না থাকিলে যেমন আলোর মর্য্যাদা নাই—দুঃখ না থাকিলে যেমন সুখের আদর নাই—জটিলা কুটিলা না থাকিলে যেমন ব্রজলীলা সম্পূর্ণ হয় না—সেইরূপ প্রবৃত্তির ভিতরে সু আর কু আছে। সৃষ্টির এই খেলা মানুষের পরীক্ষার জন্য।

চক্ষু দেখিতে চায়, কর্ণ শুনিতে চায়, জিহ্বা আস্বাদন করিতে চায়, নাসিকা আঘ্রাণ লইতে চায়, হাত কাজ করিতে চায়, পা চলিতে চায়, স্নেহ ভালবাসা দয়া প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি সকল আপন আপন বিষয় চায়, বুদ্ধি নানাবিধ নূতন নূতন তত্ত্ব জানিতে চায়। দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের ইহাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই সকল করিতে দেওয়ার নাম প্রবৃত্তিমার্গ, আর এই সকল করিতে না দেওয়ার নাম নিবৃত্তিমার্গ। প্রবৃত্তিমার্গ স্বাভাবিক আর নিবৃত্তিমার্গ অস্বাভাবিক। প্রবৃত্তিমার্গ জীবের স্বধর্ম্ম আর নিবৃত্তিমার্গ জীবের পরধর্ম্ম।

প্রথমতঃ নিবৃত্তিমার্গের বিষয় বিচার করিয়া দেখা যাউক। চিত্তবৃত্তি বা প্রকৃতি আত্মার নিকট বিষয় প্রদর্শন করে ও আত্মার বিষয় ভোগ হইয়া থাকে। আত্মার বিষয় ভোগ বা সংসার ভোগ বন্ধ করিতে হইলে চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে নিরোধ করিতে হইবে। নিবৃত্তিমার্গের প্রকৃত অর্থ চিত্তবৃত্তির নিরোধ। নিবৃত্তিমার্গের ব্যক্তির নিকট সকল কর্ম্মই বন্ধনের মূল—সুকর্ম্মই হউক আর কুকর্ম্মই হউক—কর্ম্ম থাকিতে আত্মার মুক্তি হইতে পারে না। চিত্তবৃত্তি বা প্রকৃতিই কর্ম্মের মূল সুতরাং চিত্তবৃত্তির নিরোধ না হইলে কর্ম্মত্যাগ হইতে পারে না। একমাত্র যোগদ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে। নিবৃত্তিমার্গে যোগ ভিন্ন গতি নাই। ইহাতে দয়া, ক্ষমা, ভালবাসা প্রভৃতি সুবৃত্তি সকলের এবং স্বার্থপরতা হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি কুবৃত্তি সকলের নিরোধ করিতে হইবে। গীতা বলিয়াছেন এই পথ ক্লেশকর। আমরাও অনুমান করিতেছি যে এই পথ স্বাভাবিক এবং সহজ নয়। সুতরাং এ বিষয়ে আলোচনা না করাই ভাল। তবে ভগবান যখন সৃষ্টিশক্তির বা ইচ্ছাশক্তির প্রত্যাহার করিবেন অর্থাৎ যখন সৃষ্টি থাকিবে না—তখন নিবৃত্তিমার্গের ও প্রবৃত্তিমার্গের সকলেই একস্থানেই যাইবেন, তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রকৃতিলয় আত্মাগণ সকটক রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় শূন্যমার্গেই বিচরণ করেন কি না কে বলিতে পারে?

যাঁহারা লীলাময় ভগবানের আরাধনা করেন—যাঁহারা অপ্রকট অপেক্ষা ভগবানের প্রকট অবস্থা ভালবাসেন—যাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের পূজা করেন—ভগবান সত্য এবং জগৎ সত্য যাঁহাদের বিশ্বাস—ভগবানের প্রকট অবস্থাই জগৎ, যাঁহারা বুঝিয়াছেন—তাঁহাদের পথ—প্রবৃত্তিমার্গ। এই পথ জীবের স্বাভাবিক সহজ এবং ইহাই জীবের স্বধর্ম্ম। প্রাণ মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের ইহাতেই সম্পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে এবং মানুষ জড়ভরত না হইয়া প্রকৃত মানুষ হয়। সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয় দেহের পুষ্টি সাধন হইলেই সম্পূর্ণ মানুষ হয়। শরীর অসুস্থ হইলে চিত্ত অসুস্থ হয় এবং মন ভাল না থাকিলে শরীরও ভাল থাকে না—ইহা স্বাভাবিক। ইচ্ছারই অপর নাম প্রকৃতি, চিত্ত বা প্রবৃত্তি। ইহা ভগবানের দান। ভগবান মনুষ্যেতর জীবে এই ইচ্ছাশক্তির নির্দ্দিষ্ট সীমা বাঁধিয়া দিয়াছেন। তাহাদের জ্ঞান ও ক্রিয়া অনাদিকাল হইতে একভাবে চলিয়া আসিতেছে এবং ইহার মধ্যে ভাল মন্দ নাই সকলই একরূপ। কিন্তু ভগবান মানুষের ইচ্ছাশক্তির এইরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা করিয়া দেন নাই, যদ্বারা সকল মানুষের জ্ঞান ও ক্রিয়া একরূপ হইবে। এই ইচ্ছাশক্তি মানুষের অসীম এবং ইহার মধ্যে ভালমন্দের বীজ আছে এবং ইহাই মানুষের পরীক্ষার স্থল। এই শক্তির প্রভাবে একদিকে মানুষ যেমন দেবতা হইতে পারে, অন্যদিকে তেমনি অসুর হইতে পারে। প্রকৃতি অনুসারে ইন্দ্রিয়গণ শত্রু বা মিত্র কিম্বা উভয়ই হইতে পারে। সকল ইন্দ্রিয়েরই ভালর এবং মন্দের দিক আছে। চক্ষুর কার্য্য দর্শন। স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য দেখিয়া কাহারও মনে সুভাব আইসে আবার কাহারও মনে কুভাব আইসে—তাই বলিয়া বিল্বমঙ্গলের ন্যায় চক্ষু নষ্ট করা বিবেচকের বা বীরের কার্য্য হইতে পারে না। আহারে শরীরের পুষ্টি সাধন করে, আবার পীড়াও আনয়ন করে। তাই বলিয়া আহার বন্ধ করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ধনে সঞ্চয়বাসনা ও বিলাসিতা আনিতে পারে বলিয়া ধনোপার্জ্জন করিব না—ইহা মূর্খের এবং কাপুরুষের কার্য্য। প্রবৃত্তির মধ্যে সুবৃত্তি এবং কুবৃত্তি আছে বা অক্লিষ্ট এবং ক্লিষ্ট বৃত্তি আছে। সুপ্রবৃত্তির আশ্রয় লইতে হইবে এবং কুপ্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাকেই ভোগ এবং ত্যাগ বলে এবং এই ভোগ ও ত্যাগের মধ্য দিয়াই মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়। ভোগ বন্ধ করিলে দেহ মন প্রাণ বুদ্ধি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় শুষ্ক হইয়া যায় এবং কার্য্যকরী থাকিতে পারে না। উপযুক্ত ভোগ না পাইলে দৈহিক এবং মানসিক শক্তির হ্রাস হয় এবং মানুষ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মবিদ্যা, ক্ষাত্রবিদ্যা, ভেষজ, জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রভৃতি এবং সামাজিক বিধি নিয়ম প্রভৃতি যে ঋষিগণ আবিষ্কার ও প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের তপোবনে যেমন ঐশ্বর্য্য ও আনন্দ নিত্য বিরাজ করিত তেমনি ত্যাগও ছিল। তপোবনকে ভূস্বর্গ বলিত। ঋষিগণ যেমন ভোগী ছিলেন তেমনি ত্যাগী ছিলেন। তাঁহাদের কুমার কুমারীগণ দেবপুত্র ও দেবকন্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেন। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য-দ্বারা শরীর ও মনের সম্পূর্ণ বিকাশ করিতেন এবং সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইতেন। তাঁহারা

ভোগের সহিত তপস্যা করিতে জানিতেন এবং ভোগ ও ত্যাগের প্রকৃত অর্থ তাঁহারাই অবগত ছিলেন। আমি খাইতে বসিয়াছি এমন সময় যদি ক্ষুধার্ত্ত কেহ আসিয়া খাইতে চায়, আর আমি না খাইয়া যদি তাহাকে দিতে পারি তবেই আমি ত্যাগী—কৃচ্ছসাধন উদ্দেশে উপবাস, অর্দ্ধাশন কিম্বা বলবুদ্ধি বৃদ্ধিকারক আহার ত্যাগ প্রকৃত ত্যাগ নহে। ভোগ স্বাভাবিক। এই ভোগ প্রকৃত মানুষ হইবার জন্য থাকা চাই। প্রবৃত্তিমার্গই মানুষের স্বাভাবিক এবং সহজ পথ। নিত্যানন্দ ভক্তগণের ইহাই পথ। ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেব জড়বাদ বা মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া আমাদিগকে এই পথই দেখাইয়া গিয়াছেন :—

'জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন।
ইহা ভিন্ন ধর্ম্ম নাই শুন সনাতন ॥'

ধর্ম্মে প্রবৃত্তি আর অধর্ম্মে নিবৃত্তি ইহাকেই প্রকৃত প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমার্গ বলে। যাহা ধর্ম্ম যাহা সত্য তাহা করিতে হইবে। আহার করা ধর্ম্ম। আহারীয় সংগ্রহ করাও ধর্ম্ম। ইহা সত্য। ইহার ত্যাগ অধর্ম্ম, ইত্যাদি। প্রবৃত্তি নিবৃত্তির মধ্য দিয়াই মানুষকে যাইতে হইবে। প্রবৃত্তি মুখ্য আর নিবৃত্তি গৌণ। প্রবৃত্তি যদি কুপথে যায় তবেই নিবৃত্তির প্রয়োজন, নতুবা নিবৃত্তির কোন আবশ্যকতা নাই।

শ্রীশশিভূষণ সেনগুপ্ত

অখিল-ভারত-ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলন

এই সম্মেলনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিচার হইয়াছে। ১। বিবাহের বয়স। কত বয়স হইতে কত বয়স পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহকাল শাস্ত্রসম্মত? বর্ত্তমান পরিস্থিতি অনুসারে কত বয়স পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে? এই প্রসঙ্গে পুরুষের কত বৎসরের বয়সের পর বিবাহ করা উচিত নহে, তাহার আলোচনা হয়। ২। ঋতুমতী কন্যার বিবাহ। প্রায়শ্চিত্তান্তে এইরূপ কন্যার ব্যবহার্য্যতা আছে কিনা? ৩। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বর্ণ এবং ভিন্ন দেশবাসী স্বজাতিমধ্যে পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে কিনা? ৪। বৈষ্ণব দীক্ষা বা ভাগবতধর্ম্ম-দীক্ষা দ্বারা জাতি পরিবর্ত্তন হইতে পারে কিনা? ৫। প্রণবোচ্চারণে শূদ্রের অধিকার আছে কি না?

৬। বর্ত্তমান ম্লেচ্ছ যবনাদি জাতি কর্ম্মদ্বারা বা জন্মদ্বারা উৎপন্ন ? ৭। পতিতাবস্থায় স্বভার্য্যায় উৎপন্ন পুত্রকন্যাদির বিবাহ বিষয়ে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কিরূপ? ৮। স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার, যবন ও অন্ত্যজ জাতির তুলনা ৯। কূপোদক-গ্রহণে অস্পৃশ্যজাতির অধিকার ১০। ব্রাত্য-সংস্কার ১১। বিধবা-বিবাহ ১২। ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন। এই দ্বাদশটি বিষয়ে বিচার হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন মত মধ্যস্থের নিকট দেওয়া হইয়াছে, ফল বা মীমাংসা একরূপ জানা গিয়াছে, তবে বোধ হয় ঘোষণা করা হয় নাই। আমরা নিম্নে আমাদের বাঙ্গলাদেশের কয়েকখানি বিখ্যাত সংবাদ পত্রের অভিমত উদ্ধৃত করিলাম।

১। বঙ্গবাসী

ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও বর্ণাশ্রমাচার-রত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদি সকলের সমবেত যত্নে কাশীর মহাসভা—অখিল-ভারতবর্ষীয়-ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলন—মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কাশীর মহাসভার হাসি খুসি আনন্দ কোলাহল কিছুরই কমি ছিল না। এই মহাসভার উদ্‌যোগ-পর্ব্ব বহু পূর্ব্ব হইতেই আরব্ধ হইয়াছিল। বৃহদ্ ব্যাপারে বাধা বিঘ্ন সেকালেও হইত, একালেও হয়; সেকালে আসুর উপদ্রবে যেমন যজ্ঞাদি কার্য্য বিপর্য্যস্ত হইত, একালেও তেমনই সনাতন বর্ণাশ্রমাচারের প্রতি-কূল অসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক তথাবিধ সাধুকার্য্য বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া থাকে। পুরাণে ইতিহাসে পাওয়া যায়,—সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে যাগকর্ত্তারা অসীম শক্তিশালী ছিলেন, তাঁহাদের ইঙ্গিতে ক্ষাত্র শক্তির প্রভাবে অসুরেরা বিঘ্নোৎপাদনে যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইত না; কিন্তু এই কলিকালে তাহারা অনায়াসেই সফলমনোরথ হয়। মনে হয়—সেই সকল অসুরেরা স্ব স্ব প্রাক্তন সংস্কারবশে এদেশের সন্তানসন্ততিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া এই সকল অনর্থ ঘটাইতেছে।

কাশীর সভায় প্রমথের প্রগল্‌ভতা একেবারে অস্বাভাবিক নহে। বিশেষতঃ যেখানে পঞ্চানন, সেইখানেই প্রমথের আগমন। কাশীপুরী গণতন্ত্র, তাই প্রমথের দল প্রথমতঃ লম্ফ ঝম্ফ করিয়া বিভীষিকার সূচনা করিয়াছিল, কিন্তু পঞ্চাননের প্রভাবে একে একে সকলেই স্ব স্ব নিলয়ে শান্তভাবে থাকিতে বাধ্য হয়। রামেশ্বরের প্রসাদে মদনের মোহনবাণও ব্যর্থ হয়, এ সকলই শঙ্করের কৃপা।

এইরূপ পদে পদে যে কত বাধা বিঘ্নের সম্ভাবনা হইয়াছিল, তাহার পূর্ণ বিবরণ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। শ্রীশঙ্করের কৃপায় সকল দিকেই যে এই মহাসভার সাফল্য হইয়াছে, ইহা ভারতবাসীর সৌভাগ্য।

গত ২০শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার হইতে ২২শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত মহাসম্মেলন সভার অধিবেশন হয়। স্থান—কাশীর মিশ্রিপোখরার প্রাচীর-বেষ্টিত প্রকাণ্ড মাঠ। সুবৃহৎ সভামণ্ডপ মধ্যে প্রতিদিন প্রায় দশসহস্র দর্শকের সমাগম হইত। সভায় সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না,

সভা-প্রবেশের জন্ত টিকিট করা হইয়াছিল, এ টিকিটও সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী ব্যক্তি পাইত না, তথাপি যে এত লোক সমাগম, ইহা সভার খুবই গৌরবের কথা। সভার উত্তরাংশের মধ্যস্থলে রজত-সিংহাসনে হস্তলিখিত বেদগ্রন্থ এবং তাহারই উভয় পার্শ্বে সভাপতিগণের আসন। এ সভার সভাপতি প্রধানতঃ সারদা মঠের জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য শঙ্কেশ্বর মঠের জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য ও আচার্য্য প্রতিবাদি-ভয়ঙ্কর এবং রামানুজাচার্য্য বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহারাজাধি-রাজ কাশীনরেশ। প্রবন্ধকারিণী সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন এবং সম্মেলনের সভাপতি দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর। সভায় সভাপতিগণের অভিভাষণ, বহু বিভিন্ন বিষয়ে বহু বাগ্মীর বক্তৃতা এবং প্রস্তাব উত্থাপন সমর্থন প্রভৃতি যথারীতি হইয়াছিল। পাঠক! সে সকল স্থানান্তরে পাঠ করুন।

সভাপতির আসনে শঙ্করাচার্য্যগণকে সন্দর্শন করিয়া সকলেই আনন্দিত হইয়াছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর ভাবী ধর্ম্ম বিপ্লবের সম্ভাবনা করিয়া—তাহার সাময়িক বাধাপ্রদান আবশ্যক বুঝিয়া—ভারতের চারিদিকে চারিটী মঠ প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক উহাতে খাঁটী সন্ন্যাসিগণের প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া যান। তাঁহারই শিষ্য-প্রশিষ্য-পরম্পরা সম্প্রতি জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য আখ্যায় আখ্যাত। একখানি গৃহরক্ষা করিতে হইলে যেমন চারিটী সুদৃঢ় স্তম্ভের প্রয়োজন, তদ্রূপ ধর্ম্মজগতের যজ্ঞমণ্ডপ নির্ম্মাণার্থ আচার্য্য শঙ্কর সাম ঋক যজু ও অথর্ব্ব স্বরূপ চারিটী স্তম্ভের উপর উক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করেন। পশ্চিকদিকে দ্বারকায় সারদা মঠ সাম, পূর্ব্বদিকে পুরীর গোবর্দ্ধন মঠ ঋক, উত্তরে বদরীবনে জ্যোতিঃ বা যোশী মঠ অথর্ব্ব এবং দক্ষিণে মহীশূরে শৃঙ্গেরী মঠ যজুঃ। পশ্চিম মঠের শঙ্করাচার্য্য আশ্রম ও তীর্থ, পূর্ব্ব মঠের শঙ্করা-চার্য্য বন ও অরণ্য, উত্তর মঠের শঙ্করাচার্য্য গিরি পর্ব্বত ও সাগর এবং দক্ষিণ মঠের শঙ্করাচার্য্য সরস্বতী পুরী ও ভারতী—দশনামী সন্ন্যাসীর এই দশটী নাম নিরুক্ত। এতন্মধ্যে পশ্চিম মঠের শঙ্করাচার্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ধর্ম্ম সংশয়ের মীমাংসক। এই পশ্চিম মঠের শঙ্করাচার্য্যই কাশী মহাসভার প্রধান সভাপতি ছিলেন।

এখন ভেজালের দিনে শঙ্করাচার্য্যেও ভেজাল ধরিয়াছে। প্রাচীন পথভ্রষ্ট হইলে যে কদর কত কমিয়া যায়, এই শঙ্করাচার্য্য তাহার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তথাবিধ শঙ্করাচার্য্য অবশ্য উপেক্ষিত ও বিস্মৃত, বাঙ্গালার লোক আচার্য্য শঙ্করের পরবর্ত্তী এই সকল শঙ্করাচার্য্যের সংবাদ বড় একটা রাখিতেন না; কেন না, বহু পূর্ব্বে আচার্য্য শঙ্করের প্রায় তুল্যমূল্য বহু অধ্যাপক এই ভারতভূমি অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। এখনও তথাবিধ অধ্যাপক দুই একজন আছেন। কিন্তু কালবশে অনেকেরই ব্যবহার-দোষে সে প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে, ফলে এই সকল শঙ্করের প্রভাব বিলুপ্ত হয়। ইহার কারণ—এই সকল শঙ্করাচার্য্য বিদ্যায় বাঙ্গলার অধ্যাপকগণের সমকক্ষ না হইলেও ত্যাগে আদর্শ-স্থানীয়। কিঞ্চিৎ

কাঞ্চন মূল্যে বিক্রীত হওয়া আর লক্ষ মুদ্রা লাভের সম্ভাবনা সত্ত্বেও অবিকৃত থাকা, এই বৈষম্যের হেতু। কাশীতে দয়ানন্দীদলের প্রথম অভ্যুদয়ে যিনি বিচার দ্বারা ঐ দল দলিত মথিত|করেন, তাঁহারই বংশধর আজ সেই মতের সমর্থক, সুতরাং মতের মূল্য কতদূর! এই মহাসভার অঙ্গ একটী বিচারসভা ছিল, সপ্তাহকাল বিচার হয়। বিচার, বর্ত্তমান নবীনমতের অপসারণ। বিচার করিলেন বাঙ্গালার লোক; সিদ্ধান্ত করিলেন বাঙ্গালার লোক; অথচ তাহা সাধারণের স্বীকারের জন্য গুরুমুখী করিয়া—জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের মুখ হইতে বাহির করাইয়া সভায় ঘোষণা করিতে হইল। বাঙ্গালার সেই চিরগুরুতা বুঝি অচির-পরাহত! বাঙ্গালার গৃহী গুরুর গুরুতা বুঝিবা একেবারেই গা-ঢাকা দেয়—সন্ন্যাসী গুরুই গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হন। ত্যাগাদি যে সকল মহনীয় গুণে গুরুত্ব জন্মে, সেই সকল আয়ত্ত করিতে না পারিলে বাঙ্গালার এ অঙ্গবৈগুণ্য অপসারিত হইবার নহে।

আর একটী সর্ব্বনাশের কথা হইতেছে—গৃহবিবাদ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—পূর্ব্বকালীন অসুর-ভাবে অভিনিবিষ্ট ব্যক্তিরাই আমাদের ইষ্ট বন্ধুবান্ধবরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া শুভকার্য্যে অনিষ্ট সাধন করিতেছে। এখন সকলেই বলিতে চায়—আমি বড়, এই বড়ত্ব ব্যাহত হইলেই যত জঞ্জাল। তখন দেশের কার্য্যে তাহাদের দৃষ্টি আদৌ থাকে না, একজনকে পঙ্গু করিয়া অপরে মহিমমণ্ডিত হইতে চায়। এমনই অন্ধ হইয়া যায় যে, ছলে চাতুর্য্যে বলে কৌশলে শিষ্য গুরুকে, পুত্র স্থানীয় ব্যক্তি পিতৃতুল্য অভিভাবককেও পরাভূত করিতে প্রয়াস পায়। এই ভারতের বক্ষে কত কংগ্রেস কমিটি—আমুটি খামুটি হইয়া যাইতেছে, ফলে কিন্তু সেই চিরাচরিত মারামারি কাটাকাটি। কিন্তু শঙ্করের অপার করুণায় কাশীর মহাসভায় সে সকল হইতে পারে নাই, ইহা পরম সৌভাগ্যের সূচনা। এই মহাসভায় ভারতের সমস্ত প্রান্তের মহামহাপণ্ডিত, রাজা মহারাজ, বিষয়ী জমিদার সকলেই শান্তভাবে প্রকৃত দেশের কার্য্যে যোগ দিয়া সভার সাফল্য সংবিধান করিয়াছেন।

সভাপতি দ্বারবঙ্গাধীশ পাঁচলক্ষ ও নাথদ্বার মহারাজ এক লক্ষ মুদ্রা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। প্রস্তাব হইয়াছে—এই অর্থ দ্বারা একটী বিশুদ্ধ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। সত্য সত্যই যদি কালেজী বিশ্ববিদ্যালয় না হইয়া সেকেলে বিশুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় হয়, তবে বিশ্বমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষা-সংস্কার ব্যতীত বর্ত্তমান কুসংস্কার যে অপসারিত হইতে পারে না, ইহা আমরা বহুবার বলিয়া আসিতেছি। ব্রহ্মণ্যদেবের কৃপায় তাহাই হউক, ইহাই প্রার্থনা।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত লক্ষণ শাস্ত্রী এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রাণ পণ্ডিতগণের ঐকান্তিক প্রযত্নে এই মহাসভায় সৌকর্য্য সমাহিত হইয়াছে। তর্করত্ন মহাশয় মাসাধিককাল রোগে ভুগিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াও সভার কার্য্যে কিছুমাত্র কাতর হন নাই। সভার প্রথম দিন তাঁহাকে

ধরাধরি করিয়া বক্তৃতা-বেদীর উপর একটীবার মাত্র বসান হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সেই অবস্থায়ও যে ভক্তিমাখা উচ্চৈঃস্বরে ব্রহ্মণ্যদেবের উদ্দেশে দেশের শান্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন—যে বিশুদ্ধ স্বরে সেই সুবৃহৎ সভার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঝঙ্কৃত—দর্শকগণের হৃদয়তন্ত্রী শব্দিত হইয়াছিল—তাহা প্রকৃষ্ট প্রাণের পরিচায়ক। এইরূপ অকৃত্রিম কল্যাণাকর্ষণ জনে জনে থাকিলে জগৎ পুনরায় মঙ্গলময় হইতে পারে।

গৌরীপুরের বদান্য জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় বহুব্যয়ে বঙ্গাগত অধ্যাপকগণের পাথেয় ব্যয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাতে অনেকেরই সভাদর্শন, আনুষঙ্গিক কাশী-দর্শনের সুযোগ ঘটিয়াছিল। দুঃখের বিষয়—কলেরার ভয়ে অনেকেই কাশীর সূর্য্যগ্রহণ দর্শনের সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া সভান্তে প্রস্থান করেন। কালের ভয় কোথায় নাই? বরং মহাকালের কৃপায় কাশীতেই কালভয় নাই; কিন্তু এই সামান্য কথাটা যে স্মরণে আসিল না, ইহা কালবিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

সভারম্ভের পূর্ব্বে চণ্ডীপাঠ যাগ যজ্ঞাদি বহু পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া সভার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ধর্ম্মের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলেই যে মা জগদম্বা মুখ তুলিয়া তাকাইবেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। পুণ্যক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের এই পবিত্র সম্মিলন ভারতবাসীর অশেষ কল্যাণের কারণ হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

২। হিতবাদী

বর্ত্তমান বৎসরে কাশীধামে যে ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলন হইয়া গেল, ভারতের ইতিহাসে তাহার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ কথা সত্য যে এখনও ভারতের হিন্দুগণ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন যতি সন্ন্যাসী এবং মঠাধীশদিগের প্রভাবও হিন্দু-সমাজের উপর নিতান্ত অল্প নহে, বরং অত্যন্ত অধিক। সেই রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজের প্রায় দুই হাজার প্রতিনিধি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমবেত হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে একমত হইয়া যদি কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহাকে উপেক্ষা করা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। কাশীর এই মহাসম্মেলনের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে ভারতীয় হিন্দুসমাজের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাই উপস্থিত হইয়াছিলেন। এমন কোন সম্প্রদায় নাই, যে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিরা এই সভায় উপস্থিত না হইয়াছিলেন। ভারতের বহু স্থানের খ্যাতনামা পণ্ডিতমণ্ডলীর অধিকাংশই এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশ হইতেও প্রায় পাঁচশত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই সভায় গিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন বল্লভাচারী, শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী, নিম্বার্ক, রামানুজ প্রভৃতি

প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মাচার্য্যগণ, এমন কি নিরঞ্জনীয়া ও নির্ব্বাণীয়া দলের সন্ন্যাসিগণও এই সভার শোভাবর্দ্ধন ও বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন সভাস্থলে গৃহী সদস্যের ও সভ্যের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। সভাস্থলে এক সঙ্গে প্রায় ছয়, সাত হাজার লোক বসিয়া এবং দাঁড়াইয়া ছিলেন। ইহা ভিন্ন সভাস্থলে লোক ক্রমাগতই যাইতে ও আসিতেছিলেন। ফলে এই সভায় যে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল, তাহা কোন ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কাশীস্থ অতি প্রাচীন ব্যক্তিগণের মুখে শুনা গেল, এত বড় বিরাট সভা তাঁহারা কাশীতে কখনও দেখেন নাই।

বিচার সভা কয়েকদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। আমরা এ প্রবন্ধে সে সভা সম্বন্ধে কোন কথাই বলিব না। সে সভায় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ও শাস্ত্রদর্শী মহাত্মগণের পরস্পরের মধ্যে বিচার হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ কি, তাহারই বিচার হইয়াছিল। তাঁহারা যে সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছিলেন, সাধারণ সভায় তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সভাস্থলে সকলে নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দভাবে সেই সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। সভায় অনেক বন্দোবস্তের অভাব ও ত্রুটি সত্ত্বেও যে সকলে চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই সিদ্ধান্তগুলি শুনিয়াছিলেন, ইহাতে উপস্থিত ব্যক্তিগণের এই সভার কার্য্য বিষয়ে ঐকান্তিকতার এবং ঐকমত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

এই সাধারণ সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ১৯শে কার্ত্তিক সোমবার বেদ লইয়া যে শোভাযাত্রা করা হইয়াছিল তাহা লোকের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল। হিন্দু সমাজের চতুরাশ্রমের লোক লইয়া এই শোভাযাত্রা করা হয়। এই শোভাযাত্রা প্রায় এক মাইল বিস্তৃত ছিল। বড় বড় মঠাধীশ মোহান্তগণ, দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজ, কিষণগড়ের মহারাজ, নাগা সন্ন্যাসী, গৃহী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে লইয়া এই শোভাযাত্রা পুণ্যভূমি বারাণসীর রাজপথ বহিয়া চলিয়াছিল। পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে নারীগণ এই শোভাযাত্রাকারীদিগের উপর পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন। বারাণসীতে এরূপ শোভাযাত্রা ইহার পূর্ব্বে আর কখনও কেহ দেখেন নাই। বহু সহস্র লোক এই শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন।

কাশীনরেশ এই সভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র তদীয় পক্ষ হইয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এই মহতী সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি মৈথিলী ব্রাহ্মণ এবং রক্ষণশীল দলের নায়ক। তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছিল। তাঁহার অভিভাষণের সারকথা এই যে ব্রাহ্মণগণই হিন্দু সমাজের নায়ক। ব্রাহ্মণগণই চিরকাল হিন্দুধর্ম্মের এবং হিন্দু জাতির এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কেবল আধ্যাত্মিক দিক দিয়াই যে ব্রাহ্মণগণ হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিয়া আসিতে-

ছেন তাহা নহে, পরন্তু পার্থিব কল্যাণের দিক দিয়াও ব্রাহ্মণগণ হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। উদাহরণ স্বরূপ মহারাজাধিরাজ পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, দ্রোণাচার্য্য, পরশুরাম প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, যখন হিন্দুসমাজ অত্যাচারী রাজগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময়ে ব্রাহ্মণগণই অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সমাজকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে এই ব্রাহ্মণ-সমাজের উপর নানাদিক দিয়া আক্রমণ হইতেছে। আমাদের দেশীয় সমাজ-সংস্কারকগণ বলিতেছেন যে, ভারতের ব্রাহ্মণগণই সমাজ-সংস্কারের ঘোর বিরোধী, সর্ব্ববিধ উন্নতির বাধাপ্রদানকারী, এবং অকর্ম্মণ্যতার প্রশ্রয়দাতা। এই সম্প্রদায় সর্ব্ববিধ উন্নতির অন্তরায় এবং সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের বিরোধী। পক্ষান্তরে ওডায়ারী সম্প্রদায়ের ইংরাজগণ প্রকাশ্যেই বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণগণ ভারতে ইংরাজ-শাসনের বিরোধী, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব ক্ষমতা এবং গৌরব রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই বৃটিশ শাসনের ঘোর বিরোধিতা করিতেছেন। ইত্যাদি ফলে ব্রাহ্মণ সমাজ বিভিন্নদিক দিয়া বিভিন্ন ভাবে আক্রান্ত হইতেছেন।

এইরূপ অবস্থায় ব্রাহ্মণগণের আর হাঙ্গামা-বিমুখ ও নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকা উচিত নহে। সমাজের ও দেশের হিতসাধন করিবার জন্য তাঁহাদের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। যাহাতে ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নষ্ট না হয়, যাহাতে সনাতন ভাবধারা অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার জন্য তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ভারতীয় বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভায় অহিন্দু হিন্দু সদস্যগণ যাহাতে হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য পদদলিত করিতে সমর্থ না হয়েন, যাহাতে হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায় হিন্দুর ভাবধারা নিরোধ করিবার জন্য আইন প্রভৃতি প্রণয়ন করিতে সমর্থ না হয়েন, যাহাতে হিন্দু ধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ সদস্যগণ বহু সংখ্যায় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইতে পারেন, তাহার জন্য ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতিগণের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিশেষভাবে চেষ্টা করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান সময় আন্দোলনের যুগ। এ যুগে নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেই হইবে। ইত্যাদি। মহারাজাধিরাজের এই বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সভাস্থল হইতে ঘন ঘন আনন্দধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল।

এই ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলন রক্ষণশীল হিন্দুদিগেরই মহাসভা। আমরা সম্পূর্ণ রক্ষণশীল না হইলেও এই সভার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে পারি নাই। অজ্ঞ রক্ষণশীলতা সময় সময় অনেক দোষের আকর হইলেও সমাজ এবং ধর্ম্ম বিষয়ে সকল পক্ষের কথা বিশেষ ভাবে বিবেচনা এবং বিচারপূর্ব্বক আমাদের ধীরে ধীরে সংস্কারের পথে অগ্রসর হওয়া উচিত। আমরা সংস্কারের পক্ষপাতী সত্য, কিন্তু বৈশিষ্ট্যকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া সমাজ-সংস্কার সাধনের পক্ষপাতী নহি। কাশীস্থ বিচারসভা ও সাধারণসভায় মন্তব্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এবং তথায় সমবেত জনসাধারণের কথাবার্ত্তা শুনিয়া

আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে যে, হিন্দু সমাজের প্রধান সংস্কার, বিবাহ-সংস্কারকে আক্রমণ করিয়া সমাজ-সংস্কারকগণ হিন্দু সমাজে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছেন,—তাহারই ফলে আজ হিন্দু সভ্যতার মূল-কেন্দ্রীয় ধামে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের এই মহতী সভা আহূত হইয়াছে। দশাশ্বমেধের ঘাটে এবং কাশীর অন্যান্য বহু স্থানে, যেখানেই নানা প্রদেশের বহু লোক সম্মিলিত হইয়া এই সভার কথা আলোচনা করিয়াছেন, সেইখানেই প্রায় সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, যদি সর্দ্দার বিল আইনে পরিণত হয়, যদি ডাক্তার গৌরের বিবাহ বিচ্ছেদ বিলের অনুরূপ কোন বিল ভবিষ্যতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা-পরিষদে উপস্থাপিত ও গৃহীত হয়,—তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম্মের সকল গ্রন্থি শিথিল হইয়া যাইবে,—য়ুরোপের ন্যায় ভারতে গার্হস্থ্য শান্তি বিলুপ্ত হইবে, দেশে অতি শীঘ্রই "কম্প্যানিয়নেট ম্যারেজ" এবং "ট্রায়াল ম্যারেজ" প্রবর্ত্তিত হইবে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্লাবনে হিন্দু সমাজের যে ক্ষতি হয় নাই, এই পাশ্চাত্য ভাবের প্লাবনে তদপেক্ষা হিন্দু সমাজের বহু গুণে অধিক ক্ষতি হইবে। যে সকল কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তি এই কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত ইহার কুফল অত্যন্ত অতিরঞ্জিত আকারে দেখিয়াছেন, কিন্তু এ কথাও সত্য যখন ইউরোপে বিবাহবিচ্ছেদ আইনবলে সুকর করা হইয়াছিল, তখন তাহার ফল এরূপ বিষময় হইবে, তাহা অনেকেই মনে করিতে পারেন নাই। কেবল ধর্ম্মযাজকগণই সে কথা বলিয়াছিলেন।

কিন্তু তাই বলিয়া আমরা কোন মতেই কঠোর রক্ষণশীলতার সমর্থন করিতে পারি না। রক্ষণ-শীলতা সমাজকে অতিষ্ঠ করিয়া রাখে। উহা উন্নতির প্রতিরোধক, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। পক্ষান্তরে আমরা উদ্দাম সমাজ-সংস্কারেরও সমর্থন করি না। হিন্দু সমাজের বৈশিষ্ট্য, কৌলিক অবদান, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সাধনা, প্রভৃতি সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া একেবারে পাশ্চাত্য সভ্যতার মৃগতৃষ্ণিকার দিকে খরবেগে ধাবিত হইবার আমরা পক্ষপাতী নহি। অতীতের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ভবিষ্যতের উন্নতি পথে চলা আবশ্যক। রুষিয়া এখন ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছে। সেই জন্য আমরা বাল্য বিবাহের সমর্থক না হইলেও রায় সাহেব হরবিলাস সর্দ্দার বিলের কোন মতেই সমর্থন করিতে পারি না এবং ডাক্তার গৌরের বিবাহ-বিচ্ছেদ বিলের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। আমাদের বক্তব্য এই যে, যে জাতির অতীত অবদান ও যুগযুগান্তর ব্যাপিনী সাধনা ও সভ্যতা নাই, সে জাতির সমাজ-সংস্কার যত শীঘ্র সম্পাদিত হইতে পারে, যে জাতির সহিত সহস্র সহস্র বৎসরব্যাপী একটা সভ্যতা ও সাধনা জড়িত রহিয়াছে সে জাতির সমাজসংস্কার তত দ্রুত এবং প্রখরভাবে সম্পাদন করা সঙ্গত নহে। কারণ অতীতের সহিত মানুষের দৈহিক ভাব ও মানসিক সংস্কার বিশেষ ভাবে বিজড়িত হইয়া উঠে। সেই অতীত অবদানের অবধারণ ও চলাচল বিচার করিয়া তবে ভবিষ্যতের পন্থা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। সেই জন্য আমাদের মনে হয় যে, অতীতের পক্ষে ওকালতি করিবার জন্য যেমন রক্ষণশীল দলের প্রয়োজন, ভিন্ন সভ্যতার ও আদর্শের সংঘর্ষে এবং যুগভেদে ভিন্ন প্রভাবের সম্পাতে

যে অভিনব অবস্থার সৃষ্টি হয় তদনুসারে অভিনব ব্যবস্থা করিবার জন্য উন্নতিশীল দলেরও সেইরূপ প্রয়োজন। সুতরাং আমরা উভয় সম্প্রদায়েরই প্রয়োজনীয়তা পূর্ণমাত্রায় অনুভব করি। কেবল কোন পক্ষেরই গোঁড়ামী সহ্য করিতে পারি না। রক্ষণশীল দলে যেমন কতকগুলি গোঁড়া আছে, উন্নতিশীল দলেও সেইরূপ কতকগুলি পাশ্চাত্য সভ্যতার ও প্রতিষ্ঠানের গোঁড়া আছে। উভয় দলই তুল্যভাবে বর্জ্জনীয়। বরং শোষোক্ত সম্প্রদায় অধিকতর ভীষণ।

সংস্কারক মাত্রেরই মাত্রাজ্ঞান থাকা আবশ্যক। কতদূর অগ্রসর হইলে অতীতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, অতীত বহুদর্শিতার সাহায্য লইয়া তবে আমাদের ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেই জন্য হঠকারী লোক দ্বারা সমাজ সংস্কার হইতে পারে না। ধীরবুদ্ধি লোক দ্বারা উহা সম্পাদন করা বিধেয়।

৩। আত্মঘাতী ব্রাহ্মণ সমাজ

স্রোতহীন জলাশয় চিরকাল একই ভাবে স্নিগ্ধ, নির্ম্মল, পানীয় জল দান করিতে পারে না। কালে কালে তাহাতে আবর্জ্জনা নিক্ষিপ্ত হইয়া উহার জল দূষিত, কলুষিত হইয়া পরিণামে একেবারে অপেয় হইয়া উঠে। সেই জন্য মাঝে মাঝে জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে।

আমাদের সনাতন হিন্দু সমাজ আজ স্রোতহীন জলাশয়ের ন্যায়ই বিষাক্ত পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে। কত শাস্ত্র, কত বিধিনিষেধ, কত আচার বিচার, কত কুসংস্কারের আবর্জ্জনাস্তূপ আজ এই সহস্র যুগ বৃদ্ধ সনাতন হিন্দুসমাজকে মনুষ্যবাসের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।

একদিন ছিল যখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই হিন্দুসমাজকে জাগ্রত, জীবন্ত রাখিয়া সকলের শ্রদ্ধা সম্ভ্রম অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছে; শিক্ষায় দীক্ষায়, সর্ব্ববিষয়ে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণসমাজ সমগ্র হিন্দু সমাজকে অঙ্গুলি হেলনে নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ সহস্রাধিক বর্ষ পরে সেই ব্রাহ্মণ-সমাজ আর নাই। শিক্ষাদীক্ষাহীন, শাস্ত্রজ্ঞানহীন, আচারসর্ব্বস্ব, কুসংস্কারাপন্ন, সঙ্কীর্ণমনা, শ্রেষ্ঠত্বাভিমানী, ভণ্ড, পণ্ডিত-মূর্খের দ্বারা কোনো সমাজ পরিচালিত হইতে পারে না, কোনো সমাজের কল্যাণ বিধান করা যাইতে পারে না।

আজ আমাদের হিন্দুসমাজের সেই দুর্দ্দশাই হইয়াছে। অগণিত জনসমাজ অশিক্ষায় কুশিক্ষায়, অন্ধবিশ্বাস ও শাস্ত্রভয়ে ভীত, জর্জ্জরিত। স্বার্থোদ্ভূত শ্রেষ্ঠত্বাভিমানের অত্যাচার আমাদের হিন্দু-সমাজকে ভীরু, নিস্তেজ, দুর্ব্বল, পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু অধঃপাতের শেষ সীমায় আসিয়া ধ্বংস ভস্মীভূত হইয়া যাইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে শবদেহে চৈতন্য ফিরিয়া আসিয়াছে, কঙ্কালের ভিতর আজ মত্ত হস্তীর বল, সিংহের বিক্রম দেখা দিয়াছে। তাই আজ দেখিতেছি—দিকে দিকে সত্যের সহিত

অসত্যের; প্রবলের সহিত দুর্ব্বলের; স্বাধীনতার সহিত প্রভুত্বের; হিংসার সহিত অহিংসার; ভণ্ডামির সহিত সংস্কারের তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছে।

আঘাতের পর আঘাত খাইয়া সনাতন হিন্দুসমাজ আজ মরণের তীরে দাঁড়াইয়া সচেতন হইয়া বুঝিতে পারিয়াছে কাপুরুষের মত নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকিলে তাহার ভাগ্যে মৃত্যু অনিবার্য্য। তাই সে আজ আত্মরক্ষায় দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া আত্মসংগঠনে মনোনিবেশ করিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণসমাজ! তুমি আজ শত চেষ্টা করিয়াও তাহার এই নব-প্রবুদ্ধ আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে বাধা দিয়া তাহাকে প্রতিহত করিতে পারিবে না। সে দুশ্চেষ্টা যদি করিতে যাও তবে তোমারই আত্মহত্যার পথ পরিষ্কার তুমি নিজের হাতেই করিয়া লইবে, ইহা স্থির জানিয়ো।

শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে আত্মহত্যার জন্ম নয়, আত্মরক্ষার জন্যই। তুমি আজ পিতৃপিতামহের দোহাই দিয়া, স্মৃতিশাস্ত্রের শ্লোকসমষ্টি আওড়াইয়া আচার বিচারের ব্যাখ্যা করিয়া যতবিধ চেষ্টাই কর না কেন, তোমার শ্রেষ্ঠত্বাভিমানের সৌধচূড়া, আজ এই সত্যের সহিত অসত্যের সংগ্রামে তাহা ধূলিবিলুণ্ঠিত হইবেই হইবে।

সম্প্রতি কাশীতে যে ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে দ্রাবিড়ের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল ফতোয়া জারি করিয়াছেন যে ৮ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে। ব্রাহ্মণেতর জাতির কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে ঋতুমতী হইলে প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া তাহার আর বিবাহ দেওয়া চলিবে না; আর ব্রাহ্মণকুমারী ঋতুমতী হইলে তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত করিবারও অধিকার নাই, সে একেবারেই পতিত হইবে!

বর্ত্তমান যুগে যে ব্রাহ্মণ-সমাজ এ হেন বিধিনিষেধের প্রবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পায় তাহাকে আত্মঘাতী সমাজ বলিব না তা কি বলিব?

শুদ্ধি সংগঠন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, বিধবাবিবাহ প্রচলন—ইহাদের সকলগুলিই আজ ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু সমাজকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছে। দেশের এবং জাতির কল্যাণ যাহারা কামনা করে তাহারা এই সকল সংস্কারের বিরুদ্ধাচরণ কোন কারণেই করিতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণা হয় না। কিন্তু তথাপি দেখা যায় হতভাগ্য ভারতবর্ষে এমন আত্মঘাতী, দেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, ধর্ম্মধ্বজী পণ্ডিতের অভাব নাই! ইহা বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয়।

সেই ব্রাহ্মণ-মহা-সম্মেলনে ইহাও বলা হইয়াছে যে—'আমাদের সাতকোটী অস্পৃশ্য অপেক্ষা যবনেরা শ্রেষ্ঠ!' হায়, পণ্ডিত মূর্খের দল! তোমাদিগকে আজ বলিতে ইচ্ছা করে—ওগো ব্রাহ্মণ সমাজ!

সাত কোটি সন্তানেরে হে পাণ্ডিত্যাভিমানি, রেখেছ অস্পৃশ্য করে, মানুষ কর নি।

এই উপলক্ষে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া আমাদের প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি বলিয়াছেন—"অতীতের কথা না হয় নাই বলিলাম, এই যে সেদিন মন্দিরের উপর আক্রমণ হইয়াছিল, তখন মন্দির রক্ষার্থ নিজের প্রাণ লইয়া খেলা করিয়াছিল কাহারা ? আমাদের অস্পৃশ্য ভাইরা ! হে ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলনের ধুরন্ধর সদস্যবৃন্দ ! আজ সাতকোটী ভাইকে সমাজ শরীর হইতে কাটিয়া দিয়া পৃথক করিয়ো না, সমাজ হত্যা করিয়ো না ; ইহাতে তোমাদের কল্যাণ হইবে না।" ভগ্নদূত—১লা অগ্রহায়ণ

৪। সাধনা

কুমিল্লা, ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক সাধনা-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ এম্, এ, মহাশয় 'সাধনা-পত্রিকা'য় লিখিয়াছেন—"কাশীতে অখিল-ভারতীয়-ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গেল। সম্মিলনের নামটা খুব জাঁকাল হইয়াছে, লোকে মনে করিবে, সমগ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের প্রতিনিধিই ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। আসলে কিন্তু এক-মতাবলম্বী—সংস্কার-বিরোধী—মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ এবং তাঁহাদের অনুচরগণ ব্যতীত অপর কেহই নাকি ইহাতে প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই। প্রবেশের এবং বিচারপদ্ধতির নিয়মাবলীর চাতুর্য্যে দেশের সমাজের এবং ধর্ম্মের হিতকামী উদারচরিত পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রবেশ অসম্ভব হইয়াছে। সম্মিলনীর সিদ্ধান্তও অতি অপূর্ব্ব হইয়াছে। একটা নমুনা দিতেছি। প্রশ্ন উঠিল—হিন্দুসমাজের অন্ত্যজ জাতি এবং যবন—এ দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? সিদ্ধান্ত হইল—যবন শ্রেষ্ঠ, কারণ, অন্ত্যজ জাতি অস্পৃশ্য, যবন অস্পৃশ্য নহে !! আর নমুনার প্রয়োজন নাই ; এই একটা নমুনা হইতেই ব্রাহ্মণ-সম্মিলনের মনোভাব ও গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে। হায় ব্রাহ্মণ ! হায় হিন্দুসমাজ !"

"ভারতবিখ্যাত ভক্তিশাস্ত্রব্যাখ্যাতা শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশীয় প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন" মহাশয় 'সাধনা' পত্রিকার "প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক"।

মন্তব্য, সংবাদ ও বিবিধ

২৬। শরৎ-সম্বর্দ্ধনা

গত ৩১শে ভাদ্র (১৩৩৫) কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ ভবনে সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বঙ্গের সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে অভিনন্দিত করিয়াছেন। শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর রচিত নিম্নের গানটি গীত হইয়াছিল

তুমি যে মধুকর কমল বনে
আহরি আন মধু আপন মনে
ক্ষণিক ব্যথা আর চকিত হাসি
গোপন বেদনার অমিয় রাশি
কর তা সবাকার পরম আপনার
অমর কর সেই চরম ধনে।
হে গুণী ঐ তব ইন্দ্রজালে
রচিলে মৌচাক অন্তরালে
কত যে মধু তার কত যে সুধা
কেমনে মিটালে যে পরম ক্ষুধা
মধুপ দলে দলে মিলন তার তলে
মোহিত হল তারা সঙ্গোপনে
তুমি যে মধুকর কমল বনে

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী। তিনি বলেন—

বাঙ্গলায় যে যথার্থ পাঠকসমাজ গড়ে উঠছে, আজকের এই বিরাট সভাই তার প্রত্যক্ষ ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গুণীর পূজাতে গুণীও ধন্য হয়, গুণজ্ঞও ধন্য হয়। বাঙ্গালী সমাজের যে বঙ্গ সাহিত্যে রুচি জন্মেছে, এ অতীব আনন্দের বিষয়। কারণ

অরুচি জিনিষটে শারীরিক হিসেবেও যেমন, মানসিক হিসেবেও তেমনি অস্বাস্থ্যের লক্ষণ।

* * * *

এই বিংশ শতাব্দীতে যে সকল নব সাহিত্যিক বাঙ্গালায় আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁহার মধ্যে শরৎচন্দ্র যে শ্রেষ্ঠ গুণী সে সম্বন্ধে বোধ হয় সকল সাহিত্যিক, পাঠক সমাজের সঙ্গে এক মত। অন্ততঃ আমার নিজের মত যে তাই একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে আমি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নই।

* * * *

শরৎচন্দ্রকে নিম্নলিখিত উপহার প্রদান করা হইয়াছে।

১। রৌপ্য নির্ম্মিত পত্রে হস্তীদন্ত নির্ম্মিত আবরণী-যুক্ত মীনা করা অক্ষরে লিখিত মানপত্র, (২) সোনার দোয়াত ও কলম, (৩) রৌপ্যনির্ম্মিত আলবোলা, (৪) রৌপ্যনির্ম্মিত পঞ্চপত্র, (৫) রৌপ্য নির্ম্মিত দুইটি চন্দনের বাটি, (৬) রৌপ্য নির্ম্মিত থালা (৭) গরদের জোড়।

শরৎচন্দ্র অভিনন্দনের উত্তরে যাহা বলেন, তাহার দুইটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়ে একদিন নানা ব্যক্তির সংস্রবে আসতে হয়েছিল। তাতে ক্ষতি যে কিছু পৌঁছয়নি তা নয়, কিন্তু সেদিন দেখা যাদের পেয়েছিলাম, তারা সকল ক্ষতিই আমার পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। তারা মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটুকু রেখে গেছে, ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ অধর্ম্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ—তাকে আত্মা বলা যেতেও পারে—সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্যরচনায় তাকে যেন অপমান না করি। হেতু যত বড়ই হোক, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায় আমার লেখায় কোনদিন যেন না এত বড় অন্যায় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু অনেকে তা আমার অপরাধ বলেই গণ্য করেছে, এবং যে অপরাধে আমি সব চেয়ে বেশী লাঞ্ছনা পেয়েছি, সে আমার এই অপরাধ। পাপীর চিত্র আমার তুলিতে মনোহর হয়ে উঠেছে, আমার বিরুদ্ধে তাঁদের সব চেয়ে বড় এই অভিযোগ।

এ ভালো কি মন্দ আমি জানিনে, এতে মানবের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ অধিক

হয় কি না এ বিচার করেও দেখিনি—শুধু সেদিন যাকে সত্য বলে অনুভব করেছিলাম তাকেই অকপটে প্রকাশ করেছি। এ সত্য চিরন্তন ও শাশ্বত কি না এ চিন্তা আমার নয়, কাল যদি সে মিথ্যে হয়েও যায়—তা নিয়েও কারও সঙ্গে আমি বিবাদ করতে যাব না।

* * * *

সৃষ্টির কালটাই হল যৌবন কাল—কি প্রজাসৃষ্টির দিক দিয়ে, কি সাহিত্যসৃষ্টির দিক দিয়ে। এই বয়স অতিক্রম করে মানুষের দূরের দৃষ্টি হয় ত তীক্ষ্ণতর হয়, কিন্তু কাছের দৃষ্টি তেমনি ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। প্রবীণতার পাকা বুদ্ধি দিয়ে তখন নীতিপূর্ণ কল্যাণকর বই লেখা চলে কিন্তু আত্মভোলা যৌবনের প্রস্রবণ বেয়ে যে রসের বস্তু ঝ'রে পড়ে, তার উৎসমুখ রুদ্ধ হয়ে যায়। আজ ৫৩ বছরে পা দিয়ে আমার এই কথাটাই আপনাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই। অতঃপর রসের পরিবেশনে ত্রুটি যদি আপনাদের চোখে পড়ে, নিশ্চয় জানবেন তার সকল অপরাধ আমার এই তিপান্ন বছরের।

দেবানন্দপুর পল্লী-সেবক-সমিতি, বাজে শিবপুর এসোসিয়েশন্, আনন্দ-মেলা, ছাত্রগণের বঙ্কিম শরৎ-সমিতিও শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিয়াছে।

"নারীত্বের তাপস পূজারী" বলিয়া 'আনন্দমেলা' নিম্নোদ্ধৃত অভিনন্দন পত্র দিয়াছেন।

মানব যেখানে একা—যেখানে সে, শুধু আর তার আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষার, ত্রুটি-বিচ্যুতির সঙ্কোচহীন নিত্য দেখাশোনা—ঘটনার অন্তঃপুরে—তুমি মানবকে দেখিয়াছ, তার খণ্ডতার মধ্যে, তার অপরিপূর্ণতার মধ্যে, তার অসহায় নিমেষের মধ্যে। সেই একটি নিমেষের অপরিপূর্ণতার ছিদ্রপথ দিয়া তোমার তাপস মন আমাদের পরিপূর্ণ মানবতার আভাস জানাইয়া দিয়াছে। হে মানবের অন্তরঙ্গ বন্ধু, তুমি ঘটনার ধূলি-ম্লান রাজপথ হইতে আমাদের মনের চির-অম্লান অন্তঃপুরে লইয়া গিয়াছ—তোমাকে প্রণাম!

জীবন যেখানে আপনার অসীম রিক্ততায় আপনি বিচিত্র, যেখানে নিত্য তাহাকে আত্ম-প্রকাশের জন্য আত্মবিলোপ বরণ করিয়া লইতে হইতেছে—জীবনের সেই রক্ত-আহব তুমি দেখিয়াছ তার গ্লানির মধ্যে, তাহার নিত্য দ্বন্দ্বের মধ্যে, তাহার পরাজয়ের

গৌরবের মধ্যে। জীবনের পথে হে চির-পান্থ, তুমি পথ হইতে আমাদের মনকে গতির দিকে ফিরাইয়াছ, তোমাকে প্রণাম!

* * * *

নারী যেখানে আপনার মহিমায় আপনি মহিমান্বিতা,—তার ক্ষণিকের বিচ্যুতির বাহিরে, তার বন্ধনের ব্যর্থতার বাহিরে, তার অপ্রকাশের রিক্ততার বাহিরে--নারীর সেই রহস্যময় রূপ তুমি দেখিয়াছ। নারীর অসহায় নিরাবলম্বতার কণ্টক-হার খুলিয়া তুমি তাহাকে চেতনার মণিহার পরাইয়াছ, নারীত্বের হে তাপসপূজারী,—তোমাকে প্রণাম।

বাংলা যেখানে কাঁদিতেছে—আঁধার দেউলে, শূন্য মাঠে, জীর্ণ আচারে, ভাষাহীন মুক,—অজ্ঞানতার অহঙ্কারে রিক্ত গাত্মহারা; বিধবা বাংলার হে কথক—কবি, তুমি আমাদের মনকে সেইখানে তীর্থযাত্রায় লইয়া গিয়াছে—তোমাকে প্রণাম!

বঙ্কিম শরৎ-সমিতির অধিবেশনের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

যে সংযম ও সুষমা শরৎচন্দ্রে পাই তাহা না রাশিয়ান সাহিত্যে, না অন্য কোন সাহিত্যে আমরা দেখি। শরৎচন্দ্রের বাহিরের চেহারা বিদ্রোহীর মত, কিন্তু যে সাত্ত্বিকতার, যে বৈষ্ণব-লালিত্যের অরূপ দেবতার আসন তাঁহার অন্তরে আছে তাহা যেন আমাদের চোখ না এড়ায়।

* * * *

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন মানপত্রে বলা হইয়াছে যে শরৎচন্দ্রের 'বাণী বিশ্বের নহে, বাংলার' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বাণী শুধু বাংলার নহে, বিশ্বেরও। সাহিত্যের কাজ রসসৃষ্টি, এবং প্রকৃত রসসৃষ্টি হইলে তাহা বিশ্বের সকলের সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। শরৎচন্দ্র একজন প্রকৃত রসস্রষ্টা, কাজেই তাঁহার সাহিত্য শুধু বাংলার নিজস্ব হইতে পারে না, তাহা বিশ্বের সম্পত্তি। বক্তার মনে হয় যে গালস্‌ওয়ার্দি ও ডষ্টয়ভস্কির সঙ্গে তাঁহার নানাদিক দিয়া তুলনা হইতে পারে। ছাত্রদের পক্ষ হইতে বলা হয় যে শরৎচন্দ্র বাংলারই বিশেষ সম্পত্তি, যদিও অবশ্য বিশ্বের দাবী তাঁহার সাহিত্যের উপর আছেই, এই অর্থেই উহা ব্যবহৃত হইয়াছে।

ছাত্র সমাজের অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র যাহা বলেন "বাঙলার কথা" হইতে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল

শরৎচন্দ্র উত্তর দিবার কালে বলেন যে বক্তৃতা দিবার নামে তাঁহার ভয় হয়, কিন্তু গল্প তিনি অনর্গল করিতে পারেন। তাঁহার যাহা বলিবার তাহা তাঁহার বইয়েই আছে। তিনি দেশকে সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছেন, তাহার ম্যালেরিয়া, দলাদলি, দোষ গুণ সবই। 'হতভাগ্য'দের অনেকের কথা আমি বলিয়াছি, হয়ত তাহারা যে তাহাদের কাজের জন্য দায়ী নয়, একথা বলিয়াছি বলিয়াই অনেকের তাহার লেখা ভাল লাগিয়াছে। 'প্লট' ঠিক করিয়া আমি কখনো লিখিতে বসি নাই, চরিত্রগুলিকে মনে আঁকিয়া তাহাদেরই রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহার পর তিনি গল্পচ্ছলে তাহার সাহিত্য জীবনের কথা বলেন। তিনি প্রথমে লেখা আরম্ভ করেন আঠার উনিশ বছর বয়সের আগে। সেই সময়ের লেখা হইতেছে বড়দিদি, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি। তারপর তিনি বহুকাল ভুলিয়াই যান যে তিনি লিখিতে পারেন। নিরুপমা দেবী, বিভূতি ভট্ট, সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার সেকালের গল্প লেখার চেলা ছিলেন, ফণীন্দ্র পাল মহাশয় যখন 'যমুনা' কাগজ দুই শত টাকায় কিনিয়া লইয়া তাঁহাকে লেখার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, তখন তিনি বাংলা সাহিত্যের খোঁজ খবর বড় রাখিতেন না। গান বাজনা করিয়া ছবি আঁকিয়া দিন কাটিত। তাঁহাকে প্রেমের গল্প ছাড়া অন্য কিছু লিখিতে বলা হয়। তখনও তিনি লেখা আবার আরম্ভ করেন। তাঁহার চেলাদের তখন বেশ নাম হইয়াছে। প্রথমে তিনি যমুনার জন্য 'রামের সুমতি' লিখিলেন। বইখানার তখন সুখ্যাতি হয়, এবং তিনি 'বিন্দুর ছেলে' ও 'পরিণীতা' লিখিলেন; 'চরিত্রহীন' তাহার পরে ধারাবাহিক ভাবে আরম্ভ করেন। যমুনার চাঁদা ছিল একটাকা, বড়লোক কেহ লিখিতেন না। তাই বেনামীতে প্রবন্ধ জোগাইবার জন্য 'নারীর মূল্য' লিখিলেন। শুধু তাই নয়, একলাই কাগজের বহু পাতা লিখিতেন। তখন কাগজের দুই হাজার গ্রাহক হয়, আর বার্ষিক চাঁদা ধার্য্য হয় ১৷৵৹। তবে কাগজ বাঁচিল না। তিনি আরও বলেন যে, তাঁর একটা দোষ তিনি কোন এক কাজে লাগিয়া থাকিতে পারেন না। কিছুকাল হইল তাই নানা জনের তাগিদে নাটক আরম্ভ করিয়াছেন। শিবরাম চক্রবর্ত্তী যে নাটক তৈরী করেন 'দেনা পাওনা' বই হইতে, তাহা দেখিয়া শিশির ভাদুড়ী মহাশয় নানাস্থানে বদলের কথা বলেন। তখন তিনি 'ষোড়শী' লেখেন। তারপর এবিষয়ে উদাসীন ছিলেন। সভার তরফ হইতে নাটক লেখার তাগিদ হইয়াছে, এবং তিনিও সেই ইচ্ছা করেন এবং একটি রচনাও করিতেছেন।

উপন্যাস হইতে নাটক লেখার অসুবিধা অনেক, নাটক সময়ের মাপে ছোট করিয়া লিখিতে হয়। তবে আজ যুগ বদলিয়া গিয়াছে এবং নূতন নাটকের আদর হইবার অনেক কারণ আছে। বারান্তরে সমিতিতে তিনি এসবের আলোচনা করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি কথা সাঙ্গ করেন।

এতদুপলক্ষে অনেক সুকবি কবিতার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন, আমরা নিম্নে শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় লিখিত কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম।

রবীন্দ্র নিয়েছে আলো ইন্দ্রলোকে বসি ;—
শরৎচন্দ্রের আলো ভাঙাঘরে পশি
চুমিয়াছে বাঙালীর কুটিরের ধূলি ;
করবি-শেফালি-গাঁদা সন্ধ্যামণি তুলি
পূজিলে আনন্দে তুমি বিশ্ব-ভারতীরে ;
মৃন্ময় প্রদীপ ছিল পল্লীর কুটিরে--
তাই দিয়ে করিলে গো, বাণীর আরতি ;
ছিল যা আঁধারে গুপ্ত, দিলে তারে জ্যোতি।
তাই তব জন্ম দিনে উঠে শঙ্খ রব
দিকে দিকে. ঘরে ঘরে পুরনারী সব
অশ্রুজলে অভিষেক করিছে তোমারে !
গেঁথেছ তাদের মাল্য ; "অরক্ষণীয়া"রে
দিয়েছ আশ্রয় তুমি ; পতিতার চোখে
দেখেছ স্বর্গের ছায়া ; প্রেমের আলোকে
নূতন করিয়া তুমি দেখালে সংসারে ;
তাই তব জয়ধ্বনি উঠে চারিধারে।

অপ্রকাশিত পদাবলী

১৮। পদকর্ত্তা—কুঞ্জদাস

["পদমেরু" নামক নবাবিষ্কৃত পদসংগ্রহ গ্রন্থে, "বিপরীত বিভ্রমাভিসার-মিলন"—অধ্যায়ে এই পদকর্ত্তার দুইটি পদ প্রদত্ত হইয়াছে। পদ দুটী এই—

(১)

মুরলী শিখিবে রাধে শিখাব মনের সাধে
যেবা বোল বলি শুন ধনি।
ছাড়হ নারীর বেশ উচ করি বান্ধ কেশ
বামে চূড়া করহ চালনী॥
ঘুচাহ সিন্দুর পাটা পরহ বিনোদ ফোঁটা
দূরে রাখ নাসার বেসরে।
কাঁচলী ঘুচায়ে ফেল মৃগমদে হও কাল
তবে বাঁশী সাজিবে অধরে॥
লেহ মোর পীত ধরা পর আঁটি কটি বেড়া
অঙ্গুলি নোনান শিখাইব।
তুয়া নাম শুণ রাই যে রন্ধ্রে সদাই গাই
একে একে চিনাইয়া দিব॥
এলায়ে কবরী ছান্দ চূড়া বান্ধে শ্যামচাঁদ
রাই অঙ্গ করে ঝনমন।
কহে কুঞ্জ দাস বাঁশী শিখ বন্ধু পাশ
মুরলী পঞ্চ ধর করতল॥

---

(২)

নিকুঞ্জ মন্দিরে দেখ অদ্ভুত তরঙ্গ।
দুঁহু শিরে শোভে চূড়া দোঁহেতে ত্রিভঙ্গ॥
নাগরী শিখয়ে বাঁশী, নাগর শিখায়।
এক বাঁশী আধ আধ ধরিল দোঁহায়॥
শ্যাম বলে নিজ নাম বাজাও দেখি রাই।
যেন মতে উপাসনা সদাই ধেয়াই।
নিজ নামে রাই বাঁশী পূরয়ে অধরে।
'শ্যাম'-নাম আপনি ডাকিছে বামা-স্বরে॥
রাই বলে নিজ নাম বাজাও দেখি শ্যাম।
তোমার মুখে তোমার নাম শুনিতে অনুপাম॥
নিজ নামে নাগর পূরয়ে বাঁশী আধা।
শ্যাম নাম নাহি বাজে, ডাকে 'রাধা-রাধা॥
রাই বলে, এসো দেখি দোঁহে দিয়ে ফুক্।
না জানি কেমন বাজে, দেখিব কৌতুক॥
একই বাঁশী আধ আধ ধরে রাই-কানু।
রাধা-শ্যাম দুঁহু নাম বাজে ভিনু ভিনু॥
কুঞ্জদাস বলে শ্যাম বিরিঞ্চী অগোচর।
লীলায় বিহরে দোঁহে কিশোরা-কিশোর॥

শ্রীশিবরতন মিত্র

বীরভূমি ৯—৮, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫।

অর্জ্জুনের শ্রীরাধা দর্শন

১। শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যজীবন

পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ, পার্থসারথি কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের নিয়ামক ও গীতার উপদেষ্টা কৃষ্ণ। এই গেল একদিক্। মথুরায় দ্বারকায় মহাবীর মহাযোদ্ধা রাজ-রাজেশ্বর কৃষ্ণ। এই আর একদিক্। গোকুলে ব্রজে ও বৃন্দাবনে নন্দের দুলাল কৃষ্ণ, রসিকশেখর কৃষ্ণ। এই তাঁহার আর এক দিক্। শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ ত্রিবিধ। শ্রীকৃষ্ণ, তিনে এক, একে তিন।

ভারতের তত্ত্ববিৎ মহর্ষিগণ চিরদিন বলিয়া আসিতেছেন, পরমেশ্বর তিনে এক, একে তিন। তিনি সচ্চিদানন্দ, সৎ চিৎ আনন্দ; তিনি সত্য শিব সুন্দর; তিনি ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্; তাঁহাতে আছে তিনি শক্তি পরিপূর্ণমাত্রায়,—জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি।

কৃষ্ণভক্ত পৌরাণিক ঋষিগণ আর তাঁহাদের অনুগত সাধকগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলায় পরমেশ্বরের বা স্বয়ং ভগবানের প্রাকট্য বা প্রকাশ দেখিয়াছেন। God on earth in earthly affairs. শ্রীভগবানের যে-স্বরূপ, তত্ত্ব, স্বভাব বা রহস্য এই সব ঋষিগণ অন্তরের অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন, সেই সব তত্ত্ব বা রহস্যই, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্ত্য-লীলার বা নরলীলার ঘটনাসমূহের ভিতর ঘনীভূত মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন বা দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা অন্তর্মুখী হইয়া ভিতরের অনুভবের সাহায্যে বাহিরে অভিনীত ঘটনাবলী বুঝিয়াছিলেন এবং এখনও বুঝিতেছেন। তাঁহারা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ঋষি, তাঁহারা ভিতর হইতেই বাহিরে আসিতেন, ভিতরের সাহায্যেই বাহিরকে

বুঝিতেন। ইহাই ছিল তাঁহাদের পদ্ধতি। They saw the universe from within.

শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, স্বয়ং ভগবান্। পরমেশ্বরের যেমন ত্রিবিধ প্রকাশ, লীলায় অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণেরও সেইরূপ ত্রিবিধ প্রকাশ। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ, সৎ, জ্ঞান-শক্তি-প্রধান। দ্বারকা ও মথুরা, এই পুরদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতর, চিৎ, ক্রিয়াশক্তিপ্রধান। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম, আনন্দ, ইচ্ছাশক্তি প্রধান।

'আমি আছি'—ইহাতে সন্দেহ নাই। "নহি কশ্চিৎ সন্দিগ্ধে অহম্ বা নাহহম্ বেতি।" আমি আছি কিম্বা নাই, এ-সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। None doubts am I or am I not 'আমি আছি' ইহাই অসন্দিগ্ধ প্রাথমিক সত্য। তাহার পর আমি জানিতেছি 'আমি আছি'। I know I am 'আমি আছি' ইহাই সৎ আর 'আমি আছি' তাহার বোধ, ইহাই চিৎ। এই সত্বা ও সত্বাবোধের মূলে থাকিয়া যিনি ইহাদের ব্যক্ত করিতেছেন, এই সত্বা ও বোধ যাহাতে পরিণতি পাইবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত, তাহাই 'আনন্দ'। আনন্দই মূল। কিন্তু, সচ্চিদানন্দ, অবিচ্ছেদ্য পরম তত্ত্ব। ইহাই সচ্চিদানন্দের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। শ্রীকৃষ্ণই সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম।

শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন, তাঁহার নিত্যলীলা প্রপঞ্চে প্রকট করিলেন। নিত্যের প্রাকট্যের নাম লীলা। The Infinite playing in the finite. লীলা হইল এবং এখনও হইতেছে। লীলার সাক্ষী কে? লীলা জানিলেন কে? Whose consciousness is the testimony thereof? ইহাই প্রশ্ন। উত্তরে, নির্ভয়ে বলা যায়, এই লীলা সম্পূর্ণরূপে ও সম্যক্‌রূপে কেহই জানিতে পারেন নাই এবং পারিবেনও না। যাঁহার যতটুকু শক্তি বা অধিকার, তিনি ততটুকুই জানিয়াছেন এবং জানিবেন। লীলাময় অনন্ত, লীলাও অনন্ত। অনন্তের যখন অন্ত নাই, তখন অনন্তকে জানারই বা অন্ত থাকে কেমন করিয়া? অনন্ত সবই করিতে পারেন, তাঁহার ইচ্ছা অবাধ, তাঁহার ইচ্ছার উপর কাহারও কিছু বলিবার নাই। তিনিও যদি কোন দিন মনে করেন আমার লীলা আমায় জানিতে হইবে, সম্পূর্ণরূপে ও সম্যক্‌রূপে জানিতে হইবে, তাঁহা হইলে তিনিও পারিবেন না। অনন্তের অন্ত যদি থাকে তাহা এইখানে, তিনি নিজেকে নিজে জানিয়া শেষ করিতে অক্ষম। কথাটা যে সত্য, তাহা ভারতের লীলাবাদী ভক্তেরা দেখিয়াছেন। ভক্তেরা

বাহির হইয়াছিলেন অনন্তের অন্ত-অন্বেষণে। তাঁহাদের অন্বেষণ সফল হইয়াছে, তাঁহারা অন্ত দেখিয়াছেন। প্রশ্ন—কোথায়? উত্তর—নদীয়ায়। প্রশ্ন—কি অন্ত দেখিয়াছেন? উত্তর—দেখিয়াছেন, অনন্ত নিজের প্রেমে নিজেই পাগল, নিজের কাছে নিজেই ঋণী, নিজের নামে নিজেই মাতোয়ারা, নিজের রূপে নিজেই আত্মহারা। ইহারই নাম অনন্তের অন্ত।

শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন, লীলা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাহাদের অপ্রীতি হইল, তাহারা আত্মহারা বা আত্মঘাতী। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ আত্মা, আত্মারও আত্মা। তাহারা ধ্বংশ-প্রাপ্ত হইল। ঐকান্তিক ধ্বংশ (Eternal Damnation) অবশ্য নাই, কিন্তু আপাত-দৃষ্টিতে তাহাদের ধ্বংশই হইল। যাঁহারা নিজ নিজ শক্তি বা অধিকার অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার লীলার যৎকিঞ্চিৎ জানিয়া প্রীতিলাভ করিলেন, তাঁহাদের এই জানা বা পাওয়া যে শেষ হইয়া গেল, তাহা নহে। তাঁহাদের অনেকের জানা এবং পাওয়া আরম্ভ হইল, অনেকে পূর্ব্বে কিছু জানিয়াছিলেন ও পাইয়াছিলেন, এবারে আরও কিছু জানিলেন ও পাইলেন। কিন্তু কাহারও এই জানা ও পাওয়া শেষ হইল না। তাঁহারা অনন্তকাল ধরিয়া জানিবেন ও পাইবেন, প্রতিনিয়ত নূতন করিয়া এই চিরনবীন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার নব নব লীলার ভিতর জানিবেন ও পাইবেন। লীলারও শেষ নাই, জানা পাওয়া এবং হওয়ারও শেষ নাই। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে; ইহারই নাম অনন্তজীবন ও নিত্যলীলা।

নিত্যলীলার প্রাণের গূঢ় কথা, যাহা বলা হইল, তাহা না জানায় এবং না ভাবায় আমাদের ভারি ভুল হয়। আমরা মনে করি, অনেকে শ্রীকৃষ্ণকে বা শ্রীভগবানকে পাইয়াছে ও জানিয়াছে, তাহার ফলে তাহাদের জানা ও পাওয়া সব শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন তাহাদের চুপচাপ; মহানির্ব্বাণের অব্যক্ত মহা সমাধি; সব শেষ, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ ও নিশ্চেষ্টতার মধ্যে সব চুপচাপ, গতি নাই, বৈচিত্র্য নাই, হাসি নাই কান্না নাই, আলো নাই আঁধার নাই, উল্লাস ও অবসাদ নাই, মিলনবিরহ নাই, সব চুপ, একদম চুপ। অনেকে মনে করে ধর্ম্মসাধনের ও ধর্ম্মজীবনের ইহাই বুঝি শেষ কথা, ইহারই নাম ব্রহ্মদর্শন, ভগবৎপ্রাপ্তি। কথাটা কিন্তু মোটেই সত্য নহে, ইহা একটা ভুল,—মারাত্মক ভুল। এই ভুলের প্রেরণার আবেশে আজও অনেকে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের নামে জীবনের

শূন্যতার (Negation of Life) অভিমুখে চলিয়াছে। তাহাদের ডাকিয়া বল, ওপথে নহে, ওপথে নহে। জীবনের শূন্যতায় নহে ভগবান, জীবনের অসীমতায় ও পূর্ণতায় শ্রীভগবান্‌কে অন্বেষণ কর।

ভগবৎ-প্রাপ্তি বা ভগবদ্দর্শন জীবনের শেষ নহে, সত্যজীবনের আরম্ভ মাত্র। ভগবৎপ্রাপ্তি বা ভগবদ্দর্শন লয় নহে মৃত্যু নহে,—নবজন্ম লাভ। সীমায় মরিয়া অসীমে জন্ম লওয়া। এখন আমরা যে জীবনে বাঁচিয়া আছি বা যাহাকে জীবন বলিতেছি, তাহা সত্যজীবন নহে, তাহা সত্যজীবনের একটা ছায়া ও আভাস। নিত্যের দর্শন, আমি নিত্যের এই বোধ, আর এই দর্শন ও বোধের দ্বারা চালিত হইয়া নিত্যের সেবায় আত্ম-সমর্পণ, ইহাই জীবন—সত্যজীবন। ইহারই নাম নিত্যলীলায় প্রবেশ। ইহারই নাম নির্ব্বাসিত প্রবাসীর স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন।

২। লীলার তিনটি স্তর

শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ ত্রিবিধ। তত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখিলে এই ত্রিবিধ প্রকাশ যুগবৎ সত্য বা একসঙ্গে সত্য। কিন্তু, তাহার ধারণা বড়ই কঠিন। কাজেই তাহার আর আলোচনায় আপাততঃ দরকার নাই। এই ত্রিবিধ প্রকাশের ভিতর শ্রীবৃন্দাবনই সর্ব্বোত্তম।

মোটামুটি পাঁচ রকমে শ্রীকৃষ্ণকে বা শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া গিয়াছে। শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। ইহার মধ্যে শান্তভাব সকলের মূল, ঘরের ভিতের মতো। প্রাচীনেরা বলিয়াছেন, 'কৃষ্ণনিষ্ঠা' আর তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ 'তৃষ্ণাত্যাগ' (অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক বিষয়ের জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, তাহার ত্যাগ,) শান্তের বা শান্তভাবের ভক্তের এই দুইটি লক্ষণ। অনেকে এই শান্তভাবের নিষেধাত্মক অংশের (Negative aspect) অভিজ্ঞতা আশ্রয় করিয়া মনে করেন, ইহাই শেষ, শান্তভাবই শেষ। দাস্ত সখ্যাদি ভাবকে তাঁহারা অপ্রাকৃত বা নিত্য বলিতে অসম্মত। তাঁহারা শান্তভাবের কেবল অভাবের দিক্‌টাই দেখেন, 'তৃষ্ণাত্যাগ'টাই দেখেন, 'কৃষ্ণনিষ্ঠা' যাহা শান্তভাবের ভাবাত্মক অংশ (positive aspect) তাহা দেখেন না।

নারদ, সনক, সনন্দ, সনাতন, সনতকুমার, শুকদেব প্রভৃতির যে অনুভব বা

অভিজ্ঞতা আমরা পাইতেছি, তাহার সাহায্যে বেশ জোর করিয়াই বলা যায়, এই শান্তভাব শেষ নহে। এই অবস্থা, শান্তভাবের অবস্থা জীবচৈতন্যের আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশে একটি সাময়িক মধ্যবর্ত্তী অবস্থা—Interim. প্রাপঞ্চিক বৈচিত্র্য শেষ হইল, এইবার নিত্যজীবনের বৈচিত্র্য আরম্ভ হইবে, মধ্যস্থলে কিছুক্ষণের জন্য যবনিকা পতন ও বিশ্রাম। ইহাই প্রকৃত অদ্বৈততত্ত্ব। প্রপঞ্চের বিষয়ানন্দ অনিত্য, তাহা শেষ হইল। অচৈতন্যের বা জড়ের কোলাহল থামিল। এইবার নিত্যানন্দের ও শ্রীচৈতন্যের খেলা আরম্ভ হইবে, এই শান্তভাব বা অদ্বৈত তাহারই মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। ইহাই শান্তিপুর, শান্তভাবই শান্তিপুর। পুরাতন দ্বীপ তাহার ভবভয়ভীত কামতাড়িত পশুকুলকে লইয়া লুপ্ত হইল, কতক ভাঙ্গিয়া গেল কতক ডুবিয়া গেল, শ্রবণকীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তির পতাকা তুলিয়া নবদ্বীপ জাগিয়া উঠিল, বীরচন্দ্রপুরের বীর অবধুতের অভয়বাণীর সিংহগর্জ্জন শোনা গেল, আর প্রেমের বিজয়স্তম্ভ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতিষ্ঠা হইবে, এই শান্তভাব, অদ্বৈত বা শান্তিপুর তাহারই মধ্যবর্ত্তী অবস্থা।

শান্তভাবের পর আর চারিটি ভাব, দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর। ইহারা প্রত্যেকে আবার দুই দুই রকম। পুরের এক রকম, আর ব্রজের এক রকম। ব্রজের ভাবে ঐশ্বর্য্যের গন্ধ নাই, প্রপঞ্চের লেশ নাই, কামের আভাসও নাই, অনাত্মের বা বাহিরের কোন কিছুর বাধ্যতা ও বন্ধন নাই। ইহা হৃদয়ের নিজের রাজ্য, একেবারে বাধাহীন—Heart's own Kingdom. মথুরায় এবং দ্বারকায় প্রেমও আছে হৃদয়ও আছে, কিন্তু, সেখানে আসিয়া পড়িয়াছে মনের ও প্রাণের ছায়া। কাজেই সেখানে বাধা আছে, Limitation and convention আছে।

মানুষের হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় বিশুদ্ধ সাহিত্যে। ইহা স্বপ্নময় কল্পনাময়—Dreaming, Imagining—ইহা কাব্য। জীবনের ইহাই প্রথম স্তর, ইহাই বৃন্দাবন। কৈশোরেই ইহার সমাপ্তি। জীবনের দ্বিতীয় স্তর, অসীম সাহসিকতা, এমন কি দুঃসাহস—Daring—ইহা ঐতিহাসিক উপন্যাস Historical Romance—কেবল ইতিহাস নহে, কেবল উপন্যাসও নহে, কেবল হিসাবও নহে, কেবল স্বপ্নও নহে—দুই আছে, ইহা স্বপ্নেতিহাস, কাব্যেতিহাস। ইহাই মথুরা ও দ্বারকা। ইহা প্রথম যৌবন। জীবনের তৃতীয় স্তর বিবেচনাময় কর্ম্ম, হিসাবময় কর্ম্ম ও সিদ্ধি—Doing,

Achievement। Dreaming (স্বপ্নদর্শন ও কল্পনা), Daring (দুঃসাহস). Doing, (সিদ্ধি) জীবনের এই তিন স্তর। শ্রীকৃষ্ণলীলারও তিন ভাগ।

শ্রীকৃষ্ণলীলায় দেখিবেন, তৃতীয় স্তর অপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রথম স্তর বন, দ্বিতীয় স্তর নগর, তৃতীয় স্তর শ্মশান। সুতরাং, তৃতীয় স্তর অপূর্ণ, সিদ্ধি হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা একখানি বিয়োগান্তক নাটক A Tragedy. ইহার শেষ কথা "হইল না, কিছুই হইল না"। কুরুক্ষেত্র হইল, নিরস্ত্র থাকিয়া রথ চালাইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আদ্যোপান্ত মহাসমরের মহাধ্বংশ শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন। কিন্তু, হইল না, কিছুই হইল না। প্রভাস হইল, যদুবংশ ধ্বংশ হইল। তবুও হইল না।

তবে কি নিরাশাই শেষ? মূঢ়, মুর্খ! শেষ কোথায়? এযে নিত্যলীলা! হয় নাই, যাহা চাওয়া হইয়াছিল, তাহা হয় নাই। হয় নাই, যাহা প্রয়োজন, তাহা হয় নাই। হয় নাই, বহু চেষ্টা করা গিয়াছে, তবু হয় নাই। বেশ তো, হয় নাই তো হয় নাই। কাঁদ কেন, ভাব কেন, অবসন্ন হও কেন? হয় নাই তো হয় নাই।

হওয়া চাহিয়াছিল কে? শ্রীকৃষ্ণ 'হওয়া' চাহেন নাই। 'হওয়া' মানে 'শেষ হওয়া' 'সমাপ্ত হওয়া' 'আর-না-থাকা'। কে বলিল শ্রীকৃষ্ণ তাহা চাহিয়াছিলেন? শ্রীকৃষ্ণ তাহা চাহেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্, স্বয়ং ভগবান্, তিনি 'নিত্য লীলাময়' তিনি সমাপ্তি চাহেন নাই, আমরাও তাহা চাহি নাই। হয় নাই? বেশ তো ভালই হইয়াছে। তবে, এস, আবার নূতন করিয়া খেলা পাতি। এস আবার স্বপ্ন দেখি, বৃন্দাবনের মোহন বাঁশি আবার উঠুক্ বাজিয়া, এই কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের বিরাট বিশাল শ্মশানের ধ্বংস-স্তূপের উপর, আবার বাজুক বাঁশরি, আসুক কিশোর-কিশোরী, বহুক মৃদুল মলয় পবন, নাচুক ময়ূর-ময়ূরী। আবার সাজারে নিকুঞ্জ কানন, গাঁথো পুনঃ ফুলহার, বাঁশিতে হাসিতে কুসুম রাশিতে নাচুক রসের পারাবার। বৃন্দাবনের স্বপ্ন যদি সত্য তোদের হয়, তবে, আবার হইবে, মথুরা দ্বারকা, জ্বলিবে সমরানল; আবার হইবে কুরুক্ষেত্র-রণ আবার প্রভাস-লীলা। হোক হোক্—শেষ নাই, নিত্য-লীলার শেষ নাই, আবার হইবে বৃন্দাবন! Dreaming, Daring, Doing—পুনঃ পুনঃ পুনঃ পুনঃ, ঘুরিয়া ঘুরিয়া অহরহঃ চলুক চলুক চালাও চালাও শেষ হইয়া কাজ নাই। প্রস্তুত হও, বীর প্রস্তুত হও, শেষ নাই, শেষ নাই। ইহাই নিত্য-লীলা।

৩। অর্জ্জুন—ভক্ত ও সখা

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-সখা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, তুমি আমার ভক্ত ও সখা, ইহা এক উত্তম রহস্য। অনেকের কাছেই ইহা রহস্য। যাহারা কেবল দেবপূজক, দেবপূজাকেই যাহারা একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া বঞ্চিত হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, তাহারা শুনিবে কিন্তু বুঝিবে না. ভক্ত আবার সখা হয় কেমন করিয়া? যাহারা দেবপূজা ছাড়িয়াছে, বা দেবপূজা করিলেও গৌণরূপেই করে,তাহারাও ঈশ্বরেরই পূজা করে, কিন্তু ভয়ে বা লোভে ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার পূজা করে না। পরমেশ্বর আজ নরলীলায় মানুষ হইয়া আসিয়াছেন, ঈশ্বরত্ব চাপা দিয়া প্রেমের ভিখারী হইয়া ভালবাসাবাসি করিতে, প্রাণে প্রাণে মেশামেশি করিয়া রসের আস্বাদন দিয়া নিজেও পিপাসু প্রেমিকের বেশে রস আস্বাদন করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারই যাহারা পূজা করে, কেবলমাত্র শুদ্ধ প্রেমের পূজা করে, তাহারা ভয়ের বা লোভের ধার ধারে না, তাহারা গদাচক্রের বা অষ্টসিদ্ধির কল্পনাও করে না, তাহারা বেশ বুঝিবে, ভক্তই সখা, সখাই ভক্ত। তবে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন কেন, অর্জ্জুন তুমি আমার ভক্ত আবার তুমি আমার সখা, ইহা পরম রহস্য? একথা বলেন, তাহার কারণ, এ যে কুরুক্ষেত্র! এখানে যুদ্ধ, ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ, আত্মীয়ে আত্মীয়ে মারামারি, কাটাকাটি, মাটি লইয়া লাঠালাঠি। ইহারা বুঝিবে কি করিয়া, ভক্তই সখা আর সখাই ভক্ত? ইহারা বুঝিবে না, বাঁচিয়া থাকিতে বুঝিবে না, না বুঝিয়া মরিবে, মরিয়া হয় ত বুঝিবে, বুঝিয়া বাঁচিবে। মরিয়া যখন বাঁচিবে তখনও যদি না বুঝে আবার মরিবে, আবার বাঁচিবে। যখন বুঝিবে তখন আর মরিবে না, অমর হইবে। ইহাই উত্তম রহস্য—রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্।—উত্তম রহস্য কি? ভক্তোঽসি মে সখা চেতি—তুমি আমার ভক্ত, তুমি আমার সখা—একাধারে দুই।

অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় নহে। মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে একটা অমিত উত্তেজনা, উত্তেজনার পরেই একটা অবসাদ ও বিষাদ, একটা গভীর ভীষণ দুশ্চিন্তা। এই অবস্থায় গীতা-শ্রবণ, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে গীতা-শ্রবণ বা গীতামৃতপান, তাহার পর দিব্যচক্ষুপ্রাপ্তি, তাহার পর বিশ্বরূপ-দর্শন। দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ভয় পাইয়াছিলেন, কাঁপিয়াছিলেন, কাঁদিয়াছিলেন। ব্রজের মানুষের পায়ের ধূলা

পাইয়া যাহাদের ভয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মরণ যাহাদের নাই, অর্থাৎ পণ্ডিতের ভাষায় যাঁহারা অভয় ও অমৃত হইয়াছেন, তাঁহারা বলিলেন, অর্জ্জুনের বাকি আছে, অনেক বাকি আছে, ব্রজে বা বৃন্দাবনে যাইতে দেরী আছে, শ্রীরাধার সমীপবর্ত্তী হইতে অনেক দেরী আছে, এখনো অনেক বাকি আছে। এইটুকু জানা কথা। এইবার অজানা, নূতন কথা—

পদ্মপুরাণের কথা অমৃতের সার।
পানকর জন্মমৃত্যু হইবে না আর॥
'তত্ত্বতঃ' বুঝিলে পাবে ব্রজ-প্রেমধন।
প্রেমই চরম বস্তু, প্রেমই প্রয়োজন॥

৪। সংবাদ ও প্রণাম

যে-কথা গুপ্ত-কথা বা রহস্য, অথচ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা শুনিতে হইলে এবং বুঝিতে হইলে কথাটা কিরূপে আমাদের নিকট আসিল, কে কাহাকে বলিল, কবে বলিল, ইহা জানা দরকার। ইহার নাম পরম্পরা বা সংবাদ। যেমন শ্রীমদ্‌ভাগবত শাস্ত্র যে আকারে আমরা পাইতেছি, তাহাতে ইহা ষট্‌-সংবাদ গ্রন্থ। ষট্‌-সংবাদ কথার অর্থ কি, তাৎপর্য্য কি? ষট্‌চক্রের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে, অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে! মানব-চৈতন্যের বা মানবের অনুভব ও উপলব্ধির ছয় প্রকার অবস্থা আছে। একই ঘটনা এক এক চক্র হইতে দেখিলে বা এক একটা অধিষ্ঠান-ভূমি হইতে দেখিলে এক এক রকমের অনুভব বা অভিজ্ঞতা হয়। একই জিনিস কবিতার ভাষায় বা কবির ভাবে বলা যায়, ইতিহাসের ভাষায় বা ঐতিহাসিকের ভাবে বলা যায়, দর্শনের ভাষায় বা দার্শনিকের অনুভব বা উপলব্ধির সাহায্যে বলা যায়। আবার যাহারা জানে না তাহারা শুনিয়া অবাক্ হইবে, হয়ত বিশ্বাসই করিবে না, কেবল সংখ্যার সাহায্যে (By numbers) বলা যায়, জ্যামিতিশাস্ত্রের চিত্রের দ্বারা বলা যায়, কতকগুলি বর্ণের বিন্যাসের দ্বারা (colour Language) বলা যায়, বীজমন্ত্রের সাহায্যে বলা যায়। মন্ত্র, যন্ত্র, দেবতার মূর্ত্তি, বর্ণ, বীজ প্রভৃতি ব্যাপারগুলির ভিতরে অন্তর্জগতের অনেক তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে। সে-সব কথার আলোচনা ক্রমে ক্রমে হইবে, 'সংবাদ' বা 'পরম্পরা'

জিনিসটা যে খুব দরকারী জিনিস, উপেক্ষা করার জিনিস নহে, আপাততঃ এইটুকু জানিলেই কাজ হইবে।

এইবার যে-কথা বলিব তাহা অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাহা বলেন নাই, কারণ তাহা বলিবার কথা নহে। শ্রীকৃষ্ণ সবই পারেন, অর্জ্জুনকে তাহা দেখাইয়াছিলেন। কি করিয়া দেখাইয়াছিলেন তাহা পরে জানা যাইবে। অর্জ্জুন যাহা জানিয়াছিলেন বা দেখিয়াছিলেন, তাহা সনৎকুমারকে বলিয়াছিলেন, সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, উদ্ধবকে। সেই কথা উদ্ধব ও সনৎকুমারের আলোচিত কথা, দেবাদিদেব মহাদেব মহাদেবীকে বলিতেছেন। কথাটা গোপনীয় অর্থাৎ অর্জ্জুন সনৎকুমার উদ্ধব প্রভৃতি পাত্রগণকে বা ভক্তগণকে নিজের ভিতরে জাগাইতে হইবে, এইসব পাত্র বা ব্যক্তি-গণের অনুভবকে নিজের অনুভব করিতে হইবে; এইসব ভক্তগণকে প্রণাম করিতে হইবে, will have to participate in their consciousness, will have to feel what they felt, will have to think what they thought, অর্থাৎ এই সব ভক্তসাধুর অনুগত হইতে হইবে,তাহা হইলেই তাঁহাদের কথা আমাদের নিকট সত্য হইবে,নতুবা মাত্র কথা হইয়াই থাকিবে,অতএব ভক্তগণের চরণে প্রণাম। মহাদেবীর চরণে প্রণাম, মা করুণা কর। মা দয়া করিয়া বাবাকে দেখাইয়া দিলেন, চিনাইয়া দিলেন, বাবার চরণে প্রণাম, দেবাদিদেব মহাদেবের চরণে প্রণাম বাবা দেখাইয়াছিলেন উদ্ধব ও সনৎকুমারকে,তাঁহাদের চরণে প্রণাম। সনৎকুমার দেখাইলেন অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে, অর্জ্জুনের চরণে প্রণাম, প্রণাম শ্রীকৃষ্ণের চরণে। প্রণাম কথার অর্থ কি ? কেবল মাথা নোয়াইয়া পায়ের ধূলা লওয়া ? মোটেই তাহা নহে। ন মম—আমি নহে, আমার নহে, তোমার, এই ভাবিয়া আত্মসমর্পণ করা; প্রণম্যের হৃদয় ও মনকে নিজের হৃদয় ও মন করিবার জন্য যে-চেষ্টা তাহারই নাম প্রণাম। আমার হৃদয় আমার মন অনেক নীচে পড়িয়া আছে, আমি বুঝিয়াছি, নিজেই অনুভব করিয়াছি, হে প্রণম্য, তোমার হৃদয় ও মন আমার হৃদয় মনের অনেক উপরে, পবিত্রতায় ও স্বচ্ছতায় উপরে, গভীরতায় উপরে, প্রসারে উপরে; আমি যে আকাঙ্ক্ষাযুক্ত,— তোমার হৃদয়ের ও মনের পবিত্রতা স্বচ্ছতা, গভীরতা ও প্রসার আমার হউক, একদিনে হইবে না তাহা জানি, ক্রমে ক্রমে হইবে তাহা জানি, তাই মিলাইতে চাই আমার হৃদয় মন, তোমার হৃদয় মনে। ইহাই সাধুসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ, ইহারই নাম প্রণাম। কেবল প্রণাম

করিতে হয় বলিয়া, বা দশজনে প্রণাম করে বলিয়া যেখানে সেখানে যাহাকে তাহাকে প্রণাম করিও না, অন্য প্রকারে সামাজিক সৌজন্য দেখাইও। মাথার একটা গৌরব আছে, যেখানে সেখানে মাথা নোয়ানো ভাল নয়, তবে একটা দিন আসিবে যেদিন বিশ্বের সকলকে 'গোখর' পর্য্যন্ত—গাধাকে গরুকে পর্য্যন্ত, প্রণাম করিবে, শ্রীমদ্ভাগবতের এই কথা অনেক পরের কথা। এখন কি সে-অবস্থা হইয়াছে ? ভাবিয়া উত্তর দিও।

যাহা হউক প্রণাম ! প্রণাম !

৫। অর্জ্জুনের প্রশ্ন

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, করুণাসাগর প্রভু আমার, একদিন আপনি যেন কথায় কথায় আমায় বলিয়াছিলেন গোপিকারা আপনার প্রিয়া—অভীর্য্যস্তব বল্লভাঃ। আমি সেই গোপিকাদের কথা শুনিতে চাই।

তাস্তাঃ কতিবিধা দেব কতি বা সংখ্যয়া পুনঃ।
নামানি কতি বা তাসাং কা বা কুত্র ব্যবস্থিতা।
তাসাং বা কতি কর্ম্মাণি বয়ো বেশশ্চ কঃ প্রভো।
কাভিঃ সার্দ্ধং ক বা দেব বিহরিষ্যসি ভো রহঃ।
নিত্যে নিত্যসুখে নিত্যবিভবে বা বনে বনে।
তৎস্থানং কীদৃশং কুত্র শাশ্বতং পরমং মহৎ।
কৃপা যেত্তাদৃশী তন্মে সর্ব্বং বক্তুমিহার্হসি।
যদপৃষ্টং ময়াপ্যেবমজ্ঞাতং যদ্রহস্তব।
আর্ত্তার্ত্তিঘ্ন মহাভাগ তৎসর্ব্বং কথয়িষ্যসি।

১। গোপিকারা কত প্রকারের ২। তাহাদের সংখ্যা কত ৩। তাহাদের নাম কি কি ? ৪। তাহারা কে ? ৫। কোথায় তাহারা আছে ? ৬। তাহাদের কর্ম্ম কি, ও কত প্রকার ? ৭। তাহাদের বয়স কত ? ৮। তাহাদের বেশ কিরূপ ? ৯। তাহাদের মধ্যে কাহাদের সহিত আপনি নির্জ্জনে, নিত্যসুখে, নিত্য-বিভবে বনে বনে নিত্যকাল বিহার করেন ? ১০। সেই শাশ্বত, পরম ও মহৎ স্থান কিরূপ ও কোথায় ?

আমার প্রতি আপনার যদি সেরূপ কৃপা থাকে তাহা হইলে বলুন। আপনার

লীলার এই সব রহস্য আমার জানা নাই, কখনো জিজ্ঞাসাও করি নাই। হে মহাভাগ, আর্ত্তজনের আর্ত্ত দূর করাই আপনার কাজ, অতএব এই সব কথা বলুন।

এই প্রশ্নগুলি পড়িলেই বুঝিবেন, কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা-সম্বন্ধে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসিত হয় নাই। নিত্যলীলা-সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনের সমগ্র লীলাই রহস্য, চিররহস্য। মানবজাতি কখনই এই রহস্য সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে বা জানিতে পারিবে না। ভক্ত আচার্য্যেরা বলেন, শ্রীকৃষ্ণ, অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনবিহারী নন্দসূত শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজের ধামের ও লীলার রহস্য জানেন না, লীলার যাঁহারা প্রধান পরিকর সেই গোপিকাদের প্রেমের রহস্যও তিনি সম্পূর্ণরূপে জানেন না, তিনি নিজেই বিস্মিত, চিরবিস্মিত, সুতরাং অন্যে জানিবে কি ? জানার দরকারই বা কি ? আমরা জানার জন্য এত ব্যস্ত এবং ব্যাকুল কেন ? জানা আর পাওয়া, এই দুইটির জন্য যাহারা ব্যস্ত, তাহারা নিত্যজীবন, সত্যজীবন জানে না, অনিত্য অসত্য জীবনে মুগ্ধ হইয়া তাহারা মরণই খুঁজিতেছে। তাহারা জানে না জানিয়া ফেলিলেই মরিয়া যাইব। পাইলেই মরিয়া যাইব, পাইলেই ফুরাইয়া যাইব। জানা আর পাওয়া, যাহাদের শেষ হইয়াছে, যাহারা জানিয়া ফেলিয়াছে, আর পাইয়া ফেলিয়াছে, তাহারা জানেও নাই পায়ও নাই। তাহারা কেবল ফেলিয়াছে, তাহারা বাঁচিয়া মরিয়াছে, আর সকল-জানা সকল-পাওয়ার ভিতর যাহারা কিছুই জানে নাই, যাহারা কিছুইই পায় নাই, তাহারা মরিয়া বাঁচিয়াছে। বল না কি চাও, খুলিয়াই বল না, কি চাও ? বাঁচিয়া মরিতে চাও, না তোমরা মরিয়া বাঁচিতে চাও। বাঁচিতেই যদি চাও, অর্থাৎ মরিয়াও যদি বাঁচিয়া থাকিতে চাও, তবে জানা আর পাওয়া শেষ করিও না, না-জানা না-পাওয়া, কাঁদা আর চাওয়া, তোমাদের চিরদিনের পথের সম্বল হউক।

আমাদের প্রেমের ঠাকুর রাধারমণ, রাসবিহারী মদনমোহন, রাধার প্রেমে চিরঋণী শ্যামসুন্দর, বংশীবদন, পাইলেন না, শ্রীরাধার প্রেম পাইলেন না, জানিতেও পারিলেন না। তবে আমরা জানিব কেমন করিয়া ? অতএব, হে কৃষ্ণ, সে প্রাণসখা আমাদের জানা হইতে না-জানায় লইয়া চল, পাওয়া হইতে না-পাওয়ায় লইয়া চল। মন্ত্র উল্টাইয়া বল আলো হইতে আঁধারে লইয়া চল। চির-আলোটাই আঁধার, চির-অসৎটাই সৎ, চিরমরণটাই অমৃত। অতএব লইয়া চল আমাদিগকে ব্রজের সেই চির-অসতের কাছে,

লইয়া চল আমাদিগকে ব্রজের কুঞ্জবনের চির-আঁধারের কাছে, লইয়া চল আমাদিগকে সেই চিরমরণের দেশে।

প্রশ্নগুলি যে নিত্যলীলার প্রশ্ন তাহার আবার প্রমাণ চাই নাকি! 'নিত্য' এই কথাটাই আছে তিনবার, তাহা ছাড়া 'শাশ্বত' আছে, পরম আছে। অর্জ্জুন যাহা জানিতে চাহিলেন, তাহা জানে কে?

"শঙ্করাদ্যৈর্ব্বিরিঞ্চ্যাদ্যৈরদৃষ্টরশ্রুতঞ্চ যৎ।"

শঙ্করাদি ব্রহ্মাদি দেখেনও নাই শোনেনও নাই। ক্রমে শুনিবেন, ক্রমে দেখিবেন। শুনাইবার ও দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজেই অতিশয় ব্যস্ত। সেই যমুনাকূল আর সেই কদম্বমূল, সেই বাঁশরিতান, আর সেই সে নৃত্যগান। কেহ শুনিল না, কেহ দেখিল না, কেহ মজিল না, কেহ মাতিল না, এই দুঃখে নিত্য-অধীর ব্রজের শ্যামরায়। অতএব দেখিবে সবাই, বুঝিবে সবাই, জানিবেও সবাই। সবুর কর, তরুণ জাগিয়াছে—মরণভরা শ্মশানক্ষেত্র ভারতবর্ষে আবার তরুণ জাগিয়াছে, বুঝি আসিতেছে, ঐ অদূরে দলে দলে, চিরকিশোর-কিশোরী যত, তাহারা হাসিয়া হাসিয়া নাচিয়া নাচিয়া, ফুলসাজে সাজিয়া, চরণে জাগায়ে নুপুরনিক্কণ অধরে বাজায়ে বাঁশি, ঐ বুঝি আসিতেছে। তবে সবুর কর।

৬। অর্জ্জুনের সাধনা—ত্রিপুরসুন্দরী

অর্জ্জুনের প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সখে, তুমি যাহা শুনিতে চাহিতেছ, তাহা চির-অবিদিত। বলিতে পারি, কিন্তু বলিলে কি হইবে? বলিলে,—শুনিবে। শুনিলে উৎকণ্ঠা হইবে দেখিবার জন্য। ঐ সব স্থান "ব্রহ্মাদীনাং অদৃশ্যং"—ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অদৃশ্য।

অর্জ্জুনেরও প্রতিজ্ঞা আজ অর্জ্জুনেরই মতো,—জানিতেই হইবে। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, তোমাকে কিছুই বলিব না, যাহাতে তুমি দেখিতে পাও, তাহারই ব্যবস্থা করিব।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

যস্যাং সর্ব্বং সমুৎপন্নং যস্যামদ্যাপি তিষ্ঠতি।
নমস্যেত্তি তাং দেবীং শ্রীমৎত্রিপুরসুন্দরীম্॥

অরাধ্য পরয়া ভক্ত্যা তস্যৈ স্বঞ্চ নিবেদয় ।
তাং বিনৈতৎপদং দাতুং ন শক্নোমি কদাচন ।

যাহা হইতে এই সমুদয়ের উৎপত্তি হইয়াছে, যাহাতে এই সমুদয়ের অবস্থান, যাহাতেই এই সমুদয়ের লয় হইবে, সেই ত্রিপুরসুন্দরী দেবীর আরাধনা কর। পরম ভক্তির সহিত আরাধনা করিয়া সেই দেবীতে নিজেকে নিবেদন কর। সেই ত্রিপুরসুন্দরী দেবী ব্যতীত সেই পরমপদ দিতে অর্থাৎ ব্রজগোপীগণের সহিত তোমার সাক্ষাৎকার করাইতে আমিও সক্ষম নহি।

শ্রীভগবানের এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন সেই ত্রিপুরাদেবীর চরণতলে উপস্থিত হইলেন। শ্রীচিন্তামণি-বেদিকা, সেই বেদিকার সোপানশ্রেণী নানাবিধ রত্নের দ্বারা বিরচিত। বেদীতে কল্পতরু—পুষ্পফলে অবনত; সকল ঋতুতেই উহার পল্লবসমূহ কোমল, বায়ুকম্পিত, মধুস্রাবী ও উজ্জ্বল। বিহগবৃন্দের কলকণ্ঠস্বরে আর ভ্রমরগুঞ্জনে শব্দিত সেই কল্পতরু। কল্পবৃক্ষমূলে রত্নের মন্দির, মন্দিরে মহাহৈমাভিমোহন রত্ন-সিংহাসন। সেই সিংহাসনে অর্জ্জুন ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীকে দেখিলেন—

তত্র বালার্কসঙ্কাশাং নানালঙ্কারভূষিতাং ।
নবযৌবনসম্পন্নাং সৃণিপাশধনুঃশরৈঃ ॥
রাজচ্চতুর্ভুজলতাং সুপ্রসন্নাং মনোহরাম্ ।
ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশাদি কিরীটমণি রশ্মিভিঃ ॥
বিরঞ্জিতপদাম্ভোজমণিমাদিভিরাবৃতাম্ ।
প্রসন্নবদনাং দেবীং বরদাং ভক্তবৎসলাম্ ॥

চিন্তামণি বেদিকায় কল্পতরু, তাহার মূলে রত্নের মন্দির, সে-মন্দিরে হেম-সিংহাসন, সেই সিংহাসনে প্রভাতের রবিকর সম উজ্জ্বল ও সুন্দর, নানা অলঙ্কারে ভূষিতা, নবযৌবন-সম্পন্না; সৃণি, পাশ, ধনু ও শরযুক্ত চতুর্ভুজসমন্বিতা, সুপ্রসন্না ও মনোহরা এই দেবী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশাদি দেবগণের কিরীটের মণির প্রভায় দেবীর চরণ সমুজ্জ্বল, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। দেবী প্রসন্নবদনা, বরদা ও ভক্তবৎসলা।

ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী অর্জ্জুনকে কৃপা করিলেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে কৃপা করিয়া

পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে কেনই বা অবিলম্বে কৃপা না করিবেন ? দেবী বিস্মিতও হইলেন, কারণ এমন কৃপা শ্রীকৃষ্ণ আর কাহাকেও করেন নাই। ত্রিপুরসুন্দরী দেবী অর্জ্জুনকে বলিলেন—এই কুলকুণ্ড-সরোবরে স্নান কর, আর এই দেবী সর্ব্বকামপ্রদায়িনী তোমাকে যেখানে লইয়া যাইবেন, সেইখানে যাও। অর্জ্জুন স্নান করিয়া আসিলেন, যথাবিধি ন্যাস করাইয়া ও মুদ্রাদি করাইয়া দেবী ত্রিপুরসুন্দরী অর্জ্জুনের দক্ষিণ কর্ণে এক বিদ্যা বলিয়া দিলেন। এই বিদ্যার নাম পরা-বালবিদ্যা। এই মন্ত্রের জপ, পূজা, হোম প্রভৃতি সমস্তই অর্জ্জুনকে শিখাইয়া দিলেন। করবীর পুষ্পের একলক্ষ কোরকের সাহায্যে হোম করিতে হয়। সমুদয় কার্য্যই অর্জ্জুন করিলেন, দেবী প্রসন্না হইলেন। পূর্ব্বেই দেবী অর্জ্জুনকে এক সঙ্গিনী দিয়াছেন। দেবীর আদেশে সেই সহচরীর সহিত অর্জ্জুন চলিলেন—এবং

গতো রাধাপতিস্থানং যৎসিদ্ধৈরপ্যগোচরম্।

সিদ্ধগণেরও অগোচর রাধাপতি-স্থানে উপস্থিত হইলেন। সে স্থান কোথায় এবং কেমন ?

গোলোকাদুপরিস্থিতম্।
স্থিরং বায়ুং নিতং সত্যং সর্ব্বসুখাস্পদম্॥
নিত্যং বৃন্দাবনং নাম নিত্যরাস মহোৎসবম্।
অপশ্যৎ পরমং গুহ্যং পূর্ণপ্রেমরসাত্মকম্॥

গোলোকেরও উপরে এই ধাম; বায়ু সাহায্যে অন্তরীক্ষে অবস্থিত, সর্ব্বসুখের আস্পদ, সেখানে নিত্যই রাসবিহারের মহোৎসব, পূর্ণ প্রেমরসময় অতিগুহ্য নিত্যধাম, ইহাই বৃন্দাবন। অর্জ্জুন দিব্যচক্ষু পাইয়াছিলেন, তাহারই সাহায্যে এই নিত্যধাম দেখিলেন।

ধাম দেখিলেন, আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এখনও বাকি আছে। দেবী যে-সঙ্গিনী দিয়াছিলেন, সেই দেবী সখী সঙ্গে আছেন। এইবার অর্জ্জুন এক দিব্য জলাশয়ে উপস্থিত। এই সরোবর—

সহস্রদলপদ্মস্য সংস্থানং মধ্যকোরকম্।
চতুঃসরশ্চতুর্দ্বারমাশ্চর্য্যা কুলসঙ্কুলম্॥

দেবীসখীর আদেশে অর্জ্জুন এই সরোবরে স্নান করিলেন। দেবীসখী আর নাই। স্নান করিয়া যখন উঠিলেন, তখন অর্জ্জুন আর অর্জ্জুন নহেন, পুরুষই নহেন। অর্জ্জুন এখন নারী, পরমাসুন্দরী নারী, চারুহাসিনী।

সন্তপ্ত শুদ্ধ স্বর্ণরশ্মিগৌরকান্ত তনূলতাম্ ।
স্ফুরৎকিশোরবর্ষীয়াং শারদেন্দুনিভাননাম্ ॥
সুনীল কুটিল স্নিগ্ধ বিলসদ্রত্নকুণ্ডলাম্ ।
সিন্দুরবিন্দুকিরণ প্রোজ্জ্বলালকপট্টিকাম্ ॥
উন্মীলদ্ ভ্রূলতাভঙ্গী-জিতস্মরশরাসনাম্ ॥
ঘনশ্যামস সল্লোলখেলল্লোচন খঞ্জনাম্ ।
মণিকুণ্ডল তেজোংহংশু বিস্ফুরদ্গণ্ডমণ্ডলাম্ ॥
মৃণালকোমল ভ্রাজদাশ্চর্য্যভুজবল্লরীম্ ।
শরদম্বুরুহাং সর্ব্ব শ্রীচৌরপাণিপল্লবাম্ ॥
বিদগ্ধরচিতস্বর্ণকটিসূত্রকৃতাম্বরাম্
কূজৎকাঞ্চী কলাজাতি বিভ্রাজজ্জঘনস্থলাম্
ভ্রাজদ্দুকূলসংবীত নিতম্বোরুসুমণ্ডলাম্
শিঞ্জানমঞ্জুমঞ্জীর সুচারুপদপঙ্কজাম্
স্ফুরদ্বিবিধকন্দর্পকলাকৌশল শালিনীম্
সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্নাং সর্ব্বাভরণ ভূষিতাম্ ॥
আশ্চর্য্য ললনাশ্রেষ্ঠমাত্মানঞ্চবালোকয়ৎ ॥

তপ্ত স্বর্ণরশ্মিতুল্য গৌরবর্ণ সুন্দর দেহলতা, বয়সে নবীনা কিশোরী, শরতের পূর্ণচন্দ্রসম বদন, সুনীল কুটিল স্নিগ্ধ কেশরাশি-স্পর্শী কর্ণশোভা রত্নের কুণ্ডল। সিন্দুর বিন্দুর কিরণে ললাটদেশ উজ্জ্বল, বিশাল ভ্রূলতার ভঙ্গীতে মদনের শরাসন পরাজিত। মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ চঞ্চল তারকা, যেন নয়নে খঞ্জন। মণিকুণ্ডলের কিরণে গণ্ডমণ্ডল উজ্জ্বল। মৃণালের ন্যায় কোমল বাহুলতা, শরতের পদ্মসম করপল্লব, যাবতীয় সুন্দরের সৌন্দর্য্য অপহরণকারী। কটিদেশে কটিসূত্র যেন কোনো রসিকজনের রচিত। নিতম্বদেশে কাঞ্চীভূষণ শব্দায়মান, সুন্দর বস্ত্রে জঘন ও উরুদেশ আবৃত। সুচারু পদপঙ্কজে মঞ্জু মঞ্জীরের ধ্বনি। বিবিধপ্রকারের কন্দর্পকলাকৌশলসমন্বিতা, সর্ব্বলক্ষণসম্পান্না, সর্ব্বাভরণ ভূষিতা অপূর্ব্ব ললনাশ্রেষ্ঠরূপে অর্জ্জুন নিজেকে দেখিলেন।

নিজের পূর্ব্বজীবন ও পূর্ব্বকথা এখন অর্জ্জুন একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজের রূপ নিজেই দেখিতেছেন আর বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এমন

সময়ে এক দৈববাণী হইল, অর্জ্জুন, (এখন কিশোরী সুন্দরী রমণী) শুনিলেন। 'সুন্দরি যাও, সম্মুখের পথ ধরিয়া পূর্ব্ব সরোবরে যাও, সেই সরোবরের জল স্পর্শ করিলেই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। অবসন্ন হইও না, তোমার সখীগণ সেইখানে আছেন, তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, সেই সখীগণ তোমাকে সাহায্য করিবেন, তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। দৈববাণী অনুসারে যথাদিষ্টস্থানে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করার পরেই অর্জ্জুন দেখিলেন—পরমাসুন্দরী অসংখ্য রমণী, কি সুন্দর! এই রমণীগণের মধ্যে একজনের নাম প্রিয়মুদা। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে অর্জ্জুন বলিলেন, আমি কে, কাহার কন্যা, কাহার স্ত্রী, কে আমাকে এখানে আনিয়াছে, কিছুই জানি না, শুধু এইটুকু মনে আছে, আমি সরোবরে স্নান করিতে আসিয়াছিলাম। এক দেবসখী আমার সঙ্গে সঙ্গিনীরূপে ছিলেন।

৭। গোপী-পরিচয়

অর্জ্জুনও প্রশ্ন করিলেন। অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে প্রিয়মুদা নিজেদের পরিচয় দিলেন। বলিলেন,—আমরা এই গোপীগণেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। একদল নিত্যপ্রিয়া, একদল শ্রুতি, একদল মুনি, আর একদল গোপকন্যা। নিত্যপ্রিয়াদের অনেকের নাম করিলেন ১। পূর্ণরসা ২। রসতরঙ্গিণী ৩। রসকল্লোলিণী ৪। রসবাপিকা ৫। অনঙ্গসেনা ৬। অনঙ্গমালিনী ৭। মদয়ন্তী ৮। বিহ্বলা ৯। ললিতা ১০। ললিতযৌবনা ১১। অনঙ্গকুসুমা ১২। মদনমঞ্জরী ১৩। কলাবতী ১৪। রতিকলা ১৫। কামকলা ১৬। কামদায়িনী ১৭। রতলোলা ১৮। রতোৎসুকা ১৯। রতিসর্ব্বস্বা ২০। রতিচিন্তামণি ২১। নিত্যানন্দা। শ্রুতিচরী গোপীদেরও অনেকের নাম করিলেন ১। উদ্গীতা ২। কলস্বরা ৩। কলকণ্ঠিকা ৪। বিপঞ্চী ৫। ক্রমপদা ৬। বহুহুতা ৭। বহুপ্রয়োগা ৮। বহুকলা ৯। কলাবতী ১০। ক্রিয়াবতী। যে-সব গোপী মুনি ছিলেন, তাঁহাদের নাম ১। উগ্রতপা ২। বহুগুণা ৩। প্রিয়ব্রতা ৪। সুব্রতা ৫। সুরেখা ৬। সুপর্ব্বা ৭। বহুপ্রদা ৮। রত্নরেখা ৯। মণিগ্রীবা ১০। সুকল্পা ১১। আকল্পা ১২। সুপর্ণা ১৩। রত্নমালিকা ১৪। সৌদামিনী ১৫। কামদায়িনী ৬। ভোগদা ১৭। বিশ্বমাতা ১৮। ধারিণী ১৯। ধাত্রী ২০। সুমেধা ২১। কান্তি ২২। অর্পণা

২৩। সুপর্ণা ২৪। সুদতী ২৫। গুণবতী ২৬। সৌকলিনী ২৭। সুলোচনা ২৮। সুমনা ২৯। অশ্রুতা ৩০। সুশীলা ৩১। রতিসুখদায়িনী। তাহার পর গোপবালাগণের নাম বলিলেন—১। চন্দ্রাবলী ২। চন্দ্রিকা ৩। চন্দ্ররেখা ৪। চন্দ্রমালা ৫। চন্দ্রপ্রভা ৬। চন্দ্রকলা ৭। বর্ণাবলী ৮। বর্ণমালা ৯। মনিমালিকা ১০। মল্লী ১১। নবমল্লী ১২। শেফালিকা ১৩। বর্ণপ্রভা ১৪। সুপ্রভা ১৫। মনিপ্রভা ১৬। হারাবলী ১৭। তারামালিনী ১৮। মালতী ১৯। যুথী ২০। বাসন্তী ২১। নবমল্লিকা ২২। সৌগন্ধিকা ২৩। কস্তুরী ২৪। পদ্মিনী ২৫। কুমুদ্বতী ২৬। রসোল্লাসা ২৭। চিত্রবৃন্দাবনা ২৮। উর্ব্বশী ২৯। রম্ভা ৩০। সুরেখা ৩১। স্বর্ণরেখিকা ৩২। কাঞ্চনমালা ৩৩। শতসন্ত্রতিকা।

চারি প্রকারের পঁচাশি জন গোপিকার নাম প্রিয়মুদা বলিলেন। সকলের নাম বলা হয় নাই, এখনও অনেক বাকি। অর্জ্জুনেরও এখন বাকি আছে।

৮। সিদ্ধিলাভ

প্রিয়মুদা অর্জ্জুনকে পূর্ব্ব সরোবরে স্নান করাইলেন এবং একটি মন্ত্র দিলেন। এই মন্ত্রের অগ্রে বাহ্নবীজ, শেষে বরুণবীজ। এই মন্ত্রে নাদবিন্দুযুক্ত চতুর্থস্বরের যোগ আছে এবং মন্ত্রটি প্রণবপুটিত। কেবল যে মন্ত্র দিলেন, তাহা নহে। মন্ত্রের সহিত

পুরশ্চর্য্যাবিধির্ধ্যানং হোমং সংখ্যা জপস্য চ।

পুরশ্চরণ, ধ্যান ও হোমের বিধি এবং জপের সংখ্যাও বলিয়া দিলেন। অর্জ্জুন যথাবিধি কার্য্য করিলে এক দেবী আসিয়া দেখা দিলেন। এই দেবী 'হেমচম্পকবর্ণাভা'। তিনি প্রিয়ংবদানাম্নী এক সখীর উপর ভাঁর দিলেন। তিনি উত্তর সরোবরে অর্জ্জুনকে স্নান করাইয়া সঙ্কল্পাদি পূর্ব্বক পূজা করাইলেন। তাহার পর অর্জ্জুনকে দিলেন এক মন্ত্র, আর এক ব্রতের উপদেশ। হরিবল্লভা সেই দেবীর (শ্রীরাধার) আদেশে প্রিয়ংবদা সখী শিখাইয়া দিলেন, এখন অর্থাৎ এই নূতনমন্ত্র গ্রহণের পর, কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে হইবে। ভগবান্ নীলোৎপলদলশ্যাম, নানালঙ্কারভূষিত, কোটিকন্দর্পলাবণ্য, রাসরসাকুল। অর্জ্জুন এখন কি করিতেছেন? কেবল মন্ত্র বা কেবল ধ্যানের দ্বারা হইবে না বা হয় নাই, ইহাই পদ্মপুরাণের মত। দ্রব্য চাই, ক্রিয়া চাই, বিধি চাই, কেবল

রাগ বা অনুরাগের দ্বারা, কেবল ভাব বা চিন্তার দ্বারা হইবে না, পদ্মপুরাণে এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। কেহ বলিতে পারেন, ধর্ম্ম সাধনায় দ্রব্য ও ক্রিয়া না থাকিলে যাজক কি করিবেন ? যাহার যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন।

গোরোচনা, কুঙ্কুম, চন্দন প্রভৃতি অনুলেপন দ্রব্যের দ্বারা অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত হইল, তাহার ভিতর যন্ত্র আঁকিয়া মন্ত্রটি লিখিত হইল। অঙ্গন্যাস, করন্যাস, মাতৃকান্যাস প্রভৃতি করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য পুষ্প চন্দন কুঙ্কুম ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কার মাল্য প্রভৃতির দ্বারা অর্জ্জুন পূজা আরম্ভ করিলেন। বাহনের পূজা, অস্ত্রের পূজা, পরিবারগণের পূজা এবং নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পূজা হইল। পূজার পরে স্তবপাঠ ও প্রণাম। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের সেইরূপ,—শ্রীরাধার আদেশে সখী প্রিয়ংবদা যাহা শিখাইয়াছিলেন, সেইরূপ একাগ্রচিত্তে স্মরণ করিতে লাগিলেন। আর কি হরি থাকিতে পারেন ? ভক্তিতে বশীভূত হইয়া শ্রীভগবান্ যশোদানন্দন মৃদুহাস্যসহকৃত অপাঙ্গ ইঙ্গিতে শ্রীরাধাকে বলিলেন, সেই নূতন ভক্তকে এইবার লইয়া আইস, তাহার সময় হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে হাসিয়া নয়ন ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করিয়া প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধাকে কথাগুলি মৃদুস্বরে বলিলেন, তাহাতে বুঝিতে পারা গেল, শ্রীরাধার ইহাই কাজ। নূতন নূতন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া, সাধন-পথে আনিয়া তাহার প্রয়োজনমত সাধনভজনের ব্যবস্থা করিয়া, তাহাকে পরিপক্ক ও উপযুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট লইয়া আসা, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত করা,—ইহাই শ্রীরাধারাণীর কাজ। শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানেন। শ্রীকৃষ্ণবিলাসের যে-আনন্দ শ্রীরাধা পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সাধ তো মেটেই নাই, বরং আকাঙ্ক্ষা যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি—শ্রীরাধারাণী, নিখিলের সকলের, আর সকলেই তাঁহার। তিনি চাহেন ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই শ্রীকৃষ্ণবিলাসের এই পূর্ণানন্দামৃত-রস পান করিয়া ধন্য হউক। সকলের জীবন যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এই প্রকারে ধন্য হইবে, ততক্ষণ শ্রীরাধার তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই।

অর্জ্জুনকে শ্রীরাধাই টানিয়া লইলেন, আত্মসাৎ করিলেন। কি প্রকারে ইহা হইল ? হঠাৎ একদিন অর্জ্জুনের প্রাণে এক অভিনব ইচ্ছার উদগম হইল। সখা ও গুরু শ্রীকৃষ্ণের মুখে কবে একটি কথা শুনিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, ব্রজ-গোপীরাই আমার প্রেয়সী, আমি তাহাদের। বন্ধুর মুখে অনেক কথাই শোনা যায়।

হঠাৎ একদিন অর্জ্জুনের মনে হইল, আমার সখা রাজা, যোদ্ধা, পণ্ডিত, যোগী, উপদেষ্টা। কি নহেন? আমার সখা সবই। কিন্তু এই রাজাগিরি, যোদ্ধাগিরি, সারথিগিরি, যোগী-গিরি, জ্ঞানীগিরি, ইহাতে যেন সখার তৃপ্তি নাই, কোন্ সুদূরের কোন্ অতীতের, কোন্ নিভৃতের কোন্ গোপনের, কোন্ শৈশবের ও কৈশোরের এক মধুময়ী স্মৃতি যেন সখার আমার বুকের ভিতর গোপনে নীরবে বসিয়া দিবসরজনী হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছে। সে কথা সখা আমার কাহাকেও বলেন না, কারণ সেকথা শুনিবার বা বুঝিবার মতো মর্ম্মী মানুষ ত্রিভুবনে নাই। তাই অর্জ্জুন সেই কথা, সেই ব্রজগোপীর প্রেমের কথা আজ জানিতে চাহিলেন। অর্জ্জুনের মনে এই যে ইচ্ছার জাগরণ হইল, ইহাই শ্রীরাধা-রাণীর কৃপা বা হ্লাদিনীশক্তির প্রেরণা। ব্যাপারখানা এই। আমি একজনকে ভালবাসি খুবই ভালবাসি। একদিন আমার মনে হইল আমার প্রিয় প্রেমাস্পদ কখনও আর কাহাকেও ভালবাসিয়াছেন কি না, কাহাকেও ভালবাসিয়া তাহাকে হারাইয়া হৃদয়ের মধ্যে নীরবে তাহার কথা ভাবেন কি না? আমার মনে হইল আমার প্রিয় প্রেমাস্পদের হৃদয় অন্য কোথাও বাঁধা আছে কি না? যদি তাহা জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে প্রিয়কে তুষ্ট করার জন্য তাহারই সেবা করিতাম। এই যে ইচ্ছা ইহাই প্রেম। আমার প্রিয় আমারই, আর কাহারও নহেন, তিনি আর কাহারও হইলে তাহা আমার অসহ্য, ইহা প্রেম নহে।

অর্জ্জুনের মনে ইচ্ছার উদ্গম হইল শ্রীরাধার প্রেরণায়। ত্রিপুরসুন্দরীরূপে শ্রীরাধাই অর্জ্জুনকে কৃপা করিলেন। দৈববাণী প্রভৃতির দ্বারা অর্জ্জুনকে পরিচালনা, সখীদের সাহচর্যদান, দীক্ষাদান প্রভৃতি যাহা কিছু পর পর অর্জ্জুনের ভাগ্যে জুটিয়াছে, তাহার সমস্তই শ্রীরাধারাণীর প্রত্যক্ষকৃপা। শ্রীরাধা ইহাই করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ যেন বলিলেন প্রিয়ে, তোমার আর একটি গুটি পাকিল, উহাকে লইয়া আইস।

অর্জ্জুন আসিলেন। দেখিলেন কল্পতরু, রত্নমন্দির রত্নসিংহাসন, অষ্টদলপদ্ম, শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধি, কামধেনু নন্দনবন। আর দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ,—কোটিকামজিৎ তাঁহার লাবণ্য। শ্রীরাধা তাঁহার বামে। অর্জ্জুনের সাধ মিটিল। নির্জ্জন ক্রীড়াকাননে শ্রীকৃষ্ণকে পাইলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ শারদানাম্নী সখীকে বলিলেন, শারদে ইহাকে

পশ্চিম সরোবরে স্নান করাও। এই সরোবরে অর্জ্জুন যেমন স্নান করিয়া উঠিয়াছেন, অমনি যেন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, অর্জ্জুন আবার অর্জ্জুন হইলেন, দেখিলেন সখা ও গুরু শ্রীকৃষ্ণ নিকটেই দাঁড়াইয়া। এতক্ষণ কি স্বপ্ন দেখিলেন! বড়ই মধুর তো এই স্বপ্ন! অদ্ভুত, অত্যদ্ভুত। অর্জ্জুন বিমনা হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মাথায় হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, সখে, যাহা দেখিলে, গোপনে রাখিও কাহাকেও বলিও না। ইহাই অর্জ্জুনের শ্রীরাধা-দর্শন।

৯। নারদের নারীমূর্ত্তি

পদ্মপুরাণে নারদের শ্রীরাধাদর্শনসম্বন্ধে দুইটি উপাখ্যান আছে। তাহার একটি উপাখ্যান পূর্ব্বগ্রন্থে বলা হইয়াছে। সেবারে নারদকে নারীমূর্ত্তি গ্রহণ করিতে হয় নাই। পুরুষরূপেই শ্রীবৃন্দাবনে প্রকট লীলায় শ্রীরাধাকে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় উপাখ্যানে আছে, নারদকে নারীরূপ লইতে হইয়াছিল। মহাবিষ্ণুর কৃপায় নারদ অমৃত সরোবরে স্নান করিয়া নারী হইয়াছিলেন, চতুর্দ্দশ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র পাইয়াছিলেন, সেই মন্ত্রের সাহায্যে তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছিল। তাহার পর আবার অমৃত-সরোবরে স্নান করিয়া নারদ নিজের পূর্ব্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন।

১০। শ্রীবৃন্দাবন

শ্রীবৃন্দাবন কি ও কোথায়? কি প্রকারে আমরা শ্রীবৃন্দাবনের চিন্তা করিব? এ-সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে অনেক কথাই আছে। পদ্মপুরাণে যে সব কথা আছে, তাহার অনেক কথাই গৌতমীয় তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থেও পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মতাবলম্বী গোস্বামীপাদগণও এই সব শ্লোক নানাস্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সুতরাং এই সব কথার প্রকৃত তাৎপর্য্যে আলোচনা আবশ্যক। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—

> ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈককেবলম্।
> যত্র মে পশবঃ সাক্ষাদ্ বৃক্ষাঃ কীটা নরামরাঃ॥
> যে বসন্তি মমাস্তে তে মৃতা যান্তি মমান্তিকম্।
> অত্র যা গোপপত্ন্যশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে।

যোগিন্যস্তাস্ত এবং হি মম দেবাঃ পরায়ণাঃ।
পঞ্চযোজনমেবং হি বনং মে দেহরূপকম্।
কালিন্দীয়ং সুষুম্না যা পরমামৃতবাহিনী ॥
যত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ ॥
সর্ব্বতো ব্যাপকশ্চাহং ন ত্যক্ষ্যামি বনং ক্বচিৎ
আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে ॥
তেজোময়মিদং স্থানমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষাম্।
রহস্যং মে প্রভাবস্য বৃন্দাবনং যুগে যুগে।
ব্রহ্মাদীনাং সুরাণাঞ্চ ন দৃশ্যং তৎকথঞ্চন ॥

এই রমণীয় বৃন্দাবন একমাত্র আমারই ধাম। এই বৃন্দাবনে যে-সব পশু বৃক্ষ কীট মানব দেবতা প্রভৃতি বাস করে তাহারা আমারই, তাহারা মরিলে আমার নিকটেই আসে। এই বৃন্দাবনে আমার আলয়ে যে-সব গোপপত্নী বাস করে তাহারাও আমার। এই বৃন্দাবন পঞ্চযোজন বন, ইহা আমার দেহস্বরূপ, এই কালিন্দী সুষুম্না নাড়ী এবং পরমামৃতবাহিনী। এই কালিন্দীতে দেবগণ এবং ভূতগণ সূক্ষ্মরূপে বিরাজিত। আমি সর্ব্বব্যাপী, আমি কখনও এই বন পরিত্যাগ করি না। যুগে যুগে ঐ বনের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। বৃন্দাবন তেজোময় স্থান এবং চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য। বৃন্দাবন যুগে যুগে আমার প্রভাবের রহস্য, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণেরও ইহা দৃশ্য নহে।

পদ্মপুরাণে আর এক উপাখ্যান আছে। বেদব্যাস তপস্যা করিয়া শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন, আমি আপনাকে চক্ষুর সাহায্যেই দেখিতে চাই। শ্রীভগবান বেদব্যাসের এই প্রার্থনার উত্তরে বলিয়াছিলেন, আমাকে নানাজনে নানারূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কেহ বলে প্রকৃতি, কেহ বলে পুরুষ, কেহ বলে ঈশ্বর। কেহ বলে ধর্ম্ম, কেহ বলে ধন, কেহ বলে মোক্ষ, কেহ বলে ধন ও মোক্ষ উভয়ই। কেহ বলে শূন্য, কেহ বলে ভাব, কেহ বলে শিব, কেহ বলে সদাশিব। কেহ বলেন বেদশির, সদ্ভাব, বিক্রিয়াহীন, সচ্চিদানন্দ সনাতন। এই প্রকারে নানাজনে নানাভাবে আমাকে নির্দ্দেশ করেন। যাহা হউক, আমার বেদগোপিতরূপ তুমি দর্শন কর। তখন বেদব্যাস দেখিলেন—

বালং কালাম্বুদপ্রভম্।
গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ ॥

কদম্বমূল আসীনং পীতবাসসমদ্ভুতম্।
বনং বৃন্দাবনং নাম নবপল্লবমণ্ডিতম্॥
কোকিল ভ্রমরারাবং মনোভব মনোহরম্।
নদীমপশ্যং কালিন্দীমিন্দীবর ধরপ্রভাম্॥
গোবর্দ্ধনং তথাপশ্যং কৃষ্ণরামকরোদ্ধৃতম্।
মহেন্দ্রদর্পনাশায় গোগোপাল সুখাবহম্॥
গোপালমবলাসঙ্গমুদিতং বেণুবাদিনম্।

গোপবালক, নিবিড় মেঘের কান্তি, গোপকন্যাগণ-সমাবৃত, গোপবালকসঙ্গে হাস্যরত। কদম্বমূলে আসীন, পীতবসন পরিধান। বৃন্দাবন বন, নবপল্লবশোভিত, কোকিলভ্রমররব-গুঞ্জিত, মদনেরও মনোহর। ইন্দীবরধরপ্রভা যমুনা! ইন্দ্রের দর্পনাশের জন্য কৃষ্ণ-বলরামের করধৃত গোপ ও গোগণের সুখাবহ গিরি গোবর্দ্ধন। অবলাঙ্গন সঙ্গে আনন্দিত বেণুবাদনকারী শ্রীকৃষ্ণ।

বেদব্যাসকে এই রূপ ও ধাম দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

যদিদং মে ত্বয়া দৃষ্টং রূপং দিব্যং সনাতনম্।
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্॥
পূর্ণং পদ্মপলাশাক্ষং নাতঃ পরতরং মম॥
ইদমেব বদন্ত্যেতে বেদাঃ কারণ কারণম্।
সত্যঞ্চাপি পরানন্দং চিদ্ঘনং শাশ্বতং শিবম্॥
নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা।
যমুনাং গোপকন্যাংশ্চ তথা গোপালবালকান্।
মমাবতারো নিত্যোঽয়মত্র মা সংশয়ং কৃথাঃ।
মমেষ্টা হি সদা রাধা সর্ব্বজ্ঞোঽহং পরাৎপরঃ।
সর্ব্বকামশ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বানন্দঃ পরাৎপরঃ।

তুমি আমার যে রূপ দেখিতেছ, ইহা দিব্য, সনাতন, নিস্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, সচ্চিদানন্দ-ঘন পূর্ণ ও পদ্মপলাশাক্ষ, ইহা অপেক্ষা পরভাব আর কিছুই নাই। বেদসমূহ ইহাকেই সর্ব্বকারণ-কারণ বলেন। ইহা সত্য, পরানন্দ, চিদ্ঘন, শাশ্বত ও শিব। মথুরা বৃন্দাবন যমুনা গোপকন্যা ও গোপবালক ইহারা আমারই অবতার ও নিত্য, ইহাতে সন্দেহ করিও

না। আমি সর্ব্বজ্ঞ, পরাৎপর, সর্ব্বকাম, সর্ব্বেশ, সর্ব্বানন্দ। শ্রীরাধা আমার ইষ্টা বা প্রিয়তমা।

ব্যাসদেব পুনরায় নানারূপ প্রশ্ন করায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋচো বৈ গোপকন্যকাঃ।
দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র তপোযুক্তা মুমুক্ষবঃ
গোপালা মুনয়ঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠানন্দমূর্ত্তয়ঃ॥
কল্পবৃক্ষ কদম্বোঽয়ং পরানন্দৈকভাজনম্।
বনং নন্দনকাখ্যং হি মহাপাতকনাশনম্॥
সিদ্ধাশ্চ সাধ্যা গন্ধর্ব্বাঃ কোকিলাদ্যা ন সংশয়ঃ।
কেচিদানন্দহৃদয়ং সাক্ষাদ্‌যমুনয়াতনুম্॥
অনাদির্হরিদাসোঽয়ং ভূধরো নাত্র সংশয়ঃ।

গোপীগণ শ্রুতি, ঋক্ বা মন্ত্রসমূহ গোপকন্যা, বৈকুণ্ঠবাসী আনন্দমূর্ত্তিধর তপস্যারত মুক্তিকামী মুনিগণ গোপবালক। কল্পবৃক্ষই কদম্ব। পরমানন্দের একমাত্র আধার মহাপাতকনাশন নন্দন নামক বনই বৃন্দাবনের বন; সিদ্ধ সাধ্য ও গন্ধর্ব্বগণ কোকিলাদি পক্ষী। জ্ঞানীরা যমুনাকে আনন্দ-হৃদয় শ্রীভগবানের দেহস্বরূপ বলিয়া থাকেন। অনাদি হরিদাসই গোবর্দ্ধন গিরি।

এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের মুখের বাঁশিটির পূর্ব্বের ইতিহাস আছে। বেদব্রত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সাধু এবং কর্ম্মকাণ্ডে সুনিপুণ। একদিন একজন বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত নির্ম্মাল্য ও ফলমূলাদি বেদব্রতকে দিয়াছিলেন। বেদব্রত তাহা লইয়াছিলেন কিন্তু একটু হাসিয়া অশ্রদ্ধা-সহকারে লইয়াছিলেন। বেদব্রত পুণ্যাত্মা ছিলেন, তাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণের মুখের বাঁশি হইয়াছেন, কিন্তু অশ্রদ্ধা করার জন্য কঠিন-স্বভাব হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবৃন্দাবন, গোপ, গোপী প্রভৃতি সম্বন্ধে যে-সব কথা বলা হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবসমাজেরও তাহাই মত। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণপারম্যবাদী ও নিত্যবৃন্দাবনবাদী।

১১। তত্ত্বকথা ও নবযুগ

বৃন্দাবন-সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি, আর পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে যাহা কথিত হইল, তাহার আলোচনা করিলে যে-সকল সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তাহা বলা হইতেছে।

আমাদের দেশে ব্রহ্মাণ্ডকে চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক বলা হইয়াছে। সপ্তস্বর্গ আর সপ্ত পাতাল। শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরেও আছে, বাহিরেও আছে। পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন—

অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডে তদ্বাহ্যাভ্যন্তরস্থিতে।
বিষ্ণোঃ স্থানং পরং তেষাং প্রধানং বরমুত্তমম্॥

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে, তাহার ভিতরে ও বাহিরে বিষ্ণুর পরম স্থান আছে, শ্রীবৃন্দাবন তাহাদিগের মধ্যে প্রধান ও উত্তম।

প্রাচীনকালের ভারতীয় ঋষিদের বিভাগ অতিশয় সূক্ষ্ম। আমরা প্রথমে সেই সূক্ষ্মতার ভিতর প্রবেশ করিতে চেষ্টা না করিয়া বৃন্দাবন-সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিতে চেষ্টা করিতেছি। "অদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা" চর্ম্মচক্ষুর অগোচর, কিন্তু একেবারেই অগোচর নহে। এই চক্ষু তাহা দেখিতে পায় না, এই কর্ণ তাহা শুনিতে পায় না, এই মন তাহা কল্পনাও করিতে পারে না, এই বাক্য তাহা বর্ণনা করিতে পারে না, তাহা অব্যখ্যানসগোচর। কিন্তু চক্ষু তাহা দেখিয়াছে, তাহার শোভা দেখিয়াছে এবং মুগ্ধ হইয়াছে। কর্ণ তাহার শব্দ, বাণী, বংশীধ্বনি প্রভৃতি শুনিয়াছে, এবং তৃপ্ত হইয়াছে। এই যে দুই প্রকারের বিরোধী কথা, ইহারা কি সত্যই বিরোধী? অথবা একই মহাসত্যের দুইটি দিক্‌মাত্র, দুইটি অবিরোধী দিক্‌মাত্র? Can these apparently conflicting utterances be reconciled and shown to be unopposed sides of a great truth? ইহাই প্রশ্ন।

এই প্রকারের বিরোধী কথা,—দেখা যায়, দেখা যায় না; শোনা যায় শোনা যায় না; অরস, সর্ব্বরস; অগন্ধ, সর্ব্বগন্ধ; প্রভৃতি উপনিষদেও আছে পুরাণেও আছে। এই কথাগুলি যে-বস্তু বা যে-জগৎ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার নাম অপ্রাকৃত চিজ্জগৎ, আর আমাদের এই জগৎ প্রাকৃত জড়জগৎ। প্রথম কথা, যাহা আমরা পূর্ব্বের

আলোচনা হইতে পাইলাম এবং যাহা আমাদিগকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে, তাহা এই। আমরা প্রত্যেকেই বর্ত্তমানে একই সময়ে এই উভয় জগতে বাস করিতেছি—এই উভয় জগৎ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত—The physical and The spiritual. ইহাতে আজ আর কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না, সন্দেহ করিলে বঞ্চিত হইবেন। কথাটা শুনিয়া অনেকে অবাক্ হইয়া যাইবে। সাধারণ লোকের ধারণা, আমরা এখন কেবলমাত্র প্রাকৃত স্থূল জগতে বাস করিতেছি। যতদিন বাঁচিয়া আছি ততদিন অপ্রাকৃত জগতের কথা শুনিতে পারি, ভাবিতে পারি, কিন্তু সে জগতের সহিত প্রত্যক্ষভাবে কোন সম্বন্ধ নাই। যদি তেমন কর্ম্ম করিতে পারি, তাহা হইলে মৃত্যুর পর সেই অপ্রাকৃত চিজ্জগতে যাইতে পারিব। কিন্তু মৃত্যুর পর, এখন নহে। এখন সে জগৎ একটা অনুমান-মাত্র; পুঁথিতে লেখা আছে, প্রাচীনেরা বলেন, তাই মানা যায়। এই সব লোক মনে করে অপ্রাকৃত চিজ্জগৎ বোধ হয় অনেকদূরে কোন একটা জায়গায় আছে, মৃত্যুর পর আমরা সেখানে যাইব। তাহারা মনে করে চিজ্জগৎ—a locality removed from us a long distance to which our spirit departs when detached from the earthly body.

কিন্তু, তাহা নহে। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগৎ মেশামিশি করিয়া (ওতপ্রোতভাবে) এইখানেই রহিয়াছে—The physical is interpenetrated by the spiritual. বাহিরে যে নাই তাহা নহে, কিন্তু সে বাহিরের কথা ভাবিবার কোনই প্রয়োজন নাই, অধিকারও নাই। মানুষকে বল, মানুষ! সেই নিত্য ও অপ্রাকৃত চিজ্জগৎ তোমার ভিতরে রহিয়াছে, সেই জগতের অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য তোমাকে মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে না, চেষ্টা করিলে তুমি এখনই এইখানেই তাহার সত্যতা বুঝিতে পারিবে। সেই জগৎ তোমার ভিতরে রহিয়াছে, তোমার বাহিরে তোমার চারিদিকে তোমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তোমাকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, তোমার উপর সেই জগতের প্রভাব সকল সময়েই ক্রিয়া করিতেছে। মানুষকে বল, তুমি আত্মা, তুমি চৈতন্যস্বরূপ। তুমি যে ইহার পর একদিন অর্থাৎ মৃত্যুর পর গুরুকৃপায় আত্মা বা spirit হইবে তাহা নহে, তুমি চিৎ-স্বরূপ আত্মা, তুমি এখনই এইখানে চিজ্জগতে বাস করিতেছ। এই চিজ্জগৎ দূরে নহে, নিকটে, অতি নিকটে,

অন্তরে ও বাহিরে। এই চিজ্জগৎ কল্পনা নহে, অনুমান নহে, সত্য, তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃত জগৎ অপেক্ষা বেশী সত্য। জীব চিৎ-স্বরূপ, (spirit) কিন্তু তাঁহার শক্তি ও বৃত্তি অর্থাৎ চিদিন্দ্রিয়গুলি (faculties and powers) বিকশিত ও ক্রিয়ান্বিত হয় নাই। তাহার কারণ এই স্থূলদেহ ও ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের গ্রাহ্য এই স্থূল ও প্রাকৃত জড়জগতের বাধা। মানুষ বহির্মুখ হইয়া বাহ্য প্রাকৃত জগৎকে একমাত্র সত্য মনে করে, প্রাকৃত জগতের ভোগে ও চিন্তায় মত্ত হইয়া রহিয়াছে, সেইজন্য অপ্রাকৃত চিজ্জগতে থাকিয়াও সে চিজ্জগতের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে না। মৃত্যুর পর যে একটা খুব অদ্ভুত রকমের ইন্দ্রজাল ঘটিবে তাহা নহে। স্থূল দেহ খসিয়া যাইবে, বাধা বা ভার কমিয়া যাইবে, কিন্তু এখন হইতে যদি চিদিন্দ্রিয়গুলির অনুশীলন না করি, তাহা হইলে বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে না।

যে মানুষের মন কেবলমাত্র বাহ্য-জগতের ব্যাপারসমূহ লইয়া একান্ত ব্যস্ত, চিজ্জগতের ব্যাপার তাহার ধারণার অতীত। মানুষের মন দুইভাগে বিভক্ত। আমাদের শাস্ত্রে বলে সঙ্কল্পাত্মক মন আর বিকল্পাত্মক মন। সঙ্কল্পাত্মক মন চৈতন্যের বা নিত্যের অভিমুখী আর বিকল্পাত্মক মন জড়ের বা অনিত্য প্রপঞ্চের অভিমুখী। আধুনিক 'মনস্তত্ত্ব' বলেন—The supra-liminal mind আর subliminal mind. প্রথম অংশ জড়জগতে কাজ করে আর দ্বিতীয়াংশ চিজ্জগতে কাজ করে।

বর্ত্তমান সময়ে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে এবং বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অনুসন্ধান ও আলোচনা করিতেছেন, অনেক লোকের চিদিন্দ্রিয় বা অপ্রাকৃত দেহ বিকশিত ও ক্রিয়ান্বিত হইতেছে। ইহা অস্বীকার করা যায় না। সূক্ষ্মজগতের দৃশ্যাবলী অনেকে দেখিতে পাইতেছেন, সূক্ষ্মজগতের শব্দ অনেকে শুনিতে পাইতেছেন। স্থূল বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই সব দৃশ্যের ও শব্দের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই যে জগৎ ইহাকে আমরা ইচ্ছা করিয়া সূক্ষ্মজগৎ বলিলাম। এই জগৎ অপ্রাকৃত চিজ্জগৎ বা বৃন্দাবন না হইতে পারে, কিন্তু এই জগতের স্বরূপ বুঝিলে বৃন্দাবনের তত্ত্ব বেশ বুঝিতে পারা যায়, বৃন্দাবন-সম্বন্ধে মনে আর কোন সন্দেহ থাকে না। এই দৃঢ় বিশ্বাস এবং আশা, আজ বড়ই দরকার।

সূক্ষ্মজগতের বা অন্তর্জগতের যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে এবং যাহার সাহায্যে

অপ্রাকৃত চিজ্জগৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা বা মত গঠন করা স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত, তাহা এই। এই নিত্য বা চিন্ময় জগৎ রূপময়, শব্দময় ও জ্ঞানময়। এই জগৎ একটা নির্ব্বিশেষ শূন্য জগৎ নহে—not a region of abstraction. এই জগৎ ভাবময় ও বস্তুময়। আমাদের শাস্ত্র-সমূহে যাহা বলা হইয়াছে আর আধুনিক অনুসন্ধানে যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহার মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য আছে। চিজ্জগতের অভিমুখে আমরা যতই অগ্রসর হইব, ভাব ও বস্তু ততই নিকটবর্ত্তী হইবে। চরমে যেখানে ভাব ও বস্তুর মধ্যে প্রভেদ থাকিবে না, উভয়ে ভিন্ন হইয়াও অভিন্নবৎ প্রতীত হইবে, তাহাই বৃন্দাবন। তাহা হইলে চিজ্জগৎ ভাবময় ও বস্তুময়—It is a world cf subjective as well as objective reality. অন্যভাষায় বলা যায় ইহা একটি চৈতন্যের অবস্থা এবং একটি স্থান—এতদুভয়ের মিলন—a state of consciousness and a place combined in one এখানে 'মন ও বন' এক। আমাদের এই স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে যাহা আছে তাহারা সেই চিজ্জগতের সত্য বস্তুসমূহের আংশিক প্রতিবিম্ব মাত্র।

আমরা এখানে, আমাদের এই পৃথিবীতে একটি ফুল বা একটি মানুষ দেখিতেছি—বেশ সুন্দর, অতি সুন্দর। এই ফুলটি বা দেহটি কি কেবল কতকগুলি জড় পরমাণুর সমষ্টি এবং প্রাণশক্তির দ্বারা বিধৃত। ইহা ছাড়া তাহারা কি আর কিছু নহে? যদি বলেন, আর কিছু নহে, তাহা হইলে এখনও তত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই। নিত্য ও অপ্রাকৃত চিজ্জগতে যাহা আছে, এই ফুল, এই দেহ তাহারই ভৌতিক প্রতিবিম্ব। পার্থিব দেহ চিদ্দেহের একটি ভৌতিক অনুরূপ, ফুলও তাহাই। এই দেহের এবং ফুলের যদি মূলটি দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে সেই অপ্রাকৃত চিজ্জগতে যাইতে হইবে। ইহাই সত্য। The earthly body is a likeness of a spiritual body, and the flower a likeness of a spiritual flower. The originals of both are not to be looked for in the physical but the spiritual.

চিদানন্দ জ্যোতির্ম্ময় সেই নিত্যধামে যদি কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে এখানেও কিছু থাকিত না। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকেই এই কথা বলা হইয়াছে। অতএব সেখানে, সেই অপ্রাকৃত চিজ্জগতে দেহ আছে, নিত্য দেহ, পূর্ণসৌন্দর্য্যময় অপ্রাকৃত মৃত্যুহীন দেহ, নর ও নারীর দেহ আছে। সেখানে ফুল আছে, গিরি, নদী, বন আছে—সকলি

সেথায় পূর্ণ, অমৃত, অক্ষয়। তাহারি ছায়া, আংশিক আভাস আমাদের এই জড়জগৎ। মানুষের চিন্তা কথায় ব্যক্ত হয়, লেখায় ব্যক্ত হয়। কিন্তু, ভাব বা চিন্তা, স্বরূপে যত স্পষ্ট, লেখায় বা কথায় কি তত স্পষ্ট হয়? কিছুতেই তাহা হয় না। ঠিক্ সেইরূপ চিজ্জগতে সকলি নিত্য, সকলি পূর্ণ, সেখানে সকলি ভাবময় বা ভাবঘন। সেই ভাবঘন বস্তুসমূহের আভাস আমাদের এই জগৎ। অতএব আমাদের এই জগৎ মিথ্যা নহে, সত্যাভাস।

সেই চিজ্জগৎ 'বংশীগানামৃতধাম'। গানের শক্তি সকলেই বোঝেন। মানব-প্রকৃতির উচ্চতর অংশ The higher nature of man সঙ্গীতের দ্বারা অতিশয় আশ্চর্য্যরূপে উদ্বুদ্ধ, জাগরিত ও উল্লসিত হইয়া উঠে। সৎ-সঙ্গীতের প্রভাবে মানুষ, এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং সীমাবদ্ধ জগৎ ভুলিয়া যায়। এতই প্রভাব সঙ্গীতের। মানুষকে নাচাইতে, মাতাইতে, গলাইতে, হাসাইতে, কাঁদাইতে সঙ্গীতের তুল্য প্রভাবশালী জিনিস আর কিছুই নাই। ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা—গানাৎ পরতরং নহি। এই সঙ্গীত মানুষকে অনন্তে উধাও করিয়া দেয়।

সঙ্গীত কি? কবিকে জিজ্ঞাসা কর, ঋষিকে জিজ্ঞাসা কর। সেই নিত্য অপ্রাকৃত জগৎই সঙ্গীতের উদ্ভব-স্থান। Music of the spheres গ্রহতারকার গান বলিয়া একটা জিনিষ আছে। কল্পনা নয়, মিথ্যা নয় সত্য, এই সঙ্গীতই সত্য। অনন্তের বুক হইতে গান উঠিতেছে, আমাদের এই মর্ত্ত্য লোকের গান সেই সব গানেরই প্রতিধ্বনি ও অনুকরণ। একজন কলাগুরু, অনন্তপুরুষ, নিত্যধামে বিশ্বকেন্দ্রে বাঁশরি বাজায়, আমাদের যত গান, সবই সেই নিত্য ও পরমগানের ক্ষীণ অনুকরণ। নিত্যজগতের গানের ধ্বনি যাহার কাণে যাহার প্রাণে যতখানি বাজে, তিনি তত বড় কলাবিৎ হইয়া গানের দ্বারা জগৎকে মুগ্ধ করেন।

শুধু যে সঙ্গীতময়, রূপময়, সেই নিত্যধাম, তাহা নহে। ঐ নিত্যধাম প্রেমধাম। ভগবান্ প্রেমরূপ, তিনি প্রেম। প্রতি হৃদয়ে তিনি আছেন বলিয়াই হৃদয় হৃদয় চায়, প্রাণ প্রাণ চায়, মিলন চায়। সেখানে প্রেম নিত্য। দাসে ও প্রভুতে প্রেম, সখায় সখায় প্রেম, মাতাপুত্রে, পিতাপুত্রে প্রেম, ভ্রাতায় ভ্রাতায় প্রেম, পুরুষে নারীতে প্রেম। আমাদের জগতেও প্রেম আছে, আমাদের হৃদয়ও সে-প্রেমে মাতিয়া উঠে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিবেন

তাহাতে যেন সাধ মেটে না, আশা পূর্ণ হয় না। Its tone is lowered as the physical dominates it. কিন্তু সেখানে জড়ের বন্ধন নাই, বাধা নাই, প্রেম সেখানে নিত্য ও পূর্ণ।

রূপ আছে শব্দ আছে প্রেম আছে আরও আছে বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য সামাজিক জীবন; সবই সেখানে আছে, পূর্ণ নিত্যরূপে আছে। অপ্রাকৃত জগৎ যখন এই প্রাকৃত জগৎ হইতে পৃথক্ হইয়া দূরে অবস্থিত নহে, এই প্রাকৃতের সঙ্গে মেশামেশি করিয়া ইহার অন্তরে ও বাহিরে রহিয়াছে, আর ঐ অপ্রাকৃত নিত্যজগৎকে জানিবার জন্য যখন আমাদের ইন্দ্রিয় (faculty) আছে, তখন ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক যে আমরা মধ্যে মধ্যে চিজ্জগতের আভাস পাই। আজকাল Clairvoyance বা সূক্ষ্মদৃষ্টি লইয়া বৈজ্ঞানিক-গণের মধ্যেও আলোচনা হইতেছে, Clairaudience বা সূক্ষ্মশ্রুতির কথা শোনা যাইতেছে, এ সব কি? এসব তো মিথ্যা নহে। এই সব ব্যাপার আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে চিদিন্দ্রিয়ের বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। একটা নবযুগ আসিতেছে বা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে মধ্যে মধ্যে এক একটা সময় আসে যখন এই অপ্রাকৃত চিজ্জগৎ-সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষেরই কোনরূপ সন্দেহ থাকে না, অনেকেই শুনিতে পায়, দেখিতে পায় এবং প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করে, এক জ্যোতির্ম্ময় ও পূর্ণামৃত-ময় জগৎ এইখানেই রহিয়াছে, আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, আমাদিগকে যেন জাগাইবার জন্য সর্ব্বদাই ধাক্কা মারিতেছে। এই সব যুগ মানবজাতির পরম সৌভাগ্যের যুগ—অবতার-পুরুষের আবির্ভাব বা প্রকটলীলার যুগ। চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে আমাদের এই বঙ্গদেশে সেই প্রকারের একটি পরম সৌভাগ্যের যুগ আসিয়াছিল—সেই যুগে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের আবির্ভাব ও লীলা হইয়াছিল। তখন অনেকেই দেখিয়াছিলেন, শুনিয়াছিলেন, সজ্ঞান অবস্থায় অপ্রাকৃত চিজ্জগতে বা নিত্য বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং সেই নিত্য ধামের বার্ত্তা প্রচার করিয়া জগৎকে ধন্য করিয়াছিলেন। মনে হয় সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সেই প্রকারের একটি যুগ আবার আসিতেছে! আমাদিগকে সেই নবযুগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, ইহাই আমাদের সাধনা। নারদ যাহা দেখিয়াছিলেন, অর্জ্জুন যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা রহিয়াছে, এই-খানেই রহিয়াছে, আমাদের চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে, শুধু শুনিলে হইবে না, দেখিতে হইবে, দেখাইতে হইবে।

শান্তি

শোন শোন,—
কে কোথায় গাইচে মধুর স্বরে।
কেমনে বল কোথা পাবগো তাঁরে ॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ,
যাদবায় নমঃ কৃষ্ণমাধবায় নমঃ,
বলে,"—
কে কোথায় গাইচে মধুর স্বরে।
হেলে দুলে পবন, কেনেহে এলে ?
আস-যাও হায়! কতই কৌশলে,
কেন বধিরশ্রবণে প্রবেশিলে ?
দেখাও এবে, কে নাচে "হরিবোলে",
কে কোথায় গাইচে মধুর স্বরে।
দল বেঁধে চাতক, এ নৃত্য কেনে ?
কেন তাকিয়ে থাক, গগন পানে,
মজলি কি, সেই মধুর-গানে,
তাই গাইচ বুঝিরে তাল মানে,
কে কোথায় গাইচে মধুর স্বরে!
জমাট বেধেঁ, করবী-বৃক্ষ-শিরে,
সদা হাস্‌চিস ব'সে কে তোরা রে ?
গোপনে একবার বল আমারে,
এত আনন্দ তোর, কিসের তরে,
কে কোথায় গাইচে মধুর স্বরে।
ধরা তোমার হায়! রোমাঞ্চ কেনে ?
মজ্‌লি কি ? সেই গান শুনে কানে,

তাই গাইচ বুঝিরে তাঁদের সনে,
বিভোর হ'য়ে চাও না কারু পানে,
কে কোথায় গাইচে মধুর স্বরে।
আজ তোর মা, এত উজান কেনে?
মন্দহাসি কি সেই মধুর গানে,
কবে দিবি বল সেই নিত্যধনে,
শান্তি ভিক্ষা দে এই দুঃখী সন্তানে,
কে কোথায় গাইচে মধুর স্বরে।
কে যাও তুমি গো, ঐ সাত্বিক বেশে?
ঘোর জানি জীব-গতির উদ্দেশে,
হাত ধ'রে আমার তোল গো এসে,
সদাই ব'সে থাকি সেই আশ্বাসে,
কে কোথায় গাইচে মধুর স্বরে।
"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
যাদবায় নমঃ কৃষ্ণ মাধবায় নমঃ
বলে",—
কে কোথায় গাইচে মধুর স্বরে।
কেমনে বল কোথা পাব গো তাঁরে॥

উদ্দেশ্য ঃ—

ইং ১২।১১।১৯২৪ সাল বাং ২৬।৭।১৩৩১ সাল প্রায় রাত্রি ২।৪৫ মিনিটের সময় যাই নিদ্রাভঙ্গ, অমনি শুভযোগে প্রকৃত-মধুর-স্বরে শুনলাম,—

"কে কোথায় গাইচে মধুর স্বরে,
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
বলে",—

আহা! কি মধুর স্বর, সেই স্বর যেন এখন আমার কর্ণে বাজ্‌চ্ছে। আর কি সেই শুভদিন আস্‌বে, আর কি মধুর গান শুনতে পাব? ঠাকুর তোমার কৃপার উপর লক্ষ্য ক'রে ব'সে আছি ও থাকৃব; তবে সেও তোমার কৃপার সাপেক্ষ।

ঐ পূর্ব্বোক্ত বীজ হ'তে, শ্রীভগবানের কৃপায় এ শান্তিবৃক্ষ অঙ্কুরিত হইল।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

শ্রীবৃন্দাবন-তত্ত্ব লিখিবার সময় মনে হইল, সেই নিত্য ও অপ্রাকৃত ধামই সঙ্গীতের উদ্ভব-ভূমি। সেই সঙ্গীতের ধ্বনিতেই আমাদের জীবন ও জগৎ গীতময় হইয়াছে। একথাটি লেখার পরেই একজন বন্ধুর সহিত অনেকদিন পরে সৌভাগ্যক্রমে সাক্ষাৎ হইল। তাহার নাম এখন গোপনেই থাকিবে। পরিচয় এই যে অধ্যাত্ম-জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব অনুভব আছে। ধার্ম্মিকের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি সারাজীবন ধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, তাহার ফলে অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার কিছু কিছু স্পষ্ট জ্ঞান জন্মিয়াছে। তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা কিছু কিছু লিখিয়া রাখেন। নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা সাধনার একটি অঙ্গ। তাঁহার খাতা হইতে এই কবিতা ও কবিতাটি কখন কি অবস্থায় লিখিত হইয়াছিল তাহার বিবরণটি, গৃহীত হইল। অনেক সাধকেরই এই প্রকারের অনুভব হয়। অনেক নির্ম্মল চরিত্র শিশু-সম্বন্ধে শোনা গিয়াছে, তাহারা নিত্যজগতের অপ্রাকৃত গান শুনিতে পায়। 'আত্মবিদ্যাবাদী'দের একখানি গ্রন্থ হইতে নিম্নের অংশটুকু উদ্ধৃত হইল। আমাদের দেশের অনেকের নিকটও এই প্রকারের কথা শুনিয়াছি। How many a little, unimaginative child—whose soul is whiter and purer than ours,-has, in the act of dying, told us that he hears the sound of beautiful music! You know, of course, what it means. It means that the spirit-body, of that little unsullied one. even before it has left the earthly tenement, was become so quickend that the spiritual ears have cought the sound of angel-voices, unheard by the organs of physical sense.

পূর্ব্বের কবিতাটি মুদ্রিত হইল, ইহাই দেখাইবার জন্ত যে সঙ্গীতশ্রবণ, রূপদর্শন, বা গন্ধপ্রাপ্তি অর্থাৎ অপ্রাকৃতজগতের সহিত একটা সম্বন্ধে আসার অভিজ্ঞতা বর্ত্তমান সময়েও অনেক পবিত্রচেতা সাধকের হইয়া থাকে।

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়।"

অস্তি, নাস্তি ও ভক্তি

(১) অস্তিত্ববাদ।

কার শক্তি বলে এই বিশ্ব চলে,
নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমে গ্রহগণ ?
কাহার কৃপায় জগত-সেবায়
রবি-শশী করে কিরণ-ক্ষরণ ?
কে ফুটায় ফুল কানন-মাঝারে,
ছুটায় তটিনী মহা পারাবারে,
মেঘে আনে জল, ফুলে পরিমল,
শস্য দিয়ে রাখে জগত-জীবন ?
আছেন সে জন—আছেন সে জন,
সবারি ভিতরে করি দরশন ;
লুকিয়ে লুকিয়ে আড়ালে থাকিয়ে
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করিছে সাধন।

(২) নাস্তিত্ববাদ।

নিজ শক্তি বলে এই বিশ্ব চলে,
নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমে গ্রহগণ।
নিজে কৃপা ক'রে জগতের তরে
রবি-শশী করে কিরণ-ক্ষারণ।
কাননে কুসুম ফুটিছে আপনি,
আপনার মনে ছুটিছে তটিনী,
মেঘে হয় জল, ফুলে পরিমল,
শস্যক্ষেত্রে শস্য—কার্য্য ও কারণ।

নাই তিনি নাই—নাই তিনি নাই,
কোথাও তাঁহারে দেখিতে না পাই,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় স্বভাবেতে হয়,
সে কাজের তরে নাহি কোন জন।

(৩) ভক্তিবাদ।

যেই শক্তি বলে এই বিশ্ব চলে
নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমে গ্রহগণ—
যে মহাকৃপায় জগত-সেবায়
রবি-শশী করে কিরণ-ক্ষরণ,
ফুটে ফুল-দল, ছুটে নদী-জল,
মেঘে বৃষ্টি হয়, ফুলে পরিমল,
নানা-শস্য ভরা হয় বসুন্ধরা,
কি দোষ তাহারে করিতে পূজন?
আছেন সে জন? থাকুন সেজন,
তাঁরে ধরিবারে বৃথা অন্বেষণ!
নাই তিনি নাই? তাতে কি বালাই!
তাঁহাতেই ভরা মম প্রাণ-মন।

শ্রীপ্রসাদকুমার রায় বি, এ,।

চৈতন্যসাধনাশ্রম

৫ম বার্ষিকী মহোৎসব।

শুক্রবার ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫—সায়াহ্ন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে এই গানগুলি গাওয়া হইয়াছিল।

বেদগান।

ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি
নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ ॥
বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব ॥
নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ
নমঃ শিবায় চ ময়স্করায় চ
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

প্রথম সঙ্গীত।

একটি করে' দুখের প্রদীপ
জ্বালিয়ে রেখো প্রিয়তম
ভুলে ভুলেই রইবে না আর
চির-ভোলা হৃদয় মম।
বারে বারেই নয়ন জলে

এসো তোমার ছায়ার তলে
দিও না গো রইতে ভুলে
সুখে সুপ্ত পাষাণ সম ॥

দ্বিতীয় সঙ্গীত।

নিশীথের তারারা সব ডাক্‌চে আমায় জাগ্‌লিনে—জাগ্‌লিনে
মানব-জনম বিফল হল জাগ্‌লিনে—জাগ্‌লিনে।
ফুট্‌লো কুসুম—গাইল পাখী সবুজ শোভায় সাজ্‌লো শাখী
দখিণ পবন বইল ব্যাকুল জাগ্‌লিনে—জাগ্‌লিনে।
অন্তরেতে গান ছিল তোর বৃথায় গেল—বৃথায় গেল
প্রাণের বীণায় তান ছিল তোর সে তান নাহি সঞ্চারিল।
ওরে মূঢ় শয়ন ছেড়ে দেখ রে চেয়ে নয়ন মেলে
মহোৎসবে ভরা ভুবন জাগ্‌লিনে—জাগ্‌লিনে ॥

বক্তৃতার পর—

তৃতীয় সঙ্গীত।

রিক্ত করিয়া লবে গো আমায়
তোমার সুধায় ভরিবে।
বারে বারে এই ব্যথা দিয়ে দিয়ে
সকল হৃদয় হরিবে।

তাই তো গো তুমি ধন জন মান,
সব হ'তে কাড়ি' লইলে এ প্রাণ,
অশ্রু-সলিলে ধু'লে দুনয়ান
আপন যে মোরে করিবে ॥
তাই ভাল মোর তাই ভাল,
নয়নের জল,— এই ভাল।
তব সনে যদি দরশন মিলে
বিষজ্বালা আরো আরো ঢালো।
দাও দাও মোরে বেদনার দান
বেদনার রঙে রাঙা হোক্ প্রাণ
বক্ষ-শোণিতে বাহিরাক্ গান
সে হার কণ্ঠে পরিবে ॥

চতুর্থ সঙ্গীত।

রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার
যাবার আগে।
তোমার আপন রাগে
তোমার গোপন রাগে
তোমার তরুণ হাসির অরুণ রাগে
অশ্রুজলের করুণ রাগে।
রং যেন মোর মর্ম্মে লাগে
আমার সকল কর্ম্মে লাগে
সন্ধ্যা-দীপের আগায় লাগে
গভীর রাতের জাগায় লাগে।

যাবার পথে যাও গো আমার
জাগিয়ে দিয়ে
রক্তে তোমার চরণ দোলা
লাগিয়ে দিয়ে।
আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে
পাষাণ গুহার কক্ষে নিঝর ধারা জাগে
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে
বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে
তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও
যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে
কাঁদন-বাঁধন ভাসিয়ে দিয়ে॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি, এল, কর্ত্তৃক
রচিত ও গীত।

বর্ষা বিরহ

সখি কই আমার বাঞ্ছিত ত' আজও এল না। নিদাঘের তাপে শুষ্ক মরুর মতই আমার প্রাণও যে তারই বিরহে তৃষিত হ'য়ে রয়েছে। আমার শ্রবণ যে তারই অমিয় মধুর সম্বোধনের তরে তৃষিত। আমার চোখজোড়াও যে সেই কাজলপড়া চঞ্চল আঁখি-দুটীর জন্যই ব্যাকুল। আমার সমস্ত অঙ্গ যে তার প্রেমালিঙ্গনের স্মৃতিতে অবশ।

গ্রীষ্মের পরে পূবের হাওয়া এসে তার শীতল পরশে বৃক্ষলতার তাপ হরণ ক'রেছে। কিন্তু সখি আমার দয়িত কেন আজ এখনও এল না? আমার বিরহ-ব্যথিত হিয়ার তাপে আমার আঁখির জলও সে আজ শুষ্ক। সে তাপ পূবের শীতল হাওয়ায় আরও বেড়েই উঠেছে। সখি কি করি বল্‌ত? আমার উপায় কি? ঐ মেঘ আকাশে,—

বর্ষায় নবীন মেঘের অপরূপ শোভা। শুষ্ক তরু আজ মঞ্জরিত, প্রকৃতির মাঝে চিরদিনের বাঞ্ছিতকে বরণ করবার জন্য সাড়া পড়ে গেছে। চারিদিকে আনন্দের হিল্লোল উঠেছে। আর আমি যে আগে হ'তে কুঞ্জ সাজিয়ে বসে আছি, আমার কি সবই বৃথা হ'ল? রে আষাঢ়ের নবজলধর, তুই এরূপ কোথা হ'তে পেলি? এ যে আমার শ্যামের রূপ, দেখিত আমার প্রাণের মাঝের সেই ছবিখানির সঙ্গে মিলায়ে। সেই তো,—সেই রূপই তো! সখি সেই চতুর আজ কি ঐ মেঘের মাঝে লুকিয়েছে? চতুর! তুমি লুকালে কি হবে? তোমার অঙ্গপ্রভা যে ফুটে উঠেছে স্বচ্ছ মেঘরাশির সারা অঙ্গে। সুন্দরের বর্ণলালিমায়, সেও যে আজ অপরূপ সুন্দর হ'য়ে উঠেছে! সখি বরণের আয়োজন কর। এসেছে আমার দয়িত; আমার প্রাণপতি আমার শ্যামসুন্দর আজ এসেছে। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যে আজ শিথিল হোল, সখি, তুই আমার জন্য ব্যস্ত কেন? সমস্ত কুঞ্জে সাড়া জাগিয়ে দে, দেখিস্ যেন এসে সে কুঞ্জের দ্বার খোলা পায়। দেখিস্ যেন সে অভিমানে ফিরে না যায়। তোর পায়ে ধরি সখি, তুই তার অভ্যর্থনার আয়োজন কর্। দেখিস্ দেখিস্ যেন সে অভিনন্দনের ত্রুটিতে ফিরে না যায়।

মেঘের মধ্যে ওকি আশ্চর্য্য শব্দ? বুঝেছি বাসুদেব আজ তুমি মথুরার রাজা, তাই তোমার রথচক্রের অদ্ভুত ঘর্ঘরধ্বনি চারিদিক প্রতিধ্বনিত ক'রে তুলেছে। কিন্তু রাজা, মনে পড়ে কি সে পুরাণো দিনের কথা? যখন এই যমুনা পুলিনে কঙ্করময় বালুতটে ঐ কোমল রাঙ্গাচরণ লয়ে গোপালকের সঙ্গে নৃত্য ক'রেছ, কত ব্যথা ঐ চরণেই না বাজ্‌ত? আর আজ? তুমি আজ রাজা। ওগো মথুরার রাজা! সে লীলা কি আজ মনে পড়ে, আমি যখন তোমার ঐ ক্ষতবিক্ষত চরণ দেখে অশ্রুবর্ষণ ক'রে ধুইয়ে দিতাম? তখন তোমার সেই চঞ্চল চাহনি আমাকে কিরূপ লজ্জিত না ক'রে তুল্‌ত। আজ এস চতুর, আজ দেখব, ধরে তোমার ঐ রাঙ্গাচরণ,—সেই দিনের সেই অশ্রুর স্নান, আর আজ এই রাজ-পাদুকা, কে তোমায় বেশী সুখ দিয়েছে? সখি, তোর আয়োজন কি শেষ হোল? ঐ দেখ তার তরল হাস্য শত শত ধারে সুধা বর্ষণ ক'রছে। ঐ দেখ তার চমক চাহনি! ও বিদ্যুৎপ্রভা নয় সখি, ও তারই সেই রাগানন আঁখির রাগপ্রভা। হয়ত বা ঐ শ্যামসুন্দরের পীতবাসের আচলখানি। হয়ত ঐ সেই রাজা চরণের উজ্জল নখগুলি। ঐ দেখ সখি কুঞ্জদ্বারে ময়ুর ময়ুরী নৃত্য করছে, পুলক উচ্ছ্বাসে

তারা পুচ্ছ মেলে নৃত্য করছে। আমার শ্যামের শিখিচূড়া কি খসে প'ড়েছে, নয়ত অত শোভা হ'ল কিসে। কিংবা হয়ত ময়ূর নয়, আমার শ্যামই ঐখানেই লুকিয়ে নিজ চাতুর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে নৃত্য করছে, তারই শিখিচূড়া তাই দুলে দুলে উঠ্‌ছে। সখি ওঠ্, সখি দেখ গিয়ে নিশ্চয়ই শ্যাম এসে ঐ খানে লুকিয়েছে। চতুর, তুমি শেষে এই রকম লুকোচুরী করে আর কতক্ষণ লুকিয়ে থাক্‌বে? ওই শিখিচূড়া শুদ্ধ যদি লুকাতে পারতে তবে বুঝতাম বাহাদুরি। এস হে কৌশলি, তোমার কৌশলকলা সবই বুঝা গেছে। আর কেন? এস আমার হৃদয়-সিংহাসনে, এসে বসে দেখ হৃদয়রাজ, তোমার মথুরার রাজত্ব আর আমার এ হৃদয়ের রাজত্ব কোনটা মধুর! যমুনার জলে কালো ছায়া প'ড়েছে, তারই অঙ্গরূপরাশি পুলকে হিল্লোলিত হ'য়েছে। ঐ যে তার অধর কমল, ঐ যে তার চক্ষুপল্লব! নীল লাল বর্ণের পদ্মবনের মাঝে সখি তার অধর কমল ওই যে মিশিয়ে রয়েছে। চতুর তুমি কি ভেবেছ ওই পদ্মবনে তোমার বেশী সুখ? জিজ্ঞাসা কর ওই অধর-কমলকে, সেই বৃন্দাবনলীলায় যে সুখ সে পেয়েছিল, তার আস্বাদন কি ওই পদ্ম-কলিতে আছে? জিজ্ঞাসা কর ত, যে-রূপরাশি তোমার পদ্মপলাশলোচন স্থির হ'য়ে পান ক'রেছিল তার আস্বাদন কি ওই নীলকমলদলে পাবে? চতুর, তোমার চাতুরী রাখ; নিঠুর, একবার সদয় হও। এস, তোমার এ নিঠুর খেলা সম্বরণ ক'রে, আমার প্রেমিক, আমার একমাত্র পতি, এইবার এ কুঞ্জে এসে বিশ্রাম কর।

সখি, সত্যই কি শ্যাম এসেছে? ঐ যে তাঁর বাশী যেন শুনলাম, আমার মনের ভুল নয়ত? সত্যই কি আমার তৃষিত তাপিত প্রাণের ব্যথা তার চরণে গিয়ে পৌঁছিবে!

সত্যই কি সখি এসেছে? তুই ঠিক দেখেছিস্ তো। সেই শ্যামল মনোহর রূপ, সেই পীতবাস সেই শিখিচূড়া, সেই হাসি, সেই বাঁশি, সেই চাহনি, তুই ঠিক দেখেছিস্ তো? আমার প্রাণে একি অদ্ভুত অনুভূতি জাগল সখি?

একি বিপুল আনন্দ উচ্ছ্বাস। সখি, আজ গোবিন্দ কি সত্যই আমার মন্দিরে এসেছে? বল বল সখি আবার তুই বল তাকে কেমন দেখ্‌লি, সে কি বল্‌লে? আর একবার বল—

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।

শ্রীসুধীরকুমার সিংহ

পথ ও প্রশ্ন

ধর্ম্ম কি, ধর্ম্মজীবন কি, আত্মা কি, অধ্যাত্ম কি, অধ্যাত্মজীবন কি? শ্রীমদ্ভগবদগীতার অষ্টম অধ্যায়ে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে এবং গীতার অষ্টম অধ্যায়ে ও অন্যান্য অধ্যায়ে তাহার উত্তরও দেওয়া হইয়াছে।

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥

হে পুরুষোত্তম, সেই ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কর্ম্ম কি? অধিভূত কাহাকে বলে, অধিদৈব কাহাকে বলে? অধিযজ্ঞ কি? এই দেহে কোথায় কিরূপে তাহা অবস্থিত? মৃত্যুকালে সমাহিতচিত্ত পুরুষগণ কর্ত্তৃক কি প্রকারে তুমি জ্ঞানগম্য হও?' সর্ব্বসমেত এই সাতটি প্রশ্ন। এই সাতটি প্রশ্নের সদুত্তরের দ্বারা ধর্ম্মজীবনসম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহা পাওয়া যাইবে। এই প্রশ্নেরও শেষ নাই, উত্তরেরও শেষ নাই। প্রত্যেক যুগ এই প্রশ্ন করিতেছে, যুগোপযোগী উত্তরও সংগ্রহ করিতেছে। প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, নিজের মতো একটা উত্তরও পাইতেছে। প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক সমাজ প্রত্যেক যুগে নব নব আকারে এই প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু, শেষ নাই, প্রশ্নেরও শেষ নাই, উত্তরেরও শেষ নাই। তাই আমরাও জিজ্ঞাসা করিতেছি, ধর্ম্ম কি, ধর্ম্মজীবন কি, আত্মা কি, অধ্যাত্ম কি, অধ্যাত্মজীবন কি?

চিন্তাহীন ও অজ্ঞ, সাধারণ লোক, প্রাকৃত জনসাধারণ, বেদ তাহাদের 'পশু' বলিয়াছেন। তাহারা যাহা বোঝে বা বলে, তাহা নহে। ধর্ম্মজীবন বা অধ্যাত্মজীবন বলিয়া বাজারে যাহা চলিতেছে, তাহা নহে। প্রকৃত ধর্ম্ম কি? প্রকৃত ধর্ম্মজীবন কি? এই প্রশ্নের সদুত্তর কোথায় পাওয়া যাইবে, কি প্রকারে পাওয়া যাইবে, কে ইহার মীমাংসা করিয়া দিবে?

গীতায় উত্তর আছে, বেদে উপনিষদে ভাগবতে, আরও অনেক শাস্ত্রে অনেক গ্রন্থে উত্তর আছে। সেই সব উত্তর জানা দরকার। কিন্তু, তাহাতেই কাজ হইবে না, সাহায্য হইবে। প্রত্যেক যুগকে প্রত্যেক মানুষকে জিজ্ঞাসু হইতে হইবে, নিজে নিজে মীমাংসা করিতে হইবে। সেই জন্যই এই 'জিজ্ঞাসা'—ধর্ম্ম কি, প্রকৃত ধর্ম্ম কি, এ-যুগের ধর্ম্ম কি, আমার ও আমাদের এই বর্ত্তমানের প্রকৃত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবন কি?

ভগবদ্গীতার যে মীমাংসা, তাহাতে পাওয়া যায় চারিটি উপায়, মীমাংসার চারিটি উপায়। এই চারিটি উপায় ছাড়া আর কোন নূতন উপায় পাওয়া যায় নাই। শাস্ত্র (১), স্বানুভব (২), যুক্তি (৩), বিদ্বদনুভূতি বা মহাজনগণের অভিজ্ঞতা (৪)। এই চারিটি উপায় বা পদ্ধতির সাহায্যে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, ধর্ম্ম কি, ধর্ম্মজীবন কি? কাজটা যে খুব সহজ, তাহা নহে, কিন্তু দুরূহ বা অতিশয় কঠিনও নহে, অসম্ভব তো নহেই। তবে ইচ্ছা চাই, চেষ্টা চাই। প্রথমেই দেখিতে হইবে, একটা খুব বড় অসুবিধা বা বাধা রহিয়াছে। আমাদের মনের ভিতর অনেক রকমের ধারণা বা সংস্কার পূর্ব্ব হইতে জমিয়া রহিয়াছে, মন নির্ম্মল নহে, স্বচ্ছ নহে। ভ্রান্ত হউক আর অভ্রান্ত হউক, সু হউক আর কু হউক, পূর্ব্বপোষিত ধারণাসমূহ হইতে মনকে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত করা প্রারম্ভেই প্রয়োজন। মনে করিতে হইবে, আমি কিছুই জানি না, চিত্তকে একখানি সাদা কাগজের মতো করিতে হইবে। তাহার পর আর একটি জিনিষ দরকার। একজন লোককে ভদ্রলোক বলিলেই আমরা বুঝি তাঁহার চরিত্রে কতকগুলি নৈতিক সদ্‌গুণ আছে। এই সদ্‌গুণগুলি থাকা দরকার, সেগুলি রক্ষা করা দরকার, সেই সদ্‌গুণগুলি যাহাতে আরও উজ্জ্বল হয়, আরও সুন্দর হয়, আরও প্রবল হয়, সেজন্য চেষ্টা থাকা দরকার। নিজের অন্তর্জীবনের প্রতি সুপ্রখর দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। যাহা করিতেছি, যাহা ভাবিতেছি, ধীরচিত্তে তাহার প্রত্যেকটিকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, আমার জীবনে ত্রুটি ও বিচ্যুতি কোথায়, অপরাধ কোথায়? কেনই বা সেই সব অপরাধ, তাহাও চিন্তা করিয়া বুঝিতে হইবে। এই সব অপরাধের জন্য অনুতাপ করিতে হইবে, এই সব অপরাধ যাহাতে আর না হয় সেজন্য প্রার্থনা করিতে হইবে, সেই সব অপরাধ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। মহৎ হওয়ার জন্য, বৃহৎ হওয়ার জন্য, উদার ও উত্তম হওয়ার জন্য অন্তরে সর্ব্বদাই সুতীব্র ইচ্ছা থাকা চাই। ধর্ম্মজীবন লাভ করার, সদ্ধর্ম্মের আশ্রয়ে অমৃত ও অভয় লাভ করিবার ইহাই একমাত্র পথ ও উপায়। ইহা ছাড়া আর অন্য পথ নাই। এই পথেই মহাজনগণ গিয়াছেন, তাঁহাদের পদাঙ্কচিহ্নে এই পথ অলঙ্কৃত। এই পথে আমাদিগকেও যাইতে হইবে, আর অন্য পথ নাই।

ভ্রান্ত ও অন্ধ কুসংস্কার ধর্ম্ম নহে। কতকগুলি মত বা কথা মাথা পাতিয়া মানিয়া লওয়াই ধর্ম্ম নহে। কোন ব্যক্তির বা দলের চরণে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি উৎসর্গ করা ধর্ম্ম নহে। তামসিক জড়তা, কপটতা, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা ধর্ম্ম নহে। সত্যের নামই ধর্ম্ম, মিথ্যার নামই অধর্ম্ম। ইহা আমরা জানি ও মানি। কিন্তু অনেক দেখিয়া শুনিয়া, উত্তমরূপে বিচার ও বিবেচনা করিয়া পৃথিবীর অনেক ভাল লোক বলিতেছেন, কুসংস্কারই ধর্ম্ম, জড়তা ও কপটতাই ধর্ম্ম, আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনাই ধর্ম্ম, স্বাধীন চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া মানস জীবনে ও কর্ম্ম-

জীবনে ক্রীতদাস হওয়াই ধর্ম। তাঁহারা বলেন, ধর্মের যাবতীয় ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান ধ্বংশ কর, ধর্মের ভাণ ও অনুষ্ঠান বন্ধ কর, নতুবা মঙ্গল নাই জগতের, মুক্তি নাই শান্তি নাই মানবের। এই যে একটা ধারণা ও সিদ্ধান্ত জাগিয়া উঠিয়াছে, ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। ধর্মাচার্য্যগণকে, ধর্মপ্রিয় ও ধর্মবিশ্বাসী প্রত্যেক নরনারীকে ইহা দেখিতে হইবে, বুঝিতে হইবে এবং শুনিয়া দেখিয়া বুঝিয়া সমবেতভাবে ইহার উত্তর দিতে হইবে। তর্ক করিয়া, বক্তৃতা করিয়া, বই লিখিয়া উত্তর দিলে বিশেষ কিছু হইবে না, জীবনের কার্য্যের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে ও দলবদ্ধভাবে উত্তর দিতে হইবে।

আত্মা সত্য, ঈশ্বর সত্য, ধর্ম্ম সত্য, ধর্ম্মজীবন সত্য। কেবল সত্য বলিলেই হইল না, এইগুলিই একমাত্র সত্য বা পারমার্থিক সত্য। অন্য যাহা কিছু সত্য, তাহা বা তাহারা সত্য; কিন্তু এই আত্মার জন্য সত্য, আত্মার দ্বারা সত্য; এই ঈশ্বর বা ধর্মের জন্য সত্য; এই ঈশ্বর বা ধর্মের দ্বারা সত্য। এই আত্মা, ঈশ্বর, ধর্ম্ম বা ধর্ম্মজীবন, কেবল যে সত্য, তাহা নহে, ইহা শিব বা মঙ্গল, একমাত্র মঙ্গল, সার্ব্বজনীন নিত্য মঙ্গল, পরম ও চরম মঙ্গল। এই আত্মা, ঈশ্বর, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবন যেমন সত্য ও শিব, তেমনই সুন্দর, একমাত্র সুন্দর, নিত্য সুন্দর, চরম ও পরম সুন্দর। এই কথাগুলি ধর্ম্মশাস্ত্রের বা ধর্ম্মসাধনার মূলকথা বা গোড়ার কথা। বিশ্ববাসী নরনারী সকলকে, যাহারা অবিশ্বাসী নাস্তিক ও ধর্ম্মবিদ্বেষী, তাহাদের সকলকে এই কথাগুলি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে। পূর্ব্বকালে ধর্ম্মে ধর্ম্মে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে অনেক বিরোধ হইয়াছে, এখনও তাহার অবসান হয় নাই। এখন আর এই প্রকারে বিরোধ করিলে চলিবে না। আজ বিরোধ, বিশ্বাসে ও অবিশ্বাসে, আস্তিকতায় ও নাস্তিকতায়। সুতরাং যাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাসী আস্তিক, ধর্ম্মের যে-সব প্রাথমিক কথা বলা হইল, সেই কথাগুলি যাঁহারা সত্য সত্য মানেন, তদনুসারে জীবনের পথে চলেন বা চলিতে চাহেন, আর, আশা করেনও ইচ্ছা করেন, অন্য সকলেও তাঁহাদেরই মতো এই কথাগুলি জানিয়া বুঝিয়া ও মানিয়া জীবনের পথে চলুক, তাঁহারা যে ধর্ম্মের বা যে-সম্প্রদায়েরই লোক হউন, আজ দলের কথা বা দলাদলির কথা ভুলিয়া তাঁহাদিগকে মিলিত হইতে হইবে। আজ মিলনের দিন আসিয়াছে, তুলনামূলক আলোচনার দিন আসিয়াছে, সংস্কার ও সংশোধনের দিন আসিয়াছে।

ভ্রান্ত ও অন্ধ কুসংস্কারই ধর্ম্ম নহে, তামসিক জড়তা, কপটতা, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত আত্ম-বঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা ধর্ম্ম নহে। কিন্তু, ধর্ম্মের নামে মানব সমাজে অনেকদিন ধরিয়া এইসব জিনিস যে অবাধে ও নির্ব্বিবাদে চলিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সূক্ষ্ম ও সুতীক্ষ্ণ স্বানুভব বা আত্মবোধই ধর্ম্মের মূল ভিত্তি, আর সেই বোধের দ্বারা চালিত, শাসিত ও গঠিত জীবনই ধর্ম্মজীবন।

ধর্ম্মও বৈজ্ঞানিক, সম্পূর্ণরূপে ও যথার্থরূপে বৈজ্ঞানিক। বর্ত্তমান যুগকে বিজ্ঞানের যুগ বলা হয়। যে-বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসারের জন্য বর্ত্তমান যুগের নাম হইয়াছে বৈজ্ঞানিক, সেই বিজ্ঞান

জড়বিজ্ঞান—বাহ্যপ্রমাণ ও বস্তুপরীক্ষার বিজ্ঞান। বর্ত্তমান যুগ এই জড়বিজ্ঞানের বা বস্তুবিজ্ঞানের বিজয়-অভিযানের যুগ, জয়জয়কারের যুগ। জড়বিজ্ঞান বা বস্তুবিজ্ঞান ক্রমিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইতে যে-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে স্বভাবতঃ ইহাই সকলের মনে হইতেছে যে আর এক জগতের আর এক প্রকারের বিজ্ঞান মানবসমাজে প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই বিজ্ঞানের পরিচয় লওয়া আবশ্যক। জড়বিজ্ঞান ও বস্তুবিজ্ঞান, বাহ্যপ্রমাণ ও বস্তু পরীক্ষার বিজ্ঞান, আর এই নূতন বিজ্ঞান, যাহা আসিতেছে, তাহা অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মদর্শনের বিজ্ঞান। কিন্তু, ইহাও বিজ্ঞান। বিজ্ঞান কথার অর্থ, পরীক্ষিত সঠিক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবন যে-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ইহা সেই বিজ্ঞান। ইহার প্রাচীন নাম অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা। এই বিজ্ঞানই বেদান্ত—শ্রীমদ্ভাগবত যাহার অকৃত্রিম ভাষ্য। এই বিজ্ঞান চৈতন্য-বিজ্ঞান, ব্রহ্মবিজ্ঞান বা আত্মবিজ্ঞান। ইহা ভ্রান্ত কুসংস্কার সমূহের সমষ্টি নহে, সূক্ষ্ম ও সুতীক্ষ্ণ আত্মবোধের দ্বারা ইহা আবিষ্কৃত, পরীক্ষিত ও আলোচিত।

জড়বিজ্ঞান চাই, খুব ভাল করিয়াই চাই। বর্ত্তমান যুগের তিনি বাস্তুপুরুষ ও আধারশক্তি। অধ্যাত্মবিজ্ঞানও চাই, আরও ভাল করিয়াই চাই। আর চাই, এই উভয়বিধ বিজ্ঞানের মিলন, মৈত্রী ও একীকরণ। এই উভয়বিধ বিজ্ঞানের মিলনেই প্রাচীনে ও নবীনে, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে মিলন হইবে। ইহাই নবযুগের সাধনা। জড়বিজ্ঞান বা বস্তুবিজ্ঞানকে যদি বিজ্ঞান বলেন, তাহা হইলে এই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান বা চৈতন্যবিজ্ঞানের নাম হইবে 'প্রজ্ঞান'। বিজ্ঞানও চাই, প্রজ্ঞানও চাই। প্রতীচ্যের বিপদের কারণ প্রজ্ঞান-হীন বিজ্ঞান, আর প্রাচ্যের বিপদের কারণ বিজ্ঞানহীন প্রজ্ঞান। বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের মিলন ও মৈত্রী, প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের, নিখিল মানবের, জগতের সকলের, সমগ্র মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ-প্রসূ হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শাস্ত্র, স্বানুভব, যুক্তি ও বিদ্বদনুভূতি, এই চারিটি উপায় বা পদ্ধতির সাহায্যে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবনের প্রকৃত তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই চারিটি উপায় যে আমাদের হাতে আছে, তাহা নহে। এই উপায়গুলি আপাততঃ হস্তচ্যুত বলিলেও হয়। কোন সময়ে এগুলি মানুষের হাতে ছিল। সকলের হাতে না থাকুক, সমাজের যাঁহারা পরিচালক ছিলেন, তাঁহাদের হাতে ছিল। সে যুগে মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, সমাজও জটিল হয় নাই, জীবনও বিকৃত হয় নাই। এখন এই উপায়গুলি বা অস্ত্রগুলি চেষ্টা করিয়া অন্বেষণ করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহাদের প্রয়োগ শিখিতে হইবে, অপরকে শিখাইতে হইবে। সেই উপায়গুলি কেন হস্তচ্যুত হইল, তাহাও বুঝিতে হইবে।

দেবাসুরের সংগ্রাম সত্য। চরমে যাহাই হউক, মধ্যে মধ্যে অসুরের যে জয় হয়, দেবতা স্বর্গভ্রষ্ট হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। দানবের বা অসুরের মোহিনী মায়া সত্য। এই অসুর বা দানবের

দ্বারাই এই উপায় বা অস্ত্রগুলি হস্তচ্যুত হইয়াছে। দোষ কেবল অসুরের নহে, দেবতাও দোষী। এখন আমাদের অবস্থা কি, এই উপায়গুলির অবস্থা কি, দেখা যাউক।

প্রথম উপায় 'শাস্ত্র'। শাস্ত্র কি? অনেক পুঁথি, অনেক শ্লোক, অনেক বচন, আবার একই পুঁথির, একই শ্লোকের, একই বচনের অনেক প্রকার অর্থ প্রচলিত রহিয়াছে। এই সব পুঁথি, শ্লোক, বচন ও ব্যাখ্যার মধ্যে কেবল যে মিল নাই তাহা নহে, সুস্পষ্ট বিরোধ আছে। অতএব, শাস্ত্র বলিয়া কোন্‌টিকে মানিব আর কোন্‌টিকে মানিব না। ইহাই প্রথম সমস্যা।

দ্বিতীয় উপায় 'স্বানুভব'। প্রত্যেক মানুষেরই যাহা হউক একটা স্বানুভব আছে। কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই স্বানুভব কি বিশুদ্ধ? রাগদ্বেষাদির বশীভূত প্রাকৃত মানবেরও একটা নিজের অনুভব বা 'স্বানুভব' আছে। সেই অনুভবের আলোকের অনুসরণ কি নিরাপদ? আবার, অনেক সময়ে আমি মনে করি. আমার রাগদ্বেষ কাম হিংসা প্রভৃতি নাই। কিন্তু, চিত্তের গুপ্তকক্ষে (মগ্ন চৈতন্যে, In the sub-conscious or unconcious) এই সব রিপু অতিশয় গোপনে রহিয়াছে, আমার অজ্ঞাতসারে তাহারা আমার মানসজীবন, আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, কল্পনা, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, চেষ্টা, উদ্যম প্রভৃতিকে চালাইতেছে, আমি তাহাদের ধরিতে পারি না। আমার অবস্থা যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে আমার স্বানুভবের যে-আলোক তাহার অনুসরণ কি নিরাপদ ও শ্রেয়স্কর? ইহাই দ্বিতীয় সমস্যা।

তৃতীয় উপায় 'যুক্তি'। 'যুক্তিশাস্ত্র' খুবই বড় জিনিস ও ভালজিনিস। স্বানুভব ও যুক্তি, এই দুইটি উপায়ের প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা আছে। প্রাচীনেরা বলিতেন, বেদশাস্ত্রের অবিরোধী যুক্তি বা তর্ক প্রয়োজন। সে-কথা সকলে মানিতে প্রস্তুত নহে। কারণ, বেদশাস্ত্র কি, তাহাই বুঝিতে পারা যায় না, নির্দ্ধারণ করা যায় না। যাহা হউক, যুক্তিশাস্ত্রের একটা শেষ নাই। প্রাচীন-পন্থী অনেক লোক মনে করেন, যুক্তিশাস্ত্রের শেষ আছে, আর শেষ কথা আমাদের জানা আছে। কিন্তু, ইহা তাঁহাদের ভুল, মারাত্মক ও অমার্জ্জনীয় ভুল। একশত বৎসর পূর্ব্বে যে-প্রমাণ অকাট্য ও সন্তোষজনক ছিল, এখন সে-প্রমাণ উপহাসাস্পদ হইয়াছে। আজ, যে-প্রমাণ প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া ও সিদ্ধান্তের অনুকূল, দশ বৎসর পরেই তাহা অশ্রদ্ধেয় হইবে, ইহা দেখা যাইতেছে। অতএব, উপায় কি? ইহাই তৃতীয় সমস্যা।

চতুর্থ উপায় 'বিদ্বদনুভূতি' বা মহাজনগণের অভিজ্ঞতা। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বড় জিনিস ও নিরাপদ জিনিস। কিন্তু, মহাজন কে? সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ ও মতভেদ, একই সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন শাখায় ও উপশাখায় বিরোধ ও মতভেদ, দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিরোধ ও মতভেদ। একজন যাহাকে মহাজন বলে, আর একজন তাহাকে যে কেবল মহাজন বলে না তাহা

নহে, দুর্জ্জন ও অসজ্জন বলে। একদল লোক যাহাকে মহাজন বলিয়া পূজা করে, আর একদল তাহাকে দুর্জ্জন ও অসজ্জন বলিয়া তাহার নিন্দা করে। 'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা ?' যদি কোন প্রকারে মহাজনও নির্দ্ধারণ হয়, সেই মহাজনের অভিজ্ঞতা বা উপদেশও যদি সুনির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলেও সেই অভিজ্ঞতা বা উপদেশের ব্যাখ্যা বা অর্থ লইয়া দ্বন্দ্ব, মতভেদ ও দলাদলি। ইহাই চতুর্থ সমস্যা।

এখন উপায় কি, মীমাংসা কোথায় ? এই পথ ও সমস্যা সম্বন্ধে কেহ কাহাকেও মীমাংসা দিতে পারিবে না, অন্যের মীমাংসায় এ-যুগে উপকারও হইবে না। নিজে নিজে ইহার মীমাংসা করিতে হইবে। প্রাথমিক সমস্যাগুলির মীমাংসা হইলে মানুষ অনায়াসেই সত্য-ধর্ম্মের পরিচয় পাইবে। অতএব তপস্যা কর, আত্মশক্তির অনুশীলন কর। ভাবিও না, কোন একজন লোক, বা কোন একটা দল যাহা বলিয়া দিবে, তাহাই মুখস্থ করিয়া ভবনদীর পরীক্ষাঘাটে অনায়াসে পার হইয়া যাইবে। এত সস্তায় কিস্তিমাতের আশা করিয়া বঞ্চিত হইও না, অবনমিত হইও না। সুলভে বা অনায়াসে কিছু হইবার উপায় নাই। ধর্ম্মপথের এই প্রথম অংশটি কঠিন। এই অংশ-সম্বন্ধেই গীতা বলিয়াছেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

'নিজেকে নিজের দ্বারা উদ্ধার কর, নিজেকে অবসন্ন করিও না, নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের শত্রু।' এই স্থান বা অবস্থা সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে 'এ-বড় কঠিন ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই।' ভয় পাইও না, তুমি পান্থ! অভীঃ—অভয়ের সাধনা কর। বলহীন হইও না, সুদূর তীর্থের যাত্রি! আঁধার পিচ্ছিল পথ, কণ্টকিত অতিশয়, তবু বলি, নাই ভয়, নাই ভয়। একেবারে আলো নাই, তাহা নহে। একটি মাত্র তারকা সেথায় মিটিমিটি জ্বলিতেছে, নিশার আঁধার ক্রমে তরল হইয়া আসিতেছে, প্রাচীর মুখ ধূসর হইয়া আসিতেছে। ঐ দেখা যায় শুক তারা, প্রাচীর ললাটে জ্বলিতেছে। সেই নক্ষত্রের আলোকে এই পথটুকু সন্তর্পণে অতিক্রম করিলেই দেখিবে নব উষারাণী হেমভূষা পরিয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

ঐ যে তারকা আর তারকার আলো, যদি মনে কর উহা বাহিরের, বঞ্চিত হইবে, তুমি পথভ্রষ্ট হইবে। বাহিরের ঐ যে তারকা আর তারকার আলো, পথিক, বুঝিতে চেষ্টা কর, উহা তোমারই চিরন্তর অন্তরের ধন। তোমারই আত্মার অন্তর্য্যামীরূপে তোমারই ভিতরে সারানিশি গোপনে গহনে যিনি ছিলেন, তিনিই জাগিয়াছেন, তোমার অন্তরে ও বাহিরে। *

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মহাপাত্র

---

* মহাপাত্র মহাশয়ের একখানি উপাদেয় গ্রন্থ "সনাতন ধর্ম্ম ও গীতা" যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এই প্রবন্ধটি তাহার প্রথম অধ্যায়। বী, সং।

মন্তব্য ও সংবাদ

২৭। শরৎকুমার—আলোচনা

বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ দেশকর্ম্মী শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় সম্বন্ধে আমরা এই পত্রিকায় কিছু লিখিয়াছিলাম। সেই লেখাটি বাহির হওয়ার পর ব্রহ্মদেশের 'মেমিও' সহর হইতে আমাদের একজন সুপরিচিত ও শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু একখানি পত্র লিখিয়াছেন। বোধ হয়, নাম প্রকাশে তাঁহার আপত্তি নাই। যাহা হউক আমরা তাঁহার নাম প্রকাশিত করিলাম না, কিন্তু পত্রখানি প্রকাশিত করিলাম। আশা করি, এই পত্রের প্রকাশ দেশের পক্ষে মঙ্গলজনকই হইবে। পত্রের কথাগুলি যে নিখুঁত সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। সত্য অপ্রিয় হইলেও, আপাততঃ কিছু ক্ষতিকর বলিয়া প্রতীত হইলেও পরিণামে কল্যাণকর ও লাভজনক।

"আপনার পত্রিকায় মাঝে মাঝে দেশের কথাপ্রসঙ্গে তথাকথিত দেশকর্ম্মী, সাধু, ধর্ম্মপ্রচারক এবং নেতৃবর্গের অযথা আচরণের প্রতি কটাক্ষ থাকে। ইহাতে দেশের কিছু কিছু উপকার হওয়াই সম্ভব। কারণ, পরদুঃখকাতর এবং স্বদেশভক্ত বহু ব্যক্তির কষ্টার্জ্জিত অর্থাদি কতক পরিমাণেও অপব্যয় থেকে রক্ষা পায়, তবে সেটাকেও বড় লাভ ব'লে গণ্য ক'রতে হবে।

গত শ্রাবণ সংখ্যা "বীরভূমি"তে "দেশকর্ম্মী শরৎকুমার" শীর্ষক মন্তব্য পাঠে কিছু বিস্মিত হ'লাম। যেহেতু আপনি শরৎকুমারকে লোকনিন্দা থেকে বাঁচাবার চেষ্টা ক'রেছেন; আপনার চেষ্টা অবশ্য প্রশংসনীয়; কিন্তু শরৎকুমার বা অন্য কোন ব্যক্তি যতই বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ভাবুক বা ভাবোন্মাদযুক্ত হউন না কেন, তাঁরা যদি কোন নৈতিক কলঙ্কে কলঙ্কিত হ'য়ে থাকেন, তবে পূর্ব্বোক্ত অসংখ্য গুণাবলীতে তাহা ঢাকা প'ড়বে না। স্বীকার করি যে, মানুষ দোষেগুণে মিশ্রিত; কিন্তু তা'তে বিশেষ দোষ হয় না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ সকল কার্য্য সাক্ষাৎভাবে জনসাধারণের অহিতকর হ'য়ে না উঠে।

বিগত ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে পাবনা হিন্দুরিলিফের জন্য আমরা (মেমিও-প্রবাসী হিন্দু বাঙ্গালীরা) কিছু চাঁদা সংগ্রহ করি। ৪ঠা আগষ্ট শরৎকুমার ঘোষের নামে ৫০৲টাকা পাঠাই; উহার Postal acknowledgment শরৎকুমার সহি করেন। আরো ৫০৲টাকা ১৬ই আগষ্ট পাঠাই, উহা শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তি for শরৎকুমার ঘোষ সহি করেন। কিন্তু বহুদিন গত হ'লেও যখন কোন প্রাপ্তিস্বীকার রসিদ বা ধন্যবাদ-জ্ঞাপক পত্র পেলাম না, তখন আর টাকা পাঠাই নি।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে পাবনা হিন্দুসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়কে ঐ টাকার সম্বন্ধে একপত্র লিখি ; তার উত্তরে যোগেন্দ্র বাবু জানান যে ঐ টাকা তিনি পান নি ; এবং তিনি শরৎকুমারকে পত্র লিখতে পরামর্শ দেন এবং শরৎকুমারের ঠিকানাও জানান। যোগেন বাবুর পত্রপ্রাপ্তি মাত্রেই শরৎকুমারকে পত্র লিখি, কিন্তু কোন উত্তরই পাইনি

এই "পুরাণো কাসন্দি" ঘাঁটতাম না যদি না আপনার মন্তব্যটী চোখে প'ড়তো। গত বৎসর যখন ক'লকাতায় ছিলাম সে সময় এ বিষয়ে সুভাষ বাবুকে জানাবার ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু তিনি অসুস্থ শরীর নিয়েও বহু কার্য্য ক'রছেন দেখে এই সামান্য বিষয়ে তাঁকে বিরক্ত করা উচিত বোধ করিনি।

হিন্দুরিলিফের জন্য সংগৃহীত চাঁদার উদ্বৃত্ত অর্থ ক'লকাতার Mayor's fund for Minor Girls এর জন্য পাঠানো হ'য়েছিল এবং তাহার যথাযথ প্রাপ্তিস্বীকার পত্রও পাওয়া গেছে।

উপরোক্ত ঘটনা হ'তে বুঝতে পারবেন যে "সময়" বৃথা নিন্দা করেননি ; এবং আশা করি যে অন্যান্য কাগজও যেন এই সব ভক্তকর্ম্মীদের শাসনে কৃপণতা না করেন। অবশ্য এমন কাগজও আছে যারা ঐ সমস্ত ভণ্ডদের পৃষ্ঠপোষক এবং লভ্যের অংশীদার। দেশের নামে সংগৃহীত বহু অর্থ যে তথা-কথিত নেতা, সাধু, সন্ন্যাসী এবং মোহান্তদলের ভোগবিলাসে ব্যয়িত হ'য়েছে এবং এখনো হ'চ্ছে, তাহা অনেকেই জানেন। কিন্তু বড় একটা কেউ মুখ ফুটে বলেন না ; বোধ হয় তাঁরা ভাবেন যে, এই অভাগা দেশের অরণ্যে রোদনে ফল কি ? হিন্দুর চির-আদর্শ সেবা, সংযম ও ত্যাগ ভারতভূমি থেকে অন্তর্হিত ; দেশ এক মহা মোহকর বিলাসের আবর্ত্তে পতিত।

এই সব বিষয় পর্য্যালোচনা ক'রে দেশের ভবিষ্যতের আশায় হতাশ হ'তে হয়। একটু নিবিষ্ট মনে চিন্তা ক'রলেই দেখতে পাওয়া যায় যে, দেশের কি দুর্দ্দিন উপস্থিত। এত স্বার্থপরতা, এত আত্মসর্ব্বস্বতা, এত কুটিলতা এত জাল জুয়াচুরী-প্রবঞ্চনা কোন দেশে আছে কি না সন্দেহ। দেশব্যাপী দুঃখ-দৈন্য-দুর্দ্দশার মূলে যে নৈতিক কারণ বর্ত্তমান তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝতে পারবেন। তাই যখনই নিজেদের অসীম দুর্দ্দশার কথা ভাবি তখনই সাধক কবির "কারো দোষ নয় গো মা, আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি, শ্যামা" গানটী মনে হয়, আর হৃদয় অবসাদে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে।"

বীরভূমি ৯—৯, পৌষ ১৩৩৫

পুরঞ্জন বা আত্মতত্ত্ব

১। উপদেষ্টা নারদ

স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ, যে বংশে ধ্রুব ও পৃথুর রাজার জন্ম, 'বর্হিষদ' সেই বংশেরই সন্তান। তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজা ও যাজ্ঞিক। বর্হিষদ রাজা যজ্ঞ করিয়া করিয়া পৃথিবীকে যজ্ঞবেদীতে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহার যজ্ঞের জন্য পৃথিবী পূর্ব্বাগ্র কুশের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিয়া এই রাজার নাম প্রাচীনবর্হি। প্রাচীনবর্হির দশটি পুত্র, ইঁহাদের সাধারণ নাম প্রচেতা। ইঁহারা অতিশয় ভাগ্যবান্। ভগবান্ রুদ্রের সহিত ইঁহাদের সাক্ষাৎ হয়, আর ভগবান্ রুদ্র কৃপা করিয়া ইহাদিগকে রুদ্রগীতস্তোত্র উপদেশ করেন।

রুদ্রের কৃপায় পুত্রগণের পরমাগতি হইল, কিন্তু মহারাজ প্রাচীনবর্হি কর্ম্মকাণ্ডেই ডুবিয়া থাকিলেন। দেবর্ষি নারদ ভাবিলেন, বড়ই দুঃখের কথা, আমার প্রিয়শিষ্য ধ্রুবের বংশে প্রাচীনবর্হির জন্ম, তাহার পুত্রগণ রুদ্রের কৃপায় পরমার্থ লাভ করিল আর সে নিজে কর্ম্মকাণ্ড লইয়াই পড়িয়া থাকিল, ইহা অসহ্য। প্রাচীনবর্হিকে উদ্ধার করিতে হইবে। এই ভাবিয়া নারদ প্রাচীনবর্হির নিকট আসিয়া পুরঞ্জনের উপাখ্যানের দ্বারা জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি উপদেশ করিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকা—

যদৈব রুদ্রঃ স্বগীতং স্তোত্রং প্রচেতস উপদিদেশ। তদেব তৎপিতরং প্রাচীনবর্হিষং নারদোঽপি পুরঞ্জনোপাখ্যানেন জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তীরুপদিদেশেতি প্রচেতসাং কথামসমাপ্যৈব তৎপিতুঃ কথামাহ প্রাচীনেতি হন্ত হন্ত মৎপ্রিয়শিষ্যস্য ধ্রুবস্য বংশোঽয়ং কর্ম্মণি নিমজ্জতি তদিমমুদ্ধরামীতি কৃপালুঃ।

প্রচেতাগণের কথা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে পুরঞ্জনের উপাখ্যান আরম্ভ হইয়াছে।

২। পুরঞ্জন ও তাঁহার বন্ধু

পুরঞ্জন একজন রাজা, বেশ কীর্ত্তিমান রাজা। তাঁহার কোনই অভাব নাই। কিন্তু, তিনি একটা জিনিষ বড়ই ভাল বাসিতেন, কি করিলে সুখ হয় তাহা শুনিতে তাঁহাকে বড়ই ভাল লাগিত। রাজা পুরঞ্জনের এক বন্ধু ছিলেন তাঁহার যে কি নাম তাহা কেহই জানে না তিনি কি করেন, সে-সম্বন্ধে দারুণ মতভেদ, কেহ বলেন তাঁহার কাজকর্ম্ম বোঝাই যায় না, কেহ বলেন বোঝা যায়, তবে বোঝা কঠিন। আবার কেহ বলেন বোঝা আবার যায় না? তিনিই তো ভিতরে ভিতরে গোপনে গোপনে সব করিতেছেন! তোমরা ভাব না, তাই বুঝিতে পার না। ভাবিলেই বুঝিবে,—এই রাজ্যে তোমাদের কাহারও কোনরূপ স্বাধীনতা নাই, রাজার ঐ বন্ধুই গোপনে থাকিয়া যাহা করান তাহাই হয়।

৩। অভাববোধ—গৃহ-অন্বেষণ

রাজা পুরঞ্জনের অভাব নাই সত্য, কিন্তু হঠাৎ তাঁহার ভয়ানক অভাব-বোধ আরম্ভ হইল। চিত্তসাগরে সর্ব্বদাই নূতন নূতন সাধের লহর জাগিতেছে, তাহাদের কি কল্লোল! রাজার সব থাকিয়াও কিছু নাই, ভয়ানক অভাবের বাথা, রাজা বড় পীড়িত ও চঞ্চল। তাঁহার মনে হইল, আমার একখানি বাস করিবার বাড়ী চাই, বেশ মনের মতো বাড়ী! মনের মতো বাড়ী একখানি পাইলেই আমার শান্তি হইবে। রাজ্যের মধ্যে, রাজ্যের বাহিরে কত বাড়ী রহিয়াছে, প্রতিদিন কত শত নূতন নূতন বাড়ী তৈয়ারী হইতেছে। ব্যথিত ও চঞ্চলচিত্তে রাজা বাড়ী খুঁজিতেছেন। নিজের রাজ্যে নিজের যে বাড়ী ছিল, তাহা আর ভাল লাগিল না। রাজা পুরঞ্জন বাড়ী ছাড়িলেন, রাজ্য ছাড়িলেন, অজানা দেশে বাহির হইলেন। বাড়ীর অভাব কি? প্রতিদিন নূতন নূতন বাড়ী! রাজা বাড়ী দেখেন, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করেন, কিন্তু তাহা ভাল লাগে না, পছন্দ হয় না, সাধ মেটে না, বাহির হইয়া পড়েন। কিন্তু বাড়ীর অভাব কি? আবার নূতন বাড়ী, নূতন সাজ

সজ্জা, নূতন নূতন ভোগের উপকরণ। রাজা বাড়ীতে প্রবেশ করেন, বাস করেন, ভোগ করেন। কিন্তু অল্পক্ষণ! ভাল লাগে না, বাহির হইয়া পড়েন, নূতন বাড়ীর অন্বেষণ করেন। এই প্রকারে কত বাড়ীই দেখা হইল, কত বাড়ীতেই বাস করা হইল তাহার সংখ্যা নাই।

অনেক দেশ ঘুরিয়া হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণে এক অতি সুরম্য প্রদেশে রাজা একখানি বাড়ী দেখিলেন। দেশ যেমন সুন্দর, বাড়ীখানিও তেমনি সুন্দর। এমন সুন্দর দেশও রাজা কখন দেখেন নাই, এমন সুন্দর বাড়ীও কখন দেখেন নাই। সুন্দর সে বাড়ী, নয়টি তাহার দুয়ার। প্রাচীর, উপবন, অট্টালিকা, পরিখা, গবাক্ষ, বহির্দ্বার, সকলই সুন্দর। গৃহের শিখরগুলি স্বর্ণ রৌপ্য ও লৌহময়। নীলকান্তমণি, স্ফটিক, বৈদুর্য্য, মুক্তা, মাণিক্য প্রভৃতির দ্বারা হর্ম্ম্যস্থলী রচিত। এমন ভোগবতী শোভাশালিনী পুরী রাজা কখনও দেখেন নাই। সমাজস্থান, চতুষ্পথ, রাজমার্গ, দ্যূতক্রীড়াদির স্থান, হট্ট, বিশ্রামস্থান, ধ্বজা, পতাকা, চক্রাদিরূপ বিদ্রুমবেদীতে এই পুরী বা রাজপ্রাসাদ সুশোভিত। যেখানে যেমন করিয়া যে জিনিষটি করা দরকার, রাজার মনে হইল, ঠিক্ সেইখানে সেই জিনিসটি ঠিক্ সেইরূপ করিয়াই করা হইয়াছে। রাজা পুরঞ্জনের মনে হইল তিনি চিরদিন যাহা খুজিয়াছেন, এতদিনে সৌভাগ্যবশে ঠিক্ তাহাই পাইয়াছেন। রাজার আনন্দের সীমা নাই। পুরীর বাহিরে উপবন। রাজা সেই উপবনে বেড়াইতেছেন, আর বিচিত্র অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছেন। তরুলতাগুলি দিব্য শোভাময়, জলাশয়ে জলচর পক্ষীগণ সুমধুর কলরব করিতেছে, হিমকণাবাহী সুগন্ধ সমীরে তীরস্থিত বৃক্ষ-সমূহের শাখা ও পল্লব মন্দ মন্দ আন্দোলিত। নানাবিধ বনজন্তু স্বচ্ছন্দে প্রফুল্লচিত্তে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু হিংসা নাই। রাজা পুরঞ্জন অতিশয় বিস্মিত হইলেন। কোকিলের কুহুস্বরে দশদিক্ মুখরিত

৪। প্রেয়সী

এইবার বিস্ময়ের উপর বিস্ময়, আনন্দের উপর আনন্দ, চরম ও পরম বিস্ময় ও আনন্দ। রাজা দেখিলেন এক নবীনা যুবতী পরমাসুন্দরী উপবনে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে দশটি ভৃত্য, আবার প্রত্যেক ভৃত্যের সহিত অনেকগুলি করিয়া নায়িকা। একটি

সর্প, তাহার পাঁচটি মস্তক ; এই সর্প প্রহরী হইয়া পরম যত্নে যুবতীকে রক্ষা করিতেছেন। যুবতীর রূপলাবণ্য ও বসনভূষণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও অতুলনীয়। যুবতীকে দেখিয়া মনে হয়, তিনি যেন কাহাকেও খুঁজিতেছেন। তিনি নীরব ভাষায় বলিতেছেন—

কত যুগযুগান্ত ধরিয়া, আমি বিরহিনী বিরহ-শয়নে জাগিয়া।
আছি কার আশাপথ চাহিয়া—
কে যেন গিয়াছে, আসিব বলিয়া, কে যেন গিয়াছে ছলিয়া।
কে যেন গিয়াছে, প্রাণ মন মোর, জাতি কুলশীল লইয়া॥
আমি যেন তার ছায়াটি কেবল, আমি যেন তার অনুটি।
কোথা যেন আছে সুদূর প্রবাসে, আমার কায়াটি তনুটি
আমি তারেই কেবল খুঁজিয়া, মরি ঘুরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
আমি পাগলিনী, চির বিরহিনী, জীয়ন্তে আছি মরিয়া।
আছি মরিয়া মরিয়া বাঁচিয়া॥

বিস্ময়মুগ্ধ ও আত্মহারা রাজার প্রতি যুবতী চাহিলেন, বেশ ভাল করিয়াই চাহিলেন। তাঁহার স্নিগ্ধ অপাঙ্গ নিশিতবাণের তুল্য, ভ্রূলতাই ধনুক। রাজা পুরঞ্জন দৃষ্টির প্রভাব মর্ম্মে মর্ম্মে বেশ ভাল করিয়াই অনুভব করিলেন। যুবতীর সলজ্জ আস্যের ঈষদ্ধাস্যে রাজা একরূপ জ্ঞানশূন্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পদ্মপলাশাক্ষি! আপনি কে? কাহার কন্যা? কোথা হইতে আসিয়াছেন? এই সুরম্য উপবনেই বা এই প্রকারে ভ্রমণ করিতেছেন কেন? আপনার এই সঙ্গীগণ কে? বিশেষতঃ, আপনার সঙ্গীগণের মধ্যে ঐ একজন, যিনি একাদশ স্থানে রহিয়াছেন, উঁহার ন্যায় বলশালী ব্যক্তি কখনও দেখি নাই। এই সব সঙ্গীনীগণই বা কে? আর ঐ সর্পই বা কে? আপনি লজ্জা, না ভবানী, না বাণী, না রমা? এই নির্জ্জন বনে আপনি কি পতি অন্বেষণ করিতেছেন? সুন্দরি, আমি অতিশয় বিস্মিত ও বিহ্বল হইয়াছি। আপনাকে পতি অন্বেষণ করিতে হইবে কেন? সুলক্ষণে, আপনার ঐ পদদ্বয় যিনি কামনা করিবেন, তাঁহার তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। সুতরাং আপনাকে পতি অন্বেষণ করিতে হইবে কেন? আপনার জন্য কত গুণবান্ কত ভাগ্যবান্ ব্রতধারী হইয়া সুকঠোর তপস্যা করিবেন। সুন্দরি, আমায় মার্জ্জনা করিবেন, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

আমি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনি লজ্জা, লক্ষ্মী, ভবানী না বাণী? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত হয় নাই। আপনার চরণ যখন পৃথিবী স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, তখন আপনি দেবতা নহেন। সুন্দরি, আমি আর কি বলিব? আমার মনের কথা গোপন করিতে পারিতেছি না। আমি একজন বীর, আমার কর্ম্ম অতিশয় মহৎ। আপনার অপাঙ্গ নিক্ষেপে আমার মন বিখণ্ডিত, আপনার সলজ্জ হাস্যে অত্যধিক পীড়িত। আমি আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী।"

রাজা পুরঞ্জন যেমন সুন্দরীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সুন্দরীও সেইরূপ রাজার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। যুবতী হাস্য করিলেন ও সাদরে সম্ভাষণ করিয়া রাজাকে বলিলেন—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি আমার পরিচয় জানিতে চাহিলেন, কিন্তু আমার কর্ত্তা কে, অন্যের বা আপনারই বা কর্ত্তা কে, তাহা তো আমি একেবারেই জানি না। যাহা দ্বারা মানুষের নাম ও গোত্র হয়, তাহারও আমি জানি না। আমি নিজের পরিচয়ও জানি না, আর আমার বাসস্থান এই পুরী যিনি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহারও কোনরূপ সংবাদ বা পরিচয় আমি জানি না। আমার সঙ্গী এই সব পুরুষ, ইহারা আমার সখা; এই সব নারী আমার সখী; এই পঞ্চমস্তক নাগ, এই পুরীর পালনকর্ত্তা; আমি যখন ঘুমাই নাগ-মহাশয় তখন জাগিয়া থাকেন। আপনি যে এখানে আসিয়াছেন, আপনার সহিত যে আমার সাক্ষাৎ হইল, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। আপনার মঙ্গল হউক। হে বীর, আপনি যে সুখভোগের অভিলাষ করিয়াছেন, আমি আমার এই সব সখাসখীগণের দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করিব। এই পুরী, ইহার নয়টি দ্বার; এই পুরী আপনারই। একশত বৎসর আপনি এই পুরীতে বাস করুন, আপনি যাহা কিছু ভোগ করিতে চাহেন, আমি তাহা সংগ্রহ করিয়া দিব। আপনার তুল্য পুরুষ আমি আর কখনও দেখি নাই। আমি এতদিন যাহাদের দেখিয়াছি তাহারা নৈষ্ঠিক (অরতিজ্ঞ); যে সুখ নিষিদ্ধ নহে, তাহারা তাহাও ত্যাগ করে, অতএব অকোবিদ্, তাহারা মৃত্যুর অভিমুখী নহে, পরলোকের কথা কিছুই ভাবে না, আবার ইহলোকে বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য কি সে-সম্বন্ধেও তাহাদের কোনরূপ চিন্তা নাই। কাজেই তাহারা পশুতুল্য। তাহাদের প্রতি আমার প্রীতি হয় নাই। গৃহস্থ হওয়ার তুল্য সুখ আর কিছুতেই নাই। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, পুত্রসুখ, যশঃ, মুক্তি, শোকরহিত সুনির্ম্মল ভবিষ্যৎ জীবন, এই গৃহস্থাশ্রমেই আছে। নিবৃত্তিপথের পথিকেরা

এই সব আনন্দ-দায়ক বস্তুর নামও জানে না। পিতৃ, দেব, ঋষি, মানব ও ভূতগ্রাম, ইহাদের যদি কল্যাণ করিতে হয়, তাহা গৃহস্থাশ্রম হইতেই সম্ভব। আপনি কীর্ত্তিমান্, দাতা ও প্রিয়দর্শন, তাহার পর স্বয়ং আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত। আমি যুবতী, সুতরাং আপনিই আমার উপযুক্ত পতি। আপনার ঐ সুললিত দীর্ঘার্গল বাহুযুগল সর্পতুল্য, এমন নারী কে আছে, যে উহাতে মুগ্ধ হইবে না? আপনি সাধারণ মানুষ নহেন। আপনার হাস্যময় দৃষ্টি বড়ই করুণ, আপনাকে দেখিলেই দীনজনের দুঃখ দূর হয়।

৫। গৃহস্থ ও সুখী

কথাবার্ত্তা হইয়া গেল, উভয়ে সেই নবদ্বার পুরীতে প্রবেশ করিলেন। গায়কেরা সর্ব্বদাই সুমধুর স্বরে গান করে, সঙ্গিনী রমণীগণ নিত্যই নব নব ভোঁগের বস্তু লইয়া আসেন ও সুখভোগের নব নব ব্যবস্থা করেন এই প্রকারে বড়ই সুখে দিন কাটিতেছে। বসন্তকাল চলিয়া গেল, গ্রীষ্মকাল আসিয়া উপস্থিত। তখন তাঁহারা এক হ্রদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বলা হইয়াছে পুরীর নয়টি দ্বার। উহার সাতটি উপরে আর দুইটি নীচে। পূর্ব্বদিকে পাঁচটি, দক্ষিণে একটি, উত্তরে একটি আর পশ্চিমে দুইটি। ঐ দ্বারগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। ইহা ছাড়া আর দুইটি দ্বার আছে, কিন্তু তাহারা অন্ধ, তাহাদের ছিদ্র নাই। পুরঞ্জনের অবস্থা এখন বেশ। যখন তিনি অন্তঃপুরে যান, তখন একজন সর্ব্বকর্ম্মা সঙ্গী তাঁহার সঙ্গে থাকেন। সেই সঙ্গীর সাহচর্য্যে পুরঞ্জনের নানারূপ ভাবের উদয় হয়। কখন মোহ, কখন প্রসন্নতা কখন বা হর্ষ, এই সব ভাবের দ্বারা পুরঞ্জন ক্রমান্বয়ে অভিভূত হইয়া পড়েন। তাঁহার স্ত্রীর প্রতি এত ভালবাসা আর তাঁহার স্ত্রীর প্রভাব এতই বেশী যে পুরঞ্জন নিজে কিছু না করিয়াও মনে করেন সবই করিতেছি। তাঁহার স্ত্রী যখন মদ্যপান করেন, তখন পুরঞ্জন ঠিক্ অনুভব করেন তিনিই নিজেই মদ্যপান করিয়া একেবারে বিহ্বল হইয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী পুরঞ্জনী ভোজন করেন, গমন করেন, রোদন করেন, হাস্য করেন, গল্প করেন, অন্যত্র দৌড়িয়া যান, বসিয়া থাকেন, শয়ন করেন, শ্রবণ দর্শন আঘ্রাণ বা স্পর্শ করেন, পুরঞ্জনের মনে হয়,—খুব সুস্পষ্টরূপেই মনে হয়, তিনিই এই সব করিতেছেন।

পুরঞ্জনী যদি কখন শোক করেন, পুরঞ্জনও দীনের তুল্য শোক করেন। পূর্ব্বে পুরঞ্জন সম্পূর্ণরূপে অন্যপ্রকারের ছিলেন। পূর্ব্বে তিনি অসঙ্গ ছিলেন, তাঁহার সর্ব্বদাই মনে হইত তিনি কিছুই করেন না. তিনি নিজে সর্ব্বদাই একরূপ, বাহিরে পরিবর্ত্তন হইতেছে কিন্তু সেজন্য তাঁহার নিজের কোনরূপ বিকার বা পরিবর্ত্তন নাই। এখন তাঁহার অবস্থা অন্যরূপ। কিন্তু তাঁহাকে এখন এই নূতন অবস্থাই ভাল লাগিতেছে, পুরাতন অবস্থা যেন একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মনে হয় তিনি যেন চিরদিনই এইরূপ।

৬। মৃগয়া ও মানভঞ্জন

সুরম্য পুরীতে নিত্যই নূতন নূতন ভোগের বস্তু ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা, কিন্তু তাহাতেও কেমন অতৃপ্তি বোধ হইতে লাগিল। কি করা যায়? রাজা পুরঞ্জন মৃগয়ায় বাহির হইলেন। অদূরে একটি বন সেই বনে পাঁচটি সানু বা পর্ব্বতবেষ্টিত সমতলক্ষেত্র আছে। শরাসন গ্রহণ করিয়া রথে চড়িয়া পুরঞ্জন সেই বনে মৃগয়ায় গমন করিলেন। তাঁহার রথে পাঁচটি অশ্ব, রথখানি অতিশয় দ্রুতগামী, দুইটি দণ্ডের দ্বারা এই রথ নিবদ্ধ। রথের চক্র দুইটি অক্ষ একটি, ধ্বজা তিনটি, বন্ধন পাঁচটি। রথের লাগাম এক, সারথী এক, রথীর উপবেশন স্থান এক, যুগন্ধর স্থান দুই, চর্ম্মময় আবরণ সাত, গতিপ্রকার পাঁচ। রথখানি স্বর্ণালঙ্কৃত। রাজারও গাত্রে স্বর্ণময় চর্ম্ম. পৃষ্ঠে অক্ষয় তূণ। 'একাদশ' বলিয়া পূর্ব্বে যে একজন মহাবলবান ব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে, যিনি দশজন ভৃত্যের নেতা, সেই একাদশকে রাজা সেনাপতি করিয়া নিজের সঙ্গে লইলেন। মৃগয়ায় আসিয়া রাজার বড়ই আনন্দ ও উৎসাহ হইয়াছে, তাঁহার আর গৃহিনীকে মনেই নাই। মৃগয়া করিতে হইলে আসুরী বৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়, রাজা তাহাই করিয়াছেন। সুতীক্ষ্ণ ও সুশাণিত বাণের দ্বারা প্রতিনিয়ত অসংখ্য বনপশু বধ করিতেছেন। মৃগয়া কার্য্য হিংসামূলক হইলেও উহার একটা নিয়ম আছে। নিয়মপূর্ব্বক ঐ কার্য্য করিলে, যতগুলি পশু বধ করা আবশ্যক. যে যে পশু বধ করা আবশ্যক, বিবেচনাপূর্ব্বক তাহা করিলে, মৃগয়া কর্ম্মের দ্বারা রাজাদের অধঃপতন হয় না। কিন্তু যদি বিবেচনা না থাকে, যদি নিয়মানুসারে না চলা যায়, 'আমি খুব কৃতী' এই অভিমানের দ্বারা চালিত হইয়া যদি দম্ভসহকারে মৃগয়ার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। কেবল মৃগয়া নহে, সকল কর্ম্মেরই

ইহাই ব্যবস্থা। পশুহত্যার উৎসাহে পুরঞ্জন মূঢ় হইয়াছেন, এতই হত্যা চলিতেছে যে মৃগগণ কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছে। যাহা হউক ক্রমশঃ পুরঞ্জন ক্লান্তি বোধ করিলেন, অসহ্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। বাড়ীর কথা মনে পড়িয়া গেল। পুরঞ্জন বাড়ী গেলেন, স্নান ও আহার করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রেয়সী সহধর্ম্মিনীকে দেখিতে পাইলেন না। সকলই আছে, কিন্তু প্রেয়সী নাই। প্রেয়সীর সহিত মিলিত হইবার জন্য চিত্ত আকুল হইয়াছে। সখীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোথায়? মনে মনে ভাবিতেছেন, কি হইল? প্রেয়সী ব্যতীত আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না; এই গৃহ, এই দাসদাসী, এই সব ভোগের উপকরণ, আমার সকলই শূন্য ও দুঃখকর মনে হইতেছে! পুরাতন কথা আজ অনেক দিন পরে মনে পড়িয়া গেল। আমি যে বাসনাসাগরে ডুবিয়া মরিতেছিলাম, গভীর অপার সেই বাসনাসাগর, উত্তাল তরঙ্গমালা তাহার বক্ষদেশে নিয়ত উত্থিত ও ধাবিত, আমি ডুবিতেছিলাম, মরিতেছিলাম। কত দেশ পর্য্যটন করিয়াছি, কিন্তু শান্তি পাই নাই, তৃপ্ত পাই নাই। পরিশেষে সেই পুণ্যদিন, আর সেই পুণ্যক্ষণ, আমার সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয় হইল, আমি পরিত্রাণ পাইলাম, আমি ধন্য হইলাম। প্রেয়সীর সহিত এই রমণীয় উপবনে প্রথম মিলন, তিনিই নিজের প্রজ্ঞার দ্বারা আমাকে উদ্ধার করিলেন। তাহার পর কত দিন প্রেয়সীর সহিত পরমানন্দে কাটিয়াছে। তাহার পর আমি যেন তাঁহাকে ছাড়িয়া তাঁহাকে ভুলিয়া হায়, হায় কোথায় গিয়াছিলাম! হত্যা করিতে গিয়াছিলাম, হিংসা করিতে গিয়াছিলাম। এখন প্রেয়সী কোথায়? আমি যে মরিয়া যাইতেছি!

সখীগণ রাজাকে বলিলেন, নরনাথ, আপনার প্রেয়সী যে কি করিতে চাহেন, আমরা তাহার কিছুই জানি না, ঐ দেখুন তিনি মলিন-বেশে ভূমিশয্যায় শুইয়া রহিয়াছেন।

সংবাদ পাইয়াই পুরঞ্জন প্রেয়সীর নিকট গেলেন। সত্যই তো মলিনদেহে মলিনবেশে প্রেয়সী ভূমিশয্যায় শুইয়া রহিয়াছেন। রাজার চিত্ত ব্যাকুলিত হইয়াছে, তিনি অতিশয় বিস্মিত হইয়াছেন এবং নিজের কর্ম্মের জন্য অনুতপ্তও হইয়াছেন। কতনা মনোজ্ঞ সান্ত্বনার বাক্য রাজা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু, এ কি, প্রেয়সী যে কুপিতা হইয়াছেন, তাহারও তো কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। ব্যাপার কি? কত অনুনয় বাক্য বলিলেন, কত প্রকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, চরণে ধারণ করিলেন, ক্রোড়ে লইয়া হস্ত দ্বারা অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

প্রেয়সি, আমি অপরাধী, আমার দণ্ডবিধান করুন, আমার সমুচিত শিক্ষা হউক। আপনি ইঙ্গিতেও কোনরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন না কেন? ইহাতে মনে হইতেছে, আমি অতিশয় হতভাগ্য। আমাকে যদি দণ্ড দেন, তাহা হইলে বুঝিব অনুগ্রহ করিলেন। হে শোভনদশনযুতে হে সুভ্রু, হে মনস্বিনি, আপনি আমাদের সকলের কর্ত্রী, আমরা সকলেই আপনার আত্মীয়। আপনি অমন করিয়া মুখ ঢাকিয়া রহিয়াছেন কেন? একবার আপনার বদনকমল উদ্‌ঘাটন করুন। সুন্দরি, আপনার মুখকমল কি চমৎকার। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে মৃগয়ায় গিয়াছিলাম, অপরাধ হইয়াছে, মার্জ্জনা করুন।

৭। আত্মবিস্মৃতি

প্রেয়সী পুরঞ্জনী আর কতক্ষণ মানময়ী হইয়া থাকিবেন? প্রিয় বঁধুর আর্ত্তিপূর্ণ কাতর আবেদনে তাঁহার মানভঞ্জন হইল। ইহার পর পুরঞ্জনের জীবনে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। পুরঞ্জন এতদিন এই পুরীতে ছিলেন, প্রেয়সীর সহিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্তান-সন্ততি হয় নাই। এতদিন সংসার ছিল, সংসারের মাধুরী ছিল, কিন্তু সবই একটা ভাবময়, স্বপ্নময় জিনিষ ছিল। পুরঞ্জনের বিবেক বিগত হইল, কিন্তু তিনি বুঝিতেই পারিলেন না যে তাঁহার পরমায়ুর ক্ষয় হইতেছে। পুরঞ্জন মহামনা ছিলেন, কিন্তু এখন মদান্ধ হইয়াছেন, অজ্ঞানে অভিভূত হইয়াছেন। পুরঞ্জনের নবীন বয়স ক্ষণার্দ্ধের ন্যায় বিগত হইল। তাঁহার পরমায়ুর অর্দ্ধাংশ বিগত। তাঁহার পুত্রের সংখ্যা এগার শত, কন্যার সংখ্যা একশত দশ। পুরঞ্জন যে রাজ্যের রাজা তাহার নাম পঞ্চালদেশ। পুত্রকন্যাগণের উপযুক্ত পাত্রীতে ও পাত্রে বিবাহ হইয়া গেল। পুত্র-পুত্রীগণেরও আবার পুত্রপুত্রী হইল। সুবিশাল বংশ বিস্তার। সংসারবন্ধন অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছে, লোভেরও সীমা নাই, ভয়েরও সীমা নাই। কিসে কি হয় কে জানে? পুরঞ্জন যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এই সব যজ্ঞ পারমার্থিক নহে, নিস্কাম নহে, আত্মার কল্যাণের জন্য বা শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য নহে। এই সব যজ্ঞ জ্ঞানপূর্ব্বক কৃত নহে। নানা কামনায়, ভয় ও লোভের তাড়নায় প্রত্যহ নূতন নূতন যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকর্ম্ম চলিতে লাগিল। চিত্তের নির্ম্মলতা নাই, সত্যের বোধ নাই, পাঁচজনে যাহা করিতে বলে তাহাই

করেন। ইহাই হইল পুরঞ্জনের ধর্ম্ম। পূর্ব্বে তিনি এরূপ ছিলেন না। পূর্ব্বে তিনি নিজেরই ভিতরের এক উজ্জ্বল স্থানের আলোতে নিজের কল্যাণ ও অকল্যাণ, নিজের কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য অতিশয় সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেন কিন্তু এখন আর তাঁহার সে শক্তি নাই। কাজেই এখন তিনি পশুমারক ভয়ঙ্কর যজ্ঞ সমূহে দীক্ষিত হইয়া নানাবিধ কামনায়, ভয়ে এবং লোভে দেব পিতৃ ও ভূতপতিগণের অর্চ্চনা আরম্ভ করিলেন।

এইবার আসিলেন কাল, তাঁহার নাম চণ্ডবেগ, তিনি গন্ধর্ব্বগণের অধিপতি, সঙ্গে তাঁহার তিন শত ষাট জন গন্ধর্ব্ব তাহারা অতিশয় বলবান। তিনশত ষাট্ জন গন্ধর্ব্বের সহিত তিনশতষাট্ জন গন্ধর্ব্বী। ইহাদের বর্ণ শ্বেত ও কৃষ্ণ। এই গন্ধর্ব্ব মিথুনেরা কামনির্ম্মিত পুরী অপহরণ করে, ইহাই তাহাদের কাজ। সংসারে যাহারা যোষিৎ-প্রিয়, রমণী সঙ্গই যাহাদের একমাত্র সুখ, অন্যরূপ সুখের সন্ধান যাহারা রাখে না, তাহারা এই চণ্ডবেগের উপর বড়ই অসন্তুষ্ট। কিন্তু, অসন্তুষ্ট হইয়া কি করিবে? চণ্ডবেগের গতিরোধ করার শক্তি কাহারও নাই। চণ্ডবেগের অনুচর অনুচরীগণ যখন পুরঞ্জনের পুরী অপহরণ করিতে ও ধ্বংশ করিতে আরম্ভ করিল, তখন সেই পঞ্চমুখ সর্প, যিনি প্রহরীরূপে পুরী রক্ষা করিতেন, যাঁহার নাম প্রজ্বগর, তিনি গন্ধর্ব্ব-মিথুনগণের সহিত বিক্রমসহকারে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ভয়ানক সে যুদ্ধ! কিন্তু, প্রজ্বগর কি করিবেন? তিনি একাকী, আর গন্ধর্ব্ব-মিথুনেরা সংখ্যায় সাত শত কুড়ি। সুতরাং যুদ্ধ করিয়া জয়ী হওয়া প্রজ্বগরের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু, তথাপি তিনি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শতবর্ষ কাল ধরিয়াই এই যুদ্ধ। প্রজ্বগর ক্ষীণ হইয়া পড়িলেন। প্রহরীর অবস্থা দেখিয়া পুরঞ্জন অতীব চিন্তিত, পুর, রাষ্ট্র ও বান্ধবগণকে এখন কে রক্ষা করিবে?

৮। কালকন্যা জরা

চণ্ডবেগের একটি কন্যা, তাহার নাম জরা। সেই কন্যাটি বড়ই হতভাগিনী। তাহার আর বিবাহ হয় না। সে উপযুক্ত স্বামী পাইবার জন্য এই ত্রিলোকের সর্ব্বত্রই পর্য্যটন করিয়াছিল, বহুজনের নিকট প্রণয়প্রার্থিনী হইয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহার প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই, কেহই তাহাকে বিবাহ করে নাই। কন্যাটি বড়ই অভাগিনী। অনেক

দিনের কথা, একবার দেবর্ষি নারদের সহিত এই কন্যার দেখা হইয়াছিল। নারদ তখন ব্রহ্মলোক হইতে ভূলোকে আসিতেছিলেন। নারদকে দেখিয়া জরা হতজ্ঞান হইয়া নারদকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহিয়াছিল। নারদ তাঁহার প্রস্তাবে বলিয়াছিলেন, আমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, আমার বিবাহ করার ইচ্ছা নাই। নারদের কথায় জরার ক্রোধ হইল, সে নারদকে অভিশাপ দিল—তুমি যখন আমার কথা রাখিলে না, তখন আমার অভিশাপে তুমি কোন এক স্থানে স্থির থাকিতে পারিবে না। জরার অভিশাপে নারদের ক্রোধ হইল না, দয়া হইল, কারণ জরা যে কত বড় দুঃখে অভিশাপ দিয়াছে, তাহা নারদ বুঝিলেন। আর জরা যে-অভিশাপ নারদকে দিলেন, তাহা নারদের পক্ষে কিছুই নহে, নূতনও নহে। দয়ার্দ্রচিত্তে নারদ জরাকে বলিলেন—তুমি এক কাজ কর, আমি তোমাকে তোমার উপযুক্ত পতির সন্ধান বলিয়া দিতেছি। যবনদের রাজার নাম ভয় তুমি তাহার নিকট যাও।

জরা যবনরাজের নিকট নিজের প্রার্থনা জানাইলে যবনরাজ তাহাকে বলিলেন, তোমাকে কেহই বিবাহ করে না, আমিও বিবাহ করিতে পারিব না। যাহা হউক তুমি দুঃখিত হইও না আমি তোমার ব্যবস্থা বলিয়া দিতেছি। তুমি আত্মগোপন কর, এখন হইতে তোমার গতি অলক্ষিত হউক। তাহা হইলে সকলেই তোমার পতি হইবে, তুমি সকলকেই ভোগ করিতে পারিবে। কেহ তোমাকে হত্যা কারবে বলিয়া ভয় করিও না, আমার সৈন্যগণ তোমাকে রক্ষা করিবে, তোমার ভয় নাই। আমার এক ভাই আছে, তাহার নাম প্রজ্বার, আজ হইতে তুমি আমার ভগ্নি হইলে। তুমি প্রজ্বারকে সঙ্গে লইয়া নির্ভয়ে বিচরণ কর। আমার যে-সব সৈন্য তুমি দেখিতেছ, তাহা অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সৈন্য আছে, ক্রমশঃ তাহাদের পরিচয় পাইবে, তাহারা সকলেই তোমাদের সাহায্য করিবে, আর আমি নিজে গোপনে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিব, অতএব তোমাদের কোনরূপ ভয় নাই। ইহাই জরার ইতিহাস।

চণ্ডবেগের অনুচরগণের আক্রমণে পুরঞ্জনের পুরী যখন ধ্বংশপ্রায়, পাঞ্চালরাজ পুরঞ্জন যখন একেবারে নরুপায় ও অসহায়, প্রহরী প্রজগর যখন নিতান্ত ক্ষীণকায়, তখন পুরঞ্জন আত্মরক্ষার আশায় জরাকেই বিবাহ করিলেন।

জরা পুরঞ্জনের পুরীতে প্রবেশ করিলেন এবং কর্ত্রী হইয়া সেই পুরীতে যাহা

কিছু আছে সমুদয় ভোগ করিতে লাগিল। উঁরা একা নহে। যবনরাজের যেসব সৈন্য জরার সঙ্গে থাকে তাহারাও একে একে পুরঞ্জনের পুরীতে প্রবেশ করিয়া ভোগের বস্তু-সমূহ অধিকার করিল। তাহারা এখন পুরঞ্জনের কুটুম্ব। কালকন্যা জরার আলিঙ্গনে পুরঞ্জনের দেহে আর শ্রী নাই, তিনি প্রজ্ঞাহীন ও অতি দীন হইয়া পড়িলেন। গন্ধর্ব্ব-গন্ধর্ব্বী পূর্ব্বেই পুরী আক্রমণ করিয়াছিল, এখন আবার যবনসৈন্যগণ তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। অতএব অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর। প্রজগর এখন অতিশয় শীর্ণ ও দুর্ব্বল, পুরঞ্জনের উত্থানশক্তি নাই। পুরী বিশীর্ণ, পুত্রপৌত্র ভৃত্য ও অমাত্যবর্গ প্রতিকূল, প্রেয়সী পুরঞ্জনীও আর আদর করে না; পুরঞ্জন সকলি বুঝিতেছেন, কিন্তু, কি করিবেন? তিনি একেবারে নিরুপায়, কালকন্যা জরা তাঁহাকে একেবারে গ্রাস করিয়াছে। দুশ্চিন্তা-পীড়িত পুরঞ্জন কেবল বুঝিলেন প্রতিকারের কোনই উপায় নাই। পুরঞ্জনের অন্তরে তখনও বিষয়বাসনা ছিল, কিন্তু যখন দেখিলেন সকলই যাইতে বসিয়াছে, তখন মনে হইল আর কেন, এখন এই পুরী পরিত্যাগ করাই প্রয়োজন। যবনরাজ ভয়ের অগ্রজ প্রজ্বার আসিয়া সেই সময়ে উপস্থিত হইয়া পুরীতে আগুন লাগাইয়া দিল। পুরঞ্জন ও পুরবাসী সকলের অসহ্য ও ভীষণ সন্তাপ উপস্থিত। প্রজগরও সন্তপ্ত। কি করিবেন প্রজগর তখন পুরী পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। পুরঞ্জনের অবয়ব এখন শিথিল, গন্ধর্ব্বেরা তাঁহার পৌরুষ হরণ করিল, যবনেরা আসিয়া গলা টিপিয়া ধরিল, পুরঞ্জন অস্ফুটস্বরে রোদন করিলেন।

৯। অবসান

এখন পুরঞ্জনের 'আমার' বলিতে কিছুই নাই, কিন্তু তথাপি উদ্বেগ। আমার পুত্র, আমার কন্যা, জামাতা, পুত্রবধূ, পৌত্র পৌত্রী আত্মীয় স্বজন; আমার গৃহ আমার ধনাগার; হায় কি হইল, কি হইল? ইহাদের সব কি হইল, ইহারা সব কোথায় গেল। প্রাণপ্রিয়া সহধর্ম্মিণীর কথা এইবার মনে পড়িয়া গেল। তিনি এখন কোথায়? আমার তো আর এখানে থাকা হইবে না, আমি তো আর এখানে থাকিতে পারিব না। কোথায় কোন্ সুদূরবর্ত্তী অজানা আঁধার দেশে আমাকে বাধ্য হইয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তাহা হইলে আমার প্রেয়সীর কি হইবে? তাহার যে আর কেহই নাই। অনাথা হইয়া একাকিনী

হইয়া তাঁহাকে কেবল কাঁদিতে হইবে। আমার খাওয়া না হইলে তাঁহার খাওয়া হয় না, আমার স্নান না হইলে তিনি স্নান করেন না। কতদিন ক্রোধ করিয়া তিরস্কার করিয়াছি, তিনি নীরবে সকলই শুনিয়াছেন। ভ্রান্তিবশে মূর্খের ন্যায় কখন কোন কার্য্য করিতে গেলে, কতদিন কত প্রকারেই না আমাকে প্রবোধ দিয়াছেন, আমি বিদেশে গেলে আমার বিরহে কতবার শীর্ণা হইয়াছেন। আমি তো চলিলাম, চিরকালের জন্য চলিলাম, তাঁহার এখন কি হইবে? আমার পুত্রকন্যাগণ অতিশয় দীন ও অসহায়, তাহাদের আর অন্য কোন আশ্রয় নাই, আমি তো চলিলাম, চিরকালের জন্য চলিলাম, তাহাদের এখন কি হইবে। পুরঞ্জন মনে মনে এই প্রকারে বিলাপ করিতেছেন আর যবনরাজ আসিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। পুরঞ্জনকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে, আর তাঁহার স্বজনবর্গ কাতরস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে।

যবনরাজ যখন বাঁধিয়া ফেলিলেন, তখন পুরঞ্জনের জ্ঞান ছিল না, কাজেই তাঁহার সেই প্রথম যুগের সখা, তাঁহার কথা একেবারেই মনে পড়ে নাই। পুরঞ্জনের যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলেন এক অতি ভয়ানক যন্ত্রণার স্থান। তিনি শেষ সময়ে অনেক যজ্ঞ করিয়াছিলেন, অনেক পশুবধ করিয়াছিলেন, চাহিয়া দেখিলেন, সেই সব পশু সারি সারি দাঁড়াইয়া। তাহাদের হাত বাহির হইয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকেরই হাতে কি ভয়ানক কুঠার। তাহারা সকলে সেই কুঠারের আঘাতে পুরঞ্জনকে পীড়িত ও ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। কত যে যন্ত্রণা তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। শত বৎসর এইরূপ চলিল। শেষ সময়ে তাঁহার আর জ্ঞান ছিল না। স্মৃতিশক্তি একেবারে লোপ হইয়া গেল।

১০। নবজন্ম

এখন কোথায় পুরঞ্জন? সে নাম নাই, সে রূপ নাই। সে নামের, সে রূপের, আর সেই সব সুখদুঃখময় ঘটনার স্মৃতিও নাই। কিন্তু, তথাপি আছে, পুরঞ্জন আছে। আবার একটা দিন আসিবে, যেদিন বেশ বুঝিতে পারা যাইবে, পুরঞ্জন ছিল, পুরঞ্জন আছে এবং থাকিবে, চিরদিন ও চিরকাল থাকিবে। "করম সঙ্গে চলিয়া যায়"। পুরঞ্জনের যাহা কর্ম্ম তাহার ফল আছে।

বিদর্ভদেশের রাজা বড়ই ধার্ম্মিক লোক, শুভদিনে শুভক্ষণে তাঁহার একটি কন্যা হইল, কন্যার নাম বৈদর্ভী। কন্যার বয়স হইয়াছে, বিবাহ দিতে হইবে। বীর্য্যপণে বিবাহ। অনেক ক্ষত্রীয়বীর আসিয়াছেন নিজ নিজ বীরত্ব বিক্রম দেখাইতেছেন। জয়ী হইলেন মলয়ধ্বজ। মলয়ধ্বজের সঙ্গে বৈদর্ভীর বিবাহ হইল। মলয়ধ্বজ পাণ্ড্য দেশের রাজা। মলয়ধ্বজ পরম ভক্ত। বৈদর্ভীর একটি কন্যা হইল সাতটি পুত্র হইল। কন্যাটি অসিতেক্ষণা। সাতটি পুত্র দ্রাবিড়-দেশের সপ্তবিভাগের ভূমিপালক হইলেন। সপ্তপুত্রের আবার অনেকগুলি করিয়া পুত্র হইল, বংশের খুব বিস্তার হইল। কন্যাটি ব্রতপরায়ণা, মহর্ষি অগস্ত্য তাহাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহাদের পুত্র দৃঢ়চ্যুত, দৃঢ়চ্যুতের পুত্র ইধ্মবাহ। পুত্র পৌত্র ও দৌহিত্রগণ উপযুক্ত হইয়াছেন, আর কেন? ধার্ম্মিক রাজা মলয়ধ্বজ সংসার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-আরাধনার জন্য কুলাচলে আসিলেন। স্বামী সংসার ছাড়িলেন, পতিব্রতা বৈদর্ভীও সংসার ছাড়িয়া স্বামীর সঙ্গ লইলেন। জ্যোৎস্না আর কি করিবে? চন্দ্রের অনুগমন করা ব্যতীত জ্যোৎস্নার আর উপায় কি?

চন্দ্ররসা, তাম্রপর্ণী, বটোদকা প্রভৃতি পবিত্র নদীর পবিত্র জল। মলয়ধ্বজ ও বৈদর্ভী নিত্য নিয়মিতরূপে সেই জলে স্নান করেন, তাহাতে দেহের মলও ক্ষালিত হয় মনের মলও অপগত হয়; ফল মূল কন্দ বীজ পুষ্প পত্র তৃণ জল, যেদিন যেমন পাওয়া যায়, তাহাই ভোজন। রাজা ও রাণীর দেহ খুবই ক্ষীণ হইয়াছে, তাঁহারা তপস্যা করিতেছেন। শীত, উষ্ণ, বায়ু, বৃষ্টি, ক্ষুধা তৃষ্ণা, প্রিয় অপ্রিয়, এই সকলে তাঁহাদের সমজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহারা আর এই দ্বন্দ্বের দ্বারা বিচলিত নহেন। উপাসনার দ্বারা, নানারূপ নিয়ম প্রতিপালন ও শম দম প্রভৃতির যথাযথ অভ্যাসের দ্বারা মলয়ধ্বজের চিত্তে আর কামাদি বাসনার লেশমাত্র নাই, সমুদয় দগ্ধ হইয়াছে, ইন্দ্রিয় প্রাণ মন সমুদয় বিজিত ও সংযত। পরব্রহ্মের সহিত মিলিত অবস্থায় শত বৎসর কাল মলয়ধ্বজ অবস্থিতি করিলেন।

পরে ব্রহ্মণি চাত্মানং পরং ব্রহ্ম তথাত্মনি।
ঈক্ষমাণো বিহায়েক্ষামস্মাদুপররাম হ॥

সত্য সেই পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্, আমি সেই ভগবানের নিয়ত আশ্রিত। আমিও শুদ্ধ, আমাতেও সেই শ্রীভগবানের নিয়তই অধিষ্ঠান। এই দর্শনে বা অনুভবে সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, আপনা হইতেই সর্ব্বদা এই অনুভব হইয়া থাকে। (শ্রীভগবানের স্বরূপের

চিচ্ছক্তির আবির্ভাব-নিবন্ধন এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইল, আত্মচেষ্টায় নহে। (ইতি বিশ্বনাথ) সাধু মলয়ধ্বজের দেহ সাধারণ প্রাকৃত দেহের ন্যায় যে ধ্বংশ হইল তাহা নহে, তিনি উপরত হইলেন।

১১। সখার আগমন

বৈদর্ভীর অবস্থা কি? তিনি স্বামীর সেবা করিতেন, চীর বসন পরিধান করিয়া ব্রতপালন করিতেন, শরীর কৃশ, মাথায় জটা। স্বামীর উপরম হইল কিন্তু দেহের দীপ্তি কমিল না, অনলের ন্যায় দেহ উজ্জল। পতিব্রতা বৈদর্ভী যথারীতি স্বামীর সেবা করিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, স্বামীর দেহে উষ্ণতা নাই। তখন তিনি বুঝিলেন আমার স্বামী আর এই দেহে নাই, তিনি নিত্যধামে গিয়াছেন, আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। কাজেই পতিব্রতা বৈদর্ভী কাতরস্বরে বলিতেছেন—মহারাজ গাত্রোত্থান করুন, আপনার বিশাল রাজ্য এই সসাগরা ধরণী বড়ই ভয় পাইয়াছে, দস্যু ও অধার্ম্মিক রাজন্যগণ অবসর পাইয়া পৃথিবীকে আক্রমণ করিবে, আপনি উঠুন, আপনি ব্যতীত পৃথিবীকে রক্ষা করিতে যে আর কেহই নাই।

কিছুক্ষণ অধীরচিত্তে বিলাপ করিয়া বৈদর্ভী কর্ত্তব্য চিন্তা করিলেন। কাষ্ঠ সংগৃহীত হইল, চিতা নির্ম্মিত হইল, বৈদর্ভী অনুমৃতা হইবেন। একজন পরমজ্ঞানী ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি রাজা মলয়ধ্বজের সখা, হঠাৎ সেই ব্রাহ্মণ আসিয়া বৈদর্ভীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের কথা বড়ই মিষ্ট। তিনি বৈদর্ভীকে বলিলেন,—রাজ্ঞি, আপনি কে? যে পুরুষ নিস্পন্দ অবস্থায় শুইয়া রহিয়াছেন, তিনিই বা কে? আপনি এখন শোক করিতেছেন! চিন্তা করিয়া বলুন দেখি আমিই বা কে? এখন আপনি নারী, সুন্দরী; শান্তচিত্তে চিন্তা করিয়া বলুন দেখি আমাকে কখন দেখিয়াছেন কি না, আমার সহিত এই জীবনের পূর্ব্বে কখনও একত্রে ছিলেন কি না, আমার সহিত কখনও আপনার বন্ধুতা ছিল কি না?

ব্রাহ্মণের কথায় বৈদর্ভী চিন্তা করিলেন। স্বপ্নের ন্যায় কত কথা, কত সুদূরের অতীতের কথা সন্ধ্যাকাশে তারকার প্রায় চিত্ত-আকাশে জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—আপনার কি মনে পড়ে আপনি পুরুষ ছিলেন, রাজা ছিলেন?

আপনার কি মনে পড়ে, আমি আপনার বন্ধু ছিলাম? আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সুখভোগের জন্য দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন, কত অজানা বিদেশে কত নব নব ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন? আপনার কি মনে পড়ে, আরও পূর্ব্বে, সেই আদিতে আমরা দুইজন মানস-সরোবরে দুইটি হংস ছিলাম? আমাদের গৃহ ছিল না সত্য, কিন্তু আমরা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত পূর্ণানন্দরসসম্ভোগে মত্ত ছিলাম। তাহার পর, সখে, আপনার ইচ্ছা হইল গ্রাম্যসুখ ভোগ করিব। আমাকে ত্যাগ করিলেন, সমগ্র অবনীমণ্ডল ভ্রমণ করিলেন। একটি স্ত্রীলোক একটি পুরী নির্ম্মাণ করিয়া আপনাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, আপনাকে সেই পুরীতে আবদ্ধ করিয়াছিল, ইহা কি এখনও আপনার মনে পড়িতেছে না? আপনি কি এখন বলিতে পারেন, ঐ স্ত্রীলোকটি কে? উনি মায়া। আর ঐ যে পুরী যাহাতে আপনি বাস করিয়াছিলেন, ঐ পুরীখানি কি, আপনি কি বলিতে পারেন? ভোগ করিলেন, বাস করিলেন, কত হাসিলেন কাঁদিলেন, শেষে দারুণ দুঃখিত চিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে ছাড়িয়া আসিলেন, এখন কি বলিতে পারেন, ঐ পুরী ঐ রাজত্ব, ঐ ভোগায়তন, ঐ সব কি? শুনুন আপনাকে তত্ত্বকথা বলিতেছি, শুনিলেই এখন বুঝিতে পারিবেন। ঐ নারী-কর্ত্তৃক মুগ্ধ হইয়াই আপনার এই দুর্দ্দশা। আপনি বিদর্ভরাজের কন্যা নহেন, আর ঐ বীরপুরুষও আপনার পতি নহেন। আর পূর্ব্বে যে নারী আপনাকে পতি করিয়া পুরঞ্জনী নামে পরিচিতা হইয়াছিল, সেও আপনার স্ত্রী নহে, আপনিও তাহার পতি নহেন। পূর্ব্বে ভাবিতেন আপনি পুরুষ, এখন ভাবিতেছেন আপনি নারী, ইহা মায়ার বিলাস মাত্র। সত্য কথা কি শুনিবেন?

অহং ভবান্ ন চান্যস্ত্বং ত্বমেবাহং বিচক্ষ্ব ভোঃ।
ন নৌ পশ্যন্তি কবয়শ্ছিদ্রং জাতু মনাগপি॥
যথাপুরুষ আত্মানমেকমাদর্শচক্ষুষোঃ।
দ্বিধাভূতমবেক্ষেত তথৈবান্তরমাবয়োঃ॥

তুমি আমারই স্বরূপ, আমা হইতে পৃথক্ নও, আমি তোমারই স্বরূপ, যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা জানেন আমাদের মধ্যে প্রভেদ নাই ভিন্ন ভিন্ন দর্পণে একই মানুষের প্রতিবিম্ব যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেখায়, আমাদের ভেদও ঠিক্ সেইরূপ।

মানস হংস জীব, হংস সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া নষ্ট স্মৃতি ফিরিয়া পাইলেন, শোক মোহ সমুদয় অপগত হইল।

১২। তত্ত্ব

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের চব্বিশের অধ্যায় হইতে আটাশের অধ্যায় পর্য্যন্ত, এই পাঁচ অধ্যায় পুরঞ্জনের কথা, আর উনত্রিশের অধ্যায় পুরঞ্জন কথার তত্ত্বের ব্যাখ্যা। পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী মহোদয় প্রথম পাঁচ অধ্যায়ের টীকাতেও তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সুতরাং পুরঞ্জনকথার তত্ত্বের আলোচনা সুগম ও সুখকর। শ্রীমদ্ভাগবত নিজেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শ্রীধর স্বামীও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অন্যান্য টীকাকারগণও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু, তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন না। জীবতত্ত্ব উত্তমরূপে জানা চাই। ঈশ্বর, জীব, মায়া, জগৎ ও কর্ম্ম এই পাঁচটি ব্যাপার বা তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। যাহা হইক আমরা সংক্ষেপে তত্ত্বব্যাখ্যা করিতেছি।

পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীধর স্বামী মহোদয় বলেন—

"জীবস্য বিষয়াসক্ত্যা সংসারঃ, স চ ঈশ্বরানুগ্রহান্নিবর্ত্ততি" ইতি বক্তুং বিপর্য্যয়গ্রহগৃহীতস্য সাক্ষাদ্বোধয়িতুমশক্তেঃ রাজবৃত্তান্তমিবাহ।

বিষয়াসক্তির দ্বারা জীবের সংসার হয়,ঈশ্বরের অনুগ্রহে সেই সংসারের নিবৃত্তি হয়। দেবর্ষি নারদ রাজা প্রাচীনবর্হিকে ইহাই বলিতে চাহেন। কিন্তু, রাজা প্রাচীনবর্হির এখন বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, এই বিপর্য্যয় তাঁহাকে দুষ্টগ্রহের মতো পাইয়া বসিয়াছে, কাজেই সাক্ষাৎভাবে তত্ত্বকথা বলিলে তিনি শুনিবেন না, বুঝিবেন না, কাজেই তত্ত্বকথাই এক রাজার ইতিহাসের মতো করিয়া বলা হইয়াছে।

১। পুরঞ্জন—শ্রীধর স্বামী বলেন—

স্বকর্ম্মভিঃ পুরং শরীরং জনয়তি ইতি পুরঞ্জনো জীবঃ।

নিজের কর্ম্মসমূহের দ্বারা যিনি শরীরের উৎপাদন করেন, নব নব শরীরের উৎপাদন করেন, তিনিই পুরঞ্জন। 'পুরঞ্জন' বলিতে জীবকে বুঝায়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

পুরুষং পুরঞ্জনং বিদ্যাদ্যদ্ব্যনক্ত্যাত্মনা পুরং।
এক দ্বি ত্রি চতুষ্পাদং বহুপাদমপাদকং॥

পুরঞ্জন বলিতে পুরুষকে জানিবে, তিনি পুরকে বা দেহকে (ব্যনক্তি=লিম্পতি, চেতনীকরোতি, প্রকটয়তি) লেপন করেন, প্রকটিত করেন। এই পুর বা দেহ একরূপ নহে বহুরূপ. কোনটির একটি চরণ, কোনটির দুইটি, কোনটির তিনটি, কোনটির চারিটি চরণ, কাহারও বহুচরণ, কাহারও একেবারেই চরণ নাই।

২। পুরঞ্জনের সখা। ইনি ঈশ্বর।

তস্যাবিজ্ঞাতনামাসীৎ সখাবিজ্ঞাতচেষ্টিতঃ।

তস্য=ঐ পুরঞ্জনের অবিজ্ঞাতনামা সখা ছিলেন, তিনি বিজ্ঞাতচেষ্টিত বা অবিজ্ঞাত— + চেষ্টিত। ঈশ্বর যে অবিজ্ঞাতচেষ্টিত তাহা সকলেই জানে. যদি বিজ্ঞাতচেষ্টিত বলা হয়, তাহা হইলে অর্থ হয়—বিজ্ঞাতং চেষ্টিতং জীবপ্রেরণাদিলক্ষণং যস্য জীবপারতন্ত্রস্যানুভবসিদ্ধত্বাৎ। শ্রীধরঃ। ইহার অর্থ পূর্ব্বে যথাস্থানে কথিত হইয়াছে।

যোঽবিজ্ঞাতাহৃতস্তস্য পুরুষস্য সখেশ্বরঃ।
যন্ন বিজ্ঞায়তেপুংভির্নামভির্বা ক্রিয়াগুণৈঃ॥

যাঁহাকে অবিজ্ঞাত বলা হইয়াছে, তিনি ঈশ্বর। তিনি ঐ পুরুষের সখা। নাম ক্রিয়া বা গুণের দ্বারা কেহই তাঁহাকে জানিতে পারে না।

৩। পুরঞ্জন অর্থাৎ জীব যে পুর বা দেহ অন্বেষণ করিতেছে, তাহা বেদেই আছে। নানা জীবের দেহ নানারূপ, কিন্তু পুরুষের অন্য কোন দেহেই তৃপ্তি হইতেছে না। শ্রীধর স্বামী মহোদয় তাঁহার টীকায় বেদের বচন উদ্ধার করিয়াছেন।

তাভ্যোগামানয়ৎ তা আব্রুবন্ন বৈ নোঽয়মলমিতি তাভ্যোঽশ্বমানয়ত্তা অব্রুবন্ন বৈ নোঽয়মলমিতি।

তাহাদিগকে গরুর দেহ দেওয়া হইল, তাহারা বলিল, ইহা নহে, ইহাতে হইবে না। বেদ বলেন, শেষে যখন মানবদেহ, দেওয়া হইল, তখন তাহার তুষ্টি ও তৃপ্তি হইল। পুরঞ্জনেরও ঠিক্ তাহাই।

যদা জিঘৃক্ষণ্ পুরুষঃ কাৎর্স্ন্যেন প্রকৃতেগুর্ণান্।
নবদ্বারং দ্বিহস্তাঙ্ঘ্রি তত্রামন্থত সাধ্বিতি॥

পুরুষের যে বাসনার শেষ নাই, বাসনার তৃপ্তি নাই, প্রকৃতির সমুদয় গুণ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবার তাহার ইচ্ছা। কোন্ পুরের দ্বারা বা দেহের দ্বারা এই ইচ্ছা পূর্ণ করা যায়? দুই হস্ত. দুই পদ ও নবদ্বারযুক্ত যে মানবদেহ, সেই মানবদেহের দ্বারাই ইহা সম্ভব। এইজন্য পুরুষ এই মানব দেহকে 'সাধু' (উত্তম বা উপযুক্ত) বলিয়া মান্য করিলেন।

সৃষ্টিতত্ত্বের এই রহস্যের সহিত "সর্ব্বোত্তম নরলীলা"র সম্বন্ধ আছে। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কোন গুপ্তশাখায় বা সাধকমণ্ডলীতে একটি গানের বা শিক্ষার প্রচলন আছে—"শুষিব শুষিব প্রেম সকলই শুষিব। প্রকৃতির অঙ্গে এক বিন্দু না রাখিব।" ইহারও ভিতরকার গূঢ় অর্থ এইরূপ।

হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণে ভারতবর্ষ কর্ম্মক্ষেত্র বা কর্ম্মভূমি নামে পরিচিত। অন্যান্য দ্বীপ বা বর্ষ অপেক্ষা জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত এই ভারতবর্ষের মনুষ্য-দেহই ভোগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত, অন্ততঃপক্ষে কোন সময়ে অধিকতর উপযুক্ত ছিল। (এখনও তাহার সে শ্রেষ্ঠতা আছে কি না বলা যায় না।) এই কারণে পুরঞ্জন ভারতবর্ষে মনুষ্য-দেহ লাভ করিলেন।

৪। পুরঞ্জন যে প্রমদার সাহায্যে এই পুর বা দেহ পাইলেন এবং যে প্রমদার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া শত বৎসর বাস করিলেন, সেই প্রমদা কে?

বুদ্ধিন্তু প্রমদাং বিদ্যান্মমাহমিতি যৎকৃতং।
যামধিষ্ঠায় দেহেঽস্মিন্ পুমান্ভুঙ্‌ক্তেঽক্ষভির্গুণান্॥

এই প্রমদা বুদ্ধি। এই বুদ্ধির দ্বারাই 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ বোধ হইয়া থাকে। পুরুষ ঐ বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত হইয়া এই দেহে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা প্রকৃতির গুণ-সমূহ ভোগ করিয়া থাকেন।

৫। উপবনের মধ্যে পুরঞ্জন যখন প্রমদাকে দেখিলেন, তখন দেখিলেন প্রমদার সহিত দশজন ভৃত্য, এই ভৃত্যগণের প্রত্যেকের শত শত নায়িকা। এই দশ ভৃত্য দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। জীবের জ্ঞান ও কর্ম্ম এই ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অনেকগুলি করিয়া বৃত্তি, ইহারাই নায়িকা। পঞ্চশিরা সর্প, যিনি প্রহরীর কাজ করেন, তিনি প্রাণ। তাঁহারও পাঁচ-প্রকারের বৃত্তি, এইজন্য তিনি পঞ্চশির। একজন একাদশ ব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে,

তাহাকে নায়ক বলা হইয়াছে, আবার তাহাকে অতিশয় বলবান্ বলা হইয়াছে, ইনি মন, মনই ইন্দ্রিয়গণের নায়ক। পুরঞ্জন যে দেশে রাজা হইলেন তাহার নাম পঞ্চালদেশ। শব্দ প্রভৃতি পাঁচটি বিষয়ই এই পঞ্চাল দেশ। এই পঞ্চ বিষয়ের মধ্যেই নবদ্বার পুর বিদ্যমান বা দেহ ক্রিয়ান্বিত।

সখায় ইন্দ্রিয়গণা জ্ঞানং কর্ম্ম চ সৎকৃতং।
সখ্যস্তদ্বৃত্তয়ঃ প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তির্যথোরগঃ॥
বৃহদ্বলং মনোবিদ্যাদুভয়েন্দ্রিয়নায়কং।
পঞ্চালা পঞ্চবিষয়া যন্মধ্যে নব খং পুরঃ॥

৬। পুরের নয়টি দ্বার। দুই চক্ষু, দুই নাসিকা, দুই কর্ণ, মুখ, পায়ু, উপস্থ। ইন্দ্রিয়যুক্ত আত্মা ঐ নয়টি দ্বারের দ্বারা বাহিরে গমন করেন। এই নয়টি দ্বারের মধ্যে পাঁচটি পূর্ব্বদিকে, দুইটি চক্ষু, দুই নাসিকা ও মুখ। দক্ষিণে দক্ষিণ কর্ণ, বামে বাম কর্ণ, আর পশ্চিমে দুইটি অধোদ্বার পায়ু ও উপস্থ। শ্রীমদ্ভাগবতে এই দ্বারগুলির কয়েকটি বিশিষ্ট নাম আছে। নেত্রদ্বয়ের নাম 'খদ্যোতাবির্মুখী'—তাহাতে রূপের প্রকাশ হয়। নাসিকাদ্বয়ের নাম নলিনী ও নালিনী। মুখের নাম বিপন। দক্ষিণ কর্ণের নাম পিতৃহূ, বাম কর্ণের নাম দেবহূ। শাস্ত্র দ্বিবিধ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-বিষয়ক। প্রবৃত্তি-শাস্ত্র পিতৃলোক-প্রাপক অতএব পিতৃযান, আর নিবৃত্তি-শাস্ত্র দেবলোক-প্রাপক, অতএব দেবযান।

পুরের দ্বার-সমূহের বর্ণনা-প্রসঙ্গে পশ্চিম দিকের একটি দ্বারকে আসুরী বলা হইয়াছে। এই দ্বারটি শিশ্ন, ইহার দ্বারা গ্রাম্যবিষয় বা ব্যবায়ের ভোগ হয়। দুইটি দ্বার অন্ধ, ইহারা হস্ত ও পদ। এই দুই দ্বারের সাহায্যে গমন ও কর্ম্ম হইয়া থাকে। পুরঞ্জন কখন কখন অন্তঃপুরে গমন করেন, এই অন্তঃপুরই হৃদয়। এই হৃদয়ে মনের সহিত তাঁহার সঙ্গ হয়, সেই সঙ্গের ফলে পুরঞ্জন মোহ হর্ষ প্রসাদ প্রভৃতি লাভ করেন।

অন্তপুরঞ্চ হৃদয়ং বিষুচির্মন উচ্যতে।
তত্র মোহং প্রসাদং বা হর্ষং প্রাপ্নোতি তদ্গুণৈঃ॥

সত্ত্ব রজঃ তমঃ প্রকৃতির এই তিন গুণ, মোহ হর্ষ বা প্রসাদ এই তিন গুণের দ্বারাই হইয়া

থাকে। এই তিন গুণ মনে বিদ্যমান, সুতরাং মনের সহিত মিলন বা একাত্মতা না হইলে জীবের ভিতর হর্ষশোকাদির ক্রিয়া হইতে পারে না।

পুরঞ্জনের উপাখ্যানে দেহতত্ত্ব অতিশয় সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দেহতত্ত্বের ভিতর প্রবেশ করা প্রয়োজন। দেহতত্ত্বই আত্মতত্ত্ব। আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা মোটামুটি উপলব্ধি বা প্রবেশ না থাকিলে মানুষ ধারণা ও ধ্যানরূপ মানস কর্ম্ম করিতে পারে না, লীলাতত্ত্বও বুঝিতে পারে না, তাহার লীলা স্মরণও হয় না। এই কারণে শ্রীমদ্ভাগবতে নানাস্থানে নানাপ্রকারে এই আত্মতত্ত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে। নারদের উপদেশই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাণস্বরূপ, আর এই পুরঞ্জন-কথার নারদই বক্তা বা উপদেষ্টা। সুতরাং, ইহা যে কত মূল্যবান্, তাহা আর আমরা কি বলিব? আত্মতত্ত্বে প্রবেশ করিতে হইলে তিনটি প্রধান জিনিস বুঝিতে হইবে। আমরা অনেকদিনের চিন্তার ফলে এই তিনটি জিনিস যেমনভাবে বুঝিয়াছি, তাহাই ব্যক্ত করিতেছি। এই ব্যাখ্যা সার্ব্বজনীন। এই ব্যাখ্যাটি উপলব্ধি করিলে আমাদের ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানের বর্ণনামূলক যাবতীয় শাস্ত্রের ভিতরেই প্রবেশ করা যাইবে। যে তিনটি তত্ত্বের কথা বলা হইল, তাহাদের নাম

১৩। আত্মা, বুদ্ধি, মন।

আত্মা বলিতে জীবাত্মা বুঝাইতেছে। ইনি পরমাত্মা পরব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদ সম্বন্ধ-যুক্ত। আত্মা কি? দর্শনশাস্ত্র বা মনোবিজ্ঞান অনেকেই ইংরাজীতে পড়িয়াছেন। আমাদের মনে হয় দর্শনশাস্ত্র বা তত্ত্বশাস্ত্র (Metaphysics) বা মনস্তত্ত্ব (psychology) আমাদের দেশে যাঁহারা কিছু কিছু সত্য করিয়া শিখিয়াছেন বা পড়িয়াছেন বা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ইংরাজী-নবিশ। ইহাতে দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। তত্ত্ব বড়ই দুরূহ জিনিষ, সেকালের ঋষিরা, যোগীরা, ভক্ত, জ্ঞানী ও সাধুরা তত্ত্বদর্শী বা তত্ত্ববিৎ ছিলেন। তত্ত্বরাজ্যে তাঁহারা আজও জগতের গুরু। কিন্তু, এই তত্ত্বকে বিশ্লেষণ-কারিণী বুদ্ধির দ্বারা (By the analytical mind) বিশদভাবে তুলনাযোগে (Comparatively) ব্যাখ্যা করার শক্তি বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে খুব বাড়িয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশের দার্শনিকগণ ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ এই কার্য্যকরী বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করিয়াছেন। বিদ্যা এক, তত্ত্ব এক, সত্য এক, জীবন এক, জীবনের

লক্ষ্য এক, পরমার্থও এক। তাহার জাতি নাই। সুতরাং আমাদেরই জিনিস, অতিপ্রিয় ও অতি মূল্যবান জিনিস, যাহা পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাল করিয়া বুঝা যায় বা বুঝানো যায়, তাহা বুঝিতে বা বুঝাইতে পাশ্চাত্য পদ্ধতির বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা দূষণীয় নহে, বরং সর্ব্বথা ব্যবস্থেয়।

আত্মা কি! Atma is consciousness of self, the great "I am"—the spiritual self in itself. যাহা কিছুর বোধ হইতেছে, বাহিরে বা ভিতরে যাহা কিছু আছে বলিয়া মনে হয়, কিছুক্ষণের জন্য সমুদয় ভুলিয়া স্থির হও, শান্ত হও। নাই, নাই, নেতি নেতি, দৃঢ়রূপে ভাবিতে ভাবিতে নিজের ভিতর ডুবিয়া যাও। নাই কিছুই নাই। রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ শব্দ কিছুই নাই। আকাশ পর্ব্বত নদী সমুদ্র সূর্য্য চন্দ্র দিবা রাত্রি, দেশ কাল পুত্র মিত্র, দেহ ইন্দ্রিয় কিছুই নাই। নাই, নাই, সুখ দুঃখ জীবন মরণ হাসি কান্না কাম ক্রোধ প্রীতি অপ্রীতি কিছুই নাই। নাই, কিছুই নাই, সব শেষ। ভাল কথা। কিন্তু, এইবার, ভাই ভাব দেখি, আমি নাই। সত্য করিয়া ভাবিবে, শেখা কথা বলিবে না। আর পারিবে না। যত ভাবিবে আমি নাই, ততই ঐ 'আমি', বিশুদ্ধ আমি, সৎ আমি, আধ্যাত্মিক আমি, উজ্জ্বল হইয়া জাগিয়া উঠিবে। এই 'আমি'কে বল আত্মা। কিন্তু, ইহার নাম "নিষেধাত্মক অনুভব (Negative conception), কিন্তু প্রথমে ইহাই প্রয়োজন। নিষেধাত্মক অনুভবকে আমরা বলি, অভাবাত্মক অনুভব। এই অনুভবে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ইহাই প্রকৃত শান্তিপুর, ইহাই আমাদের অদ্বৈততত্ত্ব। এইবার ভাবাত্মক অনুভব আরম্ভ করা যাউক।

In its positive aspect Atma is the will in man. শক্তিকে যদি বাদ দেন, শক্তি শুনিলেই যদি ভয় হয়, তাহা হইলে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই, কারণ সে আলোচনা মিথ্যা একেবারে মিথ্যা, তাহার কোন মূল্য নাই, সার্থকতা নাই। মানিয়া লও, শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, স্বীকার কর শক্তি-ছাড়া শক্তিমান্-সম্বন্ধে কোন-কিছু মোটেই ভাবা যায় না। শক্তির প্রথম ইচ্ছা শক্তি, ইহাই আদি, ইহাই মূল। 'আত্মা' The great "I am" কি করিতেছেন? কেবল ইচ্ছা করিতেছেন? কি ইচ্ছা করিতেছেন? আমাকে বাড়িয়া উঠিতে হইবে—'অনু চাহে বিভু হইতে, অথবা বিভুর হইতে। বাড়িয়া উঠিতে হইবে, কিন্তু নিজের দ্বারা, স্বাধীনভাবে। বাহিরের কোন কিছু নাই, থাকিলেও তাহার

আনুগত্য করিব না, তাহাকে আয়ত্ত করিব, বশীভূত করিব। আমি, আমি ; কিন্তু শেষ আমি নহি, চরম আমি নহি, পরম আমি নহি। আমাকে সেই চরম আমি পরম আমি হইতে হইবে। ইহাই বিশুদ্ধ বা অবিমিশ্র ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া, ইহাই আত্মার ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম বা শক্তির সাহায্যে 'আত্মোপলব্ধি' করিতে হইবে। The will in man shows itself in man's restless desire for ever greater and greater independence of his environment and ever greater and greater control over it.

আমরা সকলেই 'ক্রমবিকাশবাদ' জানি ও ক্রমবিকাশ মানি। বিশ্বের বা জীবনের যত গতি, চাঞ্চল্য, চেষ্টা বা পরিবর্ত্তন এই বিকাশের জন্য। কে যেন অব্যক্ত, লুক্কায়িত আছে, সে যেন ব্যক্ত হইবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টান্বিত। বিরামবিহীন এই চেষ্টা। এই চেষ্টাকে ইংরাজীতে বলে Evolutionary urge বা creative Impulse ইহাই ঐ বিশুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি, ইহাই আত্মার ধর্ম্ম The urge behind the evolution of man into God—that is to say, into his own full stature.

ভাবিয়া দেখুন, পুরঞ্জনের ভিতর ইহা ছিল কি না? নিশ্চয়ই ছিল। তবে পুরঞ্জনের সম্মুখে দুইটি পথ ছিল। কারণ পুরঞ্জনের এক সখা ছিলেন, পুরঞ্জনের সঙ্গেই ছিলেন, পুরঞ্জনের সহিত সখ্যসূত্রে বাঁধা হইয়া তাঁহার অতি আপনার জন হইয়াছিলেন। কিন্তু, পুরঞ্জন তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না, চিনিতে পারিলেন না, তাঁহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেন না। পারে না, কেহই পারে না, বিশ্বসৃষ্টির নিয়ম অনুসারেই পারে না। সৃষ্টির গতি যে বহির্মুখী, কাজেই পুরঞ্জন তাঁহার সখাকে ছাড়িলেন, ভুলিলেন, ভুলিয়াই থাকিলেন, সখাও কিছু বলিলেন না। বলুন দেখি, সখা কেন কিছু বলিলেন না? বলিয়া কি হইবে? তিনি যে সখা, তিনি ভীরু অজ্ঞানের পূজা চাহেন না, তিনি স্বাধীন হৃদয়ের প্রেম চাহেন, তিনি passive reverence চাহেন না, তিনি active and free achievement চাহেন। সুতরাং সখার সহিষ্ণুতা অপরিসীম, তিনি আছেন, সব দেখিতেছেন সময় হইলে তিনি আসিবেন। যাও, তুমি পুরঞ্জন এখন যাও, প্রকৃতির ক্ষেত্রে গিয়া প্রকৃতির গুণ ভোগ কর, তাহার পর সময় হইলে আবার দেখা হইবে, আবার মিলন হইবে। ইহাই চিরসখার বাণী যাহা বলা হইল তাহার শেষ কথা ইচ্ছাশক্তিই আত্মার ধর্ম্ম, স্বরূপে এই

শক্তির প্রেরণায় আমি বড় হইতে চাই, স্বাধীন হইতে চাই। এই আত্মাই মানবকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছে। It gives us our Ideal of Freedom.

কিন্তু, কোথা বা সে 'স্ব' আর কোথায় বা স্বাধীনতা। "ষড়রিপু-ক্রীতদাস, গলে লালসার ফাঁস, তবু স্বাধীনতা-আশ হায়রে কি বিড়ম্বনা !"

এইবার বুদ্ধির কথা। আত্মা যখন নামিবেন, স্বরূপ-ভ্রষ্ট হইয়া বাহিরের পথে ছুটিয়া সংসারে ডুবিবেন, তখনও তাঁহাকে এই বুদ্ধির মধ্য দিয়া, এই বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত হইয়া নামিতে হইবে। আবার চরমে নামিয়া যখন উঠিবেন, তখন এই বুদ্ধির সাহায্যেই উঠিবেন। তাই কবি বলেন—"যে মাটিতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধ'রে"। বুদ্ধির এই দ্বিবিধভাব বা প্রকাশ মনে রাখিতে হইবে।

বুদ্ধি কি ? Buddhi is consciousness of life in others.

প্রাণের কাঙাল, প্রাণের ভিখারী, ঘুরি শুধু প্রাণ খুঁজিয়া।
ক্ষুদ্র প্রাণটুকু, চাহি মহাপ্রাণ, বাহিরে চলেছে ছুটিয়া ॥
কই কই প্রাণ, কোথায় সে প্রাণ, কে দিবে সন্ধান বলিয়া।
যেখানেতে ভাবে, আছে বুঝি প্রাণ, সেইখানে যায় চলিয়া ॥
প্রাণ বাঁচাইতে, প্রাণ বাড়াইতে, চাহে মহাপ্রাণ হইতে।
প্রাণে প্রাণে তাই, মিশাইতে চাই, প্রাণ ছুটিয়াছে জগতে ॥

অন্যত্র প্রাণের সন্ধান বা পরিচয় পাওয়াই বুদ্ধির ধর্ম্ম। ইহাই প্রকৃত জ্ঞানশক্তি। ইংরাজীতে wisdom কথাটির দ্বারা ইহা ব্যক্ত করা চলে। প্রকৃত জ্ঞানীলোক (wise man) কে ? যে ব্যক্তি সংসারের কাজকর্ম্মে বা ব্যবহারে সর্ব্বদাই অপরের প্রাণের অবস্থা ঠিক্‌মত ধরিতে পারেন, স্বভাবতঃই বুঝিতে পারেন, তিনিই জ্ঞানী, প্রকৃত বুদ্ধিমান তিনি। Knowledge বলিলে সংবাদ বুঝায়, সংবাদবিদের মাথা যাদুঘরের মতো নানারকমের খবরে বোঝাই। কিন্তু, তাহার সানুভূতি বা 'অনুকম্পা' নাই। ভাগবত-ধর্ম্মের সাধনায়, এই 'অনুকম্পা' বড়ই প্রয়োজনীয় বৃত্তি। ইহা বুদ্ধিরই প্রকাশ। এই বুদ্ধি বা অনুকম্পার দ্বারাই মানুষ বিশ্বের সকলের সহিত একাত্মতা লাভ করিয়া ধন্য হয়, অমৃত হয়। এই বুদ্ধি বা অনুকম্পাকে প্রাণ বলিতে পারেন। আমার নিজের দেহছাড়া অন্যের বা অন্যান্য সকলের ভিতরে আমারই প্রাণ রহিয়াছে, ইহারই

সুস্পষ্ট অনুভবের (direct recognition) নাম প্রেম। "ঠিক নিজেরই মতো করিয়া তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসিও" "এই ব্যক্তি আমার নিজ জন, আর এই ব্যক্তি আমার পর, এই প্রকারের গণনা লঘুচিত্ত লোকের গণনা ; উদারচরিত্রের নিকট বসুধাই কুটুম্ব" এই সব প্রাচীন শিক্ষা প্রেমের দ্বারাই জীবনে সত্য হয়, সফল হয়। যুক্তি, তর্ক বা বিচারের ইহা অগোচর, ইহা হৃদয়ের একটি উল্লাসময় জাগরণ (feeling)। ইহাকে প্রজ্ঞান বা Intuition বলুন। ইহাই আমাদের একাত্মতা লাভের আদর্শ বা প্রেরণা। আমরা বিশ্বের সকলকে আপনার করিয়া বিশ্বের সকলের আপনার হইতে চাই, ইহা এই বুদ্ধিরই তাড়নায়।

সুখসাধনের অভিলাষে বাহির হইয়া নানাবিধ জীবদেহ আশ্রয় করিয়া যখন পুরঞ্জনের তৃপ্তি হইল না, তখন কর্ম্মভূমিতে আসিয়া এক মনের মতো পুরী দেখিলেন, পুরীর বাহিরে সুরম্য উপবনে এক সুন্দরী নবীনা যুবতী দেখিলেন। এই নবীনা যুবতীই ঐ পুরীর অধিশ্বরী, পুরঞ্জন তাঁহার স্বামী হইয়া ঐ পুরী ভোগ করিতে লাগিলেন। ইহাই পুরঞ্জনের 'নরলীলা'র বা মানবজীবনের প্রথম অধ্যায়। এই যে সুন্দরী যুবতী, শাস্ত্র বলিতেছেন, ইনিই বুদ্ধি। পুরঞ্জন ঐ নারীকে বিবাহ করিলেন কথার অর্থ, আত্মা বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত হইলেন বা ইচ্ছাশক্তির সহিত জ্ঞানশক্তির মিলন হইল। মন্দ কি ? ভালই হইল। ভাল হইল না, মন্দ হইল। কিন্তু, ভাল হইতে পারিত। কেন ভাল হইল না, কি হইলে ভাল হইতে পারিত, তাহা পরে বলিব। বিবাহের পর পুরঞ্জনের কি হইল ?

শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন—

এবং কর্ম্মসু সংসক্তঃ কামাত্মা বঞ্চিতোঽবুধঃ।
মহিষী যদ্‌যদীহেত তত্তদেবান্ববর্ত্তত ॥

পুরঞ্জন কর্ম্মসমূহে সংসক্ত হইলেন, কামাত্মা হইলেন, বঞ্চিত হইলেন, অবুধ বা জ্ঞানশূন্য হইলেন। ফলে মহিষী যাহা যাহা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহারই অনুবর্ত্তন করেন।

সে আবার কেমন ?

কচিৎ পিবন্ত্যাং পিবতি মদিরাং মদবিহ্বলঃ।
অশ্নন্ত্যাং কচিদশ্নাতি যক্ষন্ত্যাং সহ যক্ষিতি ॥

ক্বচিদ্গায়তি গায়ন্ত্যাং রুদন্ত্যাং রোদিতি ক্বচিৎ।
ক্বচিদ্ধসন্ত্যাং হসতি জল্পন্ত্যামনুজল্পতি।
ক্বচিদ্ধাবতি ধাবন্ত্যাঃ তিষ্ঠন্ত্যামনুতিষ্ঠতি।
অনুশেতে শয়ানায়ামন্বাস্তে ক্বচিদাসতীং॥
ক্বচিৎ শৃণোতি শৃণ্বন্ত্যাং পশ্যন্ত্যামনুপশ্যতি।
ক্বচিৎ জিঘ্রতি জিঘ্রন্ত্যাং স্পৃশন্ত্যাং স্পৃশতি ক্বচিৎ॥
ক্বচিচ্চ শোচতীং জায়ামনুশোচতি দীনবৎ।
অনুহৃষ্যতি হৃষন্ত্যাং মুদিতামনুমোদতে॥

প্রেয়সী মদ্যপান করিলে, নিজেই যেন মদ খাইলেন ভাবিয়া বিহ্বল হইয়া পড়েন। খাইলে খান, যাইলে যান ইত্যাদি ইত্যাদি। (অনুবাদ পূর্ব্বে উপাখ্যানাংশে দেওয়া হইয়াছে।)

এক কথায়—

বিপ্রলব্ধো মহিষ্যৈবং সর্ব্বপ্রকৃতিবঞ্চিতঃ।
নেচ্ছন্নমু করোত্যজ্ঞ ক্লৈব্যাৎ ক্রীড়ামৃগো যথা॥

পুরঞ্জন এই প্রকারে মহিষী-কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া নিজের অসঙ্গত্বাদি প্রকৃতি হারাইয়া এমন পরতন্ত্র হইলেন যে ইচ্ছা না থাকিলেও ক্লীবত্ব-প্রযুক্ত অজ্ঞ ক্রীড়ামৃগের ন্যায় বনিতার অনুকরণ করেন।

শেষের শ্লোকটি ছাব্বিশের অধ্যায়ের শেষ শ্লোক বা উপসংহার। পুরঞ্জনের ভাল হইতে পারিত, কিন্তু আপাততঃ তাহা হইল না। কেন হইল না, তাহা পরে বলিব বলিয়াছি। এই শ্লোকেই তাহা রহিয়াছে। হাসিলে হাসুন কাঁদিলে কাঁদুন, মন্দ কি? তাহা তো খেলা হইতে পারে। কিন্তু, খেলা করিতে গেলে স্বতন্ত্রতা থাকা চাই, পুরঞ্জন যে পরতন্ত্র হইলেন। পুরঞ্জন যদি তাঁহার সখাকে সঙ্গে আনিতেন, কেহ কেহ বলেন তাহা হইল হইত। কেহ কেহ বলেন তাহা হইত না, কারণ তাহা হয় না। স্বাতন্ত্র্য কেবল ঈশ্বরেই সম্ভব, জীবে নহে। শ্রীশ্রীরাসলীলার টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী মহোদয় "ইত্যাদিষু স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ কেন বলিয়াছেন, এইখানেই তাহা বুঝিয়া লইবেন।

পুরঞ্জনের এই প্রেয়সীই বুদ্ধি। শ্রীমদ্ভাগবত ইহার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার সময় বলিলেন—

যথা যথা বিক্রিয়তে গুণাক্তো বিকরোতি বা।
তথা তথোপদ্রষ্টাত্মা তদ্বৃত্তীরনুকার্যতে॥ ৪ ২৯—১৫

স্বপ্নাবস্থায় বুদ্ধি বিকারপ্রাপ্ত হয়, (বিক্রিয়তে) আর জাগ্রত অবস্থায় বিকার ঘটায় (বিকরোতি), এই বিকার যেমন যেমন হয় গুণাক্ত আত্মা বুদ্ধির গুণে লিপ্ত বা বুদ্ধির গুণের সহিত একত্বপ্রাপ্ত উপদ্রষ্টা যে আত্মা তিনিও সেই সেই প্রকারে বিকারপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বুদ্ধির কথা কিছু বলা হইল, এইবার মনের কথা বলিতে হইবে। পুরঞ্জনের সহিত প্রমদাসুন্দরীর বা বুদ্ধির যখন প্রথম দেখা হয়, তখন পুরঞ্জন দেখিয়াছিলেন, সুন্দরীর দশজন ভৃত্য আর দশজন ভৃত্যের একজন অতি বলবান নায়ক। এই নায়ক একাদশ। ইনিই মন, ইনি ইন্দ্রিয়ের রাজা এবং বুদ্ধির ভৃত্য। ইনি যখন বুদ্ধির ভৃত্য তখন ইহার এক অবস্থা, আর যখন কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়েরই রাজা তখন ইহার আর একরূপ অবস্থা। এই দুই অবস্থাকে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ অবস্থা বা সঙ্কল্পাত্মক ও বিকল্পাত্মক অবস্থা বলা হইয়াছে। অশুদ্ধ বিকল্পাত্মক মনকে 'কামমনস' ও বলা হয়। পুরঞ্জন যখন অন্তঃপুরে যাইতেন তখন এই মনের সহিত বেশ ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার মেশামেশি হইত. এ-কথা উপাখ্যানে বলা হইয়াছে। পুরঞ্জন বুদ্ধির আশ্রয়ে অনেক দিন ছিলেন, সেখানে বাহিরের বিষয়ের আগমন আছে, কিন্তু পুরঞ্জন এতদিন বাহিরে যান নাই। যতদিন তিনি কতকটা ভিতরেই ছিলেন, বুদ্ধির আশ্রয়ে ছিলেন, ততদিন তিনি একরূপ ভালই ছিলেন। কিন্তু, এই অবস্থায় থাকিতে পারিলেন না। মনের সহিত তাঁহার মিত্রতা হইল আর মনকে সেনাপতি করিয়া তিনি মৃগয়ায় বাহির হইলেন। এই মৃগয়া তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়।

এইখানে মনের কথা বলা আবশ্যক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আত্মা consciousness of self, বুদ্ধি conciousness of life in others. আর মন? Manas is the consciousness of things. বাহিরে বস্তু আছে, বিষয় আছে, অগণ্য ও অসংখ্য বাহিরের এই বৈচিত্র্যের যে বোধ তাহারই নাম মনঃ। বলিতে পারেন It is the

thinking mind in man, the principle whereby he is related to the objective world. যে তত্ত্ব, যে শক্তি বা যে বৃত্তির দ্বারা বাহিরের বস্তুময় জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেই চিন্তাময় [উপলব্ধি (perception), বিশ্লেষণ ও বিচারণা (discrimination) ও নির্দ্ধারণ-(Judgement) ময়] বোধের নাম মনঃ।

চিন্তার একটি ভাবাত্মিকা শক্তি (positive power) আছে। তাহা মনেরই ধর্ম্ম। বাহিরের বস্তুময় জগতের উপরে মানুষের যে আধিপত্য তাহা এই শক্তির দ্বারাই হইয়া থাকে। যোগবাশিষ্টে আছে, যাহা সৎ ও অসতের,—চিৎ ও জড়ের মধ্যবর্ত্তী, তাহারই নাম মনঃ। সৎ ও চিৎ বলিলে ভাবময় অন্তর্জগৎ (The subjective world) বুঝায়, আর অসৎ বা জড় বলিলে বস্তুময় বহির্জগৎ (The objective world) বুঝায়। অগ্নির ধর্ম্ম যেমন উষ্ণতা, মনের ধর্ম্ম সেইরূপ চঞ্চলতা।

আত্মা বুদ্ধি ও মন, তিনই চৈতন্যময়—ইহার চৈতন্যের ত্রিবিধ প্রকাশ বলিয়া বুঝিতে হইবে—Three aspects of consciousness. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগতের জ্ঞানের সাহায্যে এই তত্ত্বগুলিকে বুঝাইতে যাওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার।

পুরঞ্জনের মৃগয়া। পুরঞ্জন রথে চড়িয়া মৃগয়ায় বাহির হইলেন। যাইবার সময় তাঁহার প্রাণ-প্রেয়সীর অনুমতি গ্রহণ করেন নাই। পুরঞ্জন যে রথে চড়িয়া গেলেন, সে রথখানি কেমন ?

দেহোরথস্ত্বিন্দ্রিয়াশ্বঃ সম্বৎসরয়ো গতিঃ।
দ্বিকর্ম্মচক্রস্ত্রিগুণ ধ্বজঃ পঞ্চাসুবন্ধুরঃ॥
মনোরশ্মির্বুদ্ধিসূতো হৃন্নীড়োদ্বন্দ্বকুবরঃ।
পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থ প্রক্ষেপঃ সপ্তধাতুবরূথকঃ॥
আকুতির্বিক্রমো বাহ্যো মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি।
একাদশেন্দ্রিয়চমূঃ পঞ্চসূনা বিনোদকৃৎ॥

দেহ রথ, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব, সম্বৎসরের তুল্য বেগ ; পাপ ও পুণ্য, এই দুই কর্ম্ম রথের দুই চক্র, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণ রথের ধ্বজা, পঞ্চ প্রাণ পাঁচটি বন্ধন। মন রশ্মি, বুদ্ধি সারথী, হৃদয় নীড় অর্থাৎ রথীর বসিবার স্থান। শোক ও মোহ, দুইটি যুগন্ধর (জোঁয়াল) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ইন্দ্রিয়ের এই পঞ্চবিষয় প্রক্ষেপ, সপ্তধাতু কবচ।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় বিক্রম, একাদশ ইন্দ্রিয় সেনানী। মৃগয়া আর কিছুই নহে, মৃগতৃষ্ণার অনুসরণ, পঞ্চসূনা অর্থাৎ পঞ্চবিধ নিত্যপাপাচরণই এই মৃগয়ার আমোদ।

রথের গতি-সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীধরস্বামী বলিলেন "বস্তুতস্তু অগতিঃ। স্বপ্নশরীরা· দেবুর্দ্ধারেব নিবৃত্তত্বেন দেশান্তরগত্যভাবাৎ" প্রকৃত প্রস্তাবে গতি নাই, স্বপ্নশরীরাদির বুদ্ধিতেই নিবৃত্তি, সুতরাং দেশান্তর গমন হইতে পারে না।

পুরঞ্জনের এই মৃগয়া সম্বন্ধে আরও কিছু ভাবিবার ও বুঝিবার আছে। এই মৃগয়া স্বপ্নাবস্থা। এই অবস্থায়—

সদ্বুদ্ধি-ত্যাগযোগাভ্যাং সংসৃতিঃ সা প্রপঞ্চতে। শ্রীধরঃ। বিশ্বনাথ বলেন

ধার্ম্মিকস্যাপি জীবস্য দৈবাত্তামসভাবত।
ষড়্‌বিংশে সদ্ধিয়স্ত্যাগঃ পুনঃ প্রাপ্তিশ্চ বর্ণ্যতে॥

সদ্বুদ্ধির ত্যাগ ও যোগ, ইহাই সংসার। ধার্ম্মিক জীবেরও তামসভাবের উদয় হয়, তখন আর সদ্বুদ্ধি থাকে না, তাহার পর আবার সদ্বুদ্ধি ফিরিয়া আসে। মৃগয়াকার্য্যের দ্বারা পুরঞ্জনের এই অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। সদ্বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া পুরঞ্জন মৃগয়ায় গেলেন, নানারূপ নিষিদ্ধ ও হিংসামূলক কর্ম্ম করিলেন, তাহার পর ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার প্রেয়সী অর্থাৎ বুদ্ধি মানময়ী হইয়া ধূলিশয্যায় মলিনবেশে শুইয়া ছিলেন। পুরঞ্জন প্রথমে তাঁহাকে দেখিতেই পান নাই, কারণ তাঁহার দৃষ্টি মলিন বা আসুরিক হইয়াছিল। যাহা হউক প্রেয়সী শেষে প্রসন্না হইলেন।

মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসার পর পুরঞ্জনের জীবনের আর এক অধ্যায় বা তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল, ইহা শ্রীল শ্রীধরস্বামী মহোদয় স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন। স্বামীপাদ সাতাইশের অধ্যায়ের টীকার ভূমিকায় বলিয়াছেন "অনুনয়াদি কথাসৌন্দর্য্যেণাত্যন্তমুপাধি-বশ্যত্বমুক্তা তন্নিমিত্তাং সংসারপরম্পরাং নিরূপয়িতুমাহ ইত্থমিতি" পুরঞ্জন তাঁহার প্রেয়সীকে প্রসন্ন করিবার জন্য যেসব কথা বলিলেন, সেই সব কথা অতিশয় সুন্দর, এই সব কথা হইতে দেখা যাইতেছে পুরঞ্জন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে উপাধিবশীভূত হইয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার প্রকৃতিতে দেহাত্মবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াত্মবুদ্ধি এবং মন-আত্মবুদ্ধি খুব বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি পূর্ব্বে এই দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনকে যতটা আপনার মনে করিতেন, এখন তদপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে আপনার বলিয়া মনে করিতেছেন। তাহারই ফলে সংসার-

পরম্পরা অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদির আবির্ভাব ও তাহাদের প্রতি মমতাবন্ধন আরম্ভ হইল। শ্রীধরস্বামী আরও বলিয়াছেন "স্ত্রীপুরুষবাসনাদার্ঢ্যেন বিচিত্রা সংসৃতির্ভবতি" স্ত্রীপুরুষের বাসনার দৃঢ়তার দ্বারা বিচিত্র সংসার হইয়া থাকে। পুরঞ্জনের কামাসক্তি ও মহিষীর সহিত ক্রীড়া বর্ণিত হইয়াছে। পুরঞ্জনের পুত্র একশত। মনকে লইয়া একাদশ ইন্দ্রিয়, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের একশত করিয়া পরিণাম ধরিয়া এই সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বুদ্ধি আর মন, ইহাদের দুই প্রকার অবস্থা বা প্রকাশ। মৃগয়ার রথের বর্ণনায় বুদ্ধিকে সারথী আর মনকে রশ্মি বলা হইয়াছে। (বেদে বা উপনিষদেও ঠিক্ তাহাই আছে।—"বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনং প্রগ্রহমেব চ"।) পুরঞ্জন উপাখ্যানেই অন্যত্র আছে, বুদ্ধি প্রমদা রমণী ও প্রেয়সী, আর নায়ক ও সেনাপতি। ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের অভিমুখী হওয়ায় একই তত্ত্ব ভিন্ন ভিন্নরূপ ক্রিয়া করে, এই কথাটি সর্ব্বদাই মনে রাখা প্রয়োজন।

চণ্ডবেগ নামক কালের কথা বলা হইয়াছে, তিনি সম্বৎসর। তিনশত ষাইট্ গন্ধর্ব্ব ও গন্ধর্ব্বী দিবারাত্রি। জরা যে কালকন্যা তাহা সকলেই বোঝেন, জরার সঙ্গে সৈন্যদল নানারূপ ব্যাধি।

পুরঞ্জনের যখন মৃত্যু হয়, তখন তিনি তাঁহার প্রেয়সী ভার্য্যাকেই চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে তিনি স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হন এবং ধার্ম্মিক পিতার কন্যা ও ধার্ম্মিক পতির পত্নী হন। পুরঞ্জন নারীদেহে পরমার্থ লাভ করিলেন, ইহাও বিশেষরূপে স্মরণীয়। বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণও অনেকেই প্রার্থনা করেন, যেন আহিরীগোপের ঘরে তনয়া হইয়া জন্মাইতে পারি। ভাগবতধর্ম্মে নারীর স্থান পুরুষের অপেক্ষা উচ্চ।

কবিতা-দশক

(শ্রীনন্দনন্দনানন্দ বিরচিত)

১। উদ্বোধন

জাগো নর-নারায়ণ ভারতের ভগ্ন স্তূপশিরে,
ধর চক্র ধনু শূল গদা, শিঙ্গা শঙ্খ বাজাও গম্ভীরে।
রচ প্রেমানন্দ মঠ মানবের হৃদয়-সৈকতে,
ধর্ম্মনীতি রাজনীতি এক হবে নদীয়ার পথে!

ব্রজের মণ্ডলী তোরা কত দিন র'বি ঘুমঘোরে?
তোদের প্রতীক্ষা করি সে যে রে ভাসিছে আঁখিলোরে।
নহে প্রভু,—দাস সে যে, সেবা করে দিব্য জ্ঞান দিয়া,
যুগে যুগে আসা যাওয়া লীলারঙ্গে বেড়ায় খেলিয়া।
কৃষ্ণের কালিন্দীকূলে ছিলি তোরা ধরা চূড়া পরি'
বুদ্ধের বিহার চৈত্যে ছিলি তোরা ভিক্ষুরূপ ধরি
শঙ্কর হুঙ্কার সনে মিশাইলি কণ্ঠরবরেশ
শ্রীচৈতন্য নাম-নৃত্যে উন্মত্ত করিলি সর্ব্ব দেশ।
একা নহে লীলারস চতুর্দ্দিকে চাহে ক্ষণে ক্ষণে,
আবার সে নরলীলা উঁকি মারে বঙ্গের প্রাঙ্গণে!

জাগুক তোদের মাঝে ভারতের ভাগ্যের বিধাতা,
বিস্ময়ে চাহুক বিশ্ব দৃপ্ত রাখি বিশ্বপটে গাঁথা
এবে নহে ব্রজকেলি,—কুরুক্ষেত্রে তাথৈ তাথৈ
বিশ্বের শ্মশান মাঝে কোটি চিতা জ্বলিয়াছে ঐ!

দামামা দুন্দুভি বাজে মথুরায় কংসের তাণ্ডব,
জ্বাল আত্ম-হোমানল দহ দহ অজ্ঞান খাণ্ডব।
ভাবুক বৈষ্ণববেশে দৈত্যকুল উৎকট তান্ত্রিক
রুধি শুদ্ধ বেদপথ স্থূল তন্ত্রে ধ্বংশের পথিক।
বিশ্বেরে করিছে ভোগ— সবলে দুর্ব্বলে দলি' পায়,
ভারক্লিষ্টা বসুন্ধরা দৈত্যপদে কাতরে লুটায়।

দারিদ্র্য লাঞ্ছনা-বহ্নি অঙ্গভূষা চন্দন সুন্দর,
অপমানে অবসাদে বজ্র কর হৃদয়-কন্দর।
আত্মরথে হও রথী সম্মুখে সারথী ভগবান্
রচিতে নবীন ব্রজ বিশ্বক্ষেত্রে হও আগুয়ান্!

২। নগর কীর্ত্তন

জনক জননি সোদর সোদরা চাহ চাহ পুর-দ্বারে,
পথে পথে ঘুরে কাঁদিছে কাহারা আকুল নয়ন-ধারে।
বিশ্বের তরে বৈরাগী মোরা নিঃস্বের ঝুলি কাঁধে,
গোলোকের আলো জ্বালাইব এই ভূ-লোকের ভুল ফাঁদে।
নদীয়ার ধূলি লুটাইয়া দিব দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে,
বরজের বুলি বিলাইব মোরা মনহরা হরিনামে।
বুকে বুকে দিব নিতাইয়ের প্রেম মুখে মুখে গোরানাম,
দেশে দেশে রচি প্রেমের নদীয়া গ্রামে গ্রামে ব্রজধাম।
কহ গৌরাঙ্গ ভজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ-শিক্ষা,
ভিখারী আমরা দেহ পুরবাসী আমাদেরে এই ভিক্ষা :

৩। যুগনেতা

পরমত-সহিষ্ণু শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়,
বিহ্বল চৈতন্য-সম ভাবের লীলায়,

বিচার-কুশল যেই শঙ্কর সমান
বুদ্ধ সম শান্ত, খ্রীষ্ট সম ক্ষমাবান।
কৃষ্ণ সম সর্ব্বকর্ম্মা, রাম সম ধীর
এ যুগে সে জন হবে নেতা পৃথিবীর॥

৪। শ্যামসুন্দর

আজি মোর বিশ্ববৃন্দাবনে কেরে ওই দাঁড়াল আসিয়া
সজল শারদ প্রাতে তনুভরা রূপরাশি নিয়া;
অরুণের হিরণ কিরণে পীতাম্বর করিয়াছে আলো
মুখখানি সুকুমার নীলিমায় সাজিয়াছে ভালো।
বিনোদ তিলক ভালে নবরবি করে ঝলমল,
ঈষৎ হাসির ছটা নীলাকাশে করে টলমল।
কমরুচি শ্রীঅঙ্গের হিমস্নাত শোভায় শ্যামল
কোটি কোটি কৌস্তভরতন হৃদিমাঝে শোভে নিরমল।
ফুলে ফুলে ফুলবনু রঙে রঙে করি দিয়া আলা,
বিচিত্র বরণে রাজে বুকে বনবৈজয়ন্তী মালা।
অঙ্গের অগুরু গন্ধ উষা বায়ু দেহে সুরভিয়া
নূপুর উঠেছে বাজি' অলিডাকা বনপথ দিয়া।
ওই বাজে গুণ গুণ! মরি মরি পরাণ শিহরে
বনচারী ব্রজের দুলাল আজি ওরে গেছে ধরা পড়ে!
নিস্পন্দ নিখিল আঁখি! নেত্রতারে কি বিস্ময় ভাসে
ম্লান পূর্ণিমার চাঁদ ফিরে চায় পশ্চিম আকাশে,
অনঙ্গ-বাঞ্ছিত রূপ। যোগীন্দ্রের যোগভঙ্গকারী
কেরে ও ত্রিভঙ্গঠামে দেখে আঁখি পালটিতে নারি!
"রাধা রাধা" বাজায় বাঁশরী এ মানস-যমুনা কিনারে
চিত্ত বড় উচাটন, রাই গৃহে আজি রহিতে না পারে।

৫। মাধবী

আমের মুকুলে কোকিলের উঁকি অলিকুলে লুকোচুরি,
আকাশের আঁথে লাখে লাখে ঝরে আলোকের ফুলঝুরি।
বাতাসের সনে ব্যথার মিতালি অতীতের স্মৃতি ভাসে,
সাদা সাদা শত জলদের দলে, দলে দলে দেব হাসে।
ভুঁইচাঁপা ভাট সজিনা নজিনা কাঁপিছে পলাশ বাগে
জাগে জয়দেব অজয়ের কূলে বীরভূমি পুরোভাগে!
হিজলে বকুলে ফুলের বাহার বাঁশবনে আশ ঝরে
হালে চষা মাঠে চাষার মেঠেলি দিগালির হৃদি ভরে।
গোধূলির রাগে ধরণীর বাগে ফাগুনের আগুপথ
সাদা সাদা শত জলদের দলে দোলে মাধবীর রথ।

৬। শবসাধনা

কে মোরে শিখাবে দুঃখ-বিজয়ী অমোঘ মন্ত্রবর,
বেদনাবারণ করিব সাধন ভীত করি চরাচর।
জন্ম ভিখারী শম্ভুর মত শবাসনে সমাসীন,
গলে কালকূট চুড়ে বিষধর ফুঁসিছে রজনীদিন।
ত্রিতাপের জ্বালা ললাট বিদারি নিঃসরে ধ্বক্ ধ্বক্
দিক্‌চয় ভরি নিন্দাবহ্নি-জ্বলিতেছে লক্ লক্।
ভ্রূক্ষেপ নাহি! অটল অচল সৌম্য মুরতি-ধর
পাগল ঈশান হুংকারে বিষাণ কাঁপাইয়া চরাচর।
লহ লহ হাস অধরে প্রকাশ হৃদয়ে শান্তি ঝরে,
অম্বর হ'তে উতারি ইন্দু তপ্ত ললাটে ধরে!
কত কৌতুকে ধরেছে গঙ্গা জটাজূটজাল মাঝে
বিস্মিত চিতে হেরে চরাচর যোগীরে পাগল সাজে!

৭। ম্রিয়মাণ

যত কাঁদি কাঁদা না ফুরায়
যত গাহি গান বেড়ে যায়,
চৌদিকে আকুল আঁখি যত চাহি তত বাড়ে ভয়,
চাই আলো আসে ছায়া চাই শান্তি, জাগিছে সংশয়।
জীবনের বিচিত্র বাসরে
আত্মা ওরে স্বরূপ পাসরে !

ফুৎকারি নিভায়ে দেরে বাতি
কি ফল বিফল মালা গাঁথি !
নিবিড় তিমির মাঝে নীরবে নিজেরে কর সাথী
বহে যদি উষার পবন,
নীরবে মুদিও দুনয়ন !

নিশান্তে কে হানা দেয় দ্বারে
—কাজ নাই সম্ভাষিয়া তারে।
ভূতলে লুটায়ে তনু দীর্ণ বক্ষ কররহ শীতল
মলিন ধূলির মাঝে খুঁজি লহ শেষের সম্বল।
ও কে কাঁদে কোন নদীকূলে
ও গান নিয়োনা শ্রুতিমূলে !

৮। স্মৃতিরেশ

সুরধুনী তীরে নয়নের নীরে
হইনু আপনা হারা
রেণু রেণু দেখি আপন স্বরূপে
কাঁদিনু পাগল পারা।

কণা কণা দিয়া হৃদয়ের রস
এরূপে জীয়াল যারা
জনমে জনমে চরণ তাদের
আমার গলার হারা ;

৯। মানুষ

মানুষ আমার মনের মানুষ
হোক্ না কেন যতই পাপী
মনের মানুষ নাই মানুষে
দুখ যে ওঠে হৃদয় ছাপি।
মানুষ খুঁজে দিবা যামি
মানুষ-লোকে বেড়াই আমি
গোলোকলোকের অলখ্ মানুষ
মানুষ বেশে রূপটি ঝাঁপি।

১০। ভিখারী ভগবান্

আপনারে লয়ে দুয়ারে দুয়ারে ফিরিয়ে বাউর পারা।
এ নিখিল মাঝে কেহ নাহি মোর মুছাইতে আঁখি ধারা।
অকূল তিয়াষা অনিবাণ আশা বহিয়ে বুকের মাঝে।
কত গান গাহি আঁখি জলে নাহি' নিশীথে সকালে সাঁঝে॥
কেহ নাহি ফিরে চায়
গণি গণি গণি দিবস রজনী বিফলে জীবন যায়।
আমি নহি কারো হেলার জিনিষ
আমি নহি কারো পর।
আরেণু আব্যোম সবি যে আমার
বিশ্ব যে মোর ঘর,
ভাবের আড়ালে আপনা হারায়ে
বেড়াই আনত মুখে

জাগে না জাগে না কম্পন-রেখা,
কাহারও পাষাণ বুকে।
আপনা লইয়া কাঁদি
নয়নের নীর নয়নে শুকাই
চাঁচর নাহিক বাঁধি!
শত ঢেউ তুলি শ্যামলা মেদিনী রসের সাগরে ভাসে
কত কলরবে শ্রবণ আবরি মায়া নাচে আঁখি পাশে।
হাসি কান্নার অলাতচক্রে আপনা হারায়ে হায়
দিবা বিভাবরী কত পায় ব্যথা বুকখানি ফেটে যায়।
আমারে চাহেনা কেহ,
কপাল-লিপিতে পরবাস মোর আপন আবাস গেহ।
পুলক পসরা আঁকড়িয়া বুকে রহি আমি এক ভিতে,
যাচিয়া যাচিয়া মুখ চাহি ফিরি কেহ নাহি চায় নিতে।
মূক মুখে মোর এ কালো বরণ রসেরে আবরি রাখে,
কেহ নাহি বোঝে পরুষ ভাষায় সরোষে দহিতে থাকে।
হায় হায় হায় হায়;
আপন আলয়ে পর সম মোর জীবন বহিয়া যায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার * কলিকাতা

প্রেমময়ী রাধা

মানুষ তার প্রাণের ঠাকুরের খোঁজ খবর রাখে না। ভগবানই যুগযুগান্ত ধরে মানুষের প্রাণান্বেষণে ব্যস্ত। ব্যাকুলতায় তার বাঁশির কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে—ব্যথার মাঝেই অবসান হয় সব।

*　　*　　*　　*

দেবতার এই ব্যথাকে মুক্তি দিয়েছিল রাধা। মানবী তাই হয়েছিল দেবী! অনেক ছিল বাঁধন আর অনেক ছিল বাধা। জীর্ণপচা সংস্কারের বাধাবাঁধন খুলে—কলঙ্কেরি কঠিন বোঝা মাথার পরে তুলে—ঘরের মায়া ছিনিয়ে যখন বাহির আলোয় এল—মিথ্যা মোহের শিকল রাধার যখন খুলে গেল—তখনই তো হৃদয়েশেই হৃদয়-মাঝে পেল!

প্রবীন স্থবির সমাজ সেদিন রাধার পায়ের হয়েছিল কাঁটা!—হায়!—দেবী রাধা সেদিন ছিল কলঙ্কিনী রাই!

রাধা ছিল বিদ্রোহিনী;—সত্যপথের পথিক ছিল রাধা। তাই তো, পথের কাঁটা পারেনিক মোটেই দিতে বাধা। প্রেমময়ীর অস্ত্র ছিল প্রেম।—সেই প্রেমের তুফান ডুবিয়ে দিল সব। কিশোর কিশোরীরা তাহার হল সবাই সাথী—জ্যোৎস্না-আলোয় পূর্ণ হল পথ—ঘুচ্‌লো আঁধার রাত্তি ঝুলন দোল আর রাসের, ব্রজে চল্‌লো মাতামাতি! দেব-মানবের আনন্দেতে পূর্ণ হল সব!

জীর্ণপচা সংস্কারের খড়্‌গ তুলে দাঁড়িয়েছিল যারা—দেবতার ঐ পরশটুকুও পায়নিক' হায় তারা!............ওরে কিশোর কিশোরীরা তোদের পূজা করি—যুগে যুগে তোদের মাঝেই দেখা দেছেন হরি!

প্রেমের বড়ো সত্য যে আর নাই;—সেই প্রেমের নেশায় রাধার হিয়া যখন হল ভোর—একনিমেষেই কাট্‌লে তখন সকল বাঁধন-ডোর—মোহনিশার তখন হল ভোর!

প্রেমের সুরে গান গাওয়াতেই যমুনা যে দেখ্‌ল আপন কূলে—রাধাশ্যামের মিলন মাধুরিমা—স্বর্গমর্ত্ত্যে একসাথেতেই উঠ্‌তে নেচে দুলে! প্রেমের বড়ো সত্য কোথাও নাই;—প্রেমের বুকেই সুন্দরেরি আনন্দগান ওঠে—প্রেমের বুকেই শিব সে নাচে দোলে—প্রেমের বুকেই সত্য খেলা করে;—সত্য শিব আর সুন্দরে প্রেম একাই বুকে ধরে।

ঐ যে ঘরের মায়া—ঐ যেখানে 'শাস্ত্র' তাহার অস্ত্র তুলে সারাদিবস দাঁড়িয়ে থাকে খাড়া—আর পায়ের তলে তার হাজার নরনারীর কেবল ঝর্‌ছে অশ্রুধার—নিঠুর 'শাস্ত্র'

ক্রন্দনেও দেয় না যেথায় সাড়া—জগদ্দলন পাথর দিয়ে বন্ধ করে পথ—প্রেমের বন্যা রাধার সেদিন ভাসিয়ে দিল সব।—বিশ্বজুড়ে উঠ্‌ল রাধার কলঙ্কেরি রব—হায়!—দেবী রাধা সেদিন ছিল কলঙ্কিনী রাই!

রক্তচোখে রাধার পানে চেয়েছিল যারা—অন্ধকারেই রইল প'ড়ে তারা!…ওরে কিশোর কিশোরীরা, সত্যপথের পথিক তোরাই শুধু!—ওরে নবীন—ওরে প্রভাত, তোরাই লুটিস্ বিশ্বভরা মধু!—আর ঐ যে যত পথহারানর দল—গতি যাদের দুর্গতিতেই শেষ—শাস্ত্র পেড়ে করছে নীতির ছল—জীর্ণপচা সমাজ নিয়ে খেলছে ছিনিমিনি—অত্যাচারী কপট যত বাঘের থেকেও খল—মিথ্যাটাকেই আঁক্‌ড়ে ধরে করছে হিংসাদ্বেষ—ওদের মাঝে নেইক কোথাও আনন্দেরি লেশ—অন্ধকারেই থাক্‌ল পড়ে তারা—কাছে থেকেও দেবতা তাদের কাছেই হ'ল হারা!

আনন্দ চায় বিশ্ব ভ'রে নাচ্‌তে লুটেপুটে। সত্য যেথায় নাই—রুদ্ধদ্বারের তলায় সেথা আনন্দ যে কাঁদছেরে হায় হায়!…ওরে সবুজ, ওরে নবীন ভাই—আনন্দ যে তোদের মাঝেই নাচেরে তাই-তাই! সুন্দরেরি সাধক তোরা সব—দিবসনিশি আনন্দ যে তোদের মাঝেই করছে কলরব!

রাধা ছিল সত্য-সাধিকা। সহজে তাই ছিঁড়্‌ল ঘরের মায়া—সরিয়ে দিল মনের মাঝের মিথ্যা-ঘন-ছায়া। কলঙ্কেরি ধারতো না সে ধার—লজ্জা-সরম মান-অপমান যা ছিল সব তার—কৃষ্ণবঁধুর তরেই সে যে ডুবিয়ে দিল সব! সত্যপথের পথিক রাধার শেষ হলে সব পথ—সমুখে তার উঠ্‌লো ফুটে সুন্দরেরি রথ! শ্যামসুন্দর আনন্দেতে উঠ্‌ল নেচে দুলে—কোলের মাঝে রাধাকে তার আনলে' টেনে তুলে। রাধা অনেক ব্যথার শেষে সত্যে পেল বুকে—কৃষ্ণসখার দুখের হল সমাপ্তি আজ সুখে। দোঁহার ব্যথা মুক্তি পেয়ে ফুট্‌লো কমল হয়ে। আনন্দেতে ভর্‌ল সকল ধরা—আনন্দেতে ভর্‌ল আকাশ—আনন্দেতে ভর্‌ল বাতাস—আনন্দেতে গাইল পাখী—আনন্দেতে দুললো শাখী—সকলি আজ আনন্দেতে ভরা!

অন্ধকারে বৃন্দাবনে পেঁচার মতো ঝিমোচ্ছিল যারা—ঐ আলোর খেলায় বিরক্তিতে মুখ ফেরাল তারা। প্রেমের আলোয় ভর্‌ল যখন বৃন্দাবনের আকাশ বাতাস সব—পেচকদলে ভাব্‌লে এসব অমঙ্গল আর অনাসৃষ্টি যত—ক্রুদ্ধ হয়ে তুল্‌লে তখন বিরাট

কলরব। পেচক ভাবে ঠিক পেচকের মতো—নইলে সেদিন দেব মানবের মিলন মধুরিমায়,—বল্‌লে কিনা অশ্লীলতায় ভরা—তাই তো তাদের কৃষ্ণ কেবল দিল না হায় ধরা! কিশোর কিশোরীদের মাঝেই দেবতা করে বাস—তাদের সাথেই খেল্‌লে যে শ্যাম ঝুলন দোল আর রাস!

বৃন্দাবনে চলেছিল সেদিন যত অমঙ্গলের খেলা—তাদের বুকের থেকেই ফুটে উঠ্‌ল স্বয়ং শিব—মঙ্গলেতে পূর্ণ হল সব—বিশ্বজুড়ে বাজ্‌ল প্রেমের বাঁশি—ঐ বাঁশির সুরই আন্‌লে বয়ে আনন্দ, গান হাসি!

বহরমপুর
মৃণ্ময়ীকুটীর

বৈষ্ণবচরণাশ্রিত—
শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ

হিন্দু মুসলমান

(ক) বিরোধের মূল

গত ২৮শে কার্ত্তিক তারিখের 'বরিশাল-হিতৈষী' হইতে নিম্নের অংশ উদ্ধৃত হইল।

মিঃ ব্লাণ্ডী সাহেবের সুশান্ত শাসনের পরে যখন মিঃ ডোনোভনের আবির্ভাব হইল, তখন অনেকেই বুঝিয়াছিল বরিশালে কিছুদিন ওয়াডারী লীলা চলিবে। পটুয়াখালী সত্যাগ্রহদলনে প্রথমতঃ ব্যর্থ-প্রয়াস, তার পর "সতীনসেনের" সহিত করমর্দ্দন, আমরা কৌতুকমিশ্রিত উপহাসের চক্ষে দেখিয়াছি। তাই মসজিদ-সমস্কে বাস্তসমস্তার এমন সুমীমাংসার পরও আমরা মিঃ ডোনোভনের যশোগান করি নাই।

জন্মাষ্টমী-মিছিলের এমন জয়যাত্রার পরও আমরা উৎফুল্ল হই নাই ; কারণ, যাহা পরের দান, তাহাতে গৌরবের কিছু নাই, ইহাই আমরা জানি। আমরা হিন্দু মুসলমানে মিলনকামী। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির দান-স্বরূপ তাহার প্রাপ্তিতেও স্বস্তিবোধ করি নাই এবং তখনও খুব জৌলস করি নাই। সহসা যখন যোগিনী ফিরিল, দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জ্জনে বাধা পড়িল, তখনও আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। তবে দুঃখিত হইতেছি মিঃ ডোনোভনের কীর্ত্তি দেখিয়া। তিনি যখন জিজ্ঞাসা করেন, "Is Satin Sen, the District Magistrate ?" (সতীন সেন কি জেলা মেজিষ্ট্রেট) তখন হাসিও পায়—লজ্জাও হয়। ইঁহারাই কি শাসনকর্ত্তার যোগ্য। জানি, আমরাও জানি, সতীন সেন জিলা মেজিষ্ট্রেটও নহে—নেপোলিয়ান বা কাইজারও নহে তথাপি তুমি যখন নাম উল্লেখ করিয়া ধমক দেও, তখন ভাবি এমনি দুর্ভাগা, এমন তরল প্রকৃতির লোকই আমাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। ইহারা গৌরবস্ফীত বক্ষে বলে, 'I am the Magistrate !' অর্থাৎ ? অর্থাৎ 'আমি যা খুসি তাই করিতে পারি !' যখন যা খুসী তখন তাই করিতে পারি ! হাঁ পার তা জানি—কিন্তু তাহাতেই কি তোমার প্রতি ভক্তি বাড়িবে ? তুমি মনে কর আজ হিন্দুকে সন্তুষ্ট করিলাম—কাল মুসলমানকে করিব ! বাস্তবপক্ষে কি হিন্দু কি মুসলমান এমন মূর্খ কে, যাহারা তোমাকে দেবতা মনে করিবে ? স্থিরবুদ্ধির লোকের কার্য্যাকার্য্যের প্রতিও লোকের শ্রদ্ধা থাকে। সে বুঝিতে পারে এ হাকিমের হুকুম নড়িবে না—কিন্তু যিনি স্বয়ং-প্রণোদিত হইয়া কাহাকেও বা স্বেচ্ছায় কাহাকেও বা অনিচ্ছায় সেই এগ্রিমেণ্ট দস্তখত করাইয়াছেন—স্বয়ং দস্তখত করিয়াছেন—পাদ্রী সাহেবদিগকে করাইয়াছেন, সেই তিনি দু'দিন পরে ষ্টেটুটারি ক্ষমতা জাহির করিবার গর্ব্ব করিয়া তদ্বিপরীতে কার্য্য করিতেছেন দেখিয়া কে সেই ব্যক্তির উপরে শ্রদ্ধাবান থাকিবে ? যে সব মুসলমান ঐ স্বীকৃতিপত্রে দস্তখত করিয়াছেন, তাঁহারা আজ কোনও প্রকারেই তাহার বিরুদ্ধাচরণ ভদ্রতা-সঙ্গত মনে করিবেন না—করিতে পারিবেন না। তাঁহারা জন্মাষ্টমীর সময়ে তাহা করেন নাই—দুর্গা-প্রতিমা বিসর্জ্জন সময়েও করিতেন না—কিন্তু খোঁচাইয়া গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিলে সে জন্য ন্যায়ত ধর্ম্মতঃ কে দায়ী হইবে। হিন্দু মুসলমানকে বিরক্ত করিতে রাজি নহে—তাহাদের আত্মসম্মানে আঘাত দিয়াছেন, আজ মিঃ ডোনাভোন—কলহ করিতে হইলে—সংগ্রাম করিতে হইলে তাহাদের সহিত করিতে হইবে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে উভয় সম্প্রদায়কে। তাই আমরা জানি এই সম্প্রদায়দ্বয় ঝগড় চাহে না—কিন্তু যাহারা মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া মিলন দেখিতে চাহে না, তাহারাই এই দ্বন্দ্ব জীয়াইয়া রাখিতে চায় !

তবে এ কথা ঠিক যে অতি পুরাতন এই ভেদের চাল আর চলিবে না। হয়ত এই প্রতিমা-বিসর্জ্জন ব্যাপার লইয়া বরিশালে আবার অসহযোগ সময়ের আন্দোলন সৃষ্ট হইবে—শত শত সহস্র সহস্র লোক

কারাবরণ করিবে—হাট বাজার বন্ধ হইবে—মিলন-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া যে সুনাম দুদিনের জন্য মিঃ ডোনোভন অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা অতলতলে ডুবিয়া গিয়া তাহার বুরোক্রাটিক মূর্ত্তি প্রকট হইবে। তাই আমাদের অনুরোধ এখনও সময় থাকতে সুবিবেচনা ফিরিয়া আসুক।

(খ) মৈত্রীর পথে

কলিকাতা এলবার্ট হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ মহম্মদ শহীদুল্লার সভাপতিত্বে নিখিল বঙ্গ মুসলমান যুবক সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

সভাপতি সাহেব তাঁহার অভিভাষণে বলেন :—

"যুবক দল, তোমাদের ললাটে যে সংকল্পের দৃঢ় রেখা, তোমাদের চোখে যে আশার জ্বলন্ত শিখা, তোমাদের বাহুতে যে শক্তির তীব্র স্ফুরণ, তোমাদের বুকে যে সাহসের অদম্য স্পন্দন, সে কি বৃথা? সে কি কেবলি একটা ছলনা? না! না! তা আমি বিশ্বাস করি না। সারা জগতের তরুণ তরুণী-দের মধ্যে নব জাগরণের নব জীবনের সাড়া পরে গেল। আমার এ দেশ, সে ত জগৎ ছাড়া নয়। তার পরিচয় ত আমরা পাচ্ছি।

আমাদের এ দেশ অতি বুড়ো দেশ। তাই বোধ হয় আমরা আধ বুড়ো আর বুড়োর বুড়োমিই পছন্দ করি। তারুণ্য আমাদের কাছে চাপল্য মাত্র। নূতন আমাদের চক্ষুশূল। নূতনকে আমরা দুশমনের মাথার মত চুরমার করে দিতে চাই। শোন তরুণের দল—আজ বৃদ্ধস্য বচনম্ অগ্রাহ্যম্-আজ সময় এসেছে, নূতনেরা আগে চলবে, পুরাণেরা তাদের লেজুড় ধরবে। কলি যে এখন উল্টো। সেই ধন্য যে যৌবনে খাঁটি যুবক। কিন্তু কাঁচা চুলেও অনেক ঝুনো বুড়ো আছে, আর পাকা চুলেও অনেক তাজা যুবক আছে। তুমি তোমার তরুণ মন দিয়ে দেশ-ভক্তি দেখাতে চাও? যাও! যাও, দেশে ও দেশের বাহিরে যত পার জ্ঞান কুড়ায়ে আন। জ্ঞানের মণিমাণিক্যে তোমার মাথা ভূষিত কর। তারপর দাও সে মাথা লুটায়ে দেশের জন্য, দশের জন্য,—এই প্রকৃত মস্তকদান। পড়! পড়, নূতন পুরাণো সকল বড় মনের সঙ্গে তোমার মন মিলিয়ে তোমার মনকে বড় কর। সমস্ত মনস্বীদের ভাবের সৌন্দর্য্য লুট করে তোমার মনকে সুন্দর কর। তার পর সঁপে দাও সেই মন দেশের সেবায়, দশের সেবায়। এই-ই প্রকৃত দেশভক্তি। দরকার হলে চাই কি—যুবকদের সব পড়াশুনা ছেড়ে দেশের জন্য কোমর বেঁধে লেগে যেতে হবে। কিন্তু ছাত্রজীবনে রাজনীতি শিক্ষা এক কথা আর রাজনীতি ক্ষেত্রে অংশ নেওয়া আর এক কথা। বর্ত্তমান শিক্ষার অনেক দোষ আছে। তাতে পেটে ভাত জোটে না, মাথায় স্বাধীন চিন্তা খেলে না, ধর্ম্ম থাকে না, জাতীয়তা গ'ড়ে ওঠে না, কেউ মানুষ হয় না—এই রকম কথা এক সময় প্রত্যেক প্লাটফরম থেকে ছেলেদের বলা হয়েছে। এখনও তাদের

পাল্টা আওয়াজ শুনি। ছেলেরা ভাবের বশে তখন দলে দলে স্কুল কলেজ ছেড়ে চলে এসেছিল। এতে মোটেই তাদের দোষ আমি দেই না; বরং তাদের আমি প্রাণ খুলে তারিফ করি। বলি, "ধন্য মায়ের ছেলে তোমরা! মায়ের নামের দোহাই শুনেই তোমরা সাড়া দিয়েছিলে; আগে পাশে কোন দিকেই চাও নি।" বর্ত্তমান শিক্ষায় যে বহু দোষ আছে, কে তা অস্বীকার করতে পারে?

দোসরা কথা শিক্ষার দোষ-সম্বন্ধে, যে তাতে স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণ হয় না, হয় শুধু গোলামি বুদ্ধি। এ দোষ কিছু শিক্ষার নয়। এ দোষ আমাদের, এ দোষ আমাদের বাপ মা অভিভাবকদের। ছোট বেলা থেকেই আমরা শুনি, লেখাপড়া শিখ্‌লে ভাল চাকরী হবে। বর্ত্তমান শিক্ষার তেস্‌রা দোষ— সেখানে ধর্ম্ম শিক্ষা হয় না। এটা একটা সাংঘাতিক দোষ বলেই প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি মনে করবে। কিন্তু এই দোষের জন্য দায়ী কে? বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী, না মুসলিম সমাজ?

সরকার আমাদের ধরম বাবা নন, যে আমাদের এই ধর্ম্মের দায় থেকে উদ্ধার করে দেবেন। এখানে আর একটা কথা বলতে চাই, মুসলমানের স্কুল, কি মুসলমানের কলেজ হলেই আমি আনন্দে নেচে উঠিনা। আমি জানতে চাই, সেখানে কি মুসলমানি শেখান হচ্ছে? এখানে জিজ্ঞাসা করতে পারি, এই নতুন ইসল্যামিয়া কলেজেই বা কি ইসলামি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। মুসলমান ছাত্রকে হিন্দুর ছোঁয়া থেকে আলগ করে রাখলেই কি সে পাক্কা মুসলমান হয়ে যাবে? চৌঠা আপত্তি—যে বর্ত্তমান শিক্ষায় জাতীয়তা জাগে না। একথা ঠিক বলেই আমি মনে করি। যাতে দেশের ঠিক অবস্থা ছেলেরা জানতে পারে, যাতে করে মনে দেশাত্মবোধ জাগে, যাতে দেশের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভাই-ভাব জন্মে, যাতে তাদের কল্পনা জন্মভূমির মুক্তির দিকে ধায়—এমন বই, কেতাব স্কুল কলেজে পড়ান হয় না। এর প্রতীকার করতে হবে—"জাতীয় পড়া ঘর" বসায়ে, যেখানে এই সব বই পড়্‌তে পাওয়া যাবে। পাঁচ দফায় আপত্তি এই যে—এই শিক্ষায় মানুষ হয়না। একথা কিন্তু ষোল আনা ঠিক নয়—দেশের অপড়া লোকের চেয়ে যে পড়া লোক খারাপ তা কেউ খতিয়ান করে দেখাতে পারবে কি? তবুও যেন মনে হয় পড়াশোনা করে ছেলেদের যেমনটি হওয়া দরকার তেমনটী তারা হয় না। এর কারণ বোধ হয় (১) নীতিসম্বন্ধে কোন বই তাদের পড়ান হয় না, (২) ছাত্রেরা পড়ে পাশের জন্য, জ্ঞান লাভের জন্য নয়। তাদের অনেকের ত—লিখনিং পঠনং পাসেরই কারণং। আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য যেমন চেষ্টা করা, তেমনি শিক্ষার স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা। হায়! এই পোড়া ভারত ছাড়া আর কোথায় শিক্ষার এমন সৃষ্টিছাড়া প্রথা আছে, যেখানে বিদেশী ভাষার ঘাড়ে চড়ে সমস্ত জ্ঞান কুড়াতে হয়। এতে ছেলেদের মুখস্থ শক্তির উপর এমন চাপ পড়ে যে তাদের বুদ্ধি একরূপ আড়ষ্ট হয়েই যায়। ইংরেজি ভাষা আমাদের শেখা দরকার। খুবই দরকার। ভারত স্বরাজ্য পেলেও আমাদের ইংরেজি পড়তে হবে, শিখতে হবে। ইংরেজী বাদ দিলে ফরাসী কি জার্ম্মাণ

ভাষা শিখতে হবে। আমাদের রাজনীতিকেরা চেষ্টা করুন—দেশে স্বরাজ্য আনতে, আর আমরা চেষ্টা করি—বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বরাজ্য আনতে। অতীতে মুসলমানেরা শিক্ষা দীক্ষায় জগতে সেরা ছিল, আমাদের ভিতর অমুক বড় কবি ছিলেন, অমুক দার্শনিক ছিলেন, অমুক বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন—এই গল্প অনেক করা হয়েছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, হে বাঙ্গালার মুসলমান তোমাদের ভিতর অতীতে আর বর্ত্তমানে ক'জন নামজাদা লোক জন্মেছেন। এ কি কেবল শিক্ষার অভাবে নয়? আগে গরীব মুসলমানদের খাবার জোগাড় ক'রে দেও, তারপর তাদের শিক্ষা দেও, দেখ্‌বে কি সোনার ফসল ফলে।

এখানে হিন্দু ভাইদের দুটি কথা বলতে চাই। এই যে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার সে শুধু মুসলমানদেরই ভালোর জন্ম নয়, দেশের দশের সকলের ভালোর জন্মই। গাঁয়ে দু'টো দুষ্ট ছোঁড়া থাকলে, গ্রামশুদ্ধ লোক তাদের জ্বালায় ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে ওঠে। গাঁয়ের লোক যদি ছোট বেলায় তাদের ভাল মানুষ করবার চেষ্টা করত, তবে তারা আজ জ্বালাতন হত না।

রাজনীতিতে আগে বাড়তে গেলে মুসলমান সমাজকে শিক্ষিত করে নিতে হবে। একটা ঘোড়া আর একটা গাধা কখনও এক সঙ্গে চলতে পারে না। তাই হয় ঘোড়াটাকে গাধা হ'তে হবে, নয় গাধাটাকে ঘোড়া করে নিতে হবে। দৈবের লিখন যে, দুইই এক বাঁধনে বাঁধা থাকবে; কেউ কাকে ছেড়ে চলতে পারে না।

শিক্ষা-বিস্তারের কথায় মেয়েদের বাদ দিলে চলবে না। তারা সমাজের অর্দ্ধেক; তারা আমাদের আধা শরীর। এই আধাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে কখনই আমরা ভাল থাকতে পারিনে। ইসলামে নারীকে তার উপযুক্ত অধিকার দেওয়া হয়েছে—এ দাবী জগতের কাছে করলে তারা ঠাট্টা করবে। কারণ জগৎ দেখবে না—ইসলামের কেতাব, দেখবে শুধু—মুসলিমের ব্যবহার। যদি নারীর শিক্ষা ও অধিকারের কথা উঠল, তবে পর্দ্দার কথা এখানে তোলা অন্যায় নয়। পর্দ্দা দু রকম—এক রকম ইসলামী পর্দ্দা, সে হচ্ছে মুখ, হাত, পা ছাড়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা, আর এক অনৈসলামী পর্দ্দা, সে মেয়েদের চার দেওয়ালের মধ্যে চিরজীবনের জন্ম কয়েদ করে রাখা। ইসলামী পর্দ্দায় বাইরের খোলা হাওয়ায় বেড়ান, কি অন্যের সঙ্গে দরকারী কথাবার্ত্তা মানা নয়; অনৈসলামী পর্দ্দায় এসব হবার জোটি নেই। আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে এই অনৈসলামী পর্দ্দা ফাঁক করে দিতে। তা না হলে আমাদের নারী হত্যার মহাপাপ হবে।

চাকরীর জন্ম পড়াশুনা একেবারে আত্মহত্যা! অন্যদিকে চাকরী গোলামী নয়। চাকরী গোলামী সেখানে, যেখানে ন্যায়, বিবেক, ব্যক্তিত্ব, দেশপ্রীতি সব বিসর্জ্জন ক'রে কেবল অত্যাচারী রাজশক্তির কেউ সাহায্য করে। এখানে গোলামীর দিকে ঝুঁকিটা বড় বেশী।

শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চাই সৎ সাহিত্য গড়তে। আমরা সংখ্যায় প্রায় ২৷৷০ কোটি। হায়! আমাদের সাহিত্য নেই বল্লেই হয়। বাংলা সাহিত্য আছে কিন্তু আমাদের সাহিত্য নেই। আমাদের ঘর ও বা'র, সুখ ও দুঃখ, আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে যে সাহিত্য, তাই আমাদের সাহিত্য। কেবল লেখক মুসলমান হলেই মুসলমান সাহিত্য হয় না। হিন্দুর সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদান্ত ও গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও হিন্দু জীবনী থেকে। আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কুরআন ও হদীস, মুসলিম ইতিহাস ও মুসলিম জীবনী থেকে। হিন্দুর সাহিত্য রস সংগ্রহ করে হিন্দু সমাজ থেকে, আমাদের সাহিত্যের ভিতর দিয়া বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমানের চেনা হলেই ভাব হবে।

লম্বা ছুটীর সময় তোমরা কি চাষীদের মধ্যে গিয়ে কাজ করতে পার না? স্বদেশ-প্রীতি কি কেবল মুখের কথা হ'য়ে থাকবে? মনে রাখ্‌তে হবে যে পর্য্যন্ত না দেশের সাড়ে পনর আনা চাষীর অবস্থা ফিরবে, এরা নিজেদের দাবী দাওয়া কড়া গণ্ডায় বুঝে নিতে পারবে, সে পর্য্যন্ত প্রকৃত স্বরাজ হবে না।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা দেখে আমার অনেক বন্ধু বলেন যে ধর্ম্মাধর্ম্মি ভারতবর্ষে থেকে দূর না করলে, ভারতে শান্তি হবে না, স্বরাজও হবে না। কিন্তু আমি বলি ধর্ম্ম নেই বলেই ত এত বিবাদ হচ্ছে। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, ধার্ম্মিক নিজে শান্তি পাবে আর পাবে তার হাতে সমস্ত দুনিয়া শান্তি। যা অশান্তি ঘটায়, তা ধর্ম্ম নয়, পরম অধর্ম্ম। ইসলাম শব্দের দু'টী মানে; একটি আত্ম-নিবেদন আর একটী শান্তি স্থাপন। ইসলাম পরধর্ম্ম অসহিষ্ণু নয়। ইসলাম মেনে নিয়েছে দুনিয়ায় বহু মতভেদ থাকবে। ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে এই মত উপেক্ষা করে ভাল কাজে পাল্লা দিতে। আজ কথাগুলো অনেকের কানে এমন নূতন শোনাচ্ছে যে কুরআনের শ্লোক উদ্ধৃত না করলে তাঁরা আমার কথায় বিশ্বাস করবেন না।—"ধর্ম্মে বল প্রয়োগ নেই।" (২য় অধ্যায়, ২৫৬ শ্লোক।) ঝগড়া বিবাদে শক্তি নষ্ট না করে যত ভারত সন্তান এক প্রাণ হয়ে স্বরাজ্য সাধনা কর! প্যারিসের মসজিদে এক তুর্কী অফিসার আমাকে একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি কেন জুমার নমাজ পড়তে এস।" আমি উত্তর দিলাম, "কেন? সে আমার কর্ত্তব্য।" তিনি বললেন, "জুমার নমাজের একটী সর্ত্ত হুরিয়াত (স্বাধীনতা)। গোলামের জন্য জুমার নমাজ নয়—এ কেতাবের কথা। তোমরা ত গোলামের জাত। তোমার আবার জুমার নমাজ কি?" প্যারিসে বসে কাগজে পড়তাম হিন্দু মুসলমান মারামারি করছে। আমার মিসরী বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলতেন, "তোমরা পাগল।" আমার মনে হ'ত বেশ আছি পাগলা গারদের বাইরে ভারতছাড়া হয়ে। মাঝে একটু নরম পড়েছিল। এখন দেখছি আবার চাগ্‌রেছে। এই যে ঝগড়া বিবাদ, একে আমি ধর্ম্মের জন্য ঝগড়া বলি না। এমন কোন কথা হিন্দুর বেদে পুরাণে নেই যে এক মিনিটের জন্য মসজিদের সামনে বাজনা থামালে

তাঁদের ধর্ম্মকর্ম্ম পণ্ড হয়ে যাবে। এমন কথা মুসলমানের কুরআন হদীসে নেই যে বিধর্ম্মী মসজিদের সামনে বাজানা বাজালে মুসলমানের ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। প্রত্যেকে বলছে তাদের স্বত্ব তারা বজায় রাখবে। আমার কয়েকজন হিন্দু বন্ধু বলেছেন, এই রকম করে নিস্তেজ হিন্দুজাতির ভিতর ক্ষাত্রশক্তি জাগাতে হবে। সকলের চেয়ে বড় স্বত্ব ত স্বাধীনতা; সে যে আমাদের জন্মগত স্বত্ব। অন্য স্বত্ব সব তারই ছায়া। হিন্দু মুসলমানের খুনাখুনি এই ছায়া নিয়ে। ওদিকে স্বরাজের ঘোড়া যে পালিয়ে যায়! মনে কর্‌তাম হিন্দু মুসলমানের চেয়ে বোঝে ভাল। একি বিচার—ভায়ের মাথায় লাঠি মেরে হাত পাকাতে হবে? জন্মভূমির সম্পর্ক নাড়ীর সম্পর্কের চেয়ে কম নয়। হিন্দুর অনেক কথা বলবার আছে, মুসলমানের অনেক কথা বলবার আছে। আমি দু কথায় সে ঝগড়া মিটুতে পারব সে ভরসা আমার নেই। কিন্তু আমি শুধু বলি এই ঝগড়ায় তোমাদের স্বরাজ এগুচ্ছে না পিছুচ্ছে? পুনরায় বলি এ ধর্ম্ম নয়, এ পরম অধর্ম্ম। নিখিল মুস্‌লিম যুবক সম্মিলনী—কাজেই তোমরা মুস্‌লিম। কিন্তু আগে তোমরা মুস্‌লিম, না তোমরা ভারতবাসী? নানা জনে নানা কথা বল্‌বে। আমি মনে করি আমরা একসঙ্গে এক সময়েই মুসলিম ও ভারতবাসী। আমরা জন্মাবা মাত্রই হয়েছি মুসলিম ও ভারতবাসী। ইস্‌লাম স্বদেশ প্রেমের বিরোধী নয়।"

মন্তব্য ও সংবাদ

২৮। একজন সুলেখক

শ্রীধাম বৃন্দাবনের বৈষ্ণবদর্শন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীগোপালদাস ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের 'শ্রীপরমেশ্বরদাস ঠাকুর' নামক প্রবন্ধ (শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ ষষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা) অতীব উপাদেয়। ভক্তের, দীনভক্তের হৃদয়-বৃত্তির বিশ্লেষণ অতিশয় সুন্দর হইয়াছে। 'সাধনা' পত্রিকায় 'সহজ ভজনের মূল' সম্বন্ধে তাঁহার পাণ্ডিত্য-পূর্ণ প্রবন্ধ সকলেরই, বিশেষতঃ অল্পজ্ঞ সাহিত্যিকগণের পাঠ করা উচিত। লেখক মহাশয় একাধারে ভাবুক, পণ্ডিত ও কবি। 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় তাঁহার একটি সুন্দর কবিতা পড়িলাম। কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

ওই কেগো যায়, বলে আয় আয়, হেম ভুজযুগ তুলিয়া।
বসন অরুণ, বচন করুণ, যে চাহে সে রহে ভুলিয়া॥
কুঞ্জর জিতি, মন্থর গতি, অন্তর অতি মধুময়।
হরি হরি বলি' কভু পড়ে ঢলি, কভু বা শূন্যে চেয়ে রয়॥
আঁখি ছল ছল, কভু ঝরে জল, কভু খল খল হাস্য।
গমন ভঙ্গী, নটনরঙ্গী, রমণী-সুলভ লাস্য॥
কিশোর বয়সে, কি জানি কি রসে, কিবা সে লালসে মাতিয়া।
ভূমে পড়ি যায়, মনে করি হায়, হৃদিখানি দেহ পাতিয়া॥

পূর্ণিমা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫।

"সহজভজনের মূল কোথায়" এই প্রবন্ধ, যাহা কুমিল্লার 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে ছান্দোগ্যোপনিষদের ত্রয়োদশ খণ্ডের বামদেব্য-নামক সামের আলোচনা করিয়া খুব ভাল কাজ করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দগিরি এই সামের বা সামবিদ্যার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতীব দুর্নীতিকর ব্যাখ্যা, আচার্য্য শঙ্কর ও আনন্দগিরির প্রতি সম্যক্ ভক্তিমান্ হইয়াও একথা না বলিয়া উপায় নাই। এই শ্রুতির মধ্বভাষ্য ও বেদেশ কৃত খণ্ডার্থ ই প্রকৃত সঙ্গত অর্থ। শ্রুতিতেই আছে, বামদেব্যনামক সামকে মিথুনে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানিতে হইবে। এই মিথুনই প্রকৃত প্রস্তাবে চিন্মিথুন—শ্রীরাধাকৃষ্ণ। ইহা যিনি দেখিবেন 'স মিথুনী ভবতি'—প্রাকৃত কাম যাহা পুরুষকে পীড়িত করে তাহা দূরীভূত হইবে। শ্রীরাসলীলার শেষ শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই এই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ। রথন্তর সাম, গায়ত্র সাম, বৃহৎ সাম, বৈরূপ সাম প্রভৃতি সমুদয় সামকে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত যে বেদান্তেরই ভাষ্য ইহা দেখাইবার জন্য এই প্রকারে উপনিষদের ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। এই সুলেখকের নিকট আমরা অনেক ভাল জিনিস আশা করি

২৯। শ্রীমৎ মাধবাচার্য্য

'বীরভূমি' ৮ম খণ্ড ৩ সংখ্যায় 'চান্দুড়া যশোদল'এর গোস্বামীবংশ-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বাহির হইয়াছিল। সে-সম্বন্ধে আরও কিছু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পুরুষোত্তম মিশ্র সিদ্ধান্তবাগীশ-প্রণীত 'মাধববংশতত্ত্বম্' নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থখানির প্রামাণিকতা বা ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা অবধারিত না হইলেও ইহাতে যাহা আছে, তাহা প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত "পঞ্চায়েৎ" সাপ্তাহিক পত্রে এই গ্রন্থ হইতে গৃহীত অনেক কথা বাহির হইয়াছে। লেখকের নাম শ্রীযোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়।

"ময়মনসিং জেলার গোঁসাইচান্দুরা গ্রামের বন্দ্যঘটীয় গোস্বামীবংশে মাধবাচার্য্যের জন্ম হয়। পূর্ব্বে রাঢ়দেশে এই বংশীয়গণের বাসস্থান ছিল। শিষ্যগৃহে আগমনকালে পদ্মায় নৌকাডুবি হইলে যাঁহারা রক্ষা পাইয়াছিলেন তাঁহারা এই দেশেই বাস করিতে আরম্ভ করেন। মাধবাচার্য্য যৌবনকালে কাশীতে বিদ্যাভ্যাস করিতেন। তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা হওয়ায় পিতামাতার অনুমতি গ্রহণের জন্য একবার বাড়ী আসেন। সেই সময়েই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গদেব সেই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ-পর্য্যটনে আসিয়াছিলেন। মাধব শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত নবদ্বীপ যান, এবং ছাত্ররূপে কিছুদিন থাকেন। তাহার পর শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস। মাধব মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলেও ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন দেশে ফিরিয়া গৃহী হইয়া ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন, মাধবও তখন ঠিক তাহাই করেন। গৃহে থাকিয়া গৃহস্থ হইয়া মাধব বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনিবাস শিরোমণি তান্ত্রিক, বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী। মাধব মনের দুঃখে মধুপুরের বনে আসিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বিশাখার অনুগা মাধবী সখীর ভাব লইয়া সাধনা করিতেন। মধুপুরের বনের এই স্থানটির নাম গুপ্ত-বৃন্দাবন। শ্রীমাধবাচার্য্য এই স্থানেই বরাবর ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম জয়রাম। পুত্র আসিয়া পিতাকে আর বাড়ী লইয়া যাইতে পারিলেন না। মাধবাচার্য্য শ্রীবৃন্দাবনেও গেলেন না, শ্রীবৃন্দাবনের যাবতীয় লীলা এই মধুপুরের বনে অভিনীত হইতে লাগিল এবং স্থানটি গুপ্ত-বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

মাধববংশ তত্ত্ব ও মাধবাচার্য্যের সংস্কৃত গ্রন্থ 'প্রেমরত্নাকর' মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক।

৩০। ভ্রম-সংশোধন

গত মাসের 'বীরভূমি'র ৩৭৩ পৃষ্ঠায় "রাঙিয়ে দিয়ে যাওগো এবার যাবার আগে" শীর্ষক একটি গান প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ গানটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের। ভ্রমক্রমে উহা শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র বড়ালের রচনা বলা হইয়াছে। শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র জানাইতেছেন—"ঐ গানটি রবীন্দ্রনাথের। ওঁরা (চৈতন্য সাধনাশ্রমের লোকেরা) না জেনে ভ্রমক্রমে আমার রচনা বলে ছেপেছিলেন। * * * আপনি এই ভ্রমটি সংশোধন করে' দিলে ভাল হয়।"

ধর্ম্ম—গুণাশ্রিত ও নির্গুণ

১। ত্রিবিধ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের ত্রিবিধ স্তর

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে ত্রিবিধ ধর্ম্ম বা ধর্ম্মের ত্রিবিধ স্তর আলোচিত হইয়াছে। ১। গুণাশ্রিত ধর্ম্ম। ২। নির্গুণ ধর্ম্ম। ৩। ভাগবত ধর্ম্ম। ভাগবত ধর্ম্মকে গুণাতীত ধর্ম্মও বলা যায়। নির্গুণ ও গুণাতীত এক নহে। 'নির্গুণ' বলিলে গুণের অভাব বুঝায়, সুতরাং 'নির্গুণ' কথাটা অভাবাত্মক বা নিষেধাত্মক। 'গুণাতীত' কথাটা ভাবাত্মকও হইতে পারে, অন্ততঃপক্ষে অনেকে উহাকে ভাবাত্মক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

'ত্রিবিধ ধর্ম্ম' আর 'ধর্ম্মের ত্রিবিধ স্তর'—এই দুই প্রকারের কথার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য সারভূত (essential) পার্থক্য, উপেক্ষণীয় পার্থক্য নহে। 'ত্রিবিধ ধর্ম্ম' বলিলে অধিকারীভেদের উপর খুব বেশী জোর দেওয়া হয় না ; শেষের স্তর আসিলে, প্রথম দুইটি স্তরকে যেন উড়াইয়া দিতে পারা যায়। 'ত্রিবিধ স্তর' বলিলে অধিকারীভেদ ব্যাপারটি বিশেষ করিয়া স্বীকার করা হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করা হয়, সমাজে চিরদিনই এই তিন প্রকারের ধর্ম্মের স্থান আছে এবং থাকিবে।

ষষ্ঠ স্কন্ধের প্রথম তিন অধ্যায়—অজামিলের উপাখ্যান। মহাপাপ অজামিল মৃত্যুকালে আভাসে "নারায়ণ" বলিয়াছিল। নারায়ণকে বা শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া 'নারায়ণ' বলে নাই। তাহারই ঔরসজাত একটি শিশুপুত্র, তাহার নাম রাখিয়াছিল নারায়ণ। সেই শিশুকে দেখিয়া, সেই শিশুকেই ডাকিবার জন্য 'নারায়ণ' বলিয়াছিল। কিন্তু, যখন বলিয়াছিল, সে সময়ে তাহার অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর। অকথ্য যন্ত্রণাময় মহাপাপের মরণ। সর্ব্ববিধ সুযোগ পাইয়াও সেই সব সুযোগের একেবারে সদ্ব্যবহার করে নাই, অসৎ সংসর্গে সমগ্র জীবন ধরিয়া কেবলই পাপাচরণ করিয়াছে, এমন দুর্বৃত্ত

মহাপাপ মরিতেছে, সম্মুখে বিকট ভীষণ-মূর্ত্তি তিনজন যমদূত দাঁড়াইয়া, আর নরকের কুণ্ডগুলি ও সেই সব নরকে পাপীদের শাস্তি দেখা যাইতেছে। অজামিল তাহার একটি শিশুপুত্রকে ভালবাসিত আর সেই শিশুটির নাম রাখিয়াছিল নারায়ণ। সেই শিশুপুত্রকে দেখিয়া ভয়ে ভীত একান্তকাতর অজামিল স্নেহরসপূর্ণ হৃদয়ে ঐ পুত্রকেই লক্ষ্য করিয়া বিবশ হইয়া 'নারায়ণ' বলিয়া ডাকিয়াছিল। তিনজন বিষ্ণুদূত সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন, অজামিলকে বন্ধনমুক্ত করিয়াছিলেন, রোগমুক্ত ও সুস্থ করিয়াছিলেন, অতীতের স্মৃতি শাস্ত্রজ্ঞান আদি তাহার অন্তরে জাগাইয়া দিয়াছিলেন, পরমায়ু বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, নব সুযোগ দিয়াছিলেন। আর অজামিল সেই সব সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাই অজামিলের উপাখ্যান।

আমরা "আত্মশক্তি ও কৃপাবাদ" গ্রন্থে অজামিলের উপাখ্যানের আলোচনা করিয়াছি। এই উপাখ্যানে ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনটি সন্দর্ভ আছে। প্রথম সন্দর্ভের বক্তা যমদূত। বিষ্ণুদূত কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যমদূত ইহা বলিয়াছিলেন। ইহাই গুণাশ্রিত ধর্ম্ম। দ্বিতীয় সন্দর্ভের বক্তা বিষ্ণুদূত—যমদূতকে নিরস্ত করিবার জন্য, আর যমদূতেরা যে-ধর্ম্ম বলিলেন সেই ধর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চতর, মহত্তর ও গভীরতর ধর্ম্ম যমদূতগণকে শিখাইবার জন্য বিষ্ণুদূত ইহা বলিয়াছিলেন। ইহাই নির্গুণ ধর্ম্ম—যদিও ইহাতে ভাগবতধর্ম্মের অনেক কথাই আসিয়া পড়িয়াছে। তৃতীয় সন্দর্ভের বক্তা স্বয়ং যমরাজ;—পরাজিত যতদূতেরা যমরাজের নিকট ফিরিয়া গিয়া সমুদয় কথা তাঁহাকে জানাইলে, যমরাজ নিজের দূতগণকে যাহা বলিলেন, তাহাই ভাগবত ধর্ম্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধের প্রথমে এই ত্রিবিধ ধর্ম্ম সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। তাহার পর, যমদূত বিষ্ণুদূত ও যমরাজ কর্ত্তৃক তাহা ব্যাখ্যাত ও বিস্তারিত হইয়াছে। অজামিল, ইন্দ্র ও চিত্রকেতুর উপাখ্যান উদাহরণমাত্র।

২। তত্ত্বত্রয়

ত্রিবিধ ধর্ম্মের বা ধর্ম্মের ত্রিবিধ স্তরের ভিতরের কথা বুঝিতে হইলে 'তত্ত্বত্রয়'এর আলোচনা আবশ্যক। বিশ্বতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব—এই ত্রিতত্ত্ব বা তত্ত্বত্রয়। আমার বাহিরে, আমার চারিদিকে এই বিশ্ব বিশাল, অতীব বিশাল। আমার ভিতরেও এই বিশ্বের

প্রভাব। আমি বিশ্বের, আমার স্বাতন্ত্র্য নাই, স্বাধীনতা নাই। বিশ্বের তুলনায় আমি ছোট, অতিশয় ছোট। আমি বিশ্বের—বিশ্বই আমাকে যেন প্রসব করিয়াছে, বিশ্বই আমাকে যেন তাহারই সেবায় নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই এক প্রকারের বোধ। ইহাই তন্ত্রের পশ্বাচার। এই বোধ আশ্রয় করিলে যে-ধর্ম্মের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা হয়, তাহারই নাম গুণাশ্রিত ধর্ম্ম। ইহাই ধর্ম্মের প্রথম স্তর। আমি মানুষ, আমি এই বিশ্বব্যবস্থার একটি অংশমাত্র, আমাকে এই বিশ্বব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে হইবে। যে কার্য্যের দ্বারা, যে বাক্যের দ্বারা, যে চিন্তার দ্বারা বিশ্বব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার নাম পাপ; আর যাহার দ্বারা বিশ্বব্যবস্থার সহিত আমার সামঞ্জস্য থাকে, তাহারই নাম পুণ্য। বিশ্ব-ব্যবস্থার উপর যেন আমার হাত দেওয়ার অধিকার নাই, আমি এই বিশ্বব্যবস্থাকে মানিয়া লইতে বাধ্য। বিশ্বব্যবস্থার মূলে ভ্রান্তি আছে বা ত্রুটি আছে, এমন কথা ভাবিওনা বা বলিওনা। ইহাই গুণাশ্রিত ধর্ম্মের উপদেশ।

বিশ্বতত্ত্বকে মুখ্য বা প্রধানতত্ত্ব বলিয়া মানিয়া লইলে এবং সমাজের ব্যবস্থাপকগণকে বা অধিকারী পুরুষগণকে বিশ্বতত্ত্বের বা বিশ্বব্যবস্থার অভ্রান্ত ও চিরন্তন জ্ঞাতা ও পরিচালক বলিয়া মানিয়া লইলে যাহা কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়, সেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবোধের যে ধর্ম্ম, তাহারই নাম গুণাশ্রিত ধর্ম্ম।

এই ধর্ম্ম লইয়া, এই ধর্ম্মকে অভ্রান্ত বা সনাতন বলিয়া মানিয়া লইয়া মানুষ চিরকাল চলিতে পারে না। ক্রমবিকাশ বা আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ যে সত্য, ইহা যে বিধাতার বিধান, বিশ্বব্যবস্থার নিয়ম। এই নিয়মে মানুষ বাড়িয়া উঠিতেছে, শক্তিতে বাড়িয়া উঠিতেছে, জ্ঞানে বাড়িয়া উঠিতেছে, প্রেমে বাড়িয়া উঠিতেছে। মানবাত্মার ক্রমিক জাগরণ হইতেছে। তাহার নিজেরই স্বরূপের অভিমুখে, ক্রমে ক্রমে ক্রমে এই সুপ্ত মানবাত্মা, এই অস্ফুট সচ্চিদানন্দ, এই ব্রহ্মবীজ ক্রমে ক্রমে ক্রমে জাগিয়া উঠিতেছে, বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। এই ক্রমবিকাশের গতি অবরুদ্ধ হইবার নহে। যে শক্তির দ্বারা এই গতি অবরুদ্ধ হয়, বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহার নাম 'দুর্গ'—এই 'দুর্গ' অসুর। এক জায়গায় বাধাপ্রাপ্ত হইলে জীবাত্মা আর এক জায়গা দিয়া বিকাশের পথ অন্বেষণ করে, একপথে বাধা পাইলে আর এক পথ ধরে, এক দেশে বা এক সমাজে বাধা পাইলে আর এক দেশে বা আর এক সমাজে নিজের বিকাশ-পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিয়া লয়। ইহাই নিয়ম।

আত্মতত্ত্বের বোধের উপর যে-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা তাহার নাম নির্গুণ ধর্ম্ম। ইহার প্রথম কথা, মানুষ পশু নহে, দাস নহে। গুণাশ্রিত ধর্ম্মে মানুষ দেবতাদের গৃহপালিত পশু, কাজেই দেবতাদের প্রিয় হইয়া,—সমাজের কর্ত্তা হইয়া যাহারা নিরুপদ্রবে সুবিধা ভোগ করিতেছে, তাহাদের ক্রীড়নক, তাহাদের ক্রীতদাস। দ্বিতীয় স্তরে মানুষ তাহার নিজের শক্তির, মহিমার ও গৌরবের সন্ধান পাইয়া গর্ব্বিত হইয়াছে। এইখানেই পশ্বাচারের শেষ, আর বীরাচারের আরম্ভ। বিশ্বের জন্য আমি নই, আমার জন্যই এই বিশ্ব। বিশ্বব্যবস্থা যেমন আছে, ঠিক তেমনটি আমি মানিয়া লইতে বাধ্য নই। আমার ভিতরে নবীন-সৃষ্টির শক্তি আছে, আমি ভাঙ্গিতে পারি, নূতন করিয়া আমার মনের মতো করিয়া গড়িতেও পারি। আমাকে তাহাই করিতে হইবে। কেবল মানিয়া লইব না, আমি ভাঙ্গিব, নির্ভয়ে নির্ম্মমভাবে ভাঙ্গিব, রুদ্র আছেন আমাতে, আমি যে রুদ্রের, আমি ভাঙ্গিব। যত বাধা আছে সব ভাঙ্গিব, নির্ভয়ে ভাঙ্গিব। আত্মশক্তির এই জাগরণের উপর নির্গুণ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা।

নির্গুণ ধর্ম্মের সহিত ভাগবতধর্ম্মের বা গুণাতীত ধর্ম্মের প্রভেদ এতই কম এবং এতই সূক্ষ্ম যে নির্গুণ ধর্ম্ম কোথায় শেষ হইল আর ভাগবত ধর্ম্ম কোথায় আরম্ভ হইল, তাহা বুঝিয়া উঠাই কঠিন। এই কারণে শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্টস্কন্ধের প্রারম্ভে ধর্ম্মের ত্রিবিধ স্তর স্পষ্টরূপে বলিয়া, তাহার পর বিস্তারিতরূপে বলিবার সময় নির্গুণ ধর্ম্ম ও ভাগবতধর্ম্মকে এক করিয়া ফেলিয়াছেন এবং তাহাই সঙ্গত ব্যবস্থা।

গুণাতীত-ধর্ম্ম বা ভাগবত-ধর্ম্ম কি? আমি ভাঙ্গিতে চাই, কিন্তু, ভাঙ্গিবার জন্যই তো ভাঙ্গিতে চাই না। নূতন করিয়া মনের মতো করিয়া গড়িবার জন্যই ভাঙ্গিতে চাই। পুনর্গঠনের চিন্তা মনের ভিতর সুস্পষ্ট বা অস্পষ্টরূপে না জাগিলে ভাঙ্গিবার চেষ্টা হয় না। ভাঙ্গিবার জন্য চেষ্টা করিয়া মানুষ যখন দেখে ভাঙ্গা বড় কঠিন, অনেক কালের পাকা বুনিয়াদ, আঘাত করিলে ভাঙ্গে না, তখন দুর্ব্বল যাহারা তাহারা হয় ক্লান্ত হইয়া, না হয় নিস্ফল হইয়া, না হয় ভয় পাইয়া, না হয় ক্ষতির আশঙ্কায় বা লাভের লোভে ভাঙ্গার চেষ্টা ছাড়িয়া দেয়, আর নির্গুণের বা গুণাতীতের ভাবনা ভাবে না, গুণাশ্রিতের দলে মিশিয়া যায়। ইহারা প্রকৃত বীর নহে, প্রকৃত বীর হইতে ইহাদের এখনও বিলম্ব আছে। যাহারা প্রকৃত বীর, তাহারা যত বাধা পায় ততই মাতিয়া উঠে, অসুবিধায় তাহাদের সাহস

ও শক্তি বাড়িয়া যায়। ফলে তাহারা গড়ার কথা একেবারে ভুলিয়া যায়। ইহারা হয় ঐকান্তিক রুদ্র-উপাসক—ইহারা চির বিদ্রোহীর দল! ইহারাই খাঁটি নিগুর্ণ-ধর্ম্ম-যাজী।

গঠনের জন্য যাহারা ভাঙ্গে, তাহারা কেবলই ভাবে গড়িব, নূতন করিয়া মনের মতো করিয়া গড়িব। কিন্তু, কে গড়িবে? আমি? না, আমি নয়, আমরা। মনের মতো করিয়া গড়িব। কিন্তু, কাহার মনের মতো করিয়া? আমার মন নহে, আমাদের মন। আমার মন অহঙ্কার, আর আমাদের সকলের মন—মহত্তত্ব। আমাদের সকলের মনই ঈশ্বর বা ঈশ্বরের মন। সেই ঈশ্বরের মন, সমুদ্রের মতো, আর আমার মন আমার বুদ্ধি, তোমার মন তোমার বুদ্ধি, সেই সাগরের বুকে তরঙ্গের মতো, সেই সাগরেরই ইচ্ছায় উঠিয়াছে, নাচিতেছে, খেলা করিতেছে আবার উঠিয়া নাচিয়া খেলা করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে না, সেই সাগরেই মিশিয়া যাইতেছে, আবার যে-দিন ইচ্ছা হইবে সাগরের, সে-দিন আবার জাগিবে উঠিবে নাচিবে ও খেলা করিবে। এই শ্রীভগবানই সত্য ও সার, এই ভগবানই সর্ব্ব-মূলাধার, আমি তাঁহার তিনি আমার, আমাতে তিনি ও তাঁহাতে আমি। এই বোধ লইয়া, এই বোধ-অনুসারে যাহা করা যায়, তাহাই ভাগবত-ধর্ম্ম। এখানে ভাঙ্গাও আছে গড়াও আছে, ভাঙ্গার জন্য গড়া আর গড়ার জন্য ভাঙ্গা। এখানে লীলা, খেলা, ভাঙ্গা-গড়ার খেলা, গড়া-ভাঙ্গার খেলা। এখানে রুদ্র আছে ব্রহ্মা আছে—বিষ্ণুশক্তি বা বৈষ্ণবী-শক্তির দ্বারা বিধৃত হইয়া প্রলয় আছে সৃষ্টি আছে। এই বিষ্ণু সত্ত্বগুণ—কিন্তু ভিতরে ত্রিগুণ, শেষে নিগুর্ণ ও গুণাতীত। ইনিই ভগবান্—লীলাময় ভগবান্, নিত্য-লীলাময় ভগবান্। সৃষ্টিও তাঁহার লীলা, প্রলয়ও তাঁহার লীলা। ত্রিগুণের খেলা এই বিশ্ব, ইহাও তাঁহার লীলা, জীবের জাগরণ বা আত্মশক্তির খেলা, ইহাও তাঁহার লীলা।

গুণাশ্রিত ধর্ম্ম কি? বিশ্বতত্ত্ব যেমন রহিয়াছে তাহা মানিয়া লইয়া, বিশ্বতত্ত্বের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করাই যে-ধর্ম্মের লক্ষ্য, যে-ধর্ম্মের দ্বারা এই বিশ্ব-ব্যবস্থাকে নিজের অনুকূলে রাখা যায় তাহারই নাম গুণাশ্রিত ধর্ম্ম। নিগুর্ণ ধর্ম্ম কি? জীবের নিজের স্বরূপের বোধের উপর যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, যে-ধর্ম্ম মানুষকে নিজের স্বরূপ বোধের সর্ব্ববিধ বাধার সহিত সংগ্রামে নিয়োজিত করিয়া মুক্তি-কামী করে, তাহার নাম নিগুর্ণ-

ধর্ম্ম। ভাগবত-ধর্ম্ম কি? আত্মজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও যে-ধর্ম্ম মানুষকে বুঝাইয়া দেয় যে মানুষ পৃথক নহে, ভগবত্ত্বে বা শিবত্বে এই জীবের প্রতিষ্ঠা ও সফলতা, যে-ধর্ম্ম মানুষকে মুক্তি-কামনা বা মোক্ষাভিসন্ধি ছাড়াইয়া প্রেমভক্তি ও সেবাধর্ম্মে নিয়োজিত করে এবং নিত্যলীলায় লইয়া যায় তাহারই নাম ভাগবত-ধর্ম্ম। নির্গুণ ধর্ম্ম যে কোথায় শেষ হয় আর ভাগবত-ধর্ম্ম যে কোথায় আরম্ভ হয়, তাহা সব সময়ে বোঝা যায় না। It is difficult to realize where Man ends and God begins. সেই জন্যই লীলায় দেখা যাইবে, মানুষে ভগবান, আর ভগবানে মানুষ—মানুষই ভগবান্ আর ভগবানই মানুষ।

৩। গুণাশ্রিত ধর্ম্ম

মনের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা, দেহের দ্বারা মানুষ পাপাচরণ করে। বিশ্বব্যবস্থার সহিত মানুষকে নিজের যে-সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে হইবে সেই সামঞ্জস্য সে রাখিতে পারে না, ভাঙ্গিয়া ফেলে। মানুষ পাপাচরণ করে, ইচ্ছা করিয়া করে, অবশ হইয়া করে, আবার এমন কতকগুলি পাপ আছে, প্রাণধারণের জন্য মানুষ তাহা না করিয়া পারে না। পাপাচরণ করিলে মানুষকে কি করিতে হইবে? মানুষকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। মনু প্রভৃতি ব্যবস্থাপক প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই দেহ থাকিতে থাকিতে পাপাচারী মানুষ ইহলোকেই যদি প্রায়শ্চিত্ত না করে তাহা হইলে তাহাকে নরকে যাইতে হয়, যাতনা পাইতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন, যথাকালে প্রয়োজন। বিলম্বে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত। কোন্ পাপে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত, তাহারও ব্যবস্থা আছে। ইহাই গুণাশ্রিত ধর্ম্ম।

গুণাশ্রিত ধর্ম্ম মূলতঃ বা মুখ্যতঃ একটি সামাজিক ব্যবস্থা। পাপের প্রায়শ্চিত্ত না থাকিলে, পাপীর দণ্ড না থাকিলে সমাজ থাকে না, কাজেই সমাজের যাঁহারা কর্ত্তা তাঁহাদিগকে দেখিতে হইবে যেন সকলেই যথা-শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হয়। আমাদের সমাজ কেবল মানুষের সমাজ নহে। দেবতারাও এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং দেবতারা এই সমাজের নেতা ও নিয়ামক। দেবতাদের সঙ্গে মানুষের সর্ব্বদাই আদান প্রদান চলিতেছে—এই সমাজে দেবতারও স্বার্থ আছে। ভুঃ, ভুবঃ ও স্বঃ, এই ত্রিলোক লইয়াই আমাদের সমাজ।

অজামিলের উপাখ্যানে বিষ্ণুদূত যমদূতকে ছয়টি প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

ব্রূত ধর্ম্মস্য নস্তত্ত্বং যচ্চ ধর্ম্মস্য লক্ষণং।
কথং স্বিদ্ধ্রিয়তে দণ্ডঃ কিং বাস্য স্থানমীপ্সিতং॥
দণ্ড্যাঃ কিং কারিণঃ সর্ব্বে আহোস্বিৎ কতিচিন্নৃণাং॥

১। ধর্ম্মের স্বরূপ কি? ২। ধর্ম্মের প্রমাণ কি? ৩। কি প্রকারে দণ্ড ধারণ করিতে হয়? ৪। দণ্ডের ঈপ্সিত স্থান কি? ৫। যাহারা দণ্ডনীয় তাহাদের কর্ম্ম কি? ৬। কর্ম্মীগণের মধ্যে কে কে দণ্ডনীয়?

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় বলেন, এই ছয়টি প্রশ্নে ধর্ম্মের স্বরূপ ও প্রমাণ, আর দণ্ডের প্রকার, কারণ, বিষয় ও ব্যবস্থা, জিজ্ঞাসিত হইয়াছে।

যমদূত এই প্রশ্ন ছয়টির যে উত্তর দিলেন, তাহাতেই গুণাশ্রিত ধর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। যমদূতের উত্তর—

১। বেদে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম। "যো বেদ-প্রমাণকঃ স ধর্ম্মঃ" (শ্রীধর) ইহাই ধর্ম্মের স্বরূপ।

২। "যো ধর্ম্মঃ স বেদপ্রমাণকঃ" যাহা ধর্ম্ম তাহা বেদের দ্বারা প্রমাণিত। ইহাই ধর্ম্মের লক্ষণ বা প্রমাণ।

জৈমিনিও ইহাই বলিয়াছেন "চোদনা লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" "শ্রুত্যর্থ্যাভ্যাং নিরূপ্যতে"। বিষ্ণুদূত ধর্ম্মেরই স্বরূপ ও লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। কিন্তু দণ্ডের স্থান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অধর্ম্ম কি, তাহা না জানিলে দণ্ডের স্থান নিরূপিত হইবে না। এইজন্য যমদূত জিজ্ঞাসিত না হইয়াও অধর্ম্মের স্বরূপ ও লক্ষণ বলিলেন। যাহা বেদনিষিদ্ধ তাহাই অধর্ম্ম। নিষেধই অধর্ম্মের প্রমাণ। এইবার প্রশ্ন হইবে, বেদের প্রমাণ কি? যমদূত উত্তরে বলিলেন—বেদ নারায়ণ হইতে উৎপন্ন, সাক্ষাৎ নারায়ণ-স্বরূপ। বেদ স্বয়ম্ভু নারায়ণের নিশ্বাসমাত্রে স্বয়ং উদ্ভূত। এইবার প্রশ্ন হইবে, নারায়ণ কে? উত্তর, যিনি আপনার স্বরূপে থাকিয়া সত্ব, রজঃ ও তমোময় প্রাণিসকলকে শান্তত্ব, ঘোরত্ব ও মূঢ়ত্বগুণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নাম, অধ্যয়ন যুদ্ধ, বাণিজ্যাদি ক্রিয়া এবং বর্ণ আশ্রমাদি রূপের দ্বারা প্রকাশিত ও বিভাজিত করেন,—তিনিই নারায়ণ।

শ্রীমদ্ভাগবতের দুইটি শ্লোকে এই কথাগুলি বলা হইয়াছে।

বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।
বেদো নারায়ণো সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুম॥
যেন স্বধাম্ন্যমী ভাবা রজঃ সত্ত্ব তমোময়াঃ।
গুণনাম ক্রিয়ারূপৈর্বিভাব্যন্তে যথাতথং॥

৩। মানুষ অধর্ম্ম করিল, ইহা কিরূপে জানা যায়? উত্তর,—সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, আকাশ, পবন, সন্ধ্যা, দিবা, রাত্রি, দিক্, পৃথিবী, জল এবং ধর্ম্ম, ইহারাই জীব সকলের আচরণের সাক্ষী। ইঁহাদের দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, উভয়ই জানা যায়।

সূর্য্যোঽগ্নিঃ খং মরুদ্দেবঃ সোমঃ সন্ধ্যাহনী দিশঃ।
কং কুঃ স্বয়ং ধর্ম্ম ইতি হ্যেতে দৈহস্য সাক্ষিণঃ॥

৪। অধর্ম্মই দণ্ডের স্থান।

এতৈরধর্ম্মো বিজ্ঞাতঃ স্থানং দণ্ডস্য যুজ্যতে।

৫। কর্ম্মী লোকমাত্রেই, দণ্ডাহ যাহার যেমন পাপ সে সেইরূপ দণ্ড পাইয়া থাকে।

সর্ব্বে ক্রমানুরোধেন দণ্ডমর্হন্তি কারিণঃ॥

৬। যাঁহার গুণসঙ্গ আছে, অর্থাৎ প্রকৃতির ত্রিগুণে যিনি বদ্ধ, তিনি কর্ম্ম করিতে বাধ্য। কর্ম্ম করিতে গেলে ভদ্র ও অভদ্র, উভয়ই সম্ভব। কর্ম্ম যদি না থাকে, কোন মানুষ যদি একেবারে কর্ম্মশূন্য হইতে পারে তাহা হইলে তাহার অভদ্র হয় না। কিন্তু, কর্ম্মশূন্য জীব নাই, সকলেই কর্ম্মকর্ত্তা। কর্ম্মিদের পাপ অবশ্যই হয়, অতএব সকল কর্ম্মীই দণ্ডার্হ।

সম্ভবন্তি হি ভদ্রাণি বিপরীতানি চানঘাঃ।
কারিণাং গুণসঙ্গোঽস্তি দেহবাম্নহ্যকর্ম্মকৃৎ॥

কেবল সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতিই যে কর্ম্মের সাক্ষী তাহা নহে, জীবকে দেখিয়া যুক্তির দ্বারাও তাহার কর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্ম বেশ বুঝিতে পারা যায়। অনুমান করিয়া বুঝিবার শক্তি কিছু কিছু সকলেরই আছে। ধর্ম্মরাজ যমের এই শক্তি পূর্ণমাত্রায় আছে। তিনি সংযমনী-পুরীতে বসিয়া মনের দ্বারা যাবতীয় জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখিয়া থাকেন এবং তদনুসারে বিচার করেন। তিনি ব্রহ্মার ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ। জীব প্রাক্তন কর্ম্মের ফলে যে দেহ পাইয়াছে, সেই দেহকেই 'আমি' বলিয়া বিবেচনা করে, সে যে দেহ নহে, সে দেহী এবং

দেহ হইতে ভিন্ন ও দেহের প্রভু, ইহা সে বুঝিতেই পারে না। তাহার জন্মান্তরীণ স্মৃতি নাই। প্রকৃতির সঙ্গবশতঃ জীবের এই বিপর্য্যয় ঘটে। যদি সে ঈশ-সঙ্গ করে তাহা হইলেই পরিত্রাণ পায়।

এই সব তত্ত্বকথা বলিয়া যমদূত বিষ্ণুদূতের নিকট অজামিলের জীবন-কথা বর্ণনা করিলেন। অজামিলের ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। প্রথম বয়সে অজামিল শ্রুতসম্পন্ন ও 'শীলবৃত্তগুণালয়' ছিলেন। তাহার সুস্বভাব ছিল, সদাচার ছিল, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণ ছিল। অজামিল 'ধৃতব্রতোমৃদুর্দান্তঃ সত্যবাঙ্‌মন্ত্রবিচ্ছুচিঃ' ছিলেন। ইনি ব্রতধারী ছিলেন, মৃদু, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, মন্ত্রবিৎ ও শুচি ছিলেন।

গুর্ব্ব্যগ্ন্যতিথিবৃদ্ধানাং শুশ্রূষুরনহঙ্কৃতঃ।
সর্ব্বভূতসুহৃৎসাধু মিতবাগনসূয়কঃ॥

ইনি গুরু, অগ্নি, অতিথি ও বৃদ্ধগণের সেবা করিতেন। ইঁহার অহঙ্কার ছিল না। ইনি সর্ব্বভূতের সুহৃৎ ছিলেন, সাধু, মিতভাষী ও অনসূয়ু ছিলেন, কাহারও কোন গুণে দোষারোপ করিতেন না। অজামিল সর্ব্বতোভাবে ধাম্মিক ছিলেন।

এই অজামিল একদিন তাঁহার পুণ্যাত্মা পিতার আদেশে পূজা ও হোমের জন্য ফল পুষ্প সমিৎ ও কুশ আনিতে গিয়াছিলেন। পথে এক দুশ্চরিত্রা নারীকে দেখিয়া তাহার পতন হইল। তাহার পর সে সারাজীবন কেবল পাপাচরণই করিয়াছে।

যদসৌ শাস্ত্রমুল্লঙ্ঘ্য স্বৈরচার্য্যতিগর্হিতঃ।
অবর্ত্তত চিরং কালমঘায়ুরশুচির্মলাৎ॥
তত এনং দণ্ডপাণেঃ সকাশং কৃতকিল্বিষং।
নেষ্যামোঽকৃতনির্ব্বেশং যত্র দণ্ডেন শুদ্ধ্যতি॥

এই ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়াছে, যথেচ্ছাচার করিয়াছে, অতিশয় গর্হিত জীবন যাপন করিয়াছে। ইহার পরমায়ুই পাপস্বরূপ, এ ব্যক্তি সারাজীবন মলরূপ দাসীর অন্ন ভোজন করিয়াছে। সেইজন্য এই পাপাচারীকে দণ্ডপাণি যমের নিকট আমরা লইয়া যাইব, এ ব্যক্তি পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করে নাই, যমদণ্ড ভোগ করিলে এ ব্যক্তি শুদ্ধ হইবে।

যমদূতেরা এই যে ধর্ম্ম বলিলেন, আমরা বলিয়াছি, এই ধর্ম্মের নাম গুণাশ্রিত ধর্ম্ম।

যমের দুতেরা এই ধর্ম্মই জানেন। এই ধর্ম্মের সার কথা, মানুষ অবিদ্যাচ্ছন্ন, অতএব মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা মানুষ পাপাচরণ করিবে। মানুষের পক্ষে এই পাপাচরণ স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। পাপ করিলেই তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যদি ইহলোকে যথাকালে প্রায়শ্চিত্ত না করে, যদি বিলম্বে প্রায়শ্চিত্ত করে তাহাকে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কোন্ পাপে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে তাহা স্মার্ত্ত ব্যবস্থাপকগণ বলিয়া গিয়াছেন। ইহলোকে প্রায়শ্চিত্ত না করিলে মৃত্যুর পর নরকে যাইতে হইবে এবং যমদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। যমদণ্ড ভোগ করিয়া মানুষ শুদ্ধ হইবে।

প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা কিরূপ তাহা জানা দরকার। সত্যযুগে ব্রত করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, ত্রেতাযুগে ধেনুদান করিলেই প্রায়শ্চিত্ত হয়। দ্বাপর ও কলিযুগে কোনরূপ কৃচ্ছ্রব্রতের প্রয়োজন হয় না, মূল্য দিলেই প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। ইহাই প্রচলিত ব্যবস্থা। আমরা অনেকে এই প্রচলিত ব্যবস্থাকেই মানুষের ধর্ম্মজীবনের জন্য যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করি।

কৃতে ব্রতং সমাদিষ্টং ত্রেতায়াং ধেনুরেব চ।
কৃচ্ছ্রাদীনাস্তু সর্ব্বেষাং মূল্যন্তু দ্বাপরে কলৌ॥

এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতের নহে, স্মৃতিশাস্ত্রের প্রচলিত ব্যবস্থা। যুগভেদে প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থার যে ভেদ হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে দেখা যায় কলিযুগে মূল্যের দ্বারা বা অর্থদণ্ডের দ্বারা প্রায় সর্ব্ববিধ প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। একটা উদাহরণ দিলেই বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্ব দিন কেশ ও নখ বপন করিতে হয়—মস্তক-মুণ্ডন করিতে হয়, নখচ্ছেদ করিতে হয় মাথা মুড়াইতে কাহারও যদি আপত্তি বা অনিচ্ছা থাকে, তাহা হইলে কি হইবে?

কেশানং ধারণার্থন্তু দ্বিগুণং ব্রতমাচরেৎ।
দ্বিগুণে তু ব্রতে চীর্ণে দ্বিগুণা দক্ষিণা ভবেৎ॥

শেষ কথা দক্ষিণা বাড়াইয়া দিলেই হইবে।

প্রায়শ্চিত্তের এই যে ব্যবস্থা—কেবল দক্ষিণা দিলেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে, ইহা

সামাজিক দণ্ডের ব্যবস্থামাত্র। ব্যবস্থাটা যে মন্দ তাহা নহে, কিন্তু ইহাতে কি মানুষ পাপ হইতে মুক্ত হইবে?

একদল লোক বলিবে মানুষ কি কোন কালে পাপ হইতে মুক্তি পাইতে পারে? এই মানবসমাজ চিরকালই এইরূপ থাকিবে।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে যেমন পুলিশ মনে করে, মানুষ চিরকাল চুরি ডাকাতি ও খুন করিবে, অতএব চিরকালই দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিবে এবং বর্ত্তমানে যেরূপ ব্যবস্থা আছে সেইরূপ ব্যবস্থাই থাকিবে। উকিল মনে করে, মানুষ চিরকালই মাম্‌লা মোকদ্দমা করিবে, ইহা মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ চিকিৎসক মনে করে মানুষ চিরকালই রোগে ভুগিবে। এই গেল এক শ্রেণীর লোকের মত। তাহারা মনে করে যাহা চলিতেছে, তাহা সনাতন। তাহারা মুখে যাহাই বলুক, মানুষের উপর তাহাদের বিশ্বাস নাই, বর্ত্তমান ব্যবস্থা বা আইন কানুনকে তাহারা অভ্রান্ত, নিরপেক্ষ, চিরন্তন ও স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচনা করে। আর এক প্রকারের লোক আছে। মানুষ চুরি করিলেই তাহারা প্রচলিত আইনের পুস্তক খুলিয়া আইনানুসারে তাহাকে দণ্ড দিবার জন্য ব্যস্ত হইবে না। তাহারা বলিবে, এতদিন ধরিয়া এই প্রকারে চুরির জন্য মানুষকে দণ্ড দেওয়া হইতেছে, কিন্তু চুরি কমে কৈ? তাহারা হয়ত বলিবে প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থাই দূষণীয়। কয়েকজন লোক বা এক শ্রেণীর লোক গায়ের জোরে বা দুর্বুদ্ধির জোরে অমিত সুবিধা ভোগ করিতেছে, আর একদল লোক চিরদিন দারুণ দুর্দ্দশা ও অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক শিক্ষা পায় না, সাধুভাবে জীবিকার্জ্জনের কোনরূপ সুবিধা পায় না, তাহাদের হৃদয়বৃত্তির কোনরূপ মার্জ্জনা বা অনুশীলন হয় না, ফলে তাহারা চুরি করে। সে যে কেন চুরি করে, সমাজের কর্ত্তারা তাহা ভাবেন না, তাহাকে কারাগারে রাখিয়া দণ্ড দান করেন। সে দণ্ড ভোগ করিয়া সংশোধিত হয় না, আরও বড়-চোর হইয়া পড়ে। কিন্তু, যে চুরি করে সে মানুষ, স্বরূপে সে 'অমৃতের পুত্র' বা 'নিত্যকৃষ্ণদাস' বা 'চিদানন্দরূপ'। সে নিজেকে ভুলিয়া গিয়াছে, অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সে ব্যক্তি অবিদ্যার হাত হইতে কিসে পরিত্রাণ পাইবে, কি করিয়া তাহার আত্মস্মৃতি ফিরিয়া আসিবে, তাহার ব্যবস্থা করিলে হয় না? প্রচলিতের পক্ষপাতী গতানুগতিক ও জড়স্বভাব সামাজিক বলিবেন, তুমি পাগল, মানুষ

কি এত সহজে ভাল হয়, আমরা অনেক দেখিয়াছি, তোমরা বাস্তব জগতের কিছুই জান না, তোমরা স্বপ্ন লইয়া রহিয়াছ।

কিন্তু, যাহারা স্বপ্ন দেখে, তাহাদের মানুষের প্রকৃতির উপর বিশ্বাস আছে। তাহারা জানে মানুষ স্বভাবতঃ পাপী নহে, ধূর্ত্ত নহে, রুগ্ন নহে। কর্ম্মদোষে, ব্যবস্থার দোষে সে পাপী ধূর্ত্ত বা রুগ্ন হইয়াছে। এখন বাহির হইতে কঠোরভাবে তাহাকে কেবল শাস্তি দিলে কি হইবে? যেমন চিকিৎসা-ব্যাপারে দেখা যায়, মানুষটার স্বাস্থ্যকর বাড়ী নাই, পরিধেয় বস্ত্র নাই, খাইবার অন্ন নাই সে ব্যাধিতে ভুগিতেছে। তাহাকে ঔষধ দেওয়া হইল, আপাততঃ রোগ সারিল। কিন্তু আবার রোগ হইল। আবার ঔষধ দেওয়া হইল, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ ঔষধ দেওয়া হইল, রোগ সারিল। কিন্তু রোগের হেতুগুলি অপসারিত না হওয়ায় আবার রোগ হইল। কি বলিবেন? আপনি কি বলিবেন, রোগ হওয়াই স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী? রোগের হেতুগুলি দূর করিলে দেখিবেন, তাহার আর রোগ হইবে না।

তাহা হইলে দেখা গেল, সংসারে দুই প্রকারের মানুষ রহিয়াছে। একদল লোক মনে করে, যাহা চলিতেছে তাহাই সনাতন, তাহাকে মানিয়া চলাই ধর্ম্ম। যাহা চলিতেছে তাহার ভিতর ভ্রান্তি আছে, কুসংস্কার আছে, তাহার আমূল সংস্কার প্রয়োজন, এ কথা বলিলে, তাহারা অত্যন্ত রুষ্ট হইবে।

আর একদল লোক বলে মানুষের শক্তির উপর বিশ্বাস কর। এই মানুষ সংসারে আসিয়াছে, যাহা চলিতেছে তাহাই মানিয়া লইতে নহে। মানুষ আসিয়াছে, যাহা চলিতেছে তাহার পরিবর্ত্তন করিতে, তাহার সংশোধন করিতে। 'গুণাশ্রিত' ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহার সম্বন্ধে একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, এই ধর্ম্মের যাহারা একান্ত অনুবর্ত্তী তাহারা বিশ্বাসই করেনা যে জগৎ বা সমাজ বা মানবজাতি ক্রমে ক্রমে উন্নতি বা মঙ্গলের অভিমুখে যাইতেছে। তাহাদের মানুষের উপর বিশ্বাস নাই, সুতরাং ভগবানের উপরও বিশ্বাস নাই। তাহারা যে ভগবানের পূজা করে, সে ভগবান্ কেমন? God of things as they are—সংসার সমাজ ও মানব যেমন অবস্থায় রহিয়াছে, সেগুলিকে যেন ভগবান্ ঠিক্ সেই অবস্থায় বজায় রাখিতে চাহেন, ভগবানের সৃষ্টি যেন শেষ হইয়া গিয়াছে, লীলা যেন শেষ হইয়া গিয়াছে।

৪। নিগুর্ণ ধর্ম্ম

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ত্রিবিধ ধর্ম্ম বা ধর্ম্মের ত্রিবিধ স্তর শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে অতীব নিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে সংক্ষেপে সূত্রাকারে বলা হইয়াছে। তাহার পর যমদূত, বিষ্ণুদূত ও যমরাজের কথায় তাহা বিস্তারিত হইয়াছে। তাহার পর অজামিল, ইন্দ্র, চিত্রকেতু প্রভৃতির উপাখ্যানের দ্বারা এই সব তত্ত্ব উদাহৃত হইয়াছে।

শ্রীশুকদেবের মুখে গুণাশ্রিত ধর্ম্মের কথা শুনিয়া মহারাজা পরীক্ষিত বলিলেন—

দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং যৎপাপং জানন্নপ্যাত্মনোঽহিতং।
করোতি ভূয়োবিবশঃ প্রায়শ্চিত্তমথো কথং॥
ক্বচিন্নিবর্ত্ততেঽভদ্রাৎ ক্বচাচরতি তৎপুনঃ।
প্রায়শ্চিত্তমথোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ॥

পাপ করিলে রাজদণ্ডাদি হয়, ইহা তো দেখাই যাইতেছে। শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, মৃত্যুর পর যমদণ্ড বা নরকপাত হয়। পাপ যে অহিতকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সব কথা জানিয়াও মানুষ প্রায়শ্চিত্ত করার পর বিবশ হইয়া আবার পাপাচরণ করিতে থাকে। তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মানুষের নিজের কি উপকার হইল? প্রায়শ্চিত্ত করার পর ক্বচিৎ কেহ পাপ হইতে বিরত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবার পাপ করে। যদি পাপের মূল উৎপাটিত না হয়, সে জন্য যদি নরকেই যাইতে হয়, তাহা হইলে এই সব প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন কি? এই সব প্রায়শ্চিত্ত কুঞ্জরশৌচবৎ নিস্ফল। হাতি যেমন স্নান করার পরেই আবার ধূলা মাখে, ইহাও ঠিক্ সেইরূপ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন, শ্রীশুকদেব মহারাজা পরীক্ষিতকে পরীক্ষা করিতেছেন। একবার এক প্রকারের কথা বলিয়া দেখিতেছেন মহারাজা উত্তরে কি বলেন। মহারাজা কথাগুলি বেশ চিন্তাপূর্ব্বক শুনিতেছেন কিনা এবং বিচারপূর্ব্বক বুঝিতে পারিতেছেন কি না। শ্রোতা যদি বুঝিতে না পারে, বিচার করিয়া বিবেচনা করিয়া যদি বুদ্ধিমানের মত প্রশ্ন উত্থাপন না করে, তাহা হইলে তাহাকে তত্ত্বকথা বলা অরণ্যে রোদন মাত্র। দেখা গেল, মহারাজা পরীক্ষিত ঠিক্ ধরিয়াছেন এবং প্রশ্নের মতো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। "পরীক্ষয়োত্তীর্ণং পরীক্ষিতং পুনরপি পরীক্ষিষ্যমানঃ

সিদ্ধান্তং জ্ঞাপয়তি" প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মহারাজা পরীক্ষিতকে পুনরায় পরীক্ষা করিবার জন্য অন্যরূপ সিদ্ধান্ত জানাইতেছেন।

শ্রীশুকদেব বলিলেন—

কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনং ॥৬-১-১০ ভা।

কর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ কৃচ্ছ্র বা কষ্টসাধ্য প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা কর্ম্মনির্হার অর্থাৎ কর্ম্মের বা পাপকর্ম্মের নাশ কখনই আত্যন্তিক নহে। কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপের মূলোচ্ছেদ হয় না। কারণ 'অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ'—যিনি প্রায়শ্চিত্ত করিলেন তিনি অবিদ্বান্, তাঁহার জ্ঞান নাই। তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিলেন অর্থাৎ হয় কতকগুলি কষ্টকর কার্য্য করিলেন না হয় কিছু অর্থদণ্ড দিলেন। কিন্তু, তাঁহার অবিদ্যার নাশ হইল না। পাপের সংস্কার বা বীজস্বরূপ যে বাসনা অভ্যাস প্রভৃতি, তাহা থাকিয়া গেল, সুতরাং সে ব্যক্তি আবার পাপাচরণ করিল। এই প্রকারে অবিদ্যাচ্ছন্ন মানুষ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও পুনঃ পুনঃ পাপ করিতেছে। তাহা হইলে মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত কি? পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীশুকদেব একেবারে শেষ কথা বলিবেন না। মহারাজা পরীক্ষিতকে পরীক্ষা করিয়া করিয়া, তাঁহার মনে প্রশ্ন জাগাইয়া জাগাইয়া ক্রমে ক্রমে শেষ সিদ্ধান্ত বলিবেন। এখন শ্রীশুকদেব, জ্ঞানীদের মত অবলম্বন করিয়া বলিলেন বিমর্শন বা জ্ঞানই মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত।

"কিং তর্হি মুখ্যং প্রায়শ্চিত্তমিত্যতঃ পুনরপি পরীক্ষমাণো জ্ঞানিনাং মতেনাহ বিমর্শনং জ্ঞানং তস্যৈবাবিদ্যানিবর্ত্তকত্বাদিতিভাবঃ।" বিশ্বনাথঃ

বিমর্শন বা জ্ঞানই মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত, কারণ জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নাশ হয়।* জ্ঞানের কথা শুনিয়া আত্মবিশ্বাসহীন জড়স্বভাব তামসিক লোক বলিবে জ্ঞান কি করিয়া হইবে

---

* আমরা গ্রন্থান্তরে ধর্ম্মকেই দুইভাগে ভাগ করিয়াছি। মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য ধর্ম্ম মৌলিক ও ব্যক্তিগত—Original and personal. ইহা মানুষের ভিতর হইতে আসে It comes from within the man, from his own experience আর গৌণ ধর্ম্ম Secondary and social—It is imposed on the man by an outer authority—ইহা সামাজিক—বাহির হইতে হইা মানুষের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। এই কথার মূল প্রমাণ ভাগবতে এইস্থানে আছে।

মহাশয়! আমরা যে পাপী, আমাদের অন্তঃকরণ যে অশুদ্ধ। তাহার উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—

নাশ্নতঃ পথ্যমেবান্নং ব্যাধয়োঽভিভবন্তি হি।
এবং নিয়মকৃদ্রাজন্ শনৈঃ ক্ষেমায় কল্পতে॥

রুগ্নব্যক্তি যদি সাবধানে নিয়মপূর্ব্বক পথ্যান্ন ভোজন করে, তাহা হইলে সে যেমন ক্রমে ক্রমে রোগের হাতে পরিত্রাণ পায়, রোগ তাহাকে অভিভব করিতে পারে না, ঠিক্ সেইরূপ ব্যস্ত এবং নিরাশ না হইয়া নিত্য অপ্রমত্তভাবে চেষ্টা করিলে নিয়মাদিকর্ত্তা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে। তাহা হইলে প্রত্যেক মানুষকে এই জ্ঞানের পথে পরিচালিত করাই আবশ্যক।

দুইটি শ্লোকের দ্বারা শ্রীশুকদেব এই সিদ্ধান্ত বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতেছেন।

তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শমেন চ দমেন চ।
ত্যাগেন সত্যশৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন বা।
দেহবাগ্‌বুদ্ধিজং ধীরা ধর্ম্মজ্ঞাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
ক্ষিপন্ত্যঘং মহদপি বেণুগুল্মমিবানলঃ॥১২

মৈথুন অষ্টাঙ্গ।

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানির্বৃতিরেব চ॥

ব্রহ্মচর্য্য ইহার ঠিক্ বিপরীত। কাজেই ব্রহ্মচর্য্যও অষ্টাঙ্গ। মানুষের চরিত্রে যদি কোন পাপপ্রবৃত্তি থাকে, তাহা হইলে সেই পাপের কথা ভাবিলে পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। সেই পাপ-প্রবৃত্তির যাহা বিপরীত, তাহাতে যদি মনকে নিবিষ্ট করা যায়, তাহা হইলেই পরিত্রাণ। এইজন্য মৈথুনও যেমন অষ্টাঙ্গ, মৈথুনের বিপরীত যে ব্রহ্মচর্য্য তাহাও ঠিক্ অষ্টাঙ্গ। শ্রীমদ্ভাগবতে এইজন্যই অষ্টাঙ্গ ব্রহ্মচর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। মৈথুনের এক এক অঙ্গের ঠিক্ বিপরীত ব্রহ্মচর্য্যের এক এক অঙ্গ।

১। তপস্যা—মনের ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতা। ২। শম—মনের নিয়মন ৩। দম—বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহের নিয়মন ৪। ত্যাগ—দান ৫। সত্য ৬। শৌচ ৭। যম—অহিংসাদি ৮। নিয়ম—জপাদি। এই সকলের দ্বারা সুমহৎ পাপকেও বেণুগুল্মনাশের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে নাশ করা যায়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে ধর্ম্মের ত্রিবিধ স্তর বর্ণিত হইয়াছে। প্রারম্ভে ঠিক তাহাই হইয়াছে। কিন্তু, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা এতই সূক্ষ্ম যে বিষ্ণুদূতগণের কথা ও যমরাজের কথা আমরা একসঙ্গেই আলোচনা করিব। শ্রীমদ্ভাগবতে বিষ্ণুদূতগণের কথাগুলিকে নির্গুণ ধর্ম্ম বলা হইয়াছে, আবার ভাগবত ধর্ম্মও বলা হইয়াছে। দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ এই। দ্বিতীয় স্তরের ধর্ম্ম আত্মতত্ত্ব বা জীবের স্বরূপ বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর তৃতীয় স্তরের ধর্ম্ম শ্রীভগবানের স্বরূপ-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ স্বরূপে কি তাহা বুঝিয়া মানুষকে তাহার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, সেই ধর্ম্ম নির্গুণ ধর্ম্ম। প্রকৃতির ত্রিগুণে জীব বন্ধ, কিন্তু স্বরূপে জীবের কোন বন্ধন নাই। জীব নিত্যমুক্ত। জীব নিজেকে ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই জীবের এই বন্ধন। জীব যদি নিজেকে চিনিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার আর বন্ধন থাকিবে না। জীব নিজেকে চিনিতে গেলেই নিজের নিত্যপ্রভু শ্রীভগবান্‌কে চিনিয়া ফেলিবে। শ্রীভগবান্‌কে না জানিলে নিজেকে জানিতে পারিবে না, আবার নিজেকে জানিতে না পারিলে শ্রীভগবান্‌কে জানিতে পারিবে না। আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব এইভাবে একত্র-গ্রথিত। মানুষ যে কোথায় শেষ, আর শ্রীভগবান্ যে কোথায় আরম্ভ, তাহা বুঝা যায় না। কারণ মানুষই শ্রীভগবানের ভক্ত। শ্রীভগবানের নরলীলাই সর্ব্বোত্তম, আর নরবপু তাঁহার স্বরূপের অনুরূপ। কাজেই আমরা এইবার তৃতীয় স্তরের আলোচনা করিতেছি।

৫। ভাগবত ধর্ম্ম

বিমর্শন বা জ্ঞানই মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত। নিরাশ না হইয়া তপস্যা শম দম প্রভৃতির পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলে মানুষ এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে।

এই কথা বলিয়া শ্রীশুকদেব মহারাজা পরীক্ষিতকে বলিলেন—

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্নেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥
ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপ আদিভিঃ।
যথা কৃষ্ণার্পিত প্রাণস্তৎপুরুষ নিষেবয়া॥১৩

সধ্রীচীনোহ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোহকুতোভয়ঃ
সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ ॥১৫
প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখং।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ ॥১৬
সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো নিবেশিতং তদ্গুণরাগিযৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্ স্বপ্নেহপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ ॥১৭

কতিপয় বাসুদেবপরায়ণব্যক্তি সূর্য্যকিরণে নীহার বিনাশের ন্যায় কেবল ভক্তির দ্বারা সমুদয় পাপ সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত করিয়া থাকেন। ১৩। শ্রীকৃষ্ণে প্রাণ সমর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্ত পুরুষদিগের সেবা দ্বারা যেরূপ পবিত্র হওয়া যায়, তপস্যাদি দ্বারা তাহা হয় না। ১৪। এই পথই সমীচীন ও মঙ্গলদায়ক। এই পথে কোনরূপ বিঘ্নের ভয় নাই। দয়ালু ও নিস্কাম নারায়ণপরায়ণ সাধুগণ এই পথে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। ১৫। যে ব্যক্তি নারায়ণ-পরাঙ্মুখ অর্থাৎ ভক্তিহীন,—প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা তাহার শুদ্ধি হয় না। নদীসমূহ যেমন মদ্যভাণ্ডকে শুদ্ধ করিতে পারে না, সেইরূপ। ১৬। যে সকল ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে একবারমাত্র আপনার মন নিবেশিত করেন, আর সেই মন ভগবানের গুণে অনুরাগী হয়—তাহাদের সমুদয় প্রায়শ্চিত্তই তাহার দ্বারা হইয়া যায়, যম অথবা পাশহস্ত যমদূতগণ স্বপ্নেও তাহাদের দৃষ্টিপথে আসিতে পারেন না। ১৭।

শ্লোককয়েকটির ইহাই হইল বঙ্গানুবাদ। এইবার শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য প্রাচীন টীকানুসারে অবধারণ করিতে হইবে। জ্ঞানই মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত, ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু, জ্ঞানলাভ যে বড়ই দুষ্কর—তস্যাতিদুষ্করত্বাৎ—শ্রীধরঃ। আবার বলা হইয়াছে, অগ্নির দ্বারা যেমন বেণুগুল্ম ধ্বংশ হয়, জ্ঞানের দ্বারা সেইরূপ পাপ বিনষ্ট হয়। অগ্নির দ্বারা বেণুগুল্ম ধ্বংশ হইলেও তাহার মূল একেবারে ধ্বংশ হয় না, ভবিষ্যতে জন্মাইবার সম্ভাবনা থাকে। এই উদাহরণটি শ্রীশুকদেবের মুখে শুনিয়া মহারাজা পরীক্ষিতের চিত্ত কিছু অপ্রসন্ন হইল, সেই অপ্রসন্নতা দূর করিবার জন্য শ্রীশুকদেব ভক্তদিগের মত বলিতেছেন।

"অত্রাপি বেণুগুল্মানলদৃষ্টান্তেন পুনরপি পাপপ্ররোহসূচনাদপ্রসন্নমনসং রাজানং ভক্তানাং মতেনাহ।" বিশ্বনাথঃ।

শ্রীজীবগোস্বামী মহোদয় এই শ্লোকগুলির ভিতরের তত্ত্ব নিম্ন প্রকারে বুঝাইয়াছেন। এখানে ভক্তি দুই প্রকার। সন্ততা ও কাদাচিৎকী। সন্ততা ভক্তি আবার দুই প্রকার— আসক্তিমাত্রযুক্তা ও রাগময়ী : কাদাচিৎকী ভক্তি ত্রিবিধ। রাগাভাসময়ী, রাগশূন্য-স্বরূপভূতা, আভাসভূতা। এই আভাসভূতা ভক্তিই সর্ব্বোত্তম প্রায়শ্চিত্ত, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত দেখাইবেন। সেইজন্য রাগময়ীর কৈমুত্যবোধক আভাসভূতার মাহাত্ম্য বলিতেছেন। আভাসভূতাতেই যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে রাগময়ীতে যে হইবে, তাহাতে আর কথা কি? 'কাৎস্ন্যেন' কথার অর্থ বাসনা-সহ। চতুর্দ্দশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, মানুষের পাপের প্রশমন, নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার। তাহার জন্য ভক্তি-মহাদেবীকে প্রযুক্ত হইতে হইবে কেন? যিনি ভক্ত, তিনি কৃষ্ণার্পিতপ্রাণ।

পাপকর্ম্মাণং মাং সমুচিতশিক্ষাদণ্ডার্থং নরকে পাতয়তু ন পাতয়তু বা স এব মে গতিস্তস্মৈবাহ-মিত্যাত্মন এব সমর্পণেন নরকপ্রতীকারমপ্যকুর্ব্বন্ শুদ্ধভক্তিমান্।

আমি পাপ করিয়াছি, আমার উপযুক্ত শিক্ষা ও দণ্ড আবশ্যক। সেজন্য আমাকে নরকে লইয়া যাও বা না যাও, আমাকে তাহা ভাবিতে হইবে না। আমার নিজের জন্য কোনরূপ ভাবনা নাই। আমি কেবল জানি, তিনি আমার গতি, আমি নিজেকে সমর্পণ করিয়াছি। নরকের আবার কি প্রতিকার করিব? যিনি এই প্রকারে চিন্তা করেন, তিনি শুদ্ধ ভক্তিমান্, তিনিই কৃষ্ণার্পিত-প্রাণ। মানুষ এই প্রকারের অবস্থা কি করিয়া লাভ করিতে পারে? "তৎপুরুষ-নিষেবয়া"। শ্রীকৃষ্ণের যাঁহারা ভক্ত বা আপনার জন, তাঁহাদের সঙ্গ করিলে, তাঁহাদের সেবা করিলে মানুষ এই অবস্থা লাভ করে।

জ্ঞানমার্গে মানুষ এক সময়ে নিজেকে একেবারে অসহায় বলিয়া বিবেচনা করে এবং সেজন্য তাহার অত্যন্ত ভয় হয়। ভক্তিপথে সে ভয় নাই। মানুষ ভক্তিপথ আশ্রয় করিলে সচ্চরিত্র ও নিষ্কামচিত্ত দয়ালু সাধুগণ মানুষকে সর্ব্বদা সাহায্য করিয়া থাকেন। কর্ম্মমার্গেও ভয় আছে, কারণ কর্ম্মমার্গে মৎসর বা হিংসাযুক্ত লোকের সংসর্গে থাকিতে হয়। একমাত্র ভক্তিপথই সাধু ও নিরাপদ পথ, কারণ এই পথে কোনরূপ ভয়ের কারণ নাই।

কর্ম্ম ও জ্ঞানময় প্রায়শ্চিত্ত ভক্তি বা শ্রদ্ধাহীন মানুষকে শুদ্ধ করিতে পারে না।

কিন্তু ভক্তি অন্য কাহারও অপেক্ষা না করিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানহীন মানুষকে শুদ্ধ করিতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের যে শ্লোকগুলি উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার শেষ শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীল বিশ্বনাথ বলেন, একবার মাত্র যদি মন কোনরূপে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিবেশিত হয়, তাহা হইলেই মানুষের পরম কল্যাণ নিশ্চয় সাধিত হইবে। "সকৃদপি কিং পুনরসকৃৎ" ? যদি সকল সময়ের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে যে কি হইবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। "মনোপি কি পুনঃ শ্রোত্রাদি ?" শুধু যদি মনটিই কৃষ্ণপদে দেওয়া যায়, তাহাতেই জীবের শুদ্ধি ও উদ্ধার সুনিশ্চয়। অতএব, শ্রোত্র আদি সমুদয় ইন্দ্রিয়ই যদি শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত হয়, তাহা হইলে কি হয় ? শাস্ত্র বলিলেন, গুণরাগি মন অর্থাৎ যে মন সর্ব্বদাই প্রাকৃতিক বিষয়-সমূহে আসক্ত, সেই মনই যদি একবার কোনরূপে শ্রীকৃষ্ণচরণে যুক্ত হয়। তাহা হইলে যে মন বিষয়রাগশূন্য বা নির্ম্মল, সেই মন যদি দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার ফল কত ? ভগবদ্গীতায় আছে—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্য সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য চিন্তা করিলে আমরা দেখিতে পাইব—মানুষের যত শক্তি বা প্রবৃত্তি আছে, তন্মধ্যে ইচ্ছাশক্তিই প্রধান। ইচ্ছাশক্তির অনুশীলনের দ্বারাই মানুষের উন্নতি ও মঙ্গল হইয়া থাকে। ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা না হইলে মানুষের কিছুতেই কিছু হইবে না। ইচ্ছাশক্তির জাগরণ কি প্রকারে হয় ? আত্মবিশ্বাসের দ্বারাই আত্মশক্তির জাগরণ হয়। নিজের উপর বিশ্বাস, আমি অনন্তের আমি অমৃতের আমি সর্ব্বের, অতএব আমিও অনন্ত, অমৃত ও সর্ব্ব, এই বোধ যদি কোন প্রকারে এক নিমেষের জন্যও কাহারও চিত্তে জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে এই বোধের বা বিশ্বাসের কিছুতেই ধ্বংশ হয় না। প্রাচীন সংস্কারের দ্বারা চালিত হইয়া, দেহ ইন্দ্রিয় ও মনের দীর্ঘকালের অভ্যাসের ফলে এই বোধের জাগরণের পরেও মানুষ যদি বিপথগামী হয়, তাহা হইলেও সে আবার ফিরিয়া আসে ; সংগ্রাম করিয়া দুই চারিবার পরাজিত হইয়াও

আবার সে ফিরিয়া আসে। এই বোধ অমৃত-স্বরূপ, একবার আসিলে বা একবার জাগিলে ইহার আর ধ্বংশ হয় না। শ্রীভগবান্ গীতায় যে বলিয়াছেন—আমার ভক্ত 'ন প্রণশ্যতি' একেবারে নষ্ট হয় না, বুদ্ধিযোগ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'এই যোগের অভিক্রমের নাশ নাই, ইহাতে প্রত্যবায় নাই, এই ধর্ম্মের অতি অল্পমাত্র পাইলেও মানুষ তাহার সাহায্যে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পায়'—এই সব কথার ইহাই অর্থ।

বিষ্ণুদূত যমদূতকে কি বলিলেন, এইবার তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। ষষ্ঠস্কন্ধের দ্বিতীয়াধ্যায়ে এই কথা আছে। এই অধ্যায়ের টীকার প্রারম্ভে পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—

দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবৈর্যাম্যান্নামমাহাত্ম্যমদ্ভুতং।
শ্রাবয়িত্বা দ্বিজো বিষ্ণুলোকং নীত ইতীর্য্যতে ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিষ্ণুদূতগণ যমদূতদিগকে ভগবানের নামের মাহাত্ম্য শুনাইলেন। এই নাম-মাহাত্ম্য অদ্ভুত। নামমাহাত্ম্য শুনাইয়া ব্রাহ্মণ অজামিলকে যমপাশ হইতে মুক্ত করিয়া বিষ্ণুলোকে লইয়া গেলেন। শ্রীধর স্বামীর এই উক্তির কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। নামের মহাত্ম্য যে অদ্ভুত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু, অজামিলকে বিষ্ণুদূতেরা তো সঙ্গে সঙ্গে বা তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুলোকে লইয়া যান নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

তং যাম্যপাশান্নির্মুচ্য বিপ্রং মৃত্যোরমূমুচন্।

সেই বিপ্র অজামিলকে যমপাশ ও মৃত্যু হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

তাহার পর—

দ্বিজঃ পাশাদ্বিনির্মুক্তো গতভীঃ প্রকৃতিং গতঃ।
ববন্দে শিরসা বিষ্ণোঃ কিঙ্করান্ দর্শনোৎসবঃ ॥
তং বিবক্ষুমভিপ্রেত্য মহাপুরুষকিঙ্করাঃ।
সহসা পশ্যতস্তস্য তত্রান্তর্দধিরেঽনঘ ॥
অথাজামিল আকর্ণ্য দূতানাং যমকৃষ্ণয়োঃ।
ধর্ম্মং ভাগবতং শুদ্ধং ত্রৈবেদ্যঞ্চ গুণাশ্রয়ং ॥

ভক্তিমান্ ভগবত্যাশু মাহাত্ম্যশ্রবণাদ্ধরেঃ।
অনুতাপো মহানাসীৎ স্মরতোঽশুভমাত্মনঃ॥
অহো মে পরমং কষ্টমভূদবিজিতাত্মনঃ।
যেন বিপ্লাবিতং ব্রহ্ম বৃষল্যাং জায়তাত্মনা॥
ধিঙ্মাং বিগর্হিতং সদ্ভির্দুস্কৃতং কুলকজ্জলং।
হিত্বা বালাং সতীং যোঽহং সুরাপীমসতীমগাৎ॥
বৃদ্ধাবনাথৌ পিতরৌ নান্যবন্ধূ তপস্বিনৌ।
অহোঽধুনা ময়া ত্যক্তাবকৃতজ্ঞেন নীচবৎ॥
সোঽহং ব্যক্তং পতিষ্যামি নরকে ভৃশদারুণে।
ধর্ম্মঘ্নাঃ কামিনো যত্র বিন্দন্তি যমযাতনাঃ।
কিমিদং স্বপ্ন আহোস্বিৎ সাক্ষাদ্দৃষ্টমিহাদ্ভুতং।
ক্ব যাতা অদ্য তে যে মাং ব্যকর্ষন্ পাশপাণয়ঃ॥
অথ তে ক্ব গতাঃ সিদ্ধাশ্চত্বারশ্চারুদর্শনাঃ।
ব্যমোচয়ন্নীয়মানং বদ্ধাপাশৈরধোভুবঃ॥
অথাপি মে দুর্ভগস্য বিবুধোত্তমদর্শনে।
ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসীদতি॥
অন্যথা ম্রিয়মাণস্য নাশুচে বৃষলীপতেঃ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহার্হতি॥
ক্বচাহং কিতবঃ পাপো ব্রহ্মঘ্নো নিরপত্রপঃ।
ক্ব চ নারায়ণেত্যেতদ্ভগবন্নাম মঙ্গলং॥
সোঽহং তথা যতিষ্যামি যতচিত্তেন্দ্রিয়ানিলঃ।
যথা ন ভূয় আত্মানমন্ধে তমসি মজ্জয়ে॥
বিমুচ্য তমিমং বন্ধমবিদ্যাকামকর্ম্মজং।
সর্ব্বভূতসুহৃচ্ছান্তো মৈত্রঃ করুণ আত্মবান্॥
মোচয়ে গ্রস্তমাত্মানং যোষিন্ময্যাত্মমায়য়া।
বিক্রীড়িতং যয়ৈবাহং ক্রীড়ামৃগ ইবাধমঃ॥
মমাহমিতি দেহাদৌ হিত্বা মিথ্যার্থধীমতিং।
ধাস্যে মনো ভগবতি শুদ্ধং তৎ কীর্ত্তনাদিভিঃ॥ ৬।২।২২—

যমপাশ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত দ্বিজ অজামিল গতভয় ও প্রকৃতিস্থ হইলেন। বিষ্ণুদূতগণকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইতেছে আমার জীবনে আজ পরম উৎসব উপস্থিত। তিনি মস্তকের দ্বারা বিষ্ণুদূতগণকে প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষের অনুচরগণ (বিষ্ণুদূতগণ) বুঝিলেন, অজামিল যেন কিছু বলিতে চায়। তাঁহারা আর অপেক্ষা করিলেন না, অজামিলের সমক্ষে সেই স্থানেই তাঁহারা অন্তর্হিত হইলেন। যমদূত ও বিষ্ণুদূতগণের মধ্যে যে কথোপকথন হইল তাহাতে বেদত্রয় প্রতিপাদ্য গুণাশ্রয় ধর্ম্ম আর ভাগবতধর্ম্মের আলোচনা হইয়াছিল। অজামিল তাহা শুনিয়াছিলেন। হরির মাহাত্ম্য শুনিয়া অজামিল তৎক্ষণাৎ ভগবানে ভক্তিমান্ হইলেন এবং নিজের অতীত জীবনের অশুভসমূহ স্মরণ করিয়া অতিশয় অনুতাপ উপস্থিত হইল। অজামিল ভাবিতেছে, হায় আমি ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারি নাই, সেই জন্যই আমার অতি ভয়ানক কষ্ট হইয়াছে। আমি শূদ্রার গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিয়া ব্রাহ্মণ জাতি বিনষ্ট করিয়াছি। আমাকে ধিক্, আমি সাধুগণনিন্দিত দুস্কৃতকারী, আমি আমার বংশের কলঙ্ক। আমি বালিকা সতী স্ত্রী ত্যাগ করিয়া অসতী মদ্যপায়িনীর সঙ্গ করিয়াছি। আমার পিতামাতা বৃদ্ধ ও অনাথ ছিলেন, আমি ছাড়া তাঁহাদের আর কেহই ছিল না, আমার জন্য তাঁহাদের কতই না সন্তাপ হইয়াছে। আমি অকৃতজ্ঞ ও অতিশয় নীচ, আমি তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। আমাকে অতি ভয়ঙ্কর নরকে পড়িতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মনাশক কামী ব্যক্তির যেরূপ যমযাতনা হয়, আমারও তাহাই হইবে।

তাহার পর, অজামিলের মনে হইতেছে, এইমাত্র আমি যে আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম, তাহা কি? তাহা কি স্বপ্ন? আমি কি জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিলাম! পাশহস্তে যাহারা আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল, তাহারাই বা কোথায় গেল? পাশে বদ্ধ হইয়া আমি যেন ভূমির নীচে গৃহীত হইতেছিলাম, কাহারা আমায় মুক্ত করিলেন? সেই চারিজন সিদ্ধপুরুষ কোথায়? তাঁহারা বড় সুন্দর। আমি বড় পাপী, তথাপি তাঁহারা দেখা দিলেন। আমার বোধ হয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য ছিল, তাঁহাদিগকে দেখিয়া আমার আত্মা প্রসন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বের পুণ্য না থাকিলে আমি অশুচি, বৃষলীপতি, আমার জিহ্বা কি নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিতে পারিত? আমি শঠ, পাপী, ব্রাহ্মণত্ব-নাশক ও নির্লজ্জ। আর, ভগবানের নাম পরম মঙ্গল। পূর্ব্বের পুণ্য না থাকিলে ঐ

নাম কি আমার মুখে বাহির হইত ? যাহা হউক, সকলই বুঝিয়াছি। এখন প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয় সংযমিত করিয়া আবার যাহাতে অন্ধকারে পতিত না হই, সেজন্য চেষ্টা করি। অবিদ্যা কাম ও কর্ম্ম হইতে যে বন্ধন ঘটিয়াছে সেই বন্ধন ছেদন করিয়া সর্ব্বভূতের সুহৃৎ, শান্ত, মৈত্র, করুণ ও আত্মবান্ হইয়া এই আত্মাকে মুক্ত করি। নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আত্মমায়াই এই আত্মাকে গ্রাস করিয়াছে। ঐ মায়া আমাকে ক্রীড়ামৃগ করিয়া আমাকে লইয়া খেলা করিতেছিল। এখন সকলই বুঝিয়াছি, অতএব এই দেহাদিতে 'আমি, আমার' এই বুদ্ধি ছাড়িয়া ভগবানে চিত্ত নিবিষ্ট করি। ভগবানের নাম-কীর্ত্তনের দ্বারা আমার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, এখন এই চিত্ত তাঁহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে।

অজামিলের চিত্তের এই পরিবর্ত্তন এবং তাঁহার মানসিক অবস্থা বিশেষরূপে মনে রাখিতে হইবে। এইজন্য আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের মূল শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিলাম। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন, তাহার পর অজামিল সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাদ্বারে গেলেন। এক দেবসদনে আসন করিয়া যোগস্থ হইলেন। যোগাভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখী করিয়া সমুদয় চিত্তবৃত্তি শ্রীভগবানে যুক্ত করিলেন। তাহার পর তিনি দেখিলেন, সেই বিষ্ণুদূতগণ আবার আসিয়াছেন। অজামিলের দেহ গঙ্গায় পড়িয়া থাকিল, অজামিল ভগবৎ-পার্ষদ হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। এই ব্যাপার অর্থাৎ অজামিলের বিষ্ণুলোকগমন যে সঙ্গে সঙ্গে হয় নাই, কিছুদিন পরে হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আর, যাহা হইয়াছিল, তাহাতে অস্বাভাবিক, অযৌক্তিক বা অলৌকিক যে কিছু নাই তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে।

শ্রীধর স্বামীর টীকার শ্লোক পূর্ব্বে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে তিনি বলিলেন "অজামিলকে বিষ্ণুলোকে লইয়া গেলেন"—ইহার অর্থ কি ? ইহার অর্থ অজামিলের চিত্তের এমন একটি অবস্থা ঘটাইলেন যে অবস্থা বিষ্ণুলোকগমনেরই প্রারম্ভ বা পূর্ব্বাবস্থা। 'বিষ্ণুলোক-গমন' একটা ভৌতিক ব্যাপার নহে, ইহা মানবাত্মার একটি অবস্থা। ইহা বুঝিলে আর কোনরূপ সংশয় থাকিবে না।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় দ্বিতীয় অধ্যায়ের টীকার প্রারম্ভে যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ কিছু স্পষ্ট, কিন্তু বেশ সুস্পষ্ট নহে।

দ্বিতীয়ে নামমাহাত্ম্যাদ্‌যমদূতাঃ পরাহতাঃ।
অজামিলস্য নির্বেদো বৈকুণ্ঠারোহ উচ্যতে ॥

যমদূতগণ নামমাহাত্ম্যের দ্বারা পরাহত হইলেন। অজামিলের নির্বেদ হইল এবং তিনি বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিলেন।

টীকার শ্লোকের অস্পষ্টতার জন্যই অজামিলের উপাখ্যান-সম্বন্ধে নানাজনের মনে নানারূপ ভ্রান্তি রহিয়াছে।

বিষ্ণুদূতগণ যাহা বলিলেন, নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোক হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

অয়ং হি কৃতনির্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি।
যদ্ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ ॥৭
এতেনৈব হ্যঘোনোঽস্য কৃতং স্যাদঘনিষ্কৃতং।
যদা নারায়ণায়েতি জগাদ চতুরক্ষরং ॥
স্তেন সুরাপো মিত্রধ্রুগ্‌ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজ পিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে ॥
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতং।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ ॥
ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভিস্তথা বিশুদ্ধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈস্তদুত্তমঃশ্লোকগুণোপলম্ভকং ॥
নৈকান্তিকং তদ্ধি কৃতেঽপি নিষ্কৃতে মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে।
তৎকর্ম্মনির্হারমভীপ্সতাং হরেগুর্ণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ ॥
অথৈনং মাপনয়ত কৃতশেষাঘনিষ্কৃতং।
যদসৌ ভগবন্নাম ম্রিয়মাণঃ সমগ্রহীৎ ॥
সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥
পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সংদষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাঃ ॥

গুরূণাঞ্চ লঘূনাঞ্চ গুরূণিচ লঘূনিচ।
প্রায়শ্চিত্তানি পাপানাং জ্ঞাত্বোক্তানি মহর্ষিভিঃ॥
তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদান ব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রি সেবয়া॥
অজ্ঞানাদথবাজ্ঞানাদুত্তমঃ শ্লোক নাম যৎ।
সঙ্কীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥
যথাগদং বীর্য্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।
অজানতোঽপ্যাত্মগুণং কুর্য্যান্মন্ত্রোঽপ্যুদাহৃতঃ॥

যমদূত বলিতেছে—এই অজামিল পাপী, মহাপাপী, জীবিতকালে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করে নাই। আমরা আমাদের প্রভুর ব্যবস্থানুসারে তাহাকে শোধন করিবার জন্য নরকে লইয়া যাইতেছি। ইহাতে আমরা তো কোন অপরাধ করি নাই। তবে আপনারা কেন আক্রোশ করিতেছেন? ইহার উত্তরে বিষ্ণুদূত বলিতেছেন—এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। কেবল একজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে নাই, কোটিজন্মে যত পাপ করিয়াছে, সমুদয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। সে যে **বিবশ** হইয়া হরিনাম উচ্চারণ করিয়াছে!

নাম্নো হি যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী নরঃ॥ বিশ্বনাথ-উদ্ধৃত।
একবার হরি নামে যত পাপ হরে।
সাধ্য কি পাপীর বল তত পাপ করে?
অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্ম্মৃগৈরিব॥ বিশ্বনাথ-উদ্ধৃত।

হরিনাম যে কেবল প্রায়শ্চিত্ত তাহা নহে, হরিনাম পরম স্বস্ত্যয়ন অর্থাৎ মোক্ষ-সাধন।

সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥

একমাত্র যে-ব্যক্তি 'হরি' এই দুইটি অক্ষর উচ্চারণ করে, সে-ব্যক্তি মোক্ষলাভের জন্য বদ্ধপরিকর।৭

৪

যমদূতেরা বলিতেছে—তপস্যা, যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়ার শেষে হরিনাম করিলে ঐ সব ক্রিয়ার সম্পূর্ণতা সাধিত হয়, ইহাই শাস্ত্রীয় উপদেশ। স্বতন্ত্ররূপে কেবল হরিনামে কি হইবে? ইহার উত্তরে বিষ্ণুদূত বলিতেছেন, হয়, নিশ্চয়ই হয়। আভাসমাত্রে চতুরক্ষর নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিয়াছে, তাহাতেই হইবে। পুরাণে এই প্রকারের কথা আছে। আর এই প্রকারের কথা যে অর্থবাদ, তাহা নহে। কেহ বলেন—অবশ্য বুদ্ধিপূর্ব্বক হরিনাম করিলে কাজ হইবে। কিন্তু, অজামিল তো বুদ্ধিপূর্ব্বক নারায়ণ বলে নাই। যমদূত দেখিয়া ভয়ে তাহার পুত্রকে নারায়ণ বলিয়া ডাকিয়াছিল সত্য। কিন্তু, এ ব্যক্তি তাহার এই নারায়ণ-নামক ছেলেটিকে অনেক সময়েই যে 'নারায়ণ আয়' এই বলিয়া ডাকিয়াছে, তাহাতেই যে তাহার পাপ দূর হইয়াছে (প্রথমাংশ শ্রীধর স্বামীর আর দ্বিতীয়াংশ বিশ্বনাথের ব্যাখ্যা।) ৮

যমদূত বলিতেছে—বেশ, নামে পাতক-সমূহের নাশ হয়, কিন্তু অজামিল ইচ্ছা করিয়া বহু বহু মহাপাতক করিয়াছে—এত পাপ করিয়াছে যে দ্বাদশাব্দাদি বড় বড় প্রায়শ্চিত্ত কোটি কোটিবার করিলেও তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় কিনা সন্দেহ। ইহার উত্তরে বিষ্ণুদূত বলিতেছেন, হয়, নিশ্চয়ই হয়। স্বর্ণস্তেয়ী (যে স্বর্ণ চুরি করে), মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘ্ন, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রীহত্যাকারী, গোবধকারী ও অন্যান্য মহাপাতকীর এই নারায়ণনামই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। কারণ, নারায়ণনাম উচ্চারণ করিলেই নারায়ণের মনে হয় এই লোকটি যখন আমার নাম করিতেছে তখন এ ব্যক্তি আমার আশ্রিত, আমার উচিত ইহাকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করা। ৯।১০

মনু প্রভৃতি বেদবাদী মুনিগণ পাপ হইতে পরিত্রাণের জন্য নানারূপ ব্রত ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সব ব্রত ও প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপী ব্যক্তি শুদ্ধ হয় না—হরির নাম উচ্চারণ করিলেই পাপী শুদ্ধ হয়। ইহা ছাড়া অন্য ফলও আছে। নামের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের গুণেরও প্রকাশ হয়। ১১

প্রায়শ্চিত্ত করার পরেও মন আবার পাপপথে যায়। একমাত্র ভগবানের গুণানুবাদই চিত্তশুদ্ধি করায়। ১২

অতএব ইহাকে আর পাপমার্গে লইয়া যাইও না। ইহার সমুদয় পাপ নষ্ট হইয়াছে। এ ব্যক্তি মৃত্যুকালে নারায়ণের নাম সম্পূর্ণরূপেই গ্রহণ করিয়াছে। ১৩

যদি বল, এ ব্যক্তি তাহার পুত্রের নাম গ্রহণ করিয়াছে, ভগবানের নাম নহে। বেশ কথা। কিন্তু, নামের এমনই মাহাত্ম্য যে সঙ্কেতেই হউক, পরিহাসে হউক, গীতালাপ-পূরণের জন্য হউক, বা হেলায় হউক, বৈকুণ্ঠের নাম অশেষ পাপের নাশক। ১৪

যদি বল, এ ব্যক্তি সঙ্কল্প করিয়া নাম করে নাই, পুত্রস্নেহপরবশ হইয়া নাম করিয়াছিল। তাহার উত্তর—পতিত, স্খলিত, ভগ্নগাত্র, সর্পাদিদষ্ট, রোগসন্তপ্ত বা আহত হইয়াও যদি কেহ অবশ অবস্থায় 'হরি' এই শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তাহাকে আর যমযাতনা ভোগ করিতে হয় না। ১৫

যমদূতগণ যেন বলিতেছে—আপনাদের কথা না হয় সত্যই হইল, কিন্তু গুরুপাপে গুরুপ্রায়শ্চিত্ত তো প্রয়োজন। অজামিল যে অনেক পাপ করিয়াছে, এত অল্প প্রায়শ্চিত্তে তাহার পরিত্রাণ হইবে কিরূপে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—মনু প্রভৃতির এইরূপই ব্যবস্থা সত্য। কিন্তু, মনু প্রভৃতির ব্যবস্থাপিত ব্রত দান ও তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা পাপেরই শোধন হয়, পাপীর হৃদয়ের যে মলিনতা বা সূক্ষ্ম পাপসংস্কার তাহা দূরীভূত হয় না, কিন্তু শ্রীভগবানের চরণ-সেবার দ্বারা পাপ-সংস্কারও বিদূরিত হয়। পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী মহোদয় তাঁহার টীকায় সমুদয় কথা এই প্রকারে বলিয়াছেন।

মহান্ত্যপি পাপানি সকৃদুচ্চরিতেনৈব নাম্না নশ্যন্তি। সকৃৎ প্রবর্ত্তিতেন দীপেন ইব গাঢ়ধ্বান্তানি। তদাবৃত্ত্যা তু পাপান্তরস্যানুৎপত্তিঃ দীপধারণ ইব তমোঽন্তরস্য ততশ্চ বাসনাক্ষয়াৎ হৃদয়স্য শুদ্ধিঃ। এতদর্থমেব তত্র তত্রাবৃত্তিবিধানং; পাপক্ষয়শ্চ ভবতি স্মরতাং তমহর্নিশমিত্যাদিষু তদেবাত্রাপ্যুক্তং গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবন ইতি। তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়েতি চ। অতোঽস্যাজামিলস্য হরিনাম্নৈব সর্ব্বপাপ ক্ষয়ঃ বাসনাক্ষয়স্তু মহাপুরুষদর্শনাদিভিরিতি॥

একবারমাত্র নাম উচ্চারণ করিলে মহা মহাপাপ নষ্ট হইয়া যায়। একবারমাত্র দীপ জ্বালিলে গাঢ় অন্ধকার যেমন দূরীভূত হয়, ঠিক সেইরূপ। ঐ দীপ জ্বালিয়া যদ্যপি নিভাইয়া কিম্বা সরাইয়া লইয়া না যাওয়া যায়, তাহা হইলে যেমন আর আঁধার আসে না, ঠিক সেইরূপ ঐ নাম যদি পুনঃ পুনঃ লওয়া যায়, তাহা হইলে আর পাপের উৎপত্তি হয় না। তাহা হইলে কামনার ক্ষয় হয়, হৃদয়ের শুদ্ধি হয়। এইজন্য পুনঃ পুনঃ কিম্বা নিরন্তর নাম গ্রহণের বিধি স্মরণেই পাপ ক্ষয় হয়। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—'গুণানুবাদের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়'। অতএব অহর্নিশি নামগ্রহণের

বিধি। তাহার পর বলা হইল 'শ্রীহরির পাদপদ্মসেবা'। অজামিলের জীবনে ঠিক্ ইহাই হইল। হরিনামের দ্বারা সর্ব্বপাপক্ষয়, মহাপুরুষের দর্শন লাভ আর তাহার ফলে কামনাক্ষয় প্রভৃতি। ১৭

পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক, চিত্তশুদ্ধি হউক, এইরূপ মনে করিয়া অজামিল নাম উচ্চারণ করে নাই, ইহা সত্য। কিন্তু, তাহাতে কি আসে যায়? অগ্নি যেমন কাষ্ঠ-রাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ, জ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক ভগবানের নাম সর্ব্বপাপ ভস্মসাৎ করে। ১৮

অজামিল কোন সাধুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হয় নাই, শ্রদ্ধার সহিতও নামোচ্চারণ করে নাই। ইহা সত্য। কিন্তু, যেমন কোন লোক, যদি না জানিয়াও তেজস্কর ঔষধ সেবন করে, তাহা হইলে ঔষধের যাহা ফল তাহা নিশ্চয়ই ফলিবে, নামাত্মক মন্ত্রও ঠিক্ সেইরূপ। "নহি বস্তুশক্তি শ্রদ্ধাদিকমপেক্ষতে" বস্তুশক্তি শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা করে না।

হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হিঃ পাবকঃ॥ বিষ্ণুধর্ম্ম।

দুষ্ট-চিত্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক স্মৃত হইয়াও হরি পাপসমূহ হরণ করেন। অনিচ্ছায় স্পর্শ করিলেও অগ্নি যেমন দগ্ধ করে, সেইরূপ। ১৯

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকসমূহের দ্বারা ভাগবতধর্ম্ম নির্ণীত হইল, শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ কথাই বলিয়াছেন।

যমরাজের শাসনের যে অন্যথা হয়, ইহা যমদূতেরা জানিতেন না। কাজেই তাঁহারা যমরাজকে অজামিলের কথা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—জীবলোকের শাস্তা কত জন আছেন। যমরাজ সমুদয় কথা শুনিয়া তাহাদিগকে ঐ ভাগবতধর্ম্মই ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। যমরাজের কথার সারমর্ম্ম এই। প্রচলিত ধর্ম্ম বা বিধির ধর্ম্ম, যাহা যমদূতেরা এতদিন জানিতেন, তাহাতে ভগবানের প্রসঙ্গ থাকিলেও তাহা গৌণ, ভগবানের সহিত জীবের বা জগতের যেন কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। ভগবান্ যেন জীব ও জগৎ রচনা করিয়া কতকগুলি নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্যের হাতে জীবকে ও জগৎকে ছাড়িয়া দিয়া বিশ্বের বাহিরে নিশ্চিন্তচিত্তে নিদ্রাগত হইয়া রহিয়াছেন। ভাগবত-ধর্ম্মের শিক্ষা ইহার বিপরীত। ভাগবতধর্ম্মে ভগবানই সর্ব্ব; তাই যমরাজ বলিলেন—

পরো মদন্যো জগতস্তস্থুষশ্চ ওতং প্রোতং পটবদ্যত্র বিশ্বং।
যদংশতোঽস্য স্থিতি জন্মনাশা নস্যোতবদ্যস্য বশে চ লোকঃ॥৬৷৩৷১২

দূতেরা যমরাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—আমরা জানিতাম আপনিই এই বিশ্বের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, এখন বুঝিলাম তাহা নহেন। কাজেই জানিতে চাই, এই বিশ্বের আর কয়জন শাস্তা আছেন? তাহারই উত্তরে যম বলিতেছেন—আমি ছাড়া বা আমার উপরে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের অন্য একজন অধীশ্বর আছেন। জঙ্গমের এক অংশ মানব। সেই মানবের এক অংশ পাপাচারী মানব। আমি সেই অধীশ্বরের কিঙ্কররূপে এই সব পাপাচারী মানুষের ঈশ্বর, আর তিনি সর্ব্বেশ্বর। তিনি কোথায়? যেমন একখানি বস্ত্রের সর্ব্বত্রই সূত্র, সেইরূপ এই বিশ্ব তাঁহাতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশ তাঁহারই অংশসমূহ হইতে হইয়া থাকে। নাসিকায় বাঁধা দড়ির দ্বারা পশু যেমন চালিত হয়, এই লোকসমূহ তাঁহার দ্বারা ঠিক সেইভাবে চালিত হইতেছে।

তাঁহার লীলা অচিন্ত্য। অথচ তিনি সকল জীবের হৃদয়াভ্যন্তরে দ্রষ্টারূপে বর্ত্তমান।

ধর্ম্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং নবৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ কুতোনু বিদ্যাধর চারণাদয়ঃ॥
স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ং॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে॥
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥ ১৯-২২

সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীত যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম ঋষিগণ, দেবগণ, সিদ্ধগণ, অসুরগণ, মনুষ্যগণ কেহই জানেন না, বিদ্যাধর বা চারণগণ কি প্রকারে জানিবেন?

স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা), নারদ, শম্ভু, সনৎকুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব, এবং আমি, আমরা এই দ্বাদশ জন এই ভাগবতধর্ম্ম জানি। ঐ ধর্ম্ম অতিশয় পবিত্র, গুহ্য ও অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য। ঐ ধর্ম্ম জানিলে অমৃত লাভ হয়।

শ্রীভগবানের নাম-গ্রহণাদি দ্বারা যে ভক্তিযোগ সাধিত হয়, তাহাই ইহলোকে পুরুষ সকলের পরম ধর্ম্ম।

এই কথায় স্বভাবতঃ একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিলেই যদি সমুদয় পাপ অপগত হয় তাহাহইলে দ্বাদশ-বার্ষিক প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের বিধান স্মৃতিশাস্ত্রে কেন রহিয়াছে? তাহার উত্তরে যমরাজ বলিতেছেন—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালং।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমান॥

মনু প্রভৃতি মহাজন, সত্য। (কিন্তু বৈদ্য যেমন মৃতসঞ্জীবন ঔষধ না জানায় রোগনাশের জন্য ত্রিকটুক নিম্ব প্রভৃতির ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত স্বয়ম্ভু প্রভৃতি দ্বাদশ জন ব্যতীত এই সব মহাজনেরা অতি গুহ্য এই নাম-মাহাত্ম্য না জানায় দ্বাদশাব্দিকাদি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন।) মনু বা জৈমিনি প্রভৃতির মতি দৈবী মায়ায় বিমোহিত। পুষ্পস্থানীয় অর্থবাদের দ্বারা ত্রয়ী বা বেদের কর্ম্মকাণ্ড অতিশয় মধুর, সেই মধুতে অভিনিবিষ্ট হওয়ায় এই সব 'মহাজনের মতি জড়ভাবাপন্ন হইয়াছে। সেইজন্য তাঁহারা শ্রদ্ধাসহকারে অগ্নিষ্টোমাদি বড় বড় কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা নিতান্ত প্রাকৃত লোক তাহাদের বড় বড় মন্ত্রেই শ্রদ্ধা, অল্পে শ্রদ্ধা নাই। আড়ম্বরপূর্ণ বৃহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলে তাহারা সন্তুষ্ট হয়, সংক্ষিপ্ত বা সুগম কোন উপায় বলিলে তাহারা সন্তুষ্ট হয় না। কাজেই এই ভাগবত-ধর্ম্মের গ্রাহক নাই বলিলেই হয়। সিংহ রহিয়াছে, কুকুর শৃগালাদি বারণের জন্য যেমন তাহাকে নিযুক্ত না করিয়া অন্য অকিঞ্চিৎকর উপায় অবলম্বন করা হয়, সেইরূপ অতিতুচ্ছ পাপ নিরসনের জন্য পরম মঙ্গল হরিনাম স্মরণ না করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করে। ২৫। ইহাই শ্রীধর স্বামীর অর্থ। শ্লোকোক্ত 'বৈতানিক' কথার অর্থ, দ্রব্য অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি বিস্তারশীল (বিশ্বনাথ) অতএব বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ।

অতএব—

এবং বিমৃশ্য সুধিয়ো ভগবত্যনন্তে সর্ব্বাত্মনা বিদধতে খলু ভাবযোগং।
তে মে ন দণ্ডমর্হন্ত্যথ যদ্যমীষাং স্যাৎ পাতকং তদপি হন্ত্যুরুগায়বাদঃ॥ ২৬
তে দেবসিদ্ধ পরিগীত পবিত্রগাথা যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
তান্নোপসীদত হরের্গদয়াভিগুপ্তান্নৈষাং বয়ং নচ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে॥ ২৭

যে সকল সদ্বুদ্ধি মানব এই তত্ত্ব জানিয়া ভগবান্ অনন্তে সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তিযোগ বিধান করেন, তাঁহারা আমার দণ্ড পাইবার যোগ্য নহেন। তাঁহাদের পাতক হয় না। যদি হয়, শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনে তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

যে সকল সাধুপুরুষ সমদর্শী এবং শ্রীভগবানের শরণাগত, দেবগণ ও সিদ্ধগণ তাঁহাদের পবিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, হে দূতগণ তোমরা কদাচ তাঁহাদের নিকট যাইও না, ভগবানের গদা তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সযত্নে রক্ষা করিতেছে, তাঁহাদিগকে দণ্ড দিতে আমারও শক্তি নাই, কালেরও শক্তি নাই।

যমদণ্ড কাহারা পাইবে, যমরাজ তাহাদের কথাও দূতগণকে বলিয়া দিলেন। অসাধু—মুকুন্দ-পদারবিন্দ-মকরন্দরস-পান-বিমুখ, তাহারাই দণ্ডার্হ।

৬। প্রাথমিক কথা

মানুষ হইয়া সংসারে আসিয়া যাহা জানিতেই হইবে, যাহা না জানিলে মানুষ, সত্য মানুষ, নিত্য মানুষ, বা দিব্য মানুষ হইবে না, মানুষের আভাসমাত্র হইয়া কর্ম্মবাসনায় বিতাড়িত অবস্থায় অসহায়ভাবে কালচক্রে বা ভবচক্রে বিঘূর্ণিত হইবে, সেই সব জানিবার বিষয়ের সংখ্যা নাই, সীমা নাই। মানুষের জানিবার বিষয়ও অসংখ্য, আবার জানিয়া বুঝিয়া করিবার বিষয়ও অসংখ্য। জ্ঞাতব্যেরও সীমা নাই, কর্ত্তব্যেরও সংখ্যা নাই। এই অসীম ও অসংখ্য জ্ঞাতব্য ও কর্ত্তব্যকে শ্রীমদ্ভাগবত দশভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন, ইতিহাস, শিল্পকলা বিজ্ঞানাদি যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, আর রাজ্যগঠন, রাজ্যশাসন, পরিবার-পালন, যুদ্ধবিগ্রহ, পূজাপাঠ, ধ্যানজপ, যজ্ঞবৈরাগ্য, ভক্তিপ্রেম প্রভৃতি যাহা কিছু করণীয়, তৎসমুদয়ের প্রত্যেকটিই এই দশটি বিষয়ের কোন না কোন একটির অন্তর্ভুক্ত। এই দশটি বিষয়-ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নাই,—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের অভিমত। সমগ্র বিশ্বব্যাপার এই দশভাগে বিভক্ত। এই দশটি বিষয়ের নাম সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, মন্বন্তর ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়।

জীবসমূহ বিসর্গসম্ভূত। যে ব্যবস্থায় (The force and method by which) জীব সমূহের জন্ম হয় তাহার নাম বিসর্গ। এই সব জীব নিজ নিজ অধিকারের

ভিতর অবস্থিত থাকিলে বিষ্ণু বিবিধরূপে জীব-সমূহের নিকট প্রকাশিত হইয়া তাহাদিগকে পালন করেন, রক্ষা করেন। জীব-সমূহের নিজ নিজ মর্য্যাদার বা স্বধর্ম্মের পালন এবং তাহার ফলে বিষ্ণুকর্ত্তৃক জীবের ও জীবের ভোগায়তন ও কর্ম্মক্ষেত্র-স্বরূপ এই বিশ্বের রক্ষণ বা পালনের নাম 'স্থান'। অথবা যে ব্যবস্থায় এই রক্ষণ বা পালন কার্য্য চলিতেছে, তাহার নাম 'স্থান'। এই ব্যবস্থার দুইটি দিক রহিয়াছে।

১। জীব নিজ নিজ মর্য্যাদা অতিক্রম করিবে না। প্রকৃতি প্রত্যেক জীবকেই একটি করিয়া সুনির্দ্দিষ্ট অধিকার দিয়াছেন, সেই অধিকারের ভিতরে থাকিয়া জীব নিজ নিজ ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য পালন করিবে।

২। তাহা হইলে বিষ্ণু তাহাদিগকে পালন করিবেন, রক্ষা করিবেন এবং ক্রমে ক্রমে কল্যাণতরমার্গে পরিচালিত করিবেন। এই দুইটি ব্যাপারের নাম 'স্থান'।

কিন্তু, জীব নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সকল সময়ে চলিতে পারে না। প্রকৃতির রজোগুণ প্রবল হইলেই জীব মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, অজ্ঞানতাবশতঃ করে, সঙ্গদোষে করে, আরও কত কারণে করে। যাহারা মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে তাহাদের উপায় কি? যাহারা মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, তাহারা ভক্ত হইতে পারে কি না? সাধারণতঃ মনে হয়, যাহারা মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, নিজের যাহা কর্ত্তব্য তাহা করে না, যাহা অবৈধ, অকর্ত্তব্য ও অধিকার-বহির্ভূত তাহাই করে, সে মানুষ আবার ভক্ত হইবে কি প্রকারে?

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী মহোদয় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে, মর্য্যাদালঙ্ঘনকারীও ভক্ত হইতে পারে এবং ভগবান্ সেই ভক্তকে রক্ষাও করেন। এই ব্যবস্থার নাম পোষণ। শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধের উনিশ অধ্যায়ে এই পোষণ বর্ণিত হইয়াছে।

অধ্যায়ৈকোনবিংশত্যা ষষ্ঠে পোষণমুচ্যতে।
অভিলঙ্ঘিতমর্য্যাদভক্তরক্ষণলক্ষণং॥

শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচ্য চতুর্থ বিষয় বা চতুর্থ ব্যাপার 'পোষণ' কাহাকে বলে এবং তাহার লক্ষণই বা কি, এই শ্লোক হইতে তাহা জানা যাইতেছে। মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী ভক্তের রক্ষণই পোষণের লক্ষণ।

'স্থান' কাহাকে বলে, পূর্ব্বে তাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, আর একটু ভাল করিয়া বলা প্রয়োজন। শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—

বিসর্গ-সম্ভবান্ জীবান্ স্বমর্য্যাদাসু সংস্থিরান্।
বিষ্ণুঃ পাত্যখিলরূপৈরিত্যেবং পঞ্চমে স্থিতং॥

বিসর্গসম্ভূত জীবগণ নিজ নিজ মর্য্যাদায় স্থিরভাবে থাকিলে অখিলরূপধারী বিষ্ণু তাহাদিগকে রক্ষা করেন;—ইহারই নাম স্থান বা স্থিতি। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে এই ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীভগবান্‌কে বা মানবের জীবনের যাহা পরমার্থ তাহাকে অন্বেষণ করিবার দুইটি সুপ্রসিদ্ধ পথ আছে। একটি পথের নাম "মর্য্যাদামার্গ" আর একটি পথের নাম "পুষ্টিমার্গ"। যাঁহারা 'স্থান'-তত্ত্বকে একান্তরূপে বা প্রধানরূপে আশ্রয় করিয়া, সেই তত্ত্বের সাহায্যে শ্রীভগবান্‌কে অন্বেষণ করেন, তাঁহারা মর্য্যাদামার্গের পথিক। যাঁহারা পোষণ-তত্ত্বকে একান্তরূপে বা প্রধানরূপে আশ্রয় করিয়া সেই তত্ত্বের আলোকে শ্রীভগবান্‌কে অন্বেষণ করেন, তাঁহারা পুষ্টি-মার্গের পথিক।

স্থান ও পোষণ, এই দুইটি বিষয় বা ব্যাপার কি, তাহা বলা হইল। অন্য প্রকারেও এই দুইটি বিষয়, কেবল এই দুইটি বিষয় নহে, পূর্ব্বকথিত দশটি বিষয় বুঝিতে পারা যায়। এই দশটি বিষয়কে দশ প্রকারের অধিষ্ঠানভূমি (standpoint) বলা যাইতে পারে। এই দশটি ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠানভূমি হইতে বা এই দশটি তত্ত্বের সাহায্যে মানুষ ঈশ্বরতত্ত্ব, বিশ্বতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব বুঝিতে ও আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে।

'স্থান' বলিতে কি বুঝায়? ঈশ্বরের প্রকৃতি (Nature and ways of God); বিশ্বের সহিত, জীবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ (God's relation to Nature and Man), বিষয়ক একটি বিশেষ প্রকারের মত বা ধারণার (conception, Idea) নাম 'স্থান'। আবার ঐ ঈশ্বর, ও বিশ্বজীবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ-বিষয়ক আর এক প্রকারের মত বা ধারণার নাম পোষণ।

এই যে দুই প্রকারের ধারণা বা মত (Idea, Conception, Philosophy, Theory), শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন ও দেখাইলেন, এই দুই প্রকারের মতই সত্য,

প্রত্যেকটিই আংশিক সত্য, উভয়ে মিলিয়া পূর্ণাঙ্গ সত্য। একটি অপরটির পরিপূরক (supplementary)। তবে কাহারও নিকট স্থানতত্ত্বই বড় সত্য, আবার কাহারও নিকট পোষণ-তত্ত্বই বড় সত্য। যিনি স্থানবাদী, তিনি যে পোষণ-তত্ত্ব অস্বীকার করেন, তাহা নহে; আবার যিনি পোষণ-বাদী, তিনি যে স্থানতত্ত্ব অস্বীকার করেন, তাহাও নহে। যিনি স্থানবাদী তিনি স্থানতত্ত্বকেই নিজের পক্ষে অবলম্বনীয় স্বাভাবিক ও সঙ্গত তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করেন এবং মর্য্যাদামার্গে শ্রীভগবান্‌কে অন্বেষণ করেন—মর্য্যাদামার্গই তাঁহার পক্ষে পরমার্থলাভের উপায়। যিনি-পোষণ-বাদী, তিনি এই পোষণ-তত্ত্বকেই নিজের পক্ষে অবলম্বনীয় স্বাভাবিক ও সঙ্গত তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করেন এবং ‘পুষ্টিমার্গে পরমার্থ-লাভের জন্য চেষ্টা করেন।

অবশিষ্ট আটটি তত্ত্বও আলোচ্য। কিন্তু এই দুইটি তত্ত্ব,—স্থান ও পোষণ, প্রধানতত্ত্ব বা কেন্দ্রীভূত তত্ত্ব। অন্যান্য তত্ত্বগুলিকে এই দুইটি প্রধান তত্ত্বের কোন একটির অঙ্গীভূত করিয়া দেখা যাইতে পারে। বিসর্গ, উতি, মন্বন্তর ও নিরোধ,—স্থান-তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত, আর সর্গ, ঈশানুকথা, মুক্তি ও আশ্রয়, পোষণতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত।

স্থানবাদী অনুভব করেন, জীব নিজ নিজ মর্য্যাদা পালন করিয়া স্বকর্ম্মের ফল-স্বরূপে ক্রমশঃ চরম ও পরম মঙ্গল যে শ্রীভগবান্, তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। জীবের ‘আত্মশক্তি’ই প্রথম কথা। কৃপা যে নাই, তাহা নহে। কৃপা যে বড় নহে, মূল নহে, বা প্রধান নহে, তাহাও নহে। কিন্তু, কৃপা লাভ করিব কিরূপে? আমি আমার কর্ম্মের দ্বারা ও জ্ঞানের দ্বারা কৃপা লাভ করিব। এইরূপ যাঁহারা মনে করেন, আত্মশক্তির অনুশীলনের দ্বারা কৃপা অর্জ্জন করিব, এইরূপ যাঁহারা ভাবেন, তাঁহারাই স্থানবাদী ও মর্য্যাদামার্গী।

জীবের বা মানুষের আত্মশক্তি নহে, শ্রীভগবানের কৃপাই প্রথম কথা। আত্মশক্তি যে নাই, তাহা নহে। সাধারণতঃ যেরূপ মনে হয়, তাহাতে আত্মশক্তি যে প্রধান নহে, তাহাও নহে। কিন্তু, আত্মশক্তি পাইলাম কোথা হইতে? আত্মশক্তির স্ফুরণই বা হয় কিরূপে? আত্মশক্তির দ্বারা যে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহারই বা ব্যবস্থাপক কে? শ্রীভগবানের কৃপাই ইহার মূল। কৃপাকণা লাভ করিলে আত্মশক্তির জাগরণ হইবে—কৃপার দ্বারা শক্তিলাভ ও সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়, এইরূপ যাঁহারা ভাবেন, তাঁহারা পোষণবাদী বা পুষ্টিমার্গী।

স্থানবাদী দেখেন বাসনাতাড়িত জীব, কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা বিবেচনা পূর্ব্বক শ্রীভগবানের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। Man is going up to his God. পোষণবাদী দেখেন, করুণাসাগর শ্রীভগবান্ তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ অনুগ্রহ লইয়া এই জগতের ও জীবনের অভিমুখে আসিতেছেন। God is coming down to man. স্থানবাদী বলেন, মানুষ ধরে ভগবান্‌কে, আর পোষণবাদী বলেন, ভগবান্ ধরেন মানুষকে।

প্রথমে মনে হয় এই দুইটি পথ বিরোধী, চিরবিরোধী। কিন্তু, তাহা নহে। এই দুইটি পথের মধ্যে অবিরোধ ও সামঞ্জস্য আছে। এই অবিরোধ বা সামঞ্জস্যই ভাগবতধর্ম্ম ও যুগধর্ম্ম—ইহাই "সর্ব্বোত্তম নরলীলার" ধর্ম্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে এই পোষণতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য দুইটি আখ্যায়িকা বা ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম,—অজামিলের চরিত্র। অজামিল মনুষ্যলোকে মহাপাপ। এই অজামিল তাহার একটি পুত্রকে ভালবাসিত। ইহাই তাহার সুমলিন চরিত্রের একমাত্র শুভ্র ও কোমল বিন্দুপ্রমাণ স্থান। পুত্রস্নেহের দ্বারা তাড়িত হইয়া অজামিল মৃত্যুকালে পুত্রকে তাহার নাম ধরিয়া নারায়ণ বলিয়া ডাকিয়াছিল। তাহাতেই অজামিল রক্ষা পাইল, উদ্ধার হইল।

মানুষের মধ্যে যেমন অজামিল মহাপাপ, সেইরূপ দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রও মহাপাপ। ইন্দ্র বিশ্বরূপ প্রভৃতিকে হত্যা করিয়াছিলেন। অজামিল যেমন নিজের একটি পুত্রকে ভালবাসিত, ইন্দ্রও সেইরূপ উপেন্দ্র বা বামনদেবের সেবা করিতেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় উপেন্দ্রের সহিত সখ্যসূত্রে বদ্ধ ছিলেন এবং উত্তমরূপেই জানিতেন এই উপেন্দ্রই তাঁহার সর্ব্বস্ব, এই উপেন্দ্রের সাহায্যেই তিনি রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও বিজয় লাভ করিয়াছেন। ইহা জানিয়া ইন্দ্র উপেন্দ্রের সেবক হইয়াছিলেন। সুতরাং ইন্দ্রও ভক্ত।

পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী তাঁহার টীকায় এই সব কথা বলিয়াছেন।

> অজামিলো মনুষ্যেষু মহাপাপো যথেরিতঃ।
> বিশ্বরূপাদিঘাতী চ তথা দেবেষু বাসবঃ॥
> অজামিলস্ত ভক্তত্বং বিষ্ণুদূতৈর্নিরূপিতং।
> সঙ্কেত্য ভগবন্নাম পুত্রস্নেহানুসঙ্গতং॥
> ইন্দ্রোঽপি ভগবদ্ভক্তঃ সখ্যেনোপেন্দ্রসেবকঃ।
> তদধীন সুরৈশ্বর্য্য শত্রুনির্জয়জীবিতঃ॥

অজামিল ও ইন্দ্র ভক্ত হইলেন ও রক্ষা পাইলেন। শ্রীভগবানের অনুগ্রহই ইহার হেতু। এই অনুগ্রহ কোন্ পথে আসিল শ্রীধরস্বামী তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে বলিয়াছেন। অজামিল মহাপাপ হইয়াও পুত্রস্নেহ লাভ করিয়াছিলেন, আর, ইন্দ্র মহাপাপ হইয়াও উপেন্দ্রের সহিত সখ্যলাভ করিয়াছিলেন। এই প্রেম, মানবীয় প্রেম। ইহাই পথ, এই পথে শ্রীভগবানের করুণার অমৃতের ধারা আসিয়া অজামিলকে ও ইন্দ্রকে উদ্ধার করিয়াছিল। এই প্রেমই দয়া—জীবে দয়া—"দয়তে চিত্তমাধত্তে"।

অনেকদিন পূর্ব্বে "কৃপাবাদ ও আত্মশক্তি" নামক গ্রন্থে, অজামিলের কথা আলোচিত হইয়াছিল। সেই গ্রন্থে প্রতিশ্রুতি ছিল, অনেক কথা বাকি থাকিল পরে বলা হইবে। কিছু বলা হইল, এখনও কিছু বাকি থাকিল, তাহা আবার পরে বলা হইবে। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

আমার বার্ষিকী

প্রথম পর্ব্ব

সন ১৩৩৪—৩৫—ইং ১৯২৭—২৮

৯ই আশ্বিন ১৩৩৪, সোমবার, রাত্রি দুইটার সময় মেদিনীপুর হইতে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে কলিকাতা। বেলা ১১টায় কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া সন্ধ্যা ৭টার সময় সিউড়ি, পূজার বাড়ী আসিলাম; ১১ দিন থাকিলাম।

২১শে আশ্বিন রাত্রিতে রওনা হইয়া ২২শে সকালে কলিকাতা পৌঁছিলাম। ফরিদপুর জেলার এক গ্রামে যাইবার কথা—অনেক দিন হইতেই অনুরোধ আসিতেছিল; সম্মত হইয়াছি, এবার যাইব।

শ্রদ্ধেয় বন্ধু গজেন্দ্রবাবু কলিকাতা হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। কলিকাতা পৌছিয়াই তাঁহাকে খবর দিলাম। তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া 'ফোন্' ধরিয়া বসিয়াছিলেন, খবর পাইয়াই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠিক হইল, রাত্রির ট্রেণে রওনা হইব। ২২শে আশ্বিন রাত্রিতে খুলনার গাড়ীতে রওনা হইলাম। ট্রেণে ঘুম হয় নাই, পরদিন সকালে ষ্টীমারে ঘুমাইয়া পড়িলাম। একটা স্বপ্ন দেখিলাম,—ভয়ানক স্বপ্ন। এই প্রকারের সুস্পষ্ট ও ভয়ানক স্বপ্ন খুবই কম দেখা যায়। স্বপ্ন দেখিলাম, আমার আপন বলিতে যেন কেহই নাই, সবাই আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, স্বপ্নে খুব কাঁদিলাম। কান্না বলিয়া কান্না নহে, মনে হয় অনেকক্ষণ ধরিয়া খুব বেশী রকম কাঁদিলাম। স্বপ্নাবস্থার কালবোধ (Time-sense) জাগ্রত অবস্থার ন্যায় নহে, কাজেই ঠিক্ কতক্ষণ স্বপ্ন দেখিলাম বা কাঁদিলাম, তাহা বলা সম্ভবপর নহে। ষ্টীমারের ক্যাবিনে (মধ্য শ্রেণীর একটু ক্যাবিন্ বা বেঞ্চ দেওয়া ঘেরা-জায়গা আছে) আমার পাশে এক অপরিচিত ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। ঘুম ভাঙ্গিলে তাঁহাকে দেখিলাম—দেখিলাম তিনি খুব বিস্মিতভাবে আমার প্রতি চাহিতেছেন। স্বপ্নে যাহা দেখিতেছিলাম বা করিতেছিলাম তাহার কোনরূপ দৈহিক প্রকাশ হইয়াছিল কি না জানিনা। সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিতাম, কিন্তু তিনি পরবর্ত্তী ঘাটেই নামিয়া গেলেন—কাজেই "মনের কথা রইল মনে।"

মাদারীপুর-গামী ষ্টীমারে যাইতেছি। দ্বিপ্রহরে সে-ষ্টীমার বদলাইয়া প্রায় তিন ঘণ্টা, কিছুক্ষণ ও-পারে আর কিছুক্ষণ এ-পারে অপেক্ষা করিয়া বোয়ালমারির ষ্টিমারে উঠিলাম। দেওয়ালিতে বিক্রয়ের জন্য বিলাতী বারুদ বা বাজি আসিয়াছে। তাহার একজন দালাল ষ্টীমারে যাইতেছে, কয়েকটি বড় ঘাটে বাজি পোড়াইয়া লোকদের দেখাইল এবং খরিদ্দারও সংগ্রহ করিল। দূরদূরান্তবর্ত্তী বাজার, হাট, গঞ্জ প্রভৃতি বিদেশীয়ের দালালেরা কেমন দখল করিয়াছে, তাহাই ভাবিলাম। সন্ধ্যার পর ষ্টীমার হইতে নামিয়া নৌকায় উঠিলাম। রাত্রি নয়টার পর গন্তব্যস্থানে পৌছিলাম। এই 'কাশিয়ানি' গ্রাম। পর দিন বক্তৃতা আরম্ভ হইল, শ্রীমান্ যতীন্দ্রমোহন সাহা আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন, যত্ন করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। পরদিন তাঁহারই বাড়ীতে বক্তৃতা আরম্ভ হইল, ৭ দিন চলিল।

কাশিয়ানি গ্রামখানি বেশ বড় গ্রাম। থানা আছে, সাব্‌রেজিষ্ট্রী আপিস আছে, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ্ আছে, ইংরাজি স্কুলও আছে। এই গ্রামের আর একটি ভদ্রলোক ব্যবসায় করিয়া ধনী হইয়াছেন, তিনি গ্রামে একখানি বাড়ী করিয়াছেন, কিন্তু গ্রামে থাকেনও না আসেনও না। তিনি একটি কলিকাতা-কেন্দ্রী আধুনিক বা নবীন ধর্ম্মমণ্ডলীতে জুটিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার যাহা উদ্বৃত্ত অর্থ বা যাহা তিনি দান করিতে পারেন, তাহা সেই মণ্ডলীই লইতেছে। মণ্ডলী তাঁহাকে উপাধি দিয়াছে, তাঁহার নাম তাহাদের কাগজে ছাপায়, তাঁহাকে নানাস্থানে লইয়া যায় এবং তিনি যে একজন কলিযুগের রাজর্ষি জনক, দাতাকর্ণ বা মহারাজা হরিশ্চন্দ্র, এ কথা তাঁহাকে জানাইয়া প্রচার করে।

ইহলোকে এই মণ্ডলী যখন এতটা উপকার করিতেছে, তখন পরকালে যে তাহারা আরও বেশী উপকার করিবে তাহাতে সন্দেহ কি?

গ্রামের উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়টির অবস্থা বেশ ভাল নহে। কিন্তু টাকা খরচ করিয়া একটি ছাত্রাবাস করিলে স্কুলটির উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু টাকা কে দিবে? গ্রামে অনেকগুলি বৈদ্য ভদ্রলোকের বাস। প্রাচীন ভদ্র পরিবার-সমূহের সাধারণতঃ যেরূপ অবস্থা, তাঁহাদেরও সেইরূপ অবস্থা। আবার বৈদ্যদের সহিত বৈশ্য সাহাদের বেশ ভালরূপ মেলামেশা নাই। এখন দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে মেলামেশা যে খুব বেশী রকম দরকার, সে বোধ গ্রামের যুবকগণের মনে এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, যদিও গ্রামে উচ্চশিক্ষিত যুবক অনেকগুলিই আছেন। আমি কাশিয়ানি হইতে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত কলিকাতা-প্রবাসী ধার্ম্মিক ব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, গ্রামের স্কুলের জন্য কিছু ব্যয় করিতে তাঁহাকে অনুরোধও করিয়াছিলাম। বোধ হয়, তিনি কিছু করিবেন, কারণ তিনি ভাল লোক, তবে এখনও করিয়াছেন কি না জানি না।

কাশিয়ানি-গ্রামে একজন বৈদ্যজাতীয় ভদ্রলোকের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল। তিনি জ্ঞানী লোক, কিছু বেশী রকম তার্কিক। এখন গ্রামে থাকিয়া কবিরাজী করেন। পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় ছিলেন এবং কলিকাতার আন্দোলনসমূহে বিশেষভাবে যোগ দিতেন। তিনি অনেক বিষয়েই উত্তমরূপ চিন্তা করিয়াছেন।

এখানকার বৈদ্যেরা বৈষ্ণবধর্ম্মের বড়ই বিরোধী। নবদ্বীপের স্বর্গীয় পণ্ডিত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় অনেকদিন পূর্ব্বে একবার এই গ্রামে বৈদ্যবাবুদের বাড়ী নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন ভুবন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত স্বর্গীয় ব্রজ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের খুব বিরোধ ছিল। ব্রজ বিদ্যারত্ন মহাশয় বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, নবদ্বীপে তিনি হরিসভা স্থাপন করেন, শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ভুবন বিদ্যারত্ন মহাশয় বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন, কতদূর বিরোধী ছিলেন, তাহা জানিতাম না, এই গ্রামে আসিয়া তাহা জানিলাম।

ভুবন বিদ্যারত্ন মহাশয় এই গ্রামে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্বন্ধে এমন সব কথা বলিয়াছিলেন, যাহা শুনিলে প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। পূর্ব্বে যে বৈদ্য ভদ্রলোকের কথা বলিয়াছি, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন, তাঁহার সহিত কয়েক দিনে বেশ বন্ধুতা জমিয়া গেল। স্বর্গীয় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় কাশিয়ানি আসিয়া সভায় বক্তৃতা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বাবুর নিকট শুনিলাম।

এই গ্রামের বৈদ্যগণের বৈষ্ণবধর্ম্মে আস্থা নাই, বরং বিদ্বেষ আছে। তাঁহারা জানেন না যে রাঢ়দেশের বৈদ্যেরা অনেকেই বৈষ্ণব এবং পুরুষানুক্রমে গুরুগিরি ব্যবসায় করেন। অষ্ট কবিরাজের

কথা বিশেষ করিয়া বলিলাম। পূর্ব্বে একবার 'কালিয়া' গিয়াছিলাম, সেখানে বহু সুশিক্ষিত বৈদ্যের বাস। মনে হয় সেখানে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি কোন শিক্ষিত বৈদ্যের কোনরূপ অনাস্থা নাই, বরং শ্রদ্ধাই আছে। কিন্তু, কাশিয়ানি গ্রামে বৈদ্যগণের সহিত বৈশ্য সাহাদের বেশ প্রীতি নাই। বৈদ্যমহোদয়গণের বৈষ্ণববিদ্বেষ ও শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্বেষের সহিত ইহার একটা কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ আছে। মানুষ শাক্ত হউক বা বৈষ্ণব হউক, কিছুই আসে যায় না। নিজের সম্প্রদায়-ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের যাহা ভাল কথা, (শিক্ষা বা উপদেশ,) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহা শোনা দরকার, ভাবা দরকার। তাহাতে ক্ষতি হয় না, লাভই হয়। দলাদলিপ্রিয় এবং দলাদলি-ব্যবসায়ী ক্ষুদ্রচেতা ধর্ম্মধ্বজীগণ এই সামান্য কথাটা না বোঝায় দেশের,—বিশেষ করিয়া আমাদের হিন্দুসমাজের দারুণ ক্ষতি হইতেছে।

কাশিয়ানি গ্রামের পাশেই "পিঙ্গলিয়া" গ্রাম। এই গ্রামখানি ব্রাহ্মণ-প্রধান, প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম, রাঢ়ীয় শ্রেণী, বাৎস্য-গোত্র ব্রাহ্মণগণের এই গ্রামে বাস। ইঁহারা বলেন, ইঁহারা কবি জয়দেবের বংশধর। মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে বীরভূম ছাড়িয়া এই দেশে আসিয়া তাঁহারা বাস করেন। 'পিঙ্গলিয়া' গ্রামে বহু বহু কবি ও পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই গ্রামের ব্রাহ্মণমহাশয়গণের ব্যবহারে বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। ইঁহাদের ব্যবহার যেমন উদার তেমনিই মধুর। গ্রামান্তর হইতে আসিয়া প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ইঁহারা কাশিয়ানির ধর্ম্মসভায় যেরূপ আগ্রহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মণোচিত।

কাশিয়ানিতে ৭ দিন বক্তৃতা করিয়া প্রবীণ বন্ধু গজেন্দ্র বাবুর—(ওর,ফে ধলা কর্ত্তা) বাড়ী যাই। গ্রামের নাম **"মহিষারগোপ"**। এই গ্রাম যশোহর জেলার অন্তর্ভুক্ত। এখানে একটি ছোট নদীর একপার ফরিদপুর, আর একপার যশোহর। মহিষারগোপ' গ্রামে তিনদিন বক্তৃতা হইল। সেখান হইতে কাশিয়ানি ফিরিয়া **পিঙ্গলিয়া** গ্রামে আহূত হইয়া একদিন তথায় বক্তৃতা করিলাম।

হরিঠাকুরের কথা অনেক দিন শুনিতেছি। ওড়াকান্দি গ্রামে হরি-ঠাকুর বাস করেন। তিনি নমঃশূদ্র কুল পবিত্র করিয়াছেন। কাশিয়ানি হইতে ওড়াকান্দি ৬।৭ মাইলের মধ্যে এবং কাশিয়ানি থানার অন্তর্গত। বিলের মধ্যে ওড়াকান্দি গ্রাম। হরি ঠাকুরের লৌকিক বা ব্যবহারিক নাম শ্রীগুরুচরণ বিশ্বাস। তাঁহার এক পুত্র সাব্ রেজিষ্ট্রার ছিলেন, দুই পুত্র বিলাতে। বারুণির সময় উৎসবে ৮।১০ হাজার লোক সমবেত হয়, প্রণামীতে ও মানসিকে হরি ঠাকুরের ৮।১০ হাজার টাকা আয় হয়। বাতাসা টাকা কড়ি প্রভৃতি যাহা কিছু আসে, হরি ঠাকুর কৃপা করিয়া তাহা নিজেই গ্রহণ করেন, অন্নদান মহোৎসবাদিতে কোনরূপ ব্যয় করিতে হয় না। হরি ঠাকুরের বয়ঃক্রম আশি বৎসরেরও অধিক। তিনি সাধারণ গৃহস্থেরই মতো জুতা পায়ে, জামা

গায়ে, ছাতা হাতে, বিষয়কর্ম্ম সকলই করেন। যাহারা হরি ঠাকুরের শিষ্য তাহাদের 'ম'তো' (মতাবলম্বী) বলে। একবার একজন চৌকিদারের খুব অসুখ হইয়াছিল, একেবারে মৃতপ্রায় অবস্থা। হরি ঠাকুরের 'ম'তো' হওয়ায় তাহার রোগ সারিয়া যায়। সেই ব্যক্তিই এখন হরি ঠাকুরের প্রধান শিষ্য। হরি ঠাকুর সম্বন্ধে ছাপা বইও বাহির হইয়াছে। অনেকদিন একখানি বই পাইতে চেষ্টা করিতেছি। একজন বন্ধু একটা ঠিকানা দিয়াছিলেন, সেই ঠিকানায় পত্র লিখিয়াছিলাম, ভিঃ পিঃ করিয়া বই পাঠাইতে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু কোন উত্তর পাই নাই। সে অনেক দিনের কথা। ওড়াকান্দি যাওয়া হয় নাই। সময়ও ছিল না, শরীরও ভাল ছিল না। শরীর খুবই খারাপ ছিল, কাশিয়ানি গ্রামে বাস করিয়া বহুল পরিমাণে স্বাস্থ্যলাভ করিলাম।

৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর কাশিয়ানি ছাড়িলাম। এবার অন্য পথে আসিলাম। কিছুদূর নৌকা, তাহার পর পদব্রজে লোহাগড়া, লক্ষ্মীপাশা প্রভৃতি নামজাদা বড় বড় গ্রামের পাশ দিয়া কাদা ভাঙ্গিয়া, জল ভাঙ্গিয়া আসিয়া ষ্টীমারে উঠিলাম। রাত্রি থাকিতে থাকিতে দৌলতপুরে নামিলাম। ষ্টীমার ঘাট হইতে রেল ষ্টেশন আসা বিশেষরূপ অসুবিধাজনক। পথ খারাপ, পথে আলোও নাই, অথচ যাত্রী হয় অনেক। দৌলতপুর ষ্টেশনে ট্রেনে উঠিয়া ৬ই কার্ত্তিক রবিবার বেলা ১০ টায় কলিকাতা পৌঁছিলাম। কাশিয়ানি হইতে একটি ভদ্রলোক আমার সহিত কলিকাতা আসিলেন, তাঁহার নাম রায় মহাশয়—তিনি সত্যই মহাশয়। তাঁহার জীবন সাধুতা ও লোভহীনতায় পবিত্র জীবন। ৬ই কার্ত্তিক রাত্রিতেই সিউড়ি পৌঁছিলাম।

৬ই কার্ত্তিক ২৩শে অক্টোবর হইতে ২০শে কার্ত্তিক ৬ই নভেম্বর পর্য্যন্ত ১৫ দিন সিউড়ি। ৭ই কালীপূজা আর ১৭ই জগদ্ধাত্রী পূজা। ইতি—প্রথমপর্ব্ব।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

কলিকাতা, শিমলা কাঁসারিপাড়ার কতকগুলি যুবক 'চৈতন্য সাধনাশ্রম' নাম দিয়া একটি সমিতি করিয়াছে। যখন কলিকাতায় থাকি তখন তাহারা কেহ কেহ প্রায়ই আসে এবং তাহাদের সমিতিতে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করে। এতদিন সময় করিতে পারি নাই। এবার তাহাদেরই অনুরোধে, তাহাদেরই উৎসবে কলিকাতা যাইতে হইল। ২০শে ২১শে কার্ত্তিক চৈতন্য-সাধনাশ্রমে বক্তৃতা হইল। ২২শে তারিখে নাথের বাগানে প্রাচ্যতারা-সমিতির যুবকগণের এক সভা ও সমাজ-সম্মেলন অর্থাৎ কিছু গান, আমোদ-কৌতুক ও জলযোগ ছিল। সেখানে বক্তৃতা করিলাম ও তরুণদের সঙ্গসুখ লাভ করিলাম। পরের দুইদিন বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া 'চৈতন্য-সাধনাশ্রমে' বক্তৃতা হইল। নোয়াখালি জেলার দালাল বাজার নামক স্থান হইতে একটি অনুরোধ বা নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল, যাইতে সম্মতও হইয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবস্থার দোষে যাওয়া হইল না, টেলিগ্রাফিক্

মনি-অর্ডার ফেরত দিতে বাধ্য হইলাম। চৈতন্য সাধনাশ্রমে দুইদিন বক্তৃতা করার পর নাথেরবাগান লেন লেনে মহিলাদের একটি বিশেষ সভা হইল। এই সভায় ম্যাডাম্ ব্লাভাস্কির জীবনবৃত্ত কথিত হইয়াছিল। কলিকাতাতেই থাকিলাম—কি করিলাম, সব কথা লিখিয়া রাখি নাই। ১লা অগ্রহায়ণ, ১৭ই নভেম্বর থিয়সফিক্যাল্ সোসাইটির প্রতিষ্ঠা দিন, সেদিন কলেজস্কোয়ারে থিয়সফিক্যাল হলে বক্তৃতা করিলাম। আমাদের দেশে ধর্ম্মের একটা পুনরুত্থান হইতেছে কিন্তু সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দলে দলে বিরোধ, বিদ্বেষ ও অসৎ প্রতিযোগিতা যেরূপ চলিতেছে, তাহাতে এই পুনরুত্থান হিতকর কি অহিতকর বলা বড় কঠিন। থিয়সফিক্যাল সোসাইটির আদর্শ বিশেষভাবে প্রচারিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। বঙ্গদেশে থিয়সফিক্যাল সোসাইটি তেমন শক্তিশালী নহে, আবার তাহার যেটুকু শক্তি আছে সেটুকু অর্থ সংগ্রহেই ব্যয়িত হয়, দেশে কোন একটা ভাব প্রতিষ্ঠার বিশেষ কোন আয়োজন নাই বলিয়াই মনে হয়। আমি মনে করি থিয়সফিক্যাল্ সোসাইটির আদর্শ উত্তমরূপে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত না হইলে নব্য ভারতের কল্যাণ নাই। কাজেই ছাত্রসমাজের জন্য ২০শে নভেম্বর হইতে উপর্য্যুপরি ৪ দিন থিয়সফিক্যাল্ হলে বক্তৃতা করিলাম। এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক এই সব বক্তৃতা থিয়সফিক্যাল্ সোসাইটির আহ্বানে আগ্রহে বা সাহায্যে হয় না। ইহা আমার নিজের 'মিশন' এবং ইহার জন্য নিজের সময় ছাড়া পয়সাও কিছু কিছু প্রত্যেক বৎসর খরচ করিতে হয়। কলিকাতা থিয়সফিক্যাল্ সোসাইটি তাঁহাদের ঘরখানি আমাকে ব্যবহার করিতে দেন বলিয়া আমি তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ২৪শে নভেম্বর নাথের বাগানে স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটি বক্তৃতা হয়, ইহাও আমার নিজের আয়োজন। কলিকাতায় নিজের আয়োজনে সভা করিতে হয় কেন? কলিকাতা সহর, আর আমার বক্তৃতা গ্রামের কথা। 'বৃন্দাবন' বলিলে যে জীবনাদর্শ বুঝায়, তাহার সহিত বর্ত্তমান নাগরিক জীবনের কোনরূপ রক্ষা হয় না। বৃন্দাবন গোপ-পল্লীর মহিমা ও মাধুর্য্যের গান, সুতরাং নগরের সৌখিনতা ও পল্লীলুণ্ঠনের তাহা বিরোধী—এই জন্য ইহা আশা করা যায় না যে কলিকাতায় 'বনের কথা'র প্রতিষ্ঠা হইবে—সে বনের কথা 'তপোবনের কথা'ই হউক আর 'বৃন্দাবনের কথাই হউক। বনের কথার যদি কোন ইজ্জৎ থাকে তাহা হইলে তাহাকে সাবধানে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"কম্মাত্তজন্তি কবয়ো ধনুদুর্ম্মদান্ধান্।" ২৭শে নভেম্বর হইতে আবার উপর্য্যুপরি ৪ দিন থিয়সফিক্যাল্ হলে বক্তৃতা হইল। 'চৈতন্য-সাধন-সমিতি'র সভ্যেরা আবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, আমাকেও কলিকাতায় থাকিতে হইল কাজেই ১লা ও ২রা ডিসেম্বর আবার সেখানে বক্তৃতা করিলাম। কলিকাতা দালালের সহর। এই সব সমিতির লোকেরা বড় বেশী তোষামোদ করে, এত বেশী তোষামোদ করে যে তাহাতে বশীভূত না হইয়া পারা যায় না। কিন্তু, ইহারা ধর্ম্ম-বক্তৃতার ব্যবস্থা করে কেন? উত্তর

ইহারা জানে লোকে ধর্ম্মের বক্তৃতা শোনে, পাড়ার লোককে ধর্ম্মকথা শুনাইলে তাহাদের নিকট চাঁদা আদায় করা যায়। আমাকে ধরিলে পয়সা লাগে না—সুতরাং চাঁদার টাকাটা সমিতির লাভ হয়—এই কারণেই এই সব সমিতি ধর্ম্মের বক্তৃতার ব্যবস্থা করে। কলিকাতায় অধিকাংশ সমিতিই এই প্রকারের দালাল-মণ্ডলী। আবার এই সব মণ্ডলী কলিকাতার লোক অপেক্ষা মফঃস্বলের লোকের নিকট চাঁদা তুলিতে পারিলে নিজেদের খুব বেশী কৃতী বা succesful বলিয়া মনে করে। ৫ই ডিসেম্বর তারিখে সিউড়ি ফিরিলাম।

অনেক সময়ে অনেক কাজ করা যায় বা অনেক কাজ হইয়া যায়, কেন করা যায়, তাহা মোটেই বোঝা যায় না। কলিকাতায় এতদিন থাকা গেল, কেন থাকা গেল কিছুই বুঝিলাম না। যাহা হউক, একটা জিনিষ লাভ হইল। ইংরাজী ১৯১২ সালে যখন প্রথম ঢাকা যাই, সেই সময়ে এক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ পরিচয় হইয়াছিল এবং ঘনিষ্ঠতাও হইয়াছিল। তাহার পর অনেকবার ঢাকা গিয়াছি, আরও কত জায়গায় গিয়াছি, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। এবারে হঠাৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। চৈতন্য-সাধন-সমিতি যে বিশেষ কিছু নহে, সেখানে বক্তৃতা করার কোনরূপ সার্থকতা নাই, ইহা জানিয়াও সম্মত হইয়াছিলাম এবং প্রথমে যে ধারণা হইয়াছিল, ক্রমশঃ সেই ধারণাই দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে—কিন্তু তথাপি সম্মত হইয়াছিলাম, কারণ প্রচারকগণকে হিসাব করিয়া চলিলে চলে না। ব্যবসায় করা উদ্দেশ্য হইলে হিসাব করা উচিত, কিন্তু প্রচার করিতে হইলে হিসাবের ভার ভগবানের উপর রাখিয়া 'আমার কিছুতেই ক্ষতি হইবে না, আমার ক্ষতি হইতে পারে না, কারণ আমি যাহা করিতেছি আমার ভগবানের জন্য করিতেছি', এই বোধ লইয়া চলিতে হইবে। ইহাতে এই হয় যে অনেক লোক বঞ্চনা করে। যাহারা বঞ্চনা করে, তাহারা মনে করে বোকা ঠকাইলাম। তাহারা জানেনা অনেকে জানিয়া শুনিয়া ঠকে এবং ঠকিতেই চায়, জিতিতে চায় না। কারণ যে ঠকে সে ঠকে না, যে ঠকায় সেই ঠকে। সমগ্র দেশকে ঠকাইয়া কলিকাতার মতো একটা সহর গড়িয়া উঠিয়াছে। এখনও কলিকাতার প্রতিষ্ঠানসমূহ সেই পথে চলিতেছে। ভবিষ্যৎ বড়ই ভয়ঙ্কর। একটা ভয়ানক অন্তর্বিপ্লব আসিতেছে, চিন্তাশীল ও সাধুপ্রকৃতি-সম্পন্ন লোকেরা সংঘবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিলে প্রতীকার হইতে পারে।

এবার কলিকাতার লাভ হইল একটি হৃতবস্তুর উদ্ধার। ঢাকায় যে বন্ধুটিকে পাইয়া ষোল বৎসরের জন্য হারাইয়াছিলাম, তাঁহাকে পাইলাম বেশ ভাল করিয়া পাওয়ার মতো পাইলাম এবং তাহাতে আমার উপকারও হইল—বিশেষ উপকারই হইল। তিনি একজন ডাক্তার। নাম করার প্রয়োজন নাই, তিনি তাহা পসন্দ করিতে না পারেন। এই গেল দ্বিতীয় পর্ব্ব—২৭ দিন কলিকাতায় কাটাইয়া ৫ই ডিসেম্বর সিউড়ি ফিরিলাম।

তৃতীয় পর্ব্ব

৫ই ডিসেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সিউড়িতে থাকিলাম। বীরভূমির জন্য প্রবন্ধ লেখা আর যত রাজ্যের যত কাগজ ও বই আসিয়া জমে, সেগুলি পড়া, ইহাই সিউড়ির কাজ। ৩১শে রাত্রিতে সিউড়ি হইতে রওনা হইলাম। যাইব ময়মনসিং জেলার মফঃস্বল, প্রচারের জন্য যাইব। ৩রা জানুয়ারী হইতে সেখানে কাজ আরম্ভ হইবে। মনে হইল নূতন বৎসরের প্রথম দুইদিন হুগলীতে কাটাইয়া যাই। হুগলীর সহিত আমার কর্ম্মজীবনের সম্পর্ক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নবদ্বীপ সেবাশ্রমের কাজের সাহায্য হুগলী হইতেই সবচেয়ে বেশী পাওয়া গিয়াছে। ১লা জানুয়ারী উষাকালে হুগলী ঘাট ষ্টেশনে নামিলাম। পূর্ব্ব হইতে খবর দেওয়া ছিল। শ্রীশের নূতন বাড়ীতে উঠিলাম। অনেক পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইল। যথা ধ্রুব, গোপাল ও গৌর। হুগলীতে ছুটির সময়, সারাদিনই কাজ। কত রকমেরই আলোচনা। বেদান্তের শঙ্করভাষ্য হইতে বর্ত্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা লইয়া সারাদিন গরম গরম আলোচনা। সন্ধ্যায় এক বৈঠকে বক্তৃতা হইল। পরদিন পরেশের বাড়ীতে সন্ধ্যায় বক্তৃতা করিয়া তখনই রওনা হইলাম নৈহাটিতে। নৈহাটিতে পিংনার টিকিট পাওয়া গেল না, ইণ্টারও না, থার্ডক্লাসও না। কেন পাওয়া গেল না, খোঁজ লওয়া দরকার। ইহাতে অনেক যাত্রীর অসুবিধা হয়। যাহারা টিকিট দেয় তাহারা হিসাব করার কষ্ট এড়াইবার জন্য অনেক সময় হাতে লিখিয়া টিকিট দিতে চায় না। নৈহাটি ষ্টেশনে এ রকমের লোক থাকা ভাল নয়। বিদেশী লোকে কি করিবে? স্থানীয় লোকের ভিতর যাঁহারা দেশকর্ম্মী, দেশের কাজ করেন, তাঁহারা এই সব দিকে যদি একটু একটু নজর রাখেন তাহা হইলে দেশে তাঁহাদের প্রতিপত্তি খুবই বাড়িয়া যায়।

সিরাজগঞ্জ অবধি টিকিট করিলাম। সিরাজগঞ্জে ষ্টীমারে টিকিট্ করা অনেক সময়েই কষ্ট-সাধ্য। যাহা হউক ৩রা জানুয়ারী বেলা ৯টায় পিংনাঘাটে নামিলাম। পিংনা ময়মনসিং জেলার একটি চৌকী, মুন্সেফী আদালত আছে। পিংনার বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মজুমদার মহাশয় পূর্ব্বেই খবর পাইয়াছিলেন। তিনি ঘাটে খবর পাঠাইয়াছিলেন, প্রথম পিংনা যাইতে এবং সেখানে খাওয়া দাওয়া করিয়া গন্তব্যস্থানে যাইতে। তাঁহার অনুরোধ রাখিতে পারিলাম না। সেদিন একাদশী, খাওয়া দাওয়ার বেশী ঝঞ্ঝাট নাই, তার পর গোপালপুর হইতে পাল্কী আসিয়াছে, সুতরাং পথে বিলম্ব করা উচিত নহে। বেলা প্রায় ১টার সময় গোপালপুর পৌঁছিলাম। ইং ১৯১২ সালে ত্রিপুরা জেলার 'লক্সম্' এ, এক ভদ্রলোকের সহিত বন্ধুতা হইয়াছিল, তিনি পুলিশের দারোগা। তাহার পর তাঁহাকে অনেক খুঁজিয়াছি, কিন্তু সংবাদও পাই নাই। ১৭ বৎসর পরে গোপালপুরে তাঁহার সহিত দেখা হইল।

গোপালপুর একটি ব্যবসায়ের কেন্দ্র। সাব্‌রেজেষ্ট্রি আছে, থানা আছে, বাজার ও জমিদারী কাছারী আছে, উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়ের মাঠে সভা হইল। অনেক দূর হইতে অনেক লোক আসিয়াছিলেন, অনেকেই বেশ ভক্ত। সন্নার মুনীন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দেখা হইল। সন্না এখান হইতে খুব বেশী দূর নহে। এই মুনীন্দ্র গত বৎসর এক অতি দুঃসাহসিক কর্ম্ম করিয়াছিল। পুঁজি নাই পাটা নাই, লোকে সাহায্য করিবে এই ভরসায় বড় বড় কীর্ত্তনের দল নিমন্ত্রণ করিয়া এক উৎসব করিয়াছিল। এ প্রকারের ব্যাপার প্রায়ই হয়, কোনটা রক্ষা পায়, কোনটা রক্ষা পায় না। মুনীন্দ্র, কীর্ত্তনওয়ালা গণেশকে টাকা দিতে পারে নাই, গণেশের প্রতি অসদ্ব্যবহারই হইত, আমি অনেকটা রক্ষা করিয়াছিলাম। সে-এক উপন্যাস। যাহা হউক মুনীন্দ্র গুরুগিরি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে, বিবাহও করিয়াছে, ব্যবসায় বোধ হয় চলিতেছে।

গোপালপুরে তিন দিন বক্তৃতা হইল। নূতন জায়গায় প্রথম দিন সাধারণতঃ সনাতন ধর্ম্ম ও তাহার সার্ব্বভৌমিকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়া থাকে। ইহাই প্রথম আলোচ্য। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীই সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ধর্ম্মেও এই সার্ব্বভৌমিকতা রহিয়াছে, যদিও সকলে তাহা দেখে না। দ্বিতীয় দিন শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলা হইল। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ নিত্য, তিনি বেদের রসব্রহ্ম, প্রিয়ব্রহ্ম, মধুব্রহ্ম, আনন্দব্রহ্ম ও অমৃতব্রহ্ম, আজও সে লীলা হইতেছে। তৃতীয় দিন শ্রীমদ্ভাগবত, বেদ ও পুরাণের সম্বন্ধ, আর লীলাবাদ-সম্বন্ধে বলা হইল। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সঙ্গে থিয়সফি ও বর্ত্তমান জগতের আধ্যাত্মিক আন্দোলন, আর থিয়সফির শিক্ষা, জন্মান্তরবাদ কর্ম্মবাদ প্রভৃতি শিক্ষাব্যবস্থায় কি ভাবে প্রযুক্ত হইতেছে, মার্কিনের New Education আন্দোলন এই সব সম্বন্ধে কথোপকথন হইত।

গোপালপুরে এক ভদ্রলোক বলিলেন দুই ঘর মুসলমান হিন্দু হইতে চাহে, কি করা যায়? আমি বলিলাম, তাহাদের নবদ্বীপ পাঠাইয়া দাও। এখানে হুজুগ্ করিয়া কিছু করিলে কর্ম্ম হইবে না, বিকর্ম্ম হইবে। তাহারা নবদ্বীপ গিয়া বৈষ্ণব হউক।

গোপালপুর হইতে ৬ই জানুয়ারী **অন্নগ্রাম** আসিলাম। বাহন পাল্কী। পাবনা জেলার পর্জ্জোনার ভাদুড়ীদের একঘর এখানে বাস করেন। আরও কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের বাস আছে। দুইদিন এখানে বক্তৃতা হইল।

৮ই **হেমনগর**। হেমনগরের স্বর্গীয় হেমবাবু স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। কাশীতে তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি যে কেবল একজন দানশীল বড় জমিদার ছিলেন তাহা নহে, একজন আদর্শ ব্রাহ্মণ ও সাধক ছিলেন। তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয়। এই পুণ্যশ্লোক হেমবাবুর হেমনগর। হেমনগরের অতিথিসেবার তুলনা নাই। হেমবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত হেরম্ব বাবু বাড়ীতে আছেন,

অপর দুইপুত্র কলিকাতায়। লোকে জানে ইহারা খুব গোঁড়া। গোঁড়া অর্থে আচার-নিষ্ঠ, ইহাতে আর নিন্দা কি? অহিন্দুকে হিন্দু করা হইতেছে, হেরম্ববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কি জা'ত হইবে? আমি বলিলাম, জা'ত হইবে কেন? ইহারা বৈষ্ণব হইবে। তাহাতে হেরম্ববাবুর আপত্তি নাই। হেরম্ব বাবুদের বাড়ী হইতে একখানি পারিবারিক বার্ষিকপত্র বাহির হয়। ইঁহাদের পরিবারে সাহিত্য চিত্রবিদ্যা প্রভৃতির উত্তমরূপ আলোচনা আছে। অনেকেই বেশ ভাল লেখক। হেমনগরে ৩ দিন ছিলাম। শ্রীযুক্ত হেরম্ব বাবুকে বলিয়া আসিলাম তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের জীবনী লেখা আবশ্যক। এখনকার অনেক লোক আচারনিষ্ঠ লোক দেখিলেই ভয় পায়, আচারনিষ্ঠ লোকের চরিত্রের দৃঢ়তা, পবিত্রতা, ত্যাগশীলতা প্রভৃতির সংবাদ একালের অনেক লোক একেবারেই জানে না। স্বর্গীয় হেমবাবুকে কাশীর লোক সকলেই জানিতেন ও বিশেষভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন—সনাতন ধর্ম্মের সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য তাঁহার বিশেষ আন্তরিক চেষ্টা ছিল। হেমনগরের এই বাড়ী একটি আদর্শ ব্রাহ্মণবাড়ী, একটি পুণ্যের সংসার।

১১ই ১২ই **বাওয়াইল**। পুটিয়ার রাণী শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবীর খুব বড় কাছারী। এখানে একটি নূতন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইয়াছে। ১৩ই তারিখে পিংনা আসিলাম। অনেক দিন পূর্ব্বে আর একবার **পিংনা** আসিয়াছিলাম। এখানকার হেড্‌মাষ্টার মহাশয় পরম ভক্ত, প্রমথবাবু চিরকাল বৈষ্ণবশাস্ত্র, থিয়সফি, স্পিরিচুয়ালিজম্ প্রভৃতির চর্চ্চা করেন। তিনি কয়েকখানি বৈষ্ণবগ্রন্থও লিখিয়াছেন। এখানে একটি হরিসভা আছে, সেইখানে বক্তৃতা হইল। প্রথম দিন বলিলাম 'রাধাতত্ত্ব'। সমুদয় ভক্তিশাস্ত্র ভক্তিরই ইতিহাস'। দ্বিতীয় দিন বক্তৃতা হইল জ্যোতিষবাবুর বাড়ী, আর তৃতীয় দিন কালীবাড়ী। ১৬ই জানুয়ারী পাল্কী করিয়া চাঁপারকোণা আসিলাম। এই সেই **চাঁপারকোণা**, হেমাঙ্গিনী সাহার বাড়ী। পূর্ব্বে কখন আসি নাই, কতবার বলিয়াছি আসিব, কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই—এবার আসিলাম, সত্যই আসিলাম। বক্তৃতা আরম্ভ হইল, ৭ দিন চলিল। চাঁপারকোণার পরপার **বীরভাঙ্গা**, তিনদিন সেখানে। ২৬শে জানুয়ারী পাল্কীযোগে বাউসি ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিয়া **ময়মনসিংহ**। দুর্গাবাড়ীর বার্ষিক উৎসবের নিমন্ত্রণে আসিলাম। গতবারও আসিয়াছিলাম। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার উকীল মহাশয় দুর্গাবাড়ীর উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। তিনদিন বক্তৃতা করিয়া গৌরীপুরে গেলাম। গতবারেও **গৌরীপুর** গিয়াছিলাম। দুইদিন গৌরীপুরে থাকিয়া ২রা ফেব্রুয়ারী ধুলট উপলক্ষে **নবদ্বীপ** আসিলাম। নবদ্বীপে বক্তৃতা হইল ৭ দিন, আরও দুদিন থাকার ইচ্ছা ছিল। দাঁইহাটের ভদ্রলোকেরা বড়ই বেশী অনুরোধ করায় দাঁইহাট আসিলাম। তিন দিন দাঁইহাটে বক্তৃতা হইল। **দাঁইহাট** প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ স্থান। এখানে তের

ঘাট, বার হাট, তিন চণ্ডী ও তিন ঈশ্বর আছেন। দাঁইহাটে বিশালাক্ষী দেবী আছেন। ইনি দ্বিভুজা, বামহস্তে খড়্গ, দক্ষিণহস্তে খর্পর। দেবী মুণ্ডমালা-বিভূষিতা, মহাদেবের বক্ষে দণ্ডায়মান। বর্দ্ধমানের মহারাজার ঘাট ও মন্দির বড়ই সুন্দর, কিন্তু সংস্কারও নাই, ব্যবহারও নাই। দাঁইহাটের হরিসভাটিকে পুনরুজ্জীবিত করা হইতেছে, সেই উপলক্ষে আসিলাম, তিন দিন বক্তৃতা হইল। দাঁইহাট হইতে কাটোয়া। নবদ্বীপে রাধারমণ সেবাশ্রমের ভার লওয়ার পর কাটোয়ায় একটি সুন্দর সেবাশ্রম হয়। কতবার কাটোয়ায় আসিয়াছি। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে নিদাঘ বিদ্যালয় লইয়া কাটোয়ায় আসিয়া ১২ দিন ছিলাম। নবদ্বীপ হইতে সেবক আসিয়া কাটোয়ার আশ্রম চালাইত। এইভাবে কতদিন গিয়াছে, কত আশা করিয়াছি, কত স্বপ্ন দেখিয়াছি। সুন্দর গঙ্গাতীরে, সেবাশ্রমের সুন্দর বাড়ী, অশ্বত্থবৃক্ষ, বিল্ববৃক্ষ, সকলি সুন্দর। কিন্তু, এখন সবই বন্ধ। আবার হইবে। কিরূপে হইবে তাহাই বুঝিবার জন্য কাটোয়া গেলাম। তাঁতিপাড়ার বারোয়ারীতলায় দুই দিন বক্তৃতা হইল। কালীগঞ্জের লোক আসিয়াছে, গাড়ী আসিয়াছে। কালীগঞ্জ আমার জন্মভূমি, পিতৃপিতামহের ভূমি। কালীগঞ্জ নদীয়া জেলার উত্তর সীমা, বিখ্যাত পলাশীর চারি মাইল উত্তরে। পলাশী কালীগঞ্জ থানারই অন্তর্গত। গ্রামের নাম লাখুরিয়া, বাজারের নাম কালীগঞ্জ। দাশু রায়ের পাঁচালিতে আছে 'হাট করেন না কালীগঞ্জের হাটে'। এই সেই কালীগঞ্জ। লাখুরিয়া কালীগঞ্জ হরিনাথপুর, একখানি বড় গ্রাম, একেবারে ভাগীরথীর উপরে, কিন্তু ১৫ বৎসর হইল ভাগীরথী সরিয়া গিয়াছেন। বর্ষাকালে পুরাতন খাতে কিছুদিন জল চলে, অন্য সময় জল থাকে না। কালীগঞ্জ প্রাচীন গ্রাম, ভদ্রগ্রাম, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গ্রাম, কিন্তু আর সে সমৃদ্ধি নাই। আমার পিতাই কালীগঞ্জ ত্যাগ করেন বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে। এখন কালীগঞ্জে আছেন আমাদের পৈতৃক ঠাকুর ও আমার শৈশবের বন্ধু, শ্রীগোপীনাথ।

কালীগঞ্জে সভা করিয়া নমঃশূদ্রগণকে নাপিত দিতে হইবে। আমাকে যখন লইয়া যাওয়া হইল, তখন একথা বলা হয় নাই। নবদ্বীপ, দাঁইহাট ও কাটোয়ায় আমার সঙ্গে হিন্দুমিশনের লোক ছিল, কাটোয়ায় তাহাদের বিদায় দিলাম। যদি কালীগঞ্জে কি হইবে জানিতাম, তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গে আনিতাম। যাহা হউক কালীগঞ্জে সভা হইল। ব্রাহ্মণেরা এবং প্রাচীন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা এখন বিশেষরূপে উদারভাবাপন্ন হইয়াছেন। কালীগঞ্জে এখনও একজন প্রাচীন ও প্রকৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছেন—পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত গঙ্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য—হরিনাথপুরে তাঁহার বাড়ী সিদ্ধপুরুষের বংশ, তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৯০ বৎসর, এখনও বেশ সক্ষম আছেন। জুড়ানপুরের কালীমাতার কথা অনেকেই জানেন। জুড়ানপুরের কালীমাতার নামেই কালীগঞ্জের নাম আর এই কালীমাতা এই ভট্টাচার্য্যমহাশয়দের বাড়ীর বধূ। প্রবাদটি ঠিক্ অর্দ্ধকালীর প্রবাদের ন্যায়।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত গঙ্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় প্রাচীন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এখন দেশে খুব কমই আছেন, কিন্তু তিনি কখনই সঙ্কীর্ণমনা নহেন, দেশের পরিবর্ত্তন তিনি বেশ বোঝেন এবং সামাজিক রীতি পদ্ধতির যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহাও তিনি স্বীকার করেন। তাঁহার অনুগ্রহে ব্রাহ্মণেরা একমত হইলেন, নাপিতদের মধ্যে কিছু মতভেদ হইলেও কাজটি একরূপ হইয়া গেল। তিনদিন কালীগঞ্জে থাকিয়া গো-যানে গঙ্গা পার হইয়া গোপালপুর আসিলাম—**আমগড়ে গোপালপুর।** এখানে একজন বদান্য ভক্ত আছেন, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দত্ত। বৈষ্ণবদিগকে তিনি যেরূপ সাহায্য করেন ও ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করেন, একালে সেরূপ সাহায্য ও সেবা খুব কম লোকেই করেন। তাঁহার বাড়ীতে এই সময়ে প্রত্যেক বৎসর উৎসব হয়, ভাল ভাল কীর্ত্তনের গান হয়, পাঠ হয়, অনেক বৈষ্ণবের ও সজ্জনের সমাগম হইয়া থাকে। পূর্ব্বে কখনও যাই নাই, তবে লোকমুখে শুনিতাম। এবার কাটোয়ায় থাকার সময় গোপালপুরের লোক আসিয়া উপস্থিত। সম্মত হইলাম। কথা হইল, গোপালপুর হইতে কালীগঞ্জে গরুর গাড়ী আসিবে, সেই গাড়ীতে গোপালপুর যাইব। অন্য উপায়ে রেলে চড়িয়াও যাওয়া যাইত, কিন্তু রাঢ়দেশের মাঠে মাঠে অনেকদিন গোযানে পর্য্যটন হয় নাই, কাজেই ঐরূপ ব্যবস্থা করা গেল। গোপালপুরে দেখিলাম গোষ্ঠবাবুর ও তাঁহার পুত্রগণের অমায়িক ও অকিঞ্চন ব্যবহার। তাঁহারা বৈষ্ণবদের সাহায্য করেন বলিয়া একালের বাবুরা বড় বিরক্ত। তাঁহারা বলেন ইস্কুল করিয়া দেয় না কেন? আমাকে অনেকে একথা বলিলেন, আমি বলিলাম, যিনি যাহা বোঝেন না, তিনি তাহা করিবেন কেন? আর বৈষ্ণবদের সাহায্য করা কি ভাল কাজ নহে। এখনকার অল্পশিক্ষিত অনেক লোক যে বোঝে না। আসল কথা হিংসা। যাহা হউক গোষ্ঠবাবুর উৎসব খুব ভাল। দুদিন গোপালপুরে থাকিয়া সিউড়ি আসিলাম, ২০শে ফেব্রুয়ারী ৭ই ফাল্গুন। ৫০ দিন অবিশ্রান্ত পর্য্যটন ও বিরামবিহীন বক্তৃতা। ১০ দিন সিউড়িতে থাকিয়া ২রা মার্চ্চ ১৮ই ফাল্গুন সকালে রওনা হইয়া কলিকাতা।

চতুর্থ পর্ব্ব

দুইদিন কলিকাতা থাকিয়া **মেদিনীপুর** রওনা হইলাম। মেদিনীপুরের স্বর্গীয় জন্মেজয় মল্লিক সুপ্রসিদ্ধ লোক। ব্যবসায় করিয়া তিনি বহু উপার্জ্জন করেন—দেবসেবার জন্য তিনি যে-দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার আয় কুড়ি হাজার টাকার উপর। মেদিনীপুরের মল্লিকবাড়ী সকলেরই পরিচিত। ইঁহারা জাতিতে তাম্বুলী। এই বাড়ীর এখন যিনি বড় গিন্নী, তিনি আমার

একজন ধর্ম্ম-মাতা। তিনি অনেক দিন আমাদের সহিত পরামর্শ করিয়া এক কীর্ত্তি করিয়াছেন। একটি নিতাই-গৌরাঙ্গের মন্দির। তাঁহার একটি ছাত্রনিবাস আছে, অনেক দিনই আছে। অনেকগুলি বিদ্যার্থী, থাকিবার স্থান ও আহারীয় পায়। তাঁহার ইচ্ছা এই মন্দিরে এমন কিছু সম্পত্তি দিবেন যাহাতে দেবসেবা, ছাত্রনিবাস, শাস্ত্রগ্রন্থের পাঠাগার, কিছু ঔষধ-বিতরণ প্রভৃতি কার্য্য চলে। মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে. দোলের সময় উৎসব করা দরকার। মেদিনীপুরের বন্ধুগণ লিখিতেছেন, আপনি না আসিলে উৎসব হইবে না। কাজেই মেদিনীপুর চলিলাম। মেদিনীপুর অনেকবার গিয়াছি, খুবই নিজের জায়গা বলিয়া মনে হয়। ৪ঠা মার্চ্চ সন্ধ্যার পর মেদিনীপুর পৌঁছিলাম। মেদিনীপুর সহরে পাটনাবাজারে মহাপ্রভুর মন্দির আছে। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র বাবু ইহার সেবাইত, সুপণ্ডিত কুমুদ বাবু এই মন্দিরে প্রায়ই শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, এই মন্দিরটি অনেকগুলি ভক্তের নিয়মিত মিলন-স্থান। ক্ষেত্র বাবুর উদ্যোগে এই মন্দির অতি সুন্দরভাবে চলিতেছে, ইহা অনেক দিন হইতে দেখিতেছি। এই সময়ে সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের অনেক শিষ্য মেদিনীপুরে আসেন, এবারও আসিয়াছেন। ৫ই মার্চ্চ মহাপ্রভুর মন্দিরে বহুক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা হইল। বিদেশের অনেক ভক্ত আসিয়াছেন, স্থানীয় লোকও অনেক, খুবই আনন্দ পাইলাম। তাহার পর তিন দিন বড় গিন্নীমাতার নবপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পাঠ ও ব্যাখ্যা হইল। নূতন মন্দিরে দোলের দিন খুব ভাল উৎসব হইল, ছেলেমেয়েরা সারাদিন খুব আনন্দ করিল, অনেক লোকজনকে খাওয়ান হইল। শ্রীভগবানের লীলাস্মরণে এই প্রকারের উৎসব ঘন ঘন হওয়া প্রয়োজন, তাহা মানুষের ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ স্বাস্থ্যেরই উন্নতিকারক। এইসব উৎসব আবার সত্য হউক, আবার প্রাণময় হউক, ভক্তিরস-উদ্দীপিত হৃদয়ে আমরা আবার মেশামিশি করিতে শিখি, ইহাই আমার চিরদিনের কামনা ও প্রার্থনা, মেদিনীপুরের উৎসবে খুবই আনন্দ পাইলাম। বন্ধুগণের অনুরোধে আরও দুইদিন মেদিনীপুরে থাকিলাম। বক্তৃতা হইল, একদিন সহৃদয় শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে আর একদিন সুহৃদ্‌বর শ্রীশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে। দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতা বা ব্যাখ্যান বিশেষ-ভাবে মহিলাদের জন্য। ১১ই মার্চ্চ মেদিনীপুর ছাড়িলাম। মেদিনীপুর ষ্টেশনে পুরাতন বন্ধু ভবতোষ বাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি ধরিলেন তাঁহার গ্রামে যাইতে হইবে, তিনি উৎসব করিবেন। তাঁহার গ্রাম শাঁখারি, জেলা বর্দ্ধমান, বর্দ্ধমান সহরের দক্ষিণ, দামোদরের পার। সম্মতি দিলাম।

ক্রমশঃ

বীরভূমি ৯—১১, ফাল্গুন, ১৩৩৫।

বৃত্রাসুর ও চিত্রকেতু

১। অসুর ও তাহার জন্ম

অসুরের নাম শুনিলেই তোমাদের মনে ভয় হয়, ঘৃণা হয়, ক্রোধ হয়। তোমরা দেবদাস, তোমরা দেবপূজক। তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমরা যে অনাত্ম-দেবতার পূজক, তোমরা ভয়ে ও লোভে বাহিরের দেবতার পূজা কর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপূজা রহিত করিয়া নন্দগোকুলে গোবর্দ্ধনযজ্ঞ প্রবর্ত্তিত করার সময় তোমাদের কতই না নিন্দা করিয়া গিয়াছেন! তথাপি তোমরা দেবদাস, তোমরা দেবপূজক, তোমরা দেবতাদের পশু—দেবানাং পশুঃ। তোমরা নিতান্তই অজ্ঞান, নিতান্ত নিরীহ। তোমরা ভোগের লালসায়, দেহের ও ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের জন্য দেবতার চরণে তোমাদের মনগুলিকে বিক্রয় করিয়া নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রাগত হইয়া কেবলই দুঃস্বপ্ন দেখিতেছ। দেবতারা তোমাদের পশু করিয়া রাখিয়াছে। এই দেবতা তোমাদের ভিতরের দেবতা নহে, তোমাদের নিজেদের অনুভূতিতে এই সব দেবতার স্থান নাই, বাহির হইতে কাহারা আসিয়া ভয় দেখাইয়া লোভ দেখাইয়া তোমাদের ঘাড়ের উপর এই সব দেবতা চাপাইয়া দিয়াছে, আর তোমরা না ভাবিয়া না বুঝিয়া মৃতের ন্যায় দেবতার চরণে কত জন্ম জন্ম ধরিয়া নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া রহিয়াছ। শুনিবে না, বুঝিবে না, শুনিয়া শুনিয়া বুঝিলেও সেই বোধ ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, সেই বোধের আলোকে চলিতে পারিবে না। এমনি জড়তা আসিয়াছে, তমোগুণের প্রভাব এতই বাড়িয়া গিয়াছে। তাই, অসুরের নাম করিলেই তোমাদের ভয় হয়, ঘৃণা হয়, দুশ্চিন্তা হয়, ক্রোধ হয়।

তোমরা কি জান, দেবতার পাপের ফলেই অসুরের জন্ম হয়? সব সময়েই যে এক কারণে অসুরের জন্ম হয় তাহা নহে, কিন্তু শ্রুতিসার শ্রীমদ্ভাগবত দেখাইয়াছেন,

অনেক সময়েই দেবতার পাপে অসুরের জন্ম হয়। অসুর না থাকিলে,—অসুরের অভ্যুত্থান না হইলে, দেবতা পশু হইয়া যায়, আর দেবদাস ও দেবপূজক মানুষেরা অকর্ম্মণ্য জড়পদার্থ হইয়া যায়। কাজেই, অসুরের অভ্যুত্থান স্বাভাবিক ও আবশ্যক। যদি মানুষ হইতে চাও, যদি ভক্ত বা ভাগবত হইতে চাও, তাহা হইলে কেবল দেবতার দলভুক্ত হইলে চলিবে না, অসুরেরও পূজা কর, বল অসুরের জয় হউক, বল অসুরের চরণে প্রণাম।

দেবতা হওয়া যে খুব কঠিন, তাহা নহে। অনেকেই দেবতা হইয়াছে, আমাদেরই মতো অনেক মানুষ, সংসারের সাধারণ মানুষ তপস্যা করিয়া দেবতা হইয়াছে। আমরাও দেবতা হইব। কেন হইব না? দেবতা হওয়া খুব কঠিন নহে, কিন্তু দেবত্ব রক্ষা করা বড়ই কঠিন। দেবত্ব বলিলে অধিকার বুঝায়, আধিপত্য ও সুবিধা বুঝায়। অধিকার, আধিপত্য ও সুবিধা অর্জ্জন করা যায়, কিন্তু জীর্ণ করা বড়ই বিষম দায়। দেবরাজ ইন্দ্র এই অধিকার ও আধিপত্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি দেবগুরু বৃহস্পতির অপমান করিয়াছিলেন, পুরোহিত বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছিলেন। আমরা যাহাদের দেবতা বলিয়া পূজা করি, তাহারাও কত অকৃতজ্ঞ হইতে পারে, কত নীচ ও ঈর্ষাপরায়ণ হইতে পারে, তাহার প্রমাণ এই বিশ্বরূপ-বধ।

দেবতা যখন দেবত্ব-রক্ষার জন্য, নিজেদের অধিকার, স্বার্থ, সুবিধা ও আধিপত্য রক্ষার জন্য, ন্যায়ের সত্যের বা ধর্ম্মের মস্তকে পদে পদে পদাঘাত করে, বিশ্বরূপের বা বিশ্বজনীন কল্যাণের অকারণ মুণ্ডচ্ছেদ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না, তখন বিশ্বব্যবস্থাই চাহে অসুরের অভ্যুত্থান। ইন্দ্র যখন বিশ্বরূপকে বধ করিলেন, তখন বৃত্রের আবির্ভাব প্রয়োজন হইল। এই বৃত্রই অসুর। এই অসুর বিদ্রোহী ও বিপ্লবী।

দেবতার পাপের ফলে বিশ্বব্যবস্থার প্রয়োজনে অসুরের জন্ম হয়, কিন্তু তপস্বীর তপস্যা ও যাজ্ঞিকের যজ্ঞ প্রয়োজন। বৃত্রাসুরের জন্ম এই প্রকারেই হইয়াছিল। বিশ্বরূপের পিতা ছিলেন দেবতা, দেবতার মধ্যে ব্রাহ্মণ। তাঁহার নাম ছিল ত্বষ্টা। বিশ্বরূপের মাতা ছিলেন অসুরকন্যা। বিশ্বরূপ ছিলেন, একাধারে দেবতা, অসুর ও মানুষ, দুই নহে তিন। তিনি যদি 'দুই' হইতেন, অসুর ও দেবতা হইতেন, আর কিছু না হইতেন, তাঁহার পিতার ও মাতার যাহা ছিল তাহা ছাড়া আরও কিছু যদি বিশ্বরূপে না

থাকিত, তাহা হইলে বিশ্বরূপ হইতেন গতানুগতিক। তাই বিশ্বরূপ ছিলেন একাধারে তিন, দেবতা অসুর ও মানুষ। বিশ্বরূপের তিনটি ছিল মাথা। একটি মুখে খাইতেন তিনি সুধা, আর এক মুখে সুরা, আর তৃতীয় মুখে অন্ন। ত্বষ্টার তপস্যার ধন এই বিশ্বরূপ, বিশ্বের প্রয়োজন এই বিশ্বরূপ। কিন্তু, ইন্দ্রের জন্য বিশ্বে বিশ্বরূপের স্থান হইল না। ইন্দ্র হিংসাপরবশ হইয়া বিশ্বরূপকে বধ করিলেন।

ত্বষ্টা কে? ত্বষ্টার পিতা কশ্যপ, মাতা অদিতি। টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ বলেন এই যে কশ্যপ, ইঁহার নাম তার্ক্ষ্য। "তার্ক্ষ্যনাম্নঃ কশ্যপস্য"। ত্বষ্টা, দ্বাদশ আদিত্যের একজন। দ্বাদশ আদিত্যের নাম—

বিবস্বানর্য্যমা পূষা ত্বষ্টাথ সবিতা ভগঃ।
ধাতা বিধাতা বরুণো মিত্র শক্র উরুক্রমঃ॥ভা ৬ ৬-৩৬

আবার ত্বষ্টা একজন প্রজাপতি, তাঁহার স্ত্রী দৈত্যকন্যা রচনা, তাঁহাদের দুইপুত্র সন্নিবেশ ও বিশ্বরূপ।

ত্বষ্টুর্দৈত্যাত্মজা ভার্য্যা রচনা নাম কন্যকা।
সন্নিবেশস্তয়োর্জজ্ঞে বিশ্বরূপশ্চ বীর্য্যবান্॥

আবার বিশ্বকর্ম্মারও নাম ত্বষ্টা, কাষ্ঠশিল্পী সূত্রধর জাতিকেও 'ত্বষ্টা' বলে।

ইন্দ্র যখন বিশ্বরূপকে বধ করেন তখন ত্বষ্টা তপোবনে ছিলেন, তপোবন হইতে তপস্বীরা আশ্বিনমাসে বাড়ী ফিরিতেন এবং আশ্বিন মাসের ব্রতাদি যথারীতি পালন করিতেন। বিশ্বরূপ বধের এক বৎসর পরে ত্বষ্টা বাড়ী আসিয়া সংবাদ পাইলেন এবং ক্রোধে ও শোকে অভিভূত হইয়া ইন্দ্রকে বধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীবিশ্বনাথ তাঁহার টিকায় এই কথা বলিয়াছেন।

হতপুত্রস্ততস্ত্বষ্টা জুহাবেন্দ্রায় শত্রবে।
ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব মা চিরং জহি বিদ্বিষং॥

'ইন্দ্রায় শত্রবে' ইন্দ্ররূপ যে শত্রু, তাহাকে বধ করিবার জন্য ত্বষ্টা 'জুহাব' অগ্নিতে আহুতি দিলেন। আহুতিদানের মন্ত্র হইল—'ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব"। ত্বষ্টা যখন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, তখন তাঁহার অভিপ্রায় ছিল—তুমি ইন্দ্রের শত্রুরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। মন্ত্র বলিবার সময় উচ্চারণের দোষ হইল। বেদের মন্ত্রের স্বরবর্ণের তিন প্রকার

উচ্চারণ উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎ। 'ইন্দ্রশত্রো' এই পদটি তৎপুরুষ সমাস হইতে পারে আবার বহুব্রীহি সমাসও হইতে পারে। উচ্চারণের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় পদটি কোন্ সমাসে ব্যবহৃত হইয়াছে। ত্বষ্টার উচ্চারণে দোষ হইল। আদ্য শব্দটি উদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হওয়ায় 'ইন্দ্রের শত্রু' অর্থ না হইয়া 'হে ইন্দ্র, হে শত্রো' এইরূপ অর্থ হইয়া গেল।

অর্থ যাহাই হউক, তাহার পরিণাম পরে দেখা যাইবে। আপাততঃ ত্বষ্টার আহুতি-দানের ফল ফলিল।

অথান্বাহার্য্যপচনাদুত্থিতো ঘোরদর্শনঃ।
কৃতান্ত ইব লোকানাং যুগান্তসময়ে যথা॥১১

'অন্বাহার্য্যপচনাৎ'—দক্ষিণাগ্নি হইতে যুগান্তকালীন কৃতান্তের ন্যায় ঘোরদর্শন এক অসুরের উৎপত্তি হইল। এই অসুরের নামই বৃত্র।

যেনাবৃতা ইমে লোকাস্তপসা ত্বাষ্ট্রমূর্ত্তিনা।
স বৈ বৃত্র ইতি প্রোক্তঃ পাপঃ পরমদারুণঃ॥১৬

ত্বষ্টার পুত্র ঐ অসুর তপস্যার দ্বারা এই সমস্ত লোককে আবৃত করিয়াছিল, এই কারণে তাহার নাম বৃত্র। শ্রুতিতেও এই কথা আছে। 'স ইমান্ লোকানাবৃণোৎ।

শ্রীমদ্ভাগবতে বৃত্রাসুরকে 'পাপ' বলা হইয়াছে। 'পাপ এই কথাটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'দুরদৃষ্ট'কেও পাপ বলে। বৃত্রের জন্ম বিশ্বের পক্ষে যে একটা অশান্তিকর ব্যাপার তাহাতে সন্দেহ নাই। বৃত্রের জন্ম যে মানবজাতির দুরদৃষ্টের ফল, তাহাতেও সন্দেহ নাই। 'নিষ্ঠুরতা' পাপ। বৃত্র নিষ্ঠুর। একটা কঠিন ব্যাধি নির্ম্মূল করার জন্য যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, অনেক সময়ে সেই চিকিৎসাও নিতান্ত নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হয়। 'বৃত্র'কে এই সব কারণেই পাপ বলা হইয়াছে। সমাজে বা জগতে একটা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, মানব দেবতা প্রভৃতি সকলেই সেই ব্যবস্থার অনুবর্ত্তন করিয়া নিরুদ্বেগে দিন যাপন করিতেছিলেন। বৃত্রাসুরের আবির্ভাবের দ্বারা সেই প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার ভিত্তি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। কাজেই, সাধারণ দৃষ্টিতে বৃত্রাসুরকে লোকে 'পাপ' বলিবে। কিন্তু, মূলে 'পাপ' ইন্দ্রের। শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বজন-সম্মানিত টিকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী মহোদয় ষষ্ঠস্কন্ধের ভূমিকা-স্বরূপে বলিয়াছেন, মনুষ্যলোকে

অজামিল যেমন মহাপাপ, দেবলোকে ইন্দ্রও সেইরূপ মহাপাপ। অতএব, চিকিৎসা যেমন নিষ্ঠুর, বৃত্রও তেমনই নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর, অশান্তিকর, প্রচলিতের বা প্রতিষ্ঠিতের বিরোধী বলিয়াই বৃত্র অসুর ও পাপ।

বৃত্রাসুরকে দেখিয়াই দেবতারা দলবদ্ধ হইলেন এবং তাহাকে আক্রমণ করিলেন। দেবতাদের যাঁহার যত অস্ত্র ছিল বৃত্রাসুরের উপর অবিরল ধারায় বর্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু, কিছুতেই কিছু হইল না। "সোঽগ্রসত্তানি কৃৎস্নশঃ॥ দেবতাদের যাবতীয় অস্ত্র বৃত্রাসুর গ্রাস করিয়া ফেলিল।

বৃত্রাসুরের আকস্মিক আবির্ভাবের ন্যায় একটা ব্যাপার যে হইতে পারে, এত বড় একটা অসুর সমগ্র বিশ্বকে নিজের বিক্রমে বিকম্পিত করিয়া দেবতাদের অস্ত্রগুলিকে এমনভাবে অগ্রাহ্য করিতে পারে, দেবতারা কখন তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। দেবত্বের গর্ব্বে দেবতারা মোহাচ্ছন্ন। বৃহস্পতি নাই, ইন্দ্রের নিকট অপমানিত হইয়া বৃহস্পতি যে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, কেহই তাহা জানে না। বিশ্বরূপ ইন্দ্রকে ও দেবতাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অসুর-বিরোধী দেবরাজ ইন্দ্র ঈর্ষাপরবশ হইয়া সেই বিশ্বরূপ ব্রাহ্মণকে বধ করিয়াছেন। ইন্দ্র যখন দেবতাদের রাজা, তখন ইন্দ্রের পাপের জন্য প্রত্যেক দেবতাই দায়ী। তোমরা না দেবতা? তোমাদের রাজা পাপ করে, উৎকট ও ভীষণ পাপ করে, আর তোমরা তাহা নিবারণ করিতে পার না? তোমরা কিসের দেবতা? ধিক্ তোমাদের দেবত্বে, তোমরা যে পশুরও অধম। রাজার পাপের ফল রাজ্যের সকলকেই ভোগ করিতে হয়, রাজার পাপে রাজ্যের সর্ব্বনাশ হয়, ইহা চিরন্তন শাস্ত্রীয় কথা।

২। দেবতার তপস্যা

দেবতাদের দোষের কথা বলিলাম। তাহাদের গুণের কথাও বলা দরকার। দেবতাদের গুণ তিনটি। প্রথম গুণ, তাঁহারা বিপদাপন্ন হইলেই বুঝিতে পারেন, বিপদাপন্ন হইয়াছি। এই যে বোধ, ইহা বড়ই মূল্যবান্। যেমন বুঝিতে পারেন বিপদাপন্ন হইয়াছি, অমনি সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারেন, নিজেদের ভিতরকার পরস্পরের মধ্যে যত বিরোধ ও বৈষম্য তাহা আর থাকে না। দেবতারা বিপদের আশঙ্কা বুঝিলেই একমতাবলম্বী

হইয়া দলবদ্ধ হইতে পারেন। তৃতীয়গুণ, বিপদাপন্ন হইলেই দেবতা 'অন্তর্মুখী' হইতে পারেন। অন্তর্মুখী হইতে না পারিলে, অন্তর্যামীর শরণাগত হইতে না পারিলে কাহারও বিপদ দূর হয় না, প্রকৃত কল্যাণও হয় না। এই গুণটি দেবতাদের বিশেষ গুণ। এই গুণ আছে বলিয়াই দেবতা, দেবতা। দেবতা যদি সকল সময়ে অন্তর্মুখী হইয়া অন্তর্যামীর আশ্রিত হইয়া থাকিতে পারিতেন, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি? তাহা হইলে অসুরের অভ্যুত্থান, বিপ্লব ও অশান্তি একেবারেই হইত না। কিন্তু, ঐশ্বর্য্য-ভোগের, সুবিধা অধিকার ও আধিপত্যের দোষ, উহা মানুষকে এবং দেবতাকে বহির্মুখ করে। দেবতা বহির্মুখ হইলেই অসুরের অভ্যুদয়। অসুর শক্তিশালী ও তপস্বী। শক্তিতে এবং তপস্যায় অসুরেরা দেবতার অপেক্ষাও বড়। কিন্তু অসুরের দোষ, তাহারা প্রায়ই কখন অন্তর্মুখী নহে, সর্ব্বদাই বহির্মুখ। উপনিষদে এই সব কথা আছে। উপনিষদের এই সব তত্ত্ব যাঁহারা জানেন ও বোঝেন, তাঁহারা এই সব তত্ত্বের আলোকে পুরাণের লীলাগুলি সঠিকরূপে ও সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন।

অসুরেরা অন্তর্মুখী নহে, বহির্মুখী। সেইজন্য তাঁহারা প্রধানতঃ সঙ্কর্ষণের উপাসক। সঙ্কর্ষণও ভগবান্, নারায়ণও ভগবান্। একই ভগবান, কাহারও নিকট সঙ্কর্ষণ, কাহারও নিকট নারায়ণ। দেবতারা অন্তর্মুখী বলিয়া অন্তর্যামী নারায়ণের উপাসক। পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম বা ভাগবত ধর্ম্ম, কেবল নারায়ণেরও উপাসনা নহে, কেবল সঙ্কর্ষণেরও উপাসনা নহে। একই ভগবানের দ্বিবিধ প্রকাশ, নারায়ণ ও সঙ্কর্ষণ। ইহা যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারাই পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম পাইয়াছেন। ইহাই বাঙ্গালা দেশের যুগধর্ম্ম—নিতাই-গৌরাঙ্গ উপাসনা।

এখন দেখা যাউক, দেবতারা কি করেন? দেবতারা প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, বৃত্রাসুরকে বধ করিতে। তাঁহাদের যত অস্ত্র, যত নৈপুণ্য সমস্তই প্রযুক্ত হইল। কিন্তু, নিস্ফল, কিছুতেই কিছু হইল না। এইবার দেবতারা অন্তর্মুখী হইলেন, পরমদেবতা ও আত্মার অন্তর্যামী পরমপুরুষের শ্রীনারায়ণের শরণাগত হইলেন।

ততস্তে বিস্মিতাঃ সর্ব্বে বিষণ্ণা গ্রস্ততেজসঃ।
প্রত্যক্ষমাদিপুরুষমুপতস্থুঃ সমাহিতাঃ॥

প্রত্যঞ্চং অন্তর্যামিণং ত্রিভুবনস্য তেন ব্যাপ্তত্বাৎ কাপি গমনাসম্ভবাৎ তত্রৈব স্থিত্বা তুষ্টুবুরিত্যর্থঃ। শ্রীধরঃ। প্রত্যঞ্চং প্রত্যগ্‌ভূতমন্তর্যামিনমিত্যর্থঃ। বিশ্বনাথ।

দেবতারা প্রথমে বুঝিলেন আমাদের আর সে তেজঃ নাই, কে যেন আমাদের শক্তি গ্রাস করিয়াছে। এইটুকু বুঝিয়া তাঁহারা হইলেন বিস্মিত ও বিষণ্ণ। তখন তাঁহারা সকলে সমাহিত হইয়া অন্তর্যামী যে আদিপুরুষ তাঁহার শরণাগত হইলেন। এই যে, অন্তর্যামী, ইনি ত্রিভুবনে ব্যাপ্তরূপে সর্ব্বদাই রহিয়াছেন, তিনি আর যাইবেন কোথায়? কাজেই দেবতারা সেইখানে বসিয়াই নিজেদের ভিতরে সেই আদিপুরুষকে খুঁজিলেন, পাইলেন ও তাঁহার শরণাগত হইলেন।

দেবতারা বিপন্ন হইলেই একতাবদ্ধ হইয়া থাকেন, আদিপুরুষের শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। কিন্তু, সব সময়েই যে তাঁহারা এক প্রকারেই শরণাগত হয়েন তাহা নহে। কংস প্রভৃতির অত্যাচারে পৃথিবী ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলেন, আবার ব্রহ্মা শিবাদি দেবতাকে লইয়া ক্ষীরোদসাগরের তীরে গিয়াছিলেন। যাহা হউক, এখন আর তাঁহারা স্থানান্তরে কোথাও গেলেন না, সেইখানে বসিয়াই সমাহিত হইলেন। শ্রীধর স্বামী যখন এই কথাটি বলিয়াছেন, তখন ইহার ভিতর বিশেষ রকমের কোন রহস্য আছে।

এইবার দেবগণের প্রার্থনা। সাতটি শ্লোকে দেবতারা প্রার্থনা করিলেন।

বায্বম্বরাগ্ন্যপ্‌ক্ষিতয়স্ত্রিলোকা ব্রহ্মাদয়ো যে বয়মুদ্বিজন্তঃ।
হরাম যস্মৈ বলিমন্তকোঽসৌ বিভেতি যস্মাদরণং ততোঽস্তু নঃ। ৬।৯।১৯

বায়ু, অম্বর (আকাশ), অগ্নি, অপ্‌ (জল), ক্ষিতি—এই পঞ্চভূত বা এই পঞ্চভূতের দ্বারা উপলক্ষিত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব। এই সমুদয় তত্ত্বের দ্বারা নির্ম্মিত এই ত্রিলোক। এই ত্রিলোকের অধিপতি ব্রহ্মা প্রভৃতি, আর সেই ব্রহ্মা প্রভৃতির অধীন ও পরবর্ত্তী (অর্ব্বাচীন) আমরা এই দেবতারা। আমরা সকলেই ভীতচিত্তে (উদ্বিজন্তঃ) অন্তককে বা কালকে পূজার উপহার (বলি) প্রদান করিয়া থাকি। আমরা সকলেই অন্তকের ভয়ে ভীত, কালের শাসনে চালিত। এই কাল আবার একজনকে ভয় করেন, তিনিই পরমেশ্বর। সেই পরমেশ্বর হইতে আমাদের রক্ষা হউক।

দেবতারা পরমেশ্বরকে ভুলিয়া অহঙ্কারের দ্বারা চালিত হইলেই তাঁহাদের পতন ও বিপদ হইয়া থাকে। 'কেন' উপনিষদে তাহার বর্ণনা আছে। তখন অগ্নি একটি তৃণকে

পোড়াইতে পারেন না, বায়ু একটি তৃণকে উড়াইতে পারেন না, বরুণ একটি তৃণকে ভিজাইতে পারেন না। সেই অবস্থায় ইন্দ্র হিমাচল পর্ব্বতে যোগস্থ হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপিণী হৈমবতী উমার আরাধনা করেন। হৈমবতীর কৃপায় দেবতাদের দৃষ্টি আবার প্রসারিত হয় এবং তাঁহারা পরম পুরুষকে জানিয়া আবার ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। ইহাই ঔপনিষদী বার্ত্তা বা কেনোপনিষদের কথা। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে দেবতাদের সেই মোহভঙ্গের কথাই রহিয়াছে। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তের ভাষ্য বলা হয়।

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তং।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুং ॥ ২০

পরমেশ্বরকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া আশ্রয় করিলেন কেন? তাহার হেতু বলিতেছেন। এই পরমেশ্বর অবিস্মিত (১)—নিরহঙ্কার বা কুতূহলশূন্য। তিনি ব্যতীত বা তাঁহা হইতে পৃথক্ হইয়া অন্য কোন অপূর্ব্ব বস্তু নাই, কাজেই একমাত্র তিনিই অবিস্মিত। দেবতারা বৃত্রাসুরের বিক্রমে বিস্মিত ও বিষণ্ন হইয়াছিলেন। পরমেশ্বরকে 'অবিস্মিত' বলিয়া চিন্তা করার ইহাই হেতু। পরমেশ্বর প্রশান্ত (২) রাগাদিশূন্য ও চিত্তদোষ-রহিত। কারণ তিনি 'স্বেনৈব লাভেন পরিপূর্ণকামং' (৩) আত্মলাভেই পরিপূর্ণকাম। কারণ তিনি সম (৪) উপাধিপরিচ্ছেদশূন্য। অতএব, তাঁহাকে,—সেই এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে ছাড়িয়া যাহারা অন্যের শরণাগত হয়, তাহারা মূর্খ। তাহারা কুকুরের লাঙ্গুল ধরিয়া সমুদ্র পার হইতে চায়।

বিশেষণ-চারিটি শ্রীধর স্বামীর মতে ব্যাখ্যাত হইল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় 'স্বেনৈব লাভেন পরিপূর্ণকামং' ইহার অর্থ করিয়াছেন—"স্বস্বরূপেনৈব যো লাভঃ সৌন্দর্য্যাদিমাধুর্য্যসম্পত্তস্য প্রাপ্তি স্তেন সমং সহ পরিপূর্ণাঃ কামাঃ স্বীয়হ্লাদিনীশক্তিদত্তা ভোগা যস্য তং।" তাঁহার স্বরূপের দ্বারাই তাঁহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি সম্পত্তের প্রাপ্তি হয়। বাহিরের কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। এই প্রাপ্তির দ্বারা তাঁহার সমুদয় কামনা পূর্ণ, নিজেরই হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা তাঁহার সমুদয় ভোগই সিদ্ধ হইয়া থাকে। 'প্রশান্ত' কথার অর্থ অনুগ্র—সেবাপরাধ হইলেও তিনি এমনই ভক্তবৎসল যে অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া থাকেন।

এই দুইটি শ্লোকের দ্বারা দেবতারা পরমেশ্বরকে দৃঢ়রূপে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া চিন্তা করিতেছেন, মহাভয় উপস্থিত হইলে তিনিই একমাত্র রক্ষক। মহাপ্রলয়ে মৎস্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তিনি সত্যব্রতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রলয় পয়োধিজলে বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে পতিতপ্রায় ব্রহ্মাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা, এই দেবতারা সেই শ্রীভগবান-কর্ত্তৃক সৃষ্ট ও পালিত। আমরা, এই দেবতারা যে সৃষ্টির কাজ করি, তাহা সেই ভগবানেরই অনুগ্রহ। তিনি অন্তর্য্যামিরূপে গূঢ়ভাবে সমুদয় করিতেছেন। যত চেষ্টা সকলই তাঁহার কিন্তু আমরা নিজেদের স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া মনে করি বলিয়া তাঁহার লিঙ্গ (ক্রিয়া লক্ষণ) প্রভৃতি দেখিতে পাই না।

বয়ং ন যস্যাপি পুরঃ সমীহতঃ পশ্যাম লিঙ্গং পৃথগীশমানিনঃ।

তিনিই উপেন্দ্র (বামন) পরশুরাম, মৎস্য, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি তনু-ধারণ করিয়া অসুর-পীড়িত দেবগণকে চিরদিন রক্ষা করিয়াছেন।

তমেব দেবং বয়মাত্মদৈবতং পরং প্রধানং পুরুষং বিশ্বমন্যং।
ব্রজাম সর্ব্বে শরণং শরণ্যং স্বানাং স নো ধস্যতি শং মহাত্মা ॥২৫

আমরা সকলে সেই শরণ্য পরমেশ্বরের শরণাগত হই। তিনি আত্মভূত দৈবত (১) পরমাত্মা, তিনি বিশ্ব বা বিশ্বাত্মক ( ) কিন্তু বিশ্বের ন্যায় বিকারশীল নহেন, তিনি অন্য (৩) বিশ্ব হইতে পৃথক্। মায়াশক্তির দ্বারা বিশ্বরূপ, আর চিচ্ছক্তির দ্বারা বিশ্ব হইতে পৃথক্। (বিশ্বনাথ) তিনি পর (৪) কারণ। তিনিই প্রধান (৫), তিনিই পুরুষ। তিনি মহাত্মা, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের কল্যাণ করিবেন।

ভগবান আবির্ভূত হইলেন, প্রথমে অন্তরে, তাহার পর বাহিরে। দেবগণ প্রথমে ভূলুণ্ঠিত, তাহার পর গাত্রোত্থান করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার বন্দনা করিতেছেন।

নমস্তে যজ্ঞবীর্য্যায় বয়সে উত তে নমঃ।
নমস্তে হ্যস্তচক্রায় নমঃ সুপুরুহূতয়ে ॥

যাহাকে গুণাশ্রিত ধর্ম্ম বলে, দেবতারা সেই ধর্ম্মের প্রতিপালক। যজ্ঞই গুণাশ্রিত ধর্ম্মের প্রাণ-স্বরূপ। কাজেই দেবতারা যজ্ঞবীর্য্য (১) বলিয়া প্রথমেই ভগবানকে প্রণাম করিতেছেন। যজ্ঞের ফল হয়, যজ্ঞ করিয়া স্বর্গাদি পাওয়া যায়, যজ্ঞের এই যে বীর্য্য বা সামর্থ্য, ইহা ভগবানেরই শক্তি। যজ্ঞের যে ফল তাহা কালে শেষ হইয়া যায়, ভগবান্

সেই কালাত্মা (বয়ঃ ২)। দৈত্যেরা যজ্ঞের বিঘাতক, আর ভগবান্ যজ্ঞরক্ষক, কাজেই দৈত্যবধের জন্য চক্রনিক্ষেপকারী (অস্তচক্র ৩)। ভগবানের এই সব প্রভাব আছে বলিয়াই তিনি বহু বহু সুন্দর নামধারী (সুপুরুহূত ৪)।

এই শ্লোকে শ্রীভগবানের যে পরিচয় দেওয়া হইল তাহা গুণোপাধিক পরিচয়। প্রশ্ন হইতেছে, গুণাতীত রূপ পরিত্যাগ করিয়া দেবতারা এই পরিচয় দিতেছেন কেন? তাহার উত্তরেই যেন দেবতারা পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিতেছেন—

যত্তেগতীনাং তিসৃণামীশিতুঃ পরমং পদং।
নার্ব্বাচীনো বিসর্গস্য ধাতর্বেদিতুমর্হতি ।৬।৯।২৯

আপনি ঈশ্বর, আপনার ত্রিগুণাত্মিকা তিন গতির উপরে যে পরম পদ রহিয়াছে (বিশ্বনাথের মতে বৈকুণ্ঠাদি) আমরা তাহা জানিবার যোগ্য নই। কারণ, আমরা এই চরাচর সৃষ্টির ইতিহাসে নিতান্তই কনিষ্ঠ (অর্ব্বাচীন)। ভগবচ্চিন্তাতেও অনধিকার-চর্চ্চা করিতে নাই। ভগবান্‌কে কে জানে? আমি যাঁহাকে জানি, তিনি 'আমার' ভগবান্।

ওঁ নমস্তেঽস্তু ভগবন্নারায়ণ বাসুদেবাদিপুরুষ মহাপুরুষ মহানুভাব পরমমঙ্গল পরমকল্যাণ পরমকারুণিক কেবল জগদাধার লোকৈকনাথ সর্ব্বেশ্বর লক্ষ্মীনাথ পরমহংসপরিব্রাজকৈঃ পরমেণাত্মযোগসমাধিনা পরিভাবিত পরিস্ফুটপারমহংস্যধর্ম্মেণোদ্ঘাটিততমঃকবাটদ্বারেঽপাবৃত আত্মলোকে স্বয়মুপলব্ধ নিজসুখানুভবো ভবান্ ।৩০

এই গদ্যের শেষাংশের অর্থ এইরূপ। পরমহংস পরিব্রাজকগণ পরম আত্মযোগ বা অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারা যে সমাধি অর্থাৎ চিত্তের পরিপূর্ণ একাগ্রতা লাভ করেন, সেই সমাধির দ্বারাই এক পারমহংস্য ধর্ম্ম বা ভগবদ্ভজন পরিস্ফুট হয়। সেই ভজনার দ্বারা চিত্তের তমোরূপ কবাট খুলিয়া যায় আর আত্মলোক প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে এক আত্মসুখ আপনা হইতেই অভিব্যক্ত হইতে থাকে, আপনি সেই সুখের অনুভব-স্বরূপ। অতএব শ্রীভগবান্ কেবলানুভবরূপ।

দুরববোধ ইব তবায়ং বিহারযোগ—আপনার এই বিহারযোগ (ক্রীড়ার বা লীলার প্রক্রিয়া) দুরববোধ, আমাদের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। যদশরণোঽশরীর ইদমনবেক্ষিতাস্মৎ সমবায় আত্মনৈবাবিক্রিয়মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি পাসি হরসি। আপনি অশরণ, নিরাশ্রয়; আপনি অশরীর; অথচ 'অনবেক্ষিতাস্মৎ সমবায়' আমাদের (দেবতাদের)

সমবায় বা মেলনের অপেক্ষা না করিয়াই অগুণ হইয়াও এই সগুণ বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করিতেছেন। এই সব করিতেছেন, কিন্তু, আপনার নিজের কোনরূপ বিকার নাই।৩১

অথ তত্র ভবান্ কিং দেবদত্তবদিহ গুণবিসর্গপতিতঃ পারতন্ত্র্যেণ স্বকৃতকুশলাকুশলফলমুপাদদাতি। আহোস্বিদাত্মারাম উপশমশীলঃ সমঞ্জসদর্শন উদাস্ত ইতি হ বাব ন বিদাম॥৩২

সাধারণ জীব (যথা দেবদত্ত) যেমন গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে নিজের ভাল মন্দ কর্ম্মফল ভোগ করে, গুণবিসর্গে (প্রাকৃতিক এই সৃষ্টিতে) পতিত বা বদ্ধ হইয়া আপনিও কি সেইরূপ স্বকৃত কুশলাকুশল ফলভোগ করিতেছেন ? উত্তর, না। আপনি আত্মারাম, উপশমশীল, সমঞ্জসদর্শন (আপনার দর্শন বা চিচ্ছক্তি অপ্রচ্যুত)। আপনি উদাসীন হইয়াই থাকেন। এই রহস্য আমরা বুঝিতেই পারি না।

ন হি বিরোধ উভয়ং ভগবত্যপরিমিতগুণগণ ঈশ্বরেঽনবগাহ্যমাহাত্ম্যে ঽর্ব্বাচীনবিকল্পবিতর্কবিচার-প্রমাণাভাসকুতর্কশাস্ত্রকলিলান্তঃকরণাশয়দুরবগ্রহবাদিনাং বিবাদানবসরে উপরতসমস্তমায়াময়ে কেবল এবাত্মমায়া মন্তর্দ্ধায় কোঽর্থো দুর্ঘট ইব ভবতি স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ।৩৩

সকলই করিতেছি, অথচ কিছুতেই নাই, এই যে দ্বিবিধ ভাব, ইহা সাধারণতঃ বিরোধী হইলেও পরমেশ্বরে বিরোধী নহে। কারণ, তাঁহাতে অপরিমিত গুণগণ বিদ্যমান তাঁহার মাহাত্ম্য অনবগাহ্য বা অতর্ক্য। শাস্ত্রে আছে বিকল্প, (এবং বা এবং বেতি, এই-রূপ কি এইরূপ ?) বিতর্ক (কিমত্র যুক্তমিতি—এবিষয়ে যুক্তিযুক্ত কি, তাহারই চিন্তা), বিচার (ইত্থমেবেতি, এই রূপই ঠিক), প্রমাণাভাস (অযথার্থ প্রমাণ), আর কুতর্ক। ইহারা অর্ব্বাচীন, বস্তুর যাহা স্বরূপ ইহারা তাহা স্পর্শ করিতেই পারে না। কিন্তু এই সব শাস্ত্রের দ্বারাই মানুষের অন্তঃকরণ ব্যাকুল ও দুষ্ট আগ্রহান্বিত। আপনি এই সব বাদিদিগের বিবাদের অগোচর। একমাত্র শ্রদ্ধাই এখানে প্রয়োজন। মায়াময় সংসার আপনাতে নাই, আপনি কেবল, স্বস্বরূপে অবস্থিত, মায়াকে মধ্যে রাখিয়া আপনাতে কর্তৃত্বাদি সকলি সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু, আপনাতে কর্তৃত্বাদি নাই, আপনার স্বরূপদ্বয় দেখিতে পাই না।

আপনার অনুগ্রহ নিগ্রহ নাই, আপনি সম ও একরূপ, কিন্তু মানুষের মতির বা বুদ্ধির বৈষম্য বশতঃ নানারূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এইরূপে নানাপ্রকারে

প্রকাশিত হইলেও আপনি এক—স এব হি পুনঃ সর্ব্ববস্তুনি বস্তুস্বরূপঃ সর্ব্ববস্তুতে সৎস্বরূপ। সর্ব্বেশ্বরঃ সকলজগৎকারণকারণভূতঃ, সর্ব্বপ্রত্যাগাত্মত্বাৎ (সকলের প্রত্যাগাত্মা বা অন্তর্যামি বলিয়া) সর্ব্বগুণাভাসোপলক্ষিত এক এব পর্য্যবশেষিতঃ—যেখানেই গুণাভাস বা প্রকাশ সেখানে আপনিই বিদ্যমান, আপনি ব্যতীত কোনরূপ প্রকাশই হয় না—অতএব আপনি এক, ইহাই মীমাংসিত হইল।

অথ হ বাব তব মহিমামৃতরসসমুদ্র বিপ্রুষা সকৃদবলীঢ়য়া স্বমনসি নিষ্যন্দমানানবরত সুখেন বিস্মারিতদৃষ্টি শ্রুতিবিষয় সুখলেশাভাসাঃ পরমভাগবতা একান্তিনো ভগবতি সর্ব্বভূতপ্রিয়সুহৃদি সর্ব্বাত্মনি নিরতনির্বৃতমনসঃ কথমুহ বা এতে মধুমথন পুনঃ স্বার্থকুশলা হ্যাত্মপ্রিয়সুহৃদঃ সাধবস্ত্বচ্চরণাম্বুজ সেবাং বিসৃজন্তি ন যত্র পুনরয়ং সংসারপর্য্যাবর্ত্তঃ।

অতএব, আপনাতে ভক্তিই পরমপুরুষার্থ। হে পরমেশ্বর, যেহেতু আপনি এইরূপ, অতএব হে মধুমথন, পরমভাগবত একান্তী সাধুগণ আপনার চরণপদ্মের পরিসেবন কি প্রকারে ত্যাগ করিতে পারেন? এই সব সাধুরা পুরুষার্থে নিপুণ এবং আত্মা বলিয়া আপনিই তাঁহাদের প্রিয়সুহৃৎ। আপনি ভগবান, সর্ব্বভূতের প্রিয়সুহৃদ্ ও সর্ব্বাত্মা। আর এই সব সাধুগণের মনঃ আপনাতেই সর্ব্বদাই রত ও নির্বৃত আপনার মহিমাই অমৃত রসের সাগর। এই সাগরের এক বিন্দুও যদি আস্বাদিত হয় তাহা হইলে মনের মধ্যে যে সুখ ক্ষরিত হইতে থাকে, তাহাতে এই সব সাধুরা শ্রুতিবিষয়ক যে সুখলেশের আভাস তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন। আপনার পাদপদ্মসেবার ফলে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না।

শ্রীভগবানের তত্ত্ব ও মহিমা-সম্বন্ধীয় এই সমুদয় কথা বলিয়া দেবগণ প্রার্থনা করিলেন—

অথো ঈশ জহি ত্বাষ্ট্রং গ্রসন্তং ভুবনত্রয়ং।
গ্রস্তানি যেন নঃ কৃষ্ণ তেজাংস্যস্ত্রায়ুধানি চ ॥১৪
হংসায় দহ্রনিলয়ায় নিরীক্ষকায় কৃষ্ণায় মৃষ্টযশসে নিরুপক্রমায়।
সৎসংগ্রহায় ভবপান্থ নিজাশ্রমাপ্তাবন্তে পরীষ্টগতয়ে হরয়ে নমস্তে ॥৪২

হে পরমেশ্বর, ত্বষ্টৃপুত্র বৃত্রাসুরকে শীঘ্র বধ করুন! ঐ ব্যক্তি ভুবনত্রয় গ্রাস করিয়াছে। আমাদের তেজঃ, অস্ত্র ও আয়ুধসমূহও ঐ ব্যক্তি গ্রাস করিয়াছে। আপনি হংস (শুদ্ধ),

আপনি হরি (আর্ত্তিহারী), আপনি দহ্রনিলয় (হৃদয়াকাশবাসী), আপনি নিরীক্ষক (বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী), আপনি কৃষ্ণ (সদানন্দরূপ), আপনি মৃষ্টযশা (আপনার গুণ ও লীলা পরম রুচিকর), আপনি নিরুপক্রম (আদিশূন্য), আপনি সৎসংগ্রহ (সাধুজনকর্ত্তৃক সর্ব্বদা সংগৃহীত, অন্বেষিত), সংসার পথের পান্থ আপনার শরণ লইয়া উত্তমা গতি লাভ করে।

দেবতাদের এই স্তুতি অনুভবাত্মক। প্রথম শ্লোকেই দেখা যাইতেছে, তাঁহারা কোন অনিশ্চিত বা অজ্ঞাত তত্ত্ব বা বস্তুকে স্মরণ করিয়া যে কতকগুলি প্রচলিত কথা বলিতেছেন, তাহা নহে। প্রথম শ্লোকটি (বায্যম্বর ইত্যাদি) পড়িলেই মনে হইবে, তাঁহারা যে ভগবান্‌কে খুঁজিতেছেন তাহা নহে। তাঁহারা ভগবান্‌কে পাইয়াছেন। ভগবান্ অনুমানমাত্র নহেন, তিনি আমাদের অধিকারে রহিয়াছেন, আর আমরা সকল সময়েই তাঁহার অধিকারে, পরম নিরাপদে, তাঁহার আশিস-সুধারসে অবগাহন করিয়া রহিয়াছি। তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবেই যেন ভগবান্‌কে দেখিতেছেন বা অনুভব করিতেছেন। বিদেশীভাষায় যাহাকে Immediate vision বলে, তাঁহারা তাহাই পাইয়াছেন। তাঁহারা পরমেশ্বরকে দেখিতেছেন, কিন্তু বিশ্ব হইতে দূরে নহে, বিশ্ব হইতে পৃথক্ করিয়া নহে, বিশ্ব বা অনন্ত বিশ্ববৈচিত্র্যকেও তাঁহারা এক পরম ঐক্যে চির সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থায় দেখিতেছেন। নিজেদের সেই পরম ঐক্যের অংশরূপে দেখিতেছেন; বিশ্বের সহিত, বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থের সহিত নিজেদের যেটি প্রকৃত সম্বন্ধ তাহাও দেখিতেছেন। এই যে অনুভব (feeling); কিসের অনুভব? বিশ্বজনীন পরম ঐক্যের (of universal connectedness)। ইহাই নারায়ণ বা সূত্রান্তর্য্যামী বিরাট। সূত্রে মণিগণ যেমন গাঁথা আছে, এই বিশ্বের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, চেতন ও অচেতন, নিকট ও দূর, স্থূল ও সূক্ষ্ম সমুদয় তাহাতেই গাঁথা আছে। সমগ্র মানবজাতি বা চেতন জীবের সহিত এবং সমগ্র বাহ্য-প্রকৃতির সহিত (with mankind and nature) আমরা প্রত্যেকেই বাঁধা হইয়া রহিয়াছি, কোন মধ্যস্থ বা ব্যবধান নাই, প্রত্যক্ষভাবেই বাঁধা হইয়া আছি। (There is no intermediate link. ইহাই অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন সত্যধর্ম্ম, ইহাই ভাগবতধর্ম্ম, ইহাকেই শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে "বেদ্যং বাস্তববস্তুঃ" বলা হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ যখন দেবতাদের সমক্ষে প্রকাশিত হইলেন, তখন দেবতারা তাঁহাকে

'কেবলানুভবস্বরূপ' বলিয়াছেন। এই 'কেবলানুভব' একটি নিষেধাত্মক পদ নহে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে।

ভগবান্ তুষ্ট হইয়া দেবতাদের বলিলেন, দধ্যঞ্চ ঋষির দেহ, বিদ্যা, ব্রত ও তপস্যার দ্বারা অতিশয় দৃঢ়। তাঁহার নিকট ভিক্ষা করিয়া সেই দেহ গ্রহণ কর। এই দধ্যঞ্চ ঋষিই অশ্বশিরঃ। অশ্বের মস্তক লইয়া অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন। ঐ দধ্যঞ্চ ঋষিই প্রথম নারায়ণ কবচ পাইয়াছিলেন। তিনি ইহা ত্বষ্টাকে দেন। ত্বষ্টার নিকট বিশ্বরূপ, আর বিশ্বরূপের নিকট ইহা ইন্দ্র পাইয়াছিলেন। দধ্যঞ্চ ঋষির অস্থির দ্বারা বজ্র হইবে, আর বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুর নিহত হইবে।

দেবগণ দধ্যঞ্চ ঋষির নিকট তাঁহার দেহ চাহিলে তিনি দেবতাদের সামান্য একটু পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

যো ধ্রুবেনাত্মনা নাথা ন ধর্ম্মং ন যশঃপুমান্।
ঈহেত ভূতদয়য়া স শোচ্যঃ স্থাবরৈরপি॥
এতাবানব্যয়ো ধর্ম্মঃ পুণ্যশ্লোকৈরুপাসিতঃ।
যো ভূতশোকহর্ষাভ্যামাত্মা শোচতি হৃষ্যতি॥
অহো দৈন্যমহো কষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ।
যন্নোপকুর্য্যাদস্বার্থৈর্মর্ত্ত্যঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ॥

দেবগণ, (নাথাঃ) এই দেহ অধ্রুব (অনিত্য)। ভূতদয়ার দ্বারা চালিত হইয়া যে ব্যক্তি এই অনিত্য দেহের দ্বারা ধর্ম্ম ও যশঃ উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা না করে, অচেতন বস্তু সমূহেরও সে ব্যক্তি শোচ্য। এই ধর্ম্মই অব্যয় ধর্ম্ম, পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিগণ এই ধর্ম্মই আচরণ করেন। প্রাণিসকলের শোক ও হর্ষকে নিজের শোক ও হর্ষ বলিয়া বুঝিয়া আকুল ও হৃষ্ট হইবে। কুকুর ও শৃগালাদির ভক্ষ্য, স্বার্থোপযোগশূন্য, ক্ষণভঙ্গুর, আমার ধন, আমার জ্ঞাতি এইরূপ ভ্রান্ত অভিমানযুক্ত এই দেহসমূহের দ্বারা পরোপকার না করা কি কষ্ট ও কি কৃপণতার কর্ম্ম।

দধ্যঞ্চ ঋষি যোগবলে দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার অস্থির দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা বজ্র নির্ম্মাণ করিলেন। তাহার পর দেবাসুরে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তুমুল ও ভীষণ যুদ্ধ।

আমাদের প্রয়োজন বৃত্রাসুরের চরিত্রের সহিত পরিচয়। এই চরিত্র কত মহৎ তাহা বৃত্রাসুরের কথা ও ব্যবহার হইতে জানিতে পারা যাইবে।

৩। বৃত্রের মহত্ত্ব

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর বৃত্রাসুরের দলের অসুরেরা পলায়ন করিতেছে, বৃত্র তাহাদের ডাকিয়া বলিতেছেন—

জাতস্য মৃত্যুর্ধ্রুব এব সর্ব্বতঃ প্রতিক্রিয়া যস্য ন চেহ ক্লিপ্তা।
লোকো যশশ্চাথ ততো যদি হ্যমুং কো নাম মৃত্যুং ন বৃণীত যুক্তং॥
দ্বৌ সম্মতাবিহ মৃত্যূ দুরাপৌ যদ্ ব্রহ্মসন্ধারণয়া জিতাসুঃ।
কলেবরং যোগরতো বিজহ্যাদ্যদগ্রণী বীরশয়েহনিবৃত্তঃ॥৬।১১-২৬,২৭

যে জন্মাইয়াছে তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত। মৃত্যুর গতি কিছুতেই রুদ্ধ হইবার নহে। সেই মৃত্যুর দ্বারা যদি ইহলোকে কীর্ত্তি আর পরলোকে স্বর্গ পাওয়া যায়, তাহা হইলে কে সেই মৃত্যুকে সমীচীন বলিয়া স্বীকার না করিবে? শাস্ত্রসম্মত মৃত্যু দুই প্রকার। ব্রহ্মধারণার দ্বারা দেহত্যাগ, আর রণভূমিতে অপরাঙ্মুখ হইয়া প্রাণত্যাগ।

অসুরেরা পলাইয়া যাইতেছে, আর দেবতারা সেই ভীত ও পলায়নপরায়ণ অসুরদিগের পশ্চাদ্দিকে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে। মহাবীর বৃত্রাসুর এজন্য দেবতাদিগকে ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া অনেক তিরস্কার করিলেন। বৃত্রাসুরের গদার দ্বারা আহত হইয়া ইন্দ্রের ঐরাবত একবার রক্তবমন করিতে করিতে ইন্দ্রকে পৃষ্ঠে লইয়া বহুদূরে পড়িয়া গেল। বৃত্রাসুর সে সময়ে ইন্দ্রকে বা ঐরাবতকে আর কোন অস্ত্রাঘাত করিলেন না। ইন্দ্র সুস্থ হইলেন, ঐরাবত সুস্থ হইল তখন আবার বৃত্র যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বৃত্রাসুর যে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহার কারণ তিনি ইন্দ্রকে বলিলেন। এই কারণ সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মসঙ্গত। বৃত্র বলিলেন—

যো নোঽগ্রজস্যাত্মবিদো দ্বিজাতের্গুরোরপাপস্য চ দীক্ষিতস্য।
বিস্রভ্য খড়্গেন শিরাংস্যবৃশ্চৎ পশোরিবাকরুণঃ স্বর্গকামঃ॥
শ্রী-হ্রী-দয়া-কীর্ত্তিভিরুজ্ঝিতং ত্বাং স্বকর্ম্মণা পুরুষাদৈশ্চ গর্হ্যং।
কৃচ্ছ্রেণ মচ্ছূলবিভিন্নদেহমস্পৃষ্টবহ্নিং সমদন্তি গৃধ্রাঃ॥

বিশ্বরূপ ছিলেন আমাদের অগ্রজ। তিনি ছিলেন আত্মবিদ্ ও সুব্রাহ্মণ। তিনি ছিলেন নিস্পাপ ও গুরু এবং দীক্ষিত হইয়া যাগ করিতেছিলেন। স্বর্গকামী যেমন নির্দ্দয়ভাবে পশুবধ করে, হে ইন্দ্র, তুমি সেই প্রকারে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়াছ। শ্রী, লজ্জা, দয়া এবং কীর্ত্তি তোমায় পরিত্যাগ করিয়াছে। তুমি তোমার কর্ম্মের জন্য রাক্ষসেরও নিন্দনীয় হইয়াছ। আমি এই শূলের দ্বারা তোমার হৃদয় বিদীর্ণ করিব, তোমার অপবিত্র দেহকে অগ্নিও স্পর্শ করিবে না, গৃধ্রগণ তাহা ভোজন করিবে।

বৃত্রাসুর পরম জ্ঞানী ছিলেন। তিনি সমস্তই জানিতেন। দেবতারা যে ভগবান শ্রীহরির কৃপালাভ করিয়াছে, দধ্যঞ্চ ঋষির অস্থির দ্বারা যে বজ্র নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং তাঁহার নিজের মৃত্যু যে অনিবার্য্য এ সকল কথা তাঁহার সুবিদিত ছিল। তথাপি তিনি বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিলেন। তিনি ইন্দ্রকে বলিলেন—

অহং সমাধায় মনো যথাহ নঃ সঙ্কর্ষণস্তচ্চরণারবিন্দে।
ত্বদ্বজ্ররংহো লুলিতগ্রাম্যপাশো গতিং মুনের্যাম্যপবিদ্ধলোকঃ॥

হে ইন্দ্র, তুমি আমার উপর তোমার বজ্র নিক্ষেপ কর। তাহাতে আমার পীড়া হইবে, ইহা ভাবিও না। আমার প্রভু সঙ্কর্ষণ আমাকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন আমি সেইরূপে তাঁহার পাদপদ্মে আমার চিত্ত সমাহিত করিব, আমার গ্রাম্যপাশ (বিষয়-ভোগ-লালসা) ছিন্ন হইয়া যাইবে। আমি দেহত্যাগ করিয়া যোগিগণের প্রাপ্য সদ্গতি লাভ করিব।

ধন্য এই বৃত্রাসুর! দেবরাজ ইন্দ্রের তাঁহার সহিত তুলনাই হয় না। তিনি কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় সত্য ও ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করিতেছেন। তিনি বিজয় চাহেন না। বিজয় যে পরাজয়। তিনি পরাজিত হইয়া বিজয়ী হইবেন, তিনি মরিয়া অমর হইবেন। বৃত্রাসুরের জীবনের আলো, তাঁহার জ্ঞান ও ভক্তি, ইন্দ্রের হৃদয় আলোকিত করিবে এবং ত্রিলোকের প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

পুংসাং কিলৈকান্তধিয়াং স্বকানাং যাঃ সম্পদো দিবি ভূমৌ রসায়াং।
নরাতি যদ্দ্বেষ উদ্বেগ আধির্মদঃ কলির্ব্যসনং সংপ্রয়াসঃ॥

হে ইন্দ্র, আমি সঙ্কর্ষণের দাস। তিনি আমাকে স্বর্গাদি সম্পত্তি দান করিবেন, এরূপ মনে করিও না। স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালে যে সব সম্পত্তি আছে, সঙ্কর্ষণদেব তাঁহার ভৃত্যগণকে

তাহা দেন না। এই সব সম্পত্তি হইতে দ্বেষ, উদ্বেগ, মনঃপীড়া, মোহ, কলহ ও ব্যসন জন্মিয়া থাকে।

ত্রৈবর্গিকায়াস বিঘাতমস্মৎ পতির্বিধত্তে পুরুষস্য শক্র।
ততোঽনুমেয়োভগবৎপ্রসাদো যো দুর্ল্লভোঽকিঞ্চন গোচরোঽন্যৈঃ॥

হে ইন্দ্র, আমাদের প্রভু, ধর্ম্ম অর্থ কাম, এই ত্রিবর্গের জন্য জীবের যে কামনা, সেই কামনা দূরীভূত করেন। কামনার শান্তি দ্বারাই ভগবানের প্রসন্নতা বুঝিতে পারা যায়। ভগবানের ঐ প্রসাদ কেবলমাত্র অকিঞ্চন ব্যক্তিগণই লাভ করেন। যাহাদের ঐশ্বর্য্য বা সম্পদ্ আছে, তাহাদের পক্ষে উহা দুর্ল্লভ।

ইন্দ্রকে এই সব কথা বলিয়া বৃত্রাসুর ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

অহং হরে তব পাদৈকমূল দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।
মনঃ স্মরতাসুপতের্গুণানাং গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ॥
ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবম্বা সমঞ্জসত্বা বিরহয্য কাঙ্খে॥
অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাং॥
মমোত্তমঃশ্লোকজনেষু সখ্যং সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
ত্বন্মায়য়াত্মাত্মজদারগেহেষ্বাসক্ত চিত্তস্য ন নাথ ভূয়াৎ॥

হে ভগবন্, আপনার পাদপদ্ম যাহাদের একমাত্র আশ্রয়, আপনার সেই সকল দাসদিগের আমি অনুদাস হইয়া এখনও আছি এবং ভবিষ্যতে চিরদিনই সেইভাবেই থাকিব। আপনি আমার প্রাণ সকলের পতি, আমার মন সর্ব্বদা আপনার গুণসমূহ স্মরণ করুক, আমার বাক্য সর্ব্বদাই আপনার গুণসমূহ কীর্ত্তন করুক, আমার দেহ সর্ব্বদা আপনার কর্ম্ম করুক।

হে সমঞ্জস, নিখিলসৌভাগ্যনিধে, আপনি ব্যতীত আমার আর কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা নাই। স্বর্গ বা ধ্রুবলোক, ব্রহ্মলোক, সার্ব্বভৌমপদ, রসাতলের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি বা মুক্তি, আমি কিছুই চাহিনা। অজাতপক্ষ পক্ষীশাবক ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া যেরূপ

কাতরভাবে তাহার মাতার আগমনের প্রতীক্ষা করে, রজ্জুবদ্ধ বৎসগণ ক্ষুধিত হইয়া যেমন স্তন্যের প্রতীক্ষা করে, প্রেয়সী যেমন বিষণ্ণ ও কাতর হইয়া প্রবাসী প্রিয়ের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করে, হে পদ্মলোচন, আমার মনও সেইরূপ তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। আমার কর্ম্মসমূহের দ্বারা তাড়িত হইয়া আমি সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতেছি, হে উত্তমঃশ্লোক, আপনার ভক্তগণের সহিত আমার সখ্য হউক। আপনার মায়ায় ভ্রান্ত হওয়ায় দেহে পুত্রে পত্নীতে ও গৃহে আমার চিত্ত আসক্ত হইয়া রহিয়াছে, রক্ষা করুন, আর যেন আসক্ত না হয়।

ইহাই বৃত্রাসুরের অন্তিম প্রার্থনা। অতঃপর বৃত্রাসুর ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হইলেন।

এই বৃত্র অসুর! তোমরা যুগ যুগ ধরিয়া দল বাঁধিয়া তাহার নিন্দা কর, তাহাকে ঘৃণা কর। আর ঐ ইন্দ্র দেবতা, দেবতার রাজা, তোমরা যুগ যুগ ধরিয়া দল বাঁধিয়া তাহার পূজা কর, তাহার বন্দনা কর, তাহার চরণতলে বিলুণ্ঠিত হও। তোমরা কি ভগবানের দোহাই দিয়া বলিতে চাও, ভগবান যখন ইন্দ্রকে বা দেবতাকে বিজয়ী করিয়াছেন, দেবতাদের দ্বারা বৃত্রের পরাজয় ও ধ্বংস ঘটাইয়াছেন, তখন আমরা কেন ইন্দ্রের পূজা করিব না, কেন বৃত্রের নিন্দা করিব না? বেশ বাবা, তোমাদের জয় হউক। তোমরা দেখিতেছি, ভগবান্‌কে খুব ভাল করিয়াই চিনিয়াছ! তাই তো তোমাদের এত উন্নতি, চারিদিকে জয় জয়কার, ইহকাল পরকাল একেবারে পরিস্কার ঝরঝরে। খুব চিনিয়াছ ভগবান্‌কে।

কৌতুকী ভগবান্, চিরকৌতুকী ভগবান্। তাঁহাকে চেনা কি এতই সহজ! ভগবান্ মানুষকে ঠকাইতেছেন, ঠকাইয়া ঠকাইয়া শিখাইতেছেন। তিনি যে মোটেই ব্যস্ত নহেন। তোমরা যেমন, তোমাদের ভগবান্‌ও ঠিক্ তেমন। তিনি তোমাদের কর্ম্মফলের সমষ্টি। তোমাদের কর্ম্ম তোমাদের অন্ধ করিয়া যতদিন রাখিবে তোমরা ততদিন ইন্দ্রেরই পূজা করিবে, নগদ বিদায় পাইবে, হাতে হাতে স্বর্গফল পাইবে। বৃত্র যে কিছুই চাহে না, সে চাহে অকিঞ্চন হইতে, সে চাহে দাসানুদাস হইতে, সে চাহে মরিতে,—মরার মতো মরিতে, সে চাহে পরাজিত হইতে। তোমরা চাও বাঁচিতে, জয়ী হইতে, রাজা হইতে, স্বর্গসুখ পাইতে। কি বলিতেছ, বৃত্র বীর, বৃত্র ন্যায়, বৃত্র সত্য, বৃত্র ত্যাগ! তোমরা কি বীর হইতে চাও, তোমরা কি ন্যায় সত্য ও ত্যাগ চাও। বীরত্ব যদি মৃত্যুতে লইয়া যায়, ন্যায় যদি দারিদ্র্যে লইয়া যায়, সত্য ও ত্যাগ যদি ইহলোকে পরা-

জয়ে লইয়া যায় ? বুকে হাত দিয়া বল, পারিবে কি বীর হইতে ? দোহাই, উর্দ্ধে ভগবান, অন্তরে ভগবান্, সত্য করিয়া বল, বুকে হাত দিয়া বল, ন্যায় সত্য ও ত্যাগের পূজা করিতে পারিবে কি ? তবে তোমরা ইন্দ্রেরই পূজা কর, পার্থিব ঐশ্বর্য্যের ও পার্থিব বিজয়ের পূজা কর, আর ভণ্ডামি করিয়া বল, আমাদের ধর্ম্ম ভগবত ধর্ম্ম।

অন্য কেহ বৃত্রাসুরকে বুঝিতে না পারুক, ইন্দ্র তাঁহাকে বুঝিয়াছিলেন ও চিনিয়াছিলেন। ইন্দ্র যেমন বৃত্রকে বুঝিলেন, অমনি ইন্দ্রের জয় হইল, বৃত্রেরও ইহলীলা শেষ হইল। শেষ কথা, যাহা ইন্দ্র বৃত্রকে বলিলেন, তাহা এই—

অহো দানব সিদ্ধোঽসি যস্য তে মতিরীদৃশী।
ভক্তঃ সর্ব্বাত্মনাত্মানং সুহৃদং জগদীশ্বরং॥
ভবানতার্ষীন্মায়াং বৈ বৈষ্ণবীং জনমোহিনীং।
যদ্বিহায়াসুরং ভাবং মহাপুরুষতাঙ্গতঃ।
খল্বিদং মহদাশ্চর্য্যং যদ্রজঃ প্রকৃতেস্তব।
বাসুদেবে ভগবতি সত্ত্বাত্মনি দৃঢ়া মতিঃ॥
যস্য ভক্তির্ভগবতি হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে।
বিক্রীড়িতোমৃতাম্ভোধৌ কিং ক্ষুদ্রৈঃ খাতকোদকৈঃ॥

হে দানব, তোমার যখন এরূপ মতি হইয়াছে, তখন তুমি সিদ্ধ হইয়াছ। তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে সকলের আত্মা ও সুহৃদ্ জগদীশ্বরের সেবা করিয়াছ। যে বৈষ্ণবী মায়া সকলকে মুগ্ধ করে, তুমি সেই মায়া অতিক্রম করিয়াছ। তুমি আসুরিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া মহাপুরুষ হইয়াছ। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, তোমার প্রকৃতি রজোগুণপ্রধান, অথচ তোমার সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ বাসুদেবে দৃঢ়া মতি হইয়াছে। নিঃশ্রেয়সের ঈশ্বর ভগবান্ হরিতে তোমার ভক্তি হইয়াছে, তুমি অমৃতসাগরে ক্রীড়া করিতেছ, ক্ষুদ্র গর্ত্তাদির জলের ন্যায় স্বর্গসুখে আর তোমার কি হইবে ?

বৃত্রাসুর নিহত হইলে তাঁহার দেহ হইতে একটি জ্যোতিঃ বাহির হইল, আর সেই জ্যোতি সঙ্কর্ষণদেবে মিলিত হইল। দেবতারা ইহা দেখিলেন।

৪। বৃত্রাসুরের পূর্ব্বকথা—চিত্রকেতু

অভিজ্ঞতার দ্বারাই মানুষ প্রস্তুত হয়। এই মানুষই দেবতা, মানুষই অসুর, আবার মানুষই ভগবান্। বৃত্রাসুর প্রস্তুত হইল কিরূপে? সে জীবনই বা কি, সে অভিজ্ঞতাই বা কি, সে সংগ্রামই বা কি, যাহার দ্বারা বৃত্রাসুরের ন্যায় একটা অদ্ভুতরকমের মহৎ জীব গড়িয়া উঠিতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবত ইহার উত্তর দিয়াছেন।

শূরসেন দেশে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম চিত্রকেতু। রাজার অনেকগুলি রাণী, কিন্তু রাজা অপুত্রক। একদিন মহর্ষি অঙ্গিরা আসিলেন, তিনি বর দিলেন আর চরু প্রস্তুত করিয়া দিলেন। সেই চরু খাইয়া মহর্ষির বরে প্রধানা মহিষী কৃতদ্যুতির এক পুত্র হইল। মহর্ষি অঙ্গিরা রাজা চিত্রকেতুকে বর দেওয়ার সময় বলিয়াছিলেন, তোমার পুত্র হইবে, কিন্তু সেই পুত্রের দ্বারা যেমন সুখ পাইবে, তেমনি দুঃখও পাইবে।

এক রাণীর পুত্র হইল, অন্য রাণীর হিংসা হইল। আর অন্য রাণীরা বিষ খাওয়াইয়া একদিন ছেলেটিকে মারিয়া ফেলিল। রাজারাণীর শোকের সীমা নাই। একমাত্র পুত্র, বড় সাধনার ধন, বড় আদরের ধন, হঠাৎ মরিয়া গেল, কেমন করিয়া যে মরিল তাহাও বোঝা গেল না। রাজারাণীর শোকের সীমা নাই।

হঠাৎ দেবর্ষি নারদ আর মহর্ষি অঙ্গিরা আসিয়া উপস্থিত। এই সব সিদ্ধ মহর্ষিদের কাজ মানুষ প্রস্তুত করা। তাঁহাদের একটা একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য আর কি, এক এক রকমের মানুষ গড়িয়া তোলা। তাঁহারা সময় খোঁজেন; পাত্র খোঁজেন, ত্রিলোকের সর্ব্বত্রই তাঁহাদের দৃষ্টি, সর্ব্বত্রই তাঁহাদের গতি। অঙ্গিরা আসিয়া পুত্র দিয়াছিলেন, আবার পুত্র হারাইয়া চিত্রকেতু যখন শোকে বিহ্বল, তখন সেই অঙ্গিরাই আসিলেন, নারদকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। একটা কিছু সুগভীর উদ্দেশ্য যে এই সব সিদ্ধ ঋষিদের মনের ভিতর ছিল, তাহা তো বুঝিতেই পারা যাইতেছে। নারদও ব্রহ্মার পুত্র, অঙ্গিরাও ব্রহ্মার পুত্র। চিত্রকেতু অঙ্গিরাকে চিনিতে পারেন নাই। তাঁহাকে একবার দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। আর এখন রাজা শোকে বিহ্বল। কাজেই চিনিতে পারেন নাই। চিনিতে না পারিলেও সম্মান করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, কারণ তাঁহারা যে ঋষি তাহা তো মূর্ত্তি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। এইবার

৫। শোকোপনোদন

চিত্রকেতুর শোকোপনোদন শ্রীমদ্ভাগবতের একটি খুব ভাল জিনিস। আর ভাগবতের কোন্ জিনিসটিই বা খুব ভাল নহে। আমরা যেটি বুঝি না, সেইটিই ভাল লাগে না, আর যেটি ভক্তি করিয়া ধীরে ধীরে ভাবিয়া ভাবিয়া পড়ি না, সেইটিই বুঝি না, বুঝিতে পারি না। আমি বুঝিব বলিয়া অহঙ্কার করিয়া বুঝিতে চাই, তাই বুঝিতে পারি না। 'তুমি বুঝাইয়া দাও' 'দয়া করিয়া বুঝাইয়া দাও' এই বলিয়া নতশিরে শরণাগত হইলে, আজ হউক, কাল হউক, দশদিন বা দশবৎসর পরে হউক, বুঝিতে পারা যায়। এই শ্রীমদ্ভাগবত যে শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ, বিশ্বগুরু শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে গ্রন্থমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই কলিযুগে আবির্ভূত হইয়া সনাতন ধর্ম্ম ও যুগধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন! এই শ্রীগ্রন্থই শ্রীমদ্ভাগবত। কিন্তু ইহাতে বিশ্বাস করিবে কে? মানুষ যে জড়বাদী হইয়াছে, সংশয়ী হইয়াছে, প্রত্যক্ষবাদী হইয়াছে, 'শ্রীগ্রন্থ' যে বই হইয়া গিয়াছে। হউক, ভগবানের ইচ্ছা, কলির প্রভাব,—ভয় নাই। সংশয় এবং অবিশ্বাসেরও প্রয়োজন আছে, উপকারিতা আছে। ভালই হইবে, সংশয়ের পর বিশ্বাস যখন আসিবে, খুব ভাল করিয়া আসিবে, বেশী উজ্জ্বল ও দৃঢ় হইয়া আসিবে। এখন শোকোপনোদনের কথা।

প্রথমেই মহর্ষি অঙ্গিরা সাতটি শ্লোকে উপদেশ দিলেন।

> কোঽয়ং স্যাত্তব রাজেন্দ্র ভবান্ যমনুশোচতি।
> ত্বঞ্চাস্য কতমঃ সৃষ্টৌ পুরেদানীমতঃপরং ॥৬।১৫-২
> যথা প্রযান্তি সংযান্তি স্রোতোবেগেন বালুকাঃ।
> সংযুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তথা কালেন দেহিনঃ ॥৩
> যথা ধানাসু বৈ ধানা ভবন্তি ন ভবন্তি চ।
> এবং ভূতানি ভূতেষু চোদিতানীশমায়য়া ॥৪
> বয়ঞ্চ ত্বঞ্চ যে চেমে তুল্য কালাশ্চরাচরাঃ।
> জন্মমৃত্যোর্যথা পশ্চাৎ প্রাঙ্নৈবমধুনাপি ভোঃ ॥৫
> ভূতৈর্ভূতানি ভূতেশঃ সৃজত্যবতি হন্তি চ;
> আত্মসৃষ্টৈরস্বতন্ত্রৈরনপেক্ষোঽপি বালবৎ ॥

দেহেন দেহিনো রাজন্ দেহাদ্দেহোঽভিজায়তে।
বীজাদেব যথা বীজং দেহ্যর্থ ইব শাশ্বতঃ ॥
দেহদেহি বিভাগোঽয়মবিবেককৃতঃ পুরা।
জাতি ব্যক্তি বিভাগোঽয়ং যথা বস্তুনি কল্পিতঃ ॥

মহারাজ, আপনি যাহার জন্য শোক করিতেছেন, সে আপনার কে? পুত্র। আপনি তাহার কে? পিতা। পূর্ব্বে আপনাদের কি সম্পর্ক ছিল? এখনই বা কি সম্পর্ক? ইহার পরেই বা কি সম্পর্ক হইবে? ২। বালুকা সমুহ যেমন জলের স্রোতের বেগে একবার এদিকে একবার ওদিকে যায়, কালের দ্বারা দেহধারী জীবসমূহও সেইরূপ সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকে। ৩। বাজের মধ্যে অন্য বীজ জন্মায়, কিন্তু সব সময়ে জন্মায় না, অনেক সময়ে জন্মাইয়া মরিয়া যায়, তেমনি একটি ভূত হইতে অপর ভূত কখন জন্মায়, কখন জন্মায় না, কখন বা জন্মিয়া মরিয়া যায়। ইহাই প্রকৃতির বিধান। জন্যজনকত্ব-সম্বন্ধ এই প্রকারের ব্যাপার, পিতৃত্ব পুত্বাদি সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া এজন্য শোক করা কেন? ৪। আমরা, তুমি আর এই চরাচর জগৎ, যাহা একসঙ্গে একই সময়ে রহিয়াছে, তাহা তো পূর্ব্বে, জন্মের পূর্ব্বে, এ অবস্থায় ছিল না। আবার মৃত্যুর পরেও এ অবস্থায় থাকিবে না। এখন এই বর্ত্তমানেই বা কি অবস্থায় আছে? ইহাদের আদি এবং অন্ত, যখন অসৎ, তখন ইহা স্বপ্নবৎ। ৫। সকলই যদি অসৎ, তাহা হইলে এই প্রতীতিই বা কেন, এই অভিমানই বা কেন? উত্তর,—যিনি ভূতেশ, ভূতসমূহের ঈশ্বর, তিনি স্বয়ং অনপেক্ষ থাকিয়া বালকের ন্যায় লীলায় আত্মসৃষ্ট ও অস্বতন্ত্র ভূতসমূহের দ্বারাই ভূতসমূহকে সৃষ্টি করিয়া পালন করিয়া আবার ধ্বংশ করিতেছেন। ৬। জন্মাদি ব্যবহার দেহসমূহের। ইহা অনাত্ম, অতএব আত্মার নহে। বীজ হইতে যেমন বীজ হয়, সেইরূপ দেহের দ্বারা দেহীর দেহ এবং দেহ হইতে দেহের উৎপত্তি হয়। কিন্তু দেহী যিনি তিনি শাশ্বত, নিত্য। ৭। জাতি বা সামান্য, আর ব্যক্তি বা বিশেষ, ইহাদের মধ্যে একটা প্রভেদের বোধ বা প্রতীতি যেমন অনাদি কাল হইতেই অবিবেক-কৃত, দেহও দেহীর বিভাগও সেইরূপ।

মহর্ষি অঙ্গিরার এই উপদেশ অতিশয় গভীরার্থপূর্ণ। ইহাতে চিন্তা করিবার বা বিশ্বব্যবস্থার রহস্য বুঝিবার একটি প্রণালী রহিয়াছে। আমাদিগকে সেই চিন্তাপ্রণালীতে

অভ্যস্ত হইতে হইবে। সেই চিন্তাপ্রণালীতে অভ্যস্ত হইলে মানুষ বিবেক ও বৈরাগ্য এবং তাহাদের ফলস্বরূপ শমদম আদি সদ্গুণ লাভ করিবে। ইহার প্রথম কথা, আমাদিগকে দ্রষ্টারূপে প্রকৃতির খেলার আদ্যোপান্ত দেখিতে হইবে ও বুঝিতে হইবে। বীজ হইতে বীজের জন্ম, দেহের দ্বারা ও দেহ হইতে দেহের জন্ম, বিশ্ব জুড়িয়াই চলিতেছে। উদ্ভিদ্ জগতে, পশুজগতে, মানবজগতে একই ব্যবস্থা। জন্ম স্থিতি লয়, সর্ব্বত্রই একরূপ। এই এক বিরাট্ খেলা। আমরা মানুষেরা এই বিধির মধ্যে এই খেলার মধ্যে একটা কল্পিত অভিমান জুড়িয়া দিয়াছি। 'আমার পুত্র' 'আমার দেহ' ইত্যাদি অভিমান হইতেই শোক মোহ প্রভৃতি হইয়া থাকে।

অঙ্গিরার উপদেশে চিত্রকেতুর উপকার হইল। চিত্রকেতু তাঁহাদের দুইজনের পরিচয় জানিতে চাহিলেন। অঙ্গিরা নারদের পরিচয় দিলেন, নিজেরও পরিচয় দিলেন। নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন, মহারাজ, আমি আর একবার তোমার নিকট আসিয়াছিলাম। আমি সেই সময়েই তোমাকে জ্ঞান দিতাম, কিন্তু তখন তোমার সময় হয় নাই, তোমার অন্য বিষয়ে অভিনিবেশ ছিল। কাজেই তোমার কাতর প্রার্থনায় আমি তোমাকে পুত্র দিয়াছিলাম।

জ্ঞাত্বান্যাভিনিবেশং তে পুত্রমেব দদামাহম্।

অঙ্গিরার এই কথার অর্থ কি? শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের একটি কথা না জানিলে, অঙ্গিরার এই কথার অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে না। দক্ষ প্রজাপতির পুত্রগণ পিতার কথায় পিতার সৃষ্টির যাহাতে বৃদ্ধি হয় ও রক্ষা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে যাইতেছিলেন। দেবর্ষি নারদ তাহাদের মাথায় অন্যরূপ চিন্তা জাগাইয়া দিয়া তাহাদের প্রবৃত্তিমার্গ হইতে অপসারিত করিয়া বৈরাগ্যপন্থী করিলেন। দুইবার নারদ এই কার্য্য করিলেন। প্রজাপতি দক্ষ নারদকে শাপ দিলেন। শাপ দেওয়ার সময় অনেক কথাই দক্ষ বলিয়াছিলেন। দক্ষের সেই সব কথার ভিতর একটি কথা স্মরণীয়।

নানুভূয় ন জানাতি পুমান্ বিষয়তীক্ষ্ণতাং।
নির্ব্বিদ্যতে স্বয়ং তস্মান্নতথা ভিন্নধীঃ পরৈঃ॥ ৬।৫।৩৯

বিষয়ে একটা তীক্ষ্ণতা বা দুঃখক্লেশ আছে। মানুষ ইহা বুঝিবে কি করিয়া? অনুভবের দ্বারা মানুষকে ইহা বুঝিতে হইবে। বিষয় অনুভব করিয়া তাহার তীক্ষ্ণতা বুঝিলে

মানুষের আপনা হইতেই নির্ব্বেদ বা বৈরাগ্য জন্মাইবে। পরের কথায় বুদ্ধির পরিবর্ত্তন হইলে সে নির্ব্বেদ হয় না।

দক্ষ-সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন, দক্ষের এই কথাটি খুব সত্য। নারদ বড় চঞ্চল, অসহিষ্ণু, ব্যস্তবাগীশ, তাড়াতাড়ি সব কাজ করিতে চাহেন। দক্ষের অভিশাপের পর নারদ, ব্রহ্মার আর এক পুত্র অঙ্গিরাকে হস্তগত করিলেন, নিজের মতাবলম্বী করিলেন। অঙ্গিরাকে দলভুক্ত করিয়া নারদ মানুষ খুঁজিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, মহারাজা চিত্রকেতু একজন উপযুক্ত ব্যক্তি, চিত্রকেতুর দ্বারা তাঁহার কাজের সুবিধা হইবে। নারদ নিজে চিত্রকেতুর নিকট গেলেন না, অঙ্গিরাকে পাঠাইলেন। অঙ্গিরা দেখিলেন চিত্রকেতুর এখনও ঠিক্ সময় হয় নাই, কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। আরও কিছু বিষয়ভোগ দরকার, বিষয়ের তীক্ষ্ণতা আরও একটু ভাল করিয়া অনুভব করা উচিত। তাই অঙ্গিরার কৃপায় চিত্রকেতুর পুত্র হইল, পুত্রের মৃত্যু হইল, চিত্রকেতু পুত্রশোকে অভিভূত হইলেন। সুসময় উপস্থিত। নারদকে সঙ্গে লইয়া অঙ্গিরা আসিলেন।

মহর্ষি অঙ্গিরা চিত্রকেতুকে তত্ত্বকথা শুনাইলেন, দেবর্ষি নারদ আরও অগ্রসর হইলেন। নারদ চিত্রকেতুর মৃতপুত্রকে আনাইলেন এবং সেই মৃতপুত্রের মুখ দিয়া এই ইহকাল পরকালের বা জীবনমরণের রহস্য কথা চিত্রকেতুকে এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে শুনাইলেন।

তাহার পর দেবর্ষি নারদ চিত্রকেতুকে একটি বিদ্যা দিলেন। এক সপ্তাহকাল এই বিদ্যাধারণার ফলে চিত্রকেতু অপ্রতিহত বিদ্যাধরাধিপত্য লাভ করিলেন। তাহার পর চিত্রকেতু শেষ বা ভগবান্ সঙ্কর্ষণদেবের দর্শন লাভ করিলেন।

৬। চিত্রকেতুর বৃত্রত্ব-প্রাপ্তি

সিদ্ধচারণগণ-পরিবৃত হইয়া ভগবান্ গিরিশ মুনিগণের সভামধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন। ভগবতী ভবানী তাঁহার ক্রোড়দেশে রহিয়াছেন। ভগবান্ গিরিশ ভগবতীকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া চিত্রকেতু বড়ই বিরক্ত হইলেন। তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া স্পষ্টই সেই সভায় বলিলেন—

এষ লোকগুরুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মং বক্তা শরীরিণাং।
আস্তে মুখ্যসভায়াং বৈ মিথুনীভূয় ভার্য্যয়া॥
জটাধরস্তীব্রতপা ব্রহ্মবাদী সভাপতিঃ।
অঙ্কীকৃত্য স্ত্রিয়ন্তাস্তে গতহ্রীঃ প্রাকৃতো যথা॥
প্রায়শঃ প্রাকৃতাশ্চাপি স্ত্রিয়াং রহসি বিভ্রতি।
অয়ং মহাব্রতধরো বিভর্ত্তি সদসি স্ত্রিয়ং॥

ইনি লোকগুরু, সাক্ষাৎ ধর্ম্মবক্তা, শরীরিদিগের মধ্যে প্রধান! কি আশ্চর্য্য, ইনি সভার মধ্যে, স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন! ইনি জটাধর, তীব্রতপা, ব্রহ্মবাদী ও ও সভাপতি, অর্থচ নিতান্ত প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় নির্লজ্জভাবে স্ত্রীকে ক্রোড়ে করিয়া রহিয়াছেন। যাহারা প্রাকৃত ব্যক্তি তাহারাও স্ত্রীর সহিত নির্জ্জনে সম্ভাষণ করে, আর ইনি মহাব্রতধর হইয়া সভার মধ্যে স্ত্রীকে ক্রোড়ে করিয়া রহিয়াছেন।

চিত্রকেতুকে কেহই মন্দ লোক বলিবে না। চিত্রকেতুর দোষ এই, সে যাহা মন্দ বলিয়া বুঝিবে, স্পষ্টভাবে সকলেরই সম্মুখে তাহাকে মন্দ বলিবে। অনেক ভাল লোক সেই মন্দকে মন্দ মনে করে না, ভালই মনে করে এবং ভাল মনে করিয়া তাহার সম্মান করে। অনেক কাল হইতে ইহা চলিয়া আসিতেছে, এতদিন কেহ তাহার নিন্দা করে নাই, সকলেই তাহা মানিয়া লইয়াছে, সকলেই তাহার প্রশংসা করিয়াছে। অতএব, তোমার চোখে যদি তাহা গর্হিত বা নিন্দিত বলিয়াই প্রতীত হয়, তাহা হইলেও তাড়াতাড়ি প্রকাশ্যভাবে তাহার নিন্দা করিও না। তোমার বুদ্ধি, তোমার বিবেচনা যাবতীয় ব্যাপারের বিচারণার একমাত্র মাপকাঠি নহে। অতএব, তাড়াতাড়ি যাহা হউক একটা মন্তব্য প্রকাশ্যভাবে ও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিও না। নিজের বিবেচনার উপর অতটা নির্ভর করিও না। দশজনে কি বলে তাহা ধীরভাবে শোনো। ধীরভাবে শুনিয়া তাহার পর প্রয়োজন হইলে যাহা হয় বলিও। বিনা প্রয়োজনে, কেবলমাত্র নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া দীর্ঘকাল বহু বহু ভাল লোকে যাহা মানিয়া লইয়াছে, যাহার সম্মান করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিও না। বিরুদ্ধভাব মনে আসিলেও মনের কথা মনেই চাপিয়া রাখো। ইহাই সংসারের সুবুদ্ধি জনের পরামর্শ। এই পরামর্শ অনুসারে যাহারা চলে তাহারাই গুণাশ্রিত ধর্ম্মের উপাসক, তাহারা ইহকালে

ও পরকালে সুখ ভোগ করে, তাহাদের জীবন বেশ নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ। চিত্রকেতু তাহা পারে না। নারদের উপদেশ আর সঙ্কর্ষণদেবের কৃপা, এই দুইটি কারণে চিত্রকেতুর প্রকৃতি হইয়াছে অন্যরূপ। চিত্রকেতু সভার মধ্যেই ভগবান্ গিরিশের আচরণের প্রতিবাদ করিলেন ও নিন্দা করিলেন।

চিত্রকেতু মানুষটি কেমন, আর একটু ভাবিয়া দেখা যাউক। সংসারে একরকম লোক আছে, তাহাদের আমরা ভাল লোক বলি, ধার্ম্মিক লোকও বলি। কিন্তু, তাহারা ভাল কেন? ভয়ে ভাল, প্রচলিতের সহিত তাল মিলাইয়া চলিয়া লাভবান্ হইবার জন্য ভাল। Virtuous or good out of conformity or fear. সত্যদর্শী ঋষিরা অনেকে বলেন, এই প্রকারের ভাল মানুষ ধার্ম্মিক হওয়া অপেক্ষা, লোকে যাহাকে দুষ্ট বা দুর্দ্দান্ত বলে, তাহাই হওয়া ভাল। মানুষের নিজস্ব একটা শক্তি আছে, নিজস্ব একটা অধিকার বা দাবী আছে। কিন্তু, মানুষ সেই আত্মশক্তির সাধনা করে না, দুর্ব্বল কৃপাজীবি অপরের পদলেহন করিয়া অন্যের বলে বলীয়ান হইয়া দশজনের মধ্যে একজন হইয়া বড় হইতে চায়, উঁচু হইতে চায়। চিত্রকেতু তাহার বিরোধী। শক্তিহীন অনধিকারী বা নিম্নাধিকারী ভক্তির কথা শুনিয়া বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে চায়। নিজের হৃদয় ও অনুভবের সহিত পদে পদে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আত্মবঞ্চনা করে। চিত্রকেতু তাহার বিপরীত। চিত্রকেতুকে যদি কেহ 'অসৎ' বলেন, তাহা হইলে তাহার দলের লোকেরা বলিবে, অসৎ বলিয়া কিছু নাই—There is no evil.

ভগবান্ গিরিশ অগাধবুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি হাস্য করিলেন। তিনি মনে করিলেন এই ব্যক্তি আমাকে সদাচারে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে! ভগবান্ গিরিশ কিছুই বলিলেন না বা কিছুই করিলেন না, কাজেই সভাস্থ ব্যক্তিগণও কিছু বলিলেন না। দেবী ভগবতী এই ধৃষ্ট চিত্রকেতুর অসদ্ব্যবহার সহ্য করিলেন না, তিনি অভিশাপ দিলেন। প্রকৃত কথা চিত্রকেতুর অভিমান হইয়াছিল, আমি জিতেন্দ্রিয়, আর চিত্রকেতু বহু সমৃদ্ধিও লাভ করিয়াছিলেন, এই কারণে দেবী তাহার কল্যাণের জন্যই তাহাকে ক্ষমা করিলেন না, তাহাকে অভিশাপ দিলেন। দেবীর অভিশাপে চিত্রকেতু বৃত্রাসুর হইলেন।

চিত্রকেতুর চরিত্রের বিশেষত্ব বা মহত্ব এই। অভিশপ্ত হইয়া তিনি একেবারেই বিচলিত হইলেন না, প্রসন্নচিত্তে অভিশাপ গ্রহণ করিলেন। চিত্রকেতু বলিলেন, দেবতা-

দের অভিশাপ জীবের পূর্ব্বাচরিত কর্ম্মেরই ফলমাত্র, সুতরাং তাহা অবশ্যম্ভাবী, কিছুতেই তাহার অন্যথা হয় না। সেই অভিশাপ স্বীকার করিলেই জীবের উপকার হয়। যিনি অভিশাপ দিলেন, তাঁহারও দোষ নেই, যিনি অভিশপ্ত হইলেন তাঁহারও দোষ নাই। সর্ব্বশেষে চিত্রকেতু সসম্মানে দেবী ভগবতীকে বলিলেন, আপনি আমার উপর অকারণ কুপিত হইলেন, আমি কোন অন্যায় কার্য্য করি নাই, কোন অন্যায় কথা বলি নাই।

চিত্রকেতু এই অভিশাপ যেভাবে গ্রহণ করিলেন, এবং অভিশপ্ত হইয়া যাহা বলিলেন, তাহাতে গৌরী গিরিশ বিস্মিত হইলেন। গিরিশ বলিলেন—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥
দেহিনাং দেহসংযোগাদ্দ্বন্দ্বানীশ্বরলীলয়া।
সুখং দুঃখং মৃতির্জন্ম শাপোঽনুগ্রহ এব চ॥
অবিবেককৃতঃ পুংসো হ্যর্থভেদ ইবাত্মনি।
গুণদোষবিকল্পশ্চ ভিদেব স্রজিবৎ কৃতঃ॥
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিমুদ্বহতাং নৃনাং।
জ্ঞানবৈরাগ্যবীর্য্যানাং ন হি কশ্চিদ্ব্যপাশ্রয়ঃ॥
নাহং বিরিঞ্চো ন কুমারনারদো ন ব্রহ্মপুত্রা মুনয়ঃ সুরেশাঃ।
বিদাম যস্যেহিতমংশকাংশকা ন তৎস্বরূপং পৃথগীশমানিনঃ॥
ন হ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ঃ স্বপরোঽপি বা।
আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতপ্রিয়ো হরিঃ॥
তস্য চায়ং মহাভাগশ্চিত্রকেতু প্রিয়োঽনুগঃ।
সর্ব্বত্র সমদৃক শান্তো হ্যহঞ্চৈবাচ্যুতপ্রিয়ঃ॥
তস্মান্ন বিস্ময়ঃ কার্য্যঃ পুরুষেষু মহাত্মসু।
মহাপুরুষ ভক্তেষু শান্তেষু সমদর্শিষু॥

যাঁহারা নারায়ণ-পরায়ণ, তাঁহাদের ভয় নাই, তাঁহারা কিছুতেই ভয় পান না। স্বর্গে, অপবর্গে, ও নরকে তাঁহারা তুল্যার্থদর্শী। দেহধারী জীবসমূহের এই দেহসংযোগ, আর দেহসংযোগ নিবন্ধন তাহাদের যাহা কিছু ঘটে, অর্থাৎ সুখ দুঃখ জন্ম মরণ পাপ অনুগ্রহ প্রভৃতি সমস্তই পরমেশ্বরের লীলা, অতএব এই সমুদয়ে তুল্যার্থ-দর্শী হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু, মানুষ পরমেশ্বরকে দেখে না, পরমেশ্বরের লীলাও বোঝে না। মানুষ দেখে নিজেকে আর নিজের ভোক্তৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব, আর জ্ঞাতৃত্বের অভিমানকে। এই কারণেই সে 'গুণদোষবিকল্প' দেখিয়া থাকে। 'গুণদোষবিকল্প' কথার অর্থ ইষ্টানিষ্ট ভেদ। মানুষের মনে হয় ইহাই ভাল, ইহাই মন্দ। এই যে বোধ বা অর্থভেদ ইহা অজ্ঞানকৃত। মালা দেখিয়া যেমন সর্পাদি বলিয়া মনে হয়, ইহাও ঠিক সেইরূপ। যাঁহারা ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি বহন করেন, তাঁহারা জ্ঞান, বৈরাগ্য ও বীর্য্যসম্পন্ন। তাঁহাদের 'ব্যপাশ্রয়' নাই, বিশিষ্ট বুদ্ধির দ্বারা আশ্রয়ণীয় কোন অর্থ বা বস্তু নাই। তাঁহাদের নিকট সমুদয় বস্তুই তুল্যরূপ মায়িক, অতএব উৎকর্ষ অপকর্ষের কোনরূপ বিচার নাই। ভগবান্ গিরিশ বলিতেছেন, হে দেবি, আমি, বিরিঞ্চি, সনৎকুমার, নারদ, ব্রহ্মপুত্রগণ, (মরীচি প্রভৃতি ঋষি) প্রধান প্রধান দেবগণ, আমরাই পরমেশ্বরের লীলা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারি না। সুতরাং যে সকল দেবতা আমাদের অংশের অংশস্বরূপ এবং অজ্ঞানতা প্রযুক্ত নিজেদেরই পৃথক ঈশ্বর বলিয়া মনে করে, তাহারা কি বুঝিবে? হরির প্রিয়ও কেহ নাই, অপ্রিয়ও কেহ নাই, আপনও কেহ নাই, পরও কেহ নাই, তিনি সকল ভূতের আত্মা এবং সকল ভূতের প্রিয়। মহাভাগ চিত্রকেতু সেই ভগবান্ অনন্তের প্রিয় এবং অনুচর। সেই জন্য, এই ব্যক্তি শান্ত এবং সমদর্শী। আমিও অচ্যুতের প্রিয়। বিস্মিত হইবার কারণ নাই, যে সকল পুরুষ মহাত্মা, মহাপুরুষের ভক্ত, শান্ত এবং সমদর্শী, তাঁহাদের স্বভাবই এইরূপ।

দেবাদিদেব মহাদেব যাহা বলিলেন, তাহাতে একটি কথা স্মরণীয়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, চিত্রকেতু, নারদ ও অঙ্গিরার উপদেশে সঙ্কর্ষণদেবের উপাসনা করিয়াছিলেন। মহাদেব বলিলেন, চিত্রকেতু নারায়ণ-পরায়ণ ও বাসুদেবের ভক্ত, তিনি মহাপুরুষের আশ্রিত এবং লীলাবাদী। অতএব সঙ্কর্ষণ, নারায়ণ ও বাসুদেব উপাসনা একই জিনিস। ইহাই মহাপুরুষের উপাসনা ও লীলাবাদ।

মহাদেবের কথা শুনিয়া দেবী শান্ত হইলেন, তাঁহার বিস্ময় দূরীভূত হইল।

ইতি শ্রুত্বা ভগবতঃ শিবস্যোমাভিভাষিতং।
বভূব শান্তধী রাজন্ দেবী বিগতবিস্ময়া ॥

অতএব নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায় নমোনমঃ ॥

সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার

বদ্ধ ধারণা বা গূঢ়-মনোবৃত্তি বলিয়া একটা অতিশয় বিপজ্জনক জিনিস আছে। মানুষের মানসরাজ্যে ইহাদের আধিপত্য অতিশয় প্রবল। মুক্তিমন্ত্রপ্রচারক সংস্কারকগণ অনেক স্থলেই এই সব গূঢ় মনোবৃত্তির নিকট পরাজিত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, স্বাধীন চিন্তার ও অনুসন্ধানের যুগ। মানুষ কিছুই মানিয়া লইতে সম্মত নহে, সব জিনিসেরই মূল লইয়া টানাটানি পড়িয়াছে। এই যুগে 'গূঢ় মনোবৃত্তি'র আলোচনা প্রয়োজন।

এই সব গূঢ় মনোবৃত্তির মধ্যে কতকগুলি মানবমাত্রেরই সাধারণ। কতকগুলি এক একটি মহাজাতির বৈশিষ্ট্য। আবার কতকগুলি এক এক গ্রামে বা জনপদে, এক এক দেশে, এক এক ব্যবসায়ী বা শিল্পী সম্প্রদায়ে বা এক এক বংশে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব গূঢ়-মনোবৃত্তির ইতিহাস আছে। সমাজ-বিজ্ঞানের জন্য এই ইতিহাসের সম্যক্ আলোচনা আবশ্যক। গূঢ় মনোবৃত্তি সমূহকে পণ্ডিতেরা আদিম (original), ও উপার্জ্জিত (acquired) এই দুইভাগে বিভক্ত করেন। আলোচনার প্রারম্ভে এই বিভাগ সুবিধাজনক। কিন্তু, এখন আমরা যাহাকে মৌলিক বলিতেছি, কালে তাহাও 'উপার্জ্জিত' বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে হিন্দুদিগের মধ্যে, বিশেষ করিয়া উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদিগের মধ্যে একটি গূঢ় মনোবৃত্তি আছে। বিশ্লেষণ করিলে তাহার ভিতর তিনটি জিনিস বা উপাদান পাওয়া যাইবে।

১। বাহ্য আচারই ধর্ম্ম।

২। হিন্দুত্ব এমন একটা জিনিস, যাহা গেলে আর পাওয়া যায় না।

৩। এই হিন্দুত্ব, বিধাতা যাহাকে জন্মের সহিত দিয়াছেন, তিনিই ইহা পাইয়াছেন। তিনি ছাড়া আর কাহারও ইহাতে অধিকার নাই।

এই বদ্ধধারণা বা গূঢ়-মনোবৃত্তি আমাদের অর্ব্বাচীন বা পরবর্ত্তীকালের পুরাণে ও স্মৃতিনিবন্ধে স্থান পাওয়াও ইহার প্রভাব অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু, এই মনোবৃত্তি আমাদের আর্য্যভারতীয় জাতির মৌলিক মনোবৃত্তি নহে। মুসলমানদের শাসনকালে বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যে এই মনোবৃত্তি আমাদের মধ্যে জন্মাইয়াছে। বুদ্ধিমান ও অতিকৌশলী মুসলমান শাসকগণ উচ্চবর্ণীয় ও সুবিধাভোগী

হিন্দুদের মগ্নচৈতন্যে ও প্রকটচৈতন্যে এই গূঢ় মনোবৃত্তি গজাইয়া দিয়া হিন্দুজাতিকে একেবারে নির্জীব করিয়াছে। পুরাণের ও স্মৃতির অনেক বচনই ঐ সব মুসলমান শাসনকর্তৃগণের অতিগুপ্ত প্রেরণায় ও প্রভাবে রচিত হইয়াছিল। একটা বৈদেশিক ও অন্যধর্ম্মাবলম্বী জাতি রাজা হইয়া একটা পরাধীন জাতির মানসরাজ্যে কি প্রকারে সুকৌশলে আধিপত্য লাভ করে, ইহা তাহারই একটি সমুজ্জ্বল প্রমাণ।

পূর্ব্বোক্ত গূঢ়-মনোবৃত্তির প্রভাব আমাদের সমাজে অতিশয় ভয়ঙ্কর। গ্রামের স্ত্রীলোকেরা যেখানে নিজেদের মধ্যে সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করে, সেখানে 'জাত যাওয়া'র কথা খুবই শুনিতে পাওয়া যায়। 'জাত যাওয়া'র ভয় আমাদের মনে খুবই বেশী। ভূতের ভয় বা মরণের ভয় অপেক্ষাও বেশী। পৈতা হওয়ার পর ব্রাহ্মণের ছেলেদের অনেকেরই সর্ব্বদা ভয় হয় পাছে জাত যায়। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখে 'জাত' গিয়াছে, আর স্বপ্নে বালক কাঁদিয়া উঠে। সর্ব্বদাই ভয়, যদি পৈতা হারাইয়া যায়, আর সেই সময়ে যদি কেহ ছুঁইয়া দেয়। তাহা হইলে কি হইবে? 'জাত' যাইবে। 'জাত' যাওয়াটাকে একটা অতীব ভয়ের ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। আর এই 'জাত-যাওয়া' একটা কঠিন ব্যাপারও নহে, খুব সহজেই ইহা যাইতে পারে। 'জাত' গেলে যে কি হইবে তাহা কেহই জানে না, কিন্তু, ইহাই মনে হয় বা পূর্ব্বে মনে হইত একটা বিভীষিকাময় ভয়ানক গোছের কিছু হইবে। এই ভয়টা এখনকার ছেলেদের হয়ত অনেকটা ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গ্রাম্য বালকের এই ভয় খুবই বেশী পরিমাণে ছিল। ঘরে বাহিরে প্রায়ই কথা হইত, 'উহার জাত জরম গিয়াছে'। জরম কথাটা 'ধর্ম্ম' এর অপভ্রংশই হইবে। 'জাত' আর 'ধর্ম্ম' এই দুইটি কথা যেন এক। এই যে সুপ্রবল গূঢ় মনোভাব, যাহার প্রভাবে একটা বিশাল জনসংঘ এত আতঙ্কিত, বেদ, উপনিষদ্, মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। কাজেই আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, এই বদ্ধ ধারণা বা গূঢ় মনোভাব কোথা হইতে আসিল।

মুসলমান নবাবেরা অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সম্মানিত করিয়া ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করেন। নবাবের নিকট ভূমিদান পাইয়া এই সব ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ স্থানে সমাজপতি হইলেন। সমাজ-পতিরা নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের উচ্চবর্ণের নেতৃবর্গকে লইয়া মন্ত্রীমণ্ডল গঠন-পূর্ব্বক সমাজ-শাসন আরম্ভ করেন। এই শাসন অতিশয় কঠোর। ফলে, অনেক হিন্দুরই হিন্দুসমাজে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠে। মুসলমানের খাদ্যদ্রব্যের গন্ধ দৈবযোগে কাহারও নাকে গেল, আর হিন্দুসমাজের দ্বার তাহার জন্য একেবারে চিরকালের মতো রুদ্ধ হইল। হিন্দুপল্লীর মধ্য দিয়া মুসলমানের একদল সৈন্য চলিয়া গেল, আর সমুদয় পল্লী 'জাত' হারাইয়া সমাজচ্যুত হইল। বিতাড়িত হিন্দুসন্তানেরা বাধ্য হইয়া মুসলমান হইল। যে-সমাজ হইতে যত বেশী হিন্দুসন্তান মুসলমান হয়, নবাব-দরবারে সেই সমাজপতির সম্মানও ততই বাড়িয়া যায়। সমাজপতিরাও নবাবের খুব প্রশংসা করেন। তাঁহারা বলেন, নবাবের হিন্দুর উপর

টান খুব বেশী, নবাব মহাভারত শোনেন, হিন্দুর আচার ধর্ম্ম যাহাতে রক্ষা হয়, সেদিকে নবাব বাহাদুরের টান আছে. ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকেও মুক্তহস্তে দান করেন। এই প্রকারে একদল সমাজপতি ভূম্যাধিকারী ও তাহাদের আশ্রিত একদল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত গড়িয়া উঠিল। পূর্ব্বোক্ত গূঢ়-মনোভাব এই সব বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রায় সমগ্র হিন্দুসমাজে সংক্রামিত হইয়াছে।

এই মনোভাব আজ পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে ক্রিয়া করিতেছে। গ্রামকে গ্রাম একদিনে একসঙ্গে কেমন করিয়া মুসলমান হয়, তাহার একটি ঘটনা বলিতেছি। এই ঘটনাটি একশত বৎসরের মধ্যেই ঘটিয়াছে। বর্থাকাটি একটি গ্রাম, বরিশাল জেলার অন্তর্গত। এই গ্রামে অনেক নমঃশূদ্র বাস করিত। নমঃশূদ্রেরা সাধারণতঃ সদাচারসম্পন্ন বৈষ্ণব ও উদার প্রকৃতির লোক। কোন প্রকারে একঘর মুসলমান আসিয়া সেই গ্রামের এক প্রান্তে বাস করে। নমঃশূদ্রদের সঙ্গে মুসলমানটির খুব বন্ধুতা। নমঃশূদ্রদের অনুরোধে সেই মুসলমান বৈষ্ণব ও হিন্দু হইয়া সেই গ্রামে থাকিয়া গেল। কিছুদিন পরে এক প্রতাপশালী মৌলবী সাহেব নৌকা করিয়া সেই গ্রামে আসিয়া মুসলমানটির খোঁজ করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন, মুসলমানটি হিন্দু হইয়াছে, নাম বদলাইয়াছে, বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করিয়াছে। তিনি গ্রামের কাহাকেও কিছু না বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ও নিকটবর্ত্তী কুড়ি পঁচিশখানি গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ প্রভৃতি হিন্দুদিগকে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা আসিলেন, পাথেয় পাইলেন, প্রণামী পাইলেন। মৌলভী সাহেব ভাল লোক, টাকা কড়ি তিনিই সব দিলেন, তবে নিজে হাতে করিয়া নহে, নিজের আশ্রিত ও অনুগত ব্রাহ্মণের হাত দিয়াই দেওয়াইলেন। কারণ, ব্রাহ্মণেরা অশূদ্র প্রতিগ্রাহী ম্লেচ্ছের দান প্রাণ গেলেও লইতে পারেন না। সম্ভ্রান্ত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুরা সভা করিয়া, নমঃশূদ্রদের বিচার করিলেন। বিচারে নমঃশূদ্রেরা মুসলমান হইতে বাধ্য হইল। একরাশি নিরামিষ দ্রব্যের মধ্যে একফোঁটা মাছের জল ছড়াইয়া দিলে মাছের জল নিরামিষ হয় না, নিরামিষগুলিই আমিষ হইয়া যায়, নৈয়ায়িকের এই অকাট্য যুক্তির দ্বারাই নমঃশূদ্রেরা চিরকালের জন্য বিতাড়িত হইল।

একটি গোয়ালার গ্রামেও ঠিক্ এই প্রকারের ঘটনা ঘটে। দ্বিতীয় গ্রামটির নাম আমার মনে নাই, কেহ জানিলে দয়া করিয়া মনে পাড়াইয়া দিবেন। আমার মনে হয় এই গ্রামখানি খুলনা কিম্বা ফরিদপুর জেলায়।

স্বর্ণনির্ম্মিত বৃষ কাটিয়াছে বলিয়া একদল ধনশালী ও প্রতিপত্তিশালী বণিক্ সমাজচ্যুত হয়। ইহা নাকি বল্লালসেনের কীর্ত্তি। যাহারই কীর্ত্তি হউক, ইহার পশ্চাতেও মুসলমানের প্রভাব আছে। এই প্রভাব প্রত্যক্ষ প্রভাব নহে, পূর্ব্বোক্ত উপার্জ্জিত মনোভাবই ইহার হেতু। বেদে, রামায়ণে বা মহাভারতে এই মনোবৃত্তির আভাসও পাওয়া যায় না।

মুসলমানেরা জোর করিয়া সুবুদ্ধি রায়কে 'করোয়ার পাণি' বা "বদ্নার জল" খাওয়াইয়া ছিল। একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাহাকে তপ্ত ঘৃত খাইয়া আত্মহত্যা করিতে বলিয়াছিলেন। সমুদয় ব্রাহ্মণই যে এই নব মনোবৃত্তির দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন, তাহা নহে; কিন্তু, এই মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণেরা রাজশক্তির আশ্রিত, সুতরাং প্রবল ছিলেন। সুবুদ্ধি রায় শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় রক্ষা পান। সুতরাং এই মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে আর একটি বিপরীত মনোবৃত্তিও এক শ্রেণীর হিন্দুর মনে জাগিতেছিল। এই দুইটি বিরোধী মনোবৃত্তি ও সাধনাদর্শ, চারিশত বৎসর ধরিয়া বঙ্গের হিন্দুসমাজে ক্রিয়া করিতেছে। এই আদর্শদ্বয়ের সংঘর্ষ ও সংগ্রামের পরিচয় আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মনোভাবের কথাও একটু বলা দরকার।

শ্রীহট্ট একদিন একটি অতি পবিত্র হিন্দুরাজ্য ছিল। দ্বিতীয় মনোভাবটি শ্রীহট্টের নিজস্ব না হইলেও, শ্রীহট্ট হইতেই সমগ্র বঙ্গের সাধনক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম আবির্ভূত হয়। ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধমান, বীরভূম, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি বিশুদ্ধ হিন্দুর দেশ হইতে এই মনোভাবের পুষ্টি হয়। এই মনোভাবেরই বাহ্যপ্রকাশ শ্রীগৌরাঙ্গের বৈষ্ণবধর্ম্ম; জগাই মাধাই, রূপ-সনাতন প্রভৃতির শুদ্ধি, কাজীদলন, স্বাধীন হিন্দুরাজা প্রতাপরুদ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় উড়িয়ার সহিত কতকগুলি বাঙ্গালীর অন্তরঙ্গ মিলন প্রভৃতি। এই দ্বিতীয় মনোভাবই নদীয়ার বৈষ্ণব আন্দোলন। এই আন্দোলন চারি শত বৎসর ধরিয়া প্রথমোক্ত মনোভাব ধ্বংশ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে, অনেকস্থলে পরাজিত হইয়াছে সন্ধি করিয়াছে। অনেকস্থলে সন্ধি করিয়া নিজের বিশিষ্টতা একেবারেই হারাইয়াছে, কিন্তু সুখের বিষয় একেবারে মরিয়া যায় নাই। ইহার একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যত আছে বলিয়াই মনে হইতেছে।

মধ্যে কিছুদিন দেশে এমন একটা অবস্থা আসিয়াছিল যে অনেকে ভাবিতেছিলেন প্রথম প্রকারের মনোবৃত্তি বুঝি একেবারে ধ্বংশ হইয়া গেল। কিন্তু, তাহা হইল না। মুমূর্ষু যেমন অক্সিজেন বাষ্পের শ্বাস লইয়া বা বিসূচিকার রোগী যেমন লবণের ইন্‌জেক্‌সন্ পাইয়া কিছুক্ষণের জন্য শক্তিমত্তা বা সজীবতা দেখায়, সেইরূপ কতকগুলি লোক আমলাতন্ত্রের গূঢ় প্রেরণায় প্রবল হইয়াছে।

যে সব ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের হিন্দু প্রবল হইয়া সুবিধা ভোগ করিবেন এই আশায় অশাস্ত্রীয়, অন্যায্য ও কঠোর সামাজিক শাসনের দ্বারা হিন্দুকে ধ্বংশ করিয়াছিলেন এবং মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধির সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই যে ক্ষুদ্রচেতা ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা অনেকেই হয়ত ভাবিতেন, আমরা বা সমাজের বংশধরেরা কালে প্রবল হইলে মুসলমানের উচ্ছেদ হইবে। সেজন্য কেহ কেহ চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু, এই সংকীর্ণ কূটনীতি সফল হয় নাই। তাঁহাদের রাজা

হইবার আশা একেবারেই গিয়াছে। কিন্তু, কৌশলী মুসলমান রাজনীতিকগণ তাঁহাদের ভিতর যে গূঢ় মনোবৃত্তির আবাদ করিয়া তাঁহাদের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন, সেই মনোবৃত্তি তাঁহাদিগের ও তাঁহাদিগের আশ্রিত ও অনুগত জনগণের বংশধরদিগকে এখনও পরিত্যাগ করে নাই, ভূতের মতো এখনও তাঁহাদের ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসিয়া রহিয়াছে এবং মোহাবিষ্ট করিয়া নানারূপ অসৎচিন্তায় ও অসৎকর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছে।

এই দুই প্রকারের চেষ্টা দীর্ঘকাল ধরিয়া পাশাপাশি চলিয়াছে। দ্বিতীয় প্রকারের চেষ্টা শ্রীগৌরাঙ্গের যুগে বেশ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু, ঐ চেষ্টা বা আন্দোলন বেশী দিন নিজের প্রবলতা রক্ষা করিতে পারে নাই। ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে ইহার প্রভাব প্রায়ই চলিয়া গিয়াছিল। বৈদ্য ও কায়স্থ পরিবারে—বিশেষ করিয়া রাঢ়দেশে ও উত্তর বঙ্গে কিছু কিছু ছিল। আমরা যাহাকে সমাজের নিম্নস্তর বলি, সেখানে এই ভাবটি ছিল। ইংরাজশাসনের প্রারম্ভে এই উদার ভাবটি ক্রমে ক্রমে মাথা তুলিতেছিল। তখন ইংরাজের শাসননীতি অন্যরূপ ছিল। এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আবার সংগ্রামের সম্ভাবনা। সংগ্রাম আরম্ভও হইয়াছে। সংগ্রাম অবশ্য কঠিন নহে। তথাপি বলিতে চাই, যাঁহারা দ্বিতীয় মনোভাবের লোক তাঁহারা সংঘবদ্ধ হউন।

সংঘবদ্ধ হইয়া তাঁহারা কি করিবেন? এই প্রশ্নের একটা সদুত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। একটা কথা এই, আমাদের শাস্ত্র বা প্রাচীন অবদান ও প্রাচীন জীবনাদর্শের যাহা মহৎ ও সুন্দর, তাহার ধ্বংশ-সাধন বাঞ্ছনীয় নহে। এখন পৃথিবী জুড়িয়া বিপ্লবের দামামা যেরূপ সজোরে বাজিতেছে, তাহাতে অসহিষ্ণু তরুণেরা অনেকেই একথা শুনিবেন না। তাঁহারা অনেকেই যাহা কিছু প্রাচীন তাহাকে একেবারে লোপ করিতে চাহেন। দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে মতভেদ হইবে। মতভেদে বিচলিত হইলেও চলিবে না আর যাহার সহিত মতভেদ হইতেছে, তাহাকে খারাপ লোক মনে করিয়া গালাগালি করিলেও চলিবে না। যাহারা ভাঙ্গিতে চায় তাহারাও অনেকে মহাপ্রাণ, তাহারাও অনেকে দেশের কল্যাণের জন্য দীর্ঘকাল নানারূপ দুঃখকষ্ট বীরের মতো সহ্য করিয়াছে, এখনও শত অসুবিধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে। সুতরাং তাহাদের মত বা কর্ম্মপদ্ধতি যদিই বা গ্রহণ করিতে না পারি, তাহাদের চরিত্রের মহত্বের পূজা অবশ্যই করিব।

মতভেদ থাকুক। আমরা একটি কর্ম্ম-প্রণালী দেখাইতেছি। আমাদের দেশে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শাস্ত্রগ্রন্থের পঠন-পাঠন বর্ত্তমানে যে পদ্ধতিতে চলিতেছে, তাহার আমূল পরিবর্ত্তন একান্তভাবে আবশ্যক। পৃথিবীর জ্ঞানরাজ্য প্রসারিত হইতেছে, কত নূতন নূতন সত্য ও তত্ত্ব মানুষ পাইতেছে, পাইয়া শক্তিশালী ও গৌরবযুক্ত হইতেছে। আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠার জন্য, জড়বাদ সংশয়বাদ ও নাস্তিকতা দূর করার জন্য পৃথিবীতে নানারূপ চেষ্টা চলিতেছে। পৃথিবীর যাবতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র একত্র

করিয়া তাহাদিগের তুলনামূলক আলোচনার জন্য, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহিত প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের শিক্ষার সামঞ্জস্য আবিষ্কারের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী ও সমগ্র মানবজাতির সংহতি-সাধনের জন্য নানারূপ চেষ্টা চলিতেছে। পরলোকের কথা আজ বিজ্ঞানের আলোচনার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাই নবযুগ। আমাদের শাস্ত্রালোচনা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে এই নবযুগের উপযোগী হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহারাই ধর্ম্মগুরু ও প্রকৃত লোক-শিক্ষক। আমাদের দেশে এই প্রকারের লোকশিক্ষক রহিয়াছেন এবং তাঁহারা অনেকেই স্বভাবতঃ ত্যাগী। কিন্তু, প্রকৃত সুশিক্ষার অভাবে এবং বর্ত্তমান যুগের অনুপযোগী কুশিক্ষার প্রভাবে, তাঁহাদের দ্বারা সমাজের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হইতেছে। ইহার জন্য কেবল যে তাঁহারাই দায়ী তাহা নহে, সমগ্র সমাজই দায়ী।

বিশ্বের সমুদয় জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে ও আয়ত্ত করিতে হইবে। মানবজাতির উন্নতিমুখী যাবতীয় প্রচেষ্টার ভিতর কি সত্য ও কি মঙ্গল রহিয়াছে, তাহা জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে এবং জানিয়া বুঝিয়া সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিতে হইবেএবং স্বধর্ম্মে ও আত্মপ্রকৃতিতে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আমাদিগকে সমগ্র মানবজাতির অধ্যাত্মশিক্ষক ও নেতা হইতে হইবে। আমাদের দেশে যাঁহারা শাস্ত্রচর্চ্চা করেন, তাঁহাদের সম্মুখে এই জীবনাদর্শ কি প্রকারে ধরিতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা দরকার।

এখন যাঁহারা শাস্ত্র পড়েন তাঁহারা একযুগের একখানা গ্রন্থ বা একটিমাত্র পদ্ধতি পড়েন। কিন্তু, তাহাও ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে নহে, তুলনামূলক পদ্ধতিতে নহে, ক্রমপরিবর্ত্তনের বিধানের আলোকেও নহে। সুতরাং সে জ্ঞান, অজ্ঞান অপেক্ষা খারাপ। তাহাতে চিত্তের একটা জড়তা জন্মায়। এই পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়া একদল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত প্রস্তুত করা আবশ্যক। ইহা বিপ্লবের পথ নহে, বিকাশের পথ।

ইংরাজী ১৯২৮ সালের আগষ্ট মাসের "দি হিন্দু মিশন বুলেটিন্" নামক ইংরাজী মাসিক পত্রে আমারই লেখা একটি ইংরাজী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, এই প্রবন্ধটি তাহারই অনেকটা ভাবানুবাদ বলিয়া ইংরাজী প্রবন্ধটিও পুনর্মুদ্রিত হইল।

THE SOCIAL MALADY AND ITS CURE.

(By Kuladaprosad Mallik B. A. Bhagvatratna)

Of all recent discoveries in the mental region the most fruitful to the educationist, reformer and social worker are the unconscious mind and the

working of suggestions. In the curing of individual maladies these two discoveries have already produced wonderful results. The time is come when these two theories or ideas are to be applied for the curing of social maladies.

There is the unconscious mind or the subconscious, behind our conscious mind or conscious memory. We are not aware of its existence and working, but still we are guided by it in what we feel and believe. A 'suggestion' is not merely a persuasive argument addressed to the reasoning mind. It penetrates to the deeper, unconscious levels and resides there even for generations creating the certitude of dynamic traditional beliefs. If these beliefs be false and bad, they become very dangerous to the collective life of the society cherishing these ideas or beliefs. If the beliefs are good and healthy, then they are an incaculable blessing.

A suggestion is either a hetero-suggestion or an auto-suggestion. The former is from an outer agent while the latter is made by the man himself. Both are made to the unconscious mind. Sometimes a hetero-suggestion becomes an auto-suggestion and the unconscious mind of a whole race is affected by it for generations.

Amongst the Hindus of the present day we find some traditional beliefs. Three of these are put below :—

1. The essence of religion is mere conformity to certain rules of eating and drinking and the performance of some outer physical acts. This is the end-all and be-all of religion. All other things, even character, selflessness, disinterested social service etc, are secondary and non-essential.

II. Hinduism, if some how lost, can never be recovered or regained.

III. None, that is not a born Hindu, can be a Hindu.

These three traditional beliefs are very common. But they are not original beliefs or ideas of the Indo-Aryan races, the old Hindus, our fore-

fathers. These beliefs have been acquired latterly. Read the old scriptures, the old histories of our race, and I can assure you, you will find no trace of these beliefs in them. But, you must go to the really old ones and you must ascertain their genuinenss by the historico-critical method.

Whence come these traditional beliefs with such certitude? The generation of these beliefs is due to the successful and diplomatic suggestive work of some very clever Mussalman rulers. This is an instance of the conquest of the mind of a large race by the diplomacy of a conquering people.

How was it made? Some very clever Mussalman rulers made large gifts of rent-free lands to influential Brahmins. Some high caste men, favourites of the Court, were attached to these Brahmins. They became heads of village societies. Some Nawabs showed great love and respect for the religion of the Hindus and posed themselves as the defenders of the purity of Hinduism. Under the patronage of these Mussalmans many Hindu books were translated in Bengali and many Brahmins and temple-owners got rent-free lands, titles and other privileges.

The procedure was as follows.

"I want to see that you, Hindus, preserve the purity of your religion. I am a *Mlechchha* and I am unfortunate. How I like I were a Hindu! In my next birth I hope to be a Hindu, by your blessings. But, Sir, you should see that in your society there may not live a single man who has been in any way polluted. Rely on me, I am always your humble servant and jealous defender." So says the diplomatic Mussalman ruler.

He asked the Pandits—"Do not such and such injunctions occur in your scriptures? A Hindu who smells the cooked food of a *Mlechchha* can no longer be a Hindu. A Hindu lady, touched by a mlechchha loses her caste and religion for ever! They do occur. I heard these things from a Sadhu at Hardwar and a Pandit at Benares," continues the diplomatic Nawab.

"Yes, Yes, they are in our holy books," say the Pandits. Some Pandits manufacture or forge books, or write new *Stanzas* and throw them in old books. These are done to please the Nawab. Not only that, they drive away men from Hindu society on very trifling and imaginary grounds. The expelled Hindus are forced to embrace Islam. The head man of the village society, expelling the largest number of men gets the greatest honour from the Nawab. This has been the procedure.

Now I come to the cure, but only to suggest it. In these days, we read our scriptures, but not historically. Any book and every book written in Sanskrit is looked upon as authoritative. Many of us are still living in the dark mediaeval age. Among the orthodox Pandits, there is none who knows the historical, critical or comparative method or the application of the theory of evolution. But these men are flattered by some others with University degrees of modern culture and by a section of the commercial press. The present bureaucracy and many of its supporters help the guardians of this mediæval ideas.

But still the case is not hopeless. It is not a fact that Brahmins knowingly or unknowingly sold themselves to the diplomatic Nawabs. There were protests. The Chaitanya movement and the Esoteric Tantric movements were clear protests, though not very successful at the time.

The psycho-analysists have proved that the processes of the unconscious mind can be brought within the control of the will and its plastic shape can be bent to the mould that we desire. To cure the social malady from which we are suffering for about a thousand years, we want a new literature of successful suggestions a band of social workers with iron will, backed by real scholars with modern mind and culture. In the course of a few years, ten or twelve, we are destined to see a new earth and a new heaven. All that is necessary for the uprooting of the traditional beliefs in the unconscious mind of our race are

already present in the country ; but they lie scattered here and there. These forces are to be focussed at one point and I think that, that point will be the Hindu Mission movement.

The Hindu Mission Bulletin
August 1928.

আমার বার্ষিকী

পরদিন ১২ই মার্চ্চ রাত্রিতে কলিকাতা হইতে **রাজসাহী** রওনা হইলাম। রাজসাহী-ধর্ম্মসভার নিমন্ত্রণ লইয়াছি, কিন্তু খবর লই নাই কোনপথে যাওয়া সুবিধাজনক। তারে খবর দিলাম লালগোলা হইয়া যাইতেছি। ষ্টিমারে রাজসাহী ঘাটে নামিয়া দেখিলাম, পূর্ব্বে যেখানে পদ্মা ছিল, সেখানে নাই। সহর হইতে ঘাট ছয় মাইল। নাটোর হইয়া আসাই উচিত ছিল। যাহা হউক, ঘাটে গাড়ী আসিয়াছিল, তাই রক্ষা। কিন্তু, দ্বিপ্রহরে বালি ভাঙ্গিয়া যাওয়া, ঘোড়ারও দফা শেষ, আরোহীরও প্রায়। অনুতাপ হইল কেন এ পথে আসিলাম। রাজসাহীও পূর্ব্বে কয়েকবার আসিয়াছি। রাজসাহী-ধর্ম্মসভা বাঙ্গলা দেশের একটি সুপরিচিত প্রাচীন প্রতিষ্ঠান, ৬২ বৎসর এই সভা চলিতেছে। রাজসাহী জ্ঞানচর্চ্চায় খুব উন্নত. কেহ কেহ বলেন বাঙ্গালাদেশে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। এবারে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন মৈত্রেয় মহাশয় ধর্ম্মসভার কর্ণধার হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবু একজন পাকা স্বরাজী ও কংগ্রেস্‌ওয়ালা। ৪ দিন রাজসাহীতে বক্তৃতা হইল। পরে বঙ্গবাসী কাগজে দেখিয়াছি, রাজসাহীর ধর্ম্মসভায় ব্রাহ্মণ-সভার জয়জয়কার হইয়াছে। কথাটা সত্য হইলে ভাল, কিন্তু কথাটা কেবল কাগজের সংবাদেই সত্য। ১৭ই মার্চ্চ ৪ঠা চৈত্র রাজসাহী হইতে **পাঁচুপুর**। আত্রাই ষ্টেশনের নিকট আত্রেয়ী নদীর একটি শাখার উপর এই পাঁচুপুর গ্রাম। ধর্ম্মপরায়ণ জমিদার শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র সাহা, শ্রীঅনাদি নাথ সাহা, বিশেষ বন্ধু—সর্ব্বদাই তাঁহাদের বাড়ী যাইতে বলেন, আমিও সেখানে বেশ আনন্দ পাই। ২২শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত পাঁচুপুরে থাকিলাম, সর্ব্বদাই শাস্ত্রালোচনা, বেশ শান্তিতে দিনগুলি কাটিয়া গেল। সুসঙ্গ,—দুর্গাপুর হইতে কয়েক বৎসর আহ্বান আসিতেছে, যাওয়া হয় নাই। হঠাৎ তাঁহাদের টেলিগ্রাম পাইয়া রওনা হইলাম। ২৪শে মার্চ্চ ময়মনসিং পৌঁছিলে হিতৈষী

বন্ধু শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার উকীল মহাশয় বলিলেন, আপনার সুসঙ্গ যাওয়া হইবে না, সেখানে ভয়ানক বসন্ত হইতেছে, লোকজন পলাইয়া যাইতেছে। কলেরা বসন্তের রোগী লইয়া দীর্ঘকাল নাড়া-চাড়া করিতেছি, কাজেই বিকালে রওনা হইলাম। নূতন জায়গা, পূর্ব্বে কখনও যাই নাই। আমি একা, শেষে লোক জুটিয়া গেল, তাঁহারা আমাকেই আনিতে আসিয়াছেন। 'জাড়িয়া ঝান্ঝাইল্' ষ্টেশনে নামিয়া অন্ধকারে নদীতীরে গিয়া খেয়া পার হইলাম, তাহার পর মোটরবাস, আবার নদীপার। রাত্রি প্রায় তিনটার সময় পৌছিলাম। তিন দিন বক্তৃতা হইল, বাজারের ব্যবসায়ীরাই আমাকে আনিয়াছেন। এখানে মেলা হইতেছে সেজন্য একদিন বক্তৃতা বন্ধ, তাহার পরদিন ২৯শে মার্চ্চ ১৬ই চৈত্র ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি। বড় বড় টিনের ঘর একেবারে উড়িয়া গেল, কত গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সুসঙ্গ জায়গাটি ভাল, গারো পাহাড়ের পাদদেশ, কিন্তু ভাল করিয়া সব দেখা হইল না। পরদিনও বক্তৃতা হইল। ১লা এপ্রিল ময়মনসিং পৌছিলাম।

একটি গ্রহবিপাক

জানুয়ারী মাসের শেষাংশে যখন ময়মনসিং জেলার চাঁপারকোণা গ্রামে ছিলাম, সেই সময়ে একদিন সকালে জামালপুরের একজন মোক্তারবাবুকে সঙ্গে লইয়া এক ভদ্রসন্তান আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। ভদ্রসন্তানটির নাম অনাথ গোঁসাই। খুব অস্পষ্টভাবে মনে পড়িল, তাঁহাকে যেন অনেকদিন পূর্ব্বে নবদ্বীপে দেখিয়াছি। তিনি কি একটা মোকদ্দমায় পড়িয়াছেন, তিনিই যে আসামী তাহা আমাকে বলিলেন না, আমার সাহায্য চাহেন ইত্যাদি। গোলমালের ব্যাপার, আমি তাঁহাকে বলিলাম সেবাশ্রম মাতৃমন্দিরের দেখাশোনার ভার এখন সদানন্দের উপর, তোমার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি এখন যাও সদানন্দের সহিত পরামর্শ কর। তাহার কিছুদিন পরে খবর পাইলাম জামালপুরে এক ফৌজদারী মামলায় পুলিশ আমাকে সাক্ষী মানিয়াছে, সিউড়িতে শমন গিয়াছে। মনে হইল ঐ গোঁসাই'এরই মামলা। সুসঙ্গে থাকার সময় খবর পাইলাম 'ওয়ারাণ্ট' হইয়াছে। ময়মনসিংএ উকীল বন্ধুদের খবর লওয়ার জন্য লিখিলাম। ময়মনসিং আসিয়া ভাবিলাম, জামালপুর গিয়া ব্যাপারটা জানিয়া যাই। জামালপুর গেলাম, জানিলাম ঐ গোঁসাই এবং আর একটি লোক নবদ্বীপের অনাথ-আশ্রমের জন্য কাগজ ছাপাইয়া চাঁদা তুলিতেছিল, আর এই কাজে আমারই নাম বেশী করিয়া ব্যবহার করিতেছিল, এমন কি বলিতেছিল তাহারা আমারই 'এজেণ্ট', আমি তাহাদের চাঁদা তুলিতে পাঠাইয়াছি। ছাপা কাগজে আমার নাম ও উপাধিতে ভুল ছিল। জামাল-পুরে আমার অনেক বন্ধু আছেন, তাঁহাদের সন্দেহ হয় আর তাঁহারা একেবারে উহাদের দুইজনকে পুলিশের হাতে অর্পণ করেন, ইহাই মোকদ্দমা। আমিই প্রধান সাক্ষী। 'গোঁসাই'এর শিষ্য আছে, তাহারা ময়মনসিং হইতে ব্যারিষ্টার আনাইয়া মোকদ্দমা লড়িতেছে। আমাকে সাক্ষী দিতে হইল।

যাঁহার নিকট বিচার হইল, তিনি অতি সজ্জন ব্যক্তি, সাক্ষীর ডকে উঠিতে হয় নাই, বসিয়া বসিয়াই সাক্ষ্য হইল। সামান্য দু এক কথার সাক্ষী। সাক্ষীর পাথেয় প্রায় ৬৫৲ টাকা পাইলাম, তাহা আর লইলাম না। হাঁসপাতাল, হরিসভা আর হিন্দুসভায় হরিরলুট্ করা গেল। ত্রিলোকেশ ভট্টাচার্য্য জামালপুরে সংসার পাতিয়াছে, তাহার বাসায় থাকিয়া তাহার সংগ্রাম দেখিলাম। কয়েকদিন জামালপুরে বক্তৃতাও হইল। ৮ই এপ্রিল আবার চাঁপারকোণা পৌঁছিলাম। এক নূতন জায়গায় ৭দিন বক্তৃতা হইল। ৮ই বৈশাখ রওনা হইয়া ৯ই বৈশাখ ২২শে এপ্রিল বর্দ্ধমান পৌঁছিলাম। বর্দ্ধমানে একটি হরিসভা হইয়াছে, আমার পূর্ব্বপরিচিত এবং অতি-সুপরিচিত একজন নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী হইয়া বর্দ্ধমানে রহিয়াছেন, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া এই হরিসভা চলিতেছে। সেই হরিসভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হইয়া বর্দ্ধমান আসিলাম। টাউনহলে সভা হইল। ৪দিন বর্দ্ধমানে থাকিলাম। বর্দ্ধমানে প্রথমদিন 'হরিসভা' জিনিসটা কি ঐতিহাসিক প্রণালীতে তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। 'নব্যবঙ্গের হিন্দু পুনরুত্থানের ইতিহাসে দুইটি সাধনাদর্শ দুই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে—ধর্ম্মসভা ও হরিসভা। হরিসভা সার্ব্বজনীন হিন্দুত্ব। অধিকারভেদ স্বীকার করিলেও দেখিতে হইবে ঐক্যের ভূমি কোথায়, মিলনের সূত্র কি? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন, ইহাই সারভূত চৈতন্যধর্ম্ম (Essential Chaitannyaism.) আর ইহাই হরিসভার মূলধন। অধিকারভেদ ব্যবহারিক ও সামাজিক, প্রত্যেক নরনারী অমৃতের পুত্রপুত্রী বা শ্রীকৃষ্ণের দাসদাসী, ইহাই পারমার্থিক। ব্যবহারিকের জন্য পারমার্থিক ভুলিও না, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। ভগবান্ প্রত্যক্ষের চেয়েও সত্য। ২৬শে এপ্রিল সকালে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে দেখিলাম লর্ড সিংহের পুত্রদ্বয় সিংহের চিতাভস্মের সমাধি দেওয়ার জন্য রাইপুর যাইতেছে। শ্রদ্ধেয় চারুবাবু সঙ্গে ছিলেন, লর্ড সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার সহিত এই প্রথম দেখা। অন্যান্য কথার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, রাইপুরে কি কোন লোকহিতকর কর্ম্ম হইবে? উত্তরে জানিলাম, ছেলেরা আর কিছু করিবে না। ২৬শে এপ্রিল হইতে ৬ই মে পর্য্যন্ত সিউড়িতে থাকিলাম। ইহার মধ্যে তিন দিন অবসর প্রাপ্ত জেলাজজ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত লালা দামোদরপ্রসাদএর বাড়ীতে শাস্ত্রব্যাখ্যা হইল।

পঞ্চম পর্ব্ব

৭ই মে ২৪শে বৈশাখ বর্দ্ধমান হইয়া **শাঁকারি**। শাঁকারি বা শঙ্করী দেবীর নামে এই গ্রামের নাম। শঙ্করীদেবী অষ্টভুজা, সিংহবাহিনী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী। এই গ্রামে স্বর্গীয় রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের মাতুলালয় এবং তিনি বাল্যকালে এই গ্রামে অনেকদিন ছিলেন। তিন দিন এই গ্রামে থাকিলাম। মাত্র একদিন সম্পূর্ণ বক্তৃতা হইল, প্রথম দিন কিছুক্ষণ বক্তৃতার পর ঝড়বৃষ্টি, ৩য় দিন

ঝড়বৃষ্টির জন্য একেবারেই হইল না। এই গ্রামটি খুব উন্নত। গ্রামের উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয় একজন সাধুপুরুষের দান, সুন্দর গৃহ, সুন্দর লাইব্রেরী। দামোদরের বন্যায় এই গ্রামের এবং এই অঞ্চলের ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা গ্রাম দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ক্ষতি কি? চাষী লোকের একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শাঁকারিতে আরও দু একদিন থাকার জন্য অনুরোধ হইল, কিন্তু থাকিয়া কি করিব? অনেক দূর হইতে বক্তৃতা শুনিতে লোক আসিতেছে কিন্তু ঝড়বৃষ্টির সময়, সামিয়ানা টাঙ্গাইয়া বক্তৃতা, সুতরাং ঝড়বৃষ্টি হইলে বক্তৃতা হইবে না। সুতরাং, শাঁকারির উৎসব এ সময়ে না করিয়া শীতকালে করা আবশ্যক। শাঁকারির এই উৎসবের সমুদয় ব্যয় শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্র-নাথ মজুমদার মহাশয় একাকী বহন করেন। এই গ্রামে একজন ত্যাগী ও শিক্ষিত ডাক্তার আছেন, তাঁহার নেতৃত্বে গ্রামের যুবকেরা প্রাণ দিয়া গ্রামবাসী দরিদ্রগণের যেরূপ সেবা করে, তাহা দেখিলেও পুণ্য, শুনিলেও পুণ্য। শাঁকারি গ্রামখানি সাধুর গ্রাম। বঙ্গের দানবীর রাসবিহারীর শৈশবের সহিত এই গ্রামের সম্পর্ক স্মরণীয়। **বর্দ্ধমান** আসিয়া ১১ই ও ১২ মে দুইদিন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ভামিনী-রঞ্জন সেন মহাশয়ের বাড়ীতে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিলাম। কার্য্যটি একটু অন্তরঙ্গভাবেই হইল। মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু উদ্দেশ্য এখনও সিদ্ধ হয় নাই। শ্রীযুক্ত ভামিনীবাবু বর্দ্ধমানে ছিলেন না, কালিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রেরা ভদ্রলোকদিগকে আহ্বান করিয়া আনিলেন, বিশেষ পরিশ্রম করিলেন ও আমাকে খুব যত্ন করিলেন। বর্দ্ধমানে এই একটি বাড়ী ছাড়া আর কাহারও সহিত পরিচয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার সহিত মেদিনীপুর ও হুগলীর তুলনা করিয়া দেখি, কত তফাৎ! ইহার কারণ, এখনও বুঝিতে পারি নাই, বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি।

১৩ই মে আবার **হুগলী** আসিলাম। গৌর সোম প্রভৃতি দেশকর্ম্মী সন্ন্যাসীদের সহিত কত কথা হইল। বিকালে মল্লিকদের ঠাকুরবাড়ীতে বক্তৃতা হইল। পরদিন শ্রীশের বাড়ীতেই মহিলাদের জন্য শাস্ত্রব্যাখ্যা। রাত্রিতে হুগলি ছাড়িয়া নৈহাটি হইয়া সকালে জগতী ষ্টেশনে নামিলাম। জগতী **চোরহাঁস** একই গ্রাম। চোরহাঁস হরিসভার উৎসব। অনেকবার এই গ্রামে আসিয়াছি, পূর্ব্বে সেবাশ্রমের জন্য এই গ্রাম হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। সবই আছে, মাত্র একজন নাই, আমার অতি প্রিয় বন্ধু গয়ানাথ পাল নাই, সেই হাস্যবদন পরোপকারী সাধুটি অকালে স্বর্গে গিয়াছে। রেললাইনের ধারে তাহার বাড়ী, জগতী হইতে কুষ্টিয়া যাইতে ডান দিকে, যখনই ঐ পথে যাই বাড়ীখানি দেখিয়া যাই। কতদিনের কত সুখস্মৃতি, নবদ্বীপের কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে কত আশা, কত কল্পনা, এই ঘরে বসিয়া হইয়াছে, কিন্তু, সে আজ নাই, ডাক্তার গয়ানাথ পাল নাই। তাহার পুত্রও ডাক্তার হইয়াছে, ইহাই আনন্দ। চোরহাঁসে তিন দিন থাকিলাম, গয়ানাথের সেই বাড়ীতেই থাকিলাম। বৃষ্টির জন্য একদিন বক্তৃতা হইল না, দুই দিন হইল। এইবার ভক্ত

রাখালচন্দ্র দত্ত। গয়ানাথের সম্পর্কেই ইঁহার সহিত বন্ধুতা। ইঁনি আমাকে **কুর্শা** লইয়া গেলেন। হাল্‌সা ষ্টেশন হইতে কুর্শা যাইতে হয়। কুর্শা খুব প্রাচীন গ্রাম. মুসলমানযুগের অনেক ঐতিহাসিক কথা এই গ্রামের সহিত জড়িত।

'কুর্শায়' তিন দিন থাকিয়া পাল্কীযোগে "**বকচুয়া**" নামক গ্রামে গেলাম। তাঁহারাও অনেকদিন অনেক প্রকারে অনুরোধ উপরোধ করিয়াছেন। খুব বড় উৎসব, খুব বড় সভা, পাঁচ হাজার লোকের সমাগম। গ্রামটি যশোহর জেলা, নদীয়া জেলার সীমান্ত। ২৩শে মে বকচুয়া হইতে পাল্কীযোগে হাল্‌সা, পরদিন বিকাল পাঁচটায় সিউড়ি। পরদিন ২৫শে মে রাত্রি ৯টায় সিউড়ি হইতে রওনা হইয়া ২৬শে সকাল ৯টায় কোদর্ম্মা পৌঁছিলাম। কর্দ্দম ঋষির স্মৃতিপূত এই স্থান এখন অভ্রের খনির জন্য বিখ্যাত। এই তৃতীয়বার কোদর্ম্মা। ৭ দিন বক্তৃতা। তাহার মধ্যে একদিন ডোমচাঁচ। ২রা ও ৩রা জুন, আসানশোল, মহিলা সমিতির আহ্বানে। ৪ঠা জুন সিউড়ি আসিলাম। ১০ই জুন সিউড়ি হইতে দুমকা। সিউড়ির এত কাছে দুমকা, কিন্তু এতকাল দুমকা আসি নাই। আমাদের সিউড়ির শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দুমকায় অনেকদিন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন, এখন অবসর লইয়াছেন এবং দুমকাতেই বাস করিয়াছেন। তিনি হরিভক্ত লোক। আবার যোগীন দাদা, বীরভূম ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তিনিও দুমকায়, হরিকীর্ত্তন আর বৈষ্ণব সেবার জন্য তিনিও বিখ্যাত। তাঁহারা ডাকেন দুমকা যাবার জন্য, কিন্তু একটা না একটা কারণে ঘটিয়া উঠে না। রসিকপুরের শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি, নবদ্বীপে তাঁহার সহিত আলাপ, তিনিও দুমকা আসার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া আসিয়াছিলেন। এতদিন হয় নাই, এইবার দুমকা চলিলাম। সিউড়ি হইতে মোটার বাসে আমজোড়ার ঘাট, হাঁটিয়া নদী পার হইয়া আবার বাস, রাণীশ্বর, মশানজোড় প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া পথ, মধ্যে মধ্যে পাহাড়, বাঁ দিকে বরাবর ময়ূরাক্ষী নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, কখন দেখা যায়, কখন দেখা যায় না। রাস্তার ধারে ধারে জামের গাছ, জাম পাকিয়াছে, পাকা ফলের ভারে গাছ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, গাছতলায় পাকা জামের যেন বিছানা, বেশ ভাল জাম। তিন দিন দুমকায় বক্তৃতা করিয়া আবার সিউড়ি আসিলাম। যাওয়ার সময় আমজোড়ার ঘাটে হাঁটিয়া নদী পার হইয়াছিলাম, তাহার পর বান পড়িয়াছে, ময়ূরাক্ষীর ঘোড়াবান, একদিন তো পারাপারই ছিল না, পরদিন আমরা খেয়ায়, এই ডোবে আর কি নৌকা, এইভাবে পার হইলাম। আমজোড়ার ঘাটে কবে সাঁকো হইবে? বড় দরকার। বেহার-সরকার একটু দৃষ্টিপাত করিলেই হয়।

সিউড়ি হইতে ২৫শে জুন ১১ই আষাঢ় **মেহেগ্রাম**। গ্রামখানি রামপুরহাট ও নলহাটির মাঝামাঝি। দুইদিন সেই গ্রামে বক্তৃতা করিয়া **কুরুমগ্রাম** গেলাম, সেখানে

একদিন। এই গ্রামগুলি প্রাচীন মিত্রভূমের অন্তর্গত, অনেক কায়স্থের বাস। কুরুমগ্রাম বেশ উন্নত গ্রাম, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, খুব দলাদলিও আছে। ২৮শে জুন সিউড়ি।

ষষ্ঠ পর্ব্ব

২৭শে জুলাই সিউড়ি হইতে রওনা হইয়া কলিকাতা। ১লা আগষ্ট কলেজস্কোয়ার থিয়সফিক্যাল হলে বক্তৃতা The Ago & the Ideal. ২রা ও ৩রা চেৎলায় শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য মহাশয়ের বাড়ী বক্তৃতা, খুব বড় সভা। পূর্ব্বে চেৎলায় অনেক বক্তৃতা হইয়াছে, এখন আর বড় হয় না। আহিরীটোলা পল্লীবাসীদের উদ্যোগে ৪ঠা সোণার গৌরাঙ্গ মন্দিরে বক্তৃতা আরম্ভ হইল। দুইদিন বক্তৃতা হইল। ৫ই রবিবার সারাদিন বরাহনগর বাগানে ছিলাম, ভারতসমাজের পূজা ও যজ্ঞ হইল, সেখানে সারাদিনে তিনবার বক্তৃতা হইল, তাহার পর আবার সোণার গৌরাঙ্গ মন্দিরে। ৬ই সোণার গৌরাঙ্গ মন্দিরে বহুলোকের সমাগম, বক্তৃতা করিতে উঠিলাম, গলা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আরম্ভ করিয়া পারিলাম না, বক্তৃতা বন্ধ হইল। সত্যবাবু ডাক্তার ছিলেন, তিনি গাড়ীতে তুলিয়া তাঁহার বাড়ী লইয়া গেলেন এবং সেবা আরম্ভ করিলেন। এমন সেবা নিজের লোকেও করে না, সাধুলোকে করে বা করিতে পারে। পরদিন হিন্দুমিশনে বক্তৃতার কথা ছিল, গলার জন্য বন্ধ করা হইল। পরদিন বক্তৃতা হইল, লোক ছিল কম, বেশ চলিয়া গেল, বসিয়া বসিয়া বলিলাম, স্থান—নিমাই-নিবাস বিষয়—কৌতুকী ভগবান্ The sportive Divine। ১১ই ১২ই সোণার গৌরাঙ্গ মন্দিরে বক্তৃতা হইল। একদিন বন্ধ হইয়াছিল, এইজন্য দুইদিন বক্তৃতা করিলাম। ১৮ই হিন্দুমিশনে 'ক্লাশ' করিলাম, কর্ম্মীযুবকদের জন্য। ২১শে ও ২২শে আগষ্ট আলবার্ট হলে বক্তৃতা হইল। তাহার পর দুদিন হিন্দুমিশনে কথোপকথন-সভা। ২৬শে আগষ্ট নিমাই নিবাসে সুবর্ণবণিক সমাজে বক্তৃতা করিয়া থিয়সফিক্যাল হলে বক্তৃতা করিলাম। শরীর ভাল নাই, চিকিৎসা চলিতেছে, খুব নিয়মে আছি, কিন্তু কাজ বন্ধ নাই। ২রা সেপ্টেম্বর থিয়সফিক্যাল্ হলে বক্তৃতা করিয়া হিন্দুমিশনে কথোপকথন সভা করিলাম। ৫ই সেপ্টেম্বর থিয়সফিক্যাল্ হলে বক্তৃতা করিয়া বাগেরহাট চলিলাম, বড়ই জরুর আমন্ত্রণ। সঙ্গে চলিলেন পুরাতন সেবক, কৃষ্ণনগরের প্রফুল্ল মৈত্র। পরদিন হইতে তিনদিন বাগেরহাটে বিশাল সভায় দীর্ঘকালব্যাপী বক্তৃতা, কিন্তু অতিশয় অসুস্থ। শরীরে অস্ত্রোপচার হইল, ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু এম্ বি, বড় যত্ন করিলেন। দুইদিন অস্ত্রোপচার হইল। ৯ই খুলনা আসিলাম, তিনদিন বক্তৃতা হইল, দুইদিন ধর্ম্মসভায়, আর একদিন বাজারে। ১২ই কলিকাতা আসিয়া থিয়সফিক্যাল্ হলে বক্তৃতা, পরদিন হিন্দুমিশনে কথোপকথন। এতদিন ডাক্তার বাবুর বাড়ীতেই ছিলাম। ১৪ই নাথের বাগানে আসিলাম। ১৬ই তারিখে রিষ্ড়ায় বক্তৃতা করিয়া

আসিয়া আবার কলিকাতা চাঁপাতলায় বক্তৃতা করিলাম। রিষড়ায় থিয়সফিক্যাল্ ফেডারেশন ছিল। ১৭ই রাত্রিতে ময়মনসিং রওনা হইলাম। ১৮ই হইতে ২৬শে পর্য্যন্ত ময়মনসিং দুর্গাবাড়িতে বক্তৃতা। ২৭শে কামালপুর আসিলাম। ২দিন বক্তৃতা হইল। ৩০শে সরিষাবাড়িতে বক্তৃতা হইল, অল্পলোক। ১লা অক্টোবর চাপারকোণা গেলাম। এই তিনবার এ বৎসর চাঁপারকোণা আসা হইল। প্রথম দুইবার গ্রামখানি খুব ভাল দেখিয়াছিলাম, এখন দেখিলাম নরক, নরকেরও অধম, কারণ পাট। ৫ই রওনা হইয়া কলিকাতা আসিলাম। শ্রীমান্ শৈলেনের সঙ্গে দেখা হইল, তাহাকে বলিলাম, "ভগবান্ আসিয়াছেন, এবার ব্যাধিরূপে আসিয়াছেন, সংযমের দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে"। ১০ই ১১ই থিয়সফিক্যাল হলে বক্তৃতা। ১৪ই অক্টোবর ২৮শে আশ্বিন, আহিরীটোলায় 'গাদার মরা'র সভা হইল, উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করিলাম। সে কথা পরে বলিব। ১৫ই অক্টোবর বরানগরে বন্ধু শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সোম ডাক্তারের বাড়ীতে থাকিলাম, "চণ্ডীতত্ত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা হইল। পরদিন আহিরীটোলায় বক্তৃতা। ৩১শে আশ্বিন, ১৭ই অক্টোবর সিউড়ি আসিলাম। বৎসর শেষ হইল। মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হইল, আরও কিছু বলিব, পরের মাসে পড়িবেন।

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা ছাড়া নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে প্রচার কার্য্য হইয়াছে। কাশিয়ানি, মহিষারগোপ, পিঙ্গলিয়া, হুগলি (২ বার) গোপালপুর, নবগ্রাম, হেমনগর, ঝাওয়াইল, পিংনা, চাঁপারকোণা (৩ বার) বীরতারা, ময়মনসিং (২ বার), গৌরীপুর; নবদ্বীপ, দাঁইহাট, কালীগঞ্জ, গোপালপুর; মেদিনীপুর, রাজসাহী, পাঁচুপুর, সুসঙ্গ-দুর্গাপুর, বর্দ্ধমান; শাঁকারি, চোরহাঁস, কুর্ম্মা, বকচুরা, কোদর্ম্মা, দুমকা, মেহেগ্রাম, কুকমগ্রাম, চেৎলা, বাগেরহাট, খুলনা, সরিষাবাড়ি।

জগন্নাথ দাস কীর্ত্তণীয়া

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত খানা জংসন ষ্টেশনের আট নয় মাইল উত্তর-পূর্ব্বাংশে জেয়াড়া গোপাল পুরে, জগন্নাথ দাস বৈরাগ্য কীর্ত্তণীয়া বাস করিতেন। ইঁহার স্বহস্ত লিখিত "গৌর গণোদ্দেশ" নামক একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাইয়াছি। এই গ্রন্থের শেষাংশে লিখিত আছে—

"বহুভাগ্যে প্রাপ্তি শ্রীগৌরগণোদ্দেশ। কহেন শ্রীরামদাস···সবিশেষ॥ ইতি শ্রীচৈতন্য গণোদ্দেশ সম্পূর্ণ॥ ইতি॥ সন ১২৩৩ সাল॥ লিখিতং শ্রীজগমোহন দাস বৈরাগ্য। যার সম পৃথিবীতে নাহি হতভাগ্য॥ ইতি মাহ ফাল্গুন বুধবার॥"

এই 'গৌরগণোদ্দেশ' পুথির সহিত আমরা—মাধবাচার্য্যের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' (সুবৃহৎ গ্রন্থ) এবং জগমোহনের স্বহস্ত লিখিত 'দুর্জ্জয়মান', 'বংশীহরণ' 'বংশীহরণ তুক্ক', 'দানলীলা,, 'রাস', 'শ্রীকৃষ্ণের পৌগণ্ডলীলা' 'কুরুক্ষেত্রে মিলন', 'নন্দ-বিদায়' প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্দর্ভ এবং বহু অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি। আর প্রাপ্ত হইয়াছি এই দপ্তরের সহিত—১২৩৪ সালের ৭ই আশ্বিন তারিখের জগমোহন দাস বৈরাগ্য কীর্ত্তনীয়া মহাশয়কে শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা উপলক্ষে (২রা কার্ত্তিক) ২৯শে আশ্বিন হইতে কীর্ত্তন গান করিবার আহ্বান-পত্র। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে জগমোহন ঐ সময়েও বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা স্থূলতঃ ধরিয়া লইতে পারি যে কীর্ত্তনীয়া জগমমোহন বঙ্গীয় দ্বাদশ শতকের শেষাংশে বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যাংশ কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন।

জেয়াড়া গোপালপুরের জগন্নাথ দাস কীর্ত্তনীয়া সেকালে একজন খ্যাতনামা কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। কীর্ত্তন-গান তাঁহাদের বংশগত ব্যবসায়—তাঁহার বংশধরগণ এখনও কীর্ত্তন গান করিয়া থাকেন।

জগন্নাথ একজন রসজ্ঞ কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। তাঁহার স্বহস্তলিখিত আমরা 'দুর্জ্জয়মান', 'বংশীহরণ' প্রভৃতি যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্দর্ভ প্রাপ্ত হইয়াছি, সেগুলিতে কাহারও ভণিতা নাই—এবং আমাদের পুঁথিশালার বা অন্যত্র কোথাও এইরূপ সন্দর্ভের সন্ধান প্রাপ্ত হই নাই। আমাদের ধারণা—জগন্নাথই এই অপ্রকাশিতপূর্ব্ব সন্দর্ভগুলির রচয়িতা। এই সন্দর্ভগুলির বিশেষত্ব এই যে, রসকীর্ত্তনের পালাবন্দী গানে এক একটি আখ্যায়িকা-বিশেষের যে, বিভিন্ন পদকর্ত্তা রচিত পদাবলী সজ্জিত করিয়া যে ধরা অনুসৃত হয়, রস-পর্য্যায়ের ক্রম ঠিক্ রাখিয়া, এবং 'উজ্জ্বল-নীলমণি' প্রভৃতি গ্রন্থ-নির্দ্দিষ্ট প্রণালী যথাযথভাবে অনুসরণ করিয়া, সেই রসধারার পুষ্টি প্রদর্শনকল্পে সন্দর্ভাকারে আখ্যা-য়িকাগুলি রচিত হইয়াছে। এই ভাবে রস-কীর্ত্তনের অবলম্বিত এক একটি আখ্যায়িকা-বিশেষ, রসশাস্ত্র প্রণালীসম্মত সরল সন্দর্ভাকারে রচনা করিয়া, তিনি জনসাধারণের সহজে রসকীর্ত্তনের মর্ম্ম অবধারণ করিবার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। হয়ত, তিনি এইরূপ আরও বহু আখ্যায়িকা সন্দর্ভা-কারে রচনা করিয়া থাকিবেন—আমরা তাহার আপাততঃ সন্ধান পাইলাম না। হয়ত, আর কখনও পাইব না—তৎসমুদয় চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা যে দপ্তরটি পাইয়াছি—তাহারই একেবারে নষ্টপ্রায় অবস্থা—দপ্তরের মালিক গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া পুণ্যার্জ্জনের চেষ্টায় ছিলেন ;—বহুভাগ্য বলে চিরধ্বংসমুখ হইতে, তাহা রক্ষিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত আমরা নিজকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি। এই সন্দর্ভগুলির অপর বিশেষত্ব এই যে, এই পয়ারছন্দে রচিত অনতিদীর্ঘ এই আখ্যায়িকাগুলি কীর্ত্তনা-কারে গানকরাও চলে। অনেক প্রাচীন মহাজন-পদাবলীর ভাব অবিকল গ্রহণ করিয়া, এই সন্দর্ভগুলি মধ্যে যথাস্থানে সুবিন্যস্ত করিয়া সমুজ্জ্বল করা হইয়াছে। আমরা এই অপূর্ব্ব সন্দর্ভগুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত করিব।

নন্দ-বিদায়

উগ্রসেন রাজা করি নন্দকে বিদায়।
একথা আমার সঙ্গে কহা নাহি যায়॥
অসুর সংহার হেতু জনম ইহার।
সবার অধিক ভাগ্য তোমার আমার॥
মোর ঘরে জন্ম লয়া, ছিল তোর ঘরে।
আনি থুলাম লয়া পাপ কংসরাজার ভরে॥
তোর ঘরে দুই ভাই ছিল এত দিন।
আনিলে পালিলে তুমি আমি ভাগ্যহীন॥
কাতর হইয়া কহে৷ কহিতে ডরাই।
দিন কতক থাকুক হেথা যদি আজ্ঞা পাই॥
আমি জানি তোমায় আমায় নাহি ভিন্নাভিন্ন।
তোর ঘরে ছিল হেথা থাকুক কতক দিন॥

এবোল শুনিয়া নন্দ হরিল চেতন।
ছল ছল আঁখি কিছু না বলে বচন॥
সম্বিত হইল অন্ধ অনিমিষ আঁখি।
পরাণ ছাড়িল যেন দেহ হেন দেখি॥
ঐছন দেখিয়া বাসুদেব গেল ঘর।
ছট্‌ফট্‌ করে সব গোয়ালা অন্তর॥
কেহ কান্দে কেহ বলে কি বল কি বল।
কৃষ্ণ কি ছাড়িল নন্দ যশোদার কোল॥
কেহ নন্দ নন্দ বলি ডাকে তার কানে।
অনেক শব্দেতে নন্দ পাইল চেতনে।

চেতন পাইয়া 'রামকৃষ্ণ' বলি ডাকে।
ঘর যাই, আইস বাপ, চুম্ব দিই তোর মুখে॥
চাণুর, মুষ্টীক, পাপ কংস রাজার হাতে।
মৃত্যু এড়াইলে, ভয় ঘুচাইলে তাথে॥
সঙ্কট ঘুচিল বাপু. আইস করি কোলে।
শ্রীমুখে চুম্ব দিয়া লয়ে যাই ঘরে॥
কতি গেলে আরে হের বসুদেব মিতে।
এতদিন ধরি তোর এই ছিল চিতে॥
এতদিন নাই জানি কৃষ্ণ তোর পুত্র।
এতদিন নাই জানি এই সব সূত্র॥
এখন সে ঘরে লাগি পাইয়া হেন কর।
উগ্রসেন রাজা কৈল—এই বোল ধর॥
এ বোল বলিয়া নন্দ মূরছিত হৈল।
কৃষ্ণগত চিত্ত কৃষ্ণ-সমাধি লাগিল॥
প্রেমেই বিহ্বল যেন আছে কৃষ্ণবুকে।
কৃষ্ণ কোলে কংস যেন চুম্ব দিছে মুখে॥
ঐছন বাসে নন্দ, শোক নাহি আর।
আচম্বিতে পরিতোষ পাইল গোয়াল॥
অ-শোক হইল সব গোয়ালা-অন্তর।
শকট চালায়ে সবে যায় নিজ ঘর॥

কথোদূর গিয়া পুনঃ চমকিত চিতে।
চারি পানে চান, কৃষ্ণ না পান দেখিতে॥
কৃষ্ণ বলরাম নাই যাই কাঁহা লয়া।
গোকুল নগরে প্রবেশিব কি বলিয়া।
না যাইব ঘর কেহ. জ্বালহ আগুনি।
পুড়িয়া মরিব যুক্তি এই ভাল জানি॥

কৃষ্ণ-বলরাম দুটি আঁখি এ সবার।
আঁখিহীন জনের কি কাজ জীবার॥
আত্মা পরমাত্মা দুই কৃষ্ণ বলরাম।
মরা কি জীবিত হয় ছাড়িয়ে পরাণ॥
শুনিতে শুনিতে সব যায় ধীরে ধীরে।
নিকট হইল দেখে গোকুল-নগরে॥

শকটের শব্দ গেল গোকুল-নগরে।
ধাই ধাই লোক সব হৈভে গেল বাহিরে॥
কৃষ্ণ বলরাম আইল—উঠে এই ধ্বনি।
আনন্দে ধাইয়া যায় যশোদা জননী॥
উর্দ্ধমুখে ধায় দেবী নগর বাইরে।
সব লোক ধায়, কেহ নাহি বান্ধে স্থিরে॥
যশোদা দেখিয়া নন্দ মূরছিত হৈয়া।
শকট হইতে পড়ে গা-আছাড়িয়া॥
সকল গোয়ালা কান্দে নাহিক সম্বিত।
নীরস সকল জন উনমত চিত॥
দেখিয়া যশোদা রাণী চমকিত চিয়ে।
কৃষ্ণ-বলরাম দোঁহে দেখিতে না পায়ে॥

নন্দেরে পুছয়ে কৃষ্ণ বলরাম কোথা।
বজ্র পড়িল হেন বাস মোর মাথা॥
মূরছিত হইয়া পড়ে আউদড় চুলি।
ভূমে গড়াগড়ি বুলে উন্মত পাগলি॥
আকান্দ কান্দনা কান্দে কৃষ্ণ বলি ডাকে।
গোকুল নগর অন্ধকারময় দেখে॥
আমারে ছাড়িয়া বাপু কেমনে থাকিবে।
মা' বলিয়া মুখে তুমি আর না ডাকিবে॥

সে-হেন সুন্দর মুখে নাহি দিব চুম্ব।
আজ হৈতে শূন্য হৈল কালিন্দী কদম্ব॥
কুলের প্রদীপ মোর নয়নের তারা।
এ-দেহের আত্মা তোমা বই নাই মোরা॥
ক্ষীর নাড়ু নবনী দধি দুগ্ধ সর।
আকুটী করিয়া মুখে না মাগিবে আর॥
কেমনে বাঁচিব তোর সঙ্গের ছাওয়াল।
না দেখিব তা সবা সহিতে তোমা আর॥
কলভের মাঝে যেন করিবর সাজে।
ময়মত্ত সিংহ যেন সাবকের মাঝে॥
আগে যায় গাবীগণ পাছু যায় শিশুগণ।
মাঝে দুই ভাই মত্ত গজেন্দ্র গমন॥
গোকুল নগরে না দেখিব তেন রূপ।
আচম্বিতে নিভাইল ঘৃতের প্রদীপ॥
কে মোর কাড়িয়া নিল আঁখির পুতলি।
অন্ধকার দশদিক শূন্য সকলি॥
প্রাণের অধিক তোর ধবলি শামলি।
কেমনে সহিব বাপু তাহার বিকুলি॥
কালিন্দী কদম্ব বৃন্দাবন পাশ বিনে।
কেহ না জীব বাপু তোমা না দেখিলে॥
গোয়ালা ছাওয়াল কান্দে করি কোলাকুলি।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ কহ কহ বলি॥
খেনে গায়া আছাড়িয়া পড়ে ভূমিতলে।
কৃষ্ণ আইলা কৃষ্ণ আইলা কেহো কেহো বলে॥
কেহ বলে ব্রজবাসী সিঙ্গা কর সাজ।
সবে চলে যাই সেই রাজার সমাজ॥
গাবীগণ কান্দে সব আঁখি ঝরঝরে।
মুখে রা' নাই পুনঃ বুক পুড়ি মরে॥

তরুলতা কান্দে সব শুকাইল পাতা।
পশু পাখী কান্দে সব হেঁট করি-মাথা॥
গোপীগণ কান্দে সব মুখে নাই বাতা।
হিয়ার আগুনি পোড়ে কি কহু তার কথা॥
ঝর ঝর নয়ন ঝুরে মুখে বাণী নাহি স্ফুরে
ধাই ধাই যায় নন্দ যথা।
কারু পা নাই চলে সেইখানে ঠায় পড়ে
কি কহু তাহার মনব্যথা॥
বস্ত্র না সম্বরে গায় লাজ ভয় খেয়ে ধায়
শেল বাজিল যেন বুকে।
আগুপাছু নাই গুণে গুরু গর্ব্বিত নাহি মানে
পুছিতে না আসে কিছু মুখে॥
অন্তরে লাগিল ঘুন মনের কন্দনা শুন
বাহিরে মরা যেন আছে॥
যায় ডরে ডরে মরে যা লাগি দুকুল ছাড়ে
দারুণ বিধি অই করিয়াছে॥
যেখানে যে কৈল খেলা সে বন রাসের বেলা
আগুনি ঝলক উথলিল।
তিলে তিলে মনে পড়ে অন্তরে গুমরি মরে
জর জর জরে যে জারিল॥
কান্দিতে না পারে রাই ছটফট করি ধাই
কালিন্দী কদম্ব তরুতলে।
বিষে অগ্নি জ্বলে গা আপাদমস্তক পা
ঝাঁপ দিতে চায় কালিন্দীর জলে॥
কে কহিতে পারে তা যেন পোড়ে তার গা
অনুভব কে কহিতে জানে॥

বধুর পরাণ দোষে কি কৈল কি কৈল শেষে
সেই হৈল বিদগধ জনে।
বৃন্দাবনে তরুলতা কাঁচা নাই কারু পাতা
দাবাগ্নি পুড়িল যেন গা।
পাখীগণের পাখা নাই পশুগণের ... নাই
চোঙা শব্দে নাই শুনি রা॥
মূর্চ্ছিত সকল জন কান্দে মাত্র অচেতন
দিবারাত্রি নাহিক গোকুলে।
চান্দ লুকাইল ডরে পাছে গোপীগণ মরে
কৃষ্ণহীন দিনে দিবা দিবাকরে॥

হেনই সময়ে কৃষ্ণ চতুর সুজান।
মনে অনুমানি সবার রাখিতে পরাণ॥
কৃষ্ণের বিরহে সবার চিত্ত উতরোল।
সকল ইন্দ্রিয় ভেল কৃষ্ণগুণে ভোর॥
গিলিলেক সব দেহ বিরহ বেয়াধি।
আঁখি, মুখে, চিতে, বুকে লাগিল সমাধি॥
আঁখিয়ে দেখে কৃষ্ণ মুখে কয় বাণী।
কোথা গিয়েছিলে বলে কোলে টেনে আনি।
বুক ভরি কোলে করি মুখে দেই চুম্ব।
প্রেম অনুরূপ সবে আলিঙ্গয়ে অঙ্গ॥
শোক দুঃখ গেল হিয়ে আনন্দ লহরী।
তিলেক বিচ্ছেদে দুঃখ সকলি পাসরি॥
সবার অন্তর ভেল কাছে আছে কৃষ্ণ।
গোপীর হৃদয় আর্ত্তি রতিরস তৃষ্ণ॥

—মঃ লাঃ পুঃ ২৪৩৪

শ্রীশিবরতন মিত্র।

বেদ ও পুরাণ

১। শ্রীমদ্ভাগবত ও পুরাণ

চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে আমাদের দেশে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করিয়া যে ধর্ম্মমণ্ডলী সংগঠিত হইল, তাহার শিক্ষা ও উপদেশের আলোচনা করিলে দেখা যায় বেদে ও পুরাণে কোনরূপ বিরোধ নাই। কিন্তু, কেবলমাত্র বেদের সাহায্যে আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারিব না, বেদ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বদাই পুরাণ-সমূহের সাহায্য লইতে হইবে। পুরাণের মধ্যেও নানাবিষয়ে নানারূপ মতভেদ আছে, সেই মতভেদের মীমাংসার জন্য আমাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতের শরণাগত হইতে হইবে। ইহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। "শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং"। শ্রীমদ্ভাগবতও নিজেকে বেদরূপ কল্পতরুর অমৃতময় ফল শ্রুতিসার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আমাদের বহু শাস্ত্রের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতকেই যে শীর্ষস্থানীয় করিয়াছেন, তাহার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে নামকরণের সময় নানারূপ দ্রব্য আনিয়া শিশুর সম্মুখে ধরা হয় এবং দেখা হয়, শিশু এই নানারূপ দ্রব্যের মধ্যে কোনটি গ্রহণ করে। শিশু স্বেচ্ছায় যে-দ্রব্যটি গ্রহণ করে তাহা দেখিয়া শিশুর ভবিষ্য জীবন অনুমান করা হয়। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে এই প্রথা ছিল। এখনও অনেক স্থলে এই প্রথা আছে। শ্রীচৈতন্যদেবকে লইয়াও এইরূপ করা হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহার বর্ণনা এইরূপ।

> ধান্য, পুঁথি, খড়ি, স্বর্ণ, রজতাদি যত।
> ধরিতে আনিঞা কৈরিলেন উপনীত॥
> জগন্নাথ বোলে "শুন বাপ বিশ্বম্ভর!
> যাহা চিত্তে লয়, তাহা ধরহ সত্বর॥"

...হইল পাতা। ... প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
'ভাগবত' ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥
পতিব্রতাগণে 'জয়' দেই চারিভিত।
সভেই বলেন "বড় হইব পণ্ডিত॥"

দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু (তখন নিমাই পণ্ডিত বা শ্রীগৌরাঙ্গ, অর্থাৎ সন্ন্যাসের পূর্ব্বে) বলিয়াছিলেন

গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার।
সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেমরূপ ভাগবত' চারিবেদে কয়॥
চারিবেদ 'দধি'—ভাগবত 'নবনীত'।
মথিলেন শুকে—খাইলেন পরীক্ষিত॥
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত॥
মুঞি, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে॥
*   *   *   *
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
*   *   *   *
ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বর-বুদ্ধি-যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীভগবান্-রূপে এই কথাগুলি বলিয়াছেন। সন্ন্যাসের পর নীলাচল হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া দেবানন্দ পণ্ডিতকে যখন কৃপা করেন, সেই সময়েও তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেন।

শুন বিপ্র! ভাগবতে এই বাখানিবা।
'ভক্তি' বিনু আর কিছু মুখে না আনিবা॥
আদি-মধ্য-অন্ত্যে ভাগবতে এই কয়।
বিষ্ণুভক্তি নিত্য-সিদ্ধ অক্ষয় অব্যয়॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে [illegible]তা বিষ্ণুভক্তি।
মহাপ্রলয়েও যার থা[illegible]॥
মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে।
হেন ভক্তি না জানি কৃষ্ণের কৃপা বিনে॥
ভাগবতশাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ত্ব কহে।
তেঞি ভাগবতসম কোন শাস্ত্রে নহে॥
যেনরূপ মৎস্য-কূর্ম্ম-আদি অবতার।
আবির্ভাব তিরোভাব যেন তা'-সভার॥
এইমত ভাগবত কারো কৃত নয়
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয়।
ভক্তিযোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়।
স্ফূর্ত্তি সে হইল মাত্র কৃষ্ণের কৃপায়॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায়।
এই মত ভাগবত—সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥

* * * *

প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ।
যাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণরঙ্গ॥
বেদশাস্ত্র পুরাণ কহিয়া বেদব্যাস।
তথাপি চিত্তের নাহি পায়িলা প্রকাশ॥
যখনে শ্রীভাগবত জিহ্বায় স্ফুরিল।
ততক্ষণে চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন হইল॥

* * * *

মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত—ভক্তিরসমাত্র।
ইহা বুঝে—যে হয় কৃষ্ণের কৃপাপাত্র॥
ভাগবত পুস্তকো থাকয়ে যার ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণে ভক্তি পায়॥

দুই স্থানে 'ভাগবত' নাম শুনি মাত্র।
গ্রন্থ-ভাগবত, আর কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র।

* * * *

ভাগবতরস—নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
ইহা জানে—যে হয় পরম ভাগাবন্ত॥
নিরবধি নিত্যানন্দ সহস্রবদনে।
ভাগবতরস সে গায়েন অনুক্ষণে॥
আপনেই নিত্যানন্দ অনন্ত যদ্যপি।
তথাপিহ পার নাহি পায়েন অদ্যাপি॥
হেন ভাগবত হেন অনন্ত অপার।
ইহাতে কহিল সবে ভক্তিরসসার॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতনভাগবতের এই কথাগুলি, যাহা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীমুখের উক্তি বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, তাহা হইতে ইহাই বুঝা যায়, আমাদের এই বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণবেরা বেদের অসম্মান না করিলেও বেদ অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতকে উচ্চতর স্থান দিয়াছেন। এই মত অবশ্য সর্ব্ব-সম্প্রদায়-সম্মানিত নহে। তাহা না হউক, এই কথাগুলির ইতিহাস ও তাৎপর্য্য আমাদিগকে ধীরতার সহিত অবধারণ করিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত পৌরাণিক সাহিত্যের অন্তর্গত। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ এবং পুরাণ চক্রবর্ত্তী। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমাকীর্ত্তনের দ্বারা পুরাণেরই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। কাজেই বেদ ও পুরাণ, এই দুইশ্রেণীর শাস্ত্রের সম্বন্ধ কি, এই সম্বন্ধ কি চিরদিনই একরূপ ছিল অথবা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এই সব বিষয়ের বিশিষ্টরূপে আলোচনা আবশ্যক। আমরা এই আলোচনাক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ও সত্যান্বেষী সুধীরবৃন্দকে সসম্ভ্রমে আহ্বান করিতেছি।

পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয় স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডের বচনের সাহায্যে বেদ ও পুরাণের সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

বেদবন্নিশ্চলং মন্যে পুরাণার্থং দ্বিজোত্তমাঃ।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥

বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং চালয়িষ্যতি।
ইতিহাসপুরাণৈস্তু নিশ্চলোহয়ং কৃতঃ পুরা॥
যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ।
উভয়োর্যন্ন দৃষ্টং হি তৎ পুরাণৈঃ প্রগীয়তে॥
যো বেদ চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজাঃ।
পুরাণং নৈব জানাতি ন চ স স্যাদ্বিচক্ষণঃ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজোত্তমগণ, বেদের ন্যায় পুরাণার্থকেও নিশ্চল মনে করি। বেদসমূহ পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত, ইহাতে সন্দেহ নাই। অল্পশ্রুত ব্যক্তির নিকট বেদের বিশেষ ভয়, এ ব্যক্তি আমায় বিচলিত করিবে। এইজন্য পূর্ব্বকালেই ইতিহাস ও পুরাণসমূহের দ্বারা বেদ নিশ্চলীকৃত হইয়াছেন। হে দ্বিজগণ, বেদসমূহে যাহা দেখা যায় না, তাহা স্মৃতিশাস্ত্র-সমূহে দৃষ্ট হয়। আবার, বেদ ও স্মৃতি, এই উভয়শাস্ত্রেই যাহা দৃষ্ট হয় না, তাহা পুরাণসমূহ কর্তৃক উত্তমরূপে কথিত হইয়াছে। যিনি বেদের ছয় অঙ্গ ও উপনিষদ-সহ চারি বেদ জানেন, কিন্তু, পুরাণ জানেন না তিনি বিচক্ষণ নহেন।

বায়ু, পদ্ম ও শিব, এই তিনখানি পুরাণে নিম্নের শ্লোক দুইটি পাওয়া যায়। মহাভারতেও এই শ্লোক দুইটি আছে, কিন্তু, এক স্থানে নহে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। প্রথম শ্লোকটি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া যায়, কিন্তু অর্থগত বৈষম্য বা বিরুদ্ধতা নাই।

যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ।
ন চেৎ পুরাণং সংবিদ্যান্নৈব স স্যাদ্বিচক্ষণঃ॥
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥

যে-দ্বিজ, ষড়ঙ্গ ও উপনিষদ্ সহ চারিবেদ জানেন কিন্তু পুরাণ ভাল করিয়া জানেন না তিনি বিচক্ষণ নহেন। ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা বেদকে সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া লইতে হইবে। অল্পশ্রুত-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট বেদের ভয় হয় এই ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে।

[শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দ, বেদের এই ছয় অঙ্গ। ছন্দ পদদ্বয়, কল্প হস্তদ্বয়, জ্যোতিষ চক্ষু, নিরুক্ত শ্রোত্র, শিক্ষা নাসিকা, ব্যাকরণ মুখ। প্রাচীন শ্লোক—

শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষং তথা।
ছন্দশ্চেতি ষড়ঙ্গানি বেদানাং বৈদিকা বিদুঃ॥ শব্দরত্নাবলী
ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ কথ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং নেত্রং নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে॥
শিক্ষা ঘ্রাণস্তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ তিথ্যাদিতত্ত্বম্]

২। শ্রুত ও সূত

অল্পশ্রুত ব্যক্তি বেদকে প্রহার করে; ইহার অর্থ, বেদের কুব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা করে। 'শ্রুত' কথাটির অর্থ উত্তমরূপে আলোচনা করা প্রয়োজন। 'শ্রুত' বলিতে আমরা বেদকেও বুঝি অন্যান্য শাস্ত্রকেও বুঝি। কিন্তু শ্রুত কথার মৌলিক বা নিরুক্তগত অর্থ প্রবাদ, জনরব বা পরম্পরাবাক্য;—পর পর পুরুষানুক্রমে যে-সব কথা চলিয়া আসিতেছে, তাহারই নাম শ্রুত। আমরা যাহাকে 'শাস্ত্র' বলি তাহা মূলে 'শ্রুত'। পুরাণের উৎপত্তি, বিকাশ প্রভৃতি তত্ত্ব বুঝিতে হইলে এই 'শ্রুত' কথাটির মৌলিক অর্থ মনে রাখা দরকার আর এই 'শ্রুত' বা পরম্পরাবাক্য কি কি কারণে এবং কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, কি-ভাবে স্মৃত ও হস্তান্তরিত হয়, এই সব ব্যাপার জানা দরকার। অবদান বলিয়া একটি সংস্কৃত কথা আছে—তাহার অর্থ—বৃত্তং কর্ম্ম। প্রশস্ত-মথ চ নির্বৃঢ়ং কর্ম্ম, প্রশংসনীয় ও সমাপ্ত কর্ম্ম। এই সব কর্ম্ম বা 'অবদান' লোকে পুরুষানুক্রমে মনে রাখে এবং আলোচনা করে, ইহারই নাম 'শ্রুত'।

আমাদের পুরাণসমূহ, মহাভারত এবং বহুলপরিমাণে রামায়ণেও প্রাচীন 'শ্রুত' পাওয়া যায়। বেদ, বেদের ব্রাহ্মণাংশ এবং ব্রাহ্মণ-বর্ণের অধিকৃত অন্যান্য গ্রন্থেও উপদেশ, তত্ত্বকথা ছাড়া অনেক সংবাদও আছে। এই সব সংবাদের মধ্যে কতকগুলি সমসাময়িক অর্থাৎ সেই সময়ের মানুষের ও ঘটনার সংবাদ—কিন্তু, অধিকাংশই 'শ্রুত' অর্থাৎ প্রাচীনতর কালের পরম্পরাবাক্য। কাজেই 'শ্রুত'ই মূল।

এই সব প্রাচীন 'শ্রুত' কি, কি প্রকারে তাহারা রক্ষিত, সংগৃহীত, বিভাজিত,

পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা পুরাণ হইতে পাওয়া যায়, অন্য কোন উপায়ে জানিতে পারা যায় না।

'সুত' বলিয়া এক শ্রেণীর লোক ছিলেন, এই সব 'শ্রুত' রক্ষা করা ও কীর্ত্তন করা তাঁহাদের ব্যবসায় ছিল। বায়ুপুরাণে আছে—

স্বধর্ম্ম এব সূতস্য সদ্ভির্দৃষ্টঃ পুরাতনৈঃ
দেবতানামৃষীনাঞ্চ রাজ্ঞাঞ্চামিততেজসাম্।
বংশানাং ধারণং কার্য্যং শ্রুতানাঞ্চ মহাত্মনাম্
ইতিহাস পুরাণেষু দিষ্টা যে ব্রহ্মবাদিভিঃ॥

পুরাতন সাধুগণকর্ত্তৃক দৃষ্ট 'সুত'এর স্বধর্ম্মই এই। দেবতাদের, ঋষিদের, অমিততেজা রাজাদের বংশকথা ও বিখ্যাত মহাত্মাদিগের কার্য্যের কথা রক্ষা করা। ব্রহ্মবাদিগণ কর্ত্তৃক ইতিহাস ও পুরাণসমূহে যে সব কথা বলা হইয়াছে, এইগুলিই সেই সব কথা।

পদ্মপুরাণও তাহাই বলিতেছেন—৫।১। ৭-২৮

এষ ধর্ম্মস্তু সূতস্য সদ্ভির্দৃষ্টঃ সনাতনঃ
দেবতানামৃষীনাঞ্চ রাজ্ঞামমিততেজসাম্
তদ্বংশকারণম্* কার্য্যং স্তুতিনাঞ্চ মহাত্মনাম্
ইতিহাসপুরাণেষু দৃষ্টা যে ব্রহ্মবাদিনঃ॥

'শ্রুত' কথাটির মৌলিক অর্থ বলা হইয়াছে। কথাটি বায়ু পুরাণে সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। 'স্তুতি' বলিতে প্রশংসাবাক্য বা গুণগান বুঝায়। বড় বড় রাজাদের সম্বন্ধে পুরুষানুক্রমে প্রচলিত অনেক স্তুতিবাক্য পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তুতিবাক্যকে গাথাও বলে।

তস্য যজ্ঞে জগৌ গাথাং গন্ধর্ব্বো নারদস্তথা।
কার্ত্তবীর্য্যস্য রাজর্ষের্মহিমানং নিরীক্ষ্য সঃ॥ মৎস্য ৪৩।২৩।

রাজর্ষি কার্ত্তবীর্য্যের (কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্জ্জুনের) মহিমা দর্শন করিয়া, তাঁহার (কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের) যজ্ঞে গন্ধর্ব্ব নারদ এক গাথা গান করিলেন। এই গাথাও মৎস্যপুরাণে রহিয়াছে।

মনুসংহিতায় আছে ক্ষত্রিয় পিতা ও ব্রাহ্মণ মাতার সন্তান সুত'। ইহা পরবর্ত্তী কালের কথা। মাগধ ও সুত, ইহাদের অতি প্রাচীন উৎপত্তিকথা পাওয়া যায়। বিষ্ণু-

পুরাণের প্রথমাংশের [illegible] অধ্যায়ে আছে, পৃথুরাজা পৈতামহ যজ্ঞ করিলেন, আর সেই যজ্ঞের সূতি বা সোমাভিষবভূমি হইতে সূত ও মাগধের উৎপত্তি হইল।

তস্য বৈ জাতমাত্রস্য যজ্ঞে পৈতামহে শুভে।
সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌত্যেঽহনি মহামতিঃ।
তস্মিন্নেব মহাযজ্ঞে জজ্ঞে প্রাজ্ঞোঽথ মাগধঃ॥

তিনি (পৃথুরাজা) জন্মমাত্রেই পৈতামহ যজ্ঞ করেন, তাহাতে সেই দিনেই সূতিতে মহামতি সূত, আর ঐ মহাযজ্ঞে প্রাজ্ঞ মাগধ উৎপন্ন হন।

পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ডের অষ্টাবিংশতি অধ্যায়ে ঠিক এই কথাই রহিয়াছে।

এতস্মিন্নন্তরে কালে যজ্ঞে পৈতামহে শুভে।
সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌম্যেঽহনি মহামতিঃ।
তস্মিন্নেব মহাযজ্ঞে জজ্ঞে প্রাজ্ঞো ঽথ মাগধঃ॥

বায়ুপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বিস্তারিতরূপে এই কথা বর্ণিত হইয়াছে। পৃথু মহারাজা ইহাদিগকে বাস করার জন্য দুইটি দেশ দিলেন। সূতকে দিলেন সূত বা অনুপদেশ, আর মাগধকে দিলেন মগধদেশ। "অনূপদেশং সূতায় মাগধান্ মাগধায় চ" আদি।

পদ্মপুরাণে সূতের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। এই সূত—

শিখাসূত্রেণ সংযুক্তো বেদাধ্যয়নতৎপরঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তাসাবগ্নিহোত্রমুপাসতে॥
দানাধ্যয়নসম্পন্নো ব্রহ্মাচারপরায়ণঃ।
দেবানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনাভিরতঃ সদা॥
যাচকস্তাবকৈঃ পুণ্যৈর্ব্বেদমন্ত্রৈর্যজেৎ কিল।
ব্রহ্মাচারপরো নিত্যং সম্বন্ধো ব্রাহ্মণৈঃ সহ॥

মাগধ, যদিও সূতের সহিত একই স্থানে, একই সময়ে ও একই প্রকারে উৎপন্ন, কিন্তু "বেদাধ্যয়নবর্জ্জিতঃ"। আবার বন্দী ও চারণগণ "ব্রহ্মাচারবিবর্জ্জিতঃ" স্তাবক।

তাহা হইলে পুরাণে দুই প্রকারের 'সূত' পাওয়া যাইতেছে। এক "ক্ষাত্রিয়াৎ ব্রাহ্মণীসুতঃ" আর এক "সূত্যাং জাতঃ"। এই উভয় শ্রেণীর সূতের একই কাজ বলিয়া এই দুই শ্রেণীর লোক এক হইয়া গিয়াছে সূত পৌরাণিক, মাগধ বংশ-শংসক, বন্দী স্তাবক। পৃথুরাজার যজ্ঞে উৎপন্ন মূল সূত ও মাগধ, এবং পরবর্ত্তী কালের এই নামে

পরিচিত মিশ্র বা সঙ্কর জাতি, ইহাদের মধ্যে যে প্রা[illegible] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতেই জানিতে পারা যায়। প্রতিলোম-জাত জাতির বর্ণনায় অর্থশাস্ত্র বলেন বৈশ্য পিতা আর ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় মাতার যে সন্তান, তাহাকে মাগধ এবং বৈদেহক বলে; আর ক্ষত্রিয় পিতা ও ব্রাহ্মণ মাতার সন্তানকে সূত বলে। অর্থশাস্ত্রকার বলেন পুরাণ-বর্ণিত সূত ও মাগধ হইতে ইহারা পৃথক্।

সূত-সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহাতে ইহাই বুঝা যাইতেছে সূত নামে পরিচিত এক শ্রেণীর অতিশয় সম্মানিত লোক প্রাচীনতম কাল হইতেই ছিলেন এবং তাঁহারা দেব, ঋষি, রাজা ও অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিগণের বংশানুচরিত রক্ষা করিতেন এবং কীর্ত্তন করিতেন। এই প্রকারে প্রাচীন পরম্পরাবাক্য-সমূহ রক্ষিত হইত, পুরাণ-সঙ্কলনের পূর্ব্বে এই সব উপকরণ প্রচলিত ছিল, আর সেই সব উপকরণ হইতেই পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছে। "স্মৃত" স্মরণ করিয়া রাখা হইয়াছে, 'অনুশুশ্রুম' 'ইতি নঃ শ্রুতম্' 'ইতি শ্রুতিঃ'।

৩। পুরাণ-সঙ্কলন

পুরাণ কিপ্রকারে সঙ্কলিত হইল তাহা বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড ও বিষ্ণুপুরাণে বেশ ভাল করিয়াই বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও তাহার বর্ণনা আছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন, এইজন্যই তাঁহার নাম হইল ব্যাস। বেদকে চারিভাগ করিয়া ব্যাসদেব তাঁহার এক একজন শিষ্যকে এক এক ভাগ দিলেন বা শিখাইলেন। শিষ্য চারিজনের নাম পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি আর সুমন্তু। তাহার পর বেদব্যাস।

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পসিদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥ বিষ্ণু, ৩।৬-১৬

পুরাণার্থবিশারদ বেদব্যাস আখ্যান-সমূহ, উপাখ্যান-সমূহ গাথাসমূহ ও কল্পসিদ্ধিসমূহের দ্বারা পুরাণসংহিতা করিলেন। "কল্পসিদ্ধিভিঃ"র পরিবর্ত্তে "কল্পযুক্তিভিঃ" পাঠও পাওয়া যায়।

এই শ্লোক হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে বেদব্যাসের পুরাণসংহিতা-সঙ্কলনের

পূর্ব্ব হইতেই আখ্যা[illegible]গাথা ও কল্পসিদ্ধি বা কল্পযুক্তি এই চারি প্রকারের সামগ্রী বা উপকরণ প্রচলিত ছিল।

রোমহর্ষণ-নামক * একজন বিখ্যাত সূত ছিলেন, তিনি বেদব্যাসের শিষ্য। মহামুনি ব্যাস তাঁহাকে এই পুরাণ-সংহিতা দিলেন বা শিখাইলেন। রোমহর্ষণের ছয় জন শিষ্য। বিষ্ণুপুরাণের মতে সুমতি, অগ্নিচর্চ্চা, মিত্রয়ু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ। কাশ্যপ অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন এই তিন জন আবার তিনখানি সংহিতা করিলেন। এই তিনখানি আর রোমহর্ষণের সংহিতা, এই চারিখানিতে মূল পুরাণ সংহিতা। প্রাচীনতম পুরাণ সংহিতার চারি পাদ প্রক্রিয়া, অনুসঙ্গ, উপোদ্‌ঘাত, উপসংহার।

---

* বর্ত্তমান যুগ, ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক আলোচনার যুগ। এক যুগের একখানি শাস্ত্র, বা একদেশের একখানি গ্রন্থ বা একটা কোন ব্যাপারের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে, সকল দেশের ও সকল যুগের সমশ্রেণীর যাবতীয় শাস্ত্রের ও ব্যাপারের সহিত তাঁহার তুলনা করিতে হইবে। সকল ব্যাপারেই বিশ্বজনীনের অন্বেষণই বর্ত্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য। রোমহর্ষণ-সম্বন্ধে একটা কথা জানা দরকার। কূর্ম্মপুরাণে আছে, রোমহর্ষণ ব্যাসদেবের নিকট পুরাণ ও ইতিহাস শিখিয়াছিলেন এবং তিনি জনসমাজে এই পুরাণ ও ইতিহাস প্রচার করিতেন। এই সূত যখন ব্যাসদেবের মুখে পুরাণ ও ইতিহাস শুনিয়াছিলেন, তখন তাঁহার—"সর্ব্বরোমাণি বচসা হৃষিতানি" সমুদয় লোম হৃষ্ট বা পুলকিত হইয়াছিল। এই জন্যই তাঁহার নাম 'লোমহর্ষণ' বা 'রোমহর্ষণ'।

প্রাচীন গ্রীক্‌দিগের মধ্যে এক শ্রেণীর ভ্রমণকারী গায়ক ছিলেন, তাঁহারা নিজের রচিত বা অপরের রচিত গাথা বা কাব্য গান করিয়া বেড়াইতেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই সুবিখ্যাত কবি 'হোমার' এর কাব্য গান করিতেন। অনেকে বলেন 'হোমার' নিজেও এই দলেরই একজন নেতা ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে গ্রীসদেশে ইঁহাদের খুব প্রতিপত্তি ছিল। এই গায়ক-গণকে র‍্যাপসডিষ্ট (Rhapsodist) বলে। ইঁহাদের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তাঁহারা ভাবাবেশে অত্যধিক পরিমাণে আবিষ্ট ও আত্মহারা হইতেন। তাঁহারা যাহা বলিতেন তাহার ভিতর সব সময়ে উত্তমরূপ শৃঙ্খলা, পারম্পর্য্য, বা যুক্তিযুক্ততা থাকিত না, কিন্তু তাঁহারা বলিবার সময় এমন উন্মত্ত হইতেন যে ভাবপ্রবণ শ্রোতৃবৃন্দ সহজেই মাতিয়া উঠিত। রোমহর্ষণের যে লক্ষণ পুরাণে পাওয়া যায় তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, এই দুই শ্রেণীর লোক একরূপ। পরবর্ত্তী কালে আমাদের দেশের

বায়ুপুরাণে এই চারিপাদের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণও এই চারিপাদে বিভক্ত। অন্যান্য পুরাণ, পুরাণের লক্ষণ বা আলোচ্য বিষয় অন্যভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কাজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে ক্রমে ক্রমে পুরাণে, নব নব বিষয় সংযোজিত হইয়াছে বা আমাদের ভারতীয় পৌরাণিক শাস্ত্রেরও একটা ক্রমবিকাশ আছে, আর এই ক্রমবিকাশের ধারা বেশ ধরিতে পারা যায়।

ক্রমবিকাশ কি প্রকারে হইল, এখন তাহাই আলোচ্য। মৌলিক বা আদিম পুরাণ-সংহিতা সঙ্কলিত হওয়ার পর ব্যাসদেব তাঁহার শিষ্য রোমহর্ষণ বা লোমহর্ষণকে উহা শিখাইলেন। লোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা, তাঁহার পিতার নিকট এই পুরাণ-সংহিতা পাইলেন। বর্ত্তমান সময়ে আমরা যেসব পুরাণ পাইতেছি তাহার অনেকগুলিতেই উগ্রশ্রবা সৌতিকে আমার পুরাণবক্তারূপে দেখিতে পাই। (হরিবংশ, পদ্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও মহাভারত)। রোমহর্ষণের ছয়জন শিষ্যের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে পাঁচজন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণেরা পুরাণের অধিকারী হওয়ার পর পুরাণের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, সাম্প্রদায়িক পুরাণ প্রচারিত হইতে লাগিল, পুরাণে নব নব বিষয় সংযোজিত হইতে লাগিল, বেদ দর্শনশাস্ত্র স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতির আলোচ্য বিষয়, ভিন্ন ভিন্ন তীর্থের দেবতার ও ব্রত প্রভৃতির মাহাত্ম্য-কথা পুরাণে সংযোজিত হইতে লাগিল। ইহাই পুরাণের ক্রমবিকাশের প্রণালী। এই কথা পুরাণে পাওয়া যায়।

৪। কল্প

আমরা দেখিয়াছি প্রথম স্তরে পুরাণ চারিপাদে বিভক্ত ছিল—আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা এবং কল্পযুক্তি, কল্পশুদ্ধি, কল্পসিদ্ধি বা কল্পকর্ম্ম। এই কল্প কথাটির অর্থ জানা প্রয়োজন। কল্প বলিতে ব্রহ্মার একদিন বুঝায়। ইহার পরিমাণ দৈব দ্বিসহস্র যুগ। এই প্রকারের ত্রিশদিনে ব্রহ্মার একমাস। এই ত্রিশ দিনেরও নাম পাওয়া যায়। ১। শ্বেত বরাহ ২। নীললোহিত ৩। বামদেব ৪। গাথান্তর ৫। রৌরব

মঙ্গল-গীতি-গায়ক, কীর্ত্তনীয়া, কথক, পাঁচালীওয়ালা, দাঁড়া-কবি প্রভৃতি এই কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রথমাবস্থায় ইহা ব্রাহ্মণেরই কাজ ছিল। তখন সম্মান খুব বেশি ছিল, তাহার পর ইহা ক্রমে ক্রমে অন্যশ্রেণীর লোকের হস্তগত হয়।

৬। প্রাণ ৭। বৃহৎকল্প [illegible] কন্দর্প ৯। সত্য ১০। ঈশান ১১। ধ্যান ১২। সারস্বত ১৩। উদান। ১৪। গরুড় ১৫। কৌর্ম্ম অয়ং ব্রহ্মণঃ পৌর্ণমাসী ১৬। নারসিংহ ১৭। সমাধি ১৮। আগ্নেয় ১৯। বিষ্ণুজ ২০। সৌর ২১। সোমকল্প ২২। ভাবন ২৩। সুপ্তমালী ২৪। বৈকুণ্ঠ ২৫। আর্চ্চিষ ২৬। বল্মীকল্প ২৭। বৈরাজ ২৮। গৌরীকল্প ২৯। মাহেশ্বর ৩০। পিতৃকল্প-অয়ং ব্রহ্মাণাঽ অমাবস্যা।

'কল্প' কথাটির ইহাই বর্ত্তমান অর্থ। কিন্তু, পুরাণে এই কথাটি সর্ব্বত্রই এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা, সন্দেহ। 'মৎস্য পুরাণ' এ 'রোহিণীচন্দ্র শয়ন' বলিয়া এক ব্রতের বর্ণনা আছে, এই ব্রত যিনি করিবেন, তিনি—

ত্রৈলোক্যাধিপতির্ভূত্বা সপ্তকল্পশতত্রয়ম্।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বিদ্যুত্ত্বা তু মুচ্যতে॥

এক বিংশতি শত কল্প ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইয়া চন্দ্রলোকে যাইবেন এবং বিদ্যুৎ হইয়া মুক্তিলাভ করিবেন।

তড়াগ-প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে—

এতান্ মহারাজ বিশেষ ধর্ম্মান্
করোতি যোঽপ্যাগমশুদ্ধবুদ্ধিঃ।
স যাতি রুদ্রালয়মাশু পূতঃ
কল্পাননেকান্ দিবি মোদতে চ॥

আগম-শুদ্ধ-বুদ্ধি হইয়া যিনি এই সব বিশেষ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তিনি পবিত্র হইয়া শীঘ্রই রুদ্রালয়ে গমন করেন এবং বহুকল্পকাল স্বর্গে আনন্দ ভোগ করেন।

ইমামনন্তফলদাং যস্তৃতীয়াং সমাচরেৎ।
কল্পকোটিশতং সাগ্রং শিবলোকে মহীয়তে॥

অনন্ত ফলদায়ক এই তৃতীয়া ব্রত যিনি সম্যক্‌রূপে আচরণ করিবেন, তিনি শতকোটি কল্পকাল শিবলোকে গৌরবে বাস করিবেন।

এই সব শ্লোকে 'কল্প' কথাটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলা কঠিন। ব্রহ্মার একদিন, ইহার অর্থ কিনা সন্দেহ। 'একটা অনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘকাল' এইরূপ অর্থেও কল্প কথা অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরাণে 'পুরাকল্পবিদ্' গণের কথা আছে। কাজেই

'কল্পযুক্তি' বা 'কল্পবাক্য' এই কথাটি প্রাচীনতম পু[illegible] অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, বলা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে বা পরবর্ত্তীকালে ইহার যাহা অর্থ, তাহা আমরা জানি।

৫। পুরাণ ও ইতিহাস

পুরাণ ও ইতিহাস, দুইয়ের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ কি, তাহাও বিশেষভাবে আলোচ্য। অনেক স্থানে একটিমাত্র আখ্যান বা উপাখ্যানকে ইতিহাস বা পুরাণ বলা হইয়াছে। যে কোন পুরাতন আখ্যান বা উপাখ্যানকে পুরাণ বলা যায়।

পুরাতনস্য কল্পস্য পুরাণানি বিদুর্বুধাঃ।

মৎস্যপুরাণের ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ে এই শ্লোকার্দ্ধ দুই স্থানে আছে। ইহার সহিত আর একটি শ্লোকার্দ্ধও দুইবার আছে।

ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুরাণানামনুক্রমম্।

পুরাতন কল্পের পুরাণসমূহ বুধগণ জানেন। পুরাণসমূহের অনুক্রম ধন্য, যশস্য ও আয়ুষ্য।

ইতিহাস বলিলে সত্যকার ঘটনার বর্ণনা বুঝায়। ইতি হ আস, ইহা এইরূপ ছিল। পুরাণ ও ইতিহাস প্রথমাবস্থায় পৃথকই ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ আছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উভয়ে মিশিয়া গিয়াছে। বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ নিজেদের ইতিহাস ও পুরাণ এই উভয় নামেই আখ্যাত করেন। ব্রহ্মপুরাণ নিজেকে পুরাণ ও আখ্যান বলেন। আবার মহাভারত নিজেকে পুরাণ, ইতিহাস ও আখ্যান, এই তিনই বলিয়াছেন। বাঙ্গালা-দেশের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বেদ ও পুরাণকে তুল্যরূপ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদ অপেক্ষাও উচ্চতর স্থান দিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, বেদ ও পুরাণে পূর্ব্বকালে কোনরূপ বিরোধ বা প্রতিযোগিতা ছিল কি না। প্রাচীন ও প্রামাণিক বচন-সমূহের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, বেদে ও পুরাণে বেশ ভালরূপ বিরোধ ছিল। বেদবাদী ও পুরাণবাদী, এই দুই সম্প্রদায় ধর্ম্মশিক্ষক ছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এই বিরোধ ভঞ্জন করেন। কোন্ কোন্ বিষয়ে ইহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল, তাহাও বুঝিতে পারা যায়।

প্রথমতঃ প্রাচীনত্ব লইয়া। বেদ আগে কি পুরাণ আগে? বেদ নিত্য ও অনাদি। বেদের কোন আদি নাই, অর্থাৎ বেদের রচনার বা প্রকাশের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই।

পুরাণে দেখা যায় বেদব[illegible]সমূহের সঙ্কলন করিয়াছিলেন। বেদব্যাস প্রচলিত মন্ত্রগুলি নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ বা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই হইতে একবেদ চারিবেদ হইলেন। ব্যাসদেব বেদ-সম্বন্ধে যাহা করিয়াছিলেন, পুরাণ-সম্বন্ধেও ঠিক্ তাহাই করিয়াছিলেন অর্থাৎ এক মৌলিক ও বিশাল পৌরাণিক সাহিত্য সাধ্যমত একত্র করিয়া প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণে বিভক্ত করিয়াছিলেন। বেদব্যাসের বেদবিভাগ ও পুরাণবিভাগের কথা পুরাণেরই কথা। এই কথার দ্বারা পুরাণ আপনাকে বা আপনাদিগকে সময় হিসাবে বেদের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।

পুরাণে রহিয়াছে, অগ্রে পুরাণ, তাহার পর বেদ। আর এই কথা বাজে কথা নহে। স্বয়ং পুরাণ পুরুষ বিশ্বাত্মা মৎস্যরূপে আবির্ভূত হইয়া মনুকে এই কথা বলিয়াছেন।

পুরানং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনির্গতাঃ॥ মৎস্যপুরাণ, ৫৩। ৩

সকল শাস্ত্রের মধ্যে পুরাণই সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মা কর্তৃক স্মৃত হইয়াছে। তাহার পর ব্রহ্মার মুখসমূহ হইতে বেদগুলি বিনির্গত হইয়াছে। পুরাণ যে প্রথমে এক ছিলেন, পরে বিভক্ত হইলেন, তাহারও প্রমাণ এই স্থানে পাওয়া যায়। "পুরাণমেকমেবাসীৎ।"

প্রথম পুরাণ, তাহার পর বেদ, এই কথা বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য, পদ্ম ও শিব, এই পাঁচখানি পুরাণে আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলিতেছেন—

উৎপন্নমাত্রস্য পুরা ব্রহ্মণোঽব্যক্ত জন্মনঃ।
পুরাণমেতদ্বেদাশ্চ মুখেভ্যোঽনু বিনিসৃতাঃ॥ ৪৫। ২০

পুরাকালে অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মা উৎপন্ন হওয়া মাত্রই তাঁহার মুখ হইতে এই পুরাণ ও বেদ-সমূহ অনুবিনিঃসৃত হইল। (বঙ্গবাসী সংস্করণে বঙ্গানুবাদে প্রথমে বেদ ও পরে পুরাণ বলা হইয়াছে। ভুল করিয়া না ইচ্ছা করিয়া?)

পুরাণেই পুনঃ পুনঃ বলা হইতেছে প্রকৃতি, ধর্ম্ম, গুণ বা শক্তি-হিসাবে পুরাণ বেদের সমকক্ষ। অনেক পুরাণ নিজেকে বেদ-সম্মিতঃ, বেদৈঃ সম্মিতঃ বলিয়াছেন। বায়ুপুরাণ নিজেকে 'পুরাণ-বেদ' বলিয়াছেন। অনেক পুরাণ নিজেদের শব্দকে ও শ্লোককে সুক্ত বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা বেদকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও আদি বলিয়াছেন আর অনেক পুরাণ নিজেদের আরও বড় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্র শ্রুতির অনুগত, অনেকে

পুরাণকেও স্মৃতিশাস্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত বলেন। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে পুরাণের মহিমা যত জোরেই ঘোষিত হউক, পুরাণকে তৃতীয় স্থান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু, ব্রহ্মপুরাণ ও পদ্মপুরাণে স্পষ্টই বলা হইয়াছে পুরাণশাস্ত্র স্মৃতিশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নহে, স্মৃতিশাস্ত্র হইতে পৃথক্।

ঋগ্বেদের সূক্তসমূহ ঋষিরা দেখিয়াছিলেন। বেদের প্রাধান্যের ইহাই প্রধান কারণ। আর নারদীয় ও বামন, এই দুখানি পুরাণ-ব্যতীত সমুদয় পুরাণই দেবতা বা পরমেশ্বর কর্তৃক কথিত, তাহা হইলে যেন ঋষি অপেক্ষাও মহত্তর স্থান হইতে প্রাপ্ত, পদ্মপুরাণ নিজেকে 'স্বয়ং বিষ্ণু' বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের কথা পরে বলা হইবে।

পুরাণের উপদেশ ও তাহার প্রামাণ্য-সম্বন্ধে দেখা যায় ভগবানের অনুমোদন রহিয়াছে, দেবতারা আসিয়া সকল বিষয়েই উপদেশ করিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে দেখা যায় স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়া ভূগোল-সম্বন্ধে, তীর্থ-সম্বন্ধে, গৌতমীগঙ্গা বা গোদাবরীর মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে বলিতেছেন। ভগবান্ বিষ্ণু মৎস্য ও বরাহ-মূর্তি ধারণ করিয়া মৎস্যপুরাণ ও বরাহ-পুরাণ বলিতেছেন। অনেকস্থলে মহাদেব বলিতেছেন, পার্ব্বতী শুনিতেছেন। সুতরাং এই সব কথায় সন্দেহ করিবার বা এই সব কথার প্রতিবাদ করিবার আর অবসর বা অধিকার নাই। পুরাণপাঠকে যাহারা অসম্মানের চক্ষে দেখিবে তাহাদের পুনঃ পুনঃ নানারূপ নিন্দা করা হইয়াছে। বিষ্ণু-পুরাণে পুরাণবক্তা বা সূত রোমহর্ষণকে মুনি বলা হইয়াছে।

> রোমহর্ষণনামানং মহাবুদ্ধিং মহামুনিম্।
> সূতঃ জগ্রাহ শিষ্যং স ইতিহাসপুরাণয়োঃ॥ ৩। ৪। ১০

লোমহর্ষণের পুত্রকে পদ্মপুরাণে 'জগদ্‌গুরু' বলা হইয়াছে।

পুরাণের সামর্থ্য বা শক্তি সম্বন্ধে পুরাণ-সমূহ যাহা বলিয়াছেন, তাহাও দেখা উচিত। ব্রাহ্মণেরা বেদকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন, বেদের বিরুদ্ধে যিনি কিছু বলিবেন, তিনি নাস্তিক। পুরাণসমূহ নিজেদের আরও উচ্চ, যেন বেদের অপেক্ষা উচ্চতর ও মহত্তর বলিয়া নিজেদের ঘোষণা করিয়াছেন। বায়ু, বিষ্ণু, মৎস্য, বরাহ, ব্রহ্মাণ্ড, পদ্ম ও ব্রহ্ম-পুরাণে প্রমাণ-বচন পাওয়া যাইবে।

পুরাণং বৈষ্ণবঞ্চৈতৎ সর্ব্বকিল্বিষনাশনম্।
বিশিষ্টং সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ পুরুষার্থোপপাদকম্॥ বিষ্ণু ৬।৮—৩

এই বিষ্ণুপুরাণ সর্ববপাপনাশক, সকল শাস্ত্র হইতে ইহা বিশিস্ট ও পুরুষার্থের উপপাদক।

এতত্তে যন্ময়াখ্যাতং পুরাণং বেদসম্মিতম্।
শ্রুতেঽস্মিন্ সর্ব্বদোষোত্থপাপরাশিঃ প্রশাম্যতি॥ বিষ্ণু ৬।৮—১২

বেদসম্মিত এই যে পুরাণ মৎকর্ত্তৃক তোমাকে যাহা কথিত হইল, ইহা শুনিলে সর্ব্ব প্রকারের দোষ হইতে জাত পাপরাশি প্রশমিত হয়।

বর্ণধর্ম্মাদয়ো ধর্ম্মা বেদধর্ম্মাশ্চ কৃৎস্নশঃ।
যেষাং সংশ্রবণাৎ সদ্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ বিষ্ণু ৬।৮—১৭

বর্ণধর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ, বেদধর্ম্মসমূহ সমগ্ররূপে বলা হইল। এই সমুদয় শুনিলে মানুষ সর্ববপ্রকার পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করে।

মানুষের পাপ নাশ করেন, সর্ববিধ সুখ সুবিধা এবং অপবর্গ দান করেন, ব্রহ্মের সহিত ঐক্য দান করেন, বিষ্ণুপদে উন্নীত করেন বলিয়াই শাস্ত্রের সম্মান ও পূজা। লিঙ্গ-পুরাণে আছে, এই সব কার্য্যসাধনে বেদের ও পুরাণের শক্তি সমতুল্য। কিন্তু, পদ্মপুরাণে ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হইয়াছে, এ বিষয়ে পুরাণের শক্তি বেদের অপেক্ষাও অধিক।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের শেষ অংশে আছে অস্টাদশ পুরাণের নাম যে-ব্যক্তি পাঠ করে ও ত্রিসন্ধ্যা জপ করে, তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল সদৃশ ফললাভ হইয়া থাকে।

অশ্বমেধফলং লভেৎ। ১৩৭। ১২

মার্কণ্ডেয় পুরাণ শ্রবণ করিলে

শ্রুতেন নশ্যতে পাপং কল্পকোটিশতৈঃ কৃতম্।
ব্রহ্মহত্যাদি পাপানি তথান্যান্যশুভানি চ॥ ১৩
তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি তুলং বাতাহতং যথা।
পুষ্করস্নানজং পুণ্যং শ্রবণাদস্য জায়তে॥ ১৪

শতকোটি কল্পকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মহত্যাদি পাপ ও অন্যান্য যাবতীয় অমঙ্গল বাতাহত তুলার ন্যায় বিনস্ট হয়। পুষ্করে স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, ইহা শ্রবণ করিলে সেইরূপ পুণ্য হয়।

পুরাণে যে-সব কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে তাহা ক[illegible] অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করার কোনই প্রয়োজন নাই।

ঘৃতপূর্ণপ্রদীপং যে ভক্ত্যা দদ্যাদ্ধরের্গৃহে।
অশ্বমেধসহস্রেণ তস্য কিং বা প্রয়োজনম্॥
অশ্বমেধপ্রকর্ত্তা যঃ স্বর্গং যাতি হরেদিনে।
কার্ত্তিকে দীপদাতা চ স গচ্ছেৎ হরিমন্দিরম্॥ পদ্ম—ব্রহ্মখণ্ড ৩-২৯। ৩০।

যে-ব্যক্তি হরিমন্দিরে ভক্তিপূর্ব্বক ঘৃতপূর্ণ প্রদীপ দেন, সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞে তাহার প্রয়োজন কি? যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তিনি স্বর্গে যান, আর কার্ত্তিকমাসে হরিবাসরে দীপদানকারী হরিমন্দিরে গমন করেন।

ব্রহ্মপর ব্রাহ্মণও পুরাণ শ্রবণ করিবেন; পুরাণের একটিমাত্র উপাখ্যান শুনিলেই ব্রাহ্ম বেদবিৎ হইবেন, পদ্মপুরাণে এমন প্রমাণও রহিয়াছে। পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ডে সুকলা-চরিত্র বর্ণনা করিয়া তাহার উপসংহারে বলা হইয়াছে—

শ্রদ্ধয়া শৃণুয়ান্নারী সুকলাখ্যানমুত্তমম্।
সৌভাগ্যেন সুসত্যেন পুত্রপৌত্রৈশ্চ যুজ্যতে॥
মোদতে ধনধান্যৈশ্চ সহ ভর্ত্রা সুখী ভবেৎ।
পতিব্রতা ভবেৎ সা চ জন্মজন্মনি নান্যথা॥
ব্রাহ্মণো বেদবিদ্ভূয়াৎ ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ।
ধনধান্যং ভবেত্তস্য বৈশ্যগেহে ন সংশয়ঃ॥
ধর্ম্মজ্ঞো জায়তে রাজন্ সদাচারঃ সুখী ভবেৎ।
শূদ্রঃ সুখমবাপ্নোতি পুত্রপৌত্রৈঃ প্রবর্দ্ধতে।
বিপুলা জায়তে লক্ষ্মীর্ধনধান্যৈরলঙ্কৃতা॥

সুকলার এই উপাখ্যান যে-নারী শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে, তাহার সৌভাগ্য, সুসত্য ও পুত্রপৌত্র লাভ হয়; ধন ও ধান্যের দ্বারা তাহার আনন্দ বৃদ্ধি হয় এবং সে স্বামীর সহিত সুখী হয়। সে-নারী জন্ম জন্ম পতিব্রতা হয়, ইহার অন্যথা হয় না। ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ হন, ক্ষত্রিয় বিজয়ী হন, বৈশ্যের গৃহে ধন ধান্য হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। রাজা ধর্ম্মজ্ঞ, সদাচার ও সুখী হন। শূদ্র সুখলাভ করেন, পুত্র ও পৌত্র বাড়িয়া যায়, ধনধান্যে অলঙ্কৃতা বিপুলা লক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে।

বেদ বা বেদের [illegible] দাবী করেন ভগবানের আদেশ তাঁহাদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের তাঁহারই একমাত্র উপদেষ্টা। বেদের বা ব্রাহ্মণের এই দাবী পুরাণ অস্বীকার করেন না, কিন্তু এমন সব কথা বলেন, যাহাতে বেদের এই অধিকারের হানি হয়। পুরাণে তীর্থসমূহের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। বেদের উপদিষ্ট ধর্ম্ম পালন করিলে যে ফল হয়, তীর্থসেবার দ্বারাও সেই ফল হয়, পুরাণোক্ত যোগ, ব্রত, ভক্তি প্রভৃতির দ্বারা আরও অধিক ফল পাওয়া যায়। লিঙ্গপুরাণ গায়ত্রীকে সাধারণ মন্ত্র করিয়াছেন। পুরাণে গায়ত্রী পরিবর্ত্তিতও হইয়াছেন, উপহসিত হইয়াছেন।

এইবার পুরাণবক্তাদের মর্য্যাদার কথা, যাহা নানাপুরাণে কথিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে বেদ ও পুরাণে কিরূপ প্রতিযোগিতা ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। পুরাণে এমন কথা আছে, যে ব্রাহ্মণ বেদ জানেন কিন্তু পুরাণ জানেন না। তিনি বিদ্বানই নহেন। পুরাণ সমুদয় শাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয়। মৎস্যপুরাণ বলিতেছেন—

পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং যদেতন্মূর্দ্ধি সংস্থিতম্।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে, প্রথম স্কন্ধের চতুর্থাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, বেদব্যাস প্রথমে বেদের উদ্ধার করিলেন ও বেদ বিভাগ করিয়া চারিবেদ চারিজন শিষ্যকে শিখাইলেন। ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ। বেদ বিভাগের পরেই এই ইতিহাস ও পুরাণের কথা বলা হইয়াছে। তাহার পর নিন্দিত দ্বিজ, স্ত্রীলোক এবং শূদ্র, ইহাদের বেদে অধিকার নাই, সেইজন্য ইহাদের জন্য মহাভারত রচনা করিলেন। তাহাতেও চিত্তের প্রসন্নতা হইল না, তখন নারদের উপদেশে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র প্রচার করিলেন। এই উপাখ্যান অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবত মহাভারতের পরে। একটা কথা প্রায়ই মনে হয়, পুরাণ আগে কিম্বা মহাভারত আগে? ইহার উত্তর পুরাণেই পাওয়া যায়। মৎস্য পুরাণে পাওয়া যায়—

অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্বা সত্যবতী সুতঃ।
ভারতাখ্যানমখিলম্ চক্রে তদুপবৃংহিতম্॥

এই যে অষ্টাদশ পুরাণ, মৎস্যপুরাণের মতে শ্রীমদ্ভাগবত ইহার অন্তর্গত এবং পঞ্চম স্থানীয়। মৎস্যপুরাণের এই কথা পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী মহোদয় তাঁহার টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন।

যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্মবিস্তরঃ

বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমুচ্যতে ॥

লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমসিংহসমন্বিতম্ ।

পৌর্ণমাস্যাং প্রৌষ্ঠপদ্যাং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥

অষ্টাদশ সহস্রাণি পুরাণাং তৎ প্রচক্ষতে ॥ ৫৩।২০—২২

যে পুরাণে গায়ত্রীকে অবলম্বন করিয়া বিবিধ ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে, এবং যাহাতে বৃত্রাসুর বধ কথা আছে, তাহার নাম ভাগবত। এই পুরাণ লিখিয়া সোনার একটি সিংহের সহিত ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে যিনি দান করেন, তাঁহার পরমাগতি লাভ হয়।

বিষ্ণুপুরাণে বেদ-বিভাগের পরেই পুরাণ-সংহিতার কথা আছে। সেখানেও মৎস্য-পুরাণের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতকে পঞ্চমস্থানীয় বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের একটি শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন, মৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে বলিতেছেন, তুমি মহাভারতে সমুদয় কথা শুনিয়াছ, তবে আবার কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? ইহা পড়িলেই মনে হইবে মহাভারতের পরেই শ্রীমদ্ভাগবত। মহাভারতও বলেন, পুরাণের পর মহাভারত। মহাভারত রচনার পর ব্যাস বলিলেন, তিনি পূর্ব্বেই ইতিহাস ও পুরাণ রচনা করিয়াছেন। মহাভারতে এমন কথা আছে, একজন বৈষ্ণব পুরাণ শ্রবণ করিয়া যে ফল লাভ করিবেন, মহাভারত শ্রবণ করিয়া সেই ফল লাভ করিবেন।

মনোযোগ সহকারে মহাভারত পড়িলে বুঝিতে পারা যায়, পুরাণ হইতে মহাভারতে অনেক কথাই গৃহীত হইয়াছে।

প্রাচীনতম পুরাণ-সংহিতার চারিপাদ—প্রক্রিয়া, অনুসঙ্গ, উপোদ্‌ঘাত ও উপসংহার। তাহার পর পুরাণ পঞ্চলক্ষণ। বিষ্ণুপুরাণে এই পঞ্চলক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়।

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।

সর্ব্বেষ্বেতেষু কথ্যন্তে বংশানুচরিতঞ্চ যৎ॥ ৩—৬।২৫

অষ্টাদশ পুরাণের নাম বলিয়া বিষ্ণুপুরাণ বলিলেন—এই সব পুরাণে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত কথিত হইয়াছে।

পুরাণের বর্ণিত [illegible] বিষয়, ইহা বিষ্ণুপুরাণে আছে। কিন্তু, বিষ্ণুপুরাণের এই বর্ণনার একটু বিশেষত্ব আছে।

সর্গে চ প্রতিসর্গে চ বংশমন্বন্তরাদিষু।
কথ্যতে ভগবান্ বিষ্ণুরশেষেষ্বেব সত্তম॥ ৩-৬।২৭

হে সজ্জন শ্রেষ্ঠ! এই পুরাণে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর প্রভৃতি সর্ব্বত্র ভগবান্ বিষ্ণুর কথাই কথিত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে অষ্টাদশ পুরাণের যে তালিকা আছে, তাহাতে ভাগবতেরও নাম আছে। এই তালিকায় এবং অন্য অনেক পুরাণেরই তালিকায় ভাগবত পঞ্চম স্থানীয়। তাহা হইলে বিষ্ণুপুরাণের মতে শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চলক্ষণ অর্থাৎ এই পুরাণে পাঁচটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু, আমরা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানিতে পারি, এই পুরাণ চক্রবর্ত্তী মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত দশলক্ষণ অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচ্য বিষয় দশটি। ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করাই স্বাভাবিক যে বর্ত্তমান সময়ে শ্রীমদ্ভাগবত যে আকারে আছেন, ইনি চিরকাল সে আকারে ছিলেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের এবং অন্যান্য অনেক পুরাণের আকার ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। কি প্রকারে ও কি কারণে আকারের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে, তাহার আলোচনা না করিলে পুরাণের প্রকৃত তাৎপর্য্য জানিতে পারা যাইবে না। যাহা হউক, পরিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশ হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

এইবার দশলক্ষণ কি, তাহারই আলোচনা করা যাউক। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে বলা হইয়াছে, সর্গ, বিসর্গ, স্থান, উতি, মন্বন্তর ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি, আশ্রয়—পুরাণের এই দশলক্ষণ। দ্বাদশ স্কন্ধে বলা হইয়াছে সর্গবিসর্গ, বৃত্তিরক্ষা, অন্তর বংশ, বংশানুচরিত, সংস্থা, হেতু, অপাশ্রয়,—পুরাণের এই দশ লক্ষণ।

সর্গোঽস্যাথ বিসর্গশ্চ বৃত্তিরক্ষান্তরাণিচ।
বংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ॥
দশভির্লক্ষণৈর্যুক্তং পুরাণং তদ্বিদো বিদুঃ।
কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মন্ মহদল্প ব্যবস্থয়া॥

শেষ শ্লোকটিতে বলা হইল, অধিক ও অল্প ব্যবস্থানুসারে কেহ কেহ বলেন—পুরাণ পঞ্চলক্ষণ।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, মূল পুরাণে বা পুরাণ-সংহিতার বিভাগের পর নানা প্রকারে পুরাণের পরিবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশ হইয়াছে। বেদের সহিত প্রথমাবস্থায় পুরাণের বিরোধ থাকিলেও, শেষে এই বিরোধ দূরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং পুরাণের সাহায্যেই বেদের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক।

জগন্নাথ দাস কীর্ত্তনীয়া সঙ্কলিত

(২)

তুক্

[লীলাগান কীর্ত্তনে, মহাজন পদাবলী ব্যতীত, অনেক ভনিতাহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গান, কবিতা বা শ্লোক, মূল পদাবলীর ভাব-আস্বাদনের সহায়তাকল্পে, বাঁধা-আখররূপে গীত হইয়া থাকে। এই ভনিতাহীন গান বা পদগুলিই 'তুক্' নামে পরিচিত। জগন্নাথ দাস কীর্ত্তনীয়া মহোদয় এইরূপ কতকগুলি 'তুক্' একত্র সংগৃহীত করিয়াছিলেন। সেগুলি এই স্থলে প্রকাশিত হইল। লীলা-বিশেষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন 'তুক্' ও সংগৃহীত করিয়া গিয়াছেন। সেগুলিও ক্রমে প্রকাশিত হইবে।]

কপট কঠিন বড় অহে নাথ নিদয় ঠাকুর ॥
তোমার লাগিয়া হরি। কাতর সকল নারী।
আহীর অবলা জনে। কেন্দে ফিরে বনে বনে ॥
পাথারে ভাসায়ে গেলে। কালিয়া কুটিল বড় ॥
নবঘনশ্যাম বন্ধুয়া হে। এস এস আধ আঁচরে বস, বন্ধুয়া ॥
চারিদিকে গোপীগণ। চান্দে শোভে তারাগণ ॥
চাতকী যেন বারি পেলে। চকোরী যেন চান্দ পেলে ॥
প্রেমের পাথার হৈল ॥
আমি তোমা বই কারু নই। দেখ কত প্রেম উপজই ॥

রাইর অঙ্গুলি ধরি। ভাল নাচে গিরিধারী ॥
চারিদিকে সখীগণ। মাঝে নাচে ঘনশ্যাম ॥
ওনা রূপগো। মধুর শ্রীবৃন্দাবনে ওনা রূপগো ॥
শোভা ভাল বৃন্দাবনে। ও রাস মণ্ডলে ॥
রাধা মাধব আনন্দে ভোর। যমুনায় কেলি করে রাধা দামোদর ॥

॥ রাস সম্পূর্ণ ॥

হরিকে চাহিতে হরি নাম বড় ধন রে ॥
রাধাকৃষ্ণ বল মুখে। জনম যাইবে সুখে ॥
অনেক গুণের হরি আমার ॥
এ গোবর্দ্ধন ধরে যে। তারে মানুষ বলে কে ॥
কানাইরে বলাইরে ॥

রামের তুলনা শ্যাম। শ্যামের তুলনা রাম॥
মা হয়া কোন প্রাণে বিদায় দিলে॥
ঐ রূপ না দেখিয়া আছে ভাল॥
যে দেখেছে একবার। সে কি প্রাণে
জিয়ে আর॥
কিবা তার অঙ্গের ছবি। দেখিলে পাগল হবি॥
পরনারী দেখে প্রাণ ধরিতে নারি॥
পাসরিতে চাই মনে। পাসরা না যায় কেনে॥
শ্যামনবজলধর তনু॥
কিবা সে মুখের হাসি। সুধা খসে রাশি রাশি॥
হেদেগো বিধি পরের অধীন করেছে॥
যদি ব্রজের বালক হৈতাম। নেচে নেচে
সঙ্গে যেতাম॥
নারী জনম যার হবে। পরবশে প্রাণ যাবে॥
হরিকথা বড়ই মধুর। শুনিলে শ্রবণ-সুখ
পাপ যায় দূর॥
হরি ভজ এই বার বার রে॥
ভজ হরি বার বার। জনম না হবে আর রে॥

হরিলীলা কে বুঝিতে পারে। ব্রহ্মা আদি
দেব যার সীমা দিতে নারে॥
হেদে হে অঙ্গমণি। আমার বচন মানি।
যেতে হৈল গোকুল নগরে। রামকৃষ্ণ সহোদরে।
আছয়ে নন্দের ঘরে। শুনেছি (ছেঁড়া)॥
যমুনার তীরে তীরে। ফিরে শিশু লয়ে॥
আজ বড় সুপ্রভাত। গোবিন্দে দেখে।
কংস আমার বন্ধু ছিল। হরি নিতে পাঠাইল।
আর কি এমন হব। হরি দরশন পাব।
যখন ব্রজে এলে। মাকে আমার দেখেছিলে॥
কাল আমরা ব্রজভূম ছাড়িব॥
কিসের বাজনা বাজে গোকুল নগরে॥
একি শুনি অকস্মাৎ। মোর মুণ্ডে বজ্রাঘাত॥
দরিদ্রের হেম যেন। সমুদ্রে হারাল হেন॥
এলাল মাথার বেণী। পরে বেহ্মা হরিণী॥
এলোথেলো পাগলিনী॥
হরি নাকি যাবে মধুপুরী॥
হরি মধুপুরী যাবে। রাধা বলে কে ডাকিবে॥
গোকুলের সম্পদ অবশেষ॥

জগন্নাথ দাস কীর্ত্তণীয়া রচিত

(৩)

বংশী-হরণ

বিরল মন্দিরে বসি লয়া সখিগণে।
বিপিনে বংশীর ধ্বনি শুনিল শ্রবণে॥
ললিতা কহিছে রাই কান্দি অকারণে।
চল সব সখীগণ নিকুঞ্জ কাননে॥

আগে আগে চলে সব চিত্রের পুতলী।
তার পিছু পিছু চলে সখী চন্দ্রাবলী॥
নিকুঞ্জে পাইল গিয়া নন্দের কুমারে।
এস এস বলি শ্যাম রাই নিল ক্রোড়ে॥
রাই অঙ্গ পরসিয়া অবশ হইল।
প্রাণের অধিক বাঁশী পড়িয়া রহিল॥
আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
নিদ্রায় আকুল শ্যাম রহিল সুতিয়া॥
হাসিয়া হাসিয়া তখন রাধিকা সুন্দরী।
অবশ দেখিয়া শ্যামের বাঁশী কৈল চুরি॥
এইরূপে রঙ্গ রসে রজনী বঞ্চিলা।
প্রভাতে উঠিয়া রাই নিজ গৃহে গেলা॥

নিশি অবশেষ দেখি নাগরে জাগায় সখী
ব্যস্ত হৈয়া উঠিল মুরারি।
রবির কিরণ দেখি মনেতে হৈলা সুখী
মোরে কি বলিবে হলধারী॥
হয়েছে গোঠের বেলা রাখাল পেতেছে খেলা
ইহাই ভাবিয়া মনে মনে।
হোথা শ্রীদাম সুদাম দাম সুবল আদি বলরাম
খুঁজিয়া কানাই স্থানে স্থানে॥
বাঁশী পাসরিয়া হরি চলিলেন ধিরীধিরী
যেখানে রাখালগণ মেলা।
দূরে কানাই দেখিয়া শ্রীদাম আইল ধেয়া
বল ভাই কোথা গিয়াছিলা॥
কোথা গিয়াছিলা ভাই ভ্রমি বুলি অনেক ঠাই
মুখ দেখি দুঃখ দূরে গেলা॥

কৃষ্ণ কহিছে মোর বাঁশী কোথা গেল।
না জানি কোথায় গেল, কেবা হরে নিল॥
রাখালে প্রবোধ করি কানাই চলিল।
প্যারীর মন্দিরে গিয়া উপনীত হলো॥
ক্রোধ করিয়া হরি রাধিকারে কয়।
নারী হয়ে বাঁশী হর উচিত না হয়॥
ললিতা কহেন শুন গোপেন্দ্র নন্দন।
পরবৃত্তি কভু নাহি হরে গোপীগণ॥
তাহে সতী কুলবতী আমরা সবাই।
মিথ্যা পরিবাদ দিতে তোহে যুক্তি নাই॥
মিথ্যাবাণী ছাড় তুমি যাহ নিজ গৃহে।
তুয়া বিনু আমরা সে কেহ না লহে॥
ক্রোধ করি রাই গেলা বড়াইর কাছে।
কহে তুয়া নাতি মিথ্যা পরিবাদ দিছে॥
বেণু চুরি কৈল ইহা কহে পুনঃ পুনঃ।
শুনিয়া বড়াই ক্রোধ করি কহে দুন॥

ওহে কৃষ্ণ সত্য আমি জানিলাম সকল।
রাইরে বিড়ম্ব তুমি কর মিথ্যা ছল॥
বংশী চুরি করি নিলে তোমার নাতিনী।
জোর করি নাহি দিবে বুঝি অনুমানি॥
শুনিয়া বড়াই তবে পুছয়ে রাইরে।
সত্য নাকি তুমি কৃষ্ণের বংশী চুরি কৈলে॥
রাই কহে শুন আই এই বৃন্দাবনে।
কাষ্ঠ কি মাহাত্ম্য হলো বুঝিতে কারণে॥
এক হস্ত বংশী কাষ্ঠ হরিয়া লইল।
তোমার প্রতীতি এই ধূর্ত্তবাক্যে হৈল।

বেণু চুরি করি যদি না লইলে তুমি।
তবে তার বাক্যে হাসি কহ কেন বাণী॥
শুনিয়া বড়াই কহে আক্রোশ করিয়া।
শুনহে চঞ্চল কৃষ্ণ শুন মন দিয়া॥
অভিমন্যু ভার্য্যা এই রাধিকা সুন্দরী।
তুয়া বন্দনীয় হয় গৌরব আচরি॥
বড়াইর কথা শুনে হেসে সখীগণ।
এ-সব সুখের কথা জে জানে মরম॥
বড়াই বলেন শুন নাগর কানাই।
তোমার চাপল্যে নন্দ রহে দুঃখ পাই॥
অনেক ভর্ৎসয়ে তোহে দেখহ যাইয়া।
যেখানে তৎকাল যাও গোমণ্ডল লয়া॥

কৃষ্ণ কহে শুন আই বেণু না পাইলে।
যাইতে না পারি আমি আপনার ঘরে॥
যদি বা না যাও তুমি এ স্থান ছাড়িয়া।
তবে মোর দোষ নাই কহিল ডাকিয়া॥
কংস পাশে যাব মধুপুর কত দূরে।
যাইয়া সকল তারে কহিব গোচরে॥
নাতিনী লইয়া আমি রাজসভা যায়া।
কহিব রাজার আগে সব বিবরিয়া॥
বড়াই সহিত রাই ফিরে এল ঘরে।
বাঁশী না পাইয়া শ্যাম গেল বাথানেরে॥

হেথা গোকুল যুবতীগণ গৃহকর্ম্ম কাজ।
সচ্ছন্দে করুক এবে গুরুজন মাঝ॥
ধূর্ত্তবেণু নাই আজ পীতাম্বর করে।
শুনি রাই স্মিত মনে কহিল বংশীরে॥

বংশীরে লইয়ে কহে উপলক্ষ কথা।
আজি যে কহিয়ে বংশী শুনহ সর্ব্বথা॥
সৎবংশে জন্ম তুয়া সরল স্বভায়।
পুরুষোত্তম হস্ততলে বাসস্থান হয়॥
ললিতা কহেন ইহার অদভুত কাজে।
বায়ুমুখী কৈলে বাঁশী আপনি সে বাজে॥
ইহা শুনি সুধামুখী কহয়ে তখন।
পরখিয়া জানি দেখি তোমার বচন॥

ইহা কহি কৈলা রাই বংশী বায়ুমুখী।
শব্দ করে বংশী শুনে ললিতা সুমুখী॥
বিশাখা কহয়ে গান শুনাহ রাধিকা।
কুলবতীর কুলনাশে এই মুরলিকা॥
ললিতা কহয়ে বংশী করহ শ্রবণ।
যাবত না জানে কেহ পরিবারগণ॥
হেথা সে জটিলা আইলা বংশীধ্বনী শুনি।
কৃষ্ণ হেথা আইলা বলে মনে অনুমানি॥
হেনকালে রাই হাতে দেখিল মুরলী।
মনে বিচারয় অতি হইয়া ব্যাকুলি॥

দুর্ব্বিনীতা গোপ-কন্যা ছাড়হ মুরলী।
কাড়িয়া লইল বাঁশী এই বোল বলি॥
জটিলা মুরলী লয়া কহিতে লাগিল।
ভাল হৈল বংশী আজ বধূ হাতে পাইল॥
বড়াইর স্থানে ইহা দেখাইব লয়া।
না লয় বচন মোর প্রমাণ করিয়া॥
ইহা শুনি বৃন্দাদেবী করিলা গমন।
বড়াইর স্থানে কহে বংশী-বিবরণ॥

বড়াই বলেন সখী প্রমাদ হইয়াছে।
রাই হাতে ছিল বাঁশী জটিলা পায়াছে ॥
বৃন্দা কহে বড়াই চিন্তা না করিহ।
কাড়িয়া আনিব বাঁশী নিশ্চয় জানিহ ॥

বড়াইর স্থানে বৃন্দা বিদায় হইয়া।
মর্কটীরে পাঠাইল বাঁশীর লাগিয়া ॥
মর্কটী বিদায় হৈয়া গেলা ধাওাধাই।
জটিলার মন্দিরে আজ ছেনা ননী খাই ॥
হেথা সে ললিতাদেবী সভয় মানিয়া।
জটীলাকে কহে কিছু প্রণত হইয়া ॥
কালিন্দী কিনারে বাঁশী পড়িয়া পাইলাম।
আনিয়া রাধিকা হাতে সমর্পণ কৈলাম ॥
শুনিয়া জটিলা কহে সরস বচন।
থাক থাক দুর্মন্ত্রিণী চপলারগণ ॥
সেই স্থানে হেনকালে সুবল আইলা।
আসিয়া কহয়ে কিছু শুনহ জটিলা ॥

দেখহ মাখন-চোরা মর্কটী যাইয়া।
মাখন খাইছে তুয়া গৃহে প্রবেশিয়া ॥
শুনিয়া সুবলের কথা জটিলা কহয়।
সত্যবটে সুবল মর্কটী এসে খায় ॥
মর্কটী বাহির হৈয়া যাইবার কালে।
মুরলী ফেলায়া বৃদ্ধা মর্কটীরে মারে ॥
মুরলী লইয়া সেই মর্কটী পলায়।
মর্কটীর হাতে বাঁশী বৃন্দাদেবী পায় ॥

মর্কটীর স্থানে বৃন্দা মুরলী লইয়া।
রাধিকার হাতে দিল হাসিয়া হাসিয়া ॥
শ্যামের হাতের বাঁশী চিত্রা হরে নিলে।
তাহার অধিক দুঃখ ঘরে এসে দিলে ॥
ললিতার সঙ্গে রাই মনে বিচারয়।
এই বাঁশী আর মেনে রাখা ভাল নয় ॥
ললিতা কহে শ্যামের বাঁশী কোথায় রাখিব।
বাঁশী লয়া চল যাই নাগরে ভেটিব ॥

শ্রীহরি সোঙরি করি বৃকভানু কিশোরী
মুরলী লইয়া নিজ হাতে।
আনন্দে আকুল চিত অঙ্গ ভেল পুলকিত
নব নব রঙ্গিনী সাথে ॥
বলয়া কিঙ্কিনী ঘন বাজিতে লাগিল।
জয় জয় দিয়া বৃন্দাবন প্রবেশিল ॥
শ্যামের মুরলী লয়া নিজ মুখে বায়।
এসহে এসহে কুঞ্জে এস শ্যামরায় ॥
হোথা নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে মদন মোহন।
ধ্বনি শুনি চমকিয়া উঠিল তখন ॥
এস এস সুবদনি প্রাণেশ্বরী রাধা।
তো বিনে রহিতে নারি তুমি প্রাণের আধা ॥
নব জলধর যেন বিজুরী ঝাঁপিল।
শরতের চাঁদে যেন রাহু গরাসিল ॥
(—বঃ লাঃ পুঃ ২৪৩৪)।
"বংশীহরণ-সমাপ্ত"

শ্রীশিবরতন মিত্র

(৪)

বংশীহরণ-তুক্

বংশীরব শুনি কানে। ধারা বহে দু'নয়নে ॥
সখী কর ধরাধরি। মাঝে লয়া রাই কিশোরী ॥
শ্যাম কোলেতে বসিলা প্যারী। চামর ঢুলায় সব সহচরী ॥
শ্যাম রাই পরশে। আনন্দ সাগরে ভাসে ॥
অবশ হইল তনু। পড়িয়া রহিল বেণু ॥
অচেতন নিদ্রা-ঘোরে। বাঁশী অমি ধূলায় পড়ে ॥
শশী মুখী হাসি হাসি। চুরী কৈল শ্যামের বাঁশী ॥
বাঁশীটি অঞ্চলে ভরি। লয়া গেল রাই কিশোরী ॥
বল উপায় কি করি। বাঁশী ছাড়া রইতে নারি ॥
নাগর বলে হাসি। চুরি কৈলে আমার বাঁশী ॥
মনে লাজ না বাসিলে। নারী হয়া বাঁশী চুরি কৈলে ॥
আমরা কুলবতী নারী। পরধন নাহি হরি ॥
তোমার কথা শুনে লাগে ব্যথা। বাঁশী ফেলে তুমি এলে কোথা ॥
বাঁশীতে কি ফল হয়। বাঁশী বইত ধন নয় ॥
অপবাদ দেয় কালা যত। তোমার নাতি তেই সইলাম এত ॥
বড়াই বলে ক্রোধ করি। মিছে বাদ কেন দাও হরি ॥
বড়াই বলে ভাল ভাল। চোরের বাঁশী চোর নিল ॥
তুমি বুঝ উহার কথার ছান্দে। চুরি করি আমার জোর বান্ধে।
কথা শুনে লাগে ভয়। লয়া থাকত দিতে হয় ॥
রাই বলে আই আই। শুনে লাজে মরে যাই ॥
ভেবে স্থির করিলাম মনে। চোর নইলে হাসে কেনে ॥
হেদে হে নন্দের বেটা। চোর বল এত বুকের পাটা ॥
শ্যামের বাঁশী চুরী গেল। চুরি করি রাই সাধু হলো।

বাঁশী হরি নিল জোরে। কেমন করে আমি যাব ঘরে॥
যাব রাজা কংসের পাশ ঘুচাব ব্রজের বাস॥
আমরা কংসের কাছে যাব। নাগরালি তোর ভেঙ্গে দিব॥
শ্যামের বাঁশী গেল চুরি। অন্তরে ভাবে মুরারি॥
আর বাঁশী বাজিবে না। বনে যেতে হবে না॥
এখন গৃহে কাজ কর বসে। বাঁশী নাই বাজবে কিসে॥
বাঁশী তুমি বাজ মনের সুখে। আমরা মরি মনের দুঃখে॥
বাঁশীর সৎবংশে জন্ম বটে। তোর রব শুনে প্রাণ কেন্দে উঠে॥
এ বাঁশীর এম্নি গুণ আছে। না বাজালে এ আপনি বাজে॥
এসো গো ললিতা সখী। কেমনে আপনি বাজে পরখিয়ে দেখি
প্যারী বাঁশীটি লইল হাতে। বাঁশী বাতাসে আপনি বেজে উঠে॥
বিশাখা কহে হাসি হাসি। কুলবতীর কুল নিল এই বাঁশী॥
প্যারী নিভৃতে এ বাঁশী রাখিবে। যখন মনে হবে তখন বাজাইবে॥
হায় হায় মরি লাজে। ঘরের ভিতর কেন বাঁশী বাজে॥
বাঁশী পেলি তুই কার ঠাঁঞি। বুঝি বুকে তোর ভয় নাঞি॥
কৃষ্ণ গেল কোন্ পথে। বাঁশী কেন দেখি তোর হাথে॥
বড়াইর কাছে যাব। বাঁশী লয়া তারে দেখাইব॥
বড়ই প্রমাদ হলো। প্যারীর হাতের বাঁশী জটিলা নিল॥
নিশ্চয় জানিহ তুমি। শ্যামের বাঁশী এনে দিব আমি॥
প্যারী ভাল মন্দ জানে না। সে বাঁশীর কথা কানেও শুনে না॥
বাঁশী পড়েছিল যমুনার পথে। আমি এনে দিলাম রাধার হাতে॥
তোদের ঘরে গুরুজনার কাছে। সাজায়ে দিব যাহা মনে আছে॥
কোথা হতে মর্কটী এসে। মাখন খায় সকল ঘর ঢুকে॥
মুরলী ফেলায়ে মারে। মর্কটী লয়া যায় দুরে॥
বাঁশী পেলে মর্কটী স্থানে। আনন্দিত বৃন্দা হলো মনে॥
বৃন্দাদেবী হাসি হাসি। প্যারীর হাথে দিল শ্যামের বাঁশী॥
বরং শ্যামের হাতে ভাল ছিলে। কিন্তু ঘরে এসে বড় দুঃখ দিলে॥
এ বাঁশী রাখা ভাল নয়। ভয় হয় পাছে কেড়ে নয়॥

বৃন্দাবনের সভা দেখি। আনন্দিত রাই চন্দ্রামুখী ॥
প্যারী বাঁশীতে পুরিয়া গান। ডাকে এসহে রসিক শ্যাম ॥
অকস্মাৎ মুরলী শুনি। চমকি উঠে নাগর গুণমণি ॥
শ্যাম কোলে বিনোদিনী। নবীন মেঘে যেন সৌদামিনী ॥

বংশীহরণ-তুক সমাপ্ত

(—রঃ লাঃ পুঃ ২৪৩৪)

শ্রীশিবরতন মিত্র

প্রেম

'প্রেম-ভক্তি' অপেক্ষা কেবল প্রেমকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহা রায় রামানন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সাধ্য নির্ণয় সম্বন্ধে কথোপকথনে বলা হইয়াছে। প্রেম-ভক্তির সহিত সম্মান ও উৎকর্ষ বোধ থাকে এবং বিধি নিয়মের বন্ধন থাকে। ভক্তিতে ভয়ের ভাবও আছে। কেবল প্রেমে সঙ্কোচ বোধ মর্য্যাদা বোধ এবং বিধিনিয়মের বন্ধন থাকে না। প্রেমিকের যাবতীয় কর্ম্মই প্রেমাস্পদের আনন্দের জন্য। কর্ম্মের ভালমন্দ বিচার, জাতি লজ্জা ভয়, শাস্ত্রের নিষেধ প্রভৃতি কোনদিকেই তাহার লক্ষ্য থাকে না। তাহার যখন মনে হইবে যে এই কর্ম্ম করিলে তাহার প্রেমাস্পদের আনন্দ হইবে, তখন সে সামাজিক নিয়ম, শাস্ত্রের অনুশাসন—কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া সেই কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ইহাকেই ভক্তিশূন্য প্রেম বলে।

দাসভাবে সেবা করিয়া প্রভুকে যে আনন্দ দেওয়া যায়, তাহাকে দাস্য-প্রেম বলে। সখাভাবে সেবা করিয়া সখাকে যে আনন্দ দেওয়া যায় তাহাকে সখ্য-প্রেম, পিতামাতাভাবে সেবা করিয়া সন্তানকে যে আনন্দ দেওয়া যায় তাহাকে মাতৃপিতৃ-প্রেম, সন্তানভাবে সেবা করিয়া পিতামাতাকে যে আনন্দ দেওয়া যায় তাহাকে বৎস-প্রেম, ভাইভগ্নীভাবে সেবা করিয়া ভাইভগ্নীকে যে আনন্দ দেওয়া যায় তাহাকে ভ্রাতৃভগ্নী-প্রেম, কান্তাভাবে সেবা করিয়া কান্তকে যে আনন্দ দেওয়া যায় তাহাকে কান্ত-প্রেম বলে। এইরূপে নানাভাবে প্রেমের বিকাশ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে ৫টী প্রধান ধরা হইয়াছে যথা:—দাস্য,

সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা কান্তা-প্রেম। কান্তা-প্রেমের ভিতর দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য প্রেম আছে। সেইজন্য কান্তা প্রেমই সর্ব্বোচ্চ।

'অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধব নারদৈঃ॥'

অন্যের উপর ভালবাসাকে 'মমতা' বলে এবং বিষ্ণুর উপর ভালবাসাকে 'প্রেম' বলে। ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, ও নারদ এই প্রেমকে 'ভক্তি' বলেন।

পিতামাতার ভালবাসা, সন্তানের ভালবাসা, স্বামীস্ত্রীর ভালবাসা, বন্ধুবান্ধবের ভালবাসা, প্রভু-ভৃত্যের ভালবাসা আত্মীয়স্বজনের ভালবাসা—এমন কি মনুষ্যের উপর, স্বদেশের উপর পশুপক্ষী প্রভৃতি জীবের উপর যে-ভালবাসা, তাহা প্রেম নয়—কেবল মমতা বা মায়া। প্রেমের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াই ভারত শৌর্য্যবীর্য্য স্নেহমমতা, দয়া, ক্ষমা, ভালবাসা, স্বদেশপ্রীতি প্রভৃতি সদগুণ সকল হারাইয়া দীন হইয়াছে।

ভগবান প্রেমময়। তিনি দয়া করিয়া সেই প্রেমের কণা জীবকে দিয়াছেন নিজেকে আনন্দিত ও অন্যকে আনন্দিত করিবার জন্য। তাঁহার দান কৃতজ্ঞহৃদয়ে গ্রহণ করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করাই জীবের কর্ত্তব্য। মায়াবাদিগণ ভগবানের এই দয়ার দান কৃতজ্ঞহৃদয়ে গ্রহণ করা দূরের কথা, তাঁহাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত। অভাব দূর করা দানের উদ্দেশ্য, ইহা তাঁহারা ভুলিয়া যান। ইহাদিগের মতে ভগবানকে প্রভু, সখা, বৎস বা কান্ত ভাবিয়া সেবা করিয়া যে আনন্দ দেওয়া যায়, তাহাকেই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা কান্তা-প্রেম বলে।

দাস্য-প্রেম পর্য্যন্ত জীবের অধিকার। ঐশ্বর্য্য জ্ঞান থাকিতে জীবের সখ্য, বাৎসল্য বা কান্তা-প্রেম হইতে পারে না। আমি ভগবানের পূজা করিতেছি, সেবা করিতেছি, তাঁহার জন্য মালা গাঁথিতেছি, তাঁহার জন্য চন্দন ঘষিতেছি, তাঁহার পূজার জন্য ফুল তুলিতেছি—এইরূপ ভগবান জ্ঞান থাকিতে সখ্য, বাৎসল্য বা কান্তা প্রেম হইতে পারে না। যাঁহারা কোন বিশিষ্ট রূপ ও আকার বিশিষ্ট ভগবানের পূজা করেন, অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট বিগ্রহকে ঈশ্বর বলিয়া ভজনা করেন, তাঁহাদের সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তাপ্রেম বা ব্রজপ্রেম হওয়া অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে বাল্যলীলা করিয়াছিলেন, ব্রজ-বালকগণ তাঁহার সখা ছিলেন, নন্দযশোদা পিতামাতা ছিলেন, গোপীগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে কান্তভাবে ভালবাসিতেন। এই সকল ভাব স্বাভাবিক। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান ভাবিলে চরণ ধারণ করাইতে পারিতেন না, নন্দ বাধা বহন করাইতে, কিম্বা যশোদা রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিতে পারিতেন না এবং ব্রজবালকগণ উচ্ছিষ্ট ফল দিতে এবং কাঁধে চাপিতে সাহস করিত না। ঈশ্বর-জ্ঞান থাকিতে এ-সকল প্রেম হইতে পারে না। ভগবানকে মুখে সখা বলিয়া, সন্তান বলিয়া, বা প্রাণনাথ বলিয়া ডা

সহজ বটে ; কিন্তু সখা, পুত্র বা স্বামীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করা যায়, তাহা ভাবরাজ্যেও হইতে পারে না, যতক্ষণ ঈশ্বর-জ্ঞান থাকিবে। সেইজন্য ব্রজভাব জীবের অসম্ভব, অর্থাৎ ব্রজভাব জীবের স্বভাব হইতে পারে না, যতক্ষণ ভগবানকে কোন বিশিষ্ট বিগ্রহ মূর্ত্তি ভাবা যাইবে।

যাঁহাদের ঈশ্বর স্বরূপে রূপ মিশাইয়া আপনি নিরাকার, যাঁহারা বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের পূজা করেন, যাঁহারা জানেন যে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়া জগতেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যাঁহারা সর্ব্বজীবে এবং স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বত্র আত্মাস্বরূপ ঈশ্বরের অধিষ্ঠান অনুভব করেন, যাঁহারা জগতের সেবাকে ঈশ্বর-সেবা বলিয়া বিশ্বাস করেন—তাঁহারা কখন আত্মস্বরূপ অন্তর্যামীর সেবায়, কখন ও প্রভুরূপী ঈশ্বর-সেবায়, কখন সখারূপী ঈশ্বর-সেবায়, কখনও সন্তানসন্ততিরূপী ঈশ্বর-সেবায় কখনও কান্তাকান্ত-রূপী ঈশ্বর-সেবায়, কখন ও ভাইভগ্নিরূপী ঈশ্বর-সেবায়—এইরূপ নানাভাবে বিশ্বরূপের সেবায় নিযুক্ত থাকেন। ইহাই জীবের সহজ এবং স্বাভাবিক ভাব। এই ভাবে বিভাবিত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমে ক্রমে হিংসা দ্বেষ দূর হয়, আত্মপর ঘুচিয়া যায় এবং বিশ্বপ্রেম লাভ হয়। এই প্রেম অতি দুর্ল্লভ—বহুজন্মের সাধনার ফল। বিশ্বপ্রেমিকই ভক্তশ্রেষ্ঠ।

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষভাগবতোত্তমঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত)
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগ যুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"
(গীতা)
'যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥'
(গীতা)

প্রেমেই দুঃখময় জগৎকে সুখময় করে। প্রেমই আমাদিগকে সেবাকার্য্যে প্রণোদিত করে। প্রেমই পিতৃমাতৃহৃদয়ে স্নেহরূপ—স্বামীস্ত্রীর হৃদয়ে প্রণয়রূপ—সন্তানসন্ততির হৃদয়ে ভক্তিরূপে আবির্ভূত হয়। প্রেমই জগতের দুঃখ নিবারণ জন্য দয়ারূপে দেশভক্তের হৃদয়ে উদয় হইয়া তাঁহাকে অমিত বলে বলীয়ান করে। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, খৃষ্ট, মহম্মদ শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি অবতারগণ এই প্রেমই জগতে বিলাইয়া গিয়াছেন।

(বৈষ্ণব—বিষ্ণুর অপত্য, জীব)

জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন।
ইহা বই ধর্ম্ম নাই শুন সনাতন॥

ইহার মূল কারণ প্রেম।

পরকীয় বা গোপীপ্রেম।

'পরবাসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবস্বাদয়ত্যন্তর্নব সঙ্গ রসায়নম্॥'

(বশিষ্ট রামায়ণ)

পরপুরুষে অনুরক্তা নারী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকিয়াও পরপুরুষসঙ্গরস অন্তরে অন্তরে আস্বাদন করিয়া থাকে। শ্রীরূপসনাতন যখন গৃহী ছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহাদিগকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন। গৃহীদিগের পক্ষে এই উদাহরণ অতুলনীয়। গৃহকর্ম্ম করিয়াও যে ঈশ্বরভজন হয় ইহারই চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। বোধহয় উপরোক্ত শ্লোক হইতে বৈষ্ণব কবিগণের পরকীয় প্রেমতত্ত্বের অঙ্কন হইয়াছে। যাহাই হউক, এসম্বন্ধে একটু বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক; কারণ এসম্বন্ধে সাধারণের ধারণা নানারূপ।

যে প্রেমে বাধা বিঘ্ন নাই এবং বিরহ নাই তাহার প্রাবল্য কম। বাধা বিঘ্ন এবং বিরহই প্রেমে প্রাবল্য আনয়ন করে এবং নানারূপ ভাবের সৃষ্টি করে। বিরহের পর মিলনে অধিকতর আনন্দ হয়। স্বামী স্ত্রীর মিলনে কোন বাধা বিঘ্ন থাকে না এবং বিরহ নাই বলিয়া দম্পতি-প্রণয় স্বাভাবিক ভাবেই থাকে। যদি কোন পরস্ত্রী পরপুরুষে অনুরক্তা হয়, তাহাদের মিলন কদাচিৎ বহুকষ্টে হইয়া থাকে। কারণ মিলনের বাধা বিঘ্ন অনেক—লোকলজ্জাভয়, গুরুজনভয়, সাংসারিক কাজকর্ম্ম ইত্যাদি। বহুকষ্টের মিলনে বহু আনন্দই হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, মিলনের জন্যে উভয়েই সর্ব্বদা উপায় চিন্তা করে বলিয়া উভয়েরই উভয়কে সর্ব্বদা স্মরণ হয়। পরকীয়-প্রেমের গভীরতা লক্ষ্য করিয়াই বৈষ্ণব কবিগণ পরকীয়-প্রেমের উদাহরণ দ্বারা প্রেমতত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন। ইহার অবৈধতার দিকে যে তাঁহাদিগের লক্ষ্য ছিল না, তাহা নহে। তাঁহারা ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন যে, শ্রীবৃন্দাবনতত্ত্ব ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্পূর্ণ অবগত না হইয়া যেন কেহ এই নিগূঢ় প্রেমতত্ত্বের আলোচনা না করেন, এমন কি, ইহা শ্রবণেও তাঁহার অধিকার নাই।

শ্রীকর্ণপুর প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের গ্রন্থে শ্রীবৃন্দাবনের পরিমাণ এবং গোপগোপীগণের সংখ্যা যেরূপ আছে, তাহাতে অখিল ব্রহ্মাণ্ডকেই শ্রীবৃন্দাবন ধরা হইয়াছে। হৃদয় ও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, সেইজন্য হৃদয়ও শ্রীবৃন্দাবন।

এখন বৈষ্ণবগণের উপাস্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে শাস্ত্রে কি বলিয়াছে দেখা যাউক।

'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম্॥' (ব্রহ্মসংহিতা)।

ঈশ্বর সকলকে আপনার দিকে আকর্ষণ করেন বলিয়া তিনি কৃষ্ণ। জীব ভাল মন্দ যখন যে কর্ম্ম করে সে ভগবানকে ডাকে—যখন সাধু সৎকর্ম্ম করিতে যান তিনি ভগবানকে ডাকেন আবার যখন অসাধু কোন অসৎকর্ম্ম করিতে যায় সেও ভগবানকে স্মরণ করে—আমাদের অভাব অভিযোগ তাঁহাকে না জানাইয়া আমরা থাকিতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে সর্ব্বদাই যে আকর্ষণ করিতেছেন; তাঁহাকে স্মরণ না করিয়া কি আমরা থাকিতে পারি? শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দের বিগ্রহে রক্তমাংসের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। তিনি অনাদি, আদি, গোবিন্দ এবং সর্ব্বকারণের কারণ। দেশকাল পাত্রের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই।

'কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম॥
অন্তরঙ্গা বাহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি সভার উপরে॥
সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥' (চরিতামৃত)

'ললিতমাধব' ও 'বিদগ্ধ মাধব' নামক নাটক লিখিত হইবার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীরূপ গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন:—

'কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে॥'
(চরিতামৃত)

'কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি॥'

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা নিত্য। কোন যুগের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই।

শ্রীরাধার স্বরূপ:—

'কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥

সুখ-রূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ—তার 'প্রেম' নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার—'মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাবরূপা—রাধা ঠাকুরাণী॥
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার॥
মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তার কায়ব্যূহ রূপ॥

ভগবানে ভোগ্য-ভোক্তভাব আছে। তিনি উক্তভাব বিবর্জ্জিত কেবল ব্রহ্মস্বরূপ নহেন। ইহাই বৈষ্ণব কবিগণের মত। তিনি নিজে আনন্দস্বরূপ হইয়াও সর্ব্বদা সেই আনন্দের উপভোগ করিয়া থাকেন এবং জীবকেও উপভোগ করাইয়া থাকেন। ভগবানের এই স্বভাবের নাম হ্লাদিনী শক্তি। এই শক্তি জীবের হৃদয়ে (জীবাত্মায়) প্রেমরূপে বিকশিত হইয়া দুঃখময় জগৎকে আনন্দময় করে। বৈষ্ণব দার্শনিক কবিগণ এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া প্রেমময়ী শ্রীরাধার চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। শ্রীরাধা চিন্ময় শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময়ী হ্লাদিনী শক্তির সারাংশ, বিশ্বজনীন প্রেম বা মহাভাব। ভাব অনন্ত। তন্মধ্যে আটটীকে প্রধান ধরা হইয়াছে :—

'আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽর্থ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থ নিবৃত্তিঃস্যাৎ ততোনিষ্ঠাকচিস্ততঃ॥
অথাসক্তি স্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎক্রমঃ॥'

ইহারাই ললিতাদি অষ্টসখী—মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধার সমাশ্রিতা। এই মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাকে লইয়াই পরকীয় প্রেম।

বৈষ্ণব কবিগণের এই ব্রজলীলা চিন্ময়। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। শ্রীরাধা নন্দ যশোদা, গোপগোপী আয়ান জটিলা কুটিলা প্রভৃতি সকলই শ্রীকৃষ্ণের ভাব বা শক্তি। ইহার মধ্যে রক্তমাংসের কোন সম্বন্ধ নাই। এই লীলা অনন্ত, অনাদি ও নিত্য।

নররূপে অবতার শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বাল্যলীলা মাত্র। ইহা সম্পূর্ণ নরলীলা। ইহাতে এমন কিছুই অলৌকিক বা লৌকিক থাকিতে পারে না, যাহাতে লোকসমাজে কুশিক্ষা আনিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ রূপে গুণে অদ্বিতীয় ছিলেন, তিনি ব্রজবাসীগণের এবং ব্রজের সকলের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁহাকে তিলেক না দেখিলে তাঁহারা জগৎ শূন্য মনে করিতেন। তিনিও সকলকে প্রাণসম ভাল বাসিতেন।

'যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

(গীতা)

অধর্ম্মের নাশ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য ভগবান সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন। কোন অবতার পুরুষ এমন কোন কর্ম্ম করেন না, যাহার দৃষ্টান্তে জীবকে ভ্রান্তপথে লইয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে। তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম জীবের শিক্ষার জন্য। তাঁহার কর্ম্ম জীবের শিক্ষার আদর্শস্থল হইবে। এই অবৈধ পরকীয় প্রেমের দৃষ্টান্ত তিনি কখনই জীবকে দিয়া যান নাই।

এ সম্বন্ধে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীদামোদরের কথা উল্লেখযোগ্য। শ্রীদামোদর শ্রীচৈতন্য-দেবকে কোন এক উড়িয়া বালককে প্রেম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কারণ উক্ত বালকের মাতা সুন্দরী বিধবা যুবতী ছিলেন। ভগবান শ্রীচৈতন্য স্বতন্ত্র হইয়াও নিজ পদমর্য্যাদা রক্ষার জন্য ও লোকশিক্ষার জন্য শ্রীদামোদরের কথা শুনিয়াছিলেন এবং উক্ত বালককে নিকটে আসিতে দিতেন না—

'অন্যোপদেশে পণ্ডিত কহে গোসাঞির ঠাঁই।
গোসাঞি গোসাঞি এবে জানিব গোসাঞি॥
এবে গোসাঞির গুণ যশ সবলোকে গাইবে।
তবে গোসাঞির প্রতিষ্ঠা পুরুষোত্তমে হৈবে॥
শুনি প্রভু কহে—কাহা কহ দামোদর।
দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
স্বচ্ছন্দ আচার কর কে পারে বলিতে।
মুখর জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে॥

পণ্ডিত হইয়া মনে বিচার না কর।
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীত কেন কর ?
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী ॥
তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোকের কানাকানি বাতে দেহ অবসর ॥
এত বলি দামোদর মৌন করিলা।
অন্তরে সন্তোষ গোসাঞি হাসি বিচারিলা ॥
ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ।
দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ ॥

(চরিতামৃত)

অবতার পুরুষগণ লোকশিক্ষার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হন।

বৈষ্ণব কবিগণের লিখিত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাকে নরলীলা মনে করিয়া অনেক ভক্ত বৈষ্ণব পথভ্রষ্ট হইয়াছেন এবং হইতেছেন। বৈষ্ণব জাতি বলিয়া একটি জাতি সৃষ্টি হইয়াছে, যাহারা পরকীয় প্রেম ভিন্ন স্বকীয় প্রেম ভালবাসে না। এইসব দেখিয়াও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেন যে ব্রজলীলার নিগূঢ় তত্ত্ব সরলভাবে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে সাহস করিতেছেন না, ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়।

ঈশ্বর গুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হন। গুরু দুইরূপ—শিক্ষাগুরু আর দীক্ষাগুরু। ঈশ্বরের সহিত পরকীয় প্রেমে দোষ নাই ইহা শাস্ত্রে বলিতেছে, সুতরাং গুরুর সহিত পরকীয় প্রেমে দোষ নাই, বিশেষতঃ পরকীয় প্রেমেই ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন—এইরূপ সিদ্ধান্ত দেখাইয়া কত যে অজ্ঞা অবলার সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা কি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ দেখিতে বা শুনিতে পাইতেছেন না? হে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, জগৎ জাগিয়াছে আর ঘুমাইবার সময় নাই—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত'—জগৎকে মধুর ব্রজলীলার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝাইয়া দাও। পরকীয় প্রেমের উদাহরণ দ্বারা যে প্রেমতত্ত্ব বর্ণন করা হইয়াছে ইহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া দাও। আর জগৎকে বুঝাইয়া দাও যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ একাত্মাপরমপুরুষ শ্রীভগবান, যিনি জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের পতি এবং বুঝাইয়া দাও যে শক্তি বা প্রকৃতি ছাড়া পুরুষ নাই, অথবা ভগবান সগুণ।

জামসেদপুর
বৈশাখ ১৩৩৫

শ্রীশশিভূষণ সেনগুপ্ত।

সন্ন্যাসের শিক্ষা

শ্রীনন্দনন্দন ব্রহ্মচারী

সেতারস্কন্ধে অপরিচিত সন্ন্যাসী রাজপথে গাহিয়া চলিয়াছেন,—

"বিরাগের বৈরাগী নয় রে অনুরাগের সন্ন্যাসী,
অনুরাগের অরুণ বসন রাগে হয় নাই পরবাসী !"

সন্ন্যাসীর কণ্ঠ কিন্নরের, কান্তি কন্দর্পের; বয়স তরুণ, বসন অরুণ; স্বর প্রেমে টলমল, নেত্র জলে ছলছল !

ত্রিতল বাতায়নে রাজকুমারী শিহরিয়া উঠিলেন। নীল রেশমী পর্দাখানি সরাইয়া যৌবন-ঢলঢল গৌরবর্ণ মুখখানি বাড়াইয়া দিলেন।

সন্ন্যাসী গাহিতেছিলেন,

"নয়ন দুটি জলে ভরা
মরম ব্যথা যায় যে ধরা
ও কা'র গভীর প্রণয় নিবিড় হ'য়ে পড়্‌ল মূর্ত্তি উদাসী।"

রাজকুমারী মুখ বাড়াইয়া আর ফিরাইতে পারেন নাই। নয়নে ও মনে সমান তন্ময় হইয়া দৃষ্টিপথ অতিক্রমোন্মুত সেই শব্দময় রূপের পানে চাহিয়া আছেন—চমক ভাঙ্গিয়া কক্ষদ্বারে ছুটিয়া আসিলেন, কোলের উপর হইতে গীত-গোবিন্দখানা গৃহতলে লুটাইয়া পড়িল দৃক্‌পাতও করিলেন না।

রাজকুমারী ডাকিলেন, "মণিয়া", পরিচারিকা আসিল। রাজকুমারী কহিলেন, "ওই যে সন্ন্যাসী পথে গান গাহিয়া যাইতেছে, উহাকে ফিরাইয়া আনিয়া রাধামাধবের মন্দিরে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দে। আমি গান শুনিব।"

২

গমগমে রাজসভা, সন্ধ্যার দীপমালায় স্বপ্নপুরীর মত বোধ হইতেছে। সন্ন্যাসী শুধু সুকণ্ঠ গায়ক নহেন, অসাধারণ পণ্ডিত এবং বাগ্মীও বটেন। রাজসভায় গুণী ও জ্ঞানীর অভাব নাই, বিনীত সন্ন্যাসী প্রথমে যতই আত্ম গোপন করুন না কেন, তাঁহাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বহুদর্শিতার নিকট অবশেষে তাঁহাকে আত্মপ্রকাশ করিতে হইল। মাঝে মাঝে গীত এবং তৎপোষক তত্ত্বালোচনা চলিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী ব্যাখ্যা করিতেছেন "রসো বৈ সঃ"। বেদ উপনিষদ্ পুরাণ হইতে বচন তুলিয়া প্রতিষ্ঠা করিতেছেন—রসই পরতত্ত্ব, প্রেমই পুরুষার্থ। নিখিলের আদিকারণ রসরাজ প্রেমিক নবঘন-শ্যাম-সুন্দর গোপবেশী নন্দনন্দন। তিনি রাধাকান্ত, গোপবধূগণের প্রেমরসলম্পট, রাসবিহারী। উপনিষদের ব্রহ্মজ্যোতি তাঁহারই অঙ্গকান্তি, যোগীর পরমাত্মা তাঁহার একটি আংশিক প্রতীতিমাত্র। তিনিই স্বয়ং ভগবান্ পূর্ণতম-তত্ত্ব। প্রেমেই তিনি পূর্ণপ্রকাশিত এবং প্রেমই তাঁহার প্রিয়তম বস্তু। রাসই তাঁহার পূর্ণতম এবং প্রিয়তম লীলা; বৃন্দাবন তাঁহার পূর্ণতম এবং প্রিয়তম ধাম। বিশ্ববাসী এই বিশ্বেই যেদিন সেই বৃন্দাবন প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, সেইদিন সেই প্রেমময় রসরাজের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইবে—তাঁহার মোহনমুরলীরবে মুগ্ধ হইবে, তাঁহার প্রেমলীলার সহচর হইয়া আত্মা, ধন্যাতিধন্য করিতে পারিবে। বেদ উপনিষদ্ ও পুরাণে এই বৃন্দাবনের অন্বেষণকেই জীবাত্মার চরম সাধনা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু এ সাধনা অতি কঠিন ও উচ্চাধিকার ভিন্ন সম্ভবে না বলিয়া—সংক্ষেপে ও ইঙ্গিতে উল্লিখিত আছে—আর অন্যান্য সাধনা অধিকাংশের উপযোগী বলিয়া বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে—অশ্রুতপূর্ব্ব কিন্তু অকাট্য ব্যাখ্যা শ্রবণে সভাসদ্‌গণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অদূরে পরদার আড়ালে চুড়িবালার ঠুং ঠাং এর সহিত গীতগোবিন্দ পাঠিকার হৃদয়বীণার তারগুলিও টুং টুং করিয়া উঠিল।

উপযুক্ত শ্রোতৃমণ্ডলী পাইয়া সন্ন্যাসী পরিব্রজ্যা স্থগিত করিলেন। তত্ত্বপ্রচারের জন্যই তাঁহার পরিব্রজ্যা। কয়েকদিন ধরিয়া সমস্ত নগর পিপাসার পানীয়ের মত প্রবল আগ্রহে সন্ন্যাসীকে যেন পান করিয়া লইল। নগরবাসীর হৃদয় নিঃশেষে চুরি করিয়া, পূর্ণিমার দিন অপরাহ্ণে সন্ন্যাসী রাজসভায় সংবাদ দিলেন, "আমি কাল যাইব।"

রাজকুমারী উদ্যানসরসীর তীরে নাগকেশর কুঞ্জে বসিয়া তন্ময়চিত্তে বীণা বাজাইতেছিলেন। বীণা বড় মিঠা বাজিতেছিল,—

"যোগী নয় সই প্রেমের পুতুল, নয়ন দেখে যায়গো চেনা,
ওই যোগীর যোগিনী হব কুঞ্জমাঝে ডেকে দে না।

ময়ূরী তাহার ময়ূরকণ্ঠী সাড়ীর অঞ্চল লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল, শারী মাঝে মাঝে খোলা পিঞ্জর ছাড়িয়া আসিয়া তাহার কবরীতে বসিতেছিল—একদল ভ্রমর তাহার বীণার সহিত তান মিলাইয়া কম্পমান তারের উপর বসিবার ব্যর্থ চেষ্টায় পরিশ্রান্ত হইতেছিল, হরিণশিশুটি দ্বারের নিকট উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—এমন সময় খবর আসিল সন্ন্যাসী কাল যাইবেন।

সহসা বীণার তার ছিঁড়িয়া গেল—অবশ হস্ত হইতে বীণাটি ময়ূরীর ঘাড়ে পড়ায় সে কর্কশ কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, "কে ও"

রাজকুমারী বেদনা-পাণ্ডুর মুখে অর্থপূর্ণদৃষ্টিতে সহচরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মণিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চোখের জল মুছিল।

৩

সন্ন্যাসী চন্দনার জলে সান্ধ্য স্নান করিতেছিলেন। তীরস্থ নেবুফুলের গন্ধের সহিত ভাঁটফুলের গন্ধ মিশাইয়া বাতাস চন্দনার জলে সাঁতার খেলিতেছিল। দূরে ঢেউখেলান পাহাড়ের ফাঁকে চাঁদ উঠিতেছে। সন্ন্যাসী স্নান করিতেছেন আর গাহিতেছেন,

"স্ফুরদধর সীধবে তব বদন-চন্দ্রমা
রোচয়তি মে লোচন-চকোরম্!"

সন্ন্যাসীর মুখে বিচিত্র কমনীয়তা, গাত্রে পুলককম্পন, স্বরে অদ্ভুত মাদকতা, অদূরবর্ত্তী গুল্মকুঞ্জের অন্তরালে বোধ হয় কোন বন্যজীব নড়াচড়া করিতেছে—শুক্‌নো পাতা মচমচ্ করিয়া উঠিল।

সেই গুল্মবীথিই নগরে ফিরিবার পথ। স্নানান্তে সন্ন্যাসী সেই পথেই ফিরিতেছিলেন। সহসা দুইটি রমণীমূর্ত্তি অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিতে করিতে কহিল—"আপনি কাল চলে যাবেন তাই আমরা আপনাকে প্রণাম কর্‌তে এলাম"। বক্তা অগ্রবর্ত্তিনী মণিয়া।

সন্ন্যাসী "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়াই অধোমুখে পাশ কাটাইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। রাজকুমারী ধীরে ধীরে মণিয়ার পশ্চাৎ হইতে সরিয়া আসিয়া পুনরায় সন্ন্যাসীর সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলেন। বসিয়া করুণ মিনতির কণ্ঠে কহিলেন "আমার কিছু নিবেদন আছে।" সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলেন না। রাজকুমারী নীরবে কাঁদিতেছেন।

সন্ন্যাসী দেখিলেন, গীতগোবিন্দের শ্লোক সৌষ্ঠব মূর্ত্তি ধরিয়া সম্মুখে আসিয়াছে, আকাশের চাঁদ ভূমিতে নামিয়াছে—বৈশাখী পূর্ণিমা মানবীর আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, "কে?"

মণিয়া সংক্ষেপে উত্তর দিল, "রাজকুমারী"।

সন্ন্যাসী যেন চমকিয়া উঠিলেন।

নির্জ্জন বনভূমি, স্নিগ্ধ নদীতীর—আলোকিত বিশ্ব আর তরুণ উদাসীর সম্মুখে জানু পাতিয়া অশ্রুমুখী তরুণী রূপসী। অদূরে বাব্‌লাগাছে পাখী ডাকিতেছিল, "কও, কথা কও"।

রাজকুমারী কহিলেন, "এখন আমার কর্ত্তব্য কি?"

সন্ন্যাসী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিলেন "কৃষ্ণে প্রীতি করাই জীবের নিত্য কর্ত্তব্য। উহাই নিত্য ধর্ম্ম। যৌবনই ধর্ম্মসাধনার উত্তম কাল। কিন্তু একাল বড় বিষম কালও বটে। নারীর যৌবন আরও বিষম, কেননা নারী স্বভাবত ভাবময়ী, উচ্ছ্বাসপ্রবণা। তাহাতে নারী সহজেই উচ্ছৃঙ্খল

হইয়া যাইতে পারে। এই জন্যই যৌবনেই সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে, শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে হয়। নারীর যৌবন ক্ষণস্থায়ী কিন্তু ঐ ক্ষণস্থায়ী বস্তুই কৃষ্ণসেবায় লাগিতে পারে—

"নারীর যৌবন ধন যারে কৃষ্ণ করে মন
সে যৌবন দিন দুই চারি।"

এ ভাগ্য একমাত্র নারীরই আছে। তুমিও নারী—মনে করিলে এ ভাগ্য তুমিও অর্জ্জন করিতে পার। তুমি তোমার জীবন যৌবন শ্রীভগবচ্চরণে অর্পণ করিয়া দেবদাসী হও—এখন ইহাই তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া আমার মনে হয়।"

রাজকুমারী নীরবে শুনিতেছিলেন। তাহার অধরোষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল, মুখখানি লাল হইয়া উঠিল, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন, "আমার ভগবান্ তুমি, তোমার চরণেই আমি সর্ব্বস্ব অর্পণ করিলাম"—বলিয়াই সন্ন্যাসীকে আর সারিবার অবসর না দিয়া তাঁহার চরণে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী স্তম্ভিত। কিছুক্ষণ তাঁহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। তাহার পর আত্মসংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "সন্ন্যাসীকে স্ত্রী স্পর্শ করিতে নাই। আর প্রীতি করিতে হইবে ভগবানে, মানুষে নহে। ভগবানের সম্বন্ধ ধরিয়া মানুষকে যতটুকু প্রীতি করা দরকার তদতিরিক্ত করিলে বঞ্চিত হইবে। আমি ভিক্ষুক, রাজকন্যা লইয়া কি করিব? কোথায় রাখিব? তুমি কৃষ্ণভোগ্যা—ভিক্ষুকভোগ্যা নহ, আমার যোগ্যা নহ। কি চাও রাজকুমারি? রূপ, প্রেম, সম্ভোগ? শ্যামসুন্দরের মত রূপবান্ প্রেমিক সম্ভোগরসিক আর কে হইতে পারে? রাধামাধবকে ভালবাসিতে শিখ—আমি কুরূপ ভিক্ষুক কর্কশ সন্ন্যাসী, নির্দ্দয় নির্ম্মম আমাতে তুমি কি তৃপ্তি পাইবে?

রাজকুমারী তীরবেগে উঠিয়া সন্ন্যাসীর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আকুলকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—

কে বলে আমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ? স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক লইয়া আমি তোমার কাছে আসি নাই। আমি দেখিলাম, আমার আত্মার পুঞ্জীভূত প্রেমপিপাসা স্বরূপ ধরিয়া আমারই প্রাণের বেদনা গাহিয়া গাহিয়া রাজপথে চলিয়াছে। সৃষ্টির আদিকালে আমি যাহাকে হারাইয়া, যাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কতরূপে কতভূমে কতবার আনাগোনা করিতেছি—সেদিন দেখিলাম তুমি সেই। আমি তোমারই অস্তিত্বে অস্তিত্বমতী—অনবচ্ছিন্ন অসীমমিলনে এ তীব্র পিপাসার শান্তি হইবে বলিয়াই এই দীর্ঘবিরহে প্রাপ্তির পিপাসা বাড়াইয়া লইতেছি. হারাইয়া পাওয়াই যে প্রকৃত পাওয়া—এই আমাদের প্রেমলীলার রহস্য। আজ সাতদিন ধরিয়া তিলে তিলে পলে পলে আমি এ রহস্য ভেদ করিয়াছি—কষিয়া কষিয়া যাচাই করিয়া করিয়া নির্ভুল সত্যে উপনীত হইয়াছি। পরদার আড়ালে বসিয়া বসিয়া আজ

সাতদিন নয়ন মনে হৃদয়ে তোমার রূপগুণ প্রেমকথা আকণ্ঠ পান করিয়াছি, তোমাকে চিনিয়াছি, কেন এ ছলনা সখা, অপরে ভুলিতে পারে বটে, কিন্তু আমাকে লুকাইবে তুমি কোন্ ছলে?" রাজকুমারীর চোখ বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। অঞ্চলপ্রান্তে মুছিয়া ফেলিয়া পুনরায় বলিলেন "তুমি কুরূপ? উর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কন সময়েও কি দর্পণে নিজের মুখখানি কখনও দেখ নাই? ও মুখ যে কেউটের বিষ গো। তুমি ভিক্ষুক? বুকভরা মুখভরা চোখভরা এত প্রেমধন যার, সেত রাজরাজেশ্বর! তুমি কর্কশ? তবে তোমার স্বরে এত মাদকতা কেন? রাজরাজেশ্বর, তোমার ঐ অসীম প্রেমরাজ্যের এককোণে তোমার বিন্দুপ্রেম ভিখারিণীর স্থান হইবে না কি? রাধামাধবকে ভালবাসিতে শিখিব? এতকাল তাহাকে ভালবাসিয়াছি বলিয়াই আজ তোমাকে পাইয়াছি। প্রেমলুব্ধা মানবীর সেবার ফলে আজ প্রেমের ঠাকুর রাধামাধব পাথরের আবরণ ভেদ করিয়া মানবমূর্ত্তিতে প্রকট হইয়াছেন। প্রেমের দেবতা আজ যোগীবেশে নগণ্যা মানবীর দ্বারে দাঁড়াইয়া—তাঁহাকে ফিরাইব কোন্ প্রাণে? এতদিন রাধামাধবের ভিতর তোমাকে পাইতেছিলাম, আজ তোমার ভিতরে তাহাকে পাইতে চাই!"—

আবেগে রাজকন্যার নিঃশ্বাস ঘন হইতে ঘনতর হইতে লাগিল।

মুগ্ধ বিস্মিত সন্ন্যাসী দেখিলেন, তাঁহার আজন্মের প্রেমসাধনা আজ মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহাকে বর দিতে আসিয়াছে।

ঠিক ঐই সময়ে রাধামাধবের সন্ধ্যারতির ঘিয়ের বাতি নিবিতে নিবিতে জ্বলিয়া উঠিল। রাণী শীতল ভোগের ফলমূল ছাড়াইতে ছাড়াইতে বঁটিতে আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিলেন। রাজা উদ্যানে বেড়াইতেছিলেন। গোলাপকুঞ্জের কাঁটায় তাঁহার চরণ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল।

৪

নির্জ্জন অরণ্যে তৃণকুটীর। মৃত্যুশয্যায় রাজকন্যা। পার্শ্বে বিমর্ষ সন্ন্যাসী যেন ক্ষীণবক্ষা গঙ্গার কূলে ডাহুক, দীনদশা ধনীর দুয়ারে ভিক্ষুক, লীন জ্বালা হোমশিখার পার্শ্বে ক্লান্ত যাজ্ঞিক।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "কি করিলে রাজকুমারি, ইন্দ্রের মুকুটমণি তুমি, ভিখারীর ঝুলিতে কেন ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলে? মুক্তামালার আদর বাঁদরে কি করিয়া করিবে?

রাজকুমারীর পাণ্ডুর বদনখানি প্রেমে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মর্ম্মভেদী কটাক্ষ হানিয়া কহিলেন, "বেশ করিয়াছি, খুব করিয়াছি। পদ্মফুল জলে ফোটে, কিন্তু সার্থকতা পায় দেবতার চরণতলে।

সন্ন্যাসী করুণকণ্ঠে কহিলেন, "কিন্তু আমার সান্ত্বনার উপায় কি? আবাল্যের প্রেম-সাধনায় চিত্তকুঞ্জে যে মানসী তিলোত্তমার সৃষ্টি করিয়া ধ্যানমগ্ন ছিলাম, সেটি যে ধরণীর ধূলিতে ম্লান হইয়া গেল! এ দৃশ্য যে বিসদৃশ সখি, আমার মানসী প্রতিমাটি যে অশুচি স্থানে হারাইয়া ফেলিলাম—

"কেন তুমি রহিলে না ধ্যান ধারণায়?"

রাজকন্যা কহিলেন, না সখা এই দৃশ্য তোমাকে প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত সন্ন্যাস-ধর্ম্ম শিক্ষা দিবে। আজ হইতে জড়রূপ লজ্জায় তোমার নিকট হইতে পলায়ন করিবে। যে চিন্ময়-লোকে আমি চলিলাম আজ হইতে অনুক্ষণ সেই দিকে তোমার নয়ন প্রখর হইয়া থাকিবে, জগতের সৌন্দর্য্য সেই গোলোকের উদ্দীপন করিবে মাত্র—কখনো মোহ আনিবে না।

সন্ন্যাসী কাঁপিয়া উঠিলেন। রাজকন্যা ক্ষীণ বাহুলতা দ্বারা সন্ন্যাসীর পদযুগ জড়াইয়া ধরিলেন। ধরিয়া মুহুর্মুহু চুম্বন করিতে লাগিলেন। তারপর ক্লান্তভাবে চুলের লহর এলাইয়া লুটাইয়া পড়িলেন — শীর্ণ দেহ হিমশীতল হইয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। অদূরবর্ত্তী বিল্বশাখে কোকিল ডাকিল "—উঃ! উঃ!"

তখন জ্যোৎস্নালোকে বনভূমি প্লাবিত সে দিনও বৈশাখী পূর্ণিমা।

মন্তব্য ও সংবাদ

৩১। স্বর্গীয় শশীভূষণ নিয়োগী

দানবীর শশীভূষণ নিয়োগী মহাশয়ের মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে কেবল মাত্র সদ্গোপ সভাই ব্যথিত হয় নাই; সমগ্র বঙ্গদেশ এই মহাত্মার তিরোভাবে মর্ম্মাহত হইয়াছে। রেঙ্গুন-নিবাসী ৯৬ জন ইংরেজ, বর্ম্মান ও ভারতীয় পারসি, য়িহুদী, হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক কর্ত্তৃক আহুত হইয়া গত ১৮ই জানুয়ারি শুক্রবার তারিখে ৬টার সময় স্থানীয় জুবিলী হলে তাঁহার জন্য একটি বিরাট শোক সভা হয়। সভাপতি ও উপস্থিত মহোদয়গণ তদীয় বিরাট দানের কথা স্মরণ করাইয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া একটি প্রস্তাব জ্যেষ্ঠপুত্র ধীরেন্দ্রনাথকে টেলিগ্রামযোগে পাঠান হইয়াছে। রাজা রেডিয়ার, নাইতরাম্ রামবক্স, এম্ যোয়াকিম্, এম রাফি, তায়াবজি, মুখার্জ্জি ও স্বামী নার্দনকে লইয়া স্মৃতিরক্ষার উপায় অবলম্বনের জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়। বক্তৃতা উপলক্ষে সভাপতি ব্যারিষ্টার এম্, এম্, রফি বলেন যে শশীভূষণ বহুদিন পূর্ব্বে রিক্ত হস্তে বর্ম্মায় আসেন। বিনা বিত্তায় তিনি প্রচুর ধনোপার্জ্জন করিয়া প্রভূত দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত সাধু ও সচেষ্ট হইতে পারিলে তবে আমরা তাঁহার

স্মৃতির সম্যক্ সম্মান করিব। সভায় মিঃ নাইচরাম রামবক্স, চাণ্ডু গ্যালিয়ারা, মুখার্জ্জি ও গুহ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। তাঁহার দানে সন্দোপ ছাত্রগণ উপকৃত, বঙ্গের ও বর্ম্মার বহু সৎ প্রতিষ্ঠান সেইরূপ তাঁহারই দানে প্রাণপ্রাপ্ত ও সঞ্জীবিত।

১২৬৮ বঙ্গাব্দে মাঘ মাসে কলিকাতায় গাঁজার গলি নামক অতি দরিদ্র পল্লীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিশেষ দরিদ্র ছিলেন বলিয়াই হৌক্ অথবা তৎকালীন শিক্ষ-প্রণালীর উপর আস্থাবান না হওয়ার জন্যই হৌক্ শশীভূষণ প্রথমে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন নাই। পিতা বেণীমাধব আত্মসম্মান-পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, দরিদ্র হইয়াও কাহারও দান গ্রহণ করা হেয় বোধ করিতেন। এমন কি যখন শশীভূষণের বিদ্যার ব্যয় গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার পল্লীর কোন এক ধনাঢ্য ব্যক্তি উৎসুক হইয়াছিলেন তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই।

শশীভূষণের বালক বয়সে খেলাধূলার প্রতি বিশেষতঃ হাডুডু খেলায় আগ্রহ ছিল এবং স্কুলে না যাইলেও খেলার মাঠে তাঁহার খুব নাম ছিল এবং এই খেলার মাঠে প্রাপ্ত শিক্ষাই বোধ হয় ইঁহাকে পরবর্ত্তী জীবনে সফল ব্যবসায়ী করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল। শশীভূষণের মেধা খুব প্রখর ছিল এবং তাঁহার স্মরণশক্তি বহু লোককে আশ্চর্য্য করিয়া দিত। তিনি একবার যাহা শুনিতেন তাহা কখনও ভুলিতেন না।

কিছু অধিক বয়সে প্রতিবাসিগণের আগ্রহাতিশয্যে বেণীমাধব শশীভূষণকে পাঠশালে প্রবেশ করাইয়া দেন। তথায় তিনি গণিতে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতেন বটে কিন্তু পাঠশালে তাঁহার মন বসিল না। দারুণ দারিদ্র্যের পীড়নে অতি অল্প বয়স হইতেই তাঁহার অর্থোপার্জ্জনের দিকে মন নিবিষ্ট হইয়াছিল। ঐ সঙ্গে এই ধারণাও বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে বাণিজ্য ব্যতীত প্রচুর অর্থাগমের পথ আর নাই। তাঁহার ধারণা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য শশীভূষণ বালক অবস্থাতেই ব্রহ্মদেশে যাত্রা করেন। তাঁহার সময়ে ব্রহ্মদেশে যাওয়া আজকালকার মত সহজ ছিল না। তিনি বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া রেঙ্গুনে উপস্থিত হন ও তথায় এক আত্মীয়ের সুপারিসে এক বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর দোকানে কার্য্য আরম্ভ করেন। তথায় অল্প দিনের মধ্যে তিনি ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র আয়ত্ত করিয়া লন এবং তাঁহার কর্ম্মকুশলতা দেখিয়া তাঁহার প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।

শশীভূষণ নিরতিশয় সৎলোক ছিলেন ও অন্যায় উপায়ে অর্থার্জ্জন করাকে ঘৃণা করিতেন। কার্য্য লাগিয়া কিছুদিন পরে প্রভুর ব্যবসায়ের অবস্থা শোচনীয় হওয়ার জন্য তিনি দেশে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই দুইজন বন্ধুর সহিত পুনরায় ব্রহ্মদেশে গমন করেন। ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হইয়া তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। যখন সুস্থ হইলেন তখন স্থির করিলেন যে এবার স্বয়ং ব্যবসায় পরিচালনা করিতে হইবে। পুরাতন প্রভু তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন এবং

শশীভূষণের প্রস্তাবে তিনি একটি মুদিখানার দোকান তাঁহাকে ভাড়া দিতে সহজেই স্বীকৃত হইলেন। তখন হইতেই তাঁহার একমাত্র সাধনা ছিল কি উপায়ে কর্ম্মে সফলতা লাভ করা যায়। সেই সময়ে ইসমাইল নুরমহম্মদ নামক এক মুসলমান ব্যবসায়ীর সহিত তাঁহার আলাপ হয় এবং তাঁহার অংশীদার হইয়া শশীভূষণ ক্রমশঃ ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে পিতার আদেশে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন ও উমাচরণ সুর মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কিরণবালার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহে পণ লওয়া হয় নাই। আড়ম্বর না হইলেও শত্রুমিত্র সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। বিবাহের পর শশীভূষণ পুনরায় রেঙ্গুনে ফিরিয়া গেলেন এবং অদ্ভুত অধ্যবসায়ের সহিত ব্যবসায়ের উত্তোরত্তর শ্রীবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যবসায় ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। শশীভূষণ ব্যবসায় গুপ্ত রহস্য বুঝিয়াছিলেন। কি প্রকারে ব্যবসায়ে সফলকাম হওয়া যায় তাহা তিনি পূর্ব্বে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এবার তাঁহার পত্নী কিরণবালা স্বামীর সহিত ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হওয়ায় ভাগ্যলক্ষ্মী শশীভূষণকে ধরা দেন। ইহার অল্পকাল পরে ইস্মাইল নুরমহম্মদ সাহেবের সহিত কোন কারণে তাঁহার প্রায় মতান্তর উপস্থিত হয়। শশীভূষণ বন্ধুবৎসল লোক ছিলেন, বন্ধুবিচ্ছেদ হওয়ার চেয়ে তিনি বন্ধুত্ব বজায় রাখিয়া ইস্মাইল সাহেবের সহিত ব্যবসার সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। তৎপরে তিনি চাউল, আটা প্রভৃতির কল স্থাপন করেন ও স্রোতের ন্যায় তাঁহার অর্থাগম হইতে থাকে। তখন তিনি ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করেন ও ব্যবসার পরিচালনার ভার তাঁহার সুযোগ্য পুত্রদের উপর অর্পিত করেন। তাঁহার শিক্ষাগুণে রেঙ্গুনে নানা প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও পুত্রগণ কৃতবিদ্য চরিত্রবান ও পরিশ্রমী হইয়া তাঁহার শেষ জীবনে অশেষ তৃপ্তির কারণ হইয়াছেন। নিয়োগী মহাশয়ের পাঁচ পুত্র ও ছয় কন্যা। কন্যা ছয়জন সকলেই বিবাহিতা। তিন জন পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ ও মণীন্দ্রনাথ এখন পিতার ব্যবসায় চালাইতেছেন ও কনিষ্ঠেরা দুইজনে পড়াশুনা করিতেছেন।

শশীভূষণের চরিত্রের মহত্ত এই যে তিনি স্বাবলম্বী ছিলেন। তিনি গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত যা কিছু উন্নতি করিয়াছিলেন তাহা নিজের চেষ্টায়। নিজে দরিদ্র হইতে ধনকুবের হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি দরিদ্রের ব্যথা বুঝিতেন। সেই জন্যই তিনি প্রভূত অর্থ দরিদ্রের সাহায্যের জন্য দান করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তিনি আজীবন শশীবাবুই ছিলেন। কোন প্রকার সরকারী খেতাবের জন্য লালায়িত হন নাই।

৬৭ বৎসর বয়সে ১৩৩৫ সালের ২১শে পৌষ শনিবার বেলা ৯-১৫ মিনিটের সময় কলিকাতা ১৩১ নাথের বাগান লেনস্থিত বাসভবনে এই মহাত্মার মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বেই একটী ডাক্তারখানা স্থাপন করিয়া যান। তাহাতে তাঁহার কলিকাতার বসতবাড়ী, ও পঞ্চাশ সহস্র নগদ

মুদ্রা ও রেঙ্গুনের মাসিক বার শত টাকা আয়ের সম্পত্তি প্রদত্ত হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার দানের পরিমাণ তিন লক্ষ ছিয়াশি হাজার নয় শত ছিয়াত্তর টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। বাংলায় এরূপ বিরাট দান অতি বিরল। শশীভূষণ দাতব্য ভাণ্ডারের প্রথম অধিবেশনে অশ্রুসিক্ত নয়নে সভাপতি সার নীলরতন বলেন "আপনার বাসভবন যিনি এমন করিয়া দরিদ্রনারায়ণের সেবায় দান করিতে পারেন, তিনি দেবতা। তাঁহার দান মহাদান। সে দানের গৃহ তীর্থক্ষেত্র বিশেষ। সেই তীর্থক্ষেত্রে তীর্থযাত্রীর মত আসিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিলাম।" তাঁহার মত জীবিত থাকিতে থাকিতে দানের তৃপ্তি উপভোগ করিতে আর কোনও সদেগাপ মহাত্মা অগ্রসর হইবেন কি? (সদ্‌গোপ পত্রিকা)

৩২। শ্রীশ্রীরাধারমণ সেবাশ্রম।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের শ্রীধাম নবদ্বীপ। এই শ্রীধামে দরিদ্র ও অসহায় নরনারীর একমাত্র আশ্রয় স্থান "রাধারমণ" সেবাশ্রম। ১। দরিদ্র রোগীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ পথ্য দেওয়া হয়। ২। রোগীদের আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয়। ৩। আতুর, যাহারা একেবারে অক্ষম তাহাদের আশ্রয় দেওয়া হয়। ৪। অনাথ বালক প্রতিপালন করা হয়। ৫। ছাত্রদের শিক্ষা দান করা হয়। ৬। সহায়হীন মৃতদেহের সৎকার করা হয়। ৭। কাহারও সঙ্গী হারাইলে খুঁজিয়া দেওয়া হয়। এই সেবাশ্রম ছাড়া সর্ব্বপ্রকারে মানুষের সেবা করার দ্বিতীয় স্থান আর নবদ্বীপে নাই।

ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম। মানুষ হইয়া মানুষকে ভালবাস, মানুষ হইয়া মানুষের সেবা কর। মানুষের মধ্যেই শ্রীভগবান্, ইহাই নরলীলা—ইহাই প্রেমধর্ম্ম। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গে আসিয়া যে যুগধর্ম্ম প্রচার করিলেন তাহার প্রথম কথা ও প্রধান কথা "জীবে দয়া"।

পিতৃ-মাতৃহীন বালক বালিকা অযত্নে ও অনাহারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়া যাইতেছে, তাহাদের অন্ন দাও, বিদ্যা দাও, তাহাদের মানুষ কর, ধার্ম্মিক মানুষ কর। মানুষের সেবাই ভগবানের সেবা, মানুষই শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ। নিরাশ্রয় রুগ্ন বৃদ্ধ বৃদ্ধা রোগে ভুগিতেছে, কষ্ট পাইতেছে, তাহাদের রক্ষা কর, সেবা কর, ইহাই ভগবানের সেবা। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের ধর্ম্ম, শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দ নিজে আচরণ করিয়া এই ধর্ম্ম শিখাইয়াছেন।

প্রবল মানুষ অসুর হ য়া দুর্ব্বলকে বঞ্চনা করিতেছে, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতেছে, তোমরা দুর্ব্বলকে রক্ষা কর, প্রবলের তোষামোদ করিও না। ইহাই প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

রাধারমণ সেবাশ্রমকে সাহায্য করুন, বঞ্চনাকারী ব্যবসায়ী ধর্ম্মের দোকান খুলিয়া লোক ঠকাইতেছে, প্রতারিত হইবেন না। সেবাশ্রমে আসুন, ধর্ম্ম কথা শুনুন, প্রকৃত ধর্ম্ম কি, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ, প্রেম, সেবা প্রভৃতি কি, শিক্ষা করুন আর সেবাশ্রমকে সাধ্যমত সাহায্য করুন। "জীবে দয়া" না করিলে সবই বিফল। ধর্ম্মের ইহাই সার কথা। রাধারমণ সেবাশ্রম "জীবে দয়া" পরম ধর্ম্মের বিগ্রহ স্বরূপ, সেবাশ্রমকে সাহায্য করুন, ধন্য হইবেন, নবদ্বীপ আসা সার্থক হইবে।

৩৩। জাতীয় মহাসমিতি

জাতীয় মহাসমিতির ত্রিচত্বারিংশৎ অধিবেশন, কলিকাতা সহরে যাহা হইয়া গেল তাহাতে বাঙ্গালীরা, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার যুবকেরা একটা জিনিষ খুব ভাল করিয়া প্রমাণিত করিয়াছে যে সুবিধা পাইলে খুব বৃহৎ ব্যাপার তাহারা সংঘবদ্ধভাবে অতীব সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করিতে পারে। ইংরাজ বলে আমরা অক্ষম, নিজেরা কর্ত্তা হইয়া বড় বড় কার্য্য পরিচালনা করিতে অক্ষম। কংগ্রেসের কাজ দেখিয়া ইংরাজ যদি বলিত, না ইহারা অক্ষম নহে, ইহারা সক্ষম,—সৈন্য-পরিচালনায় সক্ষম, শান্তিরক্ষায় সক্ষম, বহু লোকের রসদ জোগাইতে সক্ষম, সভা সমিতি করিতে সক্ষম, আর এই সক্ষমতা স্বীকার করিয়া যদি আমাদিগের মধ্যে যাহারা নেতৃত্ব করিয়াছে, তাহাদিগকে উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করিত, তাহা হইলে আমাদের সমুদয় পরিশ্রম যে সফল হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, ইংরাজ তাহা করিল কৈ ?

এবারকার জাতীয় মহাসমিতি বাহিরের আয়তনে ও আড়ম্বরে যেমন অন্যান্য অধিবেশনকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, ঠিক সেইরূপই কৃত কর্ম্মের স্বরূপ-সম্বন্ধীয় মতভেদেও অন্যান্য অধিবেশনকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। যাঁহারা চিন্তা করিতে পারেন এবং চিন্তা করেন, তাঁহাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে, ব্যাপার কি ? এত মতভেদ হয় কেন, এমন গুরুতর মতভেদ হয় কেন ?

"মহাত্মা গান্ধি কলিকাতা-কংগ্রেসের এত জাঁকজমক সত্বেও কংগ্রেসের ধরণ দেখিয়া কিছু বিরক্ত হইয়াছেন। কংগ্রেসের বাহিরে মহা হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড, ভিতরেও সেই রুদ্রতাল। ডেলিগেট্ যে কত, তাহার সংখ্যা নাই। স্বাধীনতাওয়ালা পণ্ডিত জহরলাল ডেলিগেটের সংখ্যা কমাইবার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন তিন হাজার ডেলিগেটই যথেষ্ট। কিন্তু, তিনি ভোটে হারিয়া যান। ডেলি-গেটগণ অনেকেই যে স্বনির্ব্বাচিত তাহা মহাত্মা গান্ধি মালুম করিয়া বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। এতজন প্রতিনিধি লইয়া যে কোনও বিষয়ের পরামর্শ বা সিদ্ধান্ত হওয়া সুকঠিন তাহা মহাত্মাজি কিছু উষ্মার সহিতই প্রকাশ করিয়াছেন। মহাত্মাজির মতে এবারের কংগ্রেস নাকি ছেলেখেলা (Children's pantomime) এবং প্রদর্শনীও একটা বিরাট সার্কাস। মহাত্মাজি কংগ্রেস প্যাণ্ডালের ভিতর মনোভাব বিশেষ সাবধানতার সহিত গোপন রাখিয়া তাঁহার তরুণভারতে (young India) আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন। কংগ্রেস-ক্ষেত্রেই তাঁহার মনোভাব সুস্পষ্ট হইলে ভাল হইত।

"ফরওয়ার্ড" মহাত্মাজির উক্তি "তরুণভারত"এ দেখিয়া তাঁহাকে "গো টু হেল্" করিয়াছে। কংগ্রেস্ মহাত্মা না হইলেও চলিবে, কংগ্রেসে স্বাধীনতা আন্দোলন শত মহাত্মার বিরুদ্ধতাতেও বন্ধ হইবে না বলিয়া "ফরওয়ার্ড" উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে। * * * 'দেশ' মানে কলিকাতা

বা সেইরূপ সহরের সমষ্টি নয়। যতদিন পর্য্যন্ত দেশের পল্লীবাসী মুক অগণিত সন্তানগণের মনোমধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিবার কোনও উপায় কংগ্রেস না করিবেন, এবং সেই উপায় স্থায়ীভাবে অবলম্বন করিবার উদ্যোগে ব্রতী না হইবেন, ততদিন দেশ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া যাইবে। অজ্ঞতা, ব্যাধিপ্রবণতা, দারিদ্র্য, দেশকে জড়ের ন্যায় করিয়া রাখিয়াছে। দেশ যতদিন কংগ্রেসের চেষ্টার ফলে এই সকল হইতে মুক্তি না পাইবে ততদিন দেশবাসীর. নিকট কংগ্রেসের অস্তিত্ব অর্থহীন থাকিয়া যাইবে। এখনও জাতির মেরুদণ্ড পল্লীবাসীরা বুঝিবার অবসর পায় নাই যে দেশের জন্য কংগ্রেস, না, দেশ কংগ্রেসের জন্য। এক-তরফা কোন উদ্যমই ফলবান হইবে না। কংগ্রেসের দেশের জন্য চেষ্টা এবং দেশবাসীর সাড়া—ইহাই দেশোদ্ধারের যুগলমন্ত্র। সে মন্ত্রের সাধনাক্ষেত্র হইতে দেশের কৃষক ও শ্রমিককে বাদ রাখিলে বা তাহাদের দরদী হইয়া আত্মনির্ব্বাচিত জননায়কগণ পল্লীসংস্কারে মন দিয়া তাহাদের শ্রদ্ধাভক্তি অর্জ্জন ও দেশাত্মবোধের উদ্বোধন না করিলে মন্ত্রচৈতন্য অবাস্তব ও অসম্ভব চিরকালই থাকিয়া যাইবে।" রাঢ়দীপিকা—১০ই মাঘ ১৩৩৫।

জাতীয় মহাসমিতির গত অধিবেশন-সম্বন্ধে, মহাত্মা গান্ধি বা অন্য কোন সম্মানিত দেশনায়ক যাহাই বলুন, এই মহাসমিতিকে স্বীকার করিতে ও সম্মান করিতে দেশবাসী সকলেই যে ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য সে-সম্বন্ধে মতভেদ নাই। পাক্ষিক পত্র "প্রজার. কথা" এ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য।

"আমরা দেশবাসীকে বলিতেছি, কৃষক ভাইদের বলিতেছি ভুলিওনা স্বার্থপরের কথায়, মজিও না বিতাড়িত গুরুগণের ভণ্ডামীতে। মনে রাখিও ৪৩ বৎসরের সাধনার কংগ্রেস; ইহা গঠন করিতে কত শত অতীত মনীষীর মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়াছে, কত শত প্রাণ বিসর্জ্জিত হইয়াছে, কত অর্থ, কত যশ, কত মান দান করিয়া একটি স্থান লাভ হইয়াছে, জাতীয় যজ্ঞের বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে। মনে রাখিও এই বেদী গড়িতে সেই দাদাভাই নাওরাজ, আনন্দ চার্লু, দামোদর চাপেকার, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, বাল গঙ্গাধর তিলক, আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি কত কত মাননীয় মহাপ্রাণের মহাশক্তি নিয়োজিত হইয়াছে। এই পবিত্র বেদীকে ঘৃণা করিও না বিদ্বেষ করিও না, পাপ হইবে, অকল্যাণ আসিবে। প্রণাম কর বেদীকে—গ্রহণ কর বেদীর ধূলি মস্তকে। উহাই তোমার স্বর্গের সোপান, মুক্তির নিদান, মুমূর্ষুর প্রাণ; উহাই তোমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, ব্যাধির ঔষধ, লজ্জার বস্ত্র, জাতির জীবন। এস সকলে ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, জাতি, কুল, মান বিসর্জ্জন দিয়া স্বরাজ পতাকামূলে উপনীত হই—কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করি।

যদি কোন অযোগ্য পূজারি বেদী আগলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে; যদি কোন ইন্দ্র তোমার

তপস্যা দর্শনে স্বীয় পদভ্রষ্ট ভয়ে ভীত হইয়া তোমার তপস্যা ভঙ্গের চেষ্টা করে ; যদি তোমার সাধনার যোগ্য স্থান দিতে আপত্তি করে, মায়ের মন্দিরদ্বারে অর্গল বন্ধ করে ; তবে দুঃখ করিও না। দূর হইতে গড় কর, মন্দিরের চূড়া দর্শন কর ; আর ভক্তিগদগদ কণ্ঠে করজোড়ে প্রার্থনা কর "আমায় পূজায় অধিকার দাও মা, আমিও তোমার অধম সন্তান, দাও মা তোমার দর্শনে অধিকার" অর্জ্জন কর যোগ্যতা --লাভ কর পূজার ক্ষমতা ; কয় দিন তোমায় ঠেলিয়া রাখিতে পারিবে ? তোমার অকপট ভক্তি দেখিয়া—অকৃত্রিম শ্রদ্ধা দেখিয়া কালই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া তোমাকে লইয়া যাইবে ও পূজার আসনে বসাইয়া দিবে। ইহা তোমার পরীক্ষা। অপার ধৈর্য্যবলে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে ; তখন দেখিবে যতবড় পাষাণ হৃদয়ই হউক না কেন নিশ্চয় গলিবে।

"ও তার হউক না কেন পাষাণ হৃদয়
নামের গুণে যাবে গলে।"

যদি তাতেও কোন পাষাণ না গলে ; তবে দেখিবে মা সেই অযোগ্য পূজারীকে গৃহের বাহির করিয়া দিবেন। দেশ জাগিয়াছে, লোক চিনিবার ক্ষমতা দেশে আসিয়াছে, মেকী বেশীদিন টিকিবে না, ভণ্ড, পাষণ্ড পবিত্র মাতৃমন্দিরে স্থান পাইবে না, "কুঁদের কাছে বাঁক থাকেনা।" তুমি প্রকৃত ভক্ত হইলে মা তোমার কাছে আসিয়া হাজির হইবেন। "ডাক দেখি মন ডাকার মতন কেমন শ্যামা না দেয় দেখা ?" ভক্ত হও। যোগ্য হও। একদিন না একদিন যোগ্যতার আদর হইবেই হইবে।

"যোগ্যপাত্রে মিলে যোগ্য, সুধা সুরগণ ভোগ্য,
অসুরের পরিশ্রম সার।"
ইহা অতি নিশ্চিত।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন "চালাকীর দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য হয় না।" এক চালাককে জব্দ করিতে আবার তুমি চালাকী করিও না, করিলে তুমিও অকৃতকার্য্য হইবে। তবে "ভালর ভাল সর্ব্বকাল, মন্দের ভাল আগে।"

আর ইহাও ভাবিও না যে, নেতৃবৃন্দ সকলেই অসৎ। অসৎ হইলে তাহার নেতৃত্ব মিলিত না। কোনও না কোনও একটি গুণে তাহারা নেতৃত্ব পাইয়াছে, চালাকী দ্বারা পাইয়া থাকিতে পারে ২।১ টি মাত্র ; তবে পরে যদি পদ বজায় রাখিবার জন্য যোগ্যতা অর্জ্জন করে, ভাল ; নতুবা তাহার অযোগ্যতাই তাহাকে সরাইবে।"

৩৪। মহাসমিতির নির্দ্ধারণ

১। গ্রেট্ ব্রিটেন্ ও আমেরিকায় কংগ্রেস-কমিটি স্থাপন

২। পরাধীন দেশসমূহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন ও কংগ্রেসের বৈদেশিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা

৩। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে সমগ্র এসিয়াবাসীর সম্মেলন আহ্বান। [প্রতীচ্য সাম্রাজ্যবাদের অধীনতা হইতে যাহারা মুক্তি চাহে তাহাদিগকে লইয়া সংঘবদ্ধ হওয়াই, ইহার উদ্দেশ্য।]

৪। চীনের স্বাধীনতা লাভে আনন্দ-জ্ঞাপন

৫। মিশর, সিরিয়া, ইরাক্ ও পালেষ্টাইনের স্বাধীনতা-লাভ প্রচেষ্টায় সহানুভূতি

৬। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লীগের আগামী বৎসরে দ্বিতীয় মহাধিবেশন হইবে, তাহাতে প্রতিনিধি প্রেরণ।

৭। ভারতীয় সৈন্য ইংলণ্ডের আদেশে অন্য কোন জাতির স্বাধীনতা লাভ চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইবে না।

৮। বিদেশী পণ্যবর্জ্জন

৯। বার্দ্দোলির প্রজাবর্গের ও শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেলের প্রশংসা

১০। সরকারী লেভি বর্জ্জন

১১। প্রধান প্রস্তাব—নেহেরু রিপোর্টের সমর্থন। মহাত্মা গান্ধি এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন না পাইলে আবার অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে।

বাঙ্গালার তরুণদল শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। মহাত্মা গান্ধির প্রস্তাবই গৃহীত হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ১৩৫০, বিপক্ষে ৯৭৩ ভোট হইয়াছিল। তরুণদল পূর্ণ-স্বাধীনতাকামী।

১২। কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্য—

(ক) ব্যবস্থা পরিষদের সাহায্যে বাহির হইতে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে পিকেটিং চালাইতে হইবে।

(খ) বিদেশী বস্ত্রের আমদানী বন্ধ করিতে হইবে, খদ্দর প্রস্তুত করিতে হইবে।

(গ) বার্দ্দোলির ন্যায় নিরুপদ্রব পদ্ধতিতে জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঘ) কংগ্রেসের লোক বলিয়া যাহারা ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য হইয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের অধিকাংশ সময় কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবানুযায়ী গঠনমূলক কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন।

(ঙ) সভ্যসংখ্যা বাড়াইয়া কংগ্রেসের কাজ কর্ম্ম সুশৃঙ্খলিত করিতে হইবে।

(চ) জাতীয় কার্য্যে স্ত্রীলোকদের লাগাইতে হইবে।

(ছ) সামাজিক দুর্নীতি ও কুপ্রথাসমূহ দূর করিতে হইবে।

(জ) হিন্দু সভ্যগণ অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিবেন, অস্পৃশ্য জাতিগণকে উন্নীত করিবেন।

(ঝ) স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী-গঠন।

ইহাই এবারের নির্দ্ধারণ। সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিগণকে একত্র করিয়া এই ব্যবস্থাগুলি নির্দ্ধারণ করিতে বহু অর্থ ও বহু পরিশ্রম ব্যয় হইয়াছে।